স্বদেশচর্চা **লোক**

২০০০

সূচিপত্র

কোচবিহার

জলপাইগুড়ি

দঃ ২৪ পরগনা

দার্জিলিং

দিনাজপুর

নদীয়া

পুরলিয়া

বর্ধমান

বীরভূম

মালদহ

সম্পাদকীয়

সাড়ে তিন হাত ভূমি

মহাভারতে বকরূপী ধর্ম, রহস্যময় অথচ কঠিন প্রশ্ন করলেন "কিমাশ্চর্য্যম"—অর্থাৎ আশ্চর্য কী?

মহাজ্ঞানী যুধিষ্ঠির অসম্ভব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে উত্তর দিলেন—

" অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরম্।
শেষাস্থিরত্বামিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতপরম।। "

—অর্থাৎ অহরহ (প্রত্যহ) ভূত (জীব) সকল যম মন্দিরে (আলয়ে) গমন করছে। আর যারা অবশিষ্ট থাকছে তারা ভাবছে অমর, এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী আছে?

তার মানে মানুষ মরণশীল। জন্ম নেওয়া প্রতিটি জীব একদিন সুনিশ্চিত মারা যাবে। তবুও মানুষের মৃত্যু বুকে বেশী বাজে, বড় কষ্টের, বড় বেদনার। এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে? সেই ভয় সিঁটিয়ে দেয়। মানুষ ভাবতেই পারে না-'রইল রে তোর সাধর দোকানদারি।' এ গান, এ শোক সঙ্গীত তাকে উপলক্ষ করে একদিন গাওয়া হবে। 'রাম নাম সত্য হ্যায়' কিংবা 'বল হরি হরি বোল' ওই শব্দাবলী কেমন সব তালগোল পাকিয়ে দেয় যেন!

যে বিষয়কে পরিহার করে সবাই। স্বপ্নে বা কল্পনাতেও আনতে কষ্ট পায় তেমনতর বিষয়ে আর একবার সম্পাদকীয় লিখতে হবে—দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য। মৃত্যু, শোক, দাহ, কবর, কান্না, অশৌচ, শ্রাদ্ধ এসব শব্দ না চাইলেও জড়িয়ে যায় কারো কারো সাথে, সময়ের হাত ধরে। কেননা—মরণ নিয়ে আমাদের বসবাস—

'যত বর্ষ বেঁচে আছি — তত বর্ষ মরে গেছি
মরিতেছি প্রতি পলে পলে,
জীবন্ত মরণ মোরা — মরণের ঘরে থাকি
জানিনা মরণ কারে বলে।'

এ সংখ্যাটি পুজোর আগেই বেরুবার কথা ছিল কিন্তু গত ৩০শে আগষ্ট আমার প্রিয়তম অনুজ পথ দুর্ঘটনায় আহত হয় এবং পরদিন ৩১শে আগষ্ট ২০০৪ মারা যায়। হাসপাতাল, মর্গ, শ্মশান সব কিছু যেন আর একবার চেখে দ্যাখা!

খানিকটা একঘেঁয়ে ব্যাপার-স্যাপার। সেই একই কথা—'কাল স্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান?' তবুও যেটুকু পড়াশোনা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জেনেছি তা সাজিয়ে গুছিয়ে বৈচিত্রময় করে তুলতে চেষ্টা করছি। সাগর সদৃশ বিষয়ে কতটুকুই বা জানি? বা এক জীবনে জানা যায়? লিখতে গিয়ে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে, পড়াশোনার খামতিতে যদি এলোমেলো ভুল-ভাল কিছু এসে যায় পাঠক আপন গুণে ক্ষমা করবেন নিশ্চয়।

সেই কবে প্রায় ৬০,০০০ বছর আগে নিয়ানডারথাল যুগে প্রথম নাকি মৃতদেহ কবরস্থ করা হয়। দাহও নাকি সমকালে প্রচলিত। অনেকে আবার এদুটোর কোনটায় না গিয়ে মৃত

দেহকে উঁচু স্থানে রেখে পশু পাখিকে খাওয়াত। কিংবা ঝড়-জলে-তাপে পচে গলে নিঃশেষ হয়ে যেতো একদিন। প্রত্নপ্রস্তর যুগের মানুষ কল্পনা করতো মৃতের শরীরে একদিন জীবন ফিরে আসবে। তাই মৃত দেহের সঙ্গে পার্থিব বস্তুও রাখা হত। যথেষ্ট পরিমানে খাদ্য পানীয়, জন্তু জানোয়ার, এমনকি যুদ্ধাস্ত্র, পোষাক-আশাকও। আর শিশু যেমন মায়ের পেটে হাত পা মুড়ে থাকে সেই কতকটা ভ্রূণ ভঙ্গিতে, সেভাবে কোথাও কোথাও কবর দেওয়া হয়েছে। নুড়িপাথর এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে মৃত দেহের গায়ে চাপ না পাড়ে। শুধু কি তাই; মৃতদেহে লাল রঙ লাগানো হত। তার মানে লাল রঙ হলো জীবনের প্রতীক। আর অগ্নি কুণ্ডের কাছাকাছি কবর দেওয়া হয়েছে যাতে তাপ পেয়ে মৃতদেহ তপ্ত হয়ে ওঠে। তার মানে তাপ হচ্ছে জীবন এবং শীতলতা মৃত্যুর প্রতীক। সে যুগের মানুষও হয়তো যাদু বা ম্যাজিকে বিশ্বাস করতো।

আলবেরুণী জানিয়েছেন প্রাচীনকালে মৃতদেহ খোলা মাঠে ফেলে রাখা হত। তারপর কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির নির্দেশে নতুন বাড়ির ছাদে রেলিং করে "জরাথুষ্ট্র প্রবর্তিত নিয়ম অনুযায়ী মৃতদেহ ঐ ছাদের ফেলে রাখার নিয়ম আরম্ভ হল। দীর্ঘকাল এপ্রথা চলার পর নারায়ণ নির্দেশ দিলেন মৃতদেহ অগ্নিকে সমর্পণ করতে তখন থেকে ঐ দাহ প্রথাই বলবৎ আছে, যার ফলে কোনরকম দুর্গন্ধ অথবা দোষনীয় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, পুড়ে সব ছাই হয়ে যায়।"

আবার কোনো মৃতপ্রায় ও অসুস্থ ব্যক্তিকে, পাহাড়ে, মাঠে, নদীর তীরে ফেলে রাখা হত। আরোগ্য লাভ করলে বাড়ি ফিরে আসত না হলে ওখানেই এভাবেই অন্ত্যেষ্টি হয়ে যেতো। যদিও হিন্দুদের জল সমাধির পাশাপাশি নদীতে মৃতদেহ ভাসিয়ে দিতেও দেখা যায়। সর্পাঘাতে মৃত কোনো ব্যক্তিকে ভেলায় করে ভাসিয়ে দেওয়া হত। এতে জলদূষণ ঘটলেও (কাল্পনিক বিশ্বাস) লখিন্দরের প্রাণ ফিরে পাবার সংস্কার আজও ক্রিয়াশীল, কিন্তু বাস্তব হচ্ছে সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তির দেহ পোড়ানো বেশ কষ্টসাধ্য ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার। সেকালের মানুষ তাই এদের দাহ পরিত্যাগ করেছিলেন। হিন্দুরা অন্তর্জলিও করত। মুমূর্ষু কোন ব্যক্তিকে গঙ্গাতীরে এনে শুইয়ে রাখত। এতেও যদি তার মৃত্যু না হত তবে কাদা দিয়ে সপ্ত ছিদ্র বন্ধ করে (নাক-২, চোখ-২, কান-২, ও মুখ-১) নিরন্তর জলে চুবানো হত যতক্ষণ না তার গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়। এখন প্রশ্ন গঙ্গা কেন? আসলে গঙ্গা পবিত্র নদী। এর জল সর্বকলুষ-নাশিনী। তাই অন্যত্র দাহ কার্য সম্পন্ন হলেও অস্থি ও ভস্ম গঙ্গায় বিসর্জন দেওযা হয়। এক এক জাতির এক এক নদী যেমন সাঁওতালদের দামোদর। মনে করা হয় সগর রাজার ৬০ হাজার সন্তানের অস্থির উপর দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছিল বলেই তাঁরা নরক থেকে উদ্ধার হয়ে স্বর্গে গিয়েছিলেন। ফলে এই গঙ্গার প্রবাহের মধ্য দিয়েই স্বর্গ যাবার পথ সুগম হবে। বারানসীতে জল সমাধির কথা জানা যায়। ঘুজ তুর্কীরা, কেউ জলমগ্ন হয়ে মারা গেলে, মৃতদেহ শবাধারে রেখে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। মৃতের পায়ে দড়ি বেঁধে জলে ঝুলিয়ে রাখা হয়—বিশ্বাস এই দড়ির সাহায্যে আত্মা পুনবায় উঠবে। "বুদ্ধদেবও নাকি নির্দেশ দিয়েছিলেন শবদেহ নদীতে নিক্ষেপ করতে। সেই জন্য তাঁর অনুরক্ত শমনীয়েরা শবদেহ নদীতে ভাসিয়ে দেন।" দাহের পর সেখানে সমাধি নির্মাণ বৌদ্ধদের প্রথা। কুশীনগরে

বুদ্ধদেব পরিনির্বাণ লাভ করার পর দেহটি সাতদিন ধবে একটি সোনার পাত্রে বাখা হয়েছিল দর্শনার্থীদের জন্য, অবশেষে সেখানেই দাহ অন্তে সাতটি স্তুপ করা হয়। কৌটিল্য তাঁব 'অর্থশাস্ত্রে' *কন্টক শোধন* নামক চতুর্থ অধিকরণে বলেছেন — কাম, ক্রোধ বশত: গলায় দড়ি দিয়ে, বিষপান করে যদি কেউ আত্মহত্যা করে। কিংবা নারীর কারণে আত্মহত্যা করে তবে তার দেহ চণ্ডাল দিয়ে বেঁধে রাজপথ দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে হবে। তার দাহ হবে না, জ্ঞাতিক্রিয়াও হবে না।

খ্রিস্টান ও মুসলমানেরা মৃতদেহ কবরস্থ করেন। নাথযোগী, বৈষ্ণবেরা সমাধি দেন। বৈরাগীরা হাঁটু মুড়ে ভ্রূণ ভঙ্গিতে মৃৎ সমাধি দেন। মৃতেব মস্তকে থাকে এক মালসা লবণ। হিন্দুরা দাহ করেন। এই দাহের নানান বৈশিষ্ট্য আছে, সংস্কার আছে। সে কথায় পরে আসছি।

হিন্দুরা আগে কবরই দিতেন। এখনও আদিবাসী মানুষেরা তাই করেন। ঋগ্বেদে দেখতে পাই মৃত্যুর পর মৃত এই পৃথিবীকে জননী ভেবে আশ্রয় নেবে, এবং জননী পৃথিবীব কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে মৃতকে তিনি যেন সন্তানের ন্যায় রক্ষা করেন ঃ

উপসর্গ মাতরং ভূমিমেতা
মুরুব্যচসং পৃথিবীং সুশেবাং।
* * *
উচ্ছুংচস্ব পৃথিবী সা নি বাধথা:
সূপায়নাস্মৈ ভব সূপবংচনা।
মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং
ভূম ঊর্ণুহি।। —১০/১৮/১০-১১

"হে মৃত! এই জননী স্বরূপা বিস্তীর্ণ পৃথিবীর নিকট গমন কর, ইনি সর্বব্যাপিনী, ইঁহার আকৃতি সুন্দর। হে পৃথিবী! তুমি এই মৃতকে উন্নত করিয়া রাখ, ইঁহাকে পীড়া দিওনা। ইঁহাকে উত্তম উত্তম সামগ্রী, উত্তম উত্তম প্রলোভন দাও। যেরূপ মাতা আপন অঞ্চলের দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদন করেন, তদ্রুপ তুমি ইহাকে আচ্ছাদন কর।" (শশীভূষণ দাশগুপ্ত)

এবার *দাহ* সম্পর্কে কিছু বলা যাক। হিন্দুদের দাহে আম ও চন্দন কাঠ সিদ্ধ। চন্দন গন্ধ নাশক। আর আম গাছকে বলা হয় *রসালো*। শবকে এই রসালো কাঠের উপর শায়িত করে বলা হচ্ছে-তুমি রসময় হয়ে থাকো। এই রস আবার আনন্দময় রস—বা আনন্দরস বা ঈশ্বর। শবকে সাধারণতঃ দক্ষিণ শিয়রি বা উত্তর শিয়রি করে শোয়ানো হয়। মুসলিমরাও হিন্দুদের মত শবের মাথা উত্তর দিকে রাখেন। শবের মুখকে পশ্চিম দিকে কাৎ করে দেন। পশ্চিমে পবিত্র তীর্থস্থান আছে বলে। বিবেকানন্দ বলেছিলেন—মানুষ যে ভাবে মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ট হয়, অর্থাৎ তার মাথায় চুল থাকে না, মুখে দাঁত থাকে না, কথা থাকে না, ভূমি আশ্রয় করে থাকে বৃদ্ধাবস্থায় ঠিক একই ভাবে মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

আর একটি মজার বিষয় এই যে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হবার সময় নারী চিৎ হয়ে আর পুরুষ উপুড় হয়ে বেরিয়ে আসে। চিতায়, শেষ শয্যায় ঠিক সেইভাবেই শোয়ানো হয়। নারীকে চিৎ করে আর পুরুষকে উপুড় করে। হিন্দুরা কবরস্থ করার রীতি থেকে সরে

দাহে কেন এলেন? এর মধ্যে আত্মার বিষয়টি জড়িয়ে আছে বোধহয়। হিন্দুরা ভেবেছেন প্রাণ ত্যাগের পর আত্মা দেহের মায়ায় সহজে তাকে ছেড়ে যেতে পারে না। তার আশপাশে খুব অসহায় ভাবে ঘুরে বেড়ায়। দেহকে দাহ করে নিশ্চিহ্ন করলে, সে দ্রুত দেহের মায়া ছেড়ে পরলোকে পৌঁছোবে। আর অগ্নির একমাত্র সেই স্থানে পৌঁছোনোর ক্ষমতা আছে। তাছাড়া অগ্নিতে দাহ হলে দেহের পঞ্চভূত যথা—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ইত্যাদি মহাভূতে মিশে যেতে পারে।

আলবিরুণী বলেছিলেন—হিন্দুরা যেখানে দাহ করতো সেখানে নাকি সমাধি মন্দির গড়ে দিতেন। অবশ্য এতে বৌদ্ধ প্রভাব থাকতে পারে।

একটি রচনায় দেখতে পাচ্ছি যে হিন্দু শাস্ত্র মতে সূর্যোদয়ের কালে শবের মুখাগ্নি করলে দোষ প্রাপ্ত হয় ও পরজন্মে মনুষ্যতর যোনি প্রাপ্ত হয়। বোধহয় হিন্দুরা সূর্যোদয়কে জীবনের প্রতীক ভাবত বলেই এসময় মৃতের সৎকারে তাদের সায় ছিল না। চুল্লিতে দাহও শাস্ত্র বিরুদ্ধ ছিল।

হিন্দুদের মৃতদেহ বহনের চালন বা চালি বা তারামাচা বাঁশ দিয়েই তৈরি করা হত। বেদে তাই বাঁশকে পবিত্র বলা হয়েছে, প্রণামও জানানো হয়েছে। এখন তো সস্তা খাটিয়ার যুগ। আগে মৃতের সঙ্গে চাল দেওয়া হতো, কড়িও। চাউল—খাদ্য—প্রাণ এ ধারণা ছিল। সঙ্গে পঞ্চ কড়ি। মানুষের দেহে থাকে ১০টি প্রাণ। যথা- প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান। এই ৫টি প্রাণ দেহ থেকে বেরিয়ে গেলে মানুষকে মৃত বলে ধরা হয়। আর দাহের পর অবশিষ্ট—নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় ইত্যাদি বায়ুরূপে বেরিয়ে যায়। শেষ ৫টি প্রাণের প্রতীক ৫টি কড়ি। এখন চাউলের জায়গায় খই এসেছে। কড়ির জায়গায় পয়সা। এ দিয়ে নাকি কল্পিত বৈতবণী পার হওয়া যায়? আগে লোকে জমাতো তামার পয়সা। এখনকার ৫, ১০, ২০ পয়সাও নাকি অচল! শুনছি ঝাড়খণ্ডে ২৫ পয়সাও চলে না। ৫০ দিয়ে শুরু। মৃত্যুর আগে মরণযাত্রীকে একটি কৃষ্ণবর্ণ ধেনু দেওয়ার রীতি। পরেও দেওয়া চলে, এই দিয়ে নাকি বৈতরণী পেরিয়ে পরকালে যেতে পারে। এরও ভিন্ন তত্ত্ব আছে তা এখানে ব্যাখ্যা করলে স্থান সংকুলান হবে না। কাঞ্চন, তিল, কুশ, হিন্দুদের শ্রাদ্ধে অপরিহার্য। অতীতে মৃতের মুখ গহ্বরে সোনা দেওয়া হত? সোনা দীর্ঘস্থায়ী ধাতু। মৃতের অন্যতম সম্পদ। পরে তামা। শেষতক চোখের পাতায় এলো তুলসীপত্রের আচ্ছাদন। বিষ্ণুর ঘাম থেকে তিল এবং লোম থেকে কুশের জন্ম। সে সময় তিলের *বাজার ভাও* জানলে সুবিধে হত। নাকি সর্ষে তেলেব চাইতে তিলের তৈল ব্যবহারে আভিজাত্য বেশি ছিল? অবশ্য অনেকের কাছে সর্ষে তেল আমিষ বলেই চিহ্নিত।

হিন্দুদের মুখাগ্নির সময় দাহধিকারী পুরুষেব বেলায়—৪৯ জন এরা নারীর বেলায় ২৮ জন নির্দিষ্ট। দীর্ঘ ফর্দ দেওয়া অসম্ভব। মরণকালে বা শবযাত্রার সময় কেন হরি ধ্বনি? এ বিষয়ে শ্রীশ্রীগীতায় বলা আছে—

" অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মক্তা কলেবরম্।
য প্রয়াতি সমত্ত্বাবং যাতি নস্ত্যেএ সংশয়:।।

যং যং বাপি সম্রণ ভাবাং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমে বৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ।। (৮/৫, ৬)

ভাবার্থ : অন্তিম সময়ে যে আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করে সে আমার ভাব প্রাপ্ত হয়, এতে কোনো সংশয় নেই। যে বা যিনি যে ভাবে স্মরণে এনে দেহত্যাগ করেন—হে অর্জুন, সে মরণের পরে সেই ভাব পেয়ে থাকে।

শ্রীশ্রী গীতায় ভগবান অর্জুনকে বলেছেন—মৃতের জন্য শোক করা উচিত নয়। আর শাস্ত্রকারেরা বলেছেন ক্রিয়া করো। ক্রিয়া বলতে শবদাহান্তে, অশৌচ পালনান্তে শ্রাদ্ধক্রিয়া। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের দুটি সূক্তে পিতৃলোকের* কথা বলা হয়েছে। অঙ্গিরা, অথর্ব, ভৃগু নামক পূর্ব পুরুষদের কথা আছে। একটি সূক্তের উল্লেখ :

"অগ্নি সাত্তা: পিতর এহ গচ্ছত সদ: সদ: সদত সুপ্রণীচ্যঃ।
অত্তা হবীংষি প্রযতানি বর্হিষ্যথা রয়িং সর্ব্ববীরং দধাতন।।" (১০/১৫/১১)

অর্থাৎ "অগ্নি স্বাত্ত পিতৃগণ, তোমরা উত্তম গতি পেয়েছো। এখানে এসে আলাদা আসন নাও। এখানে কুলোর উপর হোমের দ্রব্য রাখা আছে। এগুলো গ্রহণ করে ধন ও পুত্র পৌত্রাদি দান করো।"

যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায় শ্রাদ্ধ সম্পর্কে অনেক কথা আছে। সামবেদের বহু মন্ত্র, কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র থেকেও শ্রাদ্ধ বিধান গৃহীত। মোট ১২টি শ্রাদ্ধ। যথা : নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বৃদ্ধি, সপিণ্ডন, পার্বণ, গোষ্ঠী, শুদ্ধ্যর্থ, কর্মাঙ্গ, দৈবিক, তীর্থযাত্রা, ও পুষ্টি শ্রাদ্ধ। অশৌচান্ত শ্রাদ্ধ হলো : অন্নজল, ষোড়শ, বৃষোৎসর্গ, দানসাগর, চন্দন ধেনু ইত্যাদি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ১. বৃষোৎসর্গ—একটি বৃষ বা ষাঁড়কে এই শ্রাদ্ধে উৎসর্গ করার রীতি মতান্তরে বাছুরও। ২. দান সাগর—এতে হাতি দান করার বিধান আছে। ৩. চন্দন ধেনু—সধবার মৃত্যুতে এই শ্রাদ্ধ করা হয়। এখানে সবৎসা ধেনু দান করার বিধান আছে। বিবিধ শ্রাদ্ধের দান ব্রাহ্মণই গ্রহণ করে থাকেন। পাঠক নিশ্চয় জানেন *গয়া শ্রাদ্ধ পদ্ধতি* সহ হিন্দু শ্রাদ্ধের সমুদয় চালু বিধান চৈতন্য সমকালীন রঘুনন্দন বন্দ্যো. কৃত।

এবার একটু ঐতিহাসিকগণের কথা। প্রাক আর্য যুগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া বলতে সিন্ধুসভ্যতার কথা। সুকুমারী ভট্টাচার্য লিখেছেন—"এদের মধ্যে মৃতদেহের দাহ ও সমাধি দুয়েরই প্রমাণ মেলে। সমাজটি মনে হয় শ্রেণী বিভক্ত ছিল এবং হয়তো দু-শ্রেণীর জন্যে দুরকম অন্ত্যেষ্টি হতো।" (প্রাচীন ভারত) আর ইরফান হাবিব বলেন—"সিন্ধুনগর বাসীরা সাধারণত মৃতদেহ সমাধিস্থ করতো, কোথাও শ্মশান ছিল এমন কোনো প্রমাণ আদৌ পাওয়া যায়নি।" তিনি আরো লেখেন—"শবদেহগুলি চিৎ করে উত্তর-দক্ষিণ মুখে, সর্বদা মাথাটি উত্তরদিকে রেখে শোয়ানো হতো। কিছু কবরস্থানে কাদা মাটির প্রলেপ দেওয়া প্রাচীর ছিল; সামান্য কয়েকটি দেহ কফিনে সমাধিস্থ করা হয়েছিল।" আর

---

* 'পিতৃলোক' বলতে বোঝায় যেখানে বিদেহী আত্মা স্বর্গীয় জীবন ও অপার্থিব সুখভোগ করতে সক্ষম হয়। এর অধিকর্তা যম।

একজন ইতিহাসকার লেখেন—"এক শ্রেণীর কবরে দেখা যায় যে মৃতদেহের সঙ্গে মৃত ব্যক্তির আসবাবপত্র, অলঙ্কারাদি সমাহিত করা হত। এদের *পূর্ণ কবর* বলা হয়। কয়েকটি *আংশিক কবরের* নিদর্শনও পাওয়া যায় সেগুলিতে মৃতদেহ পূর্বে দাহ করে পরে ভস্মাবশেষ সেগুলিতে রক্ষিত হত।" (সুনীল চট্টোপাধ্যায়)

বেদের যুগে "মৃতের অন্ত্যেষ্টি ছিল শবদাহ, কোথাও কোথাও সমাধিও চালু ছিল। শ্রাদ্ধের কথা সংহিতা সাহিত্যে নেই, যদিও হয়তো তেমন কোনো অনুষ্ঠান ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকের পরে সাহিত্যে শ্রাদ্ধ দেখা দেয় এবং দু-তিনশ বছরের মধ্যে বেশ প্রাধান্য পায়। যারা মারা গেছে সেই পিতৃ পুরুষদের বলা হতো 'পিতর:', এদের জন্য কিছু অনুষ্ঠান হতো।" (সুকুমারী ভট্টাচার্য—ঐ) আবার রামশরণ শর্মা জানাচ্ছেন—"অশ্বের ব্যবহারের মতোই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পদ্ধতিও বিকাশ লাভ করেছিল আর্য সংস্কৃতির স্পর্শে। এই পদ্ধতির প্রচলনের সমর্থন মেলে বৈদিক, আবেস্তা এবং হোমারীয় সাহিত্যে। .... হরপ্পার মানুষজন মাটিতে কবর দিতেন, কিন্তু এই প্রথা পরবর্তী পর্যায়ে আমূল পরিবর্তিত হয়। এজন্য 'সমাধিক্ষেত্রে---এ পাত্রাধারের মধ্যে রেখে সমাধি দেখা যায়; কোনও কোনও ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতির ফলে পাত্রের মধ্যে জমিয়ে রাখা পোড়া হাড়ও লক্ষ্য করা গেছে। .... হুইলার মনে করেন সমাধিক্ষেত্র *এইচ* হলো বহিরাগত এবং অতি অবশ্যই হরপ্পা পরবর্তী যুগের এবং এটি এক নতুন মানব গোষ্ঠীর আগমনের প্রতীক বলে ধরা হয়। ... অন্ত্যেষ্টি বা দাহ করার প্রথা প্রাচীন, প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম সহস্রাব্দের।" তিনি জানান আমাদের দেশে নাকি খ্রিষ্ট পূর্ব ১৫০০ অব্দে এই দাহ প্রথা চালু হয়। অবশ্য আরো অনুমান হরপ্পা সভ্যতার শেষ পর্বে বহিরাগতদের প্রভাবে সেখানে দাহ শুরু হয়। হিউয়েন সাং (৬২৯-৪৪ খ্রি.) এর বিবরণে জানান, শবদেহ দাহ করা হত, না হলে নদীর স্রোতে ফেলে দেওয়া হত। কখনো জঙ্গ লে পরিত্যক্ত হত। বৃদ্ধ বয়সে অনেকেই গঙ্গা ডুবে প্রাণ ত্যাগ করতেন। শবের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াকে অশুচিস্বনে কবা হত। কবিকঙ্কন চণ্ডীর যুগে পিতৃ বিয়োগে ১ বছর অশৌচ পালন করে শেযে সপিণ্ডন শ্রাদ্ধ করা হত।

সপ্তদশ শতকের ভারতবর্ষের মৃত্যু পরবর্তী লোকাচার সম্পর্কে দু'চারটে কথা বলা যাক—গোবর নিকোনো মেঝের উপর কুশ বিছিয়ে উত্তর শিয়রি করে মৃতদেহকে শোয়ানো হত। মুখে গঙ্গা জল, বুকে তুলসী পাতা, কপালে চিহ্ন আঁকা হত। বামুনকে গোদান করার পর শব চিতায় চড়ানো হত। ব্রাহ্মণেব শব জলে ভাসিয়ে দেওয়া হত, ক্ষত্রিয়ের শব পোড়ানো হত এবং শূদ্রের শব কবরে দেওয়া হত। এরপর হিন্দুব শবদেহ পোড়ানো রীতি সর্বত্র চালু হয়। কোনো ব্যক্তি স্বজন বান্ধবহীন অবস্থায় প্রবাসে মারা গেলে স্বদেশে তার স্মরণে—চিতা জ্বালিয়ে তাঁর প্রতীক হিসেবে—একটি মৃগচর্ম, একটি বাঁশ, কিছু ময়দা ও পাতা ফেলে দেওয়া হত। কোনো মৃতদেহ পাওয়া না গেলে কুশ দ্বাবা তার প্রতীক মূর্তি নির্মাণ করা হত।* কোনো ব্যাক্তি নিরুদ্দেশ হলে দ্বাদশবর্ষ পরে তার পারলৌকিক ক্রিয়া করা শাস্ত্রমতে বিধেয।

*এতে পরে ৩৬০টি পলাশ পত্র যোগ করা হয়। এ দেহকে বলে 'পর্ণনরদেহ'।

রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজকীয় ব্যক্তির মৃত্যুতে সারা দেশে তিন দিনের শোক পালন করা হত। সুলতানের উত্তরাধিকারী শোকসূচক নীল রঙের পোষাক পরে, রাজছত্র অর্ধনমিত করে শবানুগমন করত। সুলতানের আত্মার কামনায় দান ধ্যান ছাড়াও বেতনভুক কোরাণ পাঠক নিযুক্ত করা হত। তাঁর সমাধিস্থলে, রক্ষিদল, হাতি ঘোড়া নিয়ে জীবিতকালের মত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা হত। এমনকি সুলতানের পাদুকা জোড়াও শ্রদ্ধা পেত। শোনা যায়— সুলতান বলবনের মৃত্যুর পর সমস্ত খান ও মালিকরা ছিন্ন বস্ত্র পরে মাথায় ধুলো মেখে শবানুগমন করেছিলেন। কোতোয়াল ফকরুদ্দিন ৬ মাস মাটিতে ও অন্যরা ৪০ দিন শুয়েছিলেন। সুলতানের তালিকা রক্ষক ইমাদউলমূলক মারা যাওয়ার পর হিন্দু ধনীরা মস্তক মুন্ডন করে তার শোকানুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। "মুসলিমরা যে মরণান্তিক অনুষ্ঠান পালন করত তার মধ্যে সীয়ুম অর্থাৎ 'তৃতীয় দিনে' পালনীয় আচারের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। সেই দিন লোকান্তরিত ব্যক্তির শান্তি কামনায় অসংখ্য আত্মীয় বন্ধু মিলে কোরান পাঠ চালাত। অনুষ্ঠানের শেষে সাধারণ ভোজ উৎসবের মতই উপস্থিত আত্মীয় ও অভ্যাগতদের গায়ে গোলাপ জল ছিটানো হত এবং পান শরবত দিয়ে তাঁদের আপ্যায়িত করা হত।" (কে.এম.আশারফ) আর একালে—'ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান মৃত্যুর সংবাদ শোনামাত্র উচ্চারণ করবেন 'ইন্না লিল্লাহে অ ইন্না এলাইহে রাজেউন' অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমরা সকলে আল্লাহরই জন্য। এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব। .... গোরস্থানে গিয়েও মুসলমান দোয়া পড়েন। বলেন—"আচ্ছালামো আলায়কুম ..... বিল আছরে' অর্থাৎ কবরবাসীগণ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। আল্লাহ্ তোমাদের ও আমাদের ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের অগ্রগামী, আমরা তোমাদের পশ্চাৎগামী। মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য মুসলমান সমাজে রুকুসেহদা ও তকবিরের নামাজ বা জানাহা নামাজ পাঠের ব্যবস্থা আছে। এমাম ও মোক্তাদিগণ সালাম উচ্চারণ করেন। ... শবের কপালে বা কাফনে কিছু খোদাই করা যাবে না। কিন্তু 'বিসমিল্লাহে ওয়া আয়া ঝিল্লাতে ওয়া আয়া ঝিল্লাতে বাহুলিল্লাহে' ধ্বনি যুক্ত দোয়া পাঠ করা যায়। মৃতের শান্তির জন্য কবর জেয়ারত করতে দোষ নেই। তবে জুম্মাবারে, শবেবরাত রাত্রে, ঈদল ফেতরের দিনে, ঈদুজ্জোহার দিনে কবর জিয়ারত করা পুণ্যের।" (শংকর সেনগুপ্ত/বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি)

হিন্দুদের শ্রাদ্ধ শান্তির যাবতীয় গ্রন্থের সংকলক, রচয়িতা, আধুনিক রূপকার হলেন বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র শ্রীচৈতন্যের সতীর্থ রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পিতার নাম হরিহর। তিনি ২৮ খানি স্মৃতিতত্ত্বের বই লেখেন। যথা—মলমাস, দায়ভাগ, সংস্কার, শুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত, উদ্বাহ (বিবাহ), তিথি, জন্মাষ্টমী, দুর্গোৎসব, ব্যবহার, একাদশী, জলাশয়োৎসর্গ, ছন্দোগ-বৃষোৎসর্গ, যজু-বৃষোৎসর্গ, ঋক-বৃষোৎসর্গ, ব্রত, দেব প্রতিষ্ঠা, দিব্য, জ্যোতিষ বাস্তুযাগ, দীক্ষা, আহ্নিক, কৃত্য, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র, সাম-শ্রাদ্ধ, যজু :-শ্রাদ্ধ ও শূদ্র কৃত্য। জীমূত বাহনের *দায়ভাগের* টীকাও তাঁর লেখা। পরে লেখেন—তীর্থতত্ত্ব, দ্বাদশযাত্রা-তত্ত্ব, গয়াশ্রাদ্ধ পদ্ধতি, এবং রাসযাত্রা পদ্ধতি।

এই রঘুনন্দনের ফরমানেই হিন্দুধর্মে বর্ণ বিভাজনগত সংস্কার কুৎসিত রূপ ধারণ করে। তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের উপর যতটা সদয় ছিলেন, শূদ্রের উপর ছিলেন ততটা নির্দয়। ব্রাহ্মণদের নানাবিধ দোষ লাঘবের জন্য শাস্ত্র দ্বারা পথ সুগম করেন। পূর্বে, বাংলার ব্রাহ্মণদের সিদ্ধ চাউল, মুসুরির ডাল ও মৎস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল। তিনি বিধান দিলেন এতে দোষের কিছু

নেই। আগে বিধবারা একাদশীতে ফল, দুগ্ধ খেতেন। রঘুনন্দন নির্জলা উপবাসের বিধান দিলেন। বালিকা, বৃদ্ধা কারও ছাড় নেই। রঘুনন্দন মনুর ফরমান বহাল রাখলেন। ব্রাহ্মণের মৃতাশৌচ পালনীয় ১০ দিন, ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন, বৈশ্যের ১৫ দিন ও শূদ্রের ৩০ দিন। কেন তার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই। ব্রাহ্মণকে বলা হলো মহাশ্রাদ্ধী। তিনি যাবতীয় দান গ্রহণের অধিকারী। তাকে ছাড়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অসম্ভব।

অদ্ভুত এই হিন্দু সমাজ! অশ্বঘোষের বজ্রসূচী মোতাবেক জানা যায় ব্রাহ্মণের বেওয়ারিশ লাশ শূদ্রও সৎকার করতে পারে। তাতে ব্রাহ্মণের স্বর্গে যাওয়া অটকাবে না। অথচ শূদ্রের বেলায় যত ঝামেলা। শূদ্রের মৃতদেহ ছুঁলেই জাত যাবে আর ব্রাহ্মণের শব-মরা হাতি লাখ টাকা! তাইতো দেখি আজো, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় মৃত নাচনীর পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে যেতে। অবশ্য একবারই পণ্ডিত ঘাসীরামের ঘরের সামনে উপোষী দুখী চামার কাঠ কাটতে গিয়ে মারা গেলে এবং অন্য চামাররা মৃতদেহ সরাতে অস্বীকৃত হলে পানীয় জলের পথ আগলে পড়ে থাকা মৃতদেহটি পণ্ডিত ঘাঁসিরাম স্বয়ং সদ্গতি করেন এভাবে—"পণ্ডিতজী একটা দড়ি বার করলেন। তাতে একটা ফাঁস বানিয়ে লোকটার পায়ে লাগিয়ে খুব শক্ত করে বাঁধলেন। চারপাশ তখনো ফর্সা হয়নি। পণ্ডিতজী দড়ি ধরে টানতে টানতে লাশটাকে একেবারে গাঁয়ের সীমানায় নিয়ে এলেন। ওখান থেকে ফিরে স্নান সারলেন। চণ্ডীপাঠ করে বাড়ির চারপাশে গঙ্গাজল ছেটালেন।" (সদ্‌গতি/প্রেমচন্দ)

পরিশেষে প্রশ্ন, দাহ কি অ-ভারতীয় ব্যবস্থা? ভারতে কী প্রথমে কবর প্রথা ছিল? নাকি কবর ও দাহ দুইই ছিল গ্রীসের মত? রামশরণ শর্মা তো বলেছেন দাহ-এর মধ্যে দিয়ে অন্ত্যেষ্টির উদাহরণ পাওয়া যায় খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ ৫০০০-৪০০০ এর মধ্যে হল্যান্ড, জার্মানি, পূর্ব ইউরোপ, ইরাক ও মধ্য রাশিয়ার কাজাকাস্তানে। বর্তমানে সমস্যা হয়েছে গুরুতর। সমাধিস্থ বা কবরস্থ করার মতো ভূমির সংকুলান হচ্ছেনা। মাত্র *সাড়ে তিন হাত ভূমিও* প্রায় *নেই* বললেই চলে। তাছাড়া সমাধির চেয়ে দাহ অনেক বিজ্ঞান সম্মত। ঠিক মত কবরস্থ করা না হলে, সংক্রামক রোগে মৃতেব দেহ শেযাল কুকুরে কবর খুঁড়ে বার করে দূষণ ঘটাতে পারে। তাছাড়া সমাধিস্থ করার খরচ অনেক। তাই *আলোলিকা মুখোপাধ্যায়* জানাচ্ছেন খোদ আমেরিকায় কবরের বদলে দাহ বাড়ছে। তাঁর কথায়—"এতকাল তো সাহেবদের মরে ছাই হবার রেওয়াজ ছিল না। কবর মানেই শেষ শয্যা। কিন্তু আমেরিকায় ক্রমশ ক্রিমেটোরিয়ামের সংখ্যা বাড়ছে। ধর্ম নির্বিশেযে নানা জাতের মানুষ দাহ প্রথাকে সমর্থন করছে। দশ বছর আগে এদেশে মাত্র শতকরা ১০ ভাগ মৃতদেহ দাহ করা হত। আর এখন সারা বছরে যত লোক মারা যায় তার শতকরা ২৭ ভাগ মৃতদেহ ক্রিমেটোরিয়ামে দেওয়া হয়। এদেশে আবার 'ক্রিমেশন অ্যাসোসিয়ান অফ নর্থ আমেরিকা' নামে শ্মশান সংগঠন আছে। তারা আশা করছে কুড়ি বছরের মধ্যে শতকরা ৪৮ ভাগ মৃত দেহ কবরের বদলে চিতায় চলে যাবে।"(সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৪ এপ্রিল ২০০৪)

এর পেছনেও আছে আর্থ-সামাজিক কারণ। তা সত্ত্বেও বলা যায়, দাহ সম্পর্কে আমেরিকা বাসীর আগ্রহ ক্রমশ: বাড়ছে।

এখন আমাদের দেশেও কতকগুলি প্রশ্ন উঠতে শুরু কবেছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণগত-

বিভেদ-বৈষম্য থাকবে কিনা। জাতি কৌলিন্যকে হারিয়ে আজ বিজয়ীর আসনে অর্থকৌলিন্য। তবুও তো এক শ্রেণীর গোঁড়া, ধর্মান্ধ, জাতি অন্ধ মানুষ আছেন যারা "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্মাবিভাগশ:" শ্লোকের চুষি কাঠি মুখে পুরে জাতের নামে বজ্জাতি করে চলেছেন? সংস্কার ও শাস্ত্রের নামে চাপানো এইসব কলা কৌশলের অসারতা উপলব্ধি করে 'প্রয়াত আচার্য ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সকল বর্ণেরেই জননে ও মরণে সপিণ্ডদিগের ১০ দিন অশৌচ গ্রহণের বিধান ঘোষণা করেন।' তিনি স্মৃতি পুরাণ ঘেঁটে দেখান যে সর্বত্র সর্বজনের ১০ দিনে শুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। কেননা (১) যুগভেদে অশৌচ সমাজের গতি অনুসারে ঋষি বাক্যানুযায়ী পরিবর্তনশীল. (২) অঙ্গিরা শাতাতপ, দেবল, জাবাল, বৃহস্পতি প্রমুখ ১০ দিনের অশৌচ পালনের বিধান দিয়েছে। (৩) যাজ্ঞবাল্ক্য সংহিতার মিতাক্ষারা টীকায় উদ্ধৃত অঙ্গিরা বচনে ১০ দিনের কথা বলা হয়েছে। (৪) মনু সংহিতার ৫ম অধ্যায়ে লিখিত মনু বচনে বলা হয়েছে—"দশাহং শাবমাশৌচং সপিণ্ডেষু বিধীয়তে।" *(৫) শুদ্ধিতত্ত্বে রঘুনন্দন ধৃত জাবাল বচনে বলা হয়েছে জন্ম ও মৃত্যুতে সপিণ্ডদিগের দশাহ অশৌচ হবে। (৬) রঘুনন্দন ধৃত বৃহস্পতির বচনে বলা হয়েছে জননে ও মরণে ১০ দিন পর সপিণ্ডগণ মুক্তিলাভ করে। (৭) প্রত্যেক বর্ণের মরণে ১০টি পূরকপিণ্ড দেবার বিধান।

বিঃদ্রঃ - মনুস্মৃতির প্রাধান্য স্বীকার করি ও ব্রাহ্মণতর সমস্তবর্ণের একমাস অশৌচ পালনে নানা ভাবে অসমর্থ্য হইলে তাহাদের পক্ষে ১০ দিনে মাত্র অশৌচগ্রহণেই যথাযথ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা, কারণ কলিকালে ক্ষত্রিয় বৈশ্য না থাকায় ১২ দিন বা ১৫ দিন শাস্ত্র সম্মত নহে।"

(গুপ্ত প্রেস ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা, ১৪১১)

পুনশ্চ ঃ
কেউ মালা কেউ তছবি গলায়,
তাইতে যে জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কার রে।।" (লালন ফকির)

পরিশেষে কতগুলো কথা মনে আসছে। আমরা অনেকে হয়তো আত্মা বা পরকালে বিশ্বাসী নই অথচ আত্মাবাদীদের নিরন্তর প্রচার মনের মধ্যে একপ্রকার দৃঢ় সংস্কারের জন্ম দিয়েছে। তাই কারো স্মৃতির উদ্দেশ্যে, শ্রদ্ধা নিবেদনের ভাষা এমন হয়েছে : 'আত্মার শান্তির কামনায় ১ মিনিট নীরবতা পালন। অথবা ' 'স্বর্গীয়' লেখার অভ্যাস আছে। মরণের পর সবাই স্বর্গে যাবেন একথা আত্মাবাদীরা বিশ্বাস করেন না। কিংবা 'সজ্ঞানে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।' সজ্ঞানে বোধহয় স্বর্গে যাওয়া সম্ভব নয়। গঙ্গা প্রাপ্তিও আজ অচল। আত্মার চিরশান্তি কামনা-ও বোধ হয় অমূলক। কেননা শ্রীশ্রীগীতায় আত্মার বৈশিষ্ট সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাতে বোঝা যায় আত্মা এসবের তোয়াক্কা করে না। তাই প্রচলিত শ্রাদ্ধাদ্ধির অনুষ্ঠানপত্র বা স্মৃতিরক্ষার সভায়—অর্থবহ এমন শব্দ ব্যবহার উচিত যা আমাদের কাছে যথাযোগ্য হয়। দুটো সংখ্যা মিলিয়ে প্রায় ১১০০ পৃষ্ঠার, জানিনা কতটা কী হলো। পাঠকের মতামত শিরোধার্য।

* প্রিয় পাঠক পাঠিকা,
আমরা একই বিষয়ে চর্বিতচর্বণ লেখা ছাপতে চাই না। ফলে বিষয় বৈচিত্র আনাব জন্য মৃত্যুব নানান দিক তুলে ধরেছি। শ্মশান, গোরস্থান, সমাধি একটা মধ্যবর্তী পর্যায়। মুমূর্ষু, মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে যে আচার সংস্কার শুরু অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় তা শেষ হয়ে যায় না। কেননা পবলোক, আত্মা, স্বর্গ, নরক, প্রেতলোক রয়েছে। রয়েছে বার্ষিক শ্রাদ্ধ, তর্পণ, আকাশ প্রদীপ এমন নানা অনুষ্ঠান ফলে সে সব বিষয়েও অলোকপাত করা হয়েছে।

* আমরা বহুজনেব সহায়তা পেয়েছি। সবার কাছেই কৃতজ্ঞ। তবে আলাদা ভাবে কতগুলি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির নাম না করলেই নয়। যেমন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয় পাঠাগার, কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন ল ব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র, কয়েকজন সাংবাদিক এবং শিল্পীও আছেন। ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, (আনন্দবাজার), দেবাশিষ চক্রবর্তী, (গণশক্তি), দেবাশিষ মুখোপাধ্যায় (আজকাল), লীনা চাকী (সংবাদ প্রতিদিন), পার্থ ঘোষ (সাপ্তাহিক বর্তমান), শিল্পী সোমনাথ ঘোষ, রমাপ্রদাস দত্ত, ফটোগ্রাফার অভিজিৎ রায়, কালিকানন্দ মণ্ডল, আবো অনেকে।

* সম্মানীয় লেখকবৃন্দ
বিনয়ের সঙ্গে জানাচ্ছি আপনারাই আমাদের সম্পদ। তবে দিন দিন পাঠকের প্রত্যাশা বেড়ে যাওয়ায়, আমরাও লেখার মান নিয়ে ভাবিত। একটি বিষয়ে একাধিক সংখ্যা করার অনেক অসুবিধে। এবার থেকে তাই একটিই সংখ্যা হবে। এবারও অনেক লেখা স্থানাভাবে ও মান অভাবে ছাপা গেল না। লেখার পবিধিও একটা সমস্যা। অহেতুক বিস্তৃতি কাম্য নয়। সম্পাদব

* প্রশ্ন উঠতে পারে একই মনুর একাধিক ফরমান কেন? বক্ষণশীল ও প্রগতিশীল উভয় বিধান তাঁর স্ববিরোধিতা প্রকটিত করে নাকি? আসলে এযাবৎ ১১ জন মনুর খোঁজ পাওয়া গেছে। ফলে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রগতিশীল হতেই পারেন।

* প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব।

ইন্দো-ইউরোপীয়গণের আদ্যিকালের কথা

হেমন্তকুমার সরকার

১. ধর্মবিশ্বাস

প্রাচীন ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাসমূহে যে-সমস্ত দেবতাবাচক শব্দ পাওয়া যায় তাহাদিগকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। গ্রীক, লিথুয়েনীয় ও প্রাচীন শ্লাভ ভাষায় এই দেবতাবাচক শব্দের অর্থ প্রথমে 'বাতাস' (breath) এবং পরে 'আত্মা' (Soul) ছিল। প্রাচীন ভারতীয় লাতিন এবং আইরিস প্রভৃতি ভাষাতে এই জাতীয় শব্দের মূল অর্থ 'অন্তরীক্ষ' সম্বন্ধীয় heavenly) ছিল। অবশ্য গ্রীক এবং লিথুয়েনীয় ভাষাতেও অনুরূপ অর্থযুক্ত শব্দও পাওয়া যায়। ভাষার সাক্ষ্য হইতে প্রমাণ হয় যে, দৃশ্যমান আকাশই দেবতারূপে পূজিত হইত, তাবপর যে-সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি আকাশে প্রকাশমান হইত, সেইগুলি দেবতারূপে পূজা পাইতে লাগিল—যেমন, চন্দ্র, সূর্য্য, উষা, বজ্র, বায়ু, ইত্যাদি। ইহারাই অন্তরীক্ষের দেবতা ছিল।

এই দুই শ্রেণীর শব্দ হইতে বুঝা যায় কিরূপে দুই প্রকার পূজার প্রচলন হইয়াছিল - (১) আত্মার অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পূজা, (২) অন্তরীক্ষের শক্তিসমূহের পূজা। অবশ্য অদৃষ্টের আরাধনাও ক্রমে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আমরা একে একে এই তিনটি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব।

মৃতের পূজা

ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির ইতিহাসের যতদূর পর্য্যন্ত সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাতে বুঝা যায় যে, মৃতব্যক্তিকে নানারূপ আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা পূজা করিত। ইহা হইতে আমরা তাহাদের মরণের পরবর্ত্তী জীবনের ধারণা সম্বন্ধে আশ্চর্য্যরকম আভাস পাই। এই বিষয়ে ভালরকম ধারণা করিতে গেলে আমাদিগকে নিম্নলিখিতভাবে অগ্রসর হইতে হইবে—

(১) বিভিন্ন ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির মধ্যে কিরূপে মৃতদেহ সৎকার করা হইত।

(২) সৎকারকালে মৃতের প্রতি কিরূপ যত্ন লওয়া হইত, বিশেষত কি কি উপহার সঙ্গে দেওয়া হইত।

(৩) সৎকারের পর তাহাদিগকে কিভাবে পূজা দেওয়া হইত।

(৪) পরলোক সম্বন্ধে তাহাদের কিরূপ ধারণা ছিল এবং সেই ধারণা ক্রমে ক্রমে কিভাবে পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

(১) সমাধিস্থ করা বা দাহ করা। ইন্দো-ইউরোপীয়গণের সকল দেশেই এই দুই রীতির মধ্যে জয়লাভের জন্য দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল। এই দুইয়ের কোন্‌টি প্রাচীন তাহা বিচার করা যাইবে।

প্রথমে, ভারতে কি ছিল, দেখা যাক। বেদের সময় আমরা দেখিতে পাই দাহকরণ একমাত্র নিয়মিত প্রথায় দাঁড়াইয়াছে। অনুষ্ঠানবিধির গ্রন্থসমূহে (ritual tents -গ্রন্থসূত্র) কেবল এই প্রথারই উল্লেখ আছে। কিন্তু দাহ না করিয়া সমাধিস্থ করার প্রমাণও ইহার সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে (১০.১৫.১৪) পূণ্যাত্মা স্বর্গস্থ পূর্বপুরুষগণকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে—যাঁহারা অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছেন এবং যাঁহারা হন নাই। অথর্ববেদেও (১৮.২ ৩৪) পিতৃপুরুষগণকে অগ্নির নিকট আনীত, দগ্ধ, এবং সমাহিত—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে।

ইরানীয় ভ্রাতৃগণেব আধুনিক উল্লেখ সমূহে প্রাচীনতর অবস্থার কথা পাওয়া যায়। হেরোডোটাস (Herodotus) মনে করেন যে, সিথীয় (Scythians) বাজগণের মধ্যে মৃতদেহ সমাধিস্থ কবাই একমাত্র রীতি ছিল। এই সিথীয়গণকে ইরানীয়দিগের এক পূর্ব -পরিত্যক্ত শাখা বলিয়া ধরা হয়। প্রাচীন পারসিক রাজগণের সমাধি হইতে দেখা যায় যে, তাঁহাদের দেহও দগ্ধ না করিয়া কবর দেওয়া হইত। হেরোডোটাস্ সব পারসীকগণ সম্বন্ধেই এই কথা বলিতেছেন এবং মোমের ভিতর মৃতদেহ সংরক্ষণের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। অবেস্তা হইতে জানা যায় যে, দাহপ্রথা জরথুশত্র-ধর্ম্মাবলম্বীদের বাহিরে প্রচলিত ছিল। জরথুশত্রের ধর্ম্মাবলম্বীগণ সমাধিস্থ করিবার পূর্বে পশুপক্ষী দ্বারা মৃতদেহ ভক্ষণ করাইতেন। পূর্বোক্ত দাহপ্রথা ও এই প্রথা—উভয়ই বাহির হইতে আমদানী হইয়াছিল।

শেষের প্রথাটি বেলুচিস্তানের অরাইটি (oreitae) নামক স্থানের পার্বত্য বন্যজাতি সমূহের মধ্য হইতেই উদ্‌ভূত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

ইউরোপীয় শাখার মধ্যেও আমরা দাহ ও সমাধিপ্রথা দেখিতে পাই। হোমারের সময় দাহপ্রথা প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সমাধিস্থ করাই প্রাচীনতর রীতি ছিল এবং আদি গ্রীসদেশে এই প্রথাই রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে।

রোমীয়গণের মধ্যেও ঠিক অনুরূপ অবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়। খননের দ্বারা যে-সমস্ত নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় প্রাচীন লাতিন দেশে সমাধির পর দাহপ্রথা প্রচলিত হয়।

অখৃষ্টান প্রুশীয় এবং লিথুয়েনীয়দিগের মধ্যেও উভয় প্রথাই পরিলক্ষিত হয়।

শ্লাভজাতির সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রাচীন প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে দাহপ্রথার সমর্থন হয়।

কেল্ট্ এবং টিউটনদিগের মধ্যে সমাধিস্থ করাই প্রাচীনতম পদ্ধতি ছিল, যদিও ইতিহাস হইতে কেবলমাত্র দাহপ্রথারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইন্দো-ইউরোপীয়গণের ইতিহাস হইতে যেটুকু প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে দাহপ্রথা অপেক্ষা সমাধিপ্রথা পুরাতন—এই কথাই খুব সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। ভাষার সাক্ষ্য হইতেও ইহা সমর্থিত হয।

যদি দাহপ্রথাই সমাধি প্রথার পূর্বে হইত, তাহা হইলে সৎকার সম্বন্ধীয় ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দগুলি আদি-অর্থ হইতে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যাইত; যেমন 'সৎকার করা' এই

কার্য্যটি বুঝাইতে যে ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইত, তাহার মূল অর্থ 'পোড়ানো' গোছের এইরূপ একটা কিছু হইত।

কিন্তু ব্যাপার মোটেই তাহা নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের শব্দার্থ আলোচনা করিলে প্রাচীন প্রুশীয়, লিথুয়েনীয়, গ্রীক, লাতিন; প্রাচীন শ্লাভ, প্রাচীন উচ্চ জার্মান প্রভৃতি ভাষাতে 'পুঁতিয়া ফেলা' এই অর্থসূচক ধাতুর ব্যবহারই পাওয়া যায়।

এই সকল প্রমাণ হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, ইন্দো-ইউরোপীয়গণ তাঁহাদের আদি দেশে এবং পরে যে-সকল দেশে বসতি করিয়া ছিলেন, সেখানে উপযুক্ত সমাধিস্থান প্রস্তুত করিয়া মৃতদেহ না পোড়াইয়া প্রোথিত করিতেন। ডাঃ শ্রাডার (Schrader) বলেন যে, এই প্রথার মূলে ছিল—মৃতদেহ সংরক্ষণের ইচ্ছা। শত্রু এবং বন্যজন্তুর হাত হইতে মৃতদেহকে রক্ষা করা ইহার উদ্দেশ্য হইতে পাবে এবং ইহার মূলে এই বিশ্বাস থাকিতে পারে যে, মৃতের আত্মা দেহের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং দেহের অস্তিত্বের সহিত ইহার সম্বন্ধ। কিম্বা ইহা হইতে পারে, যতদিন সম্ভব মৃতদেহ রক্ষা করিয়া মৃতব্যক্তির মঙ্গলসাধন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের জীবিত অন্যান্য সকলের মঙ্গল করা—কারণ তাহাদের ভূতের ভয় ছিল এবং সেজন্য মৃতের আত্মাকে সমাধির মধ্যে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রাখিতে চাহিত। কিম্বা এই সমস্ত কারণই একসঙ্গে বর্ত্তমান ছিল।

দাহপ্রথা কিন্তু সমাধিপ্রথার সম্পূর্ণ বিপবীত। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও দাহপ্রথা কিরূপে সমস্ত ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিল, এমন কি খৃষ্টধর্ম প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাশাপাশি বর্ত্তমান ছিল, ইহা বড় আশ্চর্য্যের কথা। সমাধিপ্রথার ভিতব মৃতদেহ সংরক্ষণের চেষ্টা বর্ত্তমান রহিয়াছে। আর দাহপ্রথাতে মৃতদেহ একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলা হয়। মৃত্যুর পরবর্ত্তী জীবন সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণরূপে না বদলাইলে এরূপ হওয়া সম্ভবপর নয়।

আরউইন রোড (Erwin Rhode) বলেন—দাহের দ্বারা দেহ হইতে আত্মাকে যথাশীঘ্র সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিবার চেষ্টা বর্ত্তমান ছিল। কারণ, যতদিন শরীর আছে, ততদিন আত্মা তাহাতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে; ইহাতে আত্মা নিজেও শান্তি পাইবে না, আবার অন্যান্য জীবিতগণকেও শান্তি দিবে না এবং নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে উৎপীড়িত করিবে।

আদিম সভ্যতার অবস্থায় দাহপ্রথার মূলে এই বিশ্বাস ছিল যে, শরীর পোড়ানোর পর আত্মার সম্মুখে পরলোকের স্বর্গদ্বার খোলা হয়। কিন্তু ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না যে, দাহপ্রথা প্রথমে ইন্দো-ইউরোপীয় কোনও জাতির মধ্য হইতে উদ্ভূত হয় এবং পরে তরঙ্গের মত বিভিন্ন দিকে প্রসার লাভ করে, কিম্বা ইহা ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির গণ্ডীর বাইরে জন্মলাভ করে। হয় তো ব্যাবিলনের আদিম সুমেরু জাতির মধ্যেই ইহার উৎপত্তি হইতে পারে; কারণ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সুরগুল ও এল হিব্বা (Surghul and El Hibba) নামক স্থানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দগ্ধ শবের অবশেষপূর্ণ বৃহৎ সমাধি স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে।

২. মৃত্যুর পরবর্ত্তী অনুষ্ঠান

মৃতদেহ প্রোথিত করাই হোক আর দাহ করাই হোক, ইহা সুনিশ্চয় যে অতি প্রাচীন কালেও সৎকারের সময় বহু অনুষ্ঠানের আয়োজন হইত। বিভিন্ন ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির অনুষ্ঠান পদ্ধতি তুলনা করিলেই এ বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা হইবে।

এ-স্থলে গ্রীক এবং লিথুয়েনীয় এই দুই বিশিষ্ট ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির কথা তুলনা করিব।

ক) মৃতদেহ শায়িত অবস্থায় রাখা--

কোন নিকটতম আত্মীয় হস্তের দ্বারা মৃতের চোখ এবং মুখ বন্ধ করিয়া দিলে, পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা মৃতদেহ ধৌত করিয়া প্রসাধন করিত। তৎপরে পরিস্কার বস্ত্রে আবৃত করিয়া মৃতদেহ গৃহমধ্যে শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখা হইত।

লিথুয়েনীয় শ্লাভেরা মৃতদেহ ধৌত করাকে ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া মনে করিত এবং ইহার সহিত প্রার্থনাদির অনুষ্ঠান করিত। আত্মীয়ের দ্বারা ধৌত না করাইয়া ইহারা অপরিচিত ব্যক্তিগণকে দিয়া ধৌত করাইত; হয় পুরুষের বেলায় পুরুষ, স্ত্রীলোকের বেলায় স্ত্রীলোক নিযুক্ত করা হইত, না হয় উভয়স্থলেই বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের দ্বারা অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করা হইত।

খ) মৃতের উদ্দেশে ক্রন্দন—

মৃতদেহকে এই অবস্থায় শোয়াইয়া রাখিবার উদ্দেশ্য যে ঐ সময় সকলে তাহার জন্য কাঁদিতে পারে। গ্রীক আইন-প্রণেতা সোলন (Solon) শুধু নিকটতম স্ত্রীলোক আত্মীয়দের এই বিলাপে যোগ দিবার বিধান করিয়াছেন। শোকের ভয়ঙ্কর উচ্ছ্বাস, গণ্ডস্থল নখের আঘাতে ক্ষত করা, বুকে ও মস্তকে আঘাত করা এবং কাঁদিয়া বাঁধিগৎ গাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। হোমর হইতে আমরা জানিতে পারি যে, স্বভাবসিদ্ধ বিলাপ ছাড়া, পেশাদার গায়কগণকে (Professional mourners) স্ত্রীলোকদিগের ক্রন্দনের সহিত যোগ দিয়া করুণ সুরে বিলাপগীতি গাহিবার জন্য নিযুক্ত করা হইত। এখনো নাকি পঞ্জাব ও গুজরাতের দিকে এইরূপ পেশাদার বিলাপকারীর নিয়োগ প্রচলিত আছে। ইউরোপের নানা জাতির মধ্যেও পেশাদার শোককারী ভাড়া করিতে পাওয়া যায়।

এই সকল প্রথা বর্ত্তমান কালের কিছু পূর্ব্বেও লিথুয়েনীয় শ্লাভদিগের দৈনিক অনুষ্ঠানের মধ্যে পরিলক্ষিত হইত। রুশ দেশে এই বিলাপের ভিতর মৃত ব্যক্তির সম্পূর্ণ জীবনকাহিনী বলা হইত এবং শোকার্ত্তগণ মৃতের দিকে ফিরিয়া এইরূপ ভাবে প্রশ্ন করিত যেন সে জীবিতই আছে। বিধবা স্ত্রী বহুবার স্বামীর কবরের উপর মূর্চ্ছা যাইত। অধিকাংশ স্থলেই ভান করিয়া এইরূপ করা হইত, কারণ তাহাতে গৌরব বাড়িত এবং লোকে প্রশংসা করিয়া বলিত সে কেমন শোক করিতে জানে।

এইসব শোকোচ্ছ্বাসের মাত্রা এতই হইত যে, স্ত্রীলোকেরা তাহাদের হাত এবং মুখ ছুরি দিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিত। রুশিয়া দেশে পেশাদার স্ত্রী বিলাপিনী অনেক আছে। ইহারা পয়সা পাইলেই কাঁদিয়া থাকে এবং নিজেদের দক্ষতা দ্বারা সময়ে সময়ে বিশেষ যশ অর্জন করে।

গ) অন্ত্যে ষ্টি যাত্রা—

মৃতদেহকে মাত্র একদিন শায়িত অবস্থায় রাখা হইত। তৃতীয় দিবসের প্রত্যুষে শয্যা সহ শবকে বাড়ীর বাহিরে লইয়া যাওয়া হইত। অন্ত্যেষ্টি-যাত্রার একখানি পুরাতন চিত্রে দেখা যায় যে, দেহকে একটি উচ্চ শবাধারে গাড়ীর উপর রাখিয়া দুইটি ঘোড়া জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। পাশে তরবারিধারী পুরুষগণ যাইতেছে এবং পশ্চাতে একদল স্ত্রীলোক কাঁদিতে কাঁদিতে মাথা চাপড়াইতে চাপড়াইতে যাইতেছে।

রুশিয়া দেশে মৃতদেহকে এমন কি গ্রীষ্মকালেও স্লেজে করিয়া গোরস্থানে লইয়া যাওয়া হয়। হাত দিয়া ধরিয়া শব লইয়া যাওয়া প্রথাসঙ্গত ছিল না। প্রায়ই মৃতের প্রিয় অশ্বকে গাড়ীতে জুড়িয়া দেওয়া হইত। কোন কোন স্থানে বলদ জোড়া মালগাড়ী ব্যবহৃত হইত। তৃতীয় দিবসে অথবা সাধারণতঃ দ্বিতীয় দিবসেই শবদেহ প্রোথিত করা হইত।

ভিনটেরনিট্‌জের (Winternitz) মতে সমাধিস্থান অথবা দাহভূমির চারিদিকে তিনবার ঘোরা প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এইরূপ প্রথা কিন্তু খাঁটি শ্লাভ জাতির মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

ঘ) শ্রাদ্ধের ভোজ—

মৃতদেহ সৎকার করিয়া পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ ধর্ম্মবিধি অনুসারে পবিত্র হন এবং তারপর মস্তকে মাল্য ধারণ করিয়া শ্রাদ্ধের ভোজে যোগ দেন। পরলোকগত আত্মার পূজানুষ্ঠানের (cult of the souls) ইহা একটি অঙ্গ ছিল। মৃতের আত্মা নিমন্ত্রণকর্ত্তারূপে উপস্থিত থাকিত বলিয়া বিশ্বাস করা হইত। এই অদৃশ্য ব্যক্তিব উপস্থিতির ভয়েই ভোজের সময় তাহার সম্বন্ধে শুধু প্রশংসাসূচক কথা বলার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল। মৃত ব্যক্তির গৃহে আত্মীয়গণ ভোজ পাইত।

মৃতের সহিত প্রদত্ত উপহার—

নব্য প্রস্তর যুগেই (Neolithic Age) মানব প্রথম মৃতদেহ সৎকারের প্রতি মনোযোগী হয়। মৃত ব্যক্তিকে মাংস, পানীয়, অস্ত্রশস্ত্র, আসবাবপত্র, অলঙ্কার, গৃহপালিত জন্তু, এমনকি চাকর-বাকর এবং স্ত্রী পর্যন্ত উপহার দেওয়া হইত।

শ্লাভ জাতীয় লোকেরা এখনও মৃত ব্যক্তির যাবতীয় প্রিয় বস্তু সমাধিস্থানে প্রোথিত করে। টিউটন জাতীয় লোকের মধ্যেও অনুরূপ প্রথা এখনও দেখা যায়—যদিও এইসকল জাতি অনেক পরিমাণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। যে সকল ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির ভিতর এই উপহার দেওয়ার প্রথা দেখা যায় না, তাহারাও যে বহু পূর্ব্বে উপহার দিত, তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—বৈদিক কালে মৃতের সহিত উপহার দানের প্রথা দেখা যায় না। কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করিতে হইবে—ঋগ্বেদের একটি প্রসিদ্ধ সূক্ত (১০.১৮) হইতে পাওয়া যায় যে, মৃত যোদ্ধার পত্নীকে স্বামীর পাশে চিতা-শয্যায় শোয়ানো হইত এবং পরে তাহাকে জীবিতের রাজ্যে ফিরিয়া আসিতে উঠিবার আদেশ দেওয়া হইত। ইহা হইতে স্ত্রী এবং অস্ত্র উপহার দানের প্রথা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল বুঝা যায়। হোমারের

সময়ের গ্রীকদিগের সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। তাহাদিগের মধ্যেও মৃতদেহের ভস্মরাশি বিনা উপহারেই শবের সহিত প্রোথিত করা হইত। একিলিস (Achiles) তাঁহার বন্ধু পাত্রোক্লুসের (Patroclus) জন্য যে চিতা তৈয়ারী করিয়াছিলেন, তাহার উপর তিনি মধু ও তৈলের কলস স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বৃষ অশ্ব ও কুক্কুর সহ বারজন সম্ভ্রান্ত ট্রয়বাসীকেও বলি দিয়াছিলেন। প্রাচীন যুগের মৃতকে উপহার দেওয়ার স্মৃতি ইহার ভিতর লক্ষিত হয়।

এই সকল উপহার প্রথায় তারতম্য ছিল। যেখানে সমাধি দেওয়ার প্রথা ছিল, তথায় মৃতদেহের সহিত কবরের মধ্যে এইসকল উপহার নামাইয়া দেওয়া হইত। যেখানে দাহ-প্রথা চলিত ছিল, সেখানে উপহার-দ্রব্য চিতা-ভস্মের পাশে স্থাপন করা হইত, অথবা চিতানলে ভস্মীভূত করা হইত। শেষের এই প্রথা পরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। প্রোথিত অথবা দাহ করার বিভিন্নতা অনুসারে উপহার দ্রব্যের বিভিন্নতা করা বড় শক্ত।

ওইসকল উপহার দানের মূলে এই ইচ্ছা রহিয়াছে যে, মৃত ব্যক্তিকে এমন কিছু দেওয়া যাহা মৃত্যুর পর তাহার কাজে আসিতে পারে। এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, শোকার্ত্তগণ ওই সমস্ত জিনিষ দেওয়ার সময় ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ততটা মনে করিতেন না—মাত্র কুলক্রমাগত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতেন। এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, দেশকালপাত্র অনুসারে এই মূল উদ্দেশ্য উন্নত হয় এবং কালে উপহার-দ্রব্য ভালবাসার স্মৃতিরূপে পরিবর্ত্তিত হয়।

ইন্দো-ইউরোপীয়গণের এই মৃত-পূজার মূলে ভয়মিশ্রিত ভক্তি এবং ভালবাসা নিহিত রহিয়াছে—এ কথা বলা যাইতে পারে। আরও একটি কারণ এই যে, জীবিত ব্যক্তিগণ ভগবানের সম্মুখে ন্যায়বিচার অনুযায়ী মৃত ব্যক্তিকে তাহার দ্রব্যাদি হইতে বঞ্চিত করিতে সাহস পাইত না।

মৃত ব্যক্তির সহিত তাহার স্ত্রীকে দেওয়ার প্রথা সিথিয়, থ্রেসীয়, লিথুয়েনীয়, শ্লাভ এবং টিউটন জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইত এবং ইন্দো-ইউরোপীয় যুগেও যে ইহার মূল অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভারতে বেদের সময়ে ইহার আর চলন দেখা যায় না। কিন্তু খৃঃপূঃ পঞ্চম শতকে যখন আবার সতীদাহ প্রথার উদ্ভব দেখা যায়, তখন ইহাকে একটা নূতন কিছু বলিয়া মনে না করাই ঠিক —ইহা প্রচলিত স্থানীয় একটি বহু পুরাতন প্রথার পুনরুজ্জীবন মাত্র।

এতক্ষণ বিবাহিত লোকের কথা হইল। অবিবাহিতগণের কি হইত? অবিবাহিতের মৃত্যুতে বিবাহের কতকগুলি অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন করা হইত। গ্রীস দেশে বিবাহের জলকলস অবিবাহিত ব্যক্তিগণের সমাধিস্থলে স্থাপিত করা হইত। শ্লাভ জাতি সমাধিস্থানে নকলবিবাহের অনুষ্ঠান করিত এবং মৃত ব্যক্তিকে স্বামী বা স্ত্রী প্রদান করিত। জার্ম্মানীতে এই প্রথার চিহ্ন এখনও পাওয়া যায়। হেসে (Hesse) প্রদেশে অবিবাহিত ব্যক্তিগণের শবাধারের পাশে পাশে মাথায় মালা পরিয়া কুমারীগণ যায় এবং চারি সপ্তাহ ধরিয়া শোক-পরিচ্ছদ ধারণ করে।

প্রাচীনতম শ্লাভ এবং রুশীয় প্রথা অনুযায়ী কেবলমাত্র বিবাহিত মৃত ব্যক্তির স্ত্রী-ই যে

তাহার সঙ্গিনী হইত এমন নয়, অবিবাহিত ব্যক্তিও মৃত্যুর পর যথারীতি বিবাহিত হইলে তাহার অল্পবয়স্কা স্ত্রীকেও যমসদনে মৃত স্বামীর সঙ্গে প্রেরণ করা হইত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে গ্রীসদেশেও স্বামীর অনুগমন প্রথা প্রচলিত ছিল।

এই সকল কথা সত্য হইলে আমাদিগকে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, মৃত ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় প্রিয় এবং প্রয়োজনীয় বস্তু উপহার পাইবে এমন নয়, পরন্তু তাহার পরজীবনের কথাও জীবিত আত্মীয়গণকে ভাবিতে হইবে। এই ভাবনার মূলে ছিল যে, জীবনের অতি আবশ্যকীয় অনুষ্ঠান বিবাহ এবং অবিবাহিত অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

---

১. প্রকাশকাল : প্রবাসী ❑ ভাদ্র, ১৩২৭ (২০ শে ভাগ, ১ম খণ্ড)

২. প্রকাশকাল : প্রবাসী ❑ পৌষ, ১৩২৭ (২০শ ভাগ, ২য় খণ্ড)

সংকলক : শ্যামল বেরা।

শাং যুগের নরকঙ্কাল

উত্তর চীনের .. শাং জাতির একটি রীতি ছিল, অন্যত্রও এ রীতি দেখা গেছে, রাজকীয় শবযাত্রার সময়ে বহু সংখ্যক মানুষ বলি দেওয়া। এই কারণে এবং স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য আন ইয়াং-এর আইন সঙ্গত এবং বে-আইনী খননেও বহু কঙ্কাল উত্তোলিত হয়েছে। ১৯৩৯ সনের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সরকারী খনন কার্যের ফলেই শাং যুগের এগার শত কঙ্কাল উদ্ধার হয়েছে। এর একটিরও কোন বর্ণনা দেওয়া হয়নি, শুধু দু'চারটি মন্তব্য করা হয়েছে যে কতগুলি কঙ্কালের পার্শ্ববর্তী উর্দ্ধ কৃন্তক দন্তগুলি কোদালের আকৃতি বিশিষ্ট। আমার দাঁতও তাই কিন্তু আমি মঙ্গোলয়েড নই। এ দাঁত ইউরোপীয়দের চেয়ে এশিয়ানদের মধ্যে বেশী দেখা যায়, কিন্তু তাই বলে দাঁতের এই আকৃতিকে নৃজাতির বিশেষ লক্ষণ বলে ধরা যাবে না। কঙ্কালগুলি সম্বন্ধে এ পর্যন্ত একটি মাত্র অনুচ্ছেদ আমি পেয়েছি, একটি চৈনিক কম্যুনিষ্ট প্রচার পত্রিকার চিত্র সেটি। তাতে দুটি করোটি এবং এক জোড়া পায়ের হাড় বেশ সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত আছে। আমি ছয় দল দেহ বিচরণকারী নৃতত্ত্ববিদদের এগুলি দেখিয়েছি, তাদের কেউ বলে ওসব কঙ্কাল সাদা মানুষের, কেউ বলে মঙ্গোলয়েড, আবার কেউ বলে ওর নৃজাতি নির্ধারণ অসম্ভব। করোটির খুলি খুব উন্নত, মুখ দীর্ঘ ও সরু যেন কোন মরুভূমির বাসিন্দাদের মত। কিন্তু উর্দ্ধপদ ও নিম্নপদের অনুপাত আধুনিক চৈনিকদের অনুপাতের সমান। এসব মানুষ সম্ভবত ছিল কোন মিশ্রজাতির, উভয় জাতির প্রভাব রয়েছে এদের মধ্যে।

— দ্য স্টোরি অফ ম্যান/অনুবাদ : রবীন্দ্রনাথ সরকার

প্রাচীন বৈদিক অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া

বর্তমান হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পদ্ধতি প্রাচীন আর্যদিগের তদ্বিষয়ক নিয়ম হইতে অনেক বিভিন্ন ছিল। কৃষ্ণযজুর্বেদান্তর্গত তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ষষ্ঠকাণ্ডে পূর্বতন লোকের সৎকারাদির সবিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। বৌধায়ন এবং ভবদ্বাজ ঋষিদ্বয়ের সূত্রগ্রন্থে তদ্বিযয়ের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আশ্বলায়ন এবং হিরণ্যকেশীনামা সূত্রকারের সংগ্রহেও বৈদিক সৎকারের নিয়মাবলি সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। উক্ত গ্রন্থসমূহে যে সকল নির্দিষ্ট প্রথা প্রতিষ্ঠিত আছে বর্তমান সৎকারের রীতি হইতে তাহা অনেক অংশে বিপরীত বোধ হয়।

এইক্ষণে যে সৎকার পদ্ধতি বঙ্গদেশে প্রচলিত, তাহা রঘুনন্দনের শুদ্ধিতত্ত্ব ও অন্যান্য নব্যস্মৃতিকারদিগের গ্রন্থানুযায়ী। নিম্নলিখিত বৈদিক নিয়মাবলি পাঠে পাঠক মহাশয়েরা প্রাচীন এবং ইদানীন্তন প্রথার বৈলক্ষণ্য ও বৈষম্য অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তদর্থে এস্থলে উভয়ের তুলনা করা গেল না।

আরণ্যকের প্রথমে ব্রাহ্মণের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এক হোমের নির্দেশ আছে। বৌধায়ন বলেন যে, মৃত ব্যক্তির দক্ষিণ হাতে ধারণ পূর্বক গার্হপত্য অগ্নিতে ওই হোম চারিবার ঘৃত পরিপূর্ণ চমস দ্বারা সমাধা করিতে হইবে। ভরদ্বাজ বলেন যে, আহবনীয় অগ্নিতে ওই হোম সম্পন্ন করা কর্তব্য। আশ্বলায়নের গ্রন্থে ওই হোম মৃত্যুর অব্যবহিত পরে না হইয়া কিছুকাল বিলম্বে করার বিধি দেখা যায়। যাহা হউক উক্ত তিন মহর্ষি ফলত স্বীকার করিয়াছেন যে মৃত ব্যক্তির বাটিতেই প্রাণত্যাগ হইয়াছে, কারণ জীবদ্দশায় গঙ্গার তটে বা অন্য নদীতীরে লইয়া যাইলে গার্হপত্য অগ্নিতে হোমের উপায় হয় না। অপর ওই পুস্তকে অন্তর্জলীর কোনো উল্লেখই নাই। বস্তুত গঙ্গাযাত্রা এবং অন্তর্জলীর প্রথা অতি আধুনিক, এবং খ্রিস্টীয় শকের পঞ্চদশ শতাব্দীর পর হইতে প্রচলিত হইতেছে।

পূর্বোক্ত হোম নিষ্পন্ন হইলে পর একখানি উড়ুম্বর কাষ্ঠের খট্টা সংগ্রহ করা হইত, এবং তদুপরি একখানি সলোম কৃষ্ণাজিন এইরূপে বিস্তৃত করিবার আবশ্যক যাহাতে তাহার শিরোভাগ দক্ষিণদিকে এবং লোমসকল অধোমুখে থাকে। অতঃপর মৃত ব্যক্তির পুত্র কী কনিষ্ঠ সহোদর কী সগোত্রীয় কিংবা যে কেহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিবেক, সে একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শবের পরিধীত বস্ত্র লইয়া তাহাকে নূতন বস্ত্র পরিধান করাইত, এবং অপর এক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাহাকে একখানি নূতন অখণ্ড দশীবিশিষ্ট বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া তাহার বিছানা কিংবা একখানি মাদুরে জড়াইয়া এবং তদবস্থায় খট্টায় শায়িত করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইত। মনু সংহিতায় লিখিত আছে যে স্বগোত্রীয় উপস্থিত থাকিতে অন্য জাতীয় মনুষ্যকে শব স্পর্শ করিতে দেওয়া বিহিত নহে; এবং অন্য স্মৃতিকারেরা লিখিয়াছেন যে তাহাতে অশৌচ ঘটে; ও তাহার খণ্ডনার্থে প্রায়শ্চিত্ত বিধেয; কিন্তু যজুর্বেদের মতে শব লইয়া যাইবার উপায় শকটই প্রশস্ত; এবং বৌধায়নাদি সূত্রকারেরা তদ্‌ভাবে বৃদ্ধদাসের বিধান করেন। ঋগবেদের মন্ত্রে দাসের উল্লেখ নাই, শকটই একমাত্র উপায় বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই কথা শ্রবণে অনেক পাঠক চমৎকৃত হইবেন সন্দেহ নাই;

এবং কেহ কেহ আমাদিগের বাক্যে সন্দিহান হইতে পারেন, অতএব তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জনার্থে এস্থলে আমরা বৌধায়নের সূত্রসহ ওই মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্যথা—

"অথৈনমেতয়া আসন্দ্যা সহ তৎতল্পেন কটেন বা সংবেষ্ট্য
দাসা প্রবয়সো বহেযুঃ অথৈনম্ অনসা বহন্ত্যেকেষাং অনশ্চেদ্যুঞ্জাৎ।
ইমৌ যুনজমিতে বহ্নী অসুনীথায় বোঢ়বে।
যাভ্যাং যমস্য সাদনং সুকতঞ্চাপি গচ্ছতাৎ।"

মন্ত্রের অর্থ যথা, "হে মৃত, তোমার প্রাণের বহনার্থ আমি এই দুই বলীবর্দ্দ শকটে যোজনা করিতেছি; ইহা দ্বারা তুমি সুকৃতের লোকে বা যমালয়ে যাইতে পারিবে।"

ঋগ্‌বেদের সূত্রকার আশ্বলায়ন এক বলীবর্দ্দের বিধান করিয়াছেন। তাঁহার মতেও তদভাবে দাসই প্রশস্ত। প্রাচীন সূত্রকারেরা কেহই ব্রাহ্মণের শবকে শকটে কি শূদ্রদাস দ্বারা শ্মশানে লইয়া যাইতে কুণ্ঠিত ছিলেন না; প্রত্যুত তাহাই কর্তব্য বলিয়া বিধান করিয়াছেন, অধুনা তাহার বর্ণন-শ্রবণেও হিন্দুমাত্রে বিস্ময়ান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই।

শবকে শ্মশানে লইবার সময় তৎসহিত একটি 'গো'-কে সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রথা ছিল। তদর্থে বৃদ্ধা গো-ই প্রশস্ত, তদ্‌ভাবে কৃষ্ণা গো, তদভাবে লোহিত কৃষ্ণাক্ষী গো, তদ্‌ভাবে কৃষ্ণখুরবিশিষ্টা গো, আর এতদ্রূপ কোনো গো অপ্রাপ্য হইলে কৃষ্ণবর্ণ অল্পবয়স্ক ছাগ তাহার অনুকল্প। ওই পশুর পুরো বামপদে রজ্জু বান্ধিয়া লইয়া যাওয়ার বিধান ছিল। অপর শবের গৃহ হইতে শ্মশান-স্থান পর্যন্ত পথ তিনভাগে বিভাগ করা কর্তব্য, এবং প্রত্যেক ভাগ উৎক্রান্ত হইলে শবকে এক এক বার ভূমিতে রাখিয়া একটি ঋগ্‌বেদের মন্ত্র পাঠ করিবার রীতি ছিল।

শ্মশানভূমিতে উপনীত হইয়া এক চুল্লি খনন করা কর্তব্য, তাহা শবের বাহু উর্ধ্বে প্রসারণ করিলে যে পরিমাণ হয় সেই পরিমাণে দীর্ঘ; পাঁচ বিঘত প্রশস্ত ও ১২ অঙ্গুলি গভীর হইত। ইহার উপর যথা পরিমাণে কাষ্ঠ দিয়া শব সংস্থাপন করিতে হয়, এবং ওই শব ব্রাহ্মণের হইলে তাহার হস্তে এক খণ্ড সুবর্ণ, ও ক্ষত্রিয় হইলে এক ধনুক এবং বৈশ্য হইলে একটি মণি দেওয়া যাইত, ও তাহার স্ত্রীকে তাহার বামপার্শ্বে শায়িত করা হইত। তৎপরে দেবর তাহার নিকট গিয়া এক মন্ত্রপাঠ করিত, তাহার অভিপ্রায় এই, "হে মৃত আত্মা, তোমার পত্নী পতিলোক কামনা করিয়া তোমার শবের পার্শ্বে শুইয়া আছেন। ইনি যত্নে পতিব্রতত্ত্ব পালন করিয়াছেন, ইঁহাকে ইহলোকে নিবাস করিতে অনুমতি দিন, এবং আপন ধনপুত্রাদিগকে প্রদান করুন।"[১] তৎপরে ওই পত্নীর বামহস্ত ধারণ করিয়া কহিতেন—"হে নারী, তুমি গতপ্রাণ পতির নিকট শয়ন করিতেছ, উত্থান কর; জীবলোকে আগমন কর, এবং তোমার হস্তধারী বিবাহেচ্ছ ব্যক্তির জায়াত্ব স্বীকার কর। তোমার ধনের বৃদ্ধ্যর্থে, ব্রাহ্মণত্বের সাধনার্থে, তেজের উন্নত্যর্থে এবং বলের বাহুল্যার্থে মৃতের হস্ত হইতে সুবর্ণ লইয়া ইহলোকে নিবাস কর। আমরা সুসেবিত ও উন্নতশীল হইয়া সকল শত্রুর পরাজয় করিয়া বাস করিব।"[২]

এই মন্ত্র পঠিত হইলে পর দেবর ওই স্ত্রীকে চিতা হইতে উত্থাপন করাইতেন। এই বিধির কোনো বিকল্প নাই; এবং ইহাতে সহমরণের কোনো লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। দেবর উপস্থিত না থাকিলে একজন দাস এই উত্থাপন কার্য নিষ্পন্ন করিতেন এবং তাহা হইলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কর্তা

স্বয়ং মন্ত্র পাঠ করিতেন।

অতঃপর যে গো, শবের সহিত আনীত হইত, তাহার আলম্ভনের বিধান আছে। ওই গো-র নাম ''অনুস্তরণী'' বা 'রাজগবী'। উহার বলিদান সিদ্ধ হইলে তাহার মেদ শবের মুখ, চক্ষু ও মস্তকের উপর, এবং মাংসাদি অপর অবয়ব শবের দেহের স্থানে স্থানে স্থাপিত হইত। তদনন্তর মৃত ব্যক্তির যজ্ঞ-সাধন যে সকল চমসাদি পাত্র ছিল তাহা তাহার দেহের স্থানে স্থানে রাখিয়া সমস্ত ওই গো-র চর্মে আবৃত করিতে হইত। যদ্যপি কোনো দৈব কারণে গো-কে বিনষ্ট করিবার ব্যাঘাত ঘটে তাহা হইলে তাহার বামপদ ভগ্ন করিয়া ছাড়িয়া দিবার রীতি ছিল, এবং তাহার মাংসাদির অভাবে শক্তু দ্বারা অনুকল্প করিয়া শবের উপব স্থাপিত করা হইত। শবের সহিত ছাগ লইয়া গেলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার রীতিই ছিল।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পাবে যে, ইদানীন্তনের বৈতবণীয় গোদান কি রাজগবীর অনুকরণ?

পূর্বোক্ত প্রকারে চিতাব উপর শব প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে অগ্নি সংযোগ করা হইত। সেই অগ্নি সংযোগের মন্ত্রের অর্থ যথা, ''হে অগ্নি এই শবকে ভস্মসাৎ করিও না; ইহাকে বেদনা দিও না; ইহার এক অবয়ব বিক্ষিপ্ত কবিও না। হে জাতবেদস্, এই শব, যথাবিহিত দগ্ধ হইলে ইহার আত্মাকে পিতৃলোকে প্রেরণ করিও।'' অতঃপর মন্ত্রেব পাঠ ও তর্পণ সমাধা হইলে অগ্নি প্রদানকারী চিতার উত্তরে তিনটি খাত খনন করিত; এবং সৎকাবীবা সকলে সেই জলে স্নানানুকল্প করিয়া পবিত্র হইয়া, দুইটি পলাশ শাখা প্রোথিত করিয়া, একটি পলাশ শাখা তাহার উপব জুয়ালেব রূপে বান্ধিয়া তাহার নিম্ন দিয়া প্রয়াণ কবিত।

দাহকর্তা সকলেব শেষে গমন করিতেন, এবং জোয়াল পার হইয়া প্রোথিত শাখাদ্বয় উৎপাটন করিতেন। তদনন্তর সকলে চিতা পরিত্যাগ কবিয়া নিকটস্থ কোনো নদীতে গিয়া স্নান তর্পণ করিতেন, এবং দিবসে সৎকার কবিলে রাত্রিতে তাবা দর্শন করিয়া ও রাত্রিতে সৎকার করিলে প্রাতঃকালে বাটিতে প্রত্যাগমন করিতেন; তৎপূর্বে সমস্তকাল মাঠে বসিয়া থাকিতেন। শ্মশানে যাইবার সময় জ্যেষ্ঠেরা অগ্রে, এবং কনিষ্ঠেরা পশ্চাতে যাইতেন কিন্তু বাটি আসিবার সময় কনিষ্ঠেরা অগ্রে ও জ্যেষ্ঠেরা পশ্চাতে আসিতেন।

অতঃপর তৃতীয় বা পঞ্চম বা সপ্তম দিবসে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী দাহকর্তা ও ক'একজন আত্মীয় প্রাতঃকালে চিতার নিকট গমন করিতেন, এবং তদুপরি দুগ্ধ মিশ্রিত জল সেচন করিতেন। তৎপরে দাহকর্তা একটি উদুম্বর দণ্ড দ্বারা তদুপরি আঘাত করিয়া অঙ্গার ও ভস্ম পৃথক কবত তাহা দক্ষিণ দিকে নিক্ষেপ করিতেন, এবং তিনবার জলসেচন করিয়া তর্পণ করিতেন। ওই কার্য সমাধা হইলে স্ত্রী, আব মৃত ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকিলে তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা অগ্রসর হইয়া দুই গাছি নীল ও লোহিত রজ্জুতে একটি প্রস্তবখণ্ড বান্ধিয়া তদ্দ্বারা বামহস্ত দিয়া অস্থিগুলি ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত করিতেন। সকল অস্থি সঞ্চিত হইলে তাহা ধৌত করিতে হইত, এবং ধৌত অস্থি একটি কুম্ভে বা মৃগচর্মে বান্ধিয়া একটি শমী কিংবা পলাশ বৃক্ষের শাখায় ঝুলাইয়া বাখা হইত। সোমযাজীর অস্থি হইলে ওই অস্থি পুনরায় দগ্ধ করা হইত, কিন্তু অন্যের হইলে তাহার সমাধি দিবার নিয়ম ছিল।

সমাধির নিমিত্ত কুম্ভের বিধান ছিল। তাহা স্ত্রীর অস্থি হইলে নলবিশিষ্ট বদনার আকার ও

পুরুষের হইলে নলবিহীন প্রশস্ত। ওই কুম্ভে অস্থি রাখিয়া তাহা মধু ও দধি দিয়া পূর্ণ করিয়া তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত করা হইত। সমাধি দেওয়া প্রাতে কর্তব্য ছিল। তদর্থে জ্ঞাতিস্বজন একত্রে নিভৃতস্থানে গিয়া দাহকর্তা আদৌ একখানি চর্ম কিংবা পলাশ কিংবা শমী শাখা দ্বারা তাহা মার্জন করিতেন। তৎপরে হালে দুইটি বালীবর্দ যোজনা করিয়া তদ্দ্বারা তথায় ছয়টি শীতা খাত করিয়া তদুপরি জল সেচন করিতেন। তদনন্তর মধ্যস্থ শীতায় অস্থিকুম্ভ স্থাপনানন্তর তাহার আবরণ উদ্‌ঘাটিত করিয়া তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ সর্বৌষধি দিয়া তাহা লোষ্ট্র ও বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিতেন। তৎপরে তাহার চতুষ্পার্শ্বে ক'একখানি ইষ্টকা রাখিয়া তদুপবি তিল নিক্ষেপ করা হইত, ও একখানি কাঁচা খাপরায় কিঞ্চিত নবনীত দিয়া তাহা দক্ষিণ দিকে রাখা হইত। তাহার পর ইষ্টকের উপর কিঞ্চিত তৃণ বিস্তার করিয়া কতকগুলি পলাশ শাখা ওই স্তূপের চারিপার্শ্বে পুতিয়া বেড়া দিয়া স্তূপের উপর একটি নল-পুষ্পের চূড়া স্থাপন করার নিয়ম ছিল। ইহার পর কর্মকর্তা আপন দেহে পুরাতন ঘৃত লেপন করত কুম্ভের গাত্র একখানি জীর্ণ বস্ত্র দ্বাবা মার্জিত করিতেন। পরে তাহা ইষ্টকোপরি স্থাপন করত পলাশ শাখা দ্বারা তদুপরি কিঞ্চিত চরু বন্ধন করিয়া স্তূপের পার্শ্বে পাঁচ স্থানে তাহা রাখিতেন। পরে কিঞ্চিত তিল ও যব তাহার উপব ছড়াইয়া তদুপরি ক্রমান্বয়ে বরুণ-শাখা বহুল ইষ্টক, শমীশাখা ও যব দিলেই সমাধি-কার্য শেষ হইত। এই সকল কার্যের প্রত্যেকের নিমিত্ত স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে, কিন্তু তাহা প্রস্তাব বাহুল্য হইবার ভয়ে তাহা এস্থলে লেখিতব্য নহে।

এই অস্থি সঞ্চয়ন কার্যের উদাহরণ রামায়ণে দশবথের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় দৃষ্ট হয। কৌতুকানুরাগী পাঠকদিগকে আমরা তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পাদটীকা

১. ''ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নিপদ্যতে উপ ত্বা
মর্ত্ত্য প্রেতং বিশ্বং পুরাণমনুপালয়ন্তী তস্যৈ
প্রজাং দ্রবিণঞ্চেহ ধেহি।''

২. উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকমিতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তমেতং পত্যুর্জনিত্বমভিসম্বভূব।''
''সুবর্ণং হস্তাদদানা মৃতস্যশ্রিয়ৈব্রহ্মণে তেজসে বলায়।
অত্রৈব ত্বমিহ বয়ং সুশেবাং বিশ্বা স্পৃটো অভিমাতীর্জয়েম।।''

সংকলক : শিবেন্দু মান্না

সৌজন্যে : রহস্যসন্দর্ভ ॥ ৬ পর্ব ॥ ৬৪ খণ্ড, পৃ: ৫৬-৬০ (১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দ)

আদিম ধর্ম্ম

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

"Are there, or have there been, tribes of men so low in culture as to have no religious conceptions whatever ? This is practically the question of the Universality of religion, which for so many centuries has been affirmed and denied, with a confidence in striking contrast to the imperfect evidence on which both affirmation and denial have been based."

Edward Burneth Tylor, 1871

স্যর এড্ওয়ার্ড টাইলরকৃত 'প্রিমিটিভ্ কালচার' নামক গ্রন্থের মুখবন্ধে উপরি উদ্ধৃত অংশের উল্লেখ আছে; কিন্তু তিনিই আবার নানা আলোচনা প্রসঙ্গে শেষে এই নিরপেক্ষ দৃষ্টি হারাইয়া নিজের ভিত্তিহীন ধারণাকেই শ্রেষ্ঠস্থান দান করিয়াছেন। এতদ্সম্পর্কে তাঁহার উক্তিরই পুনরুল্লেখ করা সমীচীন হইবে এবং তাহা হইলে 'পাঠকগণও সমালোচনার অন্ধ-ধারণা হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবেন। তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে অসম্পূর্ণ নির্দ্দেশ প্রমাণের বিস্ময়কর বৈষম্যের উপর আস্থা স্থাপন করিয়াই''[১] তিনি নিজ উক্তি সত্ত্বেও নিজের নিরপেক্ষ বিচারশক্তিকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। আদিম ধর্ম্ম ও মানবের ধর্ম্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি আরও যাহা বিবৃত করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম পাঠকদের জ্ঞাতার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"কৃষ্টির নিম্নতম স্তরে—যাহার সম্বন্ধে আমরা সবিশেষ অবগত আছি তাহাতে—মানুষের দেহে থাকিয়া প্রেতাত্মা মানুষকে সজীব করিয়া রাখে—এই বিশ্বাস অস্থি মজ্জাগত হইয়া আছে। অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতির সংস্পর্শে আসিয়া বর্ব্বর অসভ্য জাতীয়গণ এই প্রকার বিশ্বাস-ধারণায় শিক্ষা লাভ করিয়াছে, অথবা শ্রেষ্ঠতর কৃষ্টি হইতে অধঃপতিত বর্ব্বর জাতির শিক্ষা-দীক্ষার ইহা ধ্বংসাবশেষ মাত্র—এমন ভাবিয়া লওয়ার কোন হেতু নাই। কারণ এস্থলে যাহা আদিম প্রেতবাদ বলিয়া বিবেচনা করা হইতেছে তাহা অসভ্যগণের মধ্যে সুপরিজ্ঞাত ও সমাদৃত হইয়া থাকে। জ্ঞানতঃ ইন্দ্রিয়ানুভূতির অস্তিত্ব হইতে তাহারা ইহা মানিয়া চলে বলিয়া মনে হয় এবং তাহাদের চিন্তাধারা অনুসারে যুক্তিসঙ্গত প্রাণীতত্ত্বের সাহায্যে ইহার ব্যাখ্যাও উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ...

"বর্ব্বরগণের এই প্রাণীতান্ত্রিকতা নিজেই সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহার উৎপত্তির সন্ধানও ইহা হইতেই পাওয়া যাও।"

ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা সম্বন্ধে স্যর এড্ওয়ার্ড টাইলর যখন তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাসকে সাধারণে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে গত ষাট বৎসরে জ্ঞানের পরিধি যতখানি

বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহাতে এই উক্তির যথার্থ কোন তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই আধুনিক নৃজাতি-বিজ্ঞানবিদ্‌গণের[২] প্রায় কেহই প্রেততাত্ত্বিকতা সম্বন্ধে টাইলরের মতবাদকে গ্রহণ করেন না। অধিকন্তু এখন যে নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা হইতে আদিম মানবের যথার্থই 'মানুষকে উজ্জীবিতকারী' প্রেতাত্মায় বিশ্বাস ছিল কিনা তৎসম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। অপ্রত্যাদিষ্ট মানবের আদৌ কোন ধর্ম্ম-বিশ্বাস ছিল অথবা আদিম ধর্ম্ম যখন প্রবর্ত্তিত হয় তখন তাহাতে প্রেতাত্মা-বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল এমন ধারণা পোষণ করিবার যথার্থপক্ষে কোনই হেতু নাই। বস্তুতঃ ধর্ম্ম সভ্য মানবেরই আবিষ্কার এবং খুব সম্ভব ছয় হাজার বৎসরেরও ন্যূনকাল পূর্ব্বে রাজত্ব-ধারণার প্রতিষ্ঠাপন কালেই এতদ্বিষয়ে পরিকল্পনা হইয়াছিল। প্রাচীন মিশরীয় লিপি হইতে ধর্ম্মমতের অস্তিত্ব-প্রমাণোপযোগী প্রাচীনতম নিদর্শন সংগৃহীত হইতে পারে; তাহাতে সর্ব্বপ্রথম যে দেবতার উল্লেখ আছে ডাঃ আলন গার্ডিনারের (Dr. Alan Gardinar) মতানুসারে সেই দেবতা মৃত রাজা ভিন্ন আর কেহ নহে। পটী জড়ান দণ্ডের চিত্রদ্বারা দেবতা সম্বন্ধে তাহাদের যে ধারণা ছিল তাহাই প্রতিবিম্বিত করা হইত; ইহা হইতে নিঃসন্দেহে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে তাহাদের প্রথমতম দেবতা হইল রাজার মমী। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে—মৃত রাজার সংরক্ষিত দেহকে নানা উৎসব আয়োজন করিয়া পুনরুজ্জীবিত করা হইত—মুখাবরণ উন্মোচনান্তে গন্ধ-ধূপ জ্বালাইয়া, তর্পণোদক[৩] ঢালিয়া এবং নৃত্য, নাট্যাভিনয়, সঙ্গীত ও ক্রীড়াকৌতুকাদি নানা ক্রিয়াকাণ্ডের সহযোগে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। আইভর ব্রাউন[৪] (Mr. Ivor Brown) ও কুমারী ইভেলীন শার্প[৫] (Miss Evelyn Sharp) যথাক্রমে প্রাচীনতম নাট্যকলা ও নৃত্যশিল্পের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাকল্পে তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থদ্বয়ে অতি মুখর আলোচনা করিয়াছেন।

মমীকৃত রাজা অসিরিসকে প্রথম দেবতা বলিয়া যে বিশ্বাস ছিল, তাহার সহিত ধর্ম্ম বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার কোনরকম সাদৃশ্য বা তুল্যার্থ কল্পনা করা সমীচীন নহে। ইহাকে মানুষের প্রয়োজনে তৎকালীন যুক্তিসিদ্ধ বিজ্ঞানের প্রয়োগ ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। রাজা প্রথম চাষ-আবাদ ও জল নিষেচন প্রভৃতির সহিত সকলকে পরিচিত করেন এবং তদ্রূপে অতি আশ্চর্য্যভাবে খাদ্যের প্রাচুর্য্য সাধন করিতে সমর্থ হন। ইহাতে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং রাজাকে শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করে। তখন রাজা কেবল প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণের মালিক বলিয়াই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন না, নিষেচন-জলের জীবনোৎপাদিকা শক্তি রাজাই দান করিতেন এবং মৃত বা শুষ্ক বীজের সঞ্জীবন ক্ষমতাও তাঁহারই প্রদত্ত বলিয়া তখনকার বিশ্বাস ছিল। রাজা প্রাণদাতা। মৃত্যু হইলে তদীয় দেহ গন্ধ-দ্রব্য প্রলিপ্ত করিলে তাঁহার স্থিতিকাল দীর্ঘ করা যায়—ইহাই ছিল তখনকার ধারণা; কাজেই তাঁহাকে দেবত্বারোপ করা হইত, রাজা তাই হইতেন তখন দেবতা। তাঁহার সেই সৃষ্টিকরণ ও জীবন দান ক্ষমতা জীবিতকালে যতটুকু ছিল তাহা দেবতারূপে আরও উৎকৃষ্টতর ও শ্রেষ্ঠতর হইয়া প্রতিভাত হইত। অঙ্কুরোদ্‌গম ও প্রজননক্রিয়ার এবং বিশেষ করিয়া নানা প্রয়োজনে জলের আবশ্যকতার ব্যাখ্যাকল্পে প্রথম যে চেষ্টা চলিতেছিল পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বেব সে প্রচেষ্টার ফল। ইহা ধর্ম্ম নহে, বরং ইহাকে আদিম প্রাণীতত্ত্বের মতবাদ বলা

যাইতে পারে; তাই মতবাদকে যাহারা কার্য্যতঃ প্রয়োগ করিয়াছিল তাহারা সুযুক্তিসম্পন্ন বলিয়াই বিশ্বাস করিত। তা'রপর জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার ভ্রান্তি প্রণিহিত হইলে পরেও যাহারা আত্ম-রক্ষা ও জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় হিসাবে ইহাকে গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা যখন এমন সুখ সম্ভোগের আশা ত্যাগ করিতে পরাঙমুখ হইয়া এই বিশ্বাসকে আঁকড়াইয়া রহিল তখন হইতেই পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত ধারণা সকল বিশ্বাস ধর্ম্মাকারে রূপান্তরিত হইয়া প্রকাশ পায়।

নদী ও প্লাবন সম্পর্কিত ঘটনাবলী, নদীর গতি-বিধি নিয়ন্ত্রণে অলক্ষ্যে দিব্য শক্তির প্রভাব (যেমন নারী দেহে জীবনদান ক্ষমতা চন্দ্র নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়া বিশ্বাস ছিল) —এই সমস্ত একত্রিত করিয়া প্রাণীতত্ত্বের বিভিন্ন ঘটনাবলীর যথাযথ ব্যাখ্যা উপস্থাপনকল্পে সেই প্রাচীনতম কল্পনাসূত্র গঠিত হইয়া উঠে। যতদিন না জাগতিক ঘটনাবলীর নিয়ন্ত্রণ -শক্তি চন্দ্রের পরিবর্ত্তে সূর্য্যের উপর আরোপিত হইয়াছিল ততকাল পর্য্যন্ত নভোজগতের কোন প্রকার ধারণাই মানুষের মনে উদিত হয় নাই। তখন যদিও নারীর জীবন-দান কার্য্যের নিয়ন্ত্রণ-শক্তি চন্দ্রের উপরে আরোপিত ছিল, তথাপি রাজাই সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইতেন; রাজাই ছিলেন সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই প্রজাগণের প্রাণদাতা ছিলেন ও যে শস্যাদির উপরে লোকের অস্তিত্ব বা জীবিকা নির্ভর করিত তাহার সেই জীবনীশক্তিও দান করিতেন রাজা। তা'রপর চন্দ্রের অপেক্ষা সূর্য্যের গতিবিধির সাহায্যে অধিকতর নির্ভুলরূপে বর্ষ গণনা করা যাইতে পারে বলিয়া যখন উপলব্ধি করিতে পারিল (হিলিওপলিসের যাজকগণ) তখনই মাত্র বিশ্বের নিয়ামক শক্তির আকর স্বরূপে মৃত রাজাকে সূর্য্যের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রচার করা হয়। এইরূপে আকাশ-জগতের ধারণার উৎপত্তি হয়। রাজা মৃত্যুর পরে সেই নভোজগতে যাইয়া সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া ঐহিক বিষয়সমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শাসন ভার গ্রহণ করেন।

মিশরীয় ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পরে স্বর্গ-গমনের সমস্যার সম্মুখীন হইলেন যেন ইহা সম্পূর্ণ পার্থিব ব্যাপার। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন মর্ত্ত্যবাসী কিরূপে স্বর্গে যাইতে পারে। কোন্ প্রকারের যানবাহন স্বর্গরাজ্যে পৌঁছিবার পক্ষে উপযুক্ত? বিংশ শতাব্দীর খৃষ্টধর্ম্মী ইংরাজগণ সম্বন্ধে ডীন আয়েন্‌গে (Dean Inge) নাকি বলিয়াছেন যে, "স্বর্গের ভূসংস্থান বৈজ্ঞানিক দিক দিয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হইলেও কল্পনার খোরাক হিসাবে ইহা অপরিবর্জ্জনীয়।" কিন্তু প্রাচীন মিশরীয়গণের নিকট স্বর্গভূমির ধারণাই ছিল তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রধানতম সম্বল; তাহারা তাই স্বর্গের সেই ভূখণ্ডের ভৌগোলিক বর্ণনা নিখুঁতভাবে প্রস্তুত করিয়াছে এবং তথায় যাইবার পথও আধুনিক দিক্‌দর্শন পুস্তকানুরূপ নির্ভুলভাবে অতি সূক্ষ্ম বর্ণনা করিয়া মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে এই প্রকার একখানা মানচিত্র দিয়া দেওয়া হইত, যেন সে তাহা দেখিয়া দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া যাইয়া স্বর্গভূমে পৌঁছিতে পারে।

স্বর্গরাজ্যে পৌঁছিবার পথ যদিও বহু ছিল, যানবাহন বলিতে কিন্তু ছিল এক এবং অদ্বিতীয়; কেবলমাত্র সে-ই সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া নিরাপদে মানুষকে স্বর্গভূমে পৌঁছাইয়া দিতে পারিত। মিশরীয় ইতিহাসের গোড়া হইতে একমাত্র এই বাহনই মৃতদেহ রক্ষাকরতঃ স্বর্গে পৌঁছাইয়া দিয়া মৃতকে অবিনশ্বর করিতে পারে বলিয়া খ্যাতি রহিয়াছে। স্বর্গ-গাভী মাতৃরূপা

হাথর ছিল বাহন। হাথর কেবল জন্মের সহিত নশ্বর দেহে প্রাণ-সঞ্চালনই করিত না, নশ্বর মানব জীবিতকালব্যাপী তাহার অকৃপণ পয়োধারায় জীবন রক্ষা করিত; আবার মৃত্যুর পরেও হাথরই নিরাপদে শূন্য-রাজ্যে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে পারিত।

আদিম কাহিনীতে [রাজগণের স্মৃতিস্তম্ভসম্বলিত-থিবন উপত্যকার (Theban Valley) প্রথম সেটির (Seti-I) সমাধি-মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে খোদিত] বর্ণিত আছে যে সূর্য্যদেব 'রী' হইলেন পৃথিবীর রাজা; তিনি পুনঃসঞ্জীবিত হইলে যখন দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হন, সেই সময়ে সমাজের অবিশ্বাসী প্রজাগণের কারণে অত্যন্ত অবসাদ অনুভব করেন। রাজার বার্দ্ধক্য-জরার মধ্য দিয়া তাহাদের এই বিশ্বাসঘাতকতা "মানবের পতন" প্রকাশ পাইত। রাজার বার্দ্ধক্য সম্বন্ধে কোন প্রকার জনরব প্রচারিত হওয়া ছিল তাঁহার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিজনক; কারণ শাসকের শক্তি-সামর্থ্য হ্রাস পাইলে তাঁহার প্রাণদণ্ড ছিল পুরাকালে মিশরের প্রথা।

'রি' শূন্য-জগতে প্রয়াণের নিমিত্ত গাভীকে বাহকরূপে ব্যবহার করিতেন। ইহা হইতে মনে হয় সূর্য্যের সহিত লীন হইয়া দেবতা 'রী'-রূপে পরিণত হইত বলিয়া যে ধারণার সূত্রপাত হয়, তাহার পূর্ব্বে চলিত বিশ্বাস ছিল কামধেনু আকাশ ও চন্দ্রের সহিত অভিন্নদেহা এবং ইহা তাহারই পুনরুল্লেখ করা হইতেছে।

মমীকরণ প্রথার সঙ্গে সঙ্গে মৃতের চিত্রাঙ্কিত প্রতিকৃতির প্রচলন আরম্ভ হয়। রাজার মমীর ন্যায় এই সকল জীবনচিত্রও সঞ্জীবিত করা যায় বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস ছিল। বস্তুতঃ প্রাচীনতম যুগের মন্দিরগুলি ছিল স্মৃতি-সৌধেরই কাঠামো। প্রতিকৃতির নিকট নানা ক্রিয়াকর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী করিয়াই এইগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সকল ক্রিয়াকাণ্ডের আয়োজন যে কোন প্রকার অর্চ্চনার উদ্দেশ্যে বা বরানুগ্রহ লাভের আশায় করা হইত তাহা নহে; উদ্দেশ্য হইল মৃত রাজাকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং তাঁহার আত্মরক্ষার্থ খাদ্য ও পানীয়ের ভেট দান করা।

মিশরীয় ধর্ম্ম গড়িয়া উঠিয়াছে মৃত রাজা অসিরিস বা তাঁহার অভিব্যক্তি 'রী'কে ঘিরিয়া; 'রী' আবার সৌর শক্তি-সামর্থ্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ বলিয়া পরিগণিত ছিল। নিম্নে যে দুইটি উদ্ধৃতাংশের সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল তাহা হইতেই অসিরিস্ সম্বন্ধে মিশরীয় ধারণার স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে।[৬]

"... বৃক্ষাদি জন্মে বড় হয় তোমারই ইচ্ছায়। তুমিই প্রধান, তুমিই ভ্রাতৃগণের দলপতি, তুমি দেবগণের দলপতি, তুমি সর্ব্বত্র ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা কর। ... তুমি মহাপরাক্রমশালী, যাহারা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে তাহাদের তুমি বিপর্য্যস্ত কর, মহাশক্তিশালী বলিষ্ঠ হস্ত তোমার, তুমি তোমার শত্রুকে নিহত কর। ... তুমি নিজের হাতে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছ; পৃথিবীর জল, বাতাস, গুল্ম, ওষধি এবং গো মহিষাদি সমস্ত চতুষ্পদ পশুই তোমার সৃজন।"[৭]

"পৃথিবী তোমারই বাহুর উপরে সংস্থিত, ইহার চতুঃসীমা তোমারই স্বেচ্ছাধীন হইয়া আছে। তুমি নড়িলে সমস্ত ভূমণ্ডল প্রকম্পিত হইয়া উঠে ... এবং (নাইল নদী) তোমারই ঘর্ম্মসিক্ত হস্ত হইতে উৎসারিত হইতেছে। তুমি তোমার কণ্ঠনালী হইতে মানবের নাসারন্ধ্রে

প্রশ্বাস প্রবাহিত কর। বৃক্ষ এবং ওষধি, যব ও গম ইত্যাদি যাহা কিছুর উপরে লোকের জীবন নির্ভর করে তাহার সমস্তই অলৌকিক শক্তি উদ্ভূত এবং তোমারই নিকট হইতে আগত। ... তুমি মানবজাতির পিতামাতা উভয়ই, তাহারা তোমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে জীবন ধারণ করে, তোমারই দেহ-মাংস খায়।"[৮]

উল্লিখিত অংশের শেষ কথাটি (তাহারা তোমার দেহ-মাংস খায়) হইতে তখনকার মানুষকে নরমাংসভুক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই কথার অর্থ অনুরূপও হইতে পারে—যব ও গম খাদ্যরূপে ব্যবহারের ইঙ্গিতই হয় উহাতে পরিস্ফুট। তৎকালীন বিশ্বাস ছিল যে যব আর গম অসিরিসের দেহজাত। অসিরিস্ "আমিই যব" বলিয়াছিলেন বলিয়া কথিতও আছে। স্পষ্টতঃ ইহার খৃষ্টধর্ম্মিগণের ইউকেরিস্ট্[৯] (Eucharist) উৎসবেরই অনুরূপ।

স্যর ওয়ালিস্ বাজ (Sir Wallis Budge) আধুনিক মিশরীয়গণের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে একটি কাহিনীর বর্ণনা করিয়াছেন।[১০] সে আখ্যানভাগ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

"গমের উৎপত্তি সম্বন্ধে কপ্‌টগণের মধ্যে এক বিস্ময়কর কাহিনী চলিত আছে। ... তা'রপর প্রভু তাঁহার দেহের পবিত্র অংশ হইতে ছোট এক টুকরা মাংস-খণ্ড তুলিয়া লইয়া ঘসিয়া ঘসিয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা করিয়া ফেলেন; পরে নিয়া তাঁহার পিতাকে দেখান; দেখিয়া পিতা কহিলেন, 'আচ্ছা দাঁড়াও, আমি আমার দেহের খানিকটা মাংস দিতেছি, কিন্তু তাহা অদৃশ্য।' তাহার পরে ভগবান তাঁহার দেহ হইতে খানিকটা মাংস তুলিয়া লইয়া তাহা হইতে গমের একটি দানা প্রস্তুত করেন। দানাটি তৈরী হইলে আলো-বাতাস সহ তাহা মিল্ করিয়া প্রভুর হাতে দিয়া প্রধান দেবদূত মাইকেলকে দিতে বলিলেন—মাইকেলকে ইহা নিয়া আবার আদমকে দিতে হইবে এবং আদমকে ইহা রোপণ করিবার প্রণালী যথাযথ শিখাইয়া দিতে হইবে এবং এতদুৎপন্ন শস্য কেমন করিয়া কাটিয়া ঘরে লইতে হইবে তাহাও বলিয়া দিতে হইবে।"

অসিরিস্ কেবল জগত-স্রষ্টা এবং প্রাণীগণের জীবনদাতা রূপেই শ্রদ্ধান্বিত হইতেন না; নাইল নদী, ভূমি ও যবের সহিত অসিরিস্ ছিলেন অভিন্ন দেহ।

পীরামিড্ যুগের একমাত্র সুদূর অতীতের সাহিত্য এবং সেই সাহিত্যই কেবল আমরা পাইতে পারি। ঐ সকল গ্রন্থে দেখিতে পাই মৃত নৃপতি নাইল নদীর প্লাবন-কর্ত্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। মিশরের সেই আদি রাজাই নিশ্চিত এই শক্তিব আধার।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মিশরীয়গণের বিশ্বাস ছিল যবে প্রাণ-বস্তু দান করে জল। এই ধারণা হইতে তাহারা মীমাংসা করিয়া লয় (যাহা পরবর্ত্তী কালে গ্রীসান্তর্গত আত্তনীয়াবাসী দার্শনিকগণও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন) যে সমস্ত প্রাণ-বস্তুই মূলীভূত সাগর হইতে লব্ধ; মূলীভূত সাগর বলিতে তাহারা নাইল নদীকেই বুঝাইত। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস টাহ (Ptah মেম্‌ফাইটবাসীর কল্পিত মমীকৃত অসিরিসের প্রতিনিধি) জলরাশির তলদেশ হইতে প্রথম স্থলভূমি উত্তোলিত করেন, এই কথাই আদিম যুগে অন্য ভাবে বলা হইত—তখন বলিত ভগবান প্লাবনের জলরাশি প্রশমিত করিয়া তবে শুষ্ক স্থলভূমির সৃষ্টি করেন। এই বিবরণ নিশ্চিত দিগ্‌দিগন্তরে প্রচারিত হইয়া জাপান, ওশেনীয়া ও আমেরিকাতে যাইয়া এক অপরূপ আকার ধারণ করিয়াছে।

ডাঃ ডব্লিউ. জে. পেরী তাঁহার 'গড্‌স্ এণ্ড্ মেন' গ্রন্থে এই জল-নিম্ন হইতে স্থল-ভূমির উত্তোলন সম্পর্কে চমকপ্রদ তথ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। মিশরীয়গণ এই সৃষ্টিতত্ত্বের অভিব্যক্তিস্বরূপ হিলিওপলিস্, মেম্‌ফিস্ ও থেব্‌স্ প্রভৃতি স্থানের মন্দিরের ন্যায় সমাধি মন্দিরের মধ্যে সেই মূলীভূত সাগরের পরিবর্ত্তে ছোট ছোট ডোবা কাটিয়া লইত। ডোবাগুলি ছিল নানা ক্রিয়াকাণ্ডের অন্যতম আবশ্যকীয় অঙ্গ। সৃষ্টিধারার এই প্রকাব কৃত্রিম অনুকরণ-আড়ম্বরের অনুষ্ঠান করিয়া যাজকগণ মনে করিত তাহারা রাজার প্রজাগণকে নূতন প্রাণ নব উদ্দীপনা দান করিয়া তাহাদের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছে। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, নববর্ষের দিনে—যে দিন নাইল নদীতে প্লাবনের বাণ ডাকিত—সেই দিন সূর্য্যদেব গভীর জলদেশ হইতে উত্থিত হইয়া আসেন। মিশরীয় বেদী ও জলাশয়গুলির ভারতীয় মন্দিরের বিশেষত্বের সহিত হুবহু মিল ছিল; কিন্তু এই বিশেষত্বের প্রকৃত ব্যাখ্যা কেবল মিশরেই পাওয়া যায়। মূলীভূত সাগর হইল নাইল নদীর প্লাবন, জীবনের মূলাধার। বেদী বা ঢিপিটি হইল প্লাবন প্রশমিত হইতে থাকিলে যে স্থলভূমি আবির্ভূত হয় সেই মূল ভূমিরই ক্ষুদ্রানুকৃতি।

ভগবানের কল্পনা স্পষ্টতঃ মিশরেই ভিত্তি লাভ করিয়াছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ বংশের রাজত্বকালের পীরামিড্ যুগের গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে ভগবান যে মৃত ও মমীকৃত রাজা ছাড়া আর কেহ নহেন তাহা নিঃসংশয়ে স্বীকার করিতে হয়। এই আবিষ্কার হইয়াছিল সেই সময়ে—যে সময়ে পৃথিবী তখনও আকাশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই অর্থাৎ নভোজগত আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বে।

ডাঃ ডব্লিউ. জে. পেরী তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে[১১] প্রাচীন ভারতীয় লিপি-বিবরণ (ব্রাহ্মণ) ও উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ান জাতির মধ্যে প্রচলিত উপাখ্যানাবলীর (পনী) পরস্পরকে বিশ্লেষণকরতঃ তুলনা করিয়া দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন যে, তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস আদি মিশরীয় কল্পনারাশিকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে।

উক্ত গ্রন্থে তিনি আরও প্রমাণিত করিয়াছেন যে, সভ্যতার জন্মভূমি হইতে বহু দূরে পরস্পর বিচ্ছিন্ন স্থানসমূহের বহু স্থলে মিশরীয় ধারণার বিশেষত্বগুলি এমনভাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে সেই সকল স্থানেব নিজস্ব বা স্বতন্ত্র বলিবার স্পষ্টতঃ কোনই কারণ নাই। এই সকল স্থানের অনেক স্থলেই কিংবদন্তি আছে যে অতি পূর্ব্বে সৃষ্টির অনুকরণে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে মানুষ স্বর্গবাসিগণের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিত। প্রাচীন ভারতে রাজার অভিষেক উৎসব মিশরে উদ্ভাবিত কল্পনানুসারে পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টির অনুকরণে সম্পাদিত হইত, এইরূপ উৎসবানুষ্ঠান ভারতের পার্শ্ববর্ত্তী কোন কোন স্থানে আজিও প্রচলিত রহিয়া গিয়াছে। রাজা তখন ছিলেন তাঁহার দেশের অবতার। তিনি আর রাষ্ট্র ছিল অভিন্ন। ফরাসী দেশে লুই দি ফোরটিনথ্ (Louis XIV) দম্ভভরে ঘোষণা করিয়াছিলেন রাষ্ট্র বলিতে তিনি স্বয়ং। কিন্তু ইহাদের সেই রাষ্ট্র-রাজার অভিন্নত্ব ধারণা লুইর চাইতে আরও সম্পূর্ণ আরও কঠোর, অবিচ্ছেদ্য। রাজবংশে জন্ম বলিয়া, একমাত্র রাজ্যশাসনাধিকারদাত্রী রাণীর পাণিগ্রহণের দাবীতেই রাজা তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হইতে পারিতেন না, যদি সৃষ্টির গৃহীত তত্ত্বানুরূপ উৎসবাদির অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাকে যথারীতি অভিষিক্ত করা না হইত। এই অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন

করিয়া সৃষ্টির অর্থাৎ প্রাণদানের ক্ষমতা রাজার উপর আরোপিত করা যায় বলিয়া অনুমিত হইত। অতএব এ অনুষ্ঠান অপরিবর্জ্জনীয়, কেন না সৃষ্টি করা হইল রাজার প্রধানতম কর্ত্তব্য।

অভিষেক উৎসবে রাজা স্রষ্টার কার্য্য করেন। এই ক্রিয়ানুষ্ঠানে আরও কয়েকটি ছোটখাট বিধি প্রতিপালন করিতে হয়; সেই সমুদায়ের উদ্দেশ্য হইল বৃক্ষ ও পশু আকারে তাঁহার প্রজাগণের প্রয়োজনীয় খাদ্য সৃষ্টি করা। অভিষেককালে শস্য ও গৃহপালিত পশুর উৎকর্ষ ও স্বাস্থ্য রক্ষাকরণোপযোগী যাদুবলও রাজার উপর সংস্থাপিত হইত। অপর কথায় বলিতে গেলে তিনি যাদুকর ও প্রাণদাতা ছিলেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন রাষ্ট্রের শুভসাধনের প্রতীক।

মূল সৃষ্টির অনুকরণে রাজা তাঁহার প্রজাগণকে গড়িয়া তোলেন বলিয়া তাহারা মনে করিত। তাঁহার অভিষেক উৎসবের কালে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এবং যাহাতে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া একতাবন্ধনে সকলে আবদ্ধ থাকিয়া সুচারুরূপে রাষ্ট্র সংগঠন হইতে পারে তজ্জন্য তিনি দেশের প্রধান প্রধান লোকের সহিত নিজে যাইয়া সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন।

পনীশ্রেণীর ন্যায় আমেরিকান্ ইণ্ডিয়ানগণের মূল উৎসবাদির মধ্যেও অনুরূপ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল উৎসব-অনুষ্ঠানে জাতি বিভিন্ন দল-নেতার চতুষ্পার্শ্বে ঘিরিয়া দাঁড়ায়, যেন নেতা তাহাদের স্বর্গের দেবতা। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতের প্রাচীন রাষ্ট্র সংগঠনে এই প্রকারের বিধিবন্ধ পবিদৃষ্ট হয়। রাজাকে কেন্দ্র করিয়া রাষ্ট্রের যাহা কিছু এই বিধি-ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী হইতে হইত। রাজাকে বাদ দিলে রাষ্ট্রের বড় কিছুই থাকে না।

রাজাকে বিভিন্ন দেবতারূপে কল্পনা কবা হইত। রাজত্বের বিভিন্ন বাজ-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ হইল এই দেবতাগণ; অতএব স্বতঃসিদ্ধরূপে বলা যাইতে পারে দেবতারা রাজার স্ফুরিত শক্তির প্রকাশ মাত্র। রাজ-গুণের ধারা বিভিন্ন; সকল দিক দিয়াই রাজাকে পবিত্রদেহ অমর-লোকবাসী করিয়া তুলিবাব চেষ্টা প্রতিভাত হয়। তাই বাজত্ব গ্রহণের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম্মাদি সমস্তই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যরূপে গৃহীত হয। সেই জন্যই ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অপবাপর দেবতাগণের অস্তিত্ব আমরা দেখিতে পাই। ইঁহারা সকলেই সৌর দেবতা। সুতরাং রাজত্বের সহিত ইঁহাদের অপব আর এক বকমের যোগসূত্রও বিদ্যমান রহিয়াছে, কারণ রাজত্বও সৌরগুণসম্পন্ন। রাজা নিজে সূর্য্যদেব, গোমাতা অদিতির পুত্ররূপে পরিচিত হন। মূলতঃ ইহা অদ্বৈতবাদসম্মত রাজত্ব; কিন্তু একের মধ্যে বহু পরিস্ফুট গুণের সমাবেশ কল্পিত হইয়া থাকে।

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনতম ধর্ম্ম অদ্বৈতবাদ ধর্ম্মই বটে। একই ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণাবলীকে একাধিক দেবতার মধ্য দিয়া কল্পনা করা হইত। এই বহু রূপের কল্পনা হইতেই শেষে বহু-ঈশ্বরবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। মিশরে একই অসিরিস্ সৌরশক্তিরূপে হইলেন 'রী', সৃষ্টিকর্ত্তারূপে খনুম্ (Khnum), লিপিকর (recorder) রূপে হইলেন থথ্ (thoth)—এমনি বিভিন্ন রূপের মধ্যে তাঁহাকে কল্পনা করা হয়। ভারতবর্ষে অভিষেকের সময় রাজা নিজে পবিত্র হইয়া দেবতারূপে পরিণত হইতেন এবং তৎসঙ্গে নিজেকে প্রজাপতির[২২] পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেন (ভারতীয় অসিরিস্)। গ্রন্থান্তরে দেবতাগণও প্রজাপতির সন্তান বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং এই দিক দিয়া তাঁহারাও রাজার সহিত সমান আসনে প্রতিষ্ঠিত।

আদি পুরুষ হইলেন প্রজাপতি, সৃষ্টির ঈশ্বর; অতএব রাজার পিতা বা জনক। রাজার পিতা স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা, তাই তিনি দেবতাগণকে সৃজন করেন।

ভারতীয় ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থরাজিতে[১১] উক্ত হইয়াছে—দেবতাগণ যতদিন না স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করেন ততদিন পর্য্যন্ত দেবত্ব গ্রহণ করিতেন না। রাজা দেহশুদ্ধি করিয়া স্বর্গগমনে সমর্থ। রাজা ও রাণী সপ্তদশপার্শ্ব সম্বলিত স্তম্ভ অবলম্বনে স্বর্গারোহণ করেন। রাজা স্তম্ভের শীর্ষতম প্রান্তে উর্দ্ধে মস্তক উত্তোলিত করিয়া ঘোষণা করেন যে তিনি আকাশের উর্দ্ধ জগতে প্রয়াণ করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছেন; অনন্তর প্রচার করেন যে তিনি প্রজাপতির পুত্রত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছেন অর্থাৎ তিনি তখন দেবতা। স্বর্গভূমে পৌছিলে অমরত্ব লাভ হয়; তাই এইরূপে রাজা মৃত্যু-আশঙ্কা হইতে বিমুক্ত হইয়া দেবতা হইয়া থাকেন।

দীর্ঘায়ু লাভের আসক্তিতে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা চিন্তিত ব্যতিব্যস্ত। যাজকগণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অবিনশ্বরত্ব লাভই চরম পরিণতি বলিয়া প্রচার করেন। যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম্মাদি যাহা কিছু সমস্তই এই অবিনশ্বরত্ব লাভের নিমিত্তই অনুষ্ঠিত হইত। অগ্নি-বেদীর মন্দিরের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল জীবদ্দশায় আকাশের উর্দ্ধদেশে পৌছিয়া রাজার দেহ যেন অজরামর হইয়া থাকে। অজরামরত্ব লাভের নিমিত্ত যে উপায় অবলম্বিত হইত এখন তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। ইষ্টকনির্ম্মিত বিশালকায় শ্যেন পক্ষীর সাহায্যে একটি স্বর্ণাবয়ব মানবমূর্ত্তি ও একখানা স্বর্ণথালা আকাশে সংস্থাপিত হইত, কারণ আকাশ হইল আত্মা ও অবিনশ্বরত্বের মূলাধার। ব্রাহ্মণগণ দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিতেন স্বর্ণ অক্ষয়; তাই রাজার অবিনশ্বরত্ব লাভ কামনায় স্বর্ণের ব্যবহার অপরিহার্য্য ছিল।

আদিম মানব কি ভাবে কি হইতে যে 'আত্মা' অমর এবং মৃত্যুর পরেও আত্মা সজ্ঞানে সচেতন থাকে বলিয়া বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে, তাহার ব্যাখ্যাকল্পে যে সমস্ত জল্পনা-কল্পনা যুক্তি-তর্ক উপস্থাপিত হয় তন্মধ্যে স্যর এড্ওয়ার্ড টাইলর কৃত গ্রন্থে (যাহার উল্লেখ পূর্ব্বেও করা হইয়াছে) উল্লিখিত যুক্তির বেশ একটু বিশেষত্ব রহিয়াছে। অবিনশ্বরত্ব লাভের নিমিত্ত রাজাকে যথেষ্ট কালক্ষেপ এবং প্রভূত কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হইত। এইটুকু হইতে এই ধরণের সুখসাধ্য যুক্তি উপস্থাপিত করা যে কতদূর অযুক্তি সিদ্ধ ও অসংলগ্ন তাহা সহজেই অনুমেয়। রাজা সম্পূর্ণ মৌলিকতাহীন অভ্যাসসিদ্ধ উপায়ে এই অবিনশ্বরত্ব লাভ করিতেন। বস্তুতঃ তিনি দেহকে অমর করিয়া লইতেন যেন মৃত্যুর পরেও সে দেহে বাস করিতে পারেন। দেহের এইরূপ স্থায়িত্ব রক্ষা না করিতে পারিলে অমরত্ব লাভেও সমর্থ হইতেন না। আদি-মানবেরা তাহাদের স্বকীয় চেষ্টায় অমর হইত, কেবল কল্পনার জাল বুনিয়া অমর হওয়ার সাধ তাহাদের ছিল না। পৃথিবীর যেখানকারই নিদর্শন পাওয়া যায় সর্ব্বত্র, আদি ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম-বিশ্বাস মূলতঃ একই প্রকারের বলিয়া প্রতিভাত হয়। সম্পূর্ণ সহজকল্পিত ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া আত্মার অধিকার জ্ঞান বা ভবিষ্যৎ জীবনের উৎকর্ষ লাভের আকাঙ্খা গড়িয়া উঠে নাই; ইহা সম্পূর্ণ খেয়াল মত গঠিত রাজা সম্বন্ধে ধারণার উপর নির্ভর করিয়া। রাজা প্রাণ-দানের সমস্ত ধারাগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতেন এবং এতদ্বিষয়ে তিনিই ছিলেন একমাত্র অধিকারী।

কি প্রকারে এই মূল-সূত্র হইতে বিভিন্ন ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উৎপত্তি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। ধর্ম্মের ইতিহাস পর্যালোচনায় অত্যাবশ্যক সত্য—যাহা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কালে উৎসারিত হইয়া আসিয়াছে—সেই গুলি যাহাতে দৃষ্টি না এড়ায় তৎপ্রতি অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নভোজগতের ধারণা, সর্ব্বপ্রধান দেবতা, যাঁহাকে স্বর্গলোকের সূর্য্যদেবের সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হইত, তৎপুত্র যিনি পৃথিবীর শাসনাধিকারী রাজা প্রভৃতির কল্পনা, অতিপ্রাকৃত গর্ভাধানের ফলে রাজার জন্ম, সৃষ্টি-কালের কল্পিত ঘটনানুকরণে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকর্ম্ম দ্বারা রাজার দেহশুদ্ধি ও অভিষেক উৎসবের বিশিষ্ট আচরণসমূহ ইত্যাদি এবং জলপ্লাবনের কাহিনী, পৃথিবীর সৃষ্টি-কথা এবং সূর্য্যদেব-পুত্রের স্বর্গারোহণ-আখ্যান সমস্তই প্রত্যেক ধর্ম্মাচরণের অন্তর্গত প্রাণ-দান ক্রিয়াকাণ্ডের সারমর্ম্ম এবং মিশরে উদ্ভূত। দক্ষিণ মিশরের বিশিষ্ট নৈসর্গিক ঘটনানিচয়ের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া হিলিওপলিসের যাজকগণ যে সকল বিভিন্ন জল্পনা-কল্পনা বা অনুধ্যান করিয়াছেন তাহারই ফলে এই সকলের উদ্ভব।[১৪]

১) পূর্ব্বে উদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য।

২) যাঁহারা বিভিন্ন মানব পরিবারের ভাষা, ধর্ম্ম, রীতি-নীতি ও শরীর গঠনাদি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

৩) দেবোদ্দেশে তর্পণ দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত পানীয় (প্রধানতঃ সুরাসার)।

৪) *First Player.*

৫) *Here we Go Round.*

৬) নিম্নোক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে যথাক্রমে উদ্ধৃতাংশের সারাংশ সংগৃহীত হইয়াছে :
   ক) Papyrus of Ani, a recension of the Book of the Dead.
   খ) *Zeitschrift fur agnplische sprache.*

৭) "Thou makest plants to grow at thy desire... Thou art the chief and prince of thy brethern, thou art the prince of the company of the gods, thou establishest right and truth everywhere...Thou art exceedingly mighty, thou overthrowest those who oppose thee, thou art mighty of hand and thou slaughterest thine enemy..Thou hast made the earth by thine hand, and the waters thereof, and the winds thereof, and the herb thereof, all the cattle thereof, and all the four-footed beats thereof." (Ani lii).

৮) "The earth lies upon thine arm, and its corners upon thee even unto the four pillars of heaven. Dost thou stir thyself, the earth trembles and (the Nile) comes forth from the sweat

of thy hands. Thou providest the breath out of thy throat for the nostrils of mankind. Everything whereby man lives, trees and herbs, barley and wheat, is of divine origin and comes from thee... Thou art the father and mother of mankind, they live by thy breath, they eat the flesh of thy body" (Z, a, S, 38, 32).

৯) যীশুখৃষ্ট মৃত্যুর পূর্ব্ব রাত্রে শিষ্যগণের সহিত ভোজন করিয়াছিলেন; তৎস্মরণে খৃষ্টিয় সমাজে একটি ধর্ম্মক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাকে Eucharist বলে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত রুটি ও সুরা যীশুখৃষ্টের মাংস ও রক্তস্বরূপ আহার করা হয়। (The Modern Anglo-Bengali Dictionary, C. Guha.)

১০) *The Book of the Cave of Treasures*, pp. 18 and 19.

১১) *Gods and Men.*

১২) বিধাতা, ব্রহ্মা; বিশ্বকর্ম্মা। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ—এই দশজন সৃষ্টিকর্ত্তা। (সরল বাঙ্গালা অভিধান—সুবল মিত্র)।

১৩) বেদাংশ বিশেষ—ব্রহ্মন্ (বেদ)+ষ্ণ ইদমর্থে। (সরল বাঙ্গালা অভিধান—সুবল মিত্র)।

১৪) Prof. C. Elliot Smith প্রণীত In The Beginning" অবলম্বনে লিখিত; চিত্রগুলিও উক্ত পুস্তিকা হইতে গৃহীত।
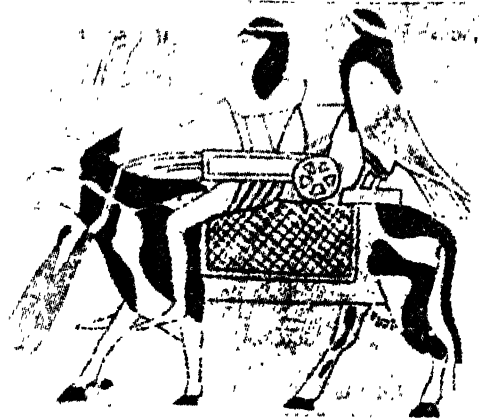
স্বর্গগাভী, হাথর, পাখির মত 'আত্মা' সহ মৃত ব্যক্তিকে স্বর্গজগতে বহন করিয়া নিতেছে।

❑ সৌজন্যে : ভারতবর্ষ ❑ ২৫ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৪৪

মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

হিরন্ময় চক্রবর্তী

কপিলাবস্তুর রাজপুত্রের মতো আকস্মিকভাবে না হলেও জীবনের কোনো না কোনো পর্বে আমরা সকলেই মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা উপলব্ধি করতে বাধ্য হই। সেই সঙ্গে একথাও মানতে হয় যে, ধর্মরূপী বকের উক্তি অনুসারে আমরা মৃত্যুর ধ্রুবত্ব বিস্মৃত হয়ে সংসারে জীবনের নিরন্তর দাবিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি। মৃত্যুর তুলনায় জন্মও কম রহস্যময় নয়। জন্ম ও মৃত্যুর গণ্ডি দিয়ে ঘেরা এই পার্থিব জীবনের মায়ায় মুগ্ধ হয়েই আমাদের অধিকাংশ কাল কেটে গেলেও ওই গভীব বিপরীত সীমান্তে কোনো লোকান্তরে আমাদের বিদেহী অস্তিত্বেরও এক জের চলে কিনা, সে সম্পর্কে কখনো কখনো কৌতূহল বোধ করি বইকী। কিন্তু মৃত্যুকে জীবনের অমোঘ পরিণতি বলে মেনে নিতে সকলেই প্রস্তুত হলেও জন্ম, মৃত্যু, পরলোক, পুনর্জন্ম প্রভৃতি জটিল বিষয়ে মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাস দেশ, কাল, পাত্র ও গোষ্ঠী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন চেহারা নিয়েছে। ইহজীবন মানুষের কাছে যতটা প্রত্যক্ষ, পরজীবন আদৌ নয়। তাই তার অস্তিত্ব নিয়ে কল্পনা, অনুমান, সংশয় ইত্যাদির অবকাশও প্রচুর। মৃত্যুকে কেউ তুলনা করেছেন এমন এক অজানা মহাদেশের সঙ্গে যেখান থেকে কোনো পর্যটকই আর ফিরে আসতে পারেনি। যদি পারত, তবে তার ভ্রমণ বিবরণ নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক হত, হয়তো অনেক সংশয়েরও নিরসন হত তখন।

আমাদের শাস্ত্রে কিন্তু এমন একজনের কাহিনি আছে যিনি মৃত্যুপুরীতে গিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারান্তে আবার ফিরে এসেছিলেন। শুধু তাই নয়, স্বয়ং মৃত্যু তাঁর কাছে মৃত্যু ও তৎসংশ্লিষ্ট রহস্য উদঘাটিত করে তাঁকে অমরত্বের দীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি হলেন নচিকেতা। হয়তো নচিকেতার উপাখ্যান এক রূপকমাত্র। মৃত্যু সম্পর্কে সনাতন ভীতিকে জয় করে তার মুখোমুখি হতে পারলে তবেই অমরত্বের সন্ধান মেলে—এই ধরনের কোনো ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যেই হয়তো সত্যনিষ্ঠ নির্ভীক কিশোরের মৃত্যুতীর্থ পরিক্রমার অবতারণা করা হয়েছে। তবে মৃত্যুর মুখ দিয়ে নচিকেতার উদ্দেশ্যে যে সকল বাণী উচ্চারিত হয়েছে, তা যে জীবন, জগৎ ও আত্মা সম্পর্কে মানুষের গভীরতম ও সূক্ষ্মতম উপলব্ধিরই এক পরিণত প্রকাশ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অতএব এই প্রাচীন আখ্যানের পুনরালোচনায় আমরা চিরন্তন সত্যের এক কালোত্তীর্ণ মহিমময় ব্যাখ্যার প্রত্যাশাই করতে পারি।

বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করে বাজশ্রবস মুনি যখন দক্ষিণাস্বরূপ কয়েকটি জরাজীর্ণ গাভীকে দান করতে উদ্যত হলেন তখন ওই অসাধু প্রয়াস সন্দর্শনে মর্মাহত পুত্র নচিকেতা পিতাকে জিজ্ঞাসা না করে পারলেন না যে, সর্বস্বদানের এই যজ্ঞে পিতা তাঁকে কার হস্তে সমর্পণ করছেন। পৌনঃপুনিক প্রশ্নবাণে উত্যক্ত হয়ে শিথিলজিহ্ব পিতা সহসা তাঁকে মৃত্যুর উদ্দেশ্যে দানের

অঙ্গীকার করে বসলেন। অতঃপর পিতৃবচন রক্ষার্থে সত্যশীল তরুণ নচিকেতা যাত্রা করলেন মৃত্যুরাজ্যে। মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর আশ্চর্যজনক সাক্ষাৎকারকে উপলক্ষ্য করে ভাবীকাল পেল এক অমৃতময় আত্মরহস্যব্যাখ্যান। মরণোত্তর অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের চিরন্তন কৌতূহল যে তার গূঢ়তম আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসারও জনক, সেই কাহিনিতে তারই পরিচয় পাই।

অগ্নিতুল্য তেজোরাশি নিয়ে অতিথি ব্রাহ্মণকুমার মৃত্যুলোকে যে গৃহে প্রবেশ করেন সেখানেই যেন আগুন জ্বলে ওঠে, আর তাঁব জ্বলন্ত তাপ প্রশমনার্থে জল ও পাদ্যার্ঘ নিয়ে সকলে তাঁর অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু যমরাজ নিজেই তখন অন্যত্র গেছেন। কাজে কাজেই নচিকেতা মৃত্যুনিলয়ে ত্রিরাত্রি উপবাসে কাটালেন। কিন্তু গৃহে ব্রাহ্মণ অতিথি উপবাসী থাকলে সেই অজ্ঞ গৃহস্বামীর আশা, প্রতীক্ষা, সজ্জনসঙ্গ, সুনৃতবাক্য, দান ও যজ্ঞেব ফল পুত্র ও পশু সবই ধ্বংস পায়। তাই ঘরে ফিরে সব শুনেই মৃত্যু আতিথেয়তার ত্রুটি সংশোধনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এক একটি উপবাসক্লিষ্ট রজনীর বিনিময়ে নচিকেতাকে একটি কবে বরদান করে তিনি ঋণমুক্ত হতে চাইলেন।

তাঁর সম্পর্কে পিতা যেন উদ্বেগমুক্ত ও প্রসন্নচিত্ত হন ও মর্ত্যে প্রত্যাবর্তনান্তে যেন তাঁকে সাদরে বরণ করেন, যমের কাছে নচিকেতার এই নিতান্ত মানবিক যদিচ গতানুগতিক প্রাথমিক বর প্রার্থনা অচির স্বীকৃত হল। কেমন কবে ও কোন অগ্নি প্রজ্বালকদের দ্বারা ভয়ক্ষুধাতৃষ্ণা জরামৃত্যুর অতীত স্বর্গরাজ্যের অধিবাসী বা দেবতা হয়ে অমরত্ব লাভ করা যায়, নচিকেতার এই দ্বিতীয় জিজ্ঞাসাকে ভোগলিপ্সু মানবতার উর্ধ্বচিন্তার প্রথম ধাপ বলা চলে। স্বর্গাদি লোকের উৎসস্বরূপ অগ্নির রহস্য ও তৎসংশ্লিষ্ট যজ্ঞে বিধির খুঁটিনাটি মৃত্যুর কাছ থেকে নচিকেতা অক্লেশে শিখে নিলেন। তাঁর এই আগ্রহ ও ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে যম তাঁকে একটি অতিরিক্ত বর দিলেন—ওই অগ্নি এখন থেকে নচিকেতার নামেই খ্যাত হবে। যম তাঁকে কর্মজ্ঞানও উপহার দিলেন। কিন্তু এই দুটি বরের অভীপ্সিত ঐহিক ও পারত্রিক সুখভোগ যে নচিকেতার কাছে নিতান্ত গৌণ ব্যাপার, তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য যে সুদূরতম ও গূঢ়তম রহস্যভেদ, সেকথা স্পষ্ট হয় তাঁর তৃতীয় জিজ্ঞাসা থেকে। নচিকেতার ওই অন্ত্য-প্রার্থনার অন্তর্নিহিত আস্পৃহার মধ্যে যেন মানবতাব অপাপবিদ্ধ কৈশোরের আকৃতিই শুনতে পাই। —'মৃত্যুর পর মানুষের কি হয় সে সম্পর্কে এই যে এক সংশয়ের কথা সুবিদিত, কেউ বলে যে, দেহমনেন্দ্রিয়বুদ্ধি হতে স্বতন্ত্র আত্মা বলে কিছুর অস্তিত্ব আছে, আবার কেউ বলে যে তা নেই। হে মৃত্যুরাজ, তুমি তো জান, তুমি বুঝিয়ে দাও।'

কিন্তু অধিকাবী বিচার না করে হেলায় বিতরণের মতো সুলভ জ্ঞান তো এ নয়। যমরাজ তাই অনেক চেষ্টা করলেন নচিকেতাকে নিরস্ত ও বিক্ষিপ্ত করতে। বিষয়টি যে অতীব সূক্ষ্ম এমনকী প্রাচীনকালের দেবতাবাও যে এ সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারেন নি, সে কথা শুনিয়েও নচিকেতাকে দমিয়ে দিতে পারা গেল না। তখন মৃত্যুরাজ তাঁর সামনে প্রলোভনের সমারোহ তুলে ধরলেন—শতজীবী পুত্রপৌত্রাদি, স্বর্ণ, হস্তী, অশ্ব, গোধন, বিশাল সাম্রাজ্য, দীর্ঘজীবন, যদৃচ্ছা বাসনাপূর্তি, রথবাহিতা সতূর্যা মর্ত্যবাসীর অলভ্যা মোহিনীদের

সেবা ইত্যাদি। কিন্তু নচিকেতা মূল জিজ্ঞাসায় অটল। কী হবে এই সব ভোগোপকরণে যখন আত্মার তুলনায় এরা সবই অসার, অনিত্য ও মৃত্যুর অধীন। মানুষ তো বিত্তে তৃপ্ত হবার নয়। তাছাড়া নচিকেতার মতো সত্যধৃতিবান প্রশ্নকর্তা পেয়ে মুগ্ধ হয়ে একসময় যমরাজ নিজেই স্বীকার করে বসলেন যে, কর্মফল কখনো শাশ্বত হতে পারে না। কারণ ক্ষণস্থায়ী সম্পদের মতোই লোকে তার অন্বেষণ করে, অধ্রুবের দ্বারা যে সুখ মেলে তা অনিত্য হতে বাধ্য। শাশ্বত নিধি যিনি সেই পরমেশ্বরকে যজ্ঞাদির দ্বারা পাওয়া যায় না। যজ্ঞের ফলে লভ্য স্বর্গসুখ ঐহিক সুখের তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী হলেও তার অবসান একদিন হবেই। যম নিজে একথা জেনেও অনিত্য দ্রব্যের সাহায্যে একদা নচিকেতাগ্নির সেবা করে যে মৃত্যুরাজের পদ বা তথাকথিত শাশ্বত স্বর্গ পেয়েছেন, তা অবশ্যই আপেক্ষিক ভাবে চিরন্তন। কিন্তু ধীরমতি নচিকেতা সংসারের সকল ঐহিক ও পারত্রিক প্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা ও অনিত্যতা। উপলব্ধি করে তাদের প্রত্যাখ্যান করলেন ও পরমবস্তুর অভীপ্সায় অটুট রইলেন। মৃত্যু তখন পরীক্ষার ফলে সন্তুষ্ট হয়ে নচিকেতাকে উপযুক্ত জ্ঞানে আত্মার রহস্য শেখালেন এবং যোগবিধি ও ব্রহ্মবিদ্যায় দীক্ষা দিলেন।

লৌকিক দেবদেবীর পাঁচালির উপাখ্যানে আমরা যেমন দেখি যে, বিরুদ্ধাচরণের পরিণাম দৈবী রোষ ও সমূহ বিপর্যয় এবং আত্মসমর্পণের ফল দাক্ষিণ্য ও ঐহিক সমৃদ্ধি নচিকেতার কাহিনির মধ্যে যেন তার একটি বিপরীত সুর লক্ষ করা যায়। মৃত্যুরাজ বলছেন যে অধিকাংশ লোকই শ্রেয়কে ছেড়ে অনিত্য সুখের আশায় প্রেয়কে বরণ করে। তারা পার্থিব ভোগসুখ, ধনৈশ্বর্য ও ইন্দ্রিয়সর্বস্ব মোহে অন্ধ হয়ে লোকান্তরকে উপেক্ষা বা অবিশ্বাস করে ঐহিক প্রাপ্তি আঁকড়ে পড়ে থাকে। এইসব অজ্ঞজনের কাছে সাম্পরায় বা পরলোকের পথ ধরা দেয় না। আত্মার সূক্ষ্ম ও গূঢ় তত্ত্ব তাদের কাছে চিরদিনই অজানা থেকে যায়, আর পরিণামে তারা বারংবার মৃত্যুর বিস্তৃত জালে ধরা পড়ে অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর অনন্তচক্রে আবর্তিত হয়ে দুঃখ পায়। এই সব মূঢ়গণ অবিদ্যাচ্ছন্ন হয়েও তাদের বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের গর্ব করে, ফলে তারা বঙ্কিম পথে ঘুরে ঘুরে অন্ধের দ্বারা চালিত অন্ধের ন্যায় দুর্গতি ভোগ করে।

মৃত্যু আরো বললেন যে, তর্কের দ্বারা আত্মাকে বোঝা যায় না, এটি শুনে শেখার বিষয়। একমাত্র ব্রহ্মবিদ অর্থাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতাপ্রাপ্ত আচার্যই আত্মার রহস্য শেখাতে পারেন। কিন্তু এর রহস্যের ব্যাখ্যা করবার ক্ষমতা যেমন মাত্র অল্প সংখ্যক আশ্চর্য বক্তারই আছে, তেমনি অনেক শ্রোতার মধ্য হতে এক-আধজন আশ্চর্য কুশল শিষ্যই এর উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এমনই এক যোগ্য শিষ্য হলেন নচিকেতা, তাই তিনি সংসারের সব আকর্ষণ তুচ্ছ করে যমের কাছে বলতে পারলেন—'পাপ-পুণ্য, কার্য-কারণ, অতীত-ভবিষ্যতের উর্ধ্বে যা আছে, তাই শেখাও।'

জন্ম মৃত্যুর রহস্য মানেই দেহাতীত অস্তিত্বের রহস্য অর্থাৎ আত্মার রহস্য। আর আত্মা শব্দটির ব্যঞ্জনা এত ব্যাপক, গভীর, গূঢ় ও সূক্ষ্ম যে তার প্রসঙ্গ মানেই অনন্তের সঙ্গে সম্ভক্ত সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম রহস্য। ভূমার অভীপ্সায় উদ্বুদ্ধ নচিকেতার কাছে এই রহস্যের

মর্ম উদ্ঘাটন করতে গিয়ে মৃত্যুরাজ শুধু আত্মার প্রকৃতিই ব্যাখ্যা করেননি, আত্মাকে কীভাবে জানা যায় সে কথাও কখনো আভাসে-ইঙ্গিতে কখনো বা অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন।

জন্ম-মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে আত্মার ধর্ম বোঝাতে গিয়ে যমরাজ বললেন যে, আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই । দেহকে বড় করে তাঁর বিনাশ ঘটানো যায় না। তিনি নিত্য, অজ, শাশ্বত, পুরাণ। তিনি সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্মতর, আবার মহৎ হতেও মহীয়ান তিনি সর্বগ। অশরীরী এই আত্মা নশ্বর শরীরে দৃঢ়ভাবে স্থিত, তিনি সর্বব্যাপী। আত্মা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ বা বিকারের অতীত, অতএব ক্ষয় বা পরিবর্তন ও বিনাশের ঊর্ধ্বে। যাঁর ক্ষয় বা বিনাশ নেই, তিনি শাশ্বত ও সেইহেতু অনাদি ও অনন্ত এবং পরিণামরহিত। আত্মার মৃত্যু নেই, মরণশীল হচ্ছে দেহ। অতএব মৃত্যু বলতে প্রকৃতপক্ষে বোঝায় দেহধারণের যারা হেতু স্বরূপ সেই অবিদ্যা, বাসনা ও কর্মফলকে। জ্ঞানলাভের পূর্বেই মানুষ মরণশীল, জ্ঞানলাভের পর সে অমরত্ব লাভ করে।

এই দেহ রথমাত্র, আত্মাকে তার রথী বলে জানা উচিত। বুদ্ধি হল সারথি মন বলগা, ইন্দ্রিয়বর্গ রথাশ্ব, আর ইন্দ্রিয়ের গোচর বিষয়সমূহ হল পথ। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান আসলে আত্মারই গোচরীভূত হয়, তাঁর অজানা কিছুই নেই। একাদশ-দ্বারযুক্ত এই দেহনগরের রাজা হলেন আত্মা। শুধু মানবদেহ কেন, বিশ্বের সবকিছুর মধ্যে এক অভিন্ন ও অবিভাজ্য আত্মাই বিভিন্নরূপে বিরাজ করছেন। আত্মাই প্রাণাদি বায়ু ও ইন্দ্রিয়সমূহের কার্য পরিচালনা করেন ও তাদের পূজা গ্রহণ করেন। মানুয প্রাণ বা অপান বায়ুর সাহায্যে বাঁচে না বাঁচে বায়ু, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির সমাবেশ যাঁর সেবার জন্য উদ্দীষ্ট সেই আত্মারই সাহায্যে।

এই আত্মা ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে নিম্নতম কীট পর্যন্ত সর্বভূতে গূঢ় হয়ে বিরাজমান, অথচ তিনি প্রকাশিত হন না, কারণ অজ্ঞান ও মোহের অন্তরালে তিনি প্রচ্ছন্ন। কিন্তু তাঁর দীপ্তিতে সবকিছু আলোকিত। এই আত্মা অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষরূপে অন্তরাত্মারূপে ও জীবের ভূতভব্যের ঈশান বা প্রভুরূপে অধূমক জ্যোতির মতো দীপ্যমান হয়ে সর্বদা সর্বজীবের হৃদয়ের নিভৃততম কন্দরে বা হৃদপদ্মের আকাশে অবস্থান করছেন। তিনি কোনো দীপ্তি বিকীরণ না করলেও সূক্ষ্মদর্শীরা তাঁদের সূক্ষ্ম-শুদ্ধ-ব্যগ্র বুদ্ধির সাহায্যে তাঁকে দেখতে পান।

আত্মার দর্শন পেতে গেলে চাই আন্তর প্রস্তুতি যে ব্যক্তির কদাচার হতে বিরত হয়নি বা ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযত এবং মনকে শান্ত ও সমাহিত করতে পারে নি, তার পক্ষে জ্ঞানের সাহায্যে আত্মাকে লাভ করা অসম্ভব। যার বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন নয়, মন যার অসংযত, যে সদা অশুচি, ইন্দ্রিয়বর্গ যার দুষ্ট অশ্বের ন্যায় অবাধ্য, সে আত্মাকে পায় না এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সংসারে পতিত হয়।

তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই আত্মা বেদাধ্যয়ন, মেধা কিংবা নিছক বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা লভ্য নন। কেবল অম্বিক্ষু সাধক যখন বাসনারহিত হয়ে শুধুমাত্র আত্মারই সন্ধানে মগ্ন থাকেন, তখন আত্মার দ্বারাই আত্মাকে লাভ করা যায়, অর্থাৎ আত্মা নিজেই এইরূপ লোকের নিকট আপন স্বরূপ ব্যক্ত করেন।

যাবতীয় বাহ্যবস্তু থেকে মনকে সরিয়ে একাগ্র করতে পারলে আত্মার ধ্যানের দ্বারা নিবিড়তম কন্দরে নিহিত আত্মাকে বুদ্ধির মধ্যে অবস্থিত বলে অনুভব কবা যায়। আত্মাকে তো কেউ চর্মচক্ষে দেখতে পায় না, পায় মনকে নিয়ন্ত্রণকারী বুদ্ধির দ্বারা ও নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানের সাহায্যে। মনসমেত চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয় যখন শান্ত এবং বুদ্ধি যখন নিষ্ক্রিয় হয়, সেই অবস্থাকে বলে পরমাগতি। ইন্দ্রিয়ের এই দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ বা ধারণকে বলে যোগ, কিন্তু একে স্থায়ী করতে গেলে সতর্কতার প্রয়োজন, কেননা এ যেমন আসে তেমনি চলেও যায়।

দেহের মধ্যে অবস্থিত হলেও আত্মার অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়ের অগোচর কেন? এর কারণ, পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়সমূহকে এমন বহির্মুখ করে গড়েছেন যে তাদের সাহায্যে কেবল বাহ্যবস্তুকেই জানা যায়, অন্তরাত্মাকে নয়। তৎসত্ত্বেও কোনো কোনো ধীর অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্রোতের মুখ উজানে ঘুরিয়ে দেবার মতো করে বাহ্যবস্তু থেকে ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক অভিনিবেশটি সরিয়ে নিয়ে অন্তর্মুখ হতে পারেন ও প্রত্যগাত্মার দর্শন লাভ করেন। কিন্তু অজ্ঞান ব্যক্তিগণ বাসনাতৃপ্তিকল্পে বাহ্যবস্তুর অলীক অন্বেষণেই মত্ত হয়ে মৃত্যুর শিকার হয়।

এই অন্তর্মুখীনতার সাহায্যে আত্মদর্শনের মধ্যে একটি গূঢ় সত্য নিহিত আছে। সাধনার লক্ষ্য হল প্রত্যক্ আত্মা, যার অর্থ সার বস্তু বা আন্তর তত্ত্ব। অন্যদৃষ্টিতে দেখলে যে তত্ত্বটি কাবণ বা বীজস্বরূপ, তাকে তার কার্য বা পরিণাম বা প্রকাশের প্রত্যগাত্মা বলা চলে। আবার একথাও সত্য যে, কার্য অপেক্ষা কারণ একটি সূক্ষ্মতর ও বৃহত্তর তত্ত্ব। অতএব কোনো কিছুর অন্তরাত্মা বা সারবস্তু তাব তুলনায় সূক্ষ্মতর ও মহত্তর এবং, বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে তার সৃষ্টির হেতুস্বরূপ। এইভাবে আত্মাকে দুটি দিক দিয়ে ধারণা করা যেতে পারে। এক, সৃষ্টি বা জন্য-জনক সম্পর্কের আলোকে কার্য থেকে কারণে প্রত্যাবর্তনের দিক দিয়ে এবং দুই, স্থূল হতে সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র হতে মহতে উজিয়ে যাওয়ার দিক দিয়ে।

বিশ্বের মূলে একটিই পরমতত্ত্ব থাকলেও সৃষ্টিতে তার প্রকাশ, বিকাশ বা বিবর্তন রূপ নিয়েছে আরো অনেক তত্ত্বকে আশ্রয় করে। এই তত্ত্বগুলির পরস্পরের মধ্যে এক জন্য-জনক সম্পর্ক বর্তমান, আবার তেমনি একটি সূক্ষ্ম হতে স্থূলের পর্যায়ক্রমে এরা বিন্যস্ত। অথবা, যেন একের পর এক কোশ সাজানো আছে এক সূক্ষ্মতার পর্যায়ক্রম অনুসারে। এই ক্রমবিন্যস্ত তত্ত্বপরম্পরায় যে কোনোটিই তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী অর্থাৎ সূক্ষ্মতর তত্ত্বের পরিমাণস্বরূপ এবং সেই সঙ্গে আবার অব্যবহিত পরবর্তী স্থূলতর তত্ত্বটির কারণস্বরূপ। এইভাবে বিশ্বজগৎকে যেন এক বিরাট বিবৃত্ত কার্য-কারণ শৃঙ্খল বলে বিবেচনা করা চলে যার একপ্রান্তে রয়েছে আদিতম ও সূক্ষ্মতম কারণ ও অন্যপ্রান্তে রয়েছে স্থূলতম কার্য বা প্রকাশ। সাধনার লক্ষ্য হল উজান পথে সূক্ষ্মতর সকল পর্যায় অতিক্রম করে চৈতন্যের বীজময় সূক্ষ্মতম স্তরে বা প্রত্যগাত্মায় উপনীত হওয়া।

যে হেতু বিষয় হতেই ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, অতএব বিষয় ইন্দ্রিয়াপেক্ষা সূক্ষ্মতর ও মহত্তর এবং সেই সঙ্গে তা ইন্দ্রিয়ের আত্মাস্বরূপ। এইভাবে পর্যায়ক্রমে বিষয় হতে মন, মন হতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হতে মহৎ বা হিরণ্যগর্ভ হলেন সূক্ষ্মতর মহত্তর সেই সঙ্গে পূর্বোক্তটির আত্মাও

বটে। হিরণ্যগর্ভকে যে মহৎ বলা হয় তার কারণ তিনি হলেন মহত্তম। অব্যক্ত অর্থাৎ মূলা প্রকৃতি বা মায়ার প্রথম জাতক এই মহৎ। তিনি বুদ্ধি ও ক্রিয়াসম্পন্ন। আর মহৎকেও অতিক্রম করলে যাঁর দেখা মেলে সেই অব্যক্ত হলেন নিখিলবিশ্বের বীজসত্তা, নামরূপের বিকারাতীত অবস্থা, সকল কারণ ও কার্যের ভব্যার্থের সময়ে। তিনি পরমাত্মায় ওতপ্রোতভাবে প্রবিষ্ট। তাঁর অপর নাম হল অব্যাকৃতি, আকাশ ইত্যাদি। এই অব্যক্তের ও অতীত যিনি, তিনিই হলেন পুরুষ, সকল কারণের কারণ, সকল কিছুর প্রত্যগাত্মা ও সর্বাপেক্ষা মহৎ। সব কিছুকে পূর্ণ করেন বলেই তাঁকে বলা হয় পুরুষ। আর এই পুরুষই হচ্ছেন চরম ও পরম তত্ত্ব, সূক্ষ্মতম ও গূঢ়তম উপলব্ধির বিষয়। তার পরে আর কিছুই নেই, তিনিই সবকিছুর সীমা, পরাগতি।

প্রাণাদি সকলে যখন ঘুমায়, তখনো এই পুরুষ জেগে থেকে অবিদ্যার সাহায্যে কামনার বস্তুসকল নির্মাণ করেন। অব্যক্ত থেকে জড়বস্তু পর্যন্ত নিয়ে যে সনাতন সংসারবৃক্ষ তার মূল উর্ধ্বে, শাখা নিম্নে! সেই মূল হলেন শুদ্ধ ব্রহ্ম। নিখিলজগৎ এই ব্রহ্ম হতেই সৃষ্টি, উদ্যতবজ্রসদৃশ তাঁর নির্দেশে ও প্রচণ্ড ভয়েই এই জগৎ চলছে। আর এই পুরুষই হলেন শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, শাস্ত্রে তাঁকেই অমৃত বলা হয়ে থাকে। তিনিই লোকসমূহের আশ্রয়, তাঁকে কেউ পার হতে পারে না।

এই পুরুষ বা আত্মারূপ পরতত্ত্বের উপলব্ধির অভিযানে সূক্ষ্মতার আরোহক্রমে প্রাজ্ঞসাধক একের পর এক স্থূলতত্ত্বকে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতত্ত্বে টেনে নেবেন, যথা ইন্দ্রিয়কে তিনি ডুবিয়ে দেবেন মনের মধ্যে, মনকে বুদ্ধির মধ্যে এবং বুদ্ধিকে মহৎ আত্মা বা হিরণ্যগর্ভের মধ্যে (অর্থাৎ বুদ্ধিকে করে তুলবেন হিরণ্যগর্ভের মতো নির্মল), আর অবশেষে এই মহৎ আত্মাকেও নিমজ্জিত করবেন মূল বা শান্ত আত্মা যেখানে কোনো অবস্থান্তব বা বিকার নেই এবং যা সকলের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে বুদ্ধ্যাদি পরিণামের সাক্ষিস্বরূপ বিরাজমান। অজ্ঞতাপ্রসূত ও দুঃখমূল নামরূপকর্মকে পুরুষের মধ্যে এইভাবে মিশিয়ে দিয়ে মুক্তিলাভের এই পথকে জ্ঞানীরা ক্ষুরধারার মতোই কঠিন ও দুর্গম বলে আখ্যা দিয়েছেন। অজ্ঞানের ঘোর নিদ্রা ভেঙে জেগে উঠে শ্রেষ্ঠকে এইভাবে লাভ করার পর উত্তম আচার্যের নিকট শিক্ষালাভ করে আত্মার অনন্ত রহস্য উপলব্ধি করতে হয়।

আত্মার সম্বন্ধে এই উপলব্ধি হওয়া প্রয়োজন যে নামরূপের বিকারের মধ্যেও যেমন তিনি আছেন, তেমনি আবার সকল বিকারের উর্ধ্বে তাঁর এক স্বরূপ সত্য আছে। অবশ্য প্রথম উপলব্ধিটি ঘটলে, দ্বিতীয়টিও ঘটবে। অগ্নি যেমন দাহ্যবস্তুভেদে এবং বায়ু যেমন আকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে সর্বভূতান্তরাত্মাও তেমনি মূলত এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও জীবভেদে তাঁর রূপের বৈচিত্র্য ঘটে, আবার তাঁর অরূপ সত্তাও বর্তমান।

অবিনশ্বর আত্মাকে জানলে ভয় দূর হয়। আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শাশ্বত শান্তি ও সুখ লাভ করেন। সূর্যের আলোতে দৃষ্টিগোচর সকল বস্তু আলোকিত হলেও যেমন তাদের বাহ্যদোষ সূর্যকে লিপ্ত করতে পারে না, তেমনি সর্বভূতান্তরাত্মাও জগতের বাহ্য দুঃখে নির্লিপ্ত থাকেন।

'আমিই সেই সর্বব্যাপী মহান পরমাত্মা' এই কথা জেনে তাই ধীরব্যক্তি শোকোত্তীর্ণ হন। এই অভেদদর্শনই আত্মদর্শনের সার কথা। পর্বতের উচ্চপৃষ্ঠে পতিত বৃষ্টির জল যেমন শতধারায় চতুর্দিকে গড়িয়ে পড়েও হারিয়ে যায়, তেমনি নামরূপের বিভিন্নতায় বিভ্রান্ত যে অজ্ঞব্যক্তি দেহবৈচিত্র্যের আকর্ষণে সাড়া দিয়ে সেই ভিন্ন ভিন্ন দেহীদের পিছনেই ছোটে সে-ও পরিণামে বারংবার জন্ম গ্রহণ করে ভিন্ন ভিন্ন দেহের খাঁচায় বন্দী হতে বাধ্য হয়।

তাই ধাতুপ্রসাদ বা মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযমের সঙ্গে সঙ্গে চাই বাসনামুক্তি। এই বাসনা আত্মার ধর্ম নয়, তা অবিদ্যার ফসল এবং ভ্রান্তবুদ্ধিই তার আশ্রয়। আত্মার স্বরূপ সত্য দর্শনের ফলে হৃদাশ্রিত বাসনা সকল খসে পড়ে, কেননা আত্মজ্ঞান হলে বাসনার বস্তু বলে আর কিছুই থাকে না। সকল বেদান্তেরই এই শিক্ষা যে, ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদদর্শনের ফলে অবিদ্যাপ্রসূত ভ্রান্তসংস্কার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সুদৃঢ় হৃদগ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হয় এবং মানুষ ইহলোকেই ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হয় ও অমরত্ব অর্জন করে। মৃত্যুর আকর যে অবিদ্যা, বাসনা ও কর্ম, তার বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধনমুক্তি ঘটে, সংসারে যাতায়াতের প্রয়োজন লোপ পায়। কিন্তু দেহত্যাগের পূর্বেই অর্থাৎ ধরণীর বুকে থাকতে থাকতেই এই আত্মোপলব্ধি কর্তব্য নতুবা পুনরায় দেহধারণ অবশ্যম্ভাবী। তার কারণ, আত্মাকে দর্পণে মুখের ন্যায় দেখা যায় কেবল নিজের মধ্যে, অর্থাৎ দেহী মানুষের মধ্যে লোকান্তরে তার উপবিষ্ট অস্পষ্ট। অবশ্য ব্রহ্মলোকের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু সাধনা ভিন্ন সেই লোকেও পৌঁছোনো যায় না।

মৃত্যুর পর মানুষের কী হয়? ইহলোকেই ব্রহ্ম হয়ে যারা ব্রহ্মলাভে অসমর্থ হয় তাদের সম্পর্কে যম বলেছেন যে, মানুষের হৃদয় থেকে যে একশো একটি নাড়ী বেরিয়েছে, তাদের মধ্যে সুষুম্না নামক নাড়ীটি মূর্ধা ভেদ করে নির্গত হয়েছে। মৃত্যুর সময় হৃদিস্থিত আত্মাকে যদি ওই নাড়ীর সঙ্গে যুক্ত করে নিষ্ক্রান্ত হওয়া যায়, তবে আপেক্ষিক অমরত্ব লাভ হয়, অর্থাৎ যে পর্যন্ত না উপাদানসমূহ বিশ্বে লীন হচ্ছে তদবধি অমর হওয়া যায়। অপরপক্ষে অন্য নাড়ী দিয়ে আত্মার নিষ্ক্রমণ হলে সংসারে পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। তখন ইহজীবনের কর্মের ফল ও জ্ঞানের প্রকৃতি অনুযায়ী অজ্ঞজনেরা পুনরায় উপযুক্ত দেহধারণার্থে জননীগর্ভে প্রবেশ করে, আর নিকৃষ্টতর ব্যক্তিরা এমন কী বৃক্ষাদি অচলবস্তুতেও পর্যবসিত হয়।

'তারপর মৃত্যুকথিত এই বিদ্যা ও যাবতীয় যোগবিধি লাভ করিয়া নচিকেতা বিরজ ও বিমৃত্যু হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইলেন, এইরূপে আত্মার প্রকৃতি জানিতে পারিলে অন্যেরাও তাহাই হইবেন।'

'মৃত্যুকথিত নচিকেতার সনাতন উপাখ্যান শুনিয়া আবৃত্তি করিয়া মেধাবী ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে মহিমা লাভ করেন।'

'যে কেহ এই পরম গুহ্য বিষয় ব্রাহ্মণসভায় অথবা শ্রাদ্ধকালে প্রযত্নসহকারে শুনাইবেন তিনিই অমরত্ব লাভ করিবেন, তিনিই অমরত্ব লাভ করিবেন।'

❑ সৌজন্যে অন্বিষ্ট, ১৯৭৫, বিশেষ প্রয়াণ সংখ্যা, কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত।

স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সকালবেলা খবরের কাগজ খুললেই দুই একটা আত্মহত্যার সংবাদ পাওযা যায়। দরিদ্রের পক্ষে জীবনের সংগ্রাম এমনই কঠোর হয়ে পড়েছে যে, অনেকের পক্ষে বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তারা মরণের কোলে চিরবিশ্রাম লাভ করে। জীবনে যাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত, অথচ জ্ঞানী, তাঁদের মধ্যেও অনেকে সম্মুখে শান্তি পারাবারের সন্ধান করেন। একজন কবি তাঁর গানে ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি জীবনের 'তৃষিত মরু' ছেড়ে পরলোকের 'রসাল নন্দন বনে' শাশ্বত আশ্রয় আকাঙ্ক্ষা করেন। দুরারোগ্য ব্যাধির কবল থেকে মুক্তির জন্য কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করতে চান। কেউ বা প্রিয়জনদের হারিয়ে দারুণ নিঃসঙ্গতার হাত থেকে মুক্তি পেতে চান করুণাময় জগদীশ্বরের আশ্রয়ে। আবার এমন কতক লোক আছেন, যাঁরা সমস্ত কর্তব্য শেষ করে আর বেঁচে থাকার সার্থকতা খুঁজে পান না। অনেকে জরাগ্রস্ত হয়ে সম্পূর্ণ পরবশ হওয়াকে অসম্মানজনক মনে করে নিজেদের জীবনাবসান করতে ইচ্ছুক হন।

সাম্প্রতিককালে উল্লিখিত অবস্থায় সসম্মানে মৃত্যুবরণের (enthanasia) বৈধতা সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক চলছে। নৈতিক দিক থেকে চিন্তা করলে মনে হয় যে জীবন আমি সৃষ্টি করিনি, সেই জীবনকে নষ্ট করার অধিকার আমার আছে কিনা। কেউ বলতে পারেন, সে দেহকে আমি অন্নপানাদি দ্বারা পুষ্ট করেছি, তাকে নষ্ট করার অধিকারও আমার আছে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রকার বলেছেন, বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাংপ্রতম্; বিষের গাছকেও বড় করে নিজে কাটা উচিত নয়।

বর্তমানে অধিকাংশ সভ্য দেশে আত্মহত্যা প্রচেষ্টা নিন্দিত এবং আইনত দণ্ডনীয়।

দেখা যাক, এ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রকারেরা কি মত পোষণ করতেন। সাধারণত স্মৃতিশাস্ত্রের মতে, আত্মহত্যা বা তার চেষ্টা পাপজনক। পরাশর বলেছেন (৪।১-২) যে, অত্যন্ত গর্ব, ক্রোধ বা দুঃখ হেতু কোনো নরনারী উদ্বন্ধনে জীবননাশ করলে তাকে নরকস্থ হতে হবে। মনুস্মৃতিতে (৫।৮৯) আছে যে, আত্মঘাতীর আত্মার উদ্দেশ্যে উদক দান নিষিদ্ধ। 'মহাভারতের' (আদি ১৭৯।২০) মন্তব্য এই যে, এইরূপ ব্যক্তির আত্মার পক্ষে আনন্দময় লোকের দ্বার রুদ্ধ। বশিষ্ঠধর্মশাস্ত্র'র (২৩।১৪-১৬) কড়া নির্দেশ, আগুনে পুড়ে, জলে ডুবে, পাথরে মাথা ঠুকে, অস্ত্র বা বিষের দ্বারা অথবা ফাঁসি দিয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার আত্মার উদ্দেশ্যে পারলৌকিক কৃত্য করা হবে না। এই গ্রন্থের মতে (২৩।১৮), আত্মহননের সংকল্পও প্রায়শ্চিত্তার্হ। ধর্মশাস্ত্রকার যমের (২০-২১) মতে, আত্মহত্যার প্রচেষ্টার পরে কেউ বেঁচে থাকলে তাকে গুরু অর্থদণ্ড দিতে হবে; আর মরে গেলে তার দেহটিও অপবিত্র দ্রব্য মাখাতে হবে। মৃত ব্যক্তির স্বজনদেরও নিষ্কৃতি নেই। তার বান্ধব ও পুত্রদের প্রত্যেককে বেশ কিছু অর্থদণ্ড দিতে হবে এবং বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

আত্মহত্যার নিন্দাসূচক বিধান সত্ত্বেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই কঠোর মনোভাবের পরিবর্তে কোমল দৃষ্টি লক্ষিত হয়, এমনকী স্থলবিশেষে মৃত্যুবরণও বিহিত হয়েছে।

ব্রহ্মহত্যার পাপের স্খলনার্থে তীরন্দাজের শরাঘাত বা অগ্নিদাহে মরণবরণ বিধেয় (মনু ১১।৭৩, যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২৪৮)। ব্রাহ্মণের পক্ষে সুরাপান এবং অন্য কিছু মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তও ছিল মৃত্যুবরণ; তপ্ত সুরাপান ছিল অন্যতম পদ্ধতি।

এর বিরুদ্ধ মতও ছিল। হারীতের প্রমাণ উদ্ধৃত করে আপস্তম্ব বলেছেন (১।১০।২৮।১৫-১৭) যে, মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত অসমীচীন।

'মহাভারতে' (শল্য ৩৯।৩৩-৩৪); অনুশাসন ২৫।৬২-৬৪ এবং 'মৎস্যপুরাণ' ১৮৬।৩৪-৩৫) ব্যবস্থা আছে যে, পুনর্জন্মের আবর্তন থেকে মুক্তিলাভের জন্য প্রয়াস, বারাণসী প্রভৃতি তীর্থস্থানে বা হিমালয়ে উপবাসাদি দ্বারা প্রাণত্যাগে কোনো পাপ হয় না। অমরকণ্টক পর্বতের শৃঙ্গ থেকে লাফিয়ে পড়ে মরণ হলেও কোনো দোষ নেই।

কতক লেখে উক্তরূপে মৃত্যুবরণ দৃষ্টান্ত আছে। যশস্করণ দেবের খৈরহা লেখ (১০৭৩ খ্রিস্টাব্দ) থেকে জানা যায় যে, রাজা গাঙ্গেয় মোক্ষকামনায় সপত্নীক প্রয়াগের অক্ষয়বটমূলে দেহরক্ষা করেছিলেন। (দ্রঃ এপিগ্রাফিআ ইন্ডিকা, ১২, পৃ. ২০৫, ২১১)। চন্দেলবংশের বাজা ধঙ্গদেব পরিণত বয়সে প্রযাগে জীবন বিসর্জন করেছিলেন (ঐ, ১, পৃ. ১৪০)। চালুক্যরাজ সোমেশ্বর ১০৬৮ খ্রিস্টাব্দে তুঙ্গভদ্রা নদীতে সলিল সমাধি বরণ করেছিলেন (এপিগ্রাফআ কার্নাটিকা, ২, এস. কে. ১৩৬)। 'রঘুবংশে' (৮।৯৪) কালিদাস লিখেছেন যে, রাজা অজ বৃদ্ধবয়সে বোগজনিত স্বাস্থ্যভঙ্গ হলে উপবাস করে গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমস্থলে নিমজ্জিত হয়ে চিরশান্তি লাভ করেছিলেন। ৪২ সংখ্যক গুপ্ত-লেখে আছে যে, সম্রাট কুমারগুপ্ত শুষ্ক গোক্ষসের অগ্নিতে প্রবেশ কবেছিলেন। কেউ কেউ মনে কবেন, এতে বোঝায় যে, তাঁর মৃতদেহ এইরূপ আগুনে দাহ করা হয়। কিন্তু, তা হলে এই ঘটনা লেখে স্থান পেত বলে মনে হয় না।

বিশেষ কতক ক্ষেত্রে বানপ্রস্থ আশ্রমে মহাপ্রস্থান করে মৃত্যুবরণ বিহিত হযেছে। যে কোনো লোকের পক্ষে অগ্নিপ্রবেশ, নিমজ্জন, উপবাস অথবা পর্বতপৃষ্ঠ থেকে পতন প্রভৃতি উপায়ে জীবনাবসানে কোনো দোষ নেই বলে শাস্ত্রে বিধান আছে।

অত্রির মতে (২১৮-২১৯), অতিবৃদ্ধ (অর্থাৎ সত্তরোর্ধ্ব), দুর্বলতাবশত শারীরিক শৌচে অক্ষম ব্যক্তি অথবা অপ্রতিকার্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি পর্বতপৃষ্ঠ থেকে পতন, নিমজ্জন বা উপবাসের দ্বারা আত্মোৎসর্গ করেন, তাতে কোনো পাপ হয় না। এইরূপ ব্যক্তির মৃত্যুতে তিন দিন অশৌচ পালনীয় ও শ্রাদ্ধ বিহিত।

যাজ্ঞবল্ক্যের টিকা অপরার্ধে (পৃ. ৫৩৬) যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হয়েছে তাঁদেরও মত অনুরূপ। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে, এইরূপ মৃত্যু বৈধ তো বটেই, বরং তপস্যা অপেক্ষাও শ্রেয়।

'রামায়ণে' (অরণ্য. ৯) আছে যে, শরভঙ্গ মুনি অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন।

'মৃচ্ছকটিকে' (১।৪) লিখিত আছে যে, রাজা শূদ্রক অনুরূপ উপায়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

বেদে আছে—ননুচ তস্মাদুহ ন পুরায়ুষঃ স্বঃ কামী প্রেয়াৎ; স্বর্গকামী ব্যক্তির পক্ষে নির্দিষ্ট আয়ুষ্কালের সমাপ্তির পূর্বেই জীবননাশের প্রয়াস নিষিদ্ধ।

মনুর (৬।৩২) টীকায় মেধাতিথি মন্তব্য করেছেন যে, উক্ত শ্রুতিতে সর্বক্ষেত্রে আত্মহনন নিষিদ্ধ হয়নি।

'বাজসনেয়ী সংহিতা'য় (৪০।৩) একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, আত্মহননকারী ব্যক্তি অন্ধ তমসাচ্ছন্ন অসুরলোকে প্রবেশ করে। এখানে কারও কারও মতে, আত্মহনন শব্দে বোঝায় আত্মা বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা।

'উত্তররামচরিতে' (৪। তৃতীয় শ্লোকের পরে) এবং 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' (৪।৪।১১) উক্ত শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক আছে।

'রাজতরঙ্গিণী' (৬।১৪১১)-তে আছে যে, এমন কতক রাজকর্মচারী ছিলেন, যাঁদের কাজ ছিল রাজাকে জানানো রাজ্যে কেউ মৃত্যুসংকল্প করে উপবাসী হয়ে আছে কিনা।

জৈনগণের শাস্ত্রে বিশেষ অবস্থায় মৃত্যুবরণ পুণ্যজনক বলে উক্ত হয়েছে। সমন্তভদ্রের (আঃ খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক) 'রত্নকরণ্ডশ্রাবকাচার' গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে 'সল্লেখনা' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে।[১] এর অর্থ হল বিপদকালে, দুর্ভিক্ষে, অত্যন্ত জরাগ্রস্ত অবস্থায় এবং অচিকিৎসা রোগে আনুষ্ঠানিক ভাবে দেহত্যাগ। (সিরোহি রাজ্যের) কালন্দ্রি লেখে (আঃ ১৩৮৯ সংবৎ) আছে যে, প্রায়োপবেশনে একদা জৈন আত্মহত্যা করেছিলেন। (দ্রঃ এপিগ্রাফিআ ইন্ডিকা, ২০, পরিশিষ্ট পৃ. ২৮, সংখ্যা ৬৯১)।

সল্লেখনাকে ঝোঁকের মাথায়, ক্রোধবশে বা সাময়িক মস্তিষ্ক বিকৃতি হেতু আত্মহত্যার মতো বলা যায় না।

গ্রীক্ মেগাস্থিনিসের (খ্রি. পূ. চতুর্থশতক) ভারত বিবরণে আছে (দ্রঃ ম্যাক্ ক্রিন্ডল্, পৃ. ১০৬) কলনোস নামক ভারতীয় যোগী পুরুষ তিয়াত্তর বছর বয়সে মরণ বরণ করেছিলেন। এর থেকে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে, হয়তো বা তার পূর্বেও ধর্মীয় ব্যাপারে আত্মহননের প্রচলন অনুমান করা যায়। স্ট্রাবো (১৫।১।৪) লিখেছেন যে, রোমের সম্রাট অগস্টাস সীজারের নিকট আগত ভারতীয় দূতের সঙ্গে একজন যোগী এসেছিলেন এবং জ্বলন্ত অনলে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন।

কতক পুরাণে, যথা 'বৃহন্নারদীয়' (পূর্বার্ধ ২৪।১৬), মহাপ্রস্থান অবলম্বনে বা অগ্নি অথবা জলে প্রবেশপূর্বক মৃত্যুবরণ নিন্দিত এবং কলিবর্জ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই পুরাণের রচনাকাল আনুমানিক খ্রিস্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগ।

১. দ্রঃ টি. কে. তুকলের প্রবন্ধ Sallekhana is not suicide Annals Bhanharkar বর্তমান Oriental Research Institute, Poone, 1982, p. 354.

উল্লিখিত বিবরণে দেখা যায় যে, মৃত্যুবরণের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি আছে। সেকালে যে সকল অবস্থায় আত্মহত্যা বিহিত ছিল, একালেও সেই সব অবস্থা আছে। তবে, পুণ্যার্জনের জন্য মৃত্যুবরণ বর্তমান যুগে ব্যাপক অনুমোদন লাভ করবে না। জীবন যুদ্ধে পর্যুদস্ত ব্যক্তি এরূপ করলে তাকে পলায়নপর কাপুরুষ বলা হয়। নানা দেশে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, পরবশ জরাগ্রস্ত বা দুরারোগ্য রোগক্লিষ্ট লোক স্বেচ্ছায় মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে।

এরকম অসহায় অনেক লোকের হয়তো মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার শক্তি বা সাহস থাকে না। এরূপাবস্থায় চিকিৎসক বা অন্য কেউ বিযাক্ত ইন্‌জেকস্‌ন প্রভৃতি দ্বারা তাদের মৃত্যু ঘটালে কোনো দোষ হয় না, এমত অনেকে পোষণ করেন। একে বলে হয়ে থাকে mercy killing বা সানুগ্রহ বা সানুকম্প হত্যা।

এরূপ মৃত্যু আইনসিদ্ধ বলে ঘোষিত হলেও এর নৈতিকতা বা বৈধতা সম্বন্ধে সংশয় কারও কারও মনে থেকেই যাবে।

কাশীমবাজার সতীর ঘাট

এই কাশিমবাজারেই রয়েছে সতীদাহের ঘাট। যা অতীতের স্মৃতি বহন করছে। এই সতীদাহের ঘাটেই ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে একজন সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় বিধবার 'সতী' হওয়ার উল্লেখযোগ্য ঘটনা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেন মিঃ হলওয়েল। তখন কাশিমবাজার কুঠীর প্রধান (১৭৪১-৪৩ খ্রিঃ) ছিলেন ফ্রান্সি রাসেল। বিধবা মহিলারা সব বান্ধবী, স্থানীয় সব সওদাগর এবং লেডী রাসেলও সদ্যবিধবাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যাতে সে সহমরণ থেকে বিরত হয়। বিধবার ছিল অবর্ণনীয় সহ্যশক্তি। মহিলা তাঁদের কথা অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করে নিজের একটি আঙুলকে আগুনে ধরে রাখেন আর অপর হাতের তালুতে একটি জ্বলন্ত আগুনের টুকরো রেখে তাতে ধূপ ছিটিয়ে দিয়ে সেই হাত দুলিয়ে দুলিয়ে তার ধোঁয়ায় উপস্থিত ব্রাহ্মণদেরকে আরতি করতে থাকেন। তখনই মুর্শিদাবাদের ফৌজদার হুসেইন শাহের অনুমতি এসে পৌছায়। মহিলা দৃঢ়চিত্তে নির্ভয়ে চিতায় উঠে আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে সতী হন। সেই স্থানটি কাশিমবাজারে 'কৃপাময়ী' কালীবাড়ীর নিকটে আদিগঙ্গার পাড় বরাবর কিছুটা এগিয়ে 'পাতালেশ্বর শিবমন্দির'-এর একটু পরেই অবস্থিত এবং 'সতীর ঘাট' নামে পরিচিত। এখানে একজোড়া শিবমন্দির ছিল। তার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত এবং অপরটিও অবলুপ্তির পথে। স্থানটির পাশ দিয়েই ছিল আদিগঙ্গার প্রবাহ। কালের গতিতে আদিগঙ্গাও কিছুটা দূরে সরে গেছে।

দেবভাষা বর্ষ ৩, সংখ্যা-৪, অক্টোবর ১৪০১ হতে পুনর্মুদ্রিত।

অনশন

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অনশন সাধারণত উদ্দেশ্যমূলক; ধর্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে, মন্ত্রতন্ত্রের পদ্ধতি প্রকরণে বা সামাজিক প্রথানুসারে অনশন পালন করা হইয়া থাকে। কু কর্মের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে এবং দেবতাদিগের সন্তোষবিধানের জন্য অথবা শোকসূচক বাহ্য অনুষ্ঠানরূপেও অনেকে এই অনশনধর্ম অবলম্বন করিয়া থাকেন। সংস্কার-সম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠানের পূর্বেও অনেকে এই অনশন-ব্রত পালন করেন। স্বপ্ন অথবা অলৌকিক দর্শন-বিষয়ে ইহার প্রভাব যথেষ্ট। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অবস্থায় উপরি-উক্ত কোন কোন কারণে অনশনের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐগুলি ব্যতীত আরও অনেক কারণও ইহার উৎপত্তির অন্তরালে থাকিতে পারে। অতি প্রাচীনকালে খাদ্যাভাবে বাধ্য হইয়া মানুষকে কখনও কখনও অনশনে থাকিতে হইত; এইরূপে অনশনে থাকার জন্য মানুষের মনে কিংবা স্বাস্থ্যে সময়ে সমেয় যে সুফল ফলিত তাহাই বিচার করিয়া পরে স্বেচ্ছাকৃত অনশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে— ইহাকেই অনশনের মূল কারণ বলিয়া উল্লেখ করিলে অসঙ্গত হইবে না।

অনশন দুই প্রকার— পূর্ণ ও আংশিক। নিরম্বু উপবাসকেই পূর্ণ অনশন বলা যাইতে পারে এবং সময়বিশেষ ও জাতিবিশেষ তাহা ভোজ্যদ্রব্য বিশেষের অনশনকে আংশিক অনশন বলা যাইতে পারে। কখনও কখনও লোকে আহারের পরিমাণ খুব কমাইয়া দিয়া স্বল্পাহারী হইয়া থাকেন। এরূপ স্বল্পাহারকেও আংশিক অনশন আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে...

শোকানুষ্ঠানে অনশন ও সমবেদনাসূচক অনশন

কাহারও মৃত্যু সম্পর্কে যে অনশন পালন করিবার নিয়ম দেখা যায় তাহার উৎপত্তি ও সার্থকতা কি তাহা নির্ণয়করা অত্যন্ত কঠিন। এইরূপ অনশনের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক কারণ উপস্থিত করা হইয়াছে যেমন মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মার সন্তোষবিধান, খাদ্যের সহিত মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মার প্রবেশ-নিবারণ, মৃতের সংস্পর্শ-হেতু খাদ্য দূষিত হইবার ভয়, শুদ্ধীকরণ ইত্যাদি। উল্লিখিত কারণগুলি মৃত্যু ব্যাপারে অনশন প্রথাগুলির স্থায়িত্বের জন্য অনেকাংশে দায়ী হইলেও শোক-হেতু আহারে অনাশক্তি মূলত এই সমস্ত প্রথার জন্য দায়ী বলা যাইতে পারে। এইরূপ শোকসূচক অনশনের প্রথা সাধু অথবা বিশেষ দেশহিতৈষী শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির মৃত্যুতে প্রচলিত ইহতে দেখা যায়। Mater Magna বা মহামাতার অনুষ্ঠান Attis এর মাতার শোকের স্মৃতিস্বরূপ ২৪এ মার্চ অনশন এবং শোকদিবস বলিয়া গণ্য হইত। সীয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানগণ আলি ও তাঁহার পুত্রদ্বয় হাসান ও হুসেনের মৃত্যুর স্মৃতিরক্ষার্থ অনুরূপ অনশন পালন করিয়া থাকেন। প্রায় প্রত্যেক দেশেই মৃত্যু সম্পর্কিত অনশন-প্রথা বর্তমান। কোথাও অনশন কয়েকদিনের জন্য করিতে হয়, আবার কোথাও বা অল্প সময়ের জন্য করিতে হয়; কোথাও পূর্ণ অনশন করিতে হয় এবং কোথাও আংশিক অনশন করিতে হয়। নিউগিনির কোন কোন জাতির মধ্যে মৃতের স্মৃতিস্বরূপ কিছুকালের নিমিত্ত আত্মীয়-স্বজন স্বেচ্ছায় কোন প্রিয় খাদ্য বর্জন করিয়া থাকে। প্রাচীন মিশরে রাজার মৃত্যুতে প্রজাদের উপবাস করিবার রীতি ছিল; তাহারা এই সময়ে মাংস, রুটি, মদ প্রভৃতি আহার করিত না এবং বিলাসিতা করা, স্নান করা, নরম বিছানায় শয়ন করা প্রভৃতি তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। প্রাচীন জাপানে মৃতের পুত্রকন্যা ৫০ দিন সামান্য নিরামিষ আহার করিত। গ্রীকদিগের মধ্যেও অনশনপ্রথা বর্তমান ছিল;

সন্তানের মৃত্যুর পর পিতামাতা দুই-তিন দিন পর্যন্ত অনশন করিতেন। হিব্রুজাতিরাও মৃত্যু উপলক্ষ্যে অনশন অবলম্বন করিত। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে শোকার্ত নরনারীগণ শূকর-মাংস, কচ্ছপের মাংস প্রভৃতি আহার করে না। জীবনের শেষ রোগে স্বামী যে সমস্ত খাদ্য গ্রহণ করিতেন, স্ত্রী পক্ষে শ্রাদ্ধ দিবস পর্যন্ত সেই সমস্ত খাদ্য বর্জন করিবার বিধি দক্ষিণ মাসিমে (Massim) প্রচলিত আছে।

মৃত্যু সম্পর্কিত অনশনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়ের অবতারণা করা যাইতে পারে। অনেক দেশে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার পর হননকর্তাকে অন্যান্য শুদ্ধীকরণ ব্যতীত অনশনও করিতে হয়।

শুদ্ধীকরণে অনশন

অসভ্যদিগের মধ্যে এইরূপ একটি বিশ্বাস আছে যে পাপ অপবিত্রতা প্রভৃতি শরীরে প্রবেশ করে খাদ্যের মধ্য দিয়া; সুতরাং অনশন করিলে শরীর অপবিত্রতা হইতে নিষ্কৃতি পায়। সেইজন্যই ধর্ম-কার্যে শুদ্ধীকরণে অনশনের অবলম্বন প্রচুর দেখা যায়। অনশনের পর সাধারণত দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়। অনেক সময় শরীরকে পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করিবার উপযোগী করিবার নিষিদ্ধ অনশন করা হইয়া থাকে। প্রেতের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের প্রাথমিক অনুষ্ঠান হিসাবে অনশনের প্রচলন আছে।

প্রায়চিত্তে অনশন

অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে অনশনের প্রচলন দেখা যায়। পাপকর্ম করিয়া মনে অনুতাপ উপস্থিত হইলে অনশনের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান অনেক ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়। অনশনের দ্বারা পাপকর্মের শাস্তির মাত্রা হ্রাস প্রাপ্ত হয় অথবা ক্রুদ্ধ দেবতাদের ক্রোধের উপশম হয় এমন ধারণার বশবর্তী হইয়াও লোকে অনশন করে। এইরূপ অনশনের ক্ষেত্রে প্রার্থনা ও নানাবিধ ধর্মানুষ্ঠান করিতে প্রায়ই দেখা যায়। ইহুদী ও খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে এইরূপ প্রথার বহুল প্রচলন আছে।

প্রাচীন মেক্সিকোবাসীদিগের মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অনশন করিবার নিয়ম ছিল। পাপকর্মে দুষ্ট আত্মার শোধনকল্পে এই অনশন একদিন হইতে মাসাধিকাল পর্যন্ত পালন করা হইত। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে জাতিগতভাবেও অনশন পালিত হইত। আসিরিয়ায় এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। প্রায়শ্চিত্তরূপে অনশন করিলে সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়সুখ বর্জন করিবার নির্দেশ ইজিপ্টে ছিল। মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত অনশন ব্যবস্থা স্বীকার করা হইয়াছে। মহম্মদ নিজে প্রায়শ্চিত্তে অনশনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক সমর্থ ব্যক্তিকেই রমজানে প্রথম ত্রিশ দিন সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিরম্বু উপবাস করিতে হয়। গোঁড়া মুসলমানেরা প্রতি সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার উপবাস করিয়া থাকেন। অতীত পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্যই এই অনশন অবলম্বন করিবার নিয়ম আছে। হিব্রুরাও প্রায়শ্চিত্তে অনশন অবলম্বন করিত।

ভারতীয় মত

মৃত্যুসঙ্কল্প করিয়া এক, দুই, তিন, সাত, নয় দিন ব্যাপী অথবা একমাস ব্যাপী উপবাস। শাস্ত্রে নির্দেশ আছে যে এইরূপ অনশন করিলে বহু পুণ্য লাভ হয়। গরুড়পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের প্রতি উপদেশ করিয়াছেন যে, যে কোন ব্যক্তি অনশন করিয়া প্রাণত্যাগ করে, সে মানুষী তনু পরিত্যাগ করিয়া আমার তুল্য হইয়া বিরাজ করিতে পারে। অনশনব্রত করিয়া যতদিন জীবিত থাকিবে, সে সমস্ত দিনগুলি তাহার পক্ষে এক একটি সদক্ষিণ ক্রতুদিবস তুল্য হইয়া থাকে।

'কৃত্বা নিরশনং যো বৈ মৃত্যুমাপ্নোতি
কোঽপি চেৎ।
মানুষীং তনুমুৎসৃজ্য মম তুল্যো
বিরাজতে।
যাবন্ত্যহানি জীবেত ব্রতে নিরশনে কৃতে।
ক্রতুভিস্তানি তুল্যানি সমপ্রবরদক্ষিণৈঃ॥—উ. ৩৬. ৫-৬।

মহারোগ উপস্থিত হইলেও যদি কেহ অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া প্রাণত্যাগ করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তির পুনর্জন্ম হয় না; সে দেবগণের ন্যায় স্বর্গে বিরাজ করিয়া থাকে।

'মহারোগোপপত্তৌ চ গৃহীতেঽনশনে কৃতে।
পুনর্ন জায়তে রোগো দেববদ্ধি বিরাজতে॥—ঐ, ৮।

অনশনব্রত মনুষ্যকে বৈকুণ্ঠপদ প্রদান করে। সুস্থ শরীরে অনশন ব্রত করিলে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

'তস্মাৎ স্বস্থে চোত্তরে বা সাধয়েন্মোক্ষলক্ষণম্।—ঐ,১২।

যে ব্যক্তি তীর্থবাসী হইয়া অনশনব্রত দ্বারা প্রাণত্যাগ করে সে সপ্তর্ষিমণ্ডলে বাস করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অনশনব্রত আচরণ দ্বারা স্বগৃহে দেহত্যাগ করে, সে আপনার কুল পরিত্যাগ করিয়া একাকী স্বর্গে বিচরণ করে। যে ব্যক্তি অন্ন ও জল পরিত্যাগ করিয়া আমার পাদোদক পানপূর্বক প্রাণত্যাগ করে, সে কখনও পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করে না। অনশনপরায়ণ তীর্থস্থ ব্যক্তিকে কুলদেবতারা রক্ষা করেন, যমদূতগণ তাহাকে কোনরূপ যাতনা দিতে পারে না।

'যস্তীর্থ সম্মুখো ভূত্বা ব্রতে হ্যনশনে কৃতে।
চেন্ম্রিয়েঽতান্তরালেপি ঋষীণাং মণ্ডলেঽধসৎ॥
ব্রতং নিরশং কৃত্বা স্বগৃহেঽপি মৃতো যদি।
স্বকুলানি পরিত্যজ্য একাকী বিচরোদ্দিবি॥
অন্নঞ্চেব তথা তোয়ং পরিত্যজ্য নরো যদি।
পীতমৎপাদতোয়শ্চ ন পুনর্জায়তে ক্ষিতৌ॥
সত্যাসীনং তীর্থগতং রক্ষন্তি বনদেবতাঃ।
যমতৃতা বিশেষেণ ন যাম্যাস্তস্য পার্শ্বগাঃ।

অনশনব্রত করিয়াও যদি কেহ জীবিত থাকে, তবে সে ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া সর্বস্ব দান করিবে এবং সেই সকল ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনুগত হইয়া চান্দ্রায়ণব্রত করিবে, কখনও মিথ্যা বাক্য বলিবে না,সর্বদা ধর্মাচারণ করিবে।

' কৃত্ব নিরশনং তার্ক্ষ্য পুনর্জিবতি মানবঃ।
ব্রাক্ষণান্ স সমাহূয় সর্বশ্বং যৎ পরিত্যজ্যে।।
চান্দ্রায়ণং চরেৎ কৃৎস্নমনু জ্ঞাতশ্চ তৈ দ্বিজৈঃ।
অনৃতং ন বদেৎ পাশ্চাদ্ধর্মমেব সমাচরেৎ।।'
-ঐ , ২০-২১

অনশন বলিলে মৃত্যু সঙ্কল্প পূর্বক উপবাস বুঝায়। সাধারণ উপবাসকে অনশন বলে না। উপবাসের অভ্যাস পরিণত স্তর প্রাপ্ত হইলে তাহা অনশন নামে অভিহিত হয়। অনশন সাধারণত ত্রিবিধ স্বল্পানশন, অর্ধানশন ও পূর্ণানশন।

সৌজন্যে ঃ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী। পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ;
☐ সংকলক ঃ সম্পাদক

মধ্যযুগের ইসলামি শিল্পকলা ও স্থাপত্য

আর্নস্ট ক্যুহনেল

সেলজুক শিল্প

সেলজুক * স্মৃতিসৌধ আমলে পশ্চিম এশিয়ায় স্মৃতিস্তম্ভগুলো গুরুত্বের দিক থেকে প্রায় মসজিদের সমকক্ষতা লাভ করে। এটা সরাসরি দুটি রূপ নেয় একটি স্মৃতিস্তম্ভ এবং আর একটি হচ্ছে গম্বুজ সম্বলিত স্মৃতিসৌধ। এর দুটিই পূর্ব ইরানের খোরাসানে উদ্ভাসিত হয়। সেখানে ইরানী অথবা তুর্কী শাসক ও গবর্নরদের কবরের ওপর এগুলো নির্মাণ করা হত।

স্মৃতিস্তম্ভগুলো ইসলামি আমলের এই ধরনের সাদাসিদা স্তম্ভগুলোরই একটি সংস্করণ বলে মনে করা হয়ে থাকে। রক্ষণশীল রুচিতে এগুলো খুবই সমাদৃত হত এবং এই কারণে আব্বাসি আমলের পরও এগুলো বেঁচে ছিল। এক্ষণে এই স্তম্ভগুলো ইটের তৈরি একটি সুবৃহৎ ভবনের রূপ লাভ করতে থাকে। গোলাকার এবং কোণাকৃতির স্মৃতিস্তম্ভের মধ্যে কোনটি অধিকতর প্রাচীন সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন। তবে একথা বলা চলে যে প্রথমদিকের স্মৃতিস্তম্ভগুলো কোণাকৃতির হত। উদাহরণ হিসাবে গুরগানের 'বুনুবাদী কাবুস'-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তারকাকৃতির ভূমি পরিকল্পনার ওপর ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে এটি নির্মাণ করা হয়। এটা ওপরের দিকে ক্রমশঃ সূঁচোলো হতে থাকে এবং পরে এর ওপর একটি সূচালো ছাদ নির্মাণ করা হয়। এর সহজ এবং রক্ষণশীল আকৃতি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। পরে অবশ্য পশ্চিম ইরানে বহুকোণী (চার, আট অথবা দশকোণ বিশিষ্ট) স্মৃতি-স্তম্ভই বিশেষভাবে সমাদৃত হত। এই ধরনের স্মৃতিস্তম্ভের সব থেকে চমৎকার দৃষ্টান্ত হচ্ছে নাখিচেভানের মুমিনা খাতুনের স্মৃতিস্তম্ভ। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে এটি নির্মাণ করা হয়। এর গায়ে অগভীর অথচ দীর্ঘ কুলুঙ্গি নির্মাণ করা হয়। কোণাকৃতির ছাদে আবৃত গোলাকার স্মৃতিস্তম্ভও ইরানে বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিল। এর কোনটির গা মসৃণ হত, আবার কোনটিতে কোণাকৃতির বা গোলাকার স্তম্ভের সাহায্যে খাঁজ কাটা হত। এতে স্মৃতিস্তম্ভের বাইরের দিকটা দেখতে অনেকটা তাঁবুর মত হত। এর ভিতরের দিকে থাকতো একটি গম্বুজ (উদাহরণ হিসাবে তেহরাণের নিকটবর্তী রায়-এর রাদকান স্মৃতিস্তম্ভের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে)। এতে প্রতীয়মান হয় যে তাঁবুই তুর্কী সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষ প্রাধান্য করেছিল। ফলে তুর্কী শাসকরা এর অনুকরণেই তাদের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করার ইচ্ছা পোষণ করতেন।

আর্মেনিয়ায় সেলজুক আমালের গোলাকার স্তম্ভ নির্মাণের ব্যবস্থা খ্রিস্টান আমলের স্থাপত্যের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে চলে। কংক্রিটের সাহায্যে এগুলো নির্মাণ করা হত এবং এর ওপর বেলে পাথরের আবরণ দেয়া হত (আখলাতের স্মৃতিসৌধ-এর অন্যতম দৃষ্টান্ত)। এশিয়া মাইনরে এই তুর্বি বা স্মৃতিস্তম্ভগুলো ছিল সমৃদ্ধ ও সুসজ্জিত ইরানী স্মৃতিস্তম্ভের ঠিক বিপরীত। ইরানী স্মৃতিস্তম্ভ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে। মেসোপটেমিয়াতেও আউলিয়া দরবেশদেব স্মৃতিস্তম্ভগুলো ছিল অতি সাধারণ ধরনের। তবে সেলজুক আমলে এসে এগুলো

---

*সেলজুকরা ছিল তুর্কমেনীয যাযাবব শ্রেণীর লোক। কিবঘিজ স্তেপ অঞ্চল থেকে বোখারা ও ইরানে প্রবেশ করে এবা সেখানেই বসতি স্থাপন করে।

জাঁকজমকপূর্ণ সুবিশাল সৌধের রূপ পরিগ্রহ করে। মোসুল অঞ্চলে এগুলো ঘন ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠা করা হত। এর ওপর থাকত লম্বা তাঁবুর আকৃতি বিশিষ্ট একটি ছাদ। কোন কোন সময় এতে সংযুক্ত হত একটি প্রবেশ কক্ষ। ইরাকে স্মৃতিস্তম্ভের ওপর নির্মিত হত এক প্রকার বিশেষ ধরনের ছাদ। কয়েকটি সেলে বিভক্ত হয়ে পিরামিডের আছে কয়েকটি খিলান এবং ভিতর দিকে এই খিলানের সঙ্গে রয়েছে কয়েকটি ঝুলন্ত কুলুঙ্গি। টাকৃটের নিকটবর্তী ইমানদার-এ এই স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছে একটি চতুষ্কোণ ভিত্তির ওপর। এই ধরনের স্মৃতিনিদর্শনের মধ্যে সব থেকে বিখ্যাত হচ্ছে বাগদাদের নিকটস্থ সিত্তা জুবাইদার স্মৃতিসৌধ। একটি অষ্টকোণী প্রিজমের ওপর এটি নির্মাণ করা হয়। এর ভিতরের দিকটাও অষ্টকোণী। এই স্মৃতিস্তম্ভের সঙ্গে খলিফা হারুনর রশীদের পত্নীর নাম সংযুক্ত করাটা হয়তো ঠিকই হয়ে থাকবে, যদিও বর্তমান আকৃতি দেখে মনে হয় না যে এটা ১২শ শতকের পূর্বে নির্মিত হয়েছে। ১২শ শতকেই মুকার্নাস মটিফ স্থাপত্যরীতির যুক্তিসঙ্গত বৈশিষ্ট্যে পর্যবসিত হয়। দামেশকে নুরুদ্দিনের নামে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় তার স্মৃতিস্তম্ভও আকারে প্রায় অনুরূপ। কেন্দ্রাভিমুখী সেলের সাহায্যে এর ওপরের ছাদ নির্মাণ করা হয়েছে। স্মৃতিসৌধের এই বৈশিষ্ট্য কত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, এ থেকেই তা প্রতীয়মান হয়।

ডিজ-এর মতে ইরানের মরু শহরে প্রাচীনকালে গম্বুজযুক্ত আবাসিক ভবন নির্মাণের যে প্রথা ছিল, তা থেকেই গম্বুজযুক্ত বিশাল স্মৃতিসৌধ নির্মাণের প্রেরণা গ্রহণ করা হয়। ডিজ সম্ভবত ঠিকই বলেছেন। খোরাসানে আবাসিক ভবনে বিশেষ এক ধরনের ছাদ নির্মাণ করা হয়। দেয়ালের কোণে ইটের খিলান পথ ধরে এই নির্মাণকার্য অগ্রসর হত। এই সময় থেকে এই পদ্ধতির পাশাপাশি কুলুঙ্গি অথবা সেলযুক্ত গম্বুজ নির্মাণ করা হতে থাকে। এর নির্মাণ প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হতে থাকা কালে একটি অষ্টকোণী পিপা এবং গ্যালারী এলাকা ধীরে ধীরে রূপলাভ করতে থাকে। এর ওপরই অবশেষে গম্বুজের ঢাকনাটি বসিয়ে দেয়া হয়। সুলতান সানজারের স্মৃতিসৌধ আজও সেলজুক শহর সার্ভ-এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তার আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ১১৫৭ খিস্টাব্দে সুলতান সানজারের মৃত্যু হয়। এই স্মৃতিসৌধে আছে একটি গ্যালারী এলাকা এবং গম্বুজ বেষ্টন করে আছে দুই সারি কুলুঙ্গি। বাইরে থেকে দেখলে একে পিপার ওপর বসানো একটি মসৃণ কুলাঙ্গি। বাইরে থেকে তার কোন আভাসই চোখে পড়ে না। খোরাসানের তুস নগরে সংরক্ষিত প্রাচীন আবাসিক ভবনটি বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ ইমাম গাজ্জালীর স্মৃতিসৌধ বলে অভিহিত হয়ে থাকে। ১১১১ খ্রিস্টাব্দে ইমাম গাজ্জালী পরলোক গমন করে। এই ভবনের প্রবেশ পথটি কলসের আকৃতি বিশিষ্ট। এর পাশে রয়েছে, আড়াআড়িভাবে খাঁজকাটা কুলুঙ্গি এবং এর গম্বুজটি অষ্টকোণী গ্যালারীর ওপর নির্মিত হয়েছে।

সমাধিভবন

স্তম্ভ নির্মাণের সেলজুক রীতি প্রথমদিকে অক্ষুন্ন থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মেরাথায় হালাকুর কন্যাদের যে সমাধি আছে, তা সম্পূর্ণভাবে নাখেচেভানের সমাধির আদর্শে নির্মাণ করা হয়। অপর দিকে একই সময়ে কুম-এর ইমামের যে কবর নির্মিত হয়, তাতে ইরাকের এই শ্রেণির স্থাপত্যের সঙ্গে এর সম্পর্কের ওপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নির্মাতাদের সাধারণ শিয়া ধর্মবিশ্বাসই এই সামঞ্জস্যের কারণ। গম্বুজযুক্ত স্মৃতি সমাধির মধ্যে

আমরা একটি নতুন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করি। সুলতানিয়ার উলজাইতু খোদাবন্দের (১৩০৪-১৩১৬) সমাধি এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। সুলতানিয়ায় তিনি সাময়িকভাবে বসতি স্থাপন করেছিলেন। আটটি স্তম্ভের অবলম্বন যুক্ত সূঁচোলো গম্বুজ উপর দিকে মিনারের আকার ধারণ করেছে এবং এতে এর লম্বা আকৃতির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পাশ্চাত্যের গথিক পদ্ধতির সাথে এর তুলনা করা চলে। কিরমানে অবস্থিত ধ্বংসাবশেষ কুবব-ই-সেবস্-এ এই লম্বাকৃতি স্তম্ভশীর্ষের পঞ্জরযুক্ত গম্বুজে পর্যবসিত হয়েছে। এই ভাবে যে নতুন পদ্ধতির উদ্ভব হয় তৈমুরের আমলের স্থাপত্যের ওপর তার যথেষ্ট প্রভাব পড়ে।

সমরখন্দে শাহ্ জিন্দের কবরের রাস্তায় বিশ্বের সব থেকে আগ্রহোদ্দীপক কবরস্থানের জন্ম দেয়। দিগ্বিজয়ী তৈমুরের পরিবারের বেশ কয়েকজনকে এখানে দাফন করা হয়। তাঁরই নির্দেশে তাঁর নিজের কবরটি একটু পেছনদিকে সুদৃশ্য সমাধিসৌধের আকারে নির্মাণ করা হয়। এই হচ্ছে বিখ্যাত গুর আমীর। ১৪৯০ এবং ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এটি নির্মাণ কবা হয়। এটি একটি স্তম্ভের আকৃতি বিশিষ্ট। অষ্টকোণী ভিত্তির ওপর গোলাকার পিপার আকারে এটি নির্মাণ করা হয়। এর চমৎকার খাতযুক্ত গম্বুজটি ফিতা দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে। দেখতে অনেকটা তাঁবুর মত মনে হয়। এর সামনে রয়েছে একটা ইউয়ান। ভেতরের কামরার বর্গক্ষেত্রকে ঝুলন্ত থামসহ ছাদযুক্ত কুলুঙ্গির সাহায্যে ক্রসের আকার আদান প্রদান করা হয়েছে। কুলুঙ্গিগুলোর বিন্যাসের দ্বারা অষ্টকোণী এবং ষোল পার্শ্ব বিশিষ্ট ভিত গড়ে তোলা হয়েছে এবং ওপরে স্থাপিত হয়েছে অশ্বক্ষুরাকৃতির সূঁচোলো গম্বুজ। এর নিচে রয়েছে সমতল ছাদযুক্ত কামরা। এর ভেতর ও বাইরে আকর্ষণীয় রূপ একে ইসলামি স্থাপত্যকীর্তির এক অতুলনীয় নিদর্শনে পরিণত করেছে।

মামলুক আমলের মসজিদের আসবাবপত্র

মসজিদ, মাদ্রাসা এবং সমাধিসৌধের আসবাবপত্রের শিল্পরীতি মামলুক* আমলের মত ইসলামি শিল্পের আর কোন পর্যায়ে সাধারণ চারুশিল্পকে এতটা প্রভাবিত করেনি। এই আমলে সুন্নী ধর্ম বিশ্বাসের পুনঃ প্রত্যাবর্তনের ফলে মূর্তিযুক্ত অলঙ্করণ রীতি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হতে থাকে। এরই ফলে সম্ভবত এই বিশ্বাসও গড়ে উঠে যে, নিষেধাজ্ঞার আওতায় থেকেও উৎকৃষ্টতর শিল্পের জন্ম দেওয়া সম্ভব। এই কারণেই পৃষ্ঠপোষকরা সম্ভবত এই জাতীয় ব্যয়বহুল কারুশিল্পের ফরমায়েশ দিতে থাকে এবং শিল্পীরাও বিশেষ ধরনের শিল্প সৃষ্টিতে উৎসাহিত হয়ে উঠে।

আসবাবপত্রের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মিম্বর। এর মূল আকৃতি হল বা কা'আর অস্তিত্ব ছিল। তবে এগুলো ছিল ইংরেজী 'টি' অক্ষরের আকৃতি বিশিষ্ট। স্থানীয় ঐতিহ্য থেকেই এই হলের আদর্শ গ্রহণ করা হয়। এই ধরনের হলগুলো ছিল পাথরের মোজাইক ব্যবহারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এর পরেও বহুকাল যাবৎ মোজাইক ব্যবহারের এই রীতি অব্যাহত থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রথম যুগের যে সব নিদর্শন আজও চোখে পড়ে তার সবগুলোই ছিল ওসমানিয়া আমলে তৈরি।

ধর্মনিরপেক্ষ ভবন হিসাবে কারাভান সরাই এবং গুদামের (ওকেল) গুরুত্বও স্থাপত্যের

---

*মামলুকরা ছিল তুর্কী বংশীয় দাস। কুর্দিশ বংশ সম্ভূত সালাদীন ১১৭১ খ্রিস্টাব্দে মিশরে ফাতেমি বংশের অবসান ঘটান এবং পরে সিরিয়া এবং আরবে নিজের আইয়ুবী বংশের পত্তন ঘটান।

দৃষ্টিকোণ থেকে কম গুরুত্ববহ ছিল না। কায়রোতে কাইট বে'র আমল থেকে দুটি নিদর্শন আজও অবশিষ্ট রয়েছে। এর একটিতে আছে ছাদের ভেতরে নকশাকাটা রীতিতে নির্মিত একটি প্রবেশ পথ। অপরটি ১৪৪৮ খ্রিস্টাব্দে বাবু আন-নাসের নিকট নির্মাণ করা হয়। এর ভিতরদিকে একটি সুবিশাল অঙ্গন এবং সামনের দিকে আছে আকর্ষণীয় চারতলা দেউড়ী। নীল উপত্যকা এবং সিরিয়ায় আরও কয়েকটি শিল্প আছে। সিরিয়ার নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে আলেপ্পোর জাঁকজমক পূর্ণ খান উজীর। এটি অত্যন্ত পুরাতন হলেও এর নির্মাণ কার্যে অত্যন্ত কঠোরভাবে মামলুক স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করা হয়। এতে বহু আকর্ষণীয় কারুকার্য স্থান লাভ করে।

আজ পর্যন্ত কায়রোর রাজপথের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওপর তলার ঝুল বারান্দার ধনুকাকৃতির কাঠের জাফরী (মাশরাবী)। এর থেকে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন নিদর্শনগুলিতে এই জাফরী একটু তির্যকভাবে বসান থাকতো বলে তা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই জাফরী ব্যবহার করার ফলে মেয়েরা পর্দা রক্ষা করে রাস্তা ও স্কোয়ারের দৃশ্যাবলী অবলোকন করতে পারত।

সমাধিফলক, বংশ পরিচিতি ও বিমূর্ত অলঙ্করণ

সমাধি ফলকের অলঙ্করণের ক্ষেত্রে নতুন যুগে এক বিপ্লবের সূচনা হয়। সমাধি ফলকে তখনও ফাতেমি আমলের সুদৃশ্য এবং লম্বাকৃতির কুফিক হরফই ব্যবহার করা হত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা ইরাণের মতই সমৃদ্ধি লাভ করে। কিন্তু মামলুক সমাধিফলকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গোলাকার নকশী হরফ। আইয়ুবী আমলে এই হরফের প্রবর্তন হয়। কিন্তু প্রধানতঃ মিশর এবং সিরিয়ায় এই রীতি সীমাবদ্ধ থেকে যায়। এই রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর লম্বা ছাঁদ। অবশ্য এই বৈচিত্র্য কুফিক হরফকেও সরকারী নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। প্রাচ্য সম্পর্কে পাশ্চাত্যের আগ্রহের ফলে বিদেশী ছোটখাট পণ্যের অহেতুক প্রশংসা এবং অযৌক্তিক চাহিদা উভয় বেড়ে যায়। এই অবস্থা শিল্পকলাকে ক্রমে ক্রমে ক্রমে এক অচলাবস্থার মুখে এনে ফেলে। এমন কি ফতেহ আলী শাহও এই অবস্থার প্রতিকারে সক্ষম হননি— যদিও ১৯শ শতকের প্রথম দিকে তিনি শিল্পকলার মান উন্নয়নের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন।

পবিত্র ভবন

স্থাপত্য শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে সমাধি-সৌধগুলি এক সময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে পরিগণিত হত। এই যুগেও কখনও তা নতুন নতুন ধারনার জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছিল। তবে এটা ঘটত কেবলমাত্র পীরদরবেশের (ইমামজাদা) সমাধির বেলায়। পশ্চিম ইরাণে অতিরিক্ত অংশ সংযোজনের দ্বারা এগুলোকে লম্বা আকৃতির গম্বুজযুক্ত ভবনে পরিণত করা হত। কিন্তু পূর্বে এগুলোর প্যাভিলিয়নের আকৃতিই প্রসার লাভ করে। এগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমতল ইউয়ান কুলাঙ্গিসহ অষ্টকোণী আকৃতি বিশিষ্ট হত। তৎকালে উন্মুক্ত কেন্দ্রীয়হল সহ নির্মিত উদ্যান গৃহের সঙ্গেই কেবল এর তুলনা করা চলে।

১৬শ শতকে একটি প্রাচীন সমাধির সম্প্রসারিত অংশ হিসাবে আর্দেবিলে শেখ সাফীর নামে একটি বিশাল সমাধি মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। এর নির্মাণকাজ শেষ হয় ১৭শ

শতকের মধ্যভাগে। এটি মূলতঃ একটি জাঁকজমকপূর্ণ তোরণদ্বার সম্বলিত প্রশস্ত বর্গক্ষেত্র। এর সঙ্গেই আছে একটি লম্বা বাগান বাড়ি, নানা আকারের কতিপয় ভবন, এতে কোণাকুণিভাবে সংযুক্ত হয়েছে। ভিতরের প্রাঙ্গণের আয়তন দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ৩১ ও ১৬ মিটার। এরই বামদিকে রয়েছে একটি স্বতন্ত্র প্রাচীন মসজিদ। এটি ১৬টি কাঠের থামের ওপর নির্মিত একটি অষ্টকোণী ভবন। এতে জানালার স্থলে কুলুঙ্গি আছে, কিন্তু কোন মেহরাব নেই (এর কেবলা প্রবেশ পথেই অবস্থিত)। এই মসজিদের সাথে সমকোণ করে অব্যাহত রয়েছে কুলুঙ্গিসহ উপাসনালয় রয়েছে। এর সামনের দিকটা প্রাসাদতুল্য এবং অনুপম সৌন্দর্যময়। ইটের তৈরি এই ভবনে আছে একটি দীর্ঘ প্রবেশ পথ এবং এর কক্ষ পাশে আছে একটি সূঁচালো খিলান। সারিবদ্ধভাবে একই ধরনের জানালা বসিয়ে একে লম্বা আকৃতি দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সব জানালায় চীনামাটির মোজাইক বসানো এবং নানা রকমের নক্সা করা। সমাধির পাশে মূল ভবনটিতে অল্প উঁচু একটি পিপার ওপর আছে গম্বুজ। এটাই হচ্ছে ১৭শ শতকের 'পোর্সেলিন ভবন' (চিনা খানা)। এই সমাধিভবনের আনুষ্ঠানিক চীনা মাটির বাসনপত্র এই ঘরেই সংরক্ষিত থাকত। এর দেয়ালগুলোতে বিভিন্ন আকারের ও ধরনের খোপযুক্ত কাঠের প্যানেল বসানো। এইসব খোপেই একট একটি করে এই সব চীনামাটির বাসন রাখা হত। কখনও এর উচ্চতা কুলুঙ্গির খিলানকেও ছাড়িয়ে যেত। এই ভবনের অংশ হিসাবে ইমাম, তীর্থযাত্রী এবং দরিদ্র জনসাধারণের জন্য রান্নাঘর এবং বাসস্থানও নির্মাণ করা হয়েছিল।

এই আমলের সত্যিকার মসজিদ বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে ইস্পাহানের মসজিদ-ই-শাহ। শুধু জাঁকজমকের দিক থেকে নয়, কারিগরি কৌশলের দিক থেকেও এটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ— যদিও মনোযোগের শৈথিল্য এখানেও বেশ খানিকটা অনুভূত হয়। সংযোগ সাধনকারী উচ্চ মঞ্চগুলো সমগ্র মসজিদটিকে শিথিলভাবে একত্র সন্নিবিষ্ট করে রেখেছে। এর তিনটি ইউয়ান তিনটি স্বতন্ত্র গম্বুজযুক্ত ভবন বলে মনে হয়। এরিভানের গাইয়োক জামি (হলুদ মসজিদ) ১৮শ শতকের গম্বুজযুক্ত ভবন বলে প্রসিদ্ধ। এতে দুটি ইউয়ান আছে এবং এর পেছনের খিলানযুক্ত প্রাঙ্গণের সংকীর্ণ পার্শ্বদেশে আছে গম্বুজ যুক্ত কামরা।

ইরাণের সে যুগের সর্বশেষ এবং সর্ববৃহৎ মাদ্রাসাটি ইস্পাহানে অবস্থিত, এটি শাহ সুলতান হোসেন-এর তৈরি (১৭০০ খ্রিস্টাব্দে)। এর চারটি ইউয়ান একটি আয়তাকার প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে অবস্থিত। এতে দুই তলার আকারে নির্মিত কয়েকটি কামরা আছে এবং তা কেব্‌লার দিকে একটি বড় গম্বুজ-ঘর পর্যন্ত সম্প্রসারিত। প্রাঙ্গণের চারটি কোণ থেকে ছোট ছোট কয়েকটি প্রাঙ্গনে যাবার পথ আছে। এখানেও কয়েক তলা কামরা সাজানো রয়েছে। সমগ্র পরিকল্পনাটি অত্যন্ত বিশাল এবং আনুপাতিক দিক থেকে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিরাজের মধ্যে নুতনত্ব কিছু নেই। শিয়া ধর্ম বিশ্বাসের অনুগামীদের জন্য এই সময়ে নিজেদের রাজ্যে ভবন তৈরী করার চাইতেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল মেসোপটেমিয়ায় তাদের ইমামের কবরে একটি মনোরম সমাধি-মসজিদ নির্মাণ করা। কারবালা, নেফেজ, সামাবী এবং অন্যান্য তীর্থকেন্দ্রে ১৯শ শতক পর্যন্ত সাফারী রীতিতে আশ্রম নির্মাণ করা হতে থাকে। ধর্মবিশ্বাসীরা আজ পর্যন্ত এইসব তীর্থ ভ্রমণে যায়।

ভারতের মোগল শৈলি

সমাধি ও মসজিদ

ভারতে ইসলামি যুগের শেষ দিকে নির্মিত স্থাপত্য নিদর্শন সমূহের মধ্যে সমাধিভবন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো এক সময়ে অস্বাভাবিক রকম জাঁকজমকপূর্ণ রূপ ধারণ করে। যে যুগের স্থাপত্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এগুলোর গুরুত্ব সমধিক। পূর্ববর্তী আমল থেকেই যদিও প্রচলিত ভারতীয় রীতিতে গম্বুজ সমস্যার সমাধান করে আসা হচ্ছিল তথাপি এই যুগের গম্বুজগুলো স্পষ্টভাবে পেঁয়াজ অথবা পদ্মফুলের রূপ ধারণ করে। গম্বুজের প্রধান ব্যবহার ছিল রাজকীয় সমাধি ভবনে। এক্ষেত্রে ভারতীয় উদ্যান স্থাপত্যের অভিনব চার বা আট পার্শ্ব বিশিষ্ট থামের ওপর নির্মিত প্যাভিলিয়নের সাথে সূঁচোলো খিলানযুক্ত বারান্দার চমৎকার সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। এগুলো যত্নসহকারে কোন পুষ্করিণীর মাঝখানে কিম্বা কোন বাগানের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করা হত। গভীর কুলুঙ্গি কিম্বা উন্মুক্ত গ্যালারী অথবা অলঙ্কারযুক্ত অবলম্বনের সাহায্যে সমগ্র স্থাপত্যে নিদর্শনের ভার হালকা করে তোলা হত।

এক্ষেত্রে ১৬শ শতকের সব ক্ষেত্রে আগ্রহোদ্দীপক দৃষ্টান্ত হচ্ছে সাসারামে অবস্থিত শের শাহের সমাধি। পানির ভেতর নির্মিত একটি সুসংহত সমতল ভিত্তির ওপর এটি নির্মিত হয়। সেকেন্দ্রা উদ্যানে আছে সম্রাট আকবরের সমাধি। এটি আসলে বহুতল বিশিষ্ট উন্মুক্ত গ্যালারীসহ একটি সুদীর্ঘ হল। স্পষ্টতই দেখা যায় যে ভারতীয় বিহার ধরনের আশ্রমের অনুকরণে এটি নির্মাণ করা হয়। সর্বকালের বিখ্যাত এবং শ্রেষ্ঠ সমাধি সম্ভবত আগ্রার বিখ্যাত তাজমহল। পত্নীর অকাল মৃত্যুতে তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য সম্রাট শাহজাহান ১৬৩০ থেকে ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এটি নির্মাণ করান। পানির চৌবাচ্চা সম্বলিত একটি মনোরম আয়তাকার উদ্যানের শেষ প্রান্তে এটি নির্মিত হয়। এর পেছনেই রয়েছে যমুনা নদী। সমগ্র তাজমহল উজ্জ্বল মার্বেল পাথরে আবৃত। এর আশে-পাশে অবস্থিত সমস্ত বাড়ি লাল বেলে পাথরে তৈরি। এর ফলে তাজমহলের পরিবেশে একটি চমৎকার বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে। তাজমহলের সামগ্রিক বর্হিদৃশ্যের মধ্যে ইরাণী প্রভাব পরিলক্ষিত হয় বটে কিন্তু অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে, যেমন গোলাকার কোণের অংশে, গম্বুজের আকৃতিতে, কোণের দিকের চারটি স্তম্ভে এবং.আভ্যন্তরীণ সজ্জার ব্যাপারে ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের মূল সুরই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এর সমগ্র নকশাটি এমন সুচিন্তিত এবং সুসমঞ্জস পরিকল্পনা নির্ভর যে, এটা যে কোন ইউরোপীয় স্থপতির তত্ত্বাবধানে নির্মিত নয়, তা ধারণা করে উঠতে জনসাধারণের অনেকদিন সময় লেগেছিল।

ইতিমুদ্দৌলার সমাধিকে (১৬১০) তাজমহলের পূর্বসূরী বলে গণ্য করা চলে। এর কোণের দিকের চারটি স্তম্ভ প্রধান ভবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রেখেই নির্মাণ করা হয়। এর সঙ্গে সুস্পষ্ট বৈসাদৃশ্য রয়েছে মীর্জাপুরের মাহমুদ আদিল শাহের সমাধির (১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ)। ওজন এবং ভর সামনে রেখে এই স্থাপত্য নিদর্শনটির পরিকল্পনা করা হয় এবং স্তম্ভগুলি সরাসরি দেয়ালের সঙ্গে নির্মাণ করা হয়। এর সুবিশাল গম্বুজের (৩৮ মিটার ব্যাস বিশিষ্ট) ভারে সমতা আনয়নের জন্য এতে সাত সারি জানালা কাটা হয়।

শেষাংশ ২৩৯ পৃষ্ঠায়

আদিবাসী চিত্রাঙ্কন রীতি ও লোককথা

অজিতকুমার মিত্র

অষ্ট্রিক জনগোষ্ঠীর নানা ধারা উপধারা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আদিম চিত্রাঙ্কন রীতির গতি-প্রকৃতি, বিশেষ লৌকিক সংস্কারের রূপায়ণ যে সম্ভব করে তোলে তা একটু লক্ষ করলেই জানতে পারা যায়। গুহার গায়ে কোন্ বিস্মৃত অতীতে মানুষ পাথরের ছেনি দিয়ে কেটে কেটে অদ্ভুত দর্শন পশুর আকৃতি এঁকেছিল। এই পশুকে ভয় করতে করতে মানুষ পশুত্বকে জয় করতে শিখেছিল। এর দ্বারা অপূর্ব এক লোকদর্শনের সূচনা হয়। সেদিন এ মনুষ্যত্বের মূল্য অবধারিত হয়ে ওঠে। মানুষ নিজেকে অকস্মাৎ আবিষ্কার করে। আদিম সমাজে তাই দেবতার কল্পনা করবার আগে ঐন্দ্রজালিকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা হয়, যারা বারে বারে যুগে যুগে মনুষ্যত্বকে বিঘ্নিত করে এসেছে। প্রকৃতির রাজ্যে ভূমিকম্প, প্লাবন, বন্যা, ঝড়ঝঞ্ঝা, গ্রহণ আর আগুনের আশ্চর্যজনক ক্ষমতা মানুষের মনে এক অদ্ভুত যাদু-বিশ্বাসের সৃষ্টি করে। ছোট ছোট কোম বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত আদিম মানুষের মধ্যে গোষ্ঠীপতি প্রাধান্য লাভের জন্য ইন্দ্রজালের অধিকারী হয়ে ওঠে। ইন্দ্রজালের মূল ঘাঁটি হচ্ছে পরলোক। ইহলোকের অকর্তব্য বা কোনো বিরোধী কাজের শাস্তি যেমন পরকালের নানা দৈহিক অত্যাচারের মধ্যে দেওয়া হত, তেমনি ধর্ম সৃষ্টি হবার পূর্বে যমালয়ের কল্পনা করা হয়। যাদু-বিশ্বাস আর তাদের সামাজিক রীতিনীতি পবলোক কল্পনায় সেদিনেব মানুষকে সাহায্য করে। ডাইনিকে যেমন পুড়িয়ে মারা হয় তেমনি পবকালে হয়তো শাস্তি পেতে হত মানুষকে নানা অসামাজিক কাজের জন্য। এমনিভাবে কৌমিক জীবনধাবা বিকাশ লাভ করে।

এই লোকদর্শনের গতি-প্রকৃতি জনসাধারণ্যে প্রচারের জন্য আদিম কাল হ'তেই এক শ্রেণির লোক পটে যমালয়ের ছবি আঁকত। ইহকালের পাপের যমপুরীতে বিচার এই ছিল এই চিত্রগুলির মূল উপজীব্য। তাদের মধ্যে অমানবিক অপরাধের জন্যে যেমন দৈহিক শাস্তির বিধান ছিল, তেমনি যমের বিচারেও দৈহিক শাস্তির বিধান অপরিহার্য হয়ে ওঠে। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রচিত বাণভট্ট শ্রীহর্ষচরিতে এই পট দেখানোর উল্লেখ আছে।

বিশাখাদত্তের মুদ্রারাক্ষস-এতা মহামতি গুপ্তচর ঠিক পটুয়ার মতো একজন লোকের বাড়িতে পট দেখাচ্ছে। তখন পর্যন্ত কিন্তু পটের বক্তব্য বলতে যমালয়ে বিচার বোঝাত। মৃত্যুভয় থেকে যমরাজার পরিকল্পনা। আদিম মানুষ মৃত্যুর কারণ আর মৃত্যুর পর কি তা' ভাবতে গিয়ে যমালয়ে প্রবেশ করে। আদিম কালের লৌকিক রীতি-প্রকৃতি, ভাব ভাবনা আর সংস্কারবে মূলত উপজীব্য করে এই পট শিল্প প্রসারতা লাভ করে। তাই আর্য সভ্যতা সব কিছুকেই গ্রাস করে নিলেও, ধ্বংস করে দিলেও, এখনও ওঁরাও, মুন্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতির মধ্যে এই পট দেখানো বিদ্যমান। এক প্রকার পটুয়া আছে তারা অবশ্য জাতকের কাহিনির আকর্ষণে

ও অর্থনৈতিক চাপে বুদ্ধের জীবনের ছবি আঁকতে আরম্ভ করে। ড. দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, *'আমরা বুদ্ধের সময় হইতেই একদল লোকের সন্ধান পাই যাদের ব্যবসা ছিল ছবি দেখাইয়া লোকের মধ্যে শিক্ষা প্রসার করা। ইহাদেব উপাধি ছিল মস্করী'।* দণ্ডের সহিত সংযুক্ত কোনো বস্ত্র অথবা 'ধ্বজদণ্ড' অর্থে কবিকঙ্কন মস্করী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। জন্মান্তরবাদ বা পারলৌকিক পটের সঙ্গে ভগবান বুদ্ধের বাণীর সম্পর্ক আছে। জাতকের কাহিনিগুলি চলমান জীবনের সামাজিক চেতনাকে প্রখর করে। তাই বৌদ্ধ ধর্মের পতনের পর এইসব পটুয়ারা হিন্দু দেবতার পট ও মুসলমান আমলে মুসলমান গাজী, পীর প্রভৃতির ছবি দেখাতে থাকে। বাংলার লোক-প্রচলিত কাহিনি আখ্যানকে অবলম্বন করেও নানা জড়ানো পটের প্রচলন হয়।

কিন্তু সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা প্রভৃতিদের মধ্যে যে পট দেখানোর রেওয়াজ সেখানে বৌদ্ধ জাতকের কাহিনি বা রামায়ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ-জীবন বা লৌকিক কোনো উপাখ্যানের ধারা প্রভাবিত করতে পারেনি। এরা আদিবাসী জীবনে প্রচলিত নানা কাহিনি কিংবদন্তীকে কখনও কখনও রূপায়িত করলেও মূলত এদের পটের লিখন যমপুরীর শাস্তি বিধানকে কেন্দ্র করেই। এরা নিজেদের 'যাদো' বলে। সাঁওতাল বা ওঁরাও এবং মুন্ডা বলতে লজ্জা পায়। দু-তিনটে ভাষায় কথা বলতে পারে। সাঁওতাল পল্লীতে সাঁওতালি ভাষায় কথা বলে। কাগজে কাপড়ে আঠা লাগিয়ে দিয়ে মিশানো পটের উপর ছবি আঁকে। এই পটেব ছবি আঁকবার সময় বনজ গাছের পাতা বা ফুলের রস বা কখনও গিরি পাথর ঘসা রং মাখিয়ে পটের মেঝে তৈরি হয়। পটের এবড়ো খেবড়ো মেঝেতে কালো কালিব প্রচুর ব্যবহারে যাদোরা ছবি আঁকেন। মাটির পাত্রে ধোঁয়া ধরে যে কালি পড়ে সেই কালিতে যমরাজার ছবি আঁকা হয়। ছবির মধ্যে কোনো শিল্পনৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয় না। প্রথম ভাবতে শেখাব কল্পনা যেন কোনো রকমে ধরে রাখা হয়। তবে যাদোদের নারীর ছবি অঙ্কনে প্রতিভার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। নানারকম সূক্ষ্ম শিল্প চেতনা এই সকল ছবিতে দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ আঁকার আদিম প্রচেষ্টা এই ছবিগুলো বিশ্লেষণ করলে জানতে পারা যায়। কালির ছোপ দিয়েই হাত, পা, কালির ছোপ দিয়েই শরীর তৈরি করার ধারাকে বিশেষ লক্ষণীয় করে। আদিম মানুষের রূপ আর প্রকৃতি হয়তো এই চিত্রাঙ্কন ধারায় বেগবান থাকে। এই ছবিগুলিকে দেখলে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এক একটি জড়ানো পটে সম মাপের বারো চৌদ্দটি পর্যন্ত ছবি থাকে। কালো রং-ই প্রাধান্য পায়। এই পট দেখানো বংশানুক্রমিক জীবিকা। তাই যে বংশদণ্ডে পট জড়ানো থাকে, সেই বংশ দণ্ডের গায়ে শত বছরের ছাপ পড়ে। বংশ দণ্ডটি হারায় না। হয়তো পাঁচ সাত পুরুষ ধরে ছবি নষ্ট হয়ে গেলেও আবার ছবি তৈরি করে ওই দণ্ডে জড়ানো হয়। তাই দণ্ডটির ক্ষয়ে যাওয়া কালো চকচকে রং বিস্ময়ের উদ্রেক করে। যেন ওই দণ্ডটি যাদুদণ্ডের মতো আদিম চিত্রাঙ্কন রীতিকে অপ্রতিহতভাবে আজও বহন করে চলেছে। কিন্তু আর্য সমাজে পতিত পটুয়ারা হিন্দু ধর্মকে কেন্দ্র করে পট আঁকলেও তাদের লৌকিক অঙ্কন পদ্ধতি না পাল্টানোর জন্য বা হিন্দু দেবতার ছবি আঁকলেও তার মধ্যে লোক দেবতার প্রভাব থাকায় তারা সমাজে অপাংক্তেয়ই থেকে গেছে। পতিতো ব্রহ্মা সাপেনো

ব্রাহ্মণাঞ্চ কোপতঃ—এরা সমাজে ঠাঁই পায়নি। তাই সাঁওতাল পটের বিষয়বস্তু এখনও সেই আদিম কালের ধারাকেই বহন করে চলেছে। একমাত্র যমালয়ের চিত্রই আঁকা হয় এই পটে।

অনেক সময় আদিবাসী কথা, গাথা থেকেও ছবি আঁকা হয়। কিন্তু হিন্দু পুরাণ বা মহাভারত, রামায়ণ থেকে আজও কোনো ছবি আঁকা হয়নি। এই যমালয়ের কথা গাথা আর্যীকরণ হয়েছে, কিন্তু তাদের লোককথাগুলি আজও স্বভাবিত আছে।

সাঁওতালি পট দেখাবার সময় পটুয়ারা স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তাদের আদি কথা বর্ণনা করে যায়। 'নিইদ যমরাজা নিইদ পাপহিড় তাহে কানা। নিইদ এডি চালাক হড় তাহে কানাই। যমরাজা সাপ আকা দিয়াই। নিইদ মামা ভাগ্নে তানে কানা। লেড়ই নিনা কিন। শাস্তি হোই ইনাকিন। হটবারের আকা দিয়া বিশ।' দড়িতে দু'জনকে বেঁধেছে। একজনকে পেরেক মেরেছে। মোর জলুই কিন। নিইদ টাকাইরে দাকাতে যমনি দাই। হেঁসেলের হাঁড়িতে লোকটা ভাত খেয়েছিল। তার জন্যে যমালয়েব দড়ি বাঁধা আছে তার গলায়। দুনিয়ার লোক দেখুক। দুনিয়ার হড় নিয়ালে কানাই। হটরে আকা-আতা দিয়া। শাস্তি আকাদিয়া। সেংগেল তাহে তুলুই তুলুই। বাই এমুয়া। আগুন চাইতে গেলে আগুন দেয় নাই। ব্রহ্মচারী তাকেও দেয় নাই। বিপিলা কাদা ডুরসি সিংগেল। তার জন্য মাথায় আগুন দিয়েছে যমরাজ। আনি এডি তাতে পাপী কানা। বাইতিঙ্ বাই এমুয়া। জনম-বারের তুল আকাদিয়া। কাঁটার দড়িতে বেঁধেছে যমরাজ। ভিক্ষা চাইতে একমুঠো ভিক্ষা দেয় নি। ঢিংকি তাহে তুলুই তুলুই। তাই শাস্তি। বাই হুরু অবু অহি। যমরাজ দেইলা ঢিংকিরে দেই নে। আদো হুরুং ইদে কানা। ঢেকি থাকতে ঢেকি দেয় নাই। তাই যমরাজ তার মাথায় ঢেকি ভেঙ্গে দিয়েছে।

আদিবাসী পটের এই হচ্ছে মূল বক্তব্য। ইহজীবনে যে যে অন্যায় করে যমালয়ে তার শাস্তি হয়। কোনো রকমেই বক্ষা পায় না। অনেক লৌকিক উপাখ্যানও সাঁওতালি পটে চিত্রিত হয়। নাকি পিলকু হারাম নাকি পিলকু বুড়ি। ইতু সিন্দুর লিমাকিন। আদিনা গাড়রে লিমাকিনে। নাড় বিড় তেবু চলা। ওকারে কিনা তাহেনা। নদেও গেবু বিড় খেন লিমাকুন। সাদেকি বাং সামাল কি নাই। জিল আর খেতা কিন। মারাং বুরু দিকু হেই ইনাকিন। ওকারে কিন তাহে কানা। দাদুল বুড়ি বুকে গেড় ইনাকিন। আদেল ঋণ কাতে যমলিদা। ওলে বুকে কে হুড গেলেকিনা। ভগবান দুয়োরে গেলে এনওয়া। ইতু সিন্দুর কাতে আদো হোই ইনা। বাকি হোই ইনা। আদো বাকি তোকি হোই ইনা। আদো মারং হো কাতে আলো বাগাম। এক বুড়াবুড়ি ছিল। তাদের বিয়ে হল। ছেলে হল। ছেলেদের আদিনা গর্তে রাখলো। মারাং বুরু বলেছিল, আদিনা গর্তে রাখতে। ওরা শিকারে গেল। কিছুই পেলো না। জিল আর সিতা কুকুর দুটিও সঙ্গে গিয়েছিল। বুড়োবুড়ি বললে, কোথায় ছেলে আছে তা দেখতে যাব। ওরা ঋণ করে খেয়েছিল। ঋণ শুধতে পারে নি। তাই বুকে ওদের ধান গাছ গজিয়েছে। বুড়ো বুড়ির ছেলে মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। বুড়োবুড়ি তাই ছেলে দেখতে পেলো না। বড় কাঁদতে লাগলো। সে কান্নার বিরাম নেই। তাই মারাং বুরু বললে, তোরা কাঁদিস না। তোদের ছেলে আর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। কান্নাব কি আছে : দেখা পাবি।

এইভাবে অনেক উপাখ্যানও পরিকল্পিত ও চিত্রিত হয়। এই চিত্রগুলি আদিম পদ্ধতিতে অঙ্কন করা হয়। কেবলমাত্র প্রথম ভাবতে শেখা মানুষের আঁকা। একটু লক্ষ করলে জানা যায়, সে আমলে ঋণ করলে এবং তা পরিশোধ না করলে পেটে ধান গাছ গজাতো। এই বিশ্বাস আস্তে আস্তে মানুষের মনে সামাজিক কর্তব্য বোধ সঞ্চার করত। এই সামাজিব কর্তব্য বোধের সুযোগে মহাজন সুদখোরের জন্ম হয়। ভিক্ষা না দিলে ঈশ্বরের দরবারে শাস্তি পেতে হয় এই সংস্কারও আস্তে আস্তে ধর্মীয় অনুশাসনে পরিবর্তিত হয়ে মানবিক ধর্ম বোধের সঞ্চার করে। আদিম কালেই প্রকৃত সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে মানুষের মানসিকতা পরিস্ফূর্তি লাভ করে। তাই শুধুমাত্র যমালয়ের ছবি আঁকার প্রথার মধ্যে মানুষের ধারণা আটকে থাকেনি।

যাদো সম্প্রদায়ের মতোই চিত্রকর (পটুয়া) সম্প্রদায়েরও পট দেখাবাব পূর্বে ও পরে যমালয়ের চিত্র দেখাবার রীতি আছে। কিন্তু তাদের যমপটে যমের ছবি বেশ ভদ্রলোকের মতো দেখতে। শৌর্য-বীর্যশালী। বলিষ্ঠ রীতিতে আঁকা হয়। দু-রকমের দুটি যমের ছবি পাশাপাশি রাখলে আদিম রীতির যে বিবর্তন হয়েছে তা অবিসম্বাদিতভাবে জানতে পারা যায়।

চিত্রকরদের পট দেখাবার রীতিতে কোনোদিনই ব্রাহ্মণ্যবাদ কোনো পোষকতা করেনি। পট দেখাবার প্রথমে ও শেষে চিত্রকরেরা জগন্নাথ, সুভদ্রা আর বলরামের পট দেখায়। গান করে :

জগন্নাথ শিরিক্ষেতের কহনে না যায়।
চণ্ডালেতে অন্ন রাঁধে ব্রাহ্মণে বেঁটে খায়।।

এইভাবে লৌকিক ধারা কোনো রকমে ভুলতে না পারায় পটুয়ারা সমাজে অপাংক্তেয়ই থেকে গেছে আজও! বাংলার ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুদ্ধারের যুগে তাই এই চিত্রকররা দলে দলে মুসলমান হ'লেও হিন্দুদের দেব-দেবী নিয়ে চিত্র রচনা করার জীবিকা ভুলতে পারেনি। ভুলতে পারেনি লৌকিক বাঙালি জীবন থেকে নানা ঘটনা নিয়ে চিত্র রচনা করা। এমন কী বাংলার বিভিন্ন লৌকিক উপাখ্যানকে পটচিত্রে রূপদান করা থেকেও তারা বিরত হয়নি।

এই পটশিল্প বাঙালীর নিজস্ব চিত্রাঙ্কন রীতি। তাই আদিবাসী চিত্রের গতি-প্রকৃতি বাঙালি জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা অনস্বীকার্য। এমনকী আর্যদর্শনকেও এই চিত্রাঙ্কন রীতি যে প্রভাবিত করেছিল তা অনস্বীকার্য। পরলোকের কল্পনা শুধুমাত্র আর্যদের দ্বারাই পরিকল্পিত হয়নি। দেশীয় জনসাধারণ আপন কল্পনায় মানুষের দুর্জ্ঞেয় মৃত্যু রহস্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরলোকতত্ত্ব আবিষ্কার করে। ওদের গানগুলি হয়তো সাহিত্য না হয়ে উঠলেও রীতি-কর্তব্য নির্ধারণে, সমাজ সচেতনতার পথে এই পরলোকতত্ত্ব সমাজ বিন্যাসের গতি ত্বরান্বিত করেছিল। একথা দ্বার্থ্যহীনভাবে স্বীকার করতে হয়। কেননা আদিম মানুষের মনেই সমাজমনস্কতা দানা বেঁধে উঠেছিল।

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা ❑ ১৮ই মে ১৯৭৩ সংখ্যা হতে পুনর্মুদ্রিত।

সাঁওতালদের ভাবনায় মৃত্যু

ওঙ্কার প্রসাদ

মানুষের জীবনের সমস্ত পর্যায়ের মধ্যে মৃত্যুই সবচেয়ে রহস্যময়। আদিবাসী গোষ্ঠী সাঁওতালদের মৃত্যু সম্পর্কে নিজস্ব চিন্তাভাবনা রয়েছে। তাদের মিথে আছে ঠাকুর জিউ (সূর্য দেবতা) -র কথা, যিনি পৃথিবীতে জীবনের সৃষ্টি করেছিলেন; তিনিই আবার মৃত্যুর জন্য দায়ী। পূর্বে মনে করা হত, যে সব ব্যক্তি সম্প্রদায়ের নৈতিকতাকে ভঙ্গ করে তাদের উপর মৃত্যু শাস্তি স্বরূপ নেমে আসে। বাহা মিথে আছে, আদি দম্পতি পিলচু বুড়ি আর পিলচু হারামের পুত্রকন্যারা যখন এতই পাপাসক্ত ও স্বার্থপর হয়ে উঠল যে কেউ কাউকে গ্রাহ্য করে না, তখন ঠাকুর জিউ মনস্থ করলেন তাদের ধ্বংস করার। সেই মতো তিনি অগ্নিবর্ষা সৃষ্টি করলেন। পিলচু বুড়ি আর পিলচু হারাম বাদে আর সবাই মারা গেল। এরা দুজন লোগো পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিল। এই সময় তাদের অন্যতম প্রধান দেবতা মারাং বুরুর (মহানপর্বত শ্রেষ্ঠ) অনুরোধে ঠাকুর জিউ বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে পৃথিবীকে আবার শীতল করলেন। পৃথিবীতে আবার জীবন জেগে উঠল।

সাঁওতালদের মতে মৃত্যু মানবদেহ থেকে আত্মার 'উড়ে যাওয়া' ছাড়া আর কিছু নয় (জি বি উদাও কানা)। এর ফলে মানবদেহ সৃষ্টির দুটি মূল উপাদান, মাটি ও বাতাস যার একটি আবার মাটিতে মিশে যায় (হাসা হবমো হাসারে মিটাওউ) আর অন্যটি বাতাসে লীন হয়ে যাওয়া (হস জিঁজবান হোয়ারে মিটাওউ)। মৃত্যু সম্পর্কে এই ধারণা একটি বিষয়কে পরিষ্কার করে যে, সাঁওতালরা মানব দেহ থেকে পৃথক একটি 'আত্মা'-র অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। তারা আরও বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পর আত্মা বর্তমান জগত ছেড়ে এক অন্য জগতে চলে যায়। এই দুটি বিশ্বাস জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সাঁওতালদের প্রভাবিত করে। এর ফলে অতিপ্রাকৃত জগতের উপর তাদের যে নির্ভরশীলতা গড়ে ওঠে তা মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত নানা আচার সংস্কারের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

সাঁওতালরা বিশ্বাস করে এই পৃথিবীতে তারা নির্ঝঞ্ঝাটে বেঁচে আছে কেবলমাত্র কিছু অতি প্রাকৃতিক শক্তির দাক্ষিণ্যে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তারা এই সমস্ত অতিপ্রাকৃত শক্তিকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। এদের দ্বারাই তারা মৃত্যুর জন্য দায়ী বিভিন্ন অশুভ শক্তিকে বশে আনার চেষ্টা করে। সাঁওতালরা মৃত্যুকে কখনো কখনো কোনো নৈর্ব্যক্তিক শক্তি এবং ডাইনি ক্রিয়াকলাপের ফল বলে মনে করে। বাস্তবিক তারা বিশ্বাস করে শুভ শক্তির অশুভ শক্তির কাছে পরাজয় ঘটলে তবেই মৃত্যু নেমে আসে। ফলে যখন কোনো মৃত্যু ঘটে তখন মৃতের পরিবার পরিজন এবং গ্রামটি অশৌচ হয়ে যায়। এবং ধরে নেওয়া হয় যে, এসময় তারা রক্ষক শক্তির (Guardian

spirits) অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে হলে মৃতের সৎকার এবং অন্যান্য শুদ্ধিকরণ সংস্কার পালন করতে হয়। কেননা তা না করা হলে তখনও অবধি মৃত ব্যক্তি তার মৃত পূর্বপুরুষদের কাছে পৌঁছোতে পারে না এবং পরিবারেরই সদস্য হয়ে থাকে। যেজন্য মৃত্যুর পরপরই মৃতদেহটিকে দাহ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এটিকে একটি খাটিয়ায় শোয়ানো হয় এবং তেল ও হলুদ মাখানো হয়। তার হাত পা জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হয় এবং তার মুখেও কয়েক ফোঁটা জল দেওয়া হয়। অতঃপর দেহটিকে তারা একটি নতুন সাদা কাপড়ে মুড়ে দেয়। শ্মশানে মৃতের সঙ্গে বেশ কটি দ্রব্য নিয়ে যেতে হয়। যেমন—কুলো, শালপাতার পাত্র, কোদাল, কুঠার, ধান এবং কিছু পোড়া কার্পাস বীজ। সেই সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় হলুদ বাটা, ছোট মাটির ঘট, চালগুঁড়ি, একটি বাচ্চা মোরগ, মৃতব্যক্তির বাড়ির চালার কিছু শুকনো খড়। একটি খড়ের দড়ির শেষাংশ মৃতের বাড়িতে পোড়ানো হয়। কুঠার, তীর-ধনুক, পেতলের বাটি, বাঁশি অথবা মাদল, লাঠি এবং কটি কয়েন মৃতের খাটিয়ায় দেওয়া হয় এই বিশ্বাসে যে এগুলি মৃতব্যক্তি যে জগতে (হানাপুরি) যাত্রা করছেন, সেখানে দরকার হবে। মৃত ব্যক্তিটি যদি মহিলা অথবা বালিকা হয় তাহলে চিতায় তার বালা, দুল ইত্যাদি অলঙ্কার উপহার স্বরূপ দিয়ে দেওয়া হয়। যাই হোক চারজন ব্যক্তি খাটিয়াটি বহন করে এবং রাস্তার মোড়ে এটিকে নামায়। সেখানে একজন ওঝা মৃতদেহের উপর ঝাড়ফুঁক (exorcise)করে। দেহটিকে যখন শ্মশানের রাস্তায় নিয়ে যাওয়া হয়, তখনও ওঝা এটিকে ঝাড়ফুঁক করে। সেখান থেকে মৃতদেহটিকে শ্মশানে আনা হয়। চিতাটি উত্তর-দক্ষিণ মুখো করে সাজানো হয়। চার ব্যক্তি খাটিয়াটিকে নিয়ে চিতাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে। তারপর এটিকে চিতার উপর রাখা হয়। এবার উপহার সামগ্রী সহ শ্মশানে বয়ে আনার খাটিয়াটিকেও সরিয়ে নেওয়া হয়। মুরগিটিকে চিতার পূর্বদিকের পায়ায় গিঁথে রাখা হয়। পূর্বে উল্লিখিত জ্বলন্ত দড়িটি থেকে আগুন নিয়ে মৃতের মুখে ঠেকানো হয়; সাধারণত মৃতের জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ পুত্রই এই কাজটি করে থাকেন। এরপর চিতায় আগুন দেওয়া হয়। মৃতদেহটিকে অনুরোধ করা হয় যাতে সে দ্রুত দগ্ধ হয়ে যায়। মূল শোককারী ব্যক্তি যিনি মুখাগ্নি করেছেন এবং অন্যান্য গ্রামবাসীরা কিছুটা দূরে বসে থাকেন। একজন নাপিত তাদের মস্তক মুণ্ডন করে দেয়। দেহটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেলে চিতাটিকে জল দিয়ে নেভানো হয়। এরপর মূল শোককারী (chief mourner)তিন টুকরো হাড় (জানবা বাহা) সংগ্রহ করেন—একটি কণ্ঠাস্থি ও দুটি করোটির অস্থি। এগুলিকে বলা হয় অস্থিপুষ্প (জানবা বাহা)। এখন হাড়ের এই 'ফুল' গুলিকে একটি মাটির পাত্রে রাখা হয়। ছোট্ট ছিদ্রযুক্ত একটি ঢাকনা দ্বারা এই পাত্রটিকে ঢেকে রাখা হয়, যাতে মৃতব্যক্তি শ্বাস নিতে পারেন। মনে করা হয় যে, এখানে .মৃতব্যক্তিটি কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নেয় এবং তার আত্মাটিও এখানেই থাকে। যাইহোক, চিতাটি যখন সম্পূর্ণ নিভে যায়, তখন শবানুগমনকারীরা প্রত্যেকে স্নান করে নেন। মূল শোককারী নদীতে বেশ কিছুটা নেমে যান। সকলের স্নান শেষ হলে পর সে তার হাতের হাড়ের 'ফুল'গুলিকে তিনটি পাতার পাত্রে করে পশ্চিমমুখো ভাসিয়ে দেয়।

এর সঙ্গে একটি দাঁতন কাঠি ও কিছুটা মাটিও দিয়ে দেওয়া হয়। এই আচারের সঙ্গে সঙ্গে ই মৃত ব্যক্তিটি পূর্বপুরুষ (হাপরামকো)দের গোত্রভুক্ত হয়ে যান। এবার শ্মশানবন্ধুরা গ্রামে ফিরে আসেন এবং গ্রামে প্রবেশের পূর্বে জ্বলন্ত রেজিনের ধূমে নিজেদের শুদ্ধ করে নেন। তারপর যে যার ঘরে ফিরে যান। বিকেলের দিকে গ্রামে বয়স্ক ব্যক্তিরা মৃতের বাড়িতে সান্ত্বনা দিতে আসেন।

শুদ্ধিকরণ আচার

তেল নাহান ও ভাণ্ডান সংস্কার (rituals) পালনের দ্বারা শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। মৃত্যুর পঞ্চম অথবা নবম দিনের মাথায় তেল নাহান অনুষ্ঠানটি হয়। মৃত ব্যক্তির কোমের (clan) সকল ব্যক্তি ও গ্রামবাসীরা মৃতের বাড়িতে আসেন। এখানেও নাপিত মস্তক মুণ্ডন করে দেয়। তারা গায়ে তেল মেখে শুদ্ধিকরণ স্নানে যায়। এরপর মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। একটি শালপাতায় চার আঙুল দৈর্ঘ্যের তিনটি দাঁতন কাঠি, খোল (oil cakes) এবং চটচটে মাটি (soaps earth) রাখা থাকে। এগুলিকে মারাং বুরু, মৃতব্যক্তি ও পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে অর্পণ করা হয়। মারাং বুরুকে অনুরোধ করা হয়, এই সমস্ত দ্রব্য দিয়ে শুদ্ধিকরণের পর মৃত আত্মাকে স্বীকার করে নিতে। তারপর সকলে আবার স্নান করে শুদ্ধ হয়। অতঃপর তাদের হাঁড়িয়া দেওয়া হয়। রাত্রে মারাং বুরু ও মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে মুরগি বলি দেওয়া হয়। হাঁড়িয়া পান ও ভোজের মধ্যে দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্ত ঘটে। মৃতব্যক্তির উদ্দেশে একটি বাস্কেটে খাবার অর্পণ করা হয় এবং এটিকে চালার মাচা (vaftu) বা আড়া থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। পরের দিন সকালে খাবারটিকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে দেখা হয় যে এটি মৃতব্যক্তির আত্মা খেয়েছে কিনা। তেল নাহানের দ্বারা গ্রামটি অশৌচ মুক্ত হয়, কিন্তু পরিবারের অশৌচ দশা কাটে না যতদিন না ভাণ্ডান হয়।

ভাণ্ডানের দিন সকল আত্মীয় পরিজনরা হাঁড়িয়া, মোরগ বা শূকর নিয়ে মৃতের বাড়িতে আসে। উৎসর্গের জন্য একটি শূকর ও গুটিকয়েক মোরগ মৃতের বাড়ির লোকজন পূর্বেই জোগাড় করে রাখে। গ্রামের মোড়ল ছাড়াও অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। গ্রামের নাপিত পুরুষদের কামান করে। তারপর পুরুষ ও মহিলারা গ্রামের নিকটবর্তী পুকুর বা নদীতে স্নান করে নেন। স্নান করে ফেরার সময় একজন মারাং বুরু ও অন্যজন মৃতব্যক্তির অস্তিত্বকে নিজেদের উপর আরোপ (impersonate)করে। তারা কণ্ঠনালী নিঃসৃত অদ্ভুত শব্দ করে (guttural sound)এবং মাথা ঝাঁকাতে থাকে। একজন আত্মীয় মৃতব্যক্তির নাম ধরে ডাকে এবং মৃতব্যক্তির দেহধারী ব্যক্তি তখন উপস্থিত সকলের কাছে জল চায়। এদের দুইজনকেই হাঁড়িয়া দেওয়া হয়। ভাগমাঝি মৃতব্যক্তির উঠোনে একটি শালগাছের ডাল পোঁতেন এবং মূল শোককারীব্যক্তি এই শাখাটির সামনে একটি মোরগের মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করে এটিকে উৎসর্গ করেন। একটি ছাগলকেও উৎসর্গ করা হয় এইজন্য যে মৃতব্যক্তি যেন পরিবারের সকল জীবিত ব্যক্তিদের সমস্ত রকম বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

হাঁড়িয়াও উৎসর্গ করা হয়। রাত্রে মূল শোককারী বিগত আত্মার উদ্দেশে কিছু খাবার অর্পণ করেন এবং প্রার্থনা করেন যাতে তিনি পুরো পরিবারটিকেই অশৌচ মুক্ত করে দেন। এইভাবেই মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত আচার পালনের সমাপ্তি ঘটে।

কিন্তু কোনো সাঁওতাল যদি কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি কোনো সংক্রামক বোগে মারা যান, তবে তার দেহকে কবর দেওয়া হয়। কবরটি খোঁড়া হয় উত্তর-দক্ষিণ মুখী করে। এর দেওয়ালে দুটি ফাঁক রাখা হয় যাতে মৃতব্যক্তি শ্বাস নিতে পারেন। কবর দেওয়ার আগে গর্তে একটি সাদা কাপড় পেতে তার উপর মৃতদেহটি শোয়ানো হয়। এরপর একটি মোরগকে এই কবরে গেঁথে দেওয়া হয়, যাতে সেও মৃতব্যক্তির আত্মার 'অন্যজগতে' যাত্রা পথে সঙ্গী হয়। কবরটিকে মাটি দিয়ে ঢেকে এর উপর বড়বড় নুড়ি পাথর চাপিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া কাঁটার ঝাড়ও চাপানো হয় এর উপর; যাতে কোনো জীবজন্তু দেহটির কোনো ক্ষতি করতে না পারে। স্থানটিকে গোবর লেপে শুদ্ধ করা হয়। এরপর শোককারীরা ফিরে আসেন। যদি কোনো গর্ভবতী মহিলা মারা যান, তাহলে তার ভ্রূণটিকে দেহ থেকে বের করে কবর দেওয়া হয়, কিন্তু তাকে পোড়ানো হয়। কোনো বাচ্চা যদি কথা শেখার আগেই মারা যায়, তাহলে তাকে কবর দেওয়া হয়; এবং কোনো আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয় না।

মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত নানা আচার থেকে বোঝা যায় যে, সাঁওতালরা মৃত্যুর পরেও জীবনের নিরবচ্ছিন্নতায় বিশ্বাস করে। মৃত্যুর প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গিটি তাদেব প্রবেশন (initiation) অনুষ্ঠান থেকেও স্পষ্ট হয়। এই অনুষ্ঠানে একটি সাঁওতাল ছেলের হাতে তিনটি দাগ (সিকা) আঁকা হয়; এর ক্রমটি হল; জীবন-মৃত্যু-জীবন (জিওন-মোরোন-জিওন)। সাঁওতালরা মৃত্যুকে অশুভ মনে করে; তাই এর মধ্যে দিয়ে জীবনের সমাপ্তি তারা মেনে নিতে পারে না; যেজন্য তারা বিজোড় সংখ্যার সিকা আঁকে যাতে মৃত্যুর পরেও জীবন প্রতীকায়িত হয়।

একজন সাঁওতালকে মৃত্যুর পর অন্যজগতে গিয়ে সেখানে তার পূর্বপুরুষদের তার হাতেব সিকা চিহ্নগুলিকে দেখাতে হয়। যদি সে তা দেখাতে না পারে তাহলে টুম্‌ডাক (ত্রিকোণাকার বাদ্যযন্ত্র)-এর মতো বড় একটি দৈত্যাকার পোকা তার কোলে উঠে তাকে যন্ত্রণা দেবে যতক্ষণ না সে পোকাটির দ্বারা উদরীকৃত হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে থাকে। তবে তাদের ক্ষেত্রে বাঁ হাত, কাঁধ এবং বুকে বিবাহের পূর্বে উল্কি আঁকা হয় (খোদা); আর বিবাহেব পরে হলে ডান হাতে উল্কি থাকে। যদি সে মৃত্যুর দেবতাকে এই চিহ্নগুলি দেখাতে না পারে তাহলে তিনি তাকে অপবিত্র বলে মনে করবেন এবং তাকে সরাসরি নরকে নিক্ষেপ করবেন। যাই হোক না কেন, একবার যদি আত্মা অন্য জগতে চলে যায়, তাকে আবারও জন্মগ্রহণ করতে হবে। এটা অবশ্য তার জীবদ্দশায় কৃতকর্মের উপর অনেকটা নির্ভর করে। একজন যদি জীবনকালে খুব খারাপ কাজ করে তবে তাকে জন্তু অথবা পাখি হয়ে জন্মাতে হবে; ভাল কাজ করলেই কেবল মানুষ হয়ে জন্মাবে। যাইহোক, কোনো ব্যক্তি যদি অপঘাতে মারা যায় অথবা কোনো মহিলা গর্ভবতী অবস্থায় অথবা বাচ্চার জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায়; সেক্ষেত্রে আত্মাটি যথাযথভাবে শুদ্ধতা পায় না। তারা অশরীরী জগতের বাসিন্দা হয়ে পড়ে; এবং পৃথিবীতে ভূত বা চুরিন হিসেবে ঘুরে বেড়ায়।

উপসংহার

এককথায় বলা যায়, সাঁওতালরা মৃত্যুর উৎসে দেখে অতিপ্রাকৃতিক শক্তিকে। মৃত্যু যে মানুষের কাছে অভিশাপ রূপে আসে তাই এটি অশুভ। অধিকন্তু সাঁওতালরা মৃত্যুর পরেও জীবনের বহমানতায় বিশ্বাস করে। যেজন্য তারা বিগত আত্মার পূর্বপুরুষদের জগতে যাত্রাপথকে মসৃণ করে তোলার জন্য, জীবিত ব্যক্তিদের অশৌচ মুক্ত করার জন্য নানা শ্মশান-আচার ও শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান পালন করে। কিন্তু অপঘাতে মৃত্যুর ক্ষেত্রে আত্মা পূর্বপুরুষদের দেহে প্রবেশ করতে পারে না; এর কারণ এইসব আত্মা পরিপূর্ণভাবে পবিত্র মর্যাদা লাভ করে না। সাঁওতালরা পুনর্জন্মেও বিশ্বাস করে। মৃত্যুর পর জীবনের প্রবহমানতা ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস জীবিতকালে ও ইহলোকে সাঁওতালদের জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

উল্লেখ্য সূত্র

আর্চার, ডব্লিউ জি; ১৯৭৪, *দি হিল অফ্ ফ্লুটস্ : লাইফ, লাভ অ্যান্ড পোয়েট্রি ইন ট্রাইবাল ইন্ডিয়া*; নিউদিল্লি: এস চাঁদ অ্যান্ড কোং।

দুপ্রে, উইলহেম; ১৯৭৫, *রিলিজিয়ন ইন প্রিমিটিভ কালচারস্ : এ স্টাডি ইন এথনোফিলোসফি;* মাইটন।

মুখার্জি, সি. এল.; ১৯৬২, *দি সানতালস্*; ক্যালকাটা, মুখার্জি অ্যান্ড কোং।

ট্রয়সি, কো ; ১৯৭৯; *ট্রাইবাল রিলিজিয়ান : রিলিজিয়াস বিলিফস্ অ্যান্ড প্র্যাকটিসেস অ্যামং দি সানতাল্স্*; নিউদিল্লি, মনোহর পাবলিকেশন্স্।

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী, এথনোমিউজিকোলজিস্ট; অধ্যাপক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন।

রচনাটি 'Death in Santal Thought' নামক প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ। উৎস : Sacred Science Review, vol-1; 2003, pp. 33-38.
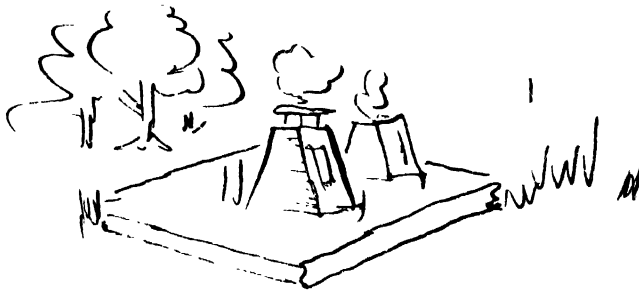
পরলোকের স্বরূপ

আমিনুল ইসলাম

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন, দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তেমনি সাধারণ মানুষ ও ভাবুক দার্শনিকদের অনেকেই পরলোকের বাস্তবতা স্বীকার করেছেন। তবে তাঁদের কেউ কেউ পারলৌকিক জীবনের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। বলা হয়েছে, বর্তমান জীবন বহুলাংশে দুঃখ দুর্ভোগ, অনিশ্চিত ও অ-নিরাপত্তার জীবন। এ জীবনে অপূর্ণতা ও অসন্তোষের কারণে আমাদের মনে এমন এক উৎকৃষ্টতর পরলোকের প্রত্যয় ও প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়, যেখানে আমরা ইহলোকের কোনো দুঃখ দুর্ভোগের পুনবাবৃত্তি দেখব না, বরং এক অনন্ত আনন্দময় জীবনের সন্ধান পাব। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধর্ম আমাদের সুনির্দিষ্ট আশ্বাস দিয়েছে এবং সেই আশ্বাসের ভিত্তিতে আমরা ইহলোককে পরলোকের প্রস্তুতিপর্ব বলে ধরে নিয়ে পরলোকের অনন্ত সুখশান্তির আশায় ইহলোকের দুঃখ দুর্দশা শোষণ নির্যাতনকে তুচ্ছ জ্ঞান করি।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, পারলৌকিক জীবন কি আমাদের বর্তমান পার্থিব জীবনের অনন্ত দীর্ঘায়ন? তাই যদি হয় তাহলে এ ইহলৌকিক জীবনকে সীমাহীনভাবে দীর্ঘায়িত করে আমরা কি আমাদের পরম ঈপ্সিত দুঃখলেশহীন আনন্দ পাব? আমরা আমাদের ব্যক্তিগত অস্থিত্বের অনন্ত স্থিতি আশা করি ঠিকই, কিন্তু শৈশব যৌবন বার্ধক্য-জীবনের এই তিন পর্বের ঠিক কোনটির অনন্ত দীর্ঘায়ন আমরা পরলোকের আশা করব? এ তিনটির সবগুলোই আমাদের বর্তমান পূর্ণ জীবনের আবশ্যিক পর্ব। এদের অনন্তভাবে দীর্ঘায়িত করলে আমরা পেতে পারি অনন্ত শৈশব, অনন্ত যৌবন ও অনন্ত বার্ধক্য। এদের যেকোনোটিকেই আমরা নির্বাচন করি না কেন, অনন্তভাবে ভোগ করার ফলে এটা কি একঘেয়ে ও অস্বস্তিকর হয়ে যাবে না? অনন্ত সুখে পারলৌকিক জীবন যত সুখের জীবনই হোক না কেন, অনন্তকাল ধরে যদি আমরা সুখভোগ করি এবং দুঃখের কোনো স্পর্শ অনুভব না করি, তাহলে এই বিরামহীন অনন্ত সুখ সত্যিই সুখকর বলে অনুভূত হবে কি? অর্থাৎ বর্তমান পার্থিব জীবনকে অনন্তভাবে দীর্ঘায়িত করাই যদি আমাদের পরলোকের ব্যবস্থা হয়, তাহলে এ ধরনের পরলোক আমাদের কাম্য কিনা, তা ভেবে দেখা দরকার বটে।

তাহলে কী ধরনের পরলোক কাম্য? এ প্রশ্নের কোনো বিজ্ঞানসম্মত ও অভিজ্ঞতা প্রসূত উত্তর জানা নেই। সঠিক খবর নেয়ার সদিচ্ছা নিয়ে একবার যদি পরলোকে যাবার চেষ্টা করি, তাহলে সেখান থেকে খবর নিয়ে পৃথিবীতে আবার হাজির হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই। এই পরিস্থিতিতে স্মরণাতীত কাল থেকে ভাবুক দার্শনিকেরা বিচার বিশ্লেষণ ও আন্দাজ অনুমানের মাধ্যমে সমস্যাটির সমাধান হাজির করেছেন, আমরাও এর বেশি অগ্রসর হতে পারি না। সীমিত সুযোগ-সুবিধার আওতায় এই গুরুতর প্রশ্নটি নিয়ে ভাবতে গিয়ে আমার

মনে হয় যে, বর্তমান দেহের হুবহু পুনরুজ্জীবন এবং অবিনশ্বর আত্মার সঙ্গে এর পুনর্মিলনের মাধ্যমে পরলোকে আমরা যদি আমাদের নিজেদের পার্থিব সত্তা খুঁজে নাও পাই তাতে হতাশ হবার কিছু নেই, কারণ দেহ মনের হুবহু পুনরুজ্জীবন সম্ভব না হলেও বর্তমান জীবনে অর্জিত আমাদের নৈতিক ও মূল্যবোধজনিত কৃতি ও কীর্তি মরণের সঙ্গে সঙ্গে বিনাশ হয়ে যেতে পারেনা। মৃত্যুতে দেহের বিনাশ হয়ে গেলেও আমাদের অর্জিত নৈতিক উৎকর্ষ অনন্তকাল না হলেও অনেকদিন টিকে থাকবে এবং অন্যদের সৎকর্মের প্রেরণার উৎস হবে—এ আশা আমরা করতে পারি। মোট কথা, আমরা যে অমরত্ব নির্বিঘ্নে আশা করতে পারি তাকে যে বর্তমান জীবনের অবিকল কপি হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আবার আমাদের যে বর্তমানে দেহ নিয়েই পরলোক পুনরুত্থিত হতে হবে, নতুনভাবে বসবাস করতে হবে, এ আশাও অপরিহার্য নয়। দেহ ও আত্মার পুনরুত্থান বা মূর্ত অস্তিত্ব ছাড়াও নিছক স্মৃতির আকারেও এক ধরনের অমরত্ব আমরা আশা করতে পারি।

দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার সব কিছু বিনষ্ট হয়ে যাবে—একথা আমরা মেনে নিতে এবং মরণকে সবকিছুর পরিসমাপ্তি বলে স্বীকার করতে পারি না। তা যদি করি তাহলে এ জীবন অর্থহীন ও জীবনযাপন অসাধ্য হয়ে পড়ে। ব্যক্তি ও জীবনের দেহ ছাড়াও এমন কিছু সদ্‌গুণ ও মূল্যায়ন রয়েছে যাদের নিছক জড়ীয় পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা যায় না ঠিক, কিন্তু তবু তারা আমাদের পরম কাম্য। যেমন মানুষ জ্ঞান ও সত্যের সন্ধান করে। সুন্দর ও শুভের চর্চা করে। সত্য সুন্দর শুভ প্রভৃতি যেসব মূল্যায়ন ও মূল্যবোধের অনুশীলন ও অনুকরণের মাধ্যমে মানুষ তার জীবনকে অর্থবহ করার প্রয়াস পায়, যাদের অভাবে মানবজীবন পাশবিক জীবনে অধঃপতিত হয়ে যায়, দেহাবসানের সাথে সেসব মূল্যবোধও বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এ আমরা মেনে নিতে পারি না। সত্য সুন্দর শুভ প্রভৃতির যদি কোনো দেহাতিরিক্ত স্থায়ী মূল্য ও তাৎপর্য না থাকতো তাহলে প্রতিকূল পরিবেশে দৈহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উৎসর্গ করে, এমনকী উৎপীড়ন নিপীড়নের মুখেও মানুষ এদের সন্ধান ও অনুশীলনে অটল থাকত না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের দুঃসাধ্য সংগ্রামেও ব্রতী হত না।

মোট কথা, ন্যায়, ধর্ম, সত্য ও সুন্দরসহ সব মূল্যায়ন ও মূল্যবোধের একটি স্থায়ী তাৎপর্য রয়েছে—এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। মরণের পরও এসব মূল্য যদি টিকে থাকে তাহলে তারা থাকবে ব্যক্তির সেই ইচ্ছা ও আদর্শের আকারে। যার সাহায্যে তা অর্জিত হয়েছে। ব্যক্তির ইচ্ছা ও আদর্শ মরণোত্তর স্থিতিলাভ করতে পারে একাধিক উপায়ে। প্রথমত, তা স্থিতিলাভ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সন্তান-সন্ততি সহ বিভিন্ন উত্তর পুরুষের মাধ্যমে। বিজ্ঞানীদের মতে, ব্যক্তি যে জীবাণুর সমবায়ে গঠিত তাদের বিনাশ নেই। এসব জীবাণু পরিবর্তিত হয়ে বংশানুক্রমে উত্তরপুরুষের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে পূর্বপুরুষদের অর্জিত সদ্‌গুণ ও ভাবাদর্শকে টিকিয়ে রাখে। তাই স্থূল অর্থে মৃত্যুতে দেহ বিনষ্ট হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যক্তিসত্তা কখনো সর্বতোভাবে বিলীন হয় না।

সৌজন্যে : পৌরোহিত্য বার্তা ❑ বর্ষ ১, সংখ্যা ২, পৌষ সংক্রান্তি, ১৪০৮

অন্ত্যেষ্টি শ্রাদ্ধ ও আনুষঙ্গিক : মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে

সনৎকুমার নস্কর

জীবনের অবসান মৃত্যুতে। চলমান প্রাণের প্রবাহ মৃত্যুর প্রস্তর-কঠিন দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে ঘটায় বিষম এক ছন্দপতন। মৃত্যু তাই মানুষের স্বাভাবিক বোধে সঞ্চারিত করে দেয় এক অপূরণীয় নেতিবাচক ধারণা। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষ একে অন্যের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্বীকার করেছে। মৃত্যুর কর্কশ হাত সেই আত্মীয়তার সূত্র ধরে টান দেয়, নির্মম ভাবে ছিঁড়ে ফেলে দীর্ঘদিনের ইহলৌকিক বাঁধন। এ ক্ষতি অপূরণীয় জেনেও মেনে নিতে হয় জীবিতদের। কেননা মৃত্যু জীবের অন্তিম পরিণাম, যার কোনো অন্যথা ঘটার সম্ভাবনা নেই। মৃত্যুলোকের অবস্থান জীবলোকের বিপরীত মেরুতে। সেখানে জীবিত আত্মার প্রবেশ নিষেধ। তাই মৃত্যুলোক সম্বন্ধে জীবিত মানুষের অপার কৌতূহল, আর সেই কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই মৃত্যু, মৃত আত্মা ও মৃত্যুলোক নিয়ে যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষ নানা ধারণা, সংস্কার, প্রথা, বিশ্বাস, আচার ইত্যাদি গড়ে তুলেছে। বলাবাহুল্য সেসব ধারণা পুরোটাই কাল্পনিক, ফলে মৃত্যুকেন্দ্রিক কৃত্যসমূহও সেই কল্পিত বিশ্বাস-সংস্কারের দিকে তাকিয়ে নির্মিত ও পালিত।

জন্মের মতো মৃত্যুও একটি স্বাভাবিক জৈবিক ঘটনা। কিন্তু প্রাচীন কালের মানুষ এ ধরনের ঘটনাকে বিভিন্ন মনগড়া তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করত। বলাবাহুল্য, আজকের পরিভাষায় যাকে বলা হচ্ছে 'তত্ত্ব' সেকালে তা এমন সুসংবদ্ধ সুশৃঙ্খল বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানের ব্যাপার ছিল না। বরং তখন ছিল কতকগুলো ভাঙা ভাঙা টুকরো টুকরো ধারণা। সেরকম বিচ্ছিন্ন ধারণাসমূহ একত্রিত করে পরে গবেষক-পণ্ডিতরা বলিষ্ঠ তত্ত্ব খাড়া করেছেন। এ ধরনের পুনর্নির্মিত দুই বিশিষ্ট তত্ত্ব হল উর্বরতাবাদের তত্ত্ব ও সর্বপ্রাণবাদের তত্ত্ব। এর প্রথমটি অনেকাংশে যুক্ত হয়ে আছে জন্মসম্পর্কিত সংস্কারের সঙ্গে, দ্বিতীয়টি মৃত্যুর সঙ্গে। প্রাচীন পৃথিবীর মানুষেরাই প্রথম আত্মার ধারণাতে বিশ্বাস করতে শুরু করে। প্রখ্যাত সংস্কৃতিবিজ্ঞানী ই.বি. টেলর সর্বপ্রাণবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, গুহাবাসী অরণ্যচারী মানুষেরা পশুপাখি, গাছপালা, পাথর, মাটি, জল, সূর্য, চন্দ্র এভৃতি জাগতিক সব বস্তুর মধ্যে আত্মা বিদ্যমান বলে মনে করত। জীবন্ত মানুষও এদেরই সমগোত্রীয়। সেও আত্মার অধিকারী। মৃত্যুতে এই আত্মা মানুষের দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যায় বলে তাদের ধারণা। ভাল-মন্দের জাগতিক বিভাজন সূত্রে আমাদেরও ভাগ করেছিল তারা—দুষ্ট আত্মা ও শুভংকর আত্মা। মৃত ব্যক্তির দুষ্ট আত্মা যাতে অনিষ্ট করতে না পারে সেজন্য প্রতিরোধক নানা আচার-আচরণ পালন

করার কথাও ভেবেছিল প্রাচীনকালের মানুষ। মানুষ মারা গেলেও তার আত্মা ভোগবাসনা থেকে নিরস্ত হয় না—এই ধারণা থেকেই বোধহয় প্রাচীন মিশরের পিরামিডগুলিতে মৃত ফ্যারাওদের জন্য সঞ্চিত রাখা হত খাদ্যশস্য, বিলাসদ্রব্য, শয্যা, অলংকার এমনকী টাকাকড়িও। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসীরা জাতিতে আর্য ছিল না। নেগ্রিটো, অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির আদিম রূপ সম্বন্ধে খুব বেশি জানাও যায়নি। তবে আত্মায় বিশ্বাস তাদেরও ছিল। ইট, কাঠ, গাছ, পাথর, পশু, পাখি, সাপ ইত্যাদি পুজো করত, আর বিশ্বাস করত টোটেমে। গোষ্ঠীগতভাবে নিষিদ্ধ ছিল কিছু আচার-আচরণ—পরবর্তীকালে এগুলোকেই বলা হয়েছে ট্যাবু। মৃত্যুসংক্রান্ত ট্যাবু ছিল যথেষ্ট। তার কিছু কিছু মিশে গেছে অর্বাচীন আর্য সংস্কারে। আর্য সংস্কৃতির সেরা দান বৈদিক সাহিত্য। উপনিষদে দেখা যায়, শাস্ত্রকার মৃত্যুকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে গ্রহণ করেননি। মৃত্যু কোনো চরম বিনাশ নয়, বরং তা নবজীবনের প্রবেশ দ্বার—এ ধরনের ধারণার মুখোমুখি হওয়া যায় গীতার বাণীতেও। মৃত ব্যক্তিকে ঘিরে নানা আচার ও কৃত্য পালনের নির্দেশ রয়েছে বিভিন্ন স্মৃতিগ্রন্থে। পূর্বপুরুষের প্রতি সম্মান জানানোর স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ থেকে অশৌচপালন, শ্রাদ্ধাদি কর্ম সম্পাদনের নির্দেশ পাওয়া যায় বিভিন্ন সংহিতায়। আর্যবিধি পালনকারী হিন্দু ভারতবাসীর রক্তগত সংস্কারে ও সামাজিক বিধিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল মৃত্যুকেন্দ্রিক নানা কৃত্যাদি। স্বভাবতই বাঙালি জনসাধারণ বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে সেসব আচার-আচরণ দীর্ঘকাল যাবৎ পালন করে আসছে। বাঙালি রচিত সাহিত্যেও লেগেছে তার ছোঁয়া। মধ্যযুগের বাংলায় মৃত্যুকেন্দ্রিক সংস্কারাদি কীভাবে পালিত হত তার কোনো ঐতিহাসিক বিবরণ না থাকলেও এক্ষেত্রে ওই সময়কার সাহিত্য আমাদের পাথেয় হতে পারে। আপাতত এ প্রবন্ধের দৃষ্টি সেদিকেই।

মৃত্যুকেন্দ্রিক কৃত্যাদির মধ্যে সর্বপ্রথম হল সৎকার কর্ম। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, পৃথিবীর প্রতিটি দেশে প্রতিটি জাতির মধ্যে সৎকার-বিধি একভাবে পালিত হয় না। কারণ লোকবিশ্বাসের বিভিন্নতা। যেমন, মিশরে রাজাদের মমি থাকত ভূগর্ভস্থ সুরম্যপ্রাসাদে, মুসলমানরা শেষ বিশ্রাম নিত কবরে, পার্শীদের নিক্ষেপ করা হত গহ্বরে, আর চিতায় হিন্দুদের সর্বগ্লানির মুক্তি। জাপানে ও মেলানেশিয়ায় মৃতদেহকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। আবার কোনো কোনো জাতি মৃতদেহ কবরস্থ বা ভস্মীভূত না করে বাইরে ফেলে রাখত এই বিবেচনায় যে, এই পরিত্যক্ত দেহ মানবেতর প্রাণীর খাদ্য হবে। তবে হিন্দুদের চিতা-সংস্কার যেমন অনেকখানি বৈজ্ঞানিক, তেমনি এর সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় ...'-এর মতো দেহের নশ্বরতা ও আত্মার অবিনাশের ধারণা। অবশ্য সর্পাঘাতে মৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর ক্ষেত্রে মাটিতে পুঁতে ফেলা কিংবা জলে ভাসিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। নিষ্ঠাবান উচ্চবর্ণের হিন্দুরা একদা সামর্থ্য অনুসারে মুমূর্ষুকে নিয়ে যেত গঙ্গার ঘাটে অন্তর্জলী যাত্রায়। পুণ্যার্জনই তার একমাত্র লক্ষ্য। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা একই সঙ্গে কাব্যিক ও দার্শনিক। একটু উদ্ধার করি : '*মৃত্যুর পূর্বে ঘরের*

বাইরে নিয়ে যাবার যে-প্রথা আমাদের দেশে আছে, তার অর্থটা মনে জেগে উঠল। ঘরের ভিতরকার সমস্ত অভ্যস্ত জিনিস হচ্ছে প্রাণের বন্ধনজাল। তারা সকলে মিলে মৃত্যুকে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করতে থাকে। জীবনের শেষ ক্ষণে মনেব মধ্যে এই দ্বন্দ্বেব কোলাহল যদি জেগে ওঠে তবে তাতেই বেসুর কর্কশ হয় : মৃত্যুর সম্পূর্ণ সংগীত শুনতে পাইনে, মৃত্যুকে সত্য বলে স্বীকার করে নেবার আনন্দ চলে যায়।' পুবানো লোকাচাব ও সংস্কৃতি নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেন তাঁদের মতে, প্রাচীন বৈদিক আর্যরা প্রথমে মৃতদেহকে মাটিতে পুঁতে রাখতেন। পরে এদেশে কাষ্ঠবাহুল্যহেতু দাহপ্রথা প্রচলিত হয়। গঙ্গায় কিংবা তীর্থস্থানে মৃতেব অস্থিনিক্ষেপের যে-প্রথা আছে সেটি বৈদিক আচার নয় বলে চিহ্নিত। লক্ষণীয় মুন্ডাবা মৃতের হাড় দামোদর নদীর তীরে পুঁতে রাখে। এদের সমাজে একই সঙ্গে দাহকার্য ও মৃতদেহ প্রোথিত করার রীতি প্রচলিত আছে। শ্মশানে মৃতের সম্মানে প্রস্তরস্তম্ভও নির্মাণ করে। এই আচার কি পরবর্তীকালে উচ্চতর সমাজে বৃষকাষ্ঠ স্থাপনে রূপান্তরিত? প্রাগবৈদিক যুগে মৃতদেহ ভূ-গর্ভস্থ করাই ছিল একমাত্র বিধি। 'শ্মশান' শব্দটি সেই সূত্রে এসেছে। কেননা শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল, যেখানে শব শায়িত থাকে। পবে মৃতদেহের দাহস্থান 'শ্মশান' নামে পরিচিত হয়। চণ্ডালের বিচরণকেন্দ্র হিসাবে শ্মশান যেমন অপবিত্র, তেমনি শিব ও শিবানীর অধিষ্ঠানভূমি হিসাবে সিদ্ধিব পীঠ, সাধনার স্থান—এর চেয়ে অগ্নিশুদ্ধ পবিত্র স্থান আর নেই।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিষয়-প্রকৃতিতে ধর্মমূলক। এই ধর্ম প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম। অবশ্য ধর্মের বর্মের আড়াল থেকে কখনো-সখনো লোকায়ত জীবনের প্রান্তভূমি দেখা গিয়েছে। সাহিত্যের এই লোকাশ্রয়ী রূপটি বেশি ধরা পড়েছে মঙ্গলকাব্যে আর শিবায়নে। লক্ষণীয় যে, এ দুটি ধারার সৃষ্টি বাংলাদেশের নিজস্ব ভূমি থেকে—যাদের কোনো, সেই অর্থে সংস্কৃতের পরিশীলিত উৎসভিত্তি নেই। আর একটি বিচ্ছিন্ন রচনাও এদের গোত্রেই পড়বে। সেটি বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এ কাব্যের সূচনায় ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণের সামান্য উল্লেখ থাকলেও এর আত্মাটি গঠিত হয়েছে লৌকিক উপাদানে। ধর্মকথার বাইরে রয়েছে প্রণয়কথা—যার প্রকৃতি বিশুদ্ধ মানব রসাত্মক বলে দাবি করা হয়। এ কাব্যধারায় মানুষের জীবন অনেকটা বাস্তবানুগভাবে চিত্রিত হলেও, মনে রাখতে হবে, তা ছিল দরবারী সাহিত্যাস্বাদনের সামগ্রী। সেখানে সামন্তপ্রভুদের উচ্চবর্গীয় জীবনই কেবল রূপ পেয়েছিল, সাধারণ মানুষের কোন প্রসঙ্গ সেভাবে স্থান করে নিতে পারেনি। যাইহোক, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দর্পণে বাঙালির মৃত্যুকেন্দ্রিক বিশ্বাস-সংস্কার-কৃত্য-আচরণ কতটা প্রতিফলিত হয়েছে তা এবার কাব্য পঙ্‌ক্তিসমূহের উদ্ধারে বুঝে নেওয়া যেতে পারে।

সৎকারের নিমিত্ত মৃতদেহ শ্মশান বা দাহস্থানে নিয়ে যাওয়া অত্যাবশ্যক ছিল। লোকালয় থেকে দূরে নদীতীরবর্তী তটভূমিতে থাকত শ্মশান ঘাট। সেই শ্মশানে মৃতদেহ বহনের ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রমী হিন্দুসমাজ ছুঁৎমার্গ অবলম্বন করেছিল। একজন ব্রাহ্মণের চারবর্ণের পত্নীর সন্তান থাকলেও একমাত্র ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত পুত্ররাই সৎকারের অধিকারী হত। 'মনুসংহিতা'-র কড়া নির্দেশ ছিল এইরকম :

'ন বিপ্রঃ স্বেষু তিষ্ঠৎসু মৃতং শূদ্রেন নারয়েৎ।
অস্বর্গা হ্যাহুতি সা স্যাচ্ছদ্রসংস্পর্শ দূষিতা।।[১]

ব্রাহ্মণেরা যে নীচজাতির মৃতদেহ স্পর্শ করত না তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে 'চণ্ডীদাস চরিত্র'-এ।[২] শব বহনের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে বানিয়ে নেওয়া হত বাঁশের খাট বা খাটুলি, যার চারধারে চারটি বড় বাঁশ ফ্রেমের আকারে থাকত। চর্যাপদের ৫০নং পদটিতে শবরপদ গভীর নিগূঢ় তত্ত্ব উপস্থাপনা ক্রমে এই তথ্য যুগিয়ে দিয়েছেন। তাঁর রচিত পদের সংশ্লিষ্ট অংশটুকু হল :

'চারিবাসে গড়িলা রেঁ দিআঁ চণ্ডালী
তঁহি তোলি শবরে দাহ কএলা কান্দল সগুন শিআলী।।'[৩]

শ্মশানে দাহকার্যে যে চণ্ডালের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল তারও প্রমাণ রয়েছে এখানে। মৃতদেহ অনুগমন করত অনেকে। অনুগমনের সময় পথে খই-মুড়ি পয়সা ছড়ানো হত হয়তো এই বিশ্বাসে যে পরলোকে সেই ব্যক্তির খাদ্য ও অর্থের কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটবে না। ময়ূর ভট্ট রচিত 'ধর্ম্মমঙ্গল'-এ আছে :

'মড়া সতি কান্দে করি লএঞা চারিজন চলি
উত্তরিলা মন্দাকিনির ধারে।
কত আর খই মুড়ি ছলাইএঞা যায় চলি
বিয়ুনি দুরায় আমডালে।।[৪]

এই লোকবিশ্বাস শুধু ভারতীয় আর্যজাতির নয়, রয়েছে পৃথিবীর আরো অনেক দেশে ও জাতির মধ্যে। আরব, পারস্য, মিশর প্রভৃতি দেশে কবরের মধ্যে টাকা-পয়সা দিয়ে দেওয়া হত। অনার্য খাসিয়ারা বাঁশের তৈরি শবাধারে অর্থকড়ি রেখে দিত।

শবদাহের জন্য প্রয়োজন একটি অগ্নিকুণ্ডের। একে বলা হয় চিতা। কাঠ দিয়ে নির্মিত হলেও কাব্যগত প্রমাণ সূত্রে অনুমান কবা যায় এ চিতা হযতো-বা কেউ কেউ সাজাত দুর্মূল্য চন্দন কাঠেও। বাঙালি কবিরা চিতার অবিবল উল্লেখ করেছেন তাঁদের কাব্যে। যেমন—

মালাধর বসু : 'চিতাএ তুলি রাজাএ কান্দে রানি উভরাএ
রাজার করিল সতকার।'[৫]

বিপ্রদাস পিপ্‌লাই : 'তবে সর্ব দেবগণ চণ্ডিকার বোলে
করিল বিচিত্র চিতা ক্ষীরোদের কূলে।।'[৬]

দ্বিজমাধব : 'কংস নদীর তটে আছে বড় রম্যস্থল।
নানা কাষ্ঠ কুড়াইয়া জ্বালিল অনল।।'[৭]

কবিকঙ্কণ : 'বঞ্চিল আমারে বিধি চিতা শত জ্বালি যদি
ছয় মাসে পোড়ে বন্ধুজন।'[৮]

সৈয়দ আলাওল : 'তেন চিতা রচি যোগী অগ্নি দিল যবে।
স্নান আচমন করি শুদ্ধ হৈল তবে।।'[৯]

জগজ্জীবন ঘোষাল : 'ছয় চিতা নির্মাইল আনল জ্বালই।'[১০]

রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র : 'নর্মদার তটে চিতা রচিয়া আনিল পিতা
অগ্নি কার্য কৈল পঞ্চজনে।'[১১]

চিতাতে চন্দন কাঠের ব্যবহারের উল্লেখ মেলে বিষ্ণু পাল, ঘনরাম চক্রবর্তী, বিপ্রদাস পিপ্‌লাই প্রমুখ মঙ্গলকাব্যের কবি ও কৃত্তিবাস এবং কাশীরাম দাসের মতো অনুবাদকদের রচনায়। রাজকীয় আভিজাত্য ও বিপুল ধনসম্পন্নতাকে বোঝাতে হয়তো বহুমূল্যবান চন্দন কাঠে শবদাহের কথা এঁরা উল্লেখ করেছিলেন। সংশ্লিষ্ট কয়েকটা কাব্যপঙ্‌ক্তি উদ্ধার করি :

বিষ্ণু পাল : 'চন্দনের চেলারে ফেলায় সারি সারি।'[১২]
ঘনরাম চক্রবর্তী : 'পাতিল চন্দন কাষ্ঠ পরিপাটি ধূলা।'[১৩]
বিপ্রদাস পিপ্‌লাই : 'দিলেন চন্দন কাষ্ঠ ঘৃত বহু তরে।'[১৪]
কৃত্তিবাস ওঝা : 'চন্দন কাষ্ঠের চিতা করিল সে তীরে।
বালিরাজে শোয়াইল তাহার উপরে।।'[১৫]
কাশীরাম দাস : 'অগুরু চন্দন কাষ্ঠ আনিল বিস্তর।।
অগ্নিহোত্র রাজার করিল দাহক্রিয়া।'[১৬]

চিতায় মৃতদেহ শোয়ানোর আগে গঙ্গাজলে স্নান করানোর বিধি পালন করা হয়। স্নানের পর মৃতদেহে মাখানো হয় ঘি ও চন্দন। কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে রাবণের মৃত্যুর পর শবদাহের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে—

'রাবণেরে করাইল স্নান সিন্ধ জলে।
সুগন্ধি চন্দন লেপে কণ্ঠে বক্ষমূলে।।'[১৭]

অন্যদিকে কবি বিষ্ণু পাল 'কলসি কলসি' ঘি ঢালার সংবাদ দিয়েছেন তাঁর মনসামঙ্গলে।

চিতায় মৃতদেহ স্থাপনাতেও রয়েছে বিশেষ শাস্ত্রীয় নিদর্শন। মৃতের মাথা থাকবে উত্তর দিকে, মুখ ফেরানো থাকবে পূর্বদিকে। এর পিছনে কী ধরনের লোকবিশ্বাস নিহিত হয়ে আছে বলা দুরূহ। তবে জীবন্ত মানুষ এই কারণে যে উত্তর দিকে মাথা রেখে শয়ন করে না তা খুব নিশ্চিত। এ বিষয়ে লোকসংস্কৃতিবিদ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সর্বত্রই মৃতের মস্তক উত্তর দিকে রক্ষা করা হইয়া থাকে, তবে কোনো কোনো স্থলে যেখানে হিন্দু প্রভাব খুব বেশি অনুভূত হয়, সেখানে দক্ষিণ দিকেও মৃতের মস্তক স্থাপন করিবার রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু বাংলার সর্বত্রই উত্তরদিকে স্থাপন করা হইয়া থাকে—ইহাই যে কারণ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।'[১৮]। চিতাতে মৃতদেহ সংস্থাপনের এই বিধি কৃত্তিবাসের রামায়ণে কাব্যগত সমর্থন পায়। কৃত্তিবাস লিখেছেন : 'করিলেন চিতা রাজা উত্তর শিয়রে।'[১৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বৈদিক যুগে শবদেহকে ভূ-প্রোথিত করাই ছিল প্রাচীনতম প্রথা। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দুটি সূক্তে এবং অথর্ববেদের একটি কাণ্ডে এ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা পাওয়া যায়। গর্ত খুঁড়ে গুহা বানিয়ে তার মধ্যে মৃতদেহ রেখে চারপাশে ও উপরে কাঠ দিয়ে বেষ্টন করে রাখা হত। মৃতদেহ মাটি চাপা পড়া অবিধেয়। যোগীজনের মৃতদেহ যোগাসনে বসিয়ে ও সাধারণের মৃতদেহ উত্তানশায়ীভাবে ভূ-প্রোথিত করা হত। মৃতদেহের অন্তিম সংস্কার

বিধি যে দাহ করা তারও উল্লেখ মেলে অথর্ববেদে। ওই শ্লোকটিতে মৃতদেহের চারপ্রকারের সংস্কারবিধির কথা বলা হয়েছে। এগুলি যথাক্রমে মৃতদেহকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া, ভূ-প্রোথিত করা, পক্ষীদের আহারার্থে উঁচু স্থানে পরিত্যাগ করা ও অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করা। এর প্রথম পদ্ধতিটি আজও টিকে রয়েছে তিব্বতে। তারা মৃতদেহকে টুকরো করে কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। কাছাকাছি বড় নদী না থাকলে মৃতদেহ পচে গলে গেলে হাড়গুলি চূর্ণ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে সেই মৃৎপিণ্ডগুলি কোনো বড় জলাশয় কিংবা নদীতে বিসর্জন দেয়। বাংলাদেশের নাথযোগীরা মৃতদেহকে সমাধিস্থ করে থাকে। 'গোর্খবিজয়'-এর সাক্ষ্য গ্রহণ করলে বলতে হবে যে, বৈদিক অগ্নিহোত্রের প্রভাব ক্রমে তাঁরা একদা মৃতদেহে মুখাগ্নি করে সেই দেহ যোগাসনে উপবেশন করিয়ে সমাধিস্থ করতেন। সৎকারবিধির তৃতীয় রীতিটি প্রচলিত আছে পার্শী সম্প্রদায়ের মধ্যে। তারা পাখিদের আহারের জন্য মৃতদেহকে উঁচু কোনো স্থানে রেখে দিয়ে আসে। আর অগ্নিসংস্কার অর্থাৎ চতুর্থ রীতিটি নিষ্ঠাবান হিন্দু সমাজে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়।

চিতাসজ্জা ও চিতায় মৃতদেহ সংস্থাপনের পর গুরুত্বপূর্ণ লোকাচারটি হল মুখাগ্নি। শাস্ত্রবিধি অনুসারে মুখ্যত জ্যেষ্ঠপুত্র, তার অবর্তমানে কনিষ্ঠ পুত্র, তাদের অবর্তমানে অন্যান্য পুত্র বা পুত্রস্থানীয় কেউ মুখাগ্নি করবার অধিকারী। বাংলা কাব্যে কোথাও এ লোকাচারটির বিস্তৃত বর্ণনা নেই। তবে একালের প্রথা যে সেকালেও কমবেশি মেনে চলা হত কোনো সন্দেহ নেই। মুখাগ্নিকারী ব্যক্তি মৃতদেহ সাতবার প্রদক্ষিণ করে মৃতের মুখের কাছে বসে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কোনো জ্বলন্ত অগ্ন্যাধার দিয়ে মৃতের মুখে আগুন স্পর্শ করাত। বাকি শবযাত্রীরা তখন সমস্ত চিতায় অগ্নিসংযোগ করত। মধ্যযুগের কাব্যে মুখাগ্নির উল্লেখ মেলে দ্বিজমাধব ও বিষ্ণু পালের কাব্যে। দ্বিজমাধব লিখেছেন : "নানা কাষ্ঠ কুড়াইয়া জ্বালিল অনল।। প্রদক্ষিণে অগ্নি দিল মুখের উপর।[২০] অন্যদিকে বিষ্ণু পাল সাদামাটাভাবে বলেছেন, 'সনকা জ্বালিয়া কৈল এ মুখ আগুন।'[২১] দেহ ভস্মীভূত হওয়ার পর চিতাস্থলের আগুন নিভিয়ে দেওয়া হত জল ঢেলে। ব্যবহৃত কলসী বা মাটির পাত্রটি সবশেষে ছিদ্র করে বা ভেঙে দিয়ে আসার রীতি ছিল। এগুলি হয়তো মৃতের আত্মাকে পশ্চাদ্ধাবিত হতে বাধা দেবার জাদুক্রিয়া। দাহের পরের আচার হল দেহাবশিষ্টটুকু মাটিতে প্রোথিত করে গঙ্গায় স্নাত হয়ে পরিশুদ্ধ হওয়া। হয়তো বা এই বিধিতে পূর্বেকার ভূপ্রোথিত রূপটি রূপান্তরিত হয়ে বর্তমানে রয়ে গেছে। মানিকরাম গাঙ্গুলি তাঁর ধর্মমঙ্গলে অবশ্য মৃতদেহের অর্ধদগ্ধ হাড়গুলিকে গঙ্গায় নিক্ষেপের কথা জানিয়েছেন।[২২] অন্যদিকে ঘনরাম চক্রবর্তী দাহান্তে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে অস্থিপ্রেরণের সংবাদ দিয়েছেন 'অস্থি পাঠাইলা গঙ্গাসাগরসঙ্গমে'।[২৩] এগুলি উর্বরতাবাদ ভিত্তিক কোনো সংস্কার হতে পারে। সাঁওতালরা নাকি এভাবে মৃতদেহ সৎকার করে। বৌধায়ন পিতৃমেধ যজ্ঞসূত্রের রচনানুযায়ী অন্ত্যেষ্টি সৎকারের মধ্য দিয়ে মৃত ব্যক্তির অনন্ত স্বর্গলাভ হয়। এজন্য পুণ্যের লোভ দেখিয়ে মৃতদেহ সৎকারে সকলশ্রেণির সামাজিককে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হয়েছে।

হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অনুসারে মৃত্যুর পর মৃতের উত্তরাধিকারীরা অশৌচ পালন করে থাকেন। অশৌচের কাল বর্ণভেদে বিভিন্ন। ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দশ দিন, শূদ্রের ক্ষেত্রে

সর্বোচ্চ একমাস। এ অবস্থায় কোনো শুভকর্ম নিষিদ্ধ, নিষিদ্ধ বিলাসময় জীবনযাপনও। অশৌচের কালটি প্রকৃতপক্ষে সম্মাননীয় পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কৃচ্ছ্রতা পালনের কাল। নিরামিষ ভক্ষণ, তেল-জুতো-ছাতা-কোমলশয্যা-সিঁদুর-আলতা-প্রসাধনী বর্জন, চুল-নখ-দাড়ি না-কাটা ইত্যাদি আচার এ সময়ে পালিত হয়। এই অশৌচের সমাপ্তি ঘটে শ্রাদ্ধক্রিয়ায়। শ্রাদ্ধ সম্পর্কে 'মনু সংহিতা' লিখেছেন :

"সংস্কৃতং ব্যঞ্জনদ্যশ্চপয়োদধিঘৃতামৃতম্।
শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে।।"

(মনু সংহিতা : ৩/২৮৪)

রঘুনন্দন ও শূলপাণির মতে, বৈদিক বিধি অনুযায়ী সম্বোধন পদের দ্বারা আহূত উপস্থিত পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ অন্ন প্রভৃতি দানের নামই শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধক্রিয়া পালিত হয় শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানানুসারে এবং এইসব নিয়ম-কানুনের অনেকগুলির পিছনে দীর্ঘদিনের লোকজ বিশ্বাস ও সংস্কার ক্রিয়াশীল। আসলে, প্রাচীনকাল থেকে মৃত্যুর ভয়াবহতা মানুষের মনে গভীর শোক ও ভীতির সৃষ্টি করে এসেছে। তাই শ্রাদ্ধক্রিয়াতে এই দুই ভাবনা একত্রিত করে পারলৌকিক ক্রিয়াগুলি সম্পাদন করা হত। লৌকিক বিশ্বাস : মৃতের আত্মার সদ্গতি না হলে তার থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাই তর্পণের দ্বারা ইহলোক ও পরলোকের মধ্যবর্তী বৈতরণী নদী পারের ব্যবস্থা, পিতৃলোকে আত্মার অবস্থানের জন্য আহার্য, বস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য দানে মৃতের সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা। পুত্র-পৌত্ররাও মনে করে এই পিণ্ডদানের মধ্য দিয়ে তারা অমেয় পিতৃঋণ শোধ করছে। শ্রদ্ধা সহকারে এই দান সম্পন্ন হয় বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধের অপর নাম পিতৃযজ্ঞ। প্রেতযোনিপ্রাপ্ত আত্মার সদ্গতি কামনায় এটি অনুষ্ঠিত হয় বলে একে প্রেতযজ্ঞ বলে থাকেন কেউ কেউ। বরাহপুরাণ মতে, শ্রাদ্ধক্রিয়ার প্রবর্তক হলেন দত্তাত্রেয় পুত্র নিমি। তবে মহাভারতে প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী নিমির পূর্বেও এ প্রথা চালু ছিল। নিমির নামে নামাঙ্কিত প্রসিদ্ধ শ্মশানতীর্থঘাট ও নিমতলার ঘাট ভাগরথীকূলে দীর্ঘদিন ধরে বর্তমান। কোনো কোনো মঙ্গলকাব্যে নিমাইতীর্থ ঘাটের উল্লেখ আছে। এই নাম কোনোভাবেই নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিতের সূত্রে সৃষ্ট নয়।

মধ্যযুগের অভিজাত ও সম্পন্ন বাঙালি হিন্দুরা শোকজ্ঞাপন অনুষ্ঠান শ্রাদ্ধতেও তাঁদের ধনাঢ্যতার পরিচয় দিতেন। অর্থবানদের জাঁকজমকপূর্ণ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মধ্যে দুটি বিশিষ্ট— দানসাগর ও বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ। দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে ও জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে যথাক্রমে দানসাগর ও বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের উল্লেখ আছে। অশৌচান্তের দ্বিতীয় দিনে তিল-কাঞ্চন-বারি সহযোগে আদ্যশ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হত। মৃতব্যক্তির নামে উৎসর্গীকৃত বৃষ, কাঞ্চন, তণ্ডুলাদি দ্রব্য ও অর্থ লাভ করতেন ব্রাহ্মণেরা। শ্রাদ্ধের প্রথম দান পিণ্ড গ্রহণ করতেন যাঁরা তাঁরা কথিত হতেন অগ্রদানী ব্রাহ্মণ নামে। এঁরা ব্রাহ্মণ সমাজে 'পতিত' বলে গণ্য। শ্রাদ্ধক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দ তাঁর অভয়ামঙ্গলের ধনপতি আখ্যানে। প্রভূত সম্পদের অধিকারী ধনপতি তাঁর পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে সমাগত ব্রাহ্মণদের যথোপযুক্ত সম্পদ দানে তুষ্ট করেছিলেন। কবির কলমে সেই শ্রাদ্ধবাসর ধরা পড়েছে ছবির মতো স্পষ্টতায় :

'তিল তুলসী গঙ্গোদক কুশ বটু রম্ভাত্মক
যব দূর্বা কুসুম চন্দন।।
অবধানে পুরোহিত কর দেই নিয়োজিত
শ্রাদ্ধ করে বান্যার নন্দন।।
কপাল জুড়িয়া ফোঁটা নিবসে পণ্ডিত ঘটা
সগল্লাথ পামরি কম্বলে। ...
জার যত অভিলাষ পুরে সাধু তার আশ
সোনা রূপা কামধেনু দিয়া।
শত শত দ্বিজবরে জে আইল সাধুর ঘরে
পূজে তারে সন্তোষ করিয়া।।'[২৪]

এখানে উল্লেখ্য যে, মৃত্যু সংক্রান্ত শ্রাদ্ধ অধিকারীভেদে দু'ধরনের। মৃতের বিবাহিতা কন্যারা যে-শ্রাদ্ধ করেন তা মৃত্যুর তিনদিন পরে অনুষ্ঠিত হয়। একে বলে তে-রাত্রি শ্রাদ্ধ। এই শ্রাদ্ধক্রিয়া দুর্ঘটনায় বা অপঘাতে মৃত্যুর জন্যও প্রযোজ্য হয়ে থাকে। বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ'-এ দেখা যায় চাঁদের পুত্র লখিন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু হলে সোমাই ব্রাহ্মণ বিধান দিচ্ছেন এই তে-রাত্রি শ্রাদ্ধের : 'সোমাই পণ্ডিত বলে স্থির কর মন/ তে-রাত্রি শ্রাদ্ধ হবে ব্যবস্থার বচন।'[২৫] এখানে 'ব্যবস্থা' বলতে মধ্যযুগে প্রচলিত স্মৃতিশাস্ত্রের কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে যে, প্রাগাধুনিক কালের বাঙালি হিন্দুর জীবন যেসব স্মৃতিগ্রন্থ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তার মধ্যে শ্রাদ্ধবিষয়ক প্রধান গ্রন্থগুলি হল শূলপাণির 'শ্রাদ্ধবিবেক', রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের 'শ্রাদ্ধতত্ত্ব' ও গোবিন্দানন্দের 'শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদি'। আর ছিল মৃতের পুত্র কিংবা নিকটতম সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অশৌচান্তের শ্রাদ্ধ, যে-শ্রাদ্ধের পর মৃতের পুত্রেরা দায়মুক্ত হন। ত্রয়োদশ দিবসান্তে শ্রাদ্ধের সাহিত্যগত উল্লেখ মেলে কাশীরাম দাসের মহাভারতে—' ত্রয়োদশ দিবসে করে শ্রাদ্ধ শান্তি দান।'[২৬]

'শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং'—শ্রাদ্ধের এ হেন সংজ্ঞায় দান আবশ্যিকভাবে বিধেয় ছিল। আগেই বলা হয়েছে, শ্রাদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোকাচার হল পিণ্ডদান। পিণ্ডদান ব্যতিরেকে মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্‌গতি হয়না—এ জাতীয় লোকবিশ্বাস আজও প্রচলিত আছে। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁর পঞ্চপুত্র পিতার উদ্দেশে পিণ্ডদান করেছিলেন বলে কাশীরাম দাস তাঁর মহাভারতে উল্লেখ করেছেন : 'পঞ্চ ভাই দিল পিণ্ড ক্ষত্রিয় বিধান।' প্রেতযোনির প্রতি শ্রাদ্ধবাসরে অশৌচান্তে পিণ্ডদান ব্যতীত গয়াতে পৃথকভাবে পিণ্ডদানের উল্লেখ পাওয়া যায় কোনো কোনো রচনায়। স্মরণে থাকতে পারে, নিমাই পণ্ডিত তাঁর মৃত পিতার উদ্দেশে পিণ্ডদানের জন্য গয়াতে গিয়েছিলেন। পিণ্ড সেখানে ফল্গু নদীর জলে ফেলাই নিয়ম। এ বিষয়ে বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্য ভাগবত'-এ আমাদের জানাচ্ছেন : 'শ্রাদ্ধ করি প্রভু পিণ্ড ফেলে সেই জলে/গয়ালি ব্রাহ্মণ সব ধরি ধরি গিলে।'[২৭] গয়াতে পিণ্ডদানের সংবাদ মেলে রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গলেও : 'পড়িয়া শুনিয়া পুত্র সহ সুপুরুষ / গয়ায় পিণ্ডদান করে

ধরে তিন কুশ।'[২৮] মস্তক মুণ্ডনের পর আদ্যশ্রাদ্ধের দিনে মৃতের আত্মার কল্যাণে গো-দানের প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল। বিপ্রদাস, কাশীরাম দাস, কবিকঙ্কণ, তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন প্রমুখ কবিরা এই দানের কথা ফলাও করে লিখেছেন তাঁদের কাব্যে। দু'একটি কাব্যপঙ্ক্তির উপর চোখ রাখা যাক :

বিপ্রদাস : 'বিধিমতে শ্রাদ্ধ কৈল দান যজ্ঞ আদি।
ক্ষিতি পরিতোষ কৈল দিয়া রত্ন নিধি।।'[২৯]

তন্ত্রবিভূতি : 'কতদিনে কোটিশ্বর তেজিল জীবন।
কর্ম কার্য করে সাধু বিবিধ বিধান।।
বিধিমত বৎস গাভি উৎসর্গ করিল।'[৩০]

জগজ্জীবন : 'দান ধ্যান বৃযোৎসর্গ করে বিধিমতে।'[৩১]

শুধু নিষ্ঠা সহকারে পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করাই নয়, শ্রাদ্ধে জাতি-গোত্র, আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আচার। নিয়মভঙ্গ অর্থাৎ আমিষ ভঙ্গনের দিন সকলের সম্মতি গ্রহণ করা আবশ্যিক। কবি মুকুন্দ চণ্ডীমঙ্গলের বণিক খণ্ডে ধনপতির পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের বিবরণে ধনপতি কর্তৃক আত্মীয়-পরিজন ও সকল সম্ভ্রান্ত বণিককে নিমন্ত্রণের কথা জানিয়েছেন। রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র তাঁর 'শিবায়ন'-এ লিখেছেন : 'নিমন্ত্রিয়া জ্ঞাতি গোত্রে / শুচি হৈল তিন রাত্রে/শ্রাদ্ধ কৈল বিবিধ বিধানে।'[৩২]
আদ্যশ্রাদ্ধে মুখ্য অশৌচ কেটে গেলেও মৃত্যুর এক বৎসর পর অনুষ্ঠেয় সপিণ্ডন শ্রাদ্ধের দ্বারা অশৌচ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া যেত। এই এক বৎসর কাল মুখাগ্নিকারী ব্যক্তির পক্ষে কোনো শুভকর্ম নিষিদ্ধ। কবিকঙ্কণ বণিকখণ্ডে সিংহলরাজ শালিবাহনের মুখ দিয়ে এই শাস্ত্রবিধির কথা প্রকাশ করেছেন তাঁর কন্যা সুশীলার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিবাহ প্রসঙ্গে। প্রাসঙ্গিক কাব্যপঙ্ক্তিগুলি এই ঃ

'কি কহিব মনস্তাপ রণে মৈল খুড়া বাপ
জাবদ না করি সপিণ্ডন।
বৎসরেক জদি জায় তবে শুচি মোর কায়
বিলম্বে করিব কন্যাদান।।'[৩৩]

আর একটি কথা, স্মৃতিকার শূলপাণি শ্রাদ্ধের যে-সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে পূর্বপুরুষের উদ্দেশে হবিত্যাগকে শ্রাদ্ধ বলে গণ্য করা হয়েছে। তিনি একাধিক শাস্ত্রকারের বচন উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, কেবল মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে নয়, সাংসারিক নানাবিধ মঙ্গল কামনায় হবিত্যাগ 'শ্রাদ্ধ' বলে গণ্য হতে পারে। এই হিসাবে মধ্যযুগের স্মৃতিশাস্ত্র বারো ধরনের শ্রাদ্ধের উল্লেখ করেছে। এগুলি হল : (১) একোদ্দিষ্ট (একজনের উদ্দেশে নিবেদিত); (২) নিত্য (প্রতিদিন কর্তব্য); (৩) কাম্য (কোনো প্রয়োজনীয় বস্তু প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে); (৪) বৃদ্ধি (মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পূর্বে তার সুষ্ঠু সমাপ্তির উদ্দেশ্যে); (৫) সপিণ্ডন (যার দ্বারা পিণ্ড সম্বন্ধ স্থাপিত হয়); (৬) পার্বণ (পর্বদিনে করণীয়); (৭) গোষ্ঠী (অনেক মিলে একত্রে কৃত)

; (৮) শুদ্ধ্যর্থ (পাপশুদ্ধির জন্য কৃত) ; (৯) কর্মাঙ্গ (নিষেক, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন প্রভৃতিতে কর্তব্য); (১০) দৈবিক (দেবতার উদ্দেশ্যে কৃত); (১১) যাত্রার্থ (যাত্রার পূর্বে করণীয়) এবং (১২) পুষ্ট্যর্থ (স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্যে বা কৃষিকর্মাদির পূর্বে করণীয়)।[৩৪]

শ্রাদ্ধের সঙ্গে যুক্ত আরো একটি পারলৌকিক কৃত্য হল তর্পণ। এটিও পিতৃকৃত্য। শ্রদ্ধার সঙ্গে পিতৃলোকের উদ্দেশে জলাঞ্জলি অর্পণের নাম তর্পণ। তর্পণ দুই ধরনের নিত্য ও আনুষ্ঠানিক। নিত্য তর্পণে প্রত্যহ স্নান সমাপনান্তে দেবতা, ঋষি ও পিতৃলোকের উদ্দেশে জলদান করা হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয় প্রকারের তর্পণ করা হয় মৃতের তৃপ্ত্যর্থে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে। কেউ কেউ বলেন দৈনন্দিন তর্পণটি প্রথা, শ্রাদ্ধকেন্দ্রিক তর্পণটি লোকাচার। মধ্যযুগের বাঙালি অনেক কবি এই প্রথাটির উল্লেখ করেছেন। কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

মালাধর বসু : 'রজনী প্রভাত হৈল অক্রূব উঠিযা।
স্নান তর্পণ কৈল জলমধ্যে গিয়া।।'[৩৫]

দ্বিজ মাধব : 'স্নান তর্পণ যদি কৈল সদাগর।
কুলেত উঠিয়া পূজে দেব গদাধর।।'[৩৬]

জগজ্জীবন ঘোষাল : 'কাণ্ডার বাক্য শুনি সাধুর নন্দন।
গঙ্গাজল করে পিতৃলোকের তর্পণ।।'[৩৭]

তন্ত্রবিভূতি : 'পিতৃগণ গঙ্গাজল পরশে মুক্তি পায়।
সাগরপুত্র মুক্ত হৈএগ স্বর্গলোকে যায়।।'[৩৮]

বিষ্ণু পাল : 'স্নান তর্পণ করো রামা অঙ্গে হল্য শুচি।'[৩৯]

ঘনরাম চক্রবর্তী : 'স্নান পূজা তর্পণ তরণী অর্থদান।
গঙ্গজলে করিলা যতেক দান ধ্যান।।'[৪০]

পরিশেষে একটি কথা বলার। শিল্প যতই স্বভাবের অনুকরণ করুক না কেন, সাহিত্য সবক্ষেত্রে প্রকৃতির আরশি নয়। পুচ্ছানুসারিতা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। অভিন্ন কাহিনী, অভিন্ন চরিত্র, ততোধিক অভিন্ন উদ্দেশ্য বর্তমান থাকায় কবিরা, বিশেষত মধ্য ও স্বল্পমেধার যশঃপ্রার্থীরা, প্রায়শই এগিয়েছেন গতানুগতিক পথে। সমকাল বা অল্প আগের হলে তো কথাই নেই, এমনকী দূরবর্তী সময়ের কবির কাব্যের দ্বারা অর্বাচীন কালের রচনাও প্রভাবিত হয়েছে। ফলে প্রাত্যহিক জীবনাচরণের বর্ণনায় কোনো কোনো জায়গায় অন্ধভাবে অনুসরণের ঘটনা যে ঘটেনি তা জোর করে একেবারেই বলা যাবে না। তাছাড়া স্মরণযোগ্য যে, জন্ম ও বিবাহ মানুষের কাছে যতটা আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা, মৃত্যু তা নয়। বোধহয় এই কারণেই প্রাগাধুনিক বাংলা কাব্যগুলিতে জীবনের প্রারম্ভ ও মধ্যপর্বের ওই দুই বিশেষ ঘটনা যতটা বিস্তারিতভাবে কবিরা উপস্থাপিত করেছেন, মৃত্যুকেন্দ্রিক কৃত্য ও সংস্কার তার তুলনায় স্বল্প। সাকুল্যে এই সিদ্ধান্ত করা চলে যে, জীবনের সার্বিক রূপায়ণে মধ্যযুগের বাঙালি কবিরা ছিলেন অকৃপণ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিজেদের অভিজ্ঞতার ঝুলি হাতড়ে লেখা এইসব রচনায় তাঁরা যে-ধরনের সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ সাজিয়ে দিয়ে

গেছেন তার তুলনা মেলা ভার। না, কোনো সচেতন অভিপ্রায় নিয়ে নয়, কাব্যের তথাকথিত 'অলৌকিক জগৎ'-কে বিশ্বাস্য করে তোলার তাগিদেই তাঁদের দৃষ্টি মাটির দিকে নামানো। আর সেই দৃষ্টির প্রসাদে শুধু সেকাল ও একালের রসজ্ঞ সাহিত্য পাঠকসমাজই তৃপ্ত নন, উপকৃত অধুনাতন সামাজিক ইতিহাসের অনুসন্ধানকারীরাও। যে-সব চূর্ণ তথ্যের হদিস সেকালের লেখা প্রথাসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে মেলে না, কবিদের কলমে তাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি সত্যি ইতিহাস-ভাবুকদের অভ্যস্ত ভাবনাকে চমকে দিতে পারে। প্রাগাধুনিক কালের বাঙালি হিন্দুর সমাজজীবন নিয়ে যদি কেউ তথ্যনির্ভর অনুসন্ধানে নামেন, তাহলে অন্য অনেক কিছুর পাশাপাশি মধ্যযুগের সুবিশাল বাংলা সাহিত্য যে সেই অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের এক অপরিহার্য অনন্য প্রাথমিক উৎসস্থল হয়ে দাঁড়াবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সংকেত সূত্র

১. Manu Samhita, Edited by Manmatha Nath Dutta, 1908, p. 200
২. চণ্ডীদাস চরিত্র, সম্পা. যোগেশচন্দ্র রায়, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২২২
৩. চর্যাগীতির ভূমিকা, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, ১৯৯৫, পৃ. ২৫৩
৪. ময়ূব ভট্টের ধর্মমঙ্গল, সম্পা. অক্ষরকুমার কয়াল ও চিত্রা দেব, ১৩৮১, পৃ. ৬৫
৫. মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, সম্পা. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ক.বি., ১৯৪৪, পৃ. ৫৩৩
৬. বিপ্রদাসের মনসাবিজয়, সম্পা. সুকুমার সেন, এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. ৩৭
৭. দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীত. সম্পা. সুধীভূষণ ভট্টাচার্য, ক.বি., ১৯৬৫, পৃ. ৪৭
৮. কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল, সম্পা. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ক.বি., ১৯৬৬, পৃ. ৪২৬
৯ সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী, সম্পা. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ঢাকা, ১৯৫০, পৃ. ১৫৩
১০. কবি জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল, সম্পা. সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ দাস, ক.বি., ১৯৬০, পৃ. ১১৮
১১. রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের শিবায়ন, সম্পা. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ ভট্টাচার্য, ব.সা.প., ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৬৫
১২. বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল, সম্পা. সুকুমার সেন, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৬৮, পৃ. ৩০
১৩. ঘনরামের শ্রীধর্মমঙ্গল, সম্পা. পীযূষকান্তি মহাপাত্র, ক.বি., ১৯৬২, পৃ. ৫০১
১৪. বিপ্রদাসের মনসাবিজয়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭
১৫. কৃত্তিবাসী রামায়ণ, সম্পা. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৯, পৃ. ১৭০
১৬. কাশীদাসী মহাভারত, সম্পা. প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৩৬০, পৃ. ১২১
১৭. কৃত্তিবাসী রামায়ণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৮
১৮. বাইশ কবির মনসামঙ্গল, সম্পা. আশুতোষ ভট্টাচার্য, ক.বি., ১৯৫৪, পৃ. ৩২৮
১৯. কৃত্তিবাসী রামায়ণ, পূর্বোক্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯
২০. দ্বিজ মাধবের মঙ্গল চণ্ডীর গীত, পৃ. ৪৭

২১. বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০
২২. মানিকরাম গাঙ্গুলির শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, সম্পা. বিজিত কুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত, ক.বি , ১৯৬০, পৃ. ৪৬৭
২৩. ঘনরামের শ্রীধর্মমঙ্গল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৪
২৪. কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সম্পা. সুকুমার সেন, সাহিত্য অকাডেমি, ১৯৭৫, পৃ. ১৭২
২৫. কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, সম্পা. জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত, ক.বি., ১৯৬২, পৃ. ৩১১
২৬. কাশীদাসী মহাভারত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১
২৭. বৃন্দাবন দাসের শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত, সম্পা. শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, আদিখণ্ড, পৃ. ৩৯১
২৮. রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গল, সম্পা. অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়, ক.বি., ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৯৭
২৯. বিপ্রদাসের মনসাবিজয়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯
৩০. তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণ, সম্পা. আশুতোষ দাস, ক.বি., ১৯৮০, পৃ. ৬৭
৩১. কবি জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২
৩২. রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের শিবায়ন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫
৩৩. কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১
৩৪. চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পঞ্চানন মণ্ডল, বিশ্বভারতী, ১৯৬৮, পৃ. ২১০
৩৫. মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭
৩৬. দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১
৩৭. কবি জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮
৩৮. তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩
৩৯. বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮
৪০. ঘনরামের শ্রীধর্মমঙ্গল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯

লেখক পরিচিতি : রীডার, ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
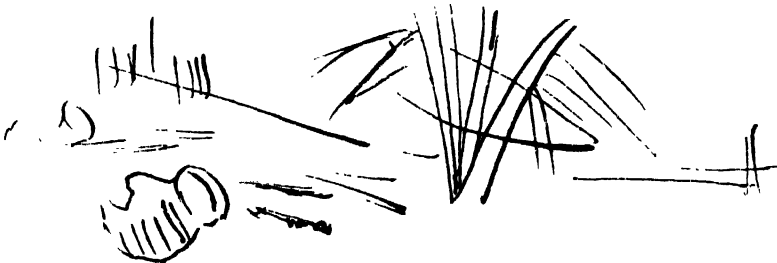
'অন্তর্জলীযাত্রা'-র ঘোর বাস্তবতা

অশ্রুকুমার সিকদার

'আমার যেমন পোড়া কপাল এমন যেন আর কাবো না হয় ছয় বৎসর সময় বে হয় কিন্তু স্বামী কেমন চক্ষে দেখনু না—শুনেছি তাঁর পঞ্চাশষাটটি বিয়ে, বয়েস আশী বচ্ছরেব উপর... বড় অধর্ম না হোলে কুলীনের ঘরে মেয়ে-মানুষের জন্ম হয না আর একজন বলিল ওগো জল তোলা হয়ে থাকে তো চল চল ঘাটে এসে আর বাকচাতুরীতে কাজ নাই—তোর তবু স্বামী বেঁচে আছে আমার যার সঙ্গে বে হয় তাঁর অন্তর্জলী হচ্ছিল।' —জলের ঘাটে নারীদের কথোপকথন, *'আলালের ঘরের দুলাল'*।

ভাষা বা চিত্ত বিবেচনার বিষয় নয় আজ আমাদের। কমলকুমারেব ভাষাগত চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা সকলের প্রশংসা পায়—'যে-চিত্র, তাঁর বিশাল অভিজ্ঞতা ও দিব্যদৃষ্টিপাতে সম্ভব হয়েছে, যে-চিত্র সত্যের অন্তঃস্থলে ছুটে যায়।' অনায়াস আর সাবলীল তাঁর চিত্রব্যবহার সেই সব চিত্রকে আশ্রয় করেই তাঁর উপন্যাস গল্প রচিত হয়ে যায়, পেয়ে যায় তাঁর নিজস্ব বাস্তবতাব ধর্ম। তাঁর এই চিত্রময়তার সম্বন্ধে চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় অনেক দিন আগে যেমন বলেছিলেন, *'চিত্র আনতে গেলে বাইরের সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়, সচেতন হলে যে বস্তুটির সম্বন্ধে সচেতন তার প্রতি দায়িত্ব আসে, দায়িত্ব এলে শুধু বিষয়ীর নয় বিষয়ের কথাও ভাবতে হয়, ফলে আপনা থেকে বাকসংযম আসে এবং একবার বাকসংযম করতে পারলে বিষয়বিষয়ী পরস্পরের প্রতি সংবেদনশীল হতে দেরি লাগে না। এইসব গুণেই কমলকুমারের রচনা আশ্চর্যভাবে সচিত্র। আমাদেব বিবেচনার বিষয় নয় তাঁর ভাষাও—যা তীব্র বিতর্ক জাগায়। অনেকেই মনে করেন তাঁর রচনা আস্বাদনের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক তাঁর ভাষা যে-ভাষা ভয়ঙ্কর সুন্দর, শক্তিশালী, দীপ্তিমণ্ডিত অথচ অসম্ভব দুরূহ। কমলকুমার নিজে মনে করতেন 'ভাষাকে যে আক্রমণ করে সেই ভাষাকে বাঁচায়।'* তাঁর কূটস্থ চৈতন্য ব্যঞ্জনার অন্বেষণ করে, অভীষ্ট লাভের জন্য তিনি গদ্যে যে অভিনবত্ব করেন, মিশ্ররীতির যে ব্যবহার করেন, অনুরাগীর ভাষায় তা 'এক মরিয়া মানসিকতার' হাতিয়ার। তাঁর গদ্য আমাদের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ ঘটায়, ভাষার বাহন ও ধারণক্ষমতার বৃদ্ধি করে, বিষয়ের পরিধি প্রসার ঘটায়। সেই কারণে উত্তরসূরি একজন গল্পকার মনে করেন, *'কমলকুমার মজুমদারের ভাষা প্রকরণ এইভাবে আমাদের অনুভূতির সম্প্রসারণ ঘটানোর ফলে বাঙলা গদ্যের বিস্তার ক্ষমতা বহুগুণে বেড়েছে।'* অন্যদিকে তুলনাত্মক সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ একজন মনে করেন কমলকুমারের অতি আধুনিক পরীক্ষামূলক বাক্‌শৈলী বাঙলাভাষা নিয়ে ফুটবল খেলার নামান্তর। ফলে বাঙলা কথাসাহিত্যে তাঁর ভূমিকা 'প্রগতি-বিদ্বেষী', ইতিহাসবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল।' তিনি মনে করেন, কমলকুমারের গদ্য ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্গের মতো দুষ্প্রবেশ্য, সেই ভাষা কিছু কমিউনিকেট করে না। দুই পক্ষে দূরত্ব এইভাবে

যতটা দুরতিক্রম্য মনে হয়, আসলে অবশ্য ততটা নয়। কারণ, অনুরাগীদের বক্তব্য প্রধানত কমলকুমারের ছোটগল্পের ভাষা নিয়ে, যখন তাঁর ভাষাগতপরীক্ষা ততটা উন্মার্গগামী হয়ে ওঠেনি। আর বিরোধীদের অভিযোগ আসলে উত্তর পর্বের উপন্যাস বিষয়ে প্রধানত—'সুহাসিনীর পমেটম', 'শ্যামনৌকা', 'পিঞ্জের বসিয়া শুক', বিষয়ে প্রধানত।

কিন্তু ভাষাচিত্রী বা গদ্যকার কমলকুমারই আজ বিবেচনার বিষয় নয়। অন্তর্জলী যাত্রার মহিমাকীর্তনে যুযুধান দুইপক্ষের মধ্যে সন্ধিস্থাপিত হয়ে যায়। এই প্রথম উপন্যাস রচনাকালে কমলকুমার বাংলা ভাষার উপর তেমন 'সংগঠিত বলাৎকার' শুরু করেন নি। আজ বিশ্লেষণের বিষয়, চিত্রগুণ ও ভাষার স্বকীয়তায় তিনি 'অন্তর্জলীযাত্রায়' যে 'ঘোর বাস্তবতা' অর্জন করেন, সেই বাস্তবতা। এই বাস্তবতা, যার মধ্যে কমলকুমার গল্পের গল্পত্ব খুঁজে পান, সর্ব-স্বভাবে রিয়ালিটির এই প্রসঙ্গেও একটা অন্য তর্ক এসে যায়। তাঁর অতি-আধুনিক বাক্‌শৈলীর সঙ্গে 'অতি পুরাতন সনাতন হিন্দু চিন্তাধারা' একটা বৈপরীত্য ও বৈষম্য সৃষ্টি করে বাস্তবতার ব্যাঘাত ঘটায় কিনা। আধুনিক মাধ্যম ও সনাতন বাণী ও পটভূমি যেন পরস্পর বিরোধী। অথচ তৎসম শব্দ ব্যবহারের প্রাচুর্য, সাধুক্রিয়াপদ, সমাস ও নামধাতুর আতিশয্য 'হরফাশ্রিত সৌন্দর্য'-এর সন্ধানে পূর্ব প্রচলিত বানানরীতির প্রতি পক্ষপাত এইসব ভাষাগত বৈশিষ্ট্য বা আর্গেইজম্ তো কাহিনির সনাতন বিষয় ও পটভূমির সঙ্গে সামঞ্জস্য রচনার প্রয়োজনেই তিনি ব্যবহার করেন। আবার বিপরীতভাবে যদি ধরেও নিই যে কমলকুমারের গদ্যরীতি বড় বেশি পরীক্ষামূলক ও আধুনিক তাহলেও কি অতীতচারী বিষয়ের বাহন হিসাবে তাব ব্যবহার দোষের হয়? আঙ্গিক ও বিষয়ের মধ্যে স্বেচ্ছাকৃত বৈপরীত্য অনেক সময় যে অপরূপ টেনশন সৃষ্টি করে অন্তত বিশ্বসাহিত্যের পাঠকের পক্ষে তা জানার কথা। ধরা যাক হারমান ব্রখের The death of Virgil উপন্যাসের কথা। মুমূর্ষু কবির জীবনের শেষ চব্বিশ ঘণ্টার স্মৃতিসত্তা মনীষার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ এই উপন্যাসে বিধৃত। দীর্ঘ গীতিকবিতার মতো এই উপন্যাসে স্বপ্নময় প্রতীকের সমাহার যেন এক অসামান্য নকশা পরিস্ফুট করে তুলেছে এই উপন্যাস এক 'antique epic' হলেও তার রচনাশৈলী একেবারেই আধুনিক। স্বেচ্ছাকৃত বৈপরীত্যে সেই উপন্যাসে যেমন পাই আমরা অপরূপ টেনশন তেমনি কমলকুমারের 'অন্তর্জলীযাত্রা'-তেও। গল্পের বস্তুত্ব, উপন্যাসের ঘোর বাস্তবতা তাতে ক্ষুন্ন হয় না। বেড়ে যায় বরং।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'-এর পঞ্চম খণ্ডে 'ঈশ্বরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য, বলা হয়েছে। 'অন্তর্জলীযাত্রা'-র লেখক ভূমিকায় বলেছেন 'জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন' এবং 'এই গল্প সেই গল্প ঈশ্বরদর্শন যাত্রার গল্প।' কথামৃতের দ্বিতীয় খণ্ডে পঞ্চমুণ্ডীর শ্মশানের কথা পাই, যেখানে ভগবতী নিজে কঠোর তপস্যা করেছিলেন লোকশিক্ষার জন্য সেই পঞ্চমুণ্ডীর কথা বারে-বারে আছে আমাদের এই উপন্যাসে। 'কত কটা ডাগর সতী দাহ হল', তাই গঙ্গা চোখের জলে লোনা হল; তাই ক্ষুব্ধ গঙ্গা ভাসিয়ে নিল পঞ্চমুণ্ডীর শ্মশান—'মা গঙ্গার সঙ্গে চালাকি, মা-ই বটে কোম্পানী, ডুবে গেল শালা পঞ্চমুণ্ডী।' পঞ্চমুণ্ডীর ঘাট

ডুবে যাওয়ার কারণের কথা যখন বৈজুনাথ বলে তখন তার দীর্ঘশ্বাসে, অসহায় কণ্ঠস্বরে 'গোধুলি লগ্নের অস্পষ্টতা, দূরাগত শঙ্খধ্বনির মায়া, বৎসহারা গাভীর আর্তরবের রেশ ছিল ...।' কথামৃতে আরও পড়ি, রামকৃষ্ণ ঈষৎ হেসে নিজের শরীরের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে শরীরটাকে 'খোল' বলেছিলেন। হাটভাতারী খানকী মাগীর দুয়ারের মাটি পুণ্য হয়, কিন্তু পতিতা পতিতাই থাকে; বৈজুও তেমনি শ্মশানের পুণ্যমাটিতে বাস করে ভাব পায় না, সে ভাবের পাগল—সে বলে,' খোল বড় ভালোবাসি গো।' এই সব কারণেই কি গ্রন্থের ভূমিকায় কমলকুমার জানিয়ে দেন 'এই গ্রন্থের ভাববিগ্রহ রামকৃষ্ণের ...।

কিন্তু তলিয়ে দেখলে কিছুটা বিপরীত কথাই মনে হয়। রামকৃষ্ণ যখন দেহকে 'খোল' বলেছিলেন, তখন তিনি দেহকে অলীক মায়া-প্রপঞ্চ বলতে চেয়েছিলেন। দেহকে তিনি মূল্য দিতে চান নি, কিন্তু কমলকুমারের নায়ক বৈজু দেহকে, খোলটাকে বড় ভালোবাসে। সে শবদাহ করে বটে, কিন্তু জ্যান্ত মানুষ চিতায় শোবে এই চিন্তা তার পটে অসহনীয়। অসহনীয় কারণ সে দেহকে মায়া মিথ্যা, অলীক মরীচিকা মনে করে না। 'দেহ-মায়াবন্ত' বৈজুনাথ বলে, 'কাল শালা যাকে লিয়েছে সে যাক। কিন্তু কেউ কাউকে ঠেলে চিতায় ফেলবে, এটা কি বল?' কথামৃতের তৃতীয় খণ্ডে চিরাগত সত্যকে নতুন করে রামকৃষ্ণ উপদেশ হিসাবে উচ্চারণ করেছেন—'কি জান, ঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য! জীব, জগৎ, বাড়ি-ঘর-দ্বার, ছেলেপিলে, এ সব বাজিকরের ভেলকি! .. কিন্তু বাজিকরই সত্য, আর সব অনিত্য! এই আছে, এই নাই।' দেহ যদি নিতান্ত খোল হতো, জীব যদি নিতান্তই বাজিকরের ভেলকি হতো, অনিত্য হতো—তাহলে প্রাণবন্ত যশোবতীর সতীদাহের সম্ভাবনায় বৈজু এত কাতর হতো না। তাই এই উপন্যাস যদি ঈশ্বরদর্শনের গল্প হয়, তাহলে মানুষই যে ঈশ্বর, সেই ঈশ্বরদর্শনের গল্প 'অন্তর্জলীযাত্রা'। আমাদের স্নেহের যে নশ্বর জগৎ, সেই জগৎ সম্বন্ধে এক করুণাবাচক আকুলতা রচিত-উপন্যাসের বাক্যপরম্পরার পরতে-পরতে মিশে গেছে। নশ্বর হতে পারে, কিন্তু জীব অলীক নয়, বাজিকরের ভেলকি নয়। তাই জ্যোতিষী অনন্তহরি, গঙ্গাতীরে বেলাতটে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান নিয়ে যে অঙ্কপাত করেছিল, বৈজু দেখে সেই ধর্ষিত আঁকের উপর দিয়ে 'একটি ক্ষুদ্রকায়া ব্যাঙ, এই শায়িত ব্রহ্মাণ্ডের উপর দিয়ে লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতেছে।' বৈজুর চোখে ব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে জীবিত একটি ব্যাঙ বড় বলে প্রতীয়মান হয়। আর একটা চূড়ান্ত বাক্য তো রামকৃষ্ণই বলেছিলেন—'মানুষ কি কম গা!' এই উপন্যাসে অতি পুরাতন সনাতন হিন্দু চিন্তাধারা নয়, জাতিধর্মের গোঁড়ামি নয়, মানুষের মহিমা কীর্তিত।। আর সেই মহিমাকীর্তনের দায়িত্ব বৈজুর, শ্মশান-চণ্ডাল বৈজুনাথের।

আর কী অর্থে এই উপন্যাসের 'কাব্যবিগ্রহ রামপ্রসাদের'? শ্মশান ভাল বাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি'—এই গান হৃদয়-শ্মশানের গান, শ্মশানের পটভূমিতেই সেই গানের বৈরাগ্য ও আসক্তির মিশ্র আবেদন যেন যথার্থ রূপ পায়। এই উপন্যাসও শ্মশানের পটভূমিতে রচিত। অনতিদূরে উদার বিশাল প্রবাহিনী গঙ্গা, 'তরল মাতৃমূর্তি যথা'—শ্মশান অস্বস্তিকর নরবসার গন্ধ উদ্দাম, নশ্বরতার চিরসত্য সেখানে প্রতিভাত। সেই শ্মশানে প্রসাদী গান গায় বিজু—

এবার আমি সার ভেবেছি
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।
যে দেশে রজনী নেই মা সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।

যশোবতীর মনে পড়ে আর একটি প্রসাদী গানের কথা—

নয়ন থাকতে না দেখলে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে তনয়া রূপেতে বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া।

যশোবতীর দিব্যসংস্কারবশে মনে হয় সে-ই রামপ্রসাদকে বেড়া বাঁধায় সাহায্য করেছিল, সীতারামকে তার মনে হয়, 'জগজন-চিতচোর-নারায়ণ।' বৈজু গান গেয়ে যখন যশোবতীকে 'বিনিসুতোর মালাগাঁথুনী মালিনী' বলে বিদ্রূপ করে, তখন রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর'-এর কথা আমাদের মনে পড়ে। বৈজুও রামপ্রসাদের মতো বারে বারে সতর্ক করে দেয় 'ভাবের ঘরে চুরি ভাল নয়।' রামপ্রসাদী গানের ভাষার মতো বৈজুও রূপকের ভাষায় কথা বলে— 'দেহচিতায় মন পুড়ে গো', 'মানুষ বড় অচিন গাছ', মুমূর্ষু সীতারাম মানুষটার জন্য মনে তার করুণা জন্মে, কারণ 'শুকনো ডালে পাখি দুটো বড় হিমসিম খায়। রামপ্রসাদের পদাবলী পরতে-পরতে আমরা নশ্বরতাবোধ জনিত কারণে যুগপৎ যে বৈরাগ্য আর আসক্তির মিশ্রানুভূতিতে আবিষ্ট হই, সেই আবেগগভীরতা 'অন্তর্জলীযাত্রা'-কেও স্পন্দিত করে।

উপন্যাসের সূত্রপাতে একটি ছবি—*'আলো ক্রমে আসিতেছে। এ নভমণ্ডল মুক্তাফলের ছায়াবৎ হিমানীলাভ। আর অল্পকাল গত হইলে রক্তিমতা প্রভাব বিস্তার করিবে, পুনর্বার আমরা, প্রাকৃত জনেরা, পুষ্পের উষ্ণতা চিহ্নিত হইব। ক্রমে আলো আসিতেছে।'* এই ঊষালগ্নের চিত্র। আর উপন্যাসে শেষে আর এক ছবি, কোটালবানে সীতারামের সঙ্গে নববধূ যশোবতী ভেসে যাবার পর—*'একটি মাত্র চোখ, হেমলকে প্রতিবিম্বিত চক্ষু সদৃশ, তাঁহার দিকেই, মিলন অভিলাষিণী নববধূর দিকে চাহিয়াছিল, যে চক্ষু কাঠের, কারণ নৌকাগাত্রে অঙ্কিত, তাহা সিন্দুরে অঙ্কিত এবং ক্রমাগত জলোচ্ছ্বাসে তাহা সিক্ত, অশ্রুপাতক্ষম, ফলে কোথাও এখনও মায়া রহিয়া গেল।'* এই সূত্রপাত ও উপসংহারের দুই চিত্রলতার মধ্যে আছে এক মায়ার গল্প। *'পশ্চাতে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা জবুস্থবু, ঊর্ধ্বে অম্বর, সম্মুখে স্বামীসোহাগ লালিত যশোবতী, এ কোন ঘোর বাস্তবতা।'* এই ঘোর বাস্তবতাকে পূর্ণাঙ্গ ও অকৃত্রিম করে তোলার আয়োজনে গঙ্গা ও যশোবতীর সঙ্গে উপস্থিত করা হয়েছে অন্তর্জলীযাত্রী মুমূর্ষু সীতারাম চট্টোপাধ্যায়কে। তার সঙ্গে আছে কুলপুরোহিত কৃষ্ণপ্রাণ, সীতারামের দুই পুত্র বলরাম ও হরেরাম, কবিরাজ বিহারীনাথ, জ্যোতিষী অনন্তহরি, যশোবতীর পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ, এক গীতাপাঠক, কীর্তনিয়াদল এবং সর্বোপরি, ভুয়োদর্শী এক 'বাগ্মী-চণ্ডাল' বৈজুনাথ। অতীব প্রাচীন কুলীন ব্রাহ্মণ সীতারাম গঙ্গাতীরের শ্মশানে আনীত হয়েছে আসন্ন মৃত্যুর বিবেচনায় অন্তর্জলীর জন্য। ক্রমাগতই বাঙ্ময়ী গঙ্গার জলছলাৎ তার বিশীর্ণ পদদ্বয়ে লাগছিল—'বৃদ্ধের দেহে দেহে কালের নিষ্ঠুর ক্ষতচিহ্ন, অসংখ্য ঘুণাক্ষর, হিজিবিজি।' কপালে চন্দনের প্রলেপে মুখমণ্ডল আরো বীভৎস। নববসার গন্ধে উদ্দাম শ্মশানে মৃতকল্প সীতারাম।

দুঃসাহসিক মোচ নিয়ে উপস্থিত বৈজুনাথ—শ্মশানচণ্ডাল। যে কমলকুমারকে বলা হয়েছে হিন্দুসংস্কারাচ্ছন্ন, তিনি কিন্তু এই চণ্ডালকেই নায়ক করেছেন এই অসামান্য উপন্যাসের। মৃত্যু দেখে-দেখে, শব দাহ করে-করে সে মৃত্যু সম্বন্ধে নির্বিকার। নিজের হৃদয়, বৈজু বলে, লোহা যেন, দধীচির অস্থি দিয়ে গড়া, পালোয়ান পালোয়ান বাজ দিয়ে গড়া। তার মাংস শেয়াল কুকুরেও খায় না। "মড়া দেখি দেখি আমি মাটি হইছি গো, আমি তো শব গো, বহুদিন মরে আছি হে ..." নির্বিকার ঈশ্বর সম্বন্ধে সে বলে, "উই যে শালা উপরে, যে শালা সবার ভিতরে, তা কমল মানতে হবেক ...সে বড় কঠিন প্রাণ গো, কোন বোধ নাই, কান নাই, হাত নাই...বিকার নাই।" ঈশ্বরের মতো, মৃত্যু বিষয়ে বৈজুরও কোন বিকার নেই। মৃত্যু দেখে সবাই বলে, শত্রুরও যেন মৃত্যু না হয়। কিন্তু বৈজু জানে, "অথচক এমনি হয়।" কিন্তু যতই সে নির্বিকার হোক, সদ্যপিতৃহারা লাউডগা সুন্দর ক্রন্দনরত বালকের বেদনায় তার বজ্রকঠিন মন আর্দ্র হয়। এমনকী বৃদ্ধ সীতরামের জন্যেও তার মনে করুণা জন্মেছিল—"কাঁহাতক বুড়া মানুষটা হিম খাবে গো, আর মড়াবসায়, মড়া পুড়ার গন্ধ শুঁকবে ...।" সেই নির্বিকার জীবনপ্রেমিক বৈজু "তত্ত্বকথা বেজায়" জানে, কারণ শ্মশানে তার বাস, আর শ্মশান "ই যে মহাটোল বটেক।" কত পণ্ডিত আচার্যে তত্ত্বালোচনা সে শোনে, সে জানে "আত্মার সাকিম কুথাকে।" সে জানে, চিতায় যে কলস ভাঙা হয়, সে আসলে ঘটাকাশ, ভাঙলেই পটাকাশে মিলাবে। আবার নির্বাপিত চিতায় রৌপ্যখণ্ড পেলে বগল বাজিয়ে মহোল্লাসে নৃত্য করে বৈজু। চিতা থেকে কাঠকয়লা তুলে নিয়ে দাঁত মাজে বৈজু একেবারে স্বাভাবিকভাবে। তা দেখে অন্যেরা অস্বস্তিবোধ করে। তাদের অস্বস্তি অনুমান করে এই শাস্ত্রজ্ঞানী চণ্ডাল জবাব দেয়, মৃত্যুতে কিছুই থেমে থাকে না, "তুমিও আবার নাচতে নাচতে লাঙল ধরবে, ছেলে দুখালে, বউকে বলবে মাই দে না কেনে?" দ্বিতীয়ত, শব ছেড়ে বাইরে যাওয়া ডোমের নিষেধ বলেই সে দাঁতন খুঁজতে বাইরে যায় না। আর তৃতীয়ত, সতীদাহের পর চিতা নিবলে ব্রাহ্মণেরা যে মৃত্যুর সোনা খুঁজে-খুঁজে বের করে তাতে যদি দোষ না থাকে, তাহলে চিতার কাঠকয়লায় দাঁত মাজলে তার দোষ হবে কেন?

এইভাবে সতীদাহের কথাটা উঠে পড়লো। যে বৈজু পরে সতীদাহ নিবারণ করতে আপ্রাণ সচেষ্ট হবে, তার মুখ দিয়ে অসতর্কভাবে যেন সতীদাহের কথাটা প্রথম উচ্চারণ করিয়ে নিলেন কমলকুমার। বৈজু এখনো জানে না, অন্তরালে সতীদাহের এক আয়োজন হতে চলেছে। সতীদাহ নিয়েই এই উপন্যাসের আসল নাটক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিস্তারিতভাবে জানিয়েছিলেন বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এক মর্মান্তিক সত্য। *'অঘরে অর্পিতা হইলে কন্যা কুলক্ষয়কারিণী হয়; এজন্য, কন্যার দশা কি হইবেক, সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, যেন তেন প্রকারেণ, কন্যাকে পাত্রসাৎ করিতে পারিলেই তাঁহারা (কুলীন ব্রাহ্মণেরা) চরিতার্থ হয়েন।'* লক্ষ্মীনারায়ণ তাই জ্যোতিষী অনন্তহরির গণনার দিকে উন্মুখভাবে তাকিয়ে আছে। যদি সীতারাম আরো দুচারটে দিন বেঁচে থাকে, তাহলে গঙ্গাতীরের শ্মশানেই লক্ষ্মীনারায়ণ সীতারামের সঙ্গে যশোবতীর বিবাহ দিতে পারবে—যেন তেন প্রকারেণ কন্যাকে পাত্রসাৎ

করে কুলরক্ষার পরিতৃপ্তি লাভ করবে। পরিণামে যে সদ্যবিবাহিতাকে অচিরেই বিধবা হতে হবে, এবং তাকে সতীদাহের চিতায় আরোহণ করতে হতে পারে, এসব যেন বিবেচনার বিষয় নয়। অবশ্য সীতারামের সঙ্গে তার কন্যাকে পরিণামে সহমৃতা হতে হবে সেটা প্রথমে লক্ষ্মীনারায়ণের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় নি। জ্যোতিষী অনন্তহরি বালুতটে অঙ্কপাত করে জানলো, পূর্ণিমায় 'চাঁদ যখন লাল হবে' তখন সীতারামের প্রাণবায়ু নির্গত হবে। কিন্তু একা যাবে না হে। দোসর নেবে...।' এই মুমূর্ষু জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মৃত্যুকালে দোসর নেবে, এই সংবাদ এতই অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, বৈজু সমর আহ্বানের ভঙ্গিতে হাত আন্দোলিত করে মহাকৌতুকে বলে, 'দোসর! দোসর বলতে তবে বুঝি আমি! বুড়ো বুজঝি আমায় লিব্‌বে·গো। শেষ বাক্যটি সে ঝুমুরের ছন্দে বলে মহা উৎসাহে লাফিয়ে উঠছিল। কন্যাকে সীতারামের সঙ্গে বিয়ে দিলে তাকে যে সহমৃতা হতে হবে, সেই কথা স্পষ্ট হয়ে গেলে লক্ষ্মীনারায়ণ একেবারেই যে মানবিক করুণায়, অপত্যস্নেহে প্লাবিত হয় নি তা নয়। 'বারম্বারই একটি বালিকার, যে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা সর্বাংশে লক্ষ্মীপ্রতিমার ন্যায়, তাহার সরল নির্মল মুখমণ্ডল তাঁহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিয়া তাঁহাকে সর্বরূপে বিমূঢ় করিয়াছে ...।' কিন্তু সে-ও তো প্রথার নিগড়ে বন্দী, তাই অচিরেই সে অবসাদ কাটিয়ে ওঠে। গঙ্গাতীরে আনীত সীতারামের প্রাণবায়ু নির্গমনের কাল-বিলম্ব সমাচারে সে চোরা আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু অপরাধবোধ থেকে সে স্বভাবতই নিস্তার পায় না। বিবাহের পর সে যশোবতীকে বোঝায় সবই কপাল এবং তাকে সে স্বামীসেবা ও পতিভক্তির পরামর্শ দেয়। তার পুণ্যে যশোবতীর পিতৃকুলের স্বর্গবাস হবে. এমনকী সীতারামেরও পুনর্জন্ম হবে, ইত্যাকার সান্ত্বনাবাক্য সে অসংলগ্নভাবে বলে চলে। কলাপাতা থেকে এক মুষ্ঠি ধান নিয়ে যশোবতী পিতৃঋণ শোধ করতে গিয়ে অশ্রুসংবরণে ব্যর্থ হয়, লক্ষ্মীনারায়ণেরও বুক ফেটে যায়।

সীতরামের সঙ্গে তার কন্যার পরিণয়ে রাজি করানোর জন্যে তার পরিজনবর্গকে অনুরোধ করতে লক্ষ্মীনারায়ণ যখন অনন্তহরিকে বলে, তখন এই প্রস্তাবে বাধা দেয় একমাত্র আয়ুর্বেদিক নাড়ীজ্ঞানী বিহারীনাথ। বিহারীনাথের পেশা মানুষের দেহকে নীরোগ করা, তাই জীবন্ত মানুষকে দাহ করার প্রস্তাবে তার মন সায় দেয় না। জ্যোতিষী অনন্তহরি যখন অনিচ্ছুক বিহারীনাথকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল, তখনই সেখানে যেন দৈব-প্রেরিত হয়ে 'এক নয়নাভিরাম,বাবু, সুন্দর, প্রজাপতি' দেখা দিল। সেই প্রজাপতি দেখে পাত্রীর পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ 'স্তম্ভিত', অনন্তহরি 'অতিশয় আহ্লাদিত', আর বিহারীনাথ 'এই যুক্তিহীন দৈবঘটনাকে প্রীতির চক্ষে না দেখিলেও, এ মহা-আশ্চর্যে তিনি সত্যিই হতবাক হইয়াছিলেন।' এই কাজের পক্ষে একের পর এক যুক্তি বিস্তার করে চলে অনন্তহরি। মৃত্যুকালে দোসর নেবার ব্যবস্থার সে পৌরাণিব উদাহরণ দেয়—পাণ্ডু পত্নী মাদ্রীর উদাহরণ। তাছাড়া মৃতকল্প সীতারামের সঙ্গে বিয়ে দিলে কুলীনকন্যার পিতৃকুলের জাতি-কুল-মান রক্ষা পাবে নিশ্চিত। কোম্পানীব রাজত্বে সতীদাহ নিষিদ্ধ ঠিকই, কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ শপথ করে সে মামলা করবে না। অভিজ্ঞতা দিয়ে কবিরাজ জানে, অল্পবয়সী বিধবার দায়িত্ব বাপেরা নিতে চায় না। তাই পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ থেকে

জ্যোতিষী অনন্তহরি, পুরোহিত কৃষ্ণপ্রাণ সকলেরই লাভ এই সতীদাহে। কবিরাজ বিহারীনাথ জানে এতজনের স্বার্থ যেখানে জড়িত সেখানে তার বাধা দেবার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই সে বৈজুর সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও বাধা দেবার বৃথা চেষ্টা আর করে না। আর এই বিবাহ প্রস্তাবে সীতারামের সম্মতি চাওয়া হলে সে মুখমণ্ডলের দাড়ি দেখায়। যেন খেউরি করিয়ে মুখ পরিষ্কার করে দিলেই সে বিয়েতে রাজি।

বৈজুনাথ মৃত্যু সম্বন্ধে নির্বিকার, সে চিতার এক কোণে প্রজ্বলিত কাঠের উপর হাঁড়ি বসিয়ে ভাত ফুটিয়ে নিতে দ্বিধা করে না। কিন্তু এক সদ্য যৌবনা নারীর সদ্য বৈধব্যের ও তার সহমৃতা হওয়ার সম্ভাবনায় সে যেন ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। জীবনের প্রতি প্রগাঢ় আসক্তিতে এই মৃত্যুর সম্ভাবনাকে সে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধে উদ্যত হয়। সীতারাম মৃত্যুকালে দোসর নেবে জ্যোতিষীর এই ভবিষ্যৎবাণীকে বৈজু পরিহাস করায় জ্যোতিষী তাকে পরজন্মে কুকুর হয়ে জন্মাতে হবে বলে শাপ দিয়েছিল। উত্তরে জানিয়ে ছিল বৈজু 'সে বড় ভাল হবে গো ঠাকুর—কুকুর হওয়া ঢের ভাল।' অসহায়ভাবে হেসে বৈজু যেন বলতে চেয়েছিল, সতীদাহের আয়োজন করে যে মানুষ, তেমন মানুষ হওয়ার চেয়ে কুকুর হওয়া অনেক ভাল। অনেক পরে যশোবতী একবার তাকে 'কৃমিকীট হয়ে থাকবি' বলে অভিশাপ দিয়েছিল। তখনও বৈজুর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অনুরূপ—'মানুষ্যজনমে গড় করি, আমি আর চাই না কনেবউ... কৃমিকীট কুকুর হওয়া ভালো গো, তাদের জাগা-ঘরে চুরি নেই, যাতনাও দেয় না হে।' অস্পৃশ্য ডোম চণ্ডাল সে, জাতিভেদস্তরের সব চেয়ে নীচু পর্যায়ে তার অবস্থান। এই অন্ত্যজ বৈজু উপন্যাসের নায়ক। তার হৃদয় বেদনায় দ্রবীভূত হয়, আর তাই উঁচুজাতের নৃশংসতা তাকে ক্ষিপ্ত করে। বামুন কায়েতের সতীর ছায়া মাড়ানো নিষেধ—নীচুজাতের লোক বলে সে অসহায়, উঁচুজাতের মানুষ হলে সে লাঠি ঘোরাতো, এদের বীভৎস বিবাহ ও নৃশংস প্রথাকে লাঠির জোরে বন্ধ করে দিত। সতীদাহ বন্ধ করার মানসে সে এই দম্পতির চাঁদোয়া ঘিরে দৌড়াদৌড়ি করে ভয় দেখায়। সীতারাম ভয়ে যশোবতীকে আলিঙ্গন করে। আলিঙ্গন-মুক্ত হয়ে যশোবতী কাজললতা হাতে 'দুষ্টকর্মা চণ্ডালের পথরোধ' করে। যশোবতী প্রশ্ন করে, তার কি মায়া দয়া নেই? হরিণনয়না যশোবতীর সুতপ্ত অশ্রুধারা দেখে, প্রশ্নের উত্তরে বৈজু বলে, 'আমি জাত-চাঁড়াল, বলি মায়ামমতা কোথাকে পাব গো, ও সব তো বামুন-কায়েতের ঘরে মরাই-মরাই ...।' তীব্র বিদ্রূপে সে আঘাত করে সমস্ত বীভৎস আয়োজনকে, ছিঁড়ে ফেলে দেয়, মিথ্যা নির্মোক আর উদঘাটিত করে ভিতরের গূঢ় স্বার্থপরতাকে। কন্যাপক্ষের শোভাযাত্রা আসতে দেখে সে ভয়ংকর ভাবে চেঁচিয়ে বলে, 'ওগো তোমাদের পুণ্যাত্মা বুড়ার কনে আসছে ...।' বিবাহ হয়, এমনকী কড়িখেলাও হয়—পুরাতন ঊর্ণনাভের মতো হাতখানি দিয়ে সীতারাম ক্রীড়াচ্ছলে যশোবতীর হাত আকর্ষণ করে বিবাহ-বাসরের উপযোগী গান গেয়ে ওঠে বৈজুনাথ—'বিবাহ এক রক্তের নেশা/বরবউ যেন বাঘের মতো...।' এই বিসদৃশ বাসরে এই গান যে ভয়ংকরভাবে বেমানান, বিদ্রূপাত্মক আয়রনিক, তা সীতারামের সহচরেরাও বুঝতে পারে। এই গান গাওয়ায় কৃষ্ণপ্রাণ প্রভৃতি বাধা দিলে বৈজু আহত হয়ে

খুব জ্ঞানী-ন্যাকা ভঙ্গিতে বলে 'তা বাসরঘরে গোঁফচোমরানো গান হবে না ঠাকুর, এ কি হবিষ্যি গান হবে...।' প্রকারান্তরে সে জানায়, বাসর-জাগার গান নয়, হবিষ্যির গানই মানানসই হবে। ঠিক এই ঘটনার প্রতিধ্বনি উপন্যাসে পরে আর একবার আমরা পাই। সীতারাম যশোবতীকে গান গাইতে বলায়, যশোবতী বেহাগ রাগিণীতে গান ধরে 'তৃণাদপি সুনীচেন' ইত্যাদি ভক্তিগীতি। সীতারাম এই গান শুনে রেগে গিয়ে তিক্তস্বরে বলে, 'হরিধ্বনি দাও না তার থেকে।' অপ্রস্তুত যশোবতী তখন বিবাহবাসরের উপযোগী গান ধরে 'যাই যাই লো আমায় বাঁশীতে কে ডেকেছে।' ঠিক সেই সময়ে যেন সীতারামের পূর্ব-উক্তির সমর্থনে শ্মশানে 'হরিধ্বনির অট্টরোল উঠিল।' সে যাই হোক 'বিবাহ এক রক্তের নেশা।' গানের অনৌচিত্যের কথা কৃষ্ণপ্রাণ প্রভৃতি বললে আহত বৈজু সজল নেত্রে বলেছিল, চাঁড়ালের ঘরে জন্মেছি ঠাকুর, ন্যায় অন্যায় জানি না। তবু তুমি শেখালে গো।' আসলে সহজাত ন্যায়-অন্যায়বোধ তারই আছে। সে দেখিয়ে দেয়, উচ্চবর্ণের ন্যায়-অন্যায়বোধ বিকৃত, অস্বাভাবিক।

মৃতকল্প বৃদ্ধ স্বামীকে নিয়ে যশোবতী যখন নিদ্রিত তখন 'ভাবের ঘরের চোর কনেবউ'-এর কাছ থেকে সীতারামকে অপহরণ করে বৈজু—কেননা 'ধুক ধুক করা নরদেহ' সে বড় ভালবাসে। জোর করে সীতারামকে নিয়ে অন্তর্ধান করে, গঙ্গার জলে নামতে থাকে, আর বলে, "দোসর লাও শালা বুড়ো"। কিন্তু সীতারাম সজোরে তার কণ্ঠ বেষ্টন করলে সে বিপদে পড়ে যায়, অন্যদিকে নিদ্রোত্থিত যশোবতী অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে তাকে আঘাত করতে থাকে। নিরুপায় বৈজু সীতারামকে ফিরিয়ে এনে শুইয়ে দেয় তার শয্যায়, আর তীব্র বিদ্রূপে যশোবতীকে বলে "লাও ঘর কর"। পরে অবুঝের মতো সীতারাম দুধ খেতে চাইলে যশোবতী অনন্যোপায় হয়ে বুনোদের ঘরে দুধ সংগ্রহে যায়। ফেরার পথে বৈজুর সঙ্গে দেখা। যশোবতী দুধ নিয়ে যাচ্ছে দেখে বৈজু বলে, "এখন বুড়োর গায়ে গত্তি লাগবে বটে...।" আরো মর্মান্তিক বিদ্রূপ পাই উপন্যাসের একেবারে শেষে। শ্মশানে পড়ে থাকা এক নরকপালকে বৈজু তার বউ বলে। সেই নরকপাল নিয়ে যশোবতীর মুখোমুখি হলে যশোবতী ভয় পায়। বৈজু বলে,"বুড়ো যদি তোমার ইহকাল পরকাল হয়, এই বা কি দোষ করলে গো কনেবউ।" এই উপন্যাসের প্রধান বিশিষ্টতা, সংলাপে-বর্ণনায় মর্মান্তিক আয়রনির ব্যবহারে—বিষাক্ত তীরের মতো তা আমাদের বিদ্ধ করে, বিমূঢ় করে। এই আয়রনির ব্যবহারে গড়ে ওঠে এই উপন্যাসের ঘোর বাস্তবতার টেন্‌শন। চম্পক ঈশ্বরীর মতো অনিন্দ্যসুন্দর সালংকারা যশোবতীকে নিয়ে কন্যাযাত্রীর দল যখন শ্মশানে প্রবেশ করছে, তখন অন্য এক শবের চিতা সাজানোর জন্যে একজন কাঠ নিয়ে সেই মিছিলে অজান্তে ঢুকে পড়েছে। যখন শোভাযাত্রা আর শবযাত্রা একাকার হয়ে যায় তখন লক্ষ্মীনারায়ণ চাপা মন্তব্য করে 'যত অলুক্ষণে কাণ্ড'! কিন্তু যশোবতীর বিবাহের শোভাযাত্রা এক অর্থে শবযাত্রা-ই। "ষড়ঐশ্বর্যময়ী দেবীমূর্তি-র মতো যশোবতীর দিকে তাকাতেই উত্তেজনায় সীতারামের মুখ থেকে গাল-চোষার শব্দ বেরোতে লাগল, লালা গড়াতে শুরু করলো। এই প্রায়-মৃত পাত্রকে দেখে বাজনদারেরা বাজনা ভুলে গেল। 'কেহ ফুঁ দেয়, আবার ঠিক হয়, কেহ বেতালা ঢাক বাজায়,

কাঁসি খন খন বাজিয়া উঠে।' তারপর 'যশোবতী বৃদ্ধকে দেখিয়াই চক্ষু তুলিলেন, সীতারামের পিছনে, নিম্নে প্রবাহিনী গঙ্গা। দেখিলেন, স্রোতে গলিত দেহে শকুন বসিয়া মনঃসংযোগ করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহারই পার্শ্বে চক্রাকারে ঘুরিয়া কাক তাহাকে বিরক্ত করে। মালাবদলের সময় মন্ত্রচালিত পাষাণপ্রতিমা যশোবতীর হস্তধৃত মালা বৃদ্ধের কণ্ঠ লগ্ন হল বটে, কিন্তু কাশির দমকে সীতারামের হাতের মালা যশোবতীর কণ্ঠে ন্যস্ত না হয়ে হাওয়ায় ভেসে গেল এবং বৈজুর ছাগল তার সদ্ব্যবহারে মুখ বাড়াল। বিবাহের পুরোহিত কৃষ্ণপ্রাণ আরো এক রৌপ্যমুদ্রা দাবি করলে পাত্রীর পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ অসুবিধায় পড়ে বিব্রত বোধ করে। বৈজু মন্তব্য করে—"যাঃ শালা—পাকা ঘুটি বুঝি কাঁচে গো"—এবং ধার দিতে চায়। তার মন্তব্য, তার ধার দিতে চাওয়া—সব কিছুর মধ্যেই তার বিদ্রূপ ক্ষুরধার। লক্ষ্মীনারায়ণ ক্ষিপ্ত হয়ে "হারামজাদা ইতর চাঁড়াল" বলে গাল দেয়। তখন উপদেশ দেয় কৃষ্ণপ্রাণ "কন্যা সম্প্রদানকালে ক্রোধ পরিত্যাজ্য" এবং আরো বলে "একমাত্র মুদ্রার ক্ষেত্রে জাতিবিচার চলে না। এতদ্ব্যতীত শ্মশানে উচ্চনীচ ভেদ নাই।" ফলে লক্ষ্মীনারায়ণকে বৈজুর কাছে হাত পাততে হয়। বৈজু যেভাবে টাকা দেয়, তার মধ্যে দিয়েও স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার উদ্ধত অবজ্ঞা। বিবাহের পরে সীতারাম নববধূকে গান গাইতে বলায় যশোবতীর পক্ষে হাস্যসংবরণ কবা কঠিন হয়। সীতারাম তখন নিজেই গায় 'কি হে বাঁশী বাজায় বধূ' এবং 'বলি পরাণ বাঁশী ফেলে দাও'—সঙ্গে হাতের ফেরতাই দেয়, তেহাই পড়ে, তারই সঙ্গে মর্মান্তিক আয়রনিক সংবাদ জানিয়ে দেন লেখক, 'সঙ্গে সঙ্গে হিক্কা উঠিল।' সীতারামের প্রস্তাবে স্বামী-স্ত্রী চাঁদোয়ার তলায় বসে বাঘবন্দী খেলছে যখন, তখন খেলারই মধ্যে হঠাৎ শ্মশানের নিকট প্রান্ত থেকে ঘোর হরিধ্বনি শোনা যায়।

কেন এই বিদ্রূপ, কেন বারে-বারে এই নির্মম ব্যঙ্গ পরিহাস? মৃত্যু দেখে-দেখে একদিকে যদিও অনাসক্ত বৈজুনাথ, অন্যদিকে তার অদম্য জীবনকামনা। মৃত্যু তার প্রাণে বড় ব্যথা দেয়—"মড়া দেখতে আমার বেজার নাই, সত্য, কিন্তু কেউ মরছে দেখলে বেজার লাগবে না!" সেই নরবসার গন্ধ ভয়ংকর শ্মশানে, সদ্যযুবতী কন্যার বিবাহের শোভাযাত্রা, এই বিষম বিবাহের আয়োজন দেখে সে নিজের ললাটে চপেটাঘাত করে। ব্যঙ্গে করুণায়, মর্মান্তিক আর্তনাদে সে বলে "না শালা আমরা কাঁদি না, মুতি—চোখে ত জল নেই।" যশোবতীর দিকে বৈজু তাকায়—'ঘাসে মুখ রাখিয়া হরিণী যেমত চাহিয়া থাকে, সেইরূপ দৃষ্টি দেখিতে পাইয়া সে থ হইয়া গেল।' তার নিত্যকার কাজ চিতা সাজাতে সাজাতে তার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে—যশোবতীর দিকে তাকিয়ে সে ঘোষণা করে, এই নারীর চিতা সে কিছুতেই রচনা করতে পারবে না। সমস্ত সত্তা তার এই সতীদাহের বিরুদ্ধতা করতে চায়, কিন্তু উচ্চবর্ণের মানুষগুলির আয়োজনের বিরুদ্ধে, স্বয়ং যশোবতীর বদ্ধমূল সংস্কারের বিরুদ্ধে সে অসহায়। বৈজু কাতর চঞ্চল, প্রায়-অচেতন অবস্থায় প্রশ্ন করে "আমি কি ঘুম! ... আমি কি ভূত! না না না... নিশ্চয় প্রেত ... না আমি চণ্ডাল? হয়ত আমি চিতা!" উপন্যাসের শেষে যশোবতী উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বৈজুকে যখন প্রশ্ন করে "তুমি কে?" তখন এই আধ্যাত্মিক

প্রশ্নের জবাবে বৈজু বলে, "শেষ নিঃশ্বাস নিয়ে যে জীব বেঁচে থাকে, আমি সেই জীব গো ...।" দুজনের বারংবার সংলাপ পাই আমরা—একদিকে চম্পকবর্ণা সুন্দরী, অন্যদিকে শ্মশান-পরিচর্যাকারী নরদেহ। বৈজু অনুরোধ করে, অনুনয় করে, ভয় দেখায়। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ পরিহাস তার অস্ত্র। সেই অস্ত্র দিয়ে সে বদ্ধমূল সংস্কারের ভিত্তিতে ভাঙন ধরাতে চায়। পারে না। বারে বারে হেরে যায়। আর হেরে গিয়েও ট্র্যাজিক মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে ওঠে।

'গতরক্যাঙলা' বৈজুর হাতে কত লোকের শবদেহ ঠেকা খায়, তার কোনো দরদ নেই—কিন্তু জ্যান্ত কেউ পুড়বে তা সে ভাবতে পারে না। "ওগো বাবু আমি ভাবের পাগল নই—আমি ভবের পাগল। তুমি পুড়বে চচ্চড় করে ... ভাবতে আমার চাঁড়ালের বুক ফাটছে গো ... তুমি পালাও না কেনে।" বৈজুর এই আবেদনে যশোবতী সায় না দিলে, বৈজু বলে, যশোবতী না হয় সতী হবে, তার নামে কত মানত, কত নোয়া শাঁখা জমা হবে, অপুত্রকের পুত্র নির্ধনের ধন হবে, সতীর না হয় স্বর্গবাস হবে—কিন্তু তারপরেই ক্ষিপ্ত বিদ্রূপে সে প্রশ্ন করে, "হ্যাঁ গা কনেবউ, স্বগ্‌গটা কেমন গো—দুধ আলতায়?" শ'য়ে শ'য়ে সুন্দরী দেখেছে বৈজু, কিন্তু যশোবতীর মতো এমনটি দেখেনি। যশোবতীর সৌন্দর্যই তাকে এই আয়োজনের অন্যায় সম্বন্ধে আরো তীব্র তীক্ষ্ণভাবে সচেতন করে তুলেছে। অনুনয়ে যখন কাজ হয় না তখন প্রায় ডাকাতের মতো ভয় দেখায় বৈজু। ভুল বুঝে যশোবতী যখন তার দিকে গায়ের অলঙ্কার ছুঁড়ে দেয় তখন ক্ষুব্ধ অসহায়তায় 'মর' বলে সে অন্তর্ধান করে। কারণ সে তো গহনা চায় না, সে যশোবতীকে বাঁচাতে চায় মৃত্যুর আসন্ন আক্রমণ থেকে। বৈজুনাথ এক বিসদৃশ অবৈধ মিথুন দেখেছে, যে মিথুন অন্যায় যুক্তিহীন, বিশ্ববিধানের বিরুদ্ধে। সে সর্বপ্রযত্নে তাকে ব্যর্থ করতে উদ্যত। সে কখনো দম্পতির চাঁদোয়ার চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করে মুমূর্ষু বৃদ্ধ ও তার নবযুবতী স্ত্রীকে ভয় দেখায়। কখনো সনির্বন্ধ অনুনয় করে যশোবতীকে বলে—"এ আমি হতে দিব না গো... তুমি পালাও হে, দুনিয়াটা খুব বড় কনেবউ—দুনিয়াটা খুব বড় বলতে আমার কেমন রোমাঞ্চ হচ্ছে হে ... পালাও কনেবউ।" এই লোকচরাচর তার বহুদিনের সাঙাৎ, তার সঙ্গে তার বহুকালের প্রণয়—তাই 'পৃথিবীটা খুব বড়' বলতে সে বাস্তবিকই রোমাঞ্চিত হয়, সেই সুমহান বিরাটত্ব অনুভবে সে কিছুক্ষণের জন্য যেন বীতচেতন হয়। সে আবার যশোবতীর মুখোমুখি হয়, কঠোর প্রাকৃত ভাষায় বলে, ঐ ঘাটের মড়াটাকে সে যে স্বামী ভাবছে সেটা 'মিছা মিছাই মিথ্যা হে কঠিন মিথ্যা গো।" মানুষ বড় ডাগর জীব, কাঠের বিড়াল দিয়ে ইঁদুর ধরে, অলীককে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করে; কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি করে কী লাভ। যা মিথ্যা তা মিথ্যাই। তামসিক চণ্ডালের রাজসিক কণ্ঠ, সত্ত্বগুণ দীপ্ত বাক্যালাপের সাহায্যে বারে বারে এইভাবে প্রতিরোধ রচনা করে।

শুধু কথা দিয়ে নয়, কাজেও এই দুর্দান্ত চণ্ডাল একাই প্রতিরোধ নির্মাণ করে। নিদ্রিত যশোবতীর অজ্ঞাতে সীতারামকে গঙ্গায় ডোবাতে গিযে সে কার্যগতিকে ব্যর্থ হয়। স্বামীর নোংরা করে ফেলা কাপড় এবং নিজের অশুচিবস্ত্র কেচে যশোবতী যখন নৌকাব আড়ালে নগ্ন হয়ে স্নানরতা, তখন সহসা বৈজু এসে উপস্থিত হলে বিমূঢ় যশোবতী ভূততাড়িতের

মতো পালাতে উদ্যত হয়। কিন্তু বৈজু 'পরক্ষণেই যশোবতীর সুন্দর রূপলেখা, নশ্বর দেহখানি দুই হস্তে তুলিয়া ধরিল। বিবস্ত্র অবস্থায়, বিশেষত নীচকুলোদ্ভব পরপুরুষের বাহুবন্ধনে লজ্জায়, ক্ষোভে, দুঃখে, ব্যথায়, ক্রোধে, অপমানে যশোবতী বিহ্বল। বৈজু বলতে থাকে, "এখন তুমি শব ছাড়া কিছু নও।" শব, তাই এই নগ্নিকা সুন্দরী কোনো যৌনচেতনা জাগায় না তার মনে। আবার এই শবকেই সে জীবন দিতে চায়; বৈজু তাকে বাঁচাবে, যশোবতী অভিশাপ দিতে গেলে সে জানায় দেহচিতায় যার মন পোড়ে তার গায়ে অভিশাপ লাগে না। ক্ষিপ্ত যশোবতী বলে, নিশ্চয় এই দুর্দান্ত চণ্ডালের কোনো অসৎ অভিপ্রায় আছে। যাকে বাঁচানোর জন্য সে সর্বস্ব পণ করেছে তার মুখে এই নিন্দনীয় ইঙ্গিত শুনে বৈজু রাগে অন্ধ হয়—"কি বল্লিস গো কনেবউ, তুমার মনে এই ছিল হে, শ্মশান আমার ঘরনী, আমি তার শ্বশুরঘর, ছি গো ছি, তুমি নারী কি পুরুষ তা আমি জানি না ...।" তার মনে স্বয়ং শুকদেব বাস করে। তাই অত্যধিক ঘৃণ্য সামগ্রীর মতোই সে যশোবতীকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। হতাশ হয়ে যায় এইভাবে ব্যর্থশ্রম বৈজুনাথ। তার মনে হয়, 'আমি আমি' বলা আর সাজে না যশোবতীর—"তুমি কার আমি। তুমি তো এক প্রহরের শ্বাসটানা শব; কাল এতক্ষণ চাঁদ যখন লাল, তখন লয়...।" বেঁচে থাকলে সহমৃতা হওয়ার নিয়তি থেকে যশোবতীর অব্যাহতি নেই বৈজু সে কথা বুঝে গেছে। অথচ যশোবতীর চরিত্রে সন্দেহ করে তাকে কুৎসিত ভাষায় "হারামজাদী নষ্ট খল খচ্চড় মাগী" বলে সীতারাম গালি দিলো, যশোবতী যখন গঙ্গায় আত্মহত্যা করতে উদ্যত, তখন 'গতরক্যাঙলা' বৈজুই তাকে বাঁচায়। বলে, "মরতে পারলে তুমি বাঁচতে"—কিন্তু মরতে দেয় না। মরতে দেয় না, কারণ জীবনের প্রতি প্রগাঢ় আসক্তি তার মজ্জায় মজ্জায়। সীতারামকে ঘিরে যারা শ্মশানে সমবেত হয়েছিল, যাদের মুখমণ্ডলে কেশে ভস্মকণা, যারা ভূতপূজকের মতো প্রহরের পর প্রহর জেগে ক্লান্ত তাদেরও 'প্রত্যেকের মনে ইদানিং বাস্তবতাকে শ্মশানের ক্ষিপ্রতাকে অগ্রাহ্য করত আপন-আপন গৃহকোণের প্রতিচ্ছবি চিত্রিত হইয়াছিল।' মৃত্যুর সংসর্গে তারা ক্লান্ত, জীবনের স্পর্শ চায়। এমনকী মৃতপ্রায় সীতারামের চাবিকাঠি হস্তগত করা নিয়ে তার পুত্রের যে কুৎসিত বিবাদ তার মধ্যেও হয়তো জীবনের অমোঘ প্রবহমানতারই এক বিকৃত প্রকাশ পাই। জৈব জীবনাকাঙ্ক্ষা এমন কী সংস্কারাচ্ছন্ন যশোবতীকেও উদ্বেলিত করে। গঙ্গার জলোচ্ছ্বাসে যশোবতী পুনঃ পুনঃ 'হে কৌন্তেয়, হে কৌন্তেয়' শুনতে পায়; কৃষ্ণ যেমন কৌন্তেয় অর্জুনকে, তেমনি যশোবতীর নিজেকেই নির্বেদ ত্যাগের পরামর্শ দিতে হয়। নিজের মনকে সে শান্ত স্থির করে রাখে বটে, কিন্তু মানসচক্ষে সতীদাহের অনুষ্ঠান—হরিধ্বনি, কাঁসরঘণ্টা, ব্রাহ্মণদের পাঁজীপাঠ, এয়োস্ত্রীগণের অনুষ্ঠান—কল্পনা করতে করতে যশোবতী একবার হতচেতন হয়ে গঙ্গায় প্রায় পতিত হয়।

এই জীবনতৃষ্ণারই এক বৈপরীত্যময়, প্রায় হাস্যকর, আয়রনিক রূপ দেখি মৃতকল্প সীতারামের মধ্যে। উদ্ভিন্নযৌবনা যশোবতীর হেমদেহস্পর্শে বৃদ্ধ সীতারামের গায়ে যেন মাংস লাগল। আবেগের রঙ্গে সে উচ্চারণ করতে থাকে 'বাঁচব বাঁচব', আর তার ফলে মুখের কষ দিয়ে তাব লালা নিঃসৃত হয়। বাড়ি জমি সংসারের কথা নতুন করে মনে পড়ে যায়

সীতারামের। অক্ষম শরীরে তার যেন জোয়াল ঠেলা ক্ষমতা ফিরে আসে। সীতারাম তার জন্যে কাতর হয়ে কাঁদতে দেখে সেই বার্ধক্যের অশ্রুর মধ্যে যশোবতী 'বহু জন্মের পুঞ্জীভূত সঙ্গ, বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য, অন্তরঙ্গতা, মিত্রতা'র স্বাদ পায়। মায়া মমতাবশে জরাজীর্ণ কালাহত স্বামীর কণ্ঠে বেষ্টন করলে তাদের দেখে মনে হয় যেন আশ্লেষবদ্ধ পার্বতী পরমেশ্বরের প্রতিচ্ছবি। সেই আলিঙ্গন অবশ্য বৃদ্ধ সহ্য করতে পারে না। সীতারামের হাসির চেষ্টা যেন 'রক্তমন্থনকারী এক অদ্ভুত ধ্বনি, তবু সে হাসতে চায়। সীতারাম ভাবে এ জন্মে হল না, জন্মান্তরে সে যশোবতীকে নিয়ে আবার ঘর বাঁধবে। সে যুবকের মতো স্ত্রীর উরুতে চাপড় দিলে 'রমণীর জরায়ু মহানন্দে মহুয়া-বেসামাল নৃত্য করিতে লাগিল।' সীতারাম ভাবে আবার হবে, সে বলে "বউ আমি আবার ঘর পাতব...। ...ছেলে দুব।" বৃদ্ধের এ হেন অহঙ্কারে স্থাবর ও জঙ্গমসমূহ এবং উলুধ্বনি করে। আর এই কথা শুনে 'ব্রীড়াবনত নববধূ মুহূর্তের... জন্য দিক্‌সমূহ এবং ত্রিলোক লইয়া নিশ্চিন্তে কড়িখেলা করিলেন।' সীতারামের যে জীবনতৃষ্ণা প্রথমে বিরূপতা, পরে কৌতুক জাগায়, পরে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করি তা-ই আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে আরম্ভ করে। যখন যশোবতীব দিকে তাকিয়ে আর মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়া স্বামীর মন কেমন করে তখন আর কৌতুকবোধে আমরা আচ্ছন্ন হই না। সীতারাম 'রাই জাগো রাই জাগো' ভোরাই গায়। এই বীভৎস পরিবেশেও তার ফুলশয্যা পাতার সাধ মনে জাগে। যশোবতীকে যেন প্রেমে, গভীর মমতায় বলে সে "বউ তুমি আছ বলে বড় বাঁচার সাধ হচ্ছে ...।" সীতারাম আয়নায় মুখ দেখতে চায়, আর পৃথিবী দর্শন করে তার ভাল লাগে—মনে হয় বহুদিন পরে এই পৃথিবীকে দেখছে সে। বৈজু বালিয়াড়ির মধ্যে হঠাৎ পড়ে গেলে যশোবতী যখন হাস্য সংবরণে ব্যর্থ হয়, তখন সেই হাসির শব্দে সীতারামের মনে তীব্র ঈর্ষা জাগে, আর তাতে তার 'বার্ধক্য যেন যৌবদশা প্রাপ্ত হইল।' স্বামীর তিবস্কারে অপমানিতা যশোবতীর আত্মহত্যার চেষ্টা বৈজু ব্যর্থ করে দিলে, যশোবতী আবার স-নাথ হয়ে স্বামীর পাশে ঘুমিয়ে পড়ে। যশোবতীর ঘুম ভাঙলে অনুতপ্ত কাতর বৃদ্ধ বলে, "তুমি আমায় ছেড়ে যাবে না তো" এবং "আমার কেউ নেই"। ফুলশয্যার কথা সে আবার যশোবতীকে মনে করিয়ে দেয় এবং লজ্জিত যশোবতী ফুল তুলতে যায়। এক অদ্ভুত অ্যাম্বিগুইটি, এক অপরূপ দ্বর্থ্যতা উপন্যাসের মর্মে-মর্মে রেখে যান কমলকুমার। জীবনকে ভালোবাসে বলেই সীতারাম-যশোবতীর বিবাহের বিরুদ্ধে সমস্ত সত্তা দিয়ে প্রতিরোধ করে বৈজু , অথচ এই বিবাহ হয় বলেই মরণোন্মুখ সীতারামের মধ্যে শেষ বারের মতো জীবনের প্রতি আসক্তি দুর্নিবার হয়ে ওঠে।

দুশো বছরের পুরোনো পটভূমিকায় লেখা কাব্যব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধশালী এই উপন্যাস পড়তে গেলে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'-র কথা মনে পড়ে যায়। হয়তো কাব্যব্যঞ্জনাময় ভাষার জন্যেই প্রধানত। *'ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব মূর্তি! নেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমি অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি! কেশভার আবেণীসমৃদ্ধ, সংসর্পিত, রাশিকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে।'* তুলনীয়

মনে হয় কমলকুমারের— *'অনিন্দ্যসুন্দর একটি সালঙ্কারা কন্যা প্রতীয়মান হইল, ক্রন্দনের ফলে অনেক স্থানের চন্দন মুছিয়াছে, আকর্ণ বিস্তৃতলোচনা রক্তাভ, হলুদ প্রলেপে মুখমণ্ডল ঈষৎ স্বর্ণসবুজ। সর্বলক্ষণে দেবভাব বর্তমান, ফলে সহজেই মনে হইবে এ যেন বা চম্পকঈশ্বরী, লক্ষ্মী-প্রতিমা।'* অথবা কমলকুমারের *'এই মুখমণ্ডলের বর্ণচ্ছটায় উদাত্ত গম্ভীর বেদগান ছিল; এ বেদগানের মধ্যে যেমন আনন্দ, আনন্দের মধ্যে যেমন প্রণাম, প্রণামের মধ্যে যেমন পুষ্পের রহস্য, পুষ্পের রহস্যের মধ্যে যেমন সরলরেখা...।'*

কিন্তু আমাদের বিবেচ্য উপন্যাসের কোনো ঐতিহাসিক কাহিনি নেই, হয়তো এই আধুনিক উপন্যাসে প্রচলিত অর্থে কোনো কাহিনিই নেই। অমোঘ এক কাব্যের মতো তার কাহিনির কোনো সারাংশ হয় না অন্তত। গল্পের শুরুতে শেষে একই রকম—ঘটনাপ্রবাহ নেই, চমক বা উৎকণ্ঠা নেই। ঘটনাপ্রবাহ বা প্রচলিত অর্থে কাহিনি 'অন্তর্জলীযাত্রা'-য় আমল পায় না। এই উপন্যাসের সমস্ত স্থানিক পটভূমি গঙ্গাতীরবর্তী শ্মশান—এই শ্মশানে স্বাহাবিরহী লেলিহান শিখা দিঙমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত, সেখানে লক্ষ মায়া ছাই হয়ে যায়, লক্ষ তোড় খার হয়ে যায়। আর এই বালুকাময় শ্মশান ছুঁয়ে গঙ্গাধারা প্রবাহিত— *'ইদানিং গঙ্গা, হাস্যময়ী ... ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফুলমৃদু জামরঙ। ক্রমাগত জলজ পানা ভাসিয়া যাইতেছে, নিম্ন আকাশে ডানার হিলমিল, শূন্যতাকে অপহরণ করিতে আপনার সত্তা হারাইতেছে।'* কপালকুণ্ডলার স্থানিক পটভূমি এক জায়গায় স্থির নয়। তবু তার আরম্ভ সমুদ্র ও নদী-মোহনা তীরবর্তী বালুতটে—যেখানে 'আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্বত্র নীরব. কেবল অবিরল কল্লোলিত সমুদ্রগর্জন আর কদাচিৎ বন্যপশুর রব।' এই উপন্যাসের শেষ গঙ্গাতীরের শ্মশানের প্রেতভূমে,—চৈত্রমাসের বায়ু অপ্রতিহত বেগে গঙ্গাহৃদয়ে প্রধাবিত হইতেছিল; তাহার কারণে তরঙ্গাভিঘাতজনিত কল-কলরব গগন ব্যাপ্ত হইতেছিল।' কাপালিক আর বৈজু দুজনেই যদিও শ্মশান-চারী, নরকপাল দুজনেই হয়তো খেলার সামগ্রী—কিন্তু তারা সগোত্র নয়। উপন্যাসেও তাদের সমান মূল্য নয়।

হয়তো উপন্যাসের পরিণামের বর্ণনার সাদৃশ্যেই একটি উপন্যাস অন্য উপন্যাসটির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। পুষ্পলাবী যশোবতীর সঙ্গে নরকপাল নিয়ে বৈজু যখন কৌতুক পরিহাসময় সংলাপে নিতে সেই সময় হঠাৎ কী যেন শব্দ হল—'বায়ু স্থির, পাখিরা উড়িয়া গেল, ধরিত্রীর বক্ষে কে যেন হাঁটু ডলিতেছে, ত্রিলোক এক হইয়াছে। ওজরিনী বিশাল তরল সমতল শ্মশান দাম্ভিকভাবে আসিতেছে, মহাব্যোমে স্ফুলিঙ্গ উদ্যত।' পূর্ণিমায়, চাঁদ যখন লাল, যেদিন দোসর নিয়ে চিরবিদায়ের কথা সীতারামের, সেদিন অতর্কিতে গুপ্তঘাতকের মতো কোটাল বান এসেছে। যশোবতী, পরিশ্রান্ত ঘর্মাক্ত অশ্বের মতো দ্রুত ছুটেছে—'জলপর্বত আসিতেছে, নিম্নে ফুলশয্যা, আর অপেক্ষমান বৃদ্ধস্বামী।' বাণবিদ্ধ পাখির মতো কর্কশ করুণস্বরে সীতারামের 'বউ' ডাক শোনা গেল, বৈজুর হাত সজোরে ছাড়িয়ে যশোবতী ছুটলো। কিন্তু ততক্ষণে জলের আলোড়নে তৈজস ছত্রাকার, গুপ্তঘাতক জলস্রোত বৃদ্ধ সীতারামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারপর *'অল্পবয়সী ষড়ৈশ্বর্যশালিনী পতিপ্রাণা কর্তা-কর্তা বলিয়া প্রতিমার কাঠামো*

ছাড়িয়া জলে লাফ দিলেন। ক্রন্দন করিতে করিতে সন্তরণের চেষ্টা করিলেন, দু'একবার কর্তা ডাক শোনা গেল। ইহার পর শুধু রক্তিম উচ্ছ্বাস। কেননা চাঁদ এখন লাল।' সীতারাম দোসর নিয়ে কোটাল বানের তীব্র জলস্রোতে ভেসে গেল। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ঘটনাচক্র তাড়িত হয়ে নবকুমার আর কপালকুণ্ডলা, এই নিয়তিতাড়িত দম্পতি গঙ্গার উচ্চতটে এসে দাঁড়িয়েছিল। চৈত্রবায়ুতাড়িত বিশাল তরঙ্গের আঘাতে ভেঙে যাওয়া মৃত্তিকাখণ্ড নিয়ে কপালকুণ্ডলা ঘোর রবে নদীপ্রবাহের মধ্যে পড়ল। 'অন্তর্জলীযাত্রা' য় স্বামীকে উদ্ধার করতে জলে নেমেছে স্ত্রী, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে স্ত্রীকে বাঁচানোর জন্যে জলে ঝাঁপ দিয়েছে স্বামী। নবকুমার সন্তরণে অপটু ছিল না। সাঁতার দিয়ে সে কপালকুণ্ডলাকে খুঁজলো। তাকে পেলো না, নিজেও উঠলো না। *'সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?* সীতারাম আর যশোবতী কোথায় গেল? আর 'দেহ-মায়াবন্ত' 'বাগ্মী-চণ্ডাল' বৈজুনাথ, সেই বা কোথায় গেল? কাল যাকে নিয়েছে সেই সীতারামের সঙ্গে নবোঢ়া যশোবতীর এই অদ্ভুত সহমরণ, সে কি অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলো, অথবা যশোবতীকে উদ্ধার করতে গিয়ে সে-ও কি কুটিল ভয়ংকর জলস্রোতে ভেসে গেল?

❑ যদি চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় রচিত 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' উপন্যাসটির আলোচনা করা হত তাহলে পাঠকের ভাল লাগত। কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপাল কুণ্ডলা' উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদের সেই শ্মশান, কাপালিক কী ভয়ংকর! 'চতুর্দ্দিকে স্থানে নরকঙ্কাল রহিয়াছে, এমনকি যোগাসীনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষমালা মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি খন্ড প্রোথিত রহিয়াছে।' অথবা শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বের সেই দার্শনিক উক্তি, 'আরে যে মড়া! মড়ার আবার জাত কি?' আর অবধূতের উদ্ধারণপুরের ঘাট' শ্মশানের পটভূমিকায় এক শ্মশানের মহাকাব্য। আরও কত রচনা। থাকলে ভালো হত। ব্যর্থতার দায় আমাদের।

— সম্পাদক

প্রত্যক্ষ ❑ প্রথমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মহালয়া, ১৩৮৭ হতে পুনর্মুদ্রিত।
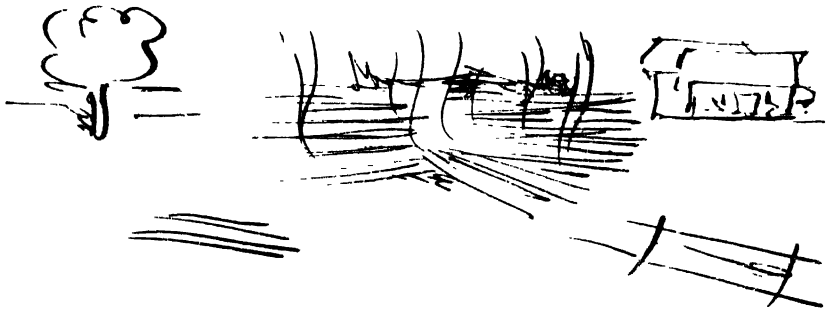
বাংলা গল্পে শ্মশান : জীবন ও সাহিত্যের কিছু দৃশ্যায়ন

সিদ্ধার্থ সেন

মৃত্যু জীবনের অনিবার্য এক নিয়তি, এক অপ্রতিরোধ্য জাগতিক নিয়ম। সমস্ত কিছুর সঙ্গেই সৃষ্টি ও লয় ব্যাপারটি জড়িয়ে আছে। দেহও তার ব্যতিক্রম নয়। আসলে "Death is one of the most inexorable 'givens' of the human condition." মানবদেহ এই অপ্রতিরোধ্য মৃত্যুর হাত এড়াতে পারে না। মৃত্যু ঘটলে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে স্বাভাবিক রীতি হল শবদাহ। এই শবদাহের জন্য নির্ধারিত স্থান 'শ্মশান'। শব্দটির অর্থ 'শব শয়নের স্থান'। বাংলা কথাসাহিত্যে শ্মশানের প্রসঙ্গ বেশ কিছু গল্প-উপন্যাসে এসেছে আবার কখনও বা শ্মশানকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে উপন্যাসের চালচিত্র। জীবন ও মৃত্যুর আশ্চর্য সমন্বয়ের সেই ছবিটি আবিষ্কারের প্রচেষ্টা থাকবে এই রচনায় কিছু গল্পে।

বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ খ্রি. - ১৯৪১ খ্রি.) এর একটি বিশিষ্ট গল্প 'জীবিত ও মৃত'। গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল 'সাধনা' পত্রিকায় ১২৯৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে। গল্পটির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদেই একটি অকস্মাৎ মৃত্যুর প্রসঙ্গ পেয়ে যাই : *"বিধবার সমস্ত রুদ্ধ প্রীতি এই ছোটো ছেলেটির প্রতি সিঞ্চন করিয়া একদিন শ্রাবণের রাত্রে কাদম্বিনীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল।"*। বাস্তবিকই মানুষের জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে এক লহমার দূরত্ব যা অতর্কিতে মুছে যেতে পারে। মৃত্যুর পর লোকাচার মেনে শবদাহের জন্য তার মৃতদেহ আনা হল শ্মশানে। সেই শ্মশানের অবস্থান উল্লেখিত হয়েছে : *"রাণীহাটের শ্মশান লোকালয় হইতে বহুদূরে।"* এ শ্মশান আজকের শ্মশান নয়। এই গল্পে শ্মশানের বর্ণিত ছবিটিও বিশেষভাবে লক্ষনীয় : *"পুষ্করিনীর ধারে একখানি কুটীর এবং তাহার নিকটে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, বৃহৎ মাঠে আর কোথাও কিছু নাই।"* বটগাছের প্রকাণ্ডতা, বৃহৎ মাঠে কোথাও কিছু না থাকার অপার শূন্যতা, মৃত্যুর স্তব্ধতা, অস্তিত্বহীনতা, নিঃসীম শূন্যতাকে যেন ইঙ্গিতায়িত করে। সেই শ্মশানেব কাছে কোন এক সময় নদী ছিল : *"পূর্বে এইখানে দিয়া নদী বহিত, এখন নদী একেবারে শুকাইয়া গেছে।"* এই জলহীন শূষ্কতা যেন বিধবা কাদম্বিনীর জীবন। আবার *"সেই শুষ্কজলপথের এক অংশ খনন করিয়া শ্মশানের পুষ্করিণী নির্মিত হইয়াছে।"* শ্মশানে নদীর অবস্থান যেন মৃত্যু আর প্রাণের প্রবাহের সংলগ্ন অবস্থান। গল্পের প্রধান নারীচরিত্র কাদম্বিনীর শুষ্ক নারী প্রকৃতিও ওই শুষ্ক জলপথের মত খনিত হয়ে পরের ছেলের প্রতি স্নেহে সিঞ্চিত হয়েছিল।

শ্মশানের ওই ছোট্ট পুষ্করিণীটার অঞ্চলের লোকদের কাছে এক ধরনের স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে। গল্পকার বলছেন : *"এখানকার লোকেরা এই পুষ্করিণীকেই পুণ্য স্রোতস্বিনীর*

প্রতিনিধিস্বরূপ জ্ঞান করে।" অতঃপর গল্পে বর্ণিত হয়েছে শবদাহের পূর্বপ্রস্তুতিজনিত পরিস্থিতি : *"মৃতদেহ কুটীরের মধ্যে স্থাপন করিয়া চিতার কাঠ আসিবার প্রতীক্ষায় চারজনে বসিয়া রহিল। সময় এত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল যে অধীর হইয়া চারি জনের মধ্যে নিতাই এবং গুরুচরণ কাঠ আনিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন দেখিতে গেল, বিধু এবং বনমালী মৃতুদেহ রক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।"* আজ থেকে শতাধিক বছর আগে শ্মশানের ছবিটি এমনই ছিল। দাহকার্যের প্রয়োজনীয় কাঠ সংগ্রহ করে আনতে হত।

'জীবিত ও মৃত' অতিপ্রাকৃত রসের গল্প নয়। তবে অন্ধকারের প্রচ্ছদে ঢাকা শ্মশানে যেন এক গা-ছম্‌ছমে পরিবেশ তৈরি হয়ে যায় : *"শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রি। থমথমে মেঘ করিয়া আছে, আকাশে একটি তারা দেখা যায় না; অন্ধকার ঘরে দুই জন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।"* মৃত্যুপুরীর স্তব্ধতা যেন ঘিরে ধরতে থাকে রাত্রিকালীন পরিবেশকে। এর পরেই অলৌলিকতার আবহে তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি বদলে যায় মৃতদেহে আকস্মিক জীবনসঞ্চারে : *"কোথাও কিছু শব্দ নাই — কেবল পুষ্করিণীতীর হইতে অবিশ্রাম ঝিল্লি এবং ভেকের ডাক শুনা যাইতেছে। এমন সময় মনে হইল যেন খাটটা ঈষৎ নড়িল — যেন মৃতদেহ পাশ ফিরিয়া শুইল।"* রেখাঙ্কিত সংশয়বাচক উৎপ্রেক্ষার ব্যবহারে গল্পে শ্মশানের গা-ছম্‌ছমে পরিবেশে অলৌকিক রস জমাট বাঁধে। সেই রস আরও ঘনীভূত হয় এই বাক্যে : *"হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস শুনা গেল।"* এ শোনা নিশ্চিত তাই দুই শববাহক *"বিধু এবং বনমালী এক মুহূর্তে ঘর হইতে লম্ফ দিয়া বাহির হইয়া গ্রামের অভিমুখে দৌড় দিল।"* কাঠ আনতে যাওয়া বাকি দুই সঙ্গীকে নিয়ে শ্মশানে ফিরে এসে দেখল : *"মৃতদেহ নাই, শূন্য খাট পড়িয়া আছে।"* অবশেষে তারা আবিষ্কার করল : *"বাহিরে গিয়া দেখে কুটীরের দ্বারের কাছে খানিকটা কাদা জমিয়া ছিল, তাহাতে স্ত্রীলোকের সদ্য এবং ক্ষুদ্র পদচিহ্ন।"* অকালমৃতা কাদম্বিনী আবার হঠাৎই জীবন ফিরে পেয়েছে তার কারণটিকে লেখক এমনভাবে বর্ণনা করেন : *"সকলেই জানেন, জীবনের যখন কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় না তখনো অনেক সময় জীবন প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, এবং সময়তম পুনর্বার মৃতবৎ দেহে তাহার কার্য আরম্ভ হয়।"*

পুনর্জীবিত কাদম্বিনীর জীবনে শ্মশানের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞান ফিরতে সে দেখল "চতুর্দিকে নিবিড় অন্ধকার।" আর এই অন্ধকারের সূত্রেই ঘটেছে তার আত্মআবিষ্কার, স্মৃতিতে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে শ্বাসরোধের পূর্বমুহূর্তে তার শেষ চাওয়া : *"দিদি, একবার খোকাকে আনিয়া দাও।"* তারপর অতলান্ত অন্ধকার। সেই মৃত্যু বা অচেতনতার অবসান এই অপ্রত্যাশিত পুনর্জীবনলাভে। এই রাত্রির শ্মশানের পটভূমিকায় কাদম্বিনীর প্রতিক্রিয়া বা অনুভূতিটি যেন মৃত্যুর আস্বাদপূর্ণ . *"প্রথমে মনে হইল, যমালয়*

বুঝি এইরূপ চিরনির্জন এবং চিরান্ধকার। সেখানে কিছুই দেখিবার নাই, শুনিবার নাই, কাজ করিবার নাই, কেবল চিরকাল এইরূপ জাগিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।' মৃত্যু হয়তো ইন্দ্রিয়ের সমস্ত শক্তিকে হারিয়ে ফেলা এক নিরালোক নির্জনতা এমন মনে হয় তার। অথচ এও অনুভব করে : "*কেবল চিরকাল এইরূপ জাগিয়া উঠিযা বসিয়া থাকিতে হইবে।*" এ জাগরণের স্বরূপ কি তা তার অজানা। তার সম্বিৎ ফিরল খোলা দরজা দিয়ে-আসা ঠান্ডা বাদলা বাতাসের স্পর্শে এবং ব্যাঙের ডাকে ও তখন "*পৃথিবীর নিকটসংস্পর্শ সে অনুভব করিতে পারিল।*" *সেই শ্মশানভূমিকেও চিনতে ভুল হল না। আর শুধু তাই নয়* "*মনে পড়িল সেই সময়ে এই শ্মশানে মৃতদেহ দেখিয়া মৃত্যুকে কী ভয়ানক মনে হইত।*"

কাদম্বিনীর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বিকল হয়েছিল শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রিতে, সেই শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রিতেই শ্মশানের ভয়ানক নির্জনতায় হঠাৎ জীবন ফিরে পেয়ে সে নিজের মৃত সত্তাকে আরও গভীর ও সুনিশ্চিত করে অনুভব করতে পারল। সে জীবিত হয়েও নিজেকে যেন এই পৃথিবী থেকে বহুদূরে নিয়ে গেল, বেঁচে উঠলেও তার সীমাহীন নিঃসঙ্গতা তার মধ্যে অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সম্পর্কে বিরাট সংশয়ের জন্ম দিল; মৃতদের স্থান, শ্মশানে বসে সেই সংশয় থেকে সৃষ্টি হল তার দ্বিতীয় সত্তা যা দ্বিধাদীর্ণ এমন ভাবনায় : "*জীবরাজ্য হইতে আমি যে নির্বাসিত হইয়া আসিয়াছি -- আমি যে আমার প্রেতাত্মা।*" এই উপলব্ধি থেকেই সে পৌঁছল এমন ভাবনায় যে, সে এই পৃথিবীর জনসমাজের কেউ নয়, সে অকল্যাণকারিণী, দাহকার্য সমাপ্ত হওয়া এক প্রেতাত্মা মাত্র। তাই দেহভারহীন কাদম্বিনী '*হঠাৎ একটা দমকা বাতাসের মতো ঘর হইতে বাহিব হইয়া অন্ধকার শ্মশানের উপর দিয়া চলিল।*" এ যাত্রা যে ভবিষ্যতেব দিকে তা খুব বেদনাবহ হয়ে দেখা দিয়েছে তার জীবনে। এই মুহূর্ত থেকে তার বাঁচার মধ্যে বা বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে মৃত্যু ভাবনা। এই পৃথিবী যেন একরাত্রির মধ্যেই তার কাছে অচেনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার মনুষ্য সত্তাকে হারিয়ে ফেলে মাথা তুলেছে তার প্রেতসত্তা। তাই সে ভোরের আলো বা পাখির ডাকে প্রেতের মতই অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। এই পৃথিবী, চিরপরিচিত মানুষজন যেন আর তার কেউ নয়। প্রেতের মতই সে আজ শ্মশানে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, সংসারের পরিজনদের কাছে সে আজ মৃত ছাড়া অন্য কিছু নয়। শ্মশানভূমিই কাদম্বিনীকে তার সত্য পরিচয়ে সমৃদ্ধ করেছে। সে সেই নির্জন মৃত্যুর শেষ স্থান শ্মশান, চলমান জীবজগৎ থেকে দূরবর্তী সেই অন্ধকাব জায়গাই তার অভিপ্রেত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সে ভাবে: "*যতক্ষণ মাঠে ছিল, শ্মশানে ছিল, শ্রাবণরজনীর অন্ধকারের মধ্যে ছিল ততক্ষণ সে যেন নির্ভয়ে ছিল, যেন আপন রাজ্যে ছিল।*" এই প্রেতসত্তার মধ্যেই সে তখন থেকে নিজের অনুভব করার চেষ্টা করছে। 'জীবিত ও মৃত' — কাদম্বিনীর এই দুই সত্তার

অনুভবে বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছে শ্মশান ও তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মরমী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গল্প 'অভাগীর স্বর্গ' ১৩২৯ সালের 'বঙ্গবাণী'-র মাঘ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে গল্পটি ''হরিলক্ষ্মী'' (১৯২৬ খ্রি.) গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই গল্পটির শুরুতেও আছে বর্ষীয়ান অবস্থাসম্পন্ন ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রীবিয়োগের ঘটনা এবং জাঁক সহকারে শ্মশানযাত্রার বর্ণনা। গল্পকারের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় : ''*পুষ্পে, পত্রে, গন্ধে, মাল্যে, কলরবে মনে হইল না এ কোন শোকের ব্যাপার — এ যেন বড়বাড়ির গৃহিণী পঞ্চাশ বর্ষ পরে আর একবার নূতন করিয়া তাঁহার স্বামিগৃহে যাত্রা করিতেছেন।*'' এ আড়ম্বর শ্মশানেও লক্ষণীয়। এই গল্পে শ্মশান আসে এমনভাবে : ''*গ্রামের একান্তে গরুড়-নদীর তীরে শ্মশান।*'' গ্রামের এক প্রান্তে অবস্থিত সেই শ্মশানে ''*পূর্বাহ্নেই কাঠের ভার, চন্দনের টুকরা, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছিল।*'' সেই শ্মশানে শবানুগমন করে ছোটজাত, দুলের মেয়ে কাঙালীর মা এসে হাজির হয়। মুখুয্যে গিন্নির পারলৌকিক ক্রিয়ার উপচার আর ধুমধাম দেখে অভাগী চমৎকৃত হল : ''*প্রশস্ত ও পর্যাপ্ত চিতার পরে যখন শব স্থাপিত করা হইল তখন তাঁহার রাঙ্গা পা-দুখানি দেখিয়া তাহার দু'চক্ষু জুড়াইয়া গেল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া একবিন্দু আলতা মুছাইয়া লইয়া মাথায় দেয়।*'' তারপর সেই চিতায় যখন অগ্নিসংযোগ ঘটল তখন অভাগীর ''*চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।*'' তার নিরন্ন অভাবী হৃদয়েও একটি লোভের জন্ম হল, মৃত্যুর পরে সেও যেন ছেলের হাতের একটু আগুন পায়। সংস্কারবশে সে আর কিছুই চায় না তার কাছে সর্বাধিক মূল্যবান মনে হয় মৃত্যুর পরের অগ্নিস্পর্শ। তার একমাত্র কামনা ''*আমিও যেন এমনি কাঙালীর হাতের আগুনটুকু পাই। ছেলের হাতের আগুন! সে ত সোজা কথা নয়!*'' এই স্বপ্নাচ্ছন্নতায় কাল্পনিক দৃষ্টিতে সে দেখল ''ছোট একখানি রথের চেহারা'' —''*গায়ে তাহার কত না ছবি-আঁকা, চূড়ায় তাহার কত না লতাপাতা জড়ানো। ভিতরে কে যেন বসিয়া আছে — মুখ তাহার চেনা যায় না, কিন্তু সিঁথায় তাঁহার সিঁদুরের রেখা, পদতল দুটি আলতায় রাঙানো।*'' এই স্বপ্নাতুরতা বা রোমান্টিকতা সম্পূর্ণ বিপ্রতীপে বেজে উঠেছে এই গল্পে। বামুন মায়ের স্বর্গযাত্রা একমাত্র অভাগীর চোখেই ধরা পড়েছে তার মনের গোপন বাসনারই যেন ছায়াছবি ওই স্বর্গারোহণ দৃশ্যটি।

'জীবিত ও মৃত' গল্পে শ্মশানে হঠাৎই প্রাণ ফিরে পাওয়া কাদম্বিনী লোকসমাজে ফিরে এসে তীব্র আকুলতায় বাঁচতে চেয়েও পরিশেষে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেছিল। এই গল্পেও প্রথমাংশে শ্মশানে অভাগীর মনে স্বর্গপ্রাপ্তির কামনা প্রবেশ করেছিল তাই তাকে তিলতিল করে এগিয়ে দিয়েছে মৃত্যুর দিকে। চালচুলোহীন, আত্মপরিচয়হীন, স্বামীপরিত্যক্তা অভাগী চায় সতী লক্ষ্মী হতে। তাই গল্পের দ্বিতীয়াংশে দেখা যায় মরবার জন্য অভাগীর

উদ্‌যোগ, আয়োজন। শ্মশান থেকে প্রত্যাগত অভাগী আর আগের অভাগী নয়। তার দেহটি মর্ত্যপৃথিবীতে বিরাজ করলেও তার মন কাল্পনিক স্বর্গারোহণের রূপকথাতে। সে রূপকথা একান্তভাবেই তার নিজস্ব সৃষ্টি — সেই শ্মশান ও ইন্দ্রের স্বর্ণরথের কাহিনি। অবশেষে সত্যিই একদিন তার মৃত্যুকামনা সত্যে পরিণত হয়। স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে সে মৃত্যুকেই কামনা করেছিল তাই কাঙালীর ঘটি বন্ধক দিয়ে নিয়ে-আসা কবিরাজের বড়ি কপালে ঠেকিয়ে সে উনুনে ফেলে দেয়। এক্ষত্রে তার যুক্তি "বাগদী-দুলের ঘরে কেউ কখনো ওষুধ খেয়ে বাঁচে না।" তার একমাত্র চাওয়া মৃত্যু পূরণের জন্য ভিন গাঁয়ে স্বামী রসিক দুলেকে আনতে পাঠায়। শুধু তাই নয় তার নাম করে নাপিত বউয়ের কাছ থেকে আলতা আনতেও কাঙালীকে অনুনয় করে। পরদিন রসিক যখন এসে পৌঁছল "তখন অভাগীর আর বড় জ্ঞান নাই। মুখের পরে মরণের ছায়া পড়িয়াছে।" অভাগীর মায়ের মৃত্যুর প্রকৃত কারণটি যেন ব্যক্ত হয় রাখালের মায়ের সংলাপে : "ক্যাঙলার হাতের আগুনের লোভে ও যেন প্রাণটা দিলে।" কিন্তু অভাগীদের স্বপ্নপূরণ হওয়া অত সহজ নয়। তাই মৃত্যু ঘটলে তাকে দাহ করার কাঠ খুঁজে পেতে আনতে গিয়ে কাঙালী বোঝে স্বর্গে যাওয়ার পথ কত জটিল। তাই অভাগীরই হাতে-লাগানো বেলগাছে কুড়ুলের ঘা মারায় রসিকের শারীরিক নিগ্রহ জোটে জমিদারের দারোয়ানের দ্বারা। মায়ের অন্তিম ইচ্ছা পূরণের জন্য প্রতিবিধানের সম্ভাবনায় কাঙালী জমিদারের গোমস্তার কাছেও হাজির হয়। সেখানে তার জোটে লাঞ্ছনা আর উপহাস। তার নমুনা : *"অধর কহিলেন, মাকে পোড়াবি এ গাছের দাম পাঁচটি টাকা আন্ গে। পারবি?"* দুর্বল, নিঃস্ব, হতদরিদ্র রসিক বা কাঙালীর মত মানুষদের নিজের ঘরের জমিতে নিজের হাতে পোঁতা গাছ কাটারও অধিকার নেই, শুধু তাই নয় সে গাছ কাটার জন্য জমিদারের প্রতিনিধি মূল্যও দাবি করতে পারে। বর্ণ, জাতি, অর্থ, হৃদয় — সকল দিক থেকেই এক সীমাহীন বৈষম্যের ছবিটিই এই গল্পে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মানুষ সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশ্রেণীভুক্ত হলেই তার মধ্যে মনুষ্যত্ব থাকে না। তাই মুখুয্যে বাড়ির গিন্নির শ্রাদ্ধের সমারোহের জন্য প্রচুর কাঠের জোগাড় হলেও অভাগীর দাহের প্রয়োজনীয় কাঠ মেলে না। শ্রাদ্ধের ফর্দ বানাতে থাকা ভট্টাচার্য কাঙালীকে বিধান দেয় যার সঙ্গে মিশে থাকে ব্যঙ্গের সুর : *"তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে? যা, মুখে একটু নুড়ো জ্বেলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দে গে।"* শবদাহের দাবি জানিয়ে কাঙালীদের মত মানুষদের 'বামুন-কায়েত'দের সমান হতে চাওয়াটা ভীষণ অপরাধ! স্বজনপড়শী সবাই সহানুভূতিশীল হলেও সংগঠিত তথাকথিত ভদ্র, উচ্চশ্রেণীর বিরুদ্ধ পক্ষের মানুষদের সঙ্গে কাঙালীদের মত মানুষেরা পারবে কেন? গল্পের শেষে আবার জেগে উঠেছে শ্মশান যেখানে অভাগী বা কাঙালীর মায়ের অন্তিম অভিলাষ পূরণের ছবি এঁকেছেন শরৎচন্দ্র : *"নদীর চরে গর্ত খুঁড়িয়া অভাগীকে শোয়ান হইল। রাখালের মা কাঙালীর হাতে একটা খড়ের আঁটি*

জ্বালিয়া দিয়া তাহারই হাত ধরিয়া মায়ের মুখে স্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দিল। তার পরে সকলে মিলিয়া মাটি চাপা দিয়া কাঙালীর মায়ের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিল।" আর *"সেই পোড়া খড়ের আঁটি হইতে যে স্বল্প ধুঁয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, তাহারই প্রতি পলকহীন চক্ষু পাতিয়া কাঙালী ঊর্ধ্বদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।"*

'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের প্রারম্ভে এবং অন্তিমে শ্মশান দৃশ্যের অবতারণা দুই বিপরীত ব্যঞ্জনায় প্রতিভাত হয়েছে। প্রারম্ভিক দৃশ্যের আড়ম্বর আয়োজনকে সরিয়ে পাঠকের হৃদয়ে বিঁধে থাকে মাতৃহারা কাঙালীর জিজ্ঞাসু নিষ্পলক দৃষ্টিটি। অভাগীর বিশ্বাস, আকাঙ্খা ও পরিণামের ক্ষেত্রে এই গল্পে শ্মশানের ভূমিকা যথেষ্ট।

শরৎচন্দ্র পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে বাংলা ছোটগল্পের এক অবিসংবাদী কৃতী শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮ খ্রি. — ১৯৭১ খ্রি.)। গল্পে শ্মশান প্রসঙ্গের ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর দুটি বিখ্যাত গল্পের কথা আমাদের মনে পড়ে যাবে। একটি গল্পের নাম 'শ্মশানের পথে', অন্যটি 'সন্ধ্যামণি' ('শ্মশানঘাট' নামে প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল)। প্রথমটি প্রকাশ পেয়েছিল 'কালি কলম' পত্রিকায় আশ্বিন ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে। দ্বিতীয় গল্পটির প্রকাশ 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার মাঘ ১৩৩৯ সংখ্যায়।

"শ্মশানের পথে' গল্পের শুরুতে একটি গ্রাম্য শ্মশান তার রুক্ষ, উদাসীন রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে : *"প্রথমেই নদী, তারপরে ধূ-ধূ করা বালুচর, সেই চরের উপর শ্মশান, শ্মশানের পর খান তিবিশেক মাঠ পার হইয়াই গ্রাম। বার মাসের মধ্যে আটটা মাস নদীর বুকে জলের ধারা বহে না, একটা অদৃশ্য অগ্নিলীলা বহিয়া যায়; হু হু করে মরীচিকার প্রবাহ, আর সে প্রবাহের অন্তরে বালুকার উত্তাপ, সে নদীরই তৃষ্ণা হাহা করে।"*

এই শ্মশান লোকালয় থেকে বহুদূরে, নির্জন, নিঃসীম শূন্যতায় আক্রান্ত। শ্মশান-সন্নিহিত নদীটির জলধারা শুষ্কপ্রায়, নদীখাতে যেন চিতার অগ্নিদাহের উত্তাপ, মৃত্যুর ভয়াবহ রুক্ষতা, জীবনের তৃষ্ণার্ত আকাঙ্ক্ষা যেন ওই নদীচর ও শ্মশানটিকে ঘিরে আছে। জীবন সম্পর্কে উদাসীন, নিষ্ঠুর এই শ্মশানে মৃত্যুর ভয়াবহতা তার সমস্ত বীভৎসতা নিয়ে যেন জেগে আছে : *"চরের উপরে শ্মশান, সেখানে অগ্নিলীলা অদৃশ্য নয়, রাশি রাশি অঙ্গার, চিতার দীপ্ত তপ্তোল্লাসে বাস্তবে মূর্ত।"* জীবন দগ্ধ হয়ে অঙ্গারে পরিণত হয় শ্মশানে। সেখানে প্রাণের উল্লাস সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, সেখানে *"আছে শুধু উত্তাপ, অগ্নি, অঙ্গার, কঙ্কাল, শব।"* তার সেই মৃতের স্তূপে একমাত্র *"জীবন্তের মধ্যে আকাশের বুকে হইতে তীক্ষ্ণ চীৎকারে শকুনির পাল শবগুলার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে; শৃগালের দল কোলাহল করে: কুকুরের পাল ছুটিয়া আসে, — লোলুপ লোভে মুখগলা হাঁ করিয়া থাকে, জিভগলা ঝুলিয়া পড়ে, আর লালা গড়াইয়া আসে।"* জীবন আর মৃত্যুর দ্বন্দ্বে

মৃত্যু যেন নিজের অধিকার কায়েম করেছে এই গ্রাম্য শ্মশানে। মরণেরও লালা ঝরে এই নদীচরে। নশ্বর এই জীবনের পরিণামী সত্যকে যেন ফুটিয়ে তুলেছে এই শবদাহস্থান। গল্পকার বলেন : *"গ্রামের প্রান্তে শ্মশানটা, যেন জীবনের রাজ্যে মরণের অভিযান।"* সেই শ্মশানের স্পর্শে গ্রামটিও যেন মৃতপ্রায় : *"মরণের ছায়ায় গ্রামখানাও ঠিক তাই। যেন মৃতের রাজ্য বলিয়া ভ্রম হয়।"* অনাহারে, ক্লিষ্ট মানুষগুলো কঙ্কালসার, তাদের ঘরের মাটির দেওয়াল ও চালের খড় খসে যাওয়ায় সেগুলিও মাংস-চর্বিহীন কঙ্কালের কাঠামোর মত। এই সমস্ত গরীব মানুষগুলির আর্তি ভগবানের কানে পৌঁছয় না। এক সর্বগ্রাসী ভাঙনে বিলুপ্ত প্রায় গ্রামটি, তার অধিবাসীরাও যেন করালগ্রাসে গ্রস্ত : *"তবু — দিন দিন ভাঙিয়া পড়িতেছে, শ্মশানখানা যেন আগাইয়া আসিতেছে।"* শকুনির তীক্ষ্ণ চীৎকার শোনা যায় যেন পাওনাদার কাবুলিওয়ালার কণ্ঠস্বর। মৃত্যুও যেন তার পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে আসে কাবুলির মত। তাই গোষ্ঠ মোড়ল-দামিনীর ছেলেটা কঙ্কালসার দুর্বল দেহটি নিয়ে আচমকা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সেই মৃত্যুর স্তব্ধতা লেখকের কলমে উঠে আসে শ্মশানেরই পারিপার্শ্বিক উপকরণে : *"তারপর সব চুপ, কথা যেন সব হারাইয়া গেল, শুধু শোনা যাইতেছিল দুঃখদীর্ণ দীর্ঘশ্বাস, সে যেন শ্মশানের বুকে কঙ্কালের মালার ভিতর দিয়া বাতাসের প্রবাহ চলিতেছে।"* সেই অকালমৃত্যুর শোকে ঘর আর শ্মশানের মধ্যে যেন কোন তফাত থাকে না ঃ *"ছেলেটার শবে ওই শ্বাসে ঘরের বুকেই যেন শ্মশানখানা প্রকট হইয়া উঠিল।"* সন্তানহারা দামিনী মড়ার মতই একপাশে পড়ে থাকে।

এই গল্পে শ্মশান আদ্যোপান্ত জড়িত গ্রামবাসী, চরিত্রগুলির সঙ্গে উপমা ও উপমানে। খাজনা, চাঁদা, সেস, সুদ, নজরানা, তলবানা, প্যায়দার রোজ সব মিলিয়ে সন্তানহারা গোষ্ঠ মোড়লেরও 'বাব' অর্থাৎ রাজস্বের প্রকারভেদের শেষ নেই। তাও উপমিত হয় ওই শ্মশান-সারমেয়দের সঙ্গে : *"সব সেখানে লোলুপ গ্রাসে হাঁ করিয়া বসিয়া আছে। অনন্ত ক্ষুধায় জিভগুলা যেন শ্মশানের বুকের কুকুরগুলার মতই ঝুলিয়া পড়িয়াছে।"* প্রাণের দায়ে পালিয়ে-যাওয়া গোষ্টকে না পেয়ে তার স্ত্রী দামিনীকে ধরবার জন্য জমিদারের খোট্টা চাপরাসী যেমনভাবে তার দিকে এগিয়ে যায় তাও উপমিত হয়েছে এমনভাবে : *"শ্মশানের কুকুরগুলা ঠিক অমনিভাবেই লোল জিহ্বায় কোলাহল করিতে করিতে শবের পানে আগাইয়া যায়।"*

দামিনীর ছেলের মৃত্যুশয্যায়ও শ্মশান প্রসঙ্গ। সুবল ছেলেটির মৃতদেহ তুলতে গিয়ে দেখে : *"কয়টা লাল শাঁখাভাঙা টুকরা, সেগুলা অঙ্গারের মতই ধকধক করিতেছে। তাহার মনে হইল, বিছানাটা ফুটিয়া যেন ওই অঙ্গার টুকরা কয়টার দাহে তাহার সর্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতেছে!"* তারপর সেই মৃত ছেলেটিকে নিয়ে গোষ্ঠ ও সুবলের প্রবল বর্ষণের মাঝখানে শ্মশান অভিমুখে যাত্রা। গল্পে সেই আশ্চর্য বর্ণনা তারাশঙ্করের কলমে এমনভাবে

উঠে আসে : *"গ্রাম হইতে বাহির হইয়া খানবিশেক মাঠ পার হইয়াই দেখিল আর পথ নাই, মাঠ নাই, সব জল; বুঝিল বন্যা আসিয়াছে।"*

সেই প্রবল প্রলয়ঙ্করী বন্যা যোজন যোজন মাঠ পেরিয়ে গ্রামকে গ্রাস করতে উদ্যত : *"পায়ে কাঠকুঠার মত কি সব ঠেকিতেছিল, বিদ্যুৎ চমকে দেখিল, সেগুলো শ্মশানেরই পোড়া কাঠ, অঙ্গার — ওই যে একটা কঙ্গালও —।*

গোষ্ঠ কহিল, 'শ্মশানে কি এসেছি নাকি, মাহান্ত?'

সুবল কহিল, 'না, বানের ঠেলে শ্মশানটা এগিয়ে এসেছে।"

এই গল্পে জীবনকে গ্রাস করতে উদ্যত শ্মশান। অনন্তর বন্যার জলে গোষ্ঠের সন্তান বিসর্জন। শ্মশানই এগিয়ে এসেছে বন্যার টানে গ্রামের কাছে, পথের দূরত্ব গেছে ঘুচে।

'সন্ধ্যামণি' গল্পেও এক সন্তানহারা পিতৃহৃদয়ের মর্মবেদনা ব্যক্ত হয়েছে। দক্ষিণ-বাহিনী গঙ্গার কূলে রাঢ়ের বিখ্যাত বাদশাহী সড়কটা পুবমুখ বরাবর এসে যে হিন্দু আমলের অক্ষয়পুণ্য মহিমান্বিত স্নানঘাটে এসে মিশেছে যেখানে, তারই পাশে শ্মশানঘাট। শেষ কার্তিকের এক শীতকাতর সন্ধ্যায় গল্পের শুরু। তারপর অনুপুঙ্ক্ষ বর্ণনায় লেখক তারাশঙ্কর পুর্ণ্যালোভাতুর তীর্থযাত্রী আর শোকে মুহ্যমান ক্লান্ত শ্মশানযাত্রীদের, শ্মশান সন্নিহিত বাজার, শ্মশানের উদাসীন শূন্যতার, গঙ্গার অবাধ প্রবাহ ও সুগহন অন্ধকারের ছবি গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পের প্রারম্ভে এইসব বর্ণনা গল্পের মধ্যে বিচ্ছেদ, দুঃখ, মনোবেদনা, বৈরাগ্যকে গাঢ় করে তুলেছে। কুমোর বুড়োর দোকানের সামনেই বামুনদের মেয়ে কুসুমের ঘর। অল্পবয়সী কুসুমের ভাগ্য মন্দ, তার স্বামী বাউণ্ডুলে। সে উদাসী, বিবাগী রিক্তহৃদয় কেনারাম চাটুজ্জে। আলো-অন্ধকারের রঙে আঁকা ঘাটের পাশে রাত্রির গঙ্গায় ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাচে নৌকোর গলুইয়ে জ্বলতে থাকা প্রদীপের আলোর কম্পিত প্রতিবিম্ব। সেই রাত্রিব নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয় শববাহকদের চিৎকারে। তারপর নির্লিপ্ত প্রাত্যহিকতায় গল্পে শুনতে পাওয়া যায় এই সংলাপ বিনিময় :

'মুদী কহিল — আর এক নম্বর এল, দাস।

দাস গম্ভীর মুখে কহিল --- খাতাটা কই রে ছকু?

ছকু খাতাখানা বাপের হাতে দিল। খাতা লইয়া দাস শ্মশানের দিকে চলিয়া গেল।'

'দাস' অর্থাৎ গল্পের দ্বিজদাস শ্মশানঘাট জমিদারের কাছ থেকে বার্ষিক এগার শো টাকায় ইজারা নিয়েছে। *"সে নিজে আদায় করে প্রতি শবে শ্মশান জমা দু' টাকা এক আনা।"* মৃত্যুর আধিক্যে মুদি ছকুদের সৌভাগ্যের ইঙ্গিত করায় ছকুর মত শিশুও ক্ষুণ্ণ হয়। মৃত্যু আয়ের পরোক্ষ উৎস হলেও মৃত্যুকে আর কে চায়! নানা মানুষের সংলাপে অবশেযে উন্মোচিত হয় কেনারাম চাটুজ্জের বৈবাগ্যেব প্রকৃত কাবণটি :

"একজন কহিল — চাটুজ্জে ত ভালই ছিল। মেয়েটি মরেই —"

তারপর হরিধ্বনির অনুষঙ্গে গল্পে উঠে আসে সর্বগ্রাসী শ্মশান : *"গঙ্গার তীরভূমির*

ঘন বনসন্নিবেশের পশ্চিম পাড় ঘেঁষিয়া একটি স্বল্প পরিসর পথ। পথটি গঙ্গার সহিত সমান্তরাল রেখায় বরাবর চলিয়া গিয়াছে। স্নানঘাটের উত্তরে কিছু দূরে আর একফালি পায়ে চলার পথ গঙ্গার গর্ভমুখে নামিয়াছে। ইহার দু'ধারে বুকভরা উঁচু আগাছার জঙ্গল। মাথার উপরে বড় বড় গাছের শাখা-প্রশাখা আকাশ ছাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। স্থানটার একটা তীব্র বিকট গন্ধে বুকের ভিতরটা কেমন মোচড় খাইয়া উঠে।

দগ্ধ নরদেহের গন্ধ। এইটিই শ্মশানঘাট।"

তারপর এই গন্ধের অনুভূতি দেখা যায় দৃশ্যমান শ্মশান *"একদিকে রাশীকৃত বাঁশ জড়ো হইয়া আছে; পাশেই তালপাতার চাটাই ও কতগুলা খাটিয়ার বোঝা। এখানে ওখানে দুই-চারটা নরকঙ্কাল পড়িয়া আছে, হাড়ের টুকরায় মাটির বুক আচ্ছন্ন!"*

শুধু এই সংকেত বা ইঙ্গিত নয়, শবদাহের প্রত্যক্ষ ছবি পাঠক দেখতে পায় : *"মানুষের দেহ নিঃশেষে আহার করিয়াও আগুনের যেন তৃপ্তি হয় নাই — এখনও সে হাহা-করিতেছে। একটা নূতন চিতায় আগুন দেওয়া হইয়াছে। অগ্নিশিখা সবে আশেপাশে উঁকি মারিতেছে। সেই শিখা-প্রভায় দেখা যাইতেছিল, রাশি রাশি ধূম পাক খাইয়া খাইয়া উপরে উঠিতেছে, নীচে নামিতেছে।"*

আরও ডিটেইলিং যুক্ত হয় গল্পে : *"চিতার বুকে অনাবৃত একটি শিশুদেহ, বুকে তাহার একখানি কাঠ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শবটির মুখ পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল — দশ-এগারো বছরের কচি মেয়ে। ছোট ছোট চুলগুলি ঝুলিয়া পড়িয়াছে — কতক তাহার পুড়িয়াছে, কতক এখনও পোড়ে নাই।"* সেই অর্ধদগ্ধ শবের পায়ের দিকে একটি বাঁশের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মানুষকে দেখা যায় — যে নিকষকালো বর্ণ, মাথায় দীর্ঘ বাবরি চুল; সে শ্মশান-প্রহরী চণ্ডাল। নাম পৈরু। একসময় ডোম বা চণ্ডালের হাতেই শবদাহ সম্পন্ন হত।

কন্যাবিয়োগে কাতর চাটুজ্জের বেদনা প্রকাশ পেয়েছে তার কথাবার্তায়, আচরণে। শ্মশান-চণ্ডাল পৈরুর সঙ্গে কথাবার্তায়, মাদীকুকুর ভৈরবীর বাচ্চাটিকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যে সেই অপত্য স্নেহের ছবি দেখতে পাওয়া যায় : *"কোল হইতে চাটুজ্জে ন্যাদাকে নামাইয়া দিল, সেটা লেজ নাড়িতে লাগিল। খুঁজিয়া বাছিয়া চাটুজ্জে ভৈরবীর কান মলিয়া দিয়া কহিল — মা হ'য়ে ছেলের খোঁজ নাই, হারামজাদী!"* তারপরই চোখ পড়ে যায় চাটুজ্জের পৈরুর ছোট্ট মেয়েটির দিকে। আবার সে তাকিয়ে থাকে শবের দিকে। তারপর হঠাৎই নিজেই কাপড় সেঁটে অর্ধদগ্ধ শবটাকে নাড়াচাড়া দিতে থাকে। পৈরুর সংকোচকে দূর করে সে বলে ওঠে শবদাহ 'একটা যজ্ঞ রে!' কুসুমের কন্যাবিয়োগে দুঃখের নীরব প্রকাশ যেমন চোখ এড়ায় না পৈরুর তেমনই সে চিতার আগুনের আলোয় চাটুজ্জের চোখের জলকে আবিষ্কার করে। মেয়ের জন্য কুসুমের কান্না লুকিয়ে দেখে এসে চাটুজ্জে পৈরুকে বলে। অশ্রুর প্রবাহেই আবার বিচ্ছিন্ন দুটি হৃদয় কাছাকাছি এসেছে।

মানবজীবনের নিষ্ফলতা ও ব্যর্থতার অন্তরালে এক ক্রূর রহস্যময় শক্তির নিগূঢ় প্রভাব অনুভব করেন জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬ খ্রি. — ১৯৫৬ খ্রি.)। 'পল্লী-শ্মশান' তাঁর একটি বিখ্যাত গল্প। এই গল্পেও আছে একটি মৃত্যুপ্রসঙ্গ : *"জিতেন্দ্র যখন মারা গেলেন বেলা তখন সাতটা।"* মৃত্যুর পরে একসময় স্বাভাবিক কারণেই সৎকারের প্রয়োজন হয়। গ্রাম্য রীতিতে শবদাহে সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকেনি কর্তাদের আমলের মত। সময়গত প্রভেদ যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে হিন্দু ও মুসলমান দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তা উন্মোচিত হত না শবদাহের আয়োজন না ঘটলে। সৎকারের কাঠ জোগাড় করতে সাহায্য প্রার্থনায় এমন ছবি মেলে :

"এর্‌ফান বাড়ীর মাতব্বর; সে প্রশ্ন করলে, — তোমাকে কে পাঠিয়েছে, খোকা?

খোকা বললে, — মা।

এর্‌ফান একটু হেসে বললে, — বাড়ীতে মড়া বলেই তিনি অচেতন হয়ে গেছেন। তাঁকে বলগে যাও, হিঁদুর মড়া আমরা ফেলিনে।

— তোমরা কেন ফেলবে? কাঠ —

বলতে বলতে খোকা চমকে উঠে থেমে গেল। এর্‌ফান গর্জন ক'রে বললে, — ছোঁড়া ত বড় বাচাল হে। দুটোত তফাৎ কি হল? কাফেরের মড়া পোড়াবার কাঠ আমরা যোগাইনে। যাও, বলগে তোমার মাকে।

... ...

এরফানের ভাই তালেবর হেসেই বললে, — মাটি দাও গে, তোমরাই পারবে।'

প্রচলিত রীতি বা শাস্ত্রীয় বিধানকে বদলে দেওয়ার পরামর্শ এত সহজে দিলেও কাজটা অত সহজ নয়। তাই ছোট্ট খোকার মনেও শেষ কথাটার সামান্য প্রতিক্রিয়া ঘটে। 'অভাগীর স্বর্গ'-এর মত অর্থাভাব নয়, লোকবলের অভাবেই শবদাহ আয়োজনে বাধা পড়ছিল। কিন্তু একদিন ভীষণ আপনজন এই মানুষগুলোর ওই বক্তব্যে মানুষের মন কতখানি আহত হতে পারে তারও পরিচয় গল্পে আছে :

"নিস্তারিণী কথাটা শুনে বিস্ময়ে ব্যথায় একেবারে হতবাক্ বিবর্ণ হ'য়ে গেলেন। মধ্যাহ্নের সূর্য যেমন বালির উপর জ্বলতে থাকে, মৃতের প্রতি এই হৃদয়হীন নিষ্ঠুর অপমানের জ্বালা তেমনি তেজে তাঁর শোকের উপর জ্বলতে লাগল। তাঁর মনে পড়ল, বাবা যখন মারা যান তখন এই এর্‌ফানেরই পিতামহ তিন দিন তিন রাত্রি শয্যাত্যাগ করেনি; ভাইফোঁটার দিন এর্‌ফানরা নেমন্তন্ন খেত; নিবিড় প্রণয়ের খাতিরেই এর্‌ফানের বসতবাড়ীর সাত কাঠা ভুঁই নিষ্কর!" পাশাপাশি এই সম্প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান গোপন বিষে আক্রান্ত হল কেন তারও কারণটি দেখিয়েছেন গল্পকার। তাই শবদাহে সাহায্যের জন্য বিনোদপুরের সেনেদের খবর দেওয়াটাও এর্‌ফানদের কাছে বেগার বলে মনে হয়। হঠাৎ এই মন পরিবর্তন, জমির নিষ্কর সত্ত্বভোগী এর্‌ফানদের এই অসহযোগিতার

মনোভাবের শিকড়টা কোথায় পোঁতা রয়েছে তাও জনতে পারা যায় : "*মৌলভী বলে গেছে, কাফেরের উপকার করাও মুসলমানের মহাপাপ, ধর্মের নিষেধ আছে।*" এই সংস্কারবোধের জন্ম বা ধর্মের ফতোয়া মানুষকে কতখানি হৃদয়হীন করে তুলতে পারে তা গল্পে ঘটতে থাকে একে একে! খোকা তিনবার এর্‌ফানদের বাড়ি ঘুরে এসে জানায় যে, তারা খেয়েই আসছে। সেকালের শবদাহের প্রাসঙ্গিক উপকরণও গল্পে পাওয়া যায় : "*তারা আসছে শুনে নিস্তারিণী ক্ষিপ্রহস্তে সব গুছিয়ে ফেললেন — ঘি, সোনার টুকরো, রূপোর টুকরোর বদলে একটা দু'আনি, তিল, তাঁবা, কড়ি, পাকাঠি ইত্যাদি।*"

কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়েও এর্‌ফানরা আসে না। তাই দু'ক্রোশ দূরে বিনোদপুরের সেনেদের বাড়িতেও খবর দিতে ছুটতে হয় খোকাকে। সময় পেরিয়ে যায়, জিতেনের মৃতদেহ পড়েই থাকে। রোদে তেতে পুড়ে খোকা শববাহকদের জোগাড় করে ফিরলেও তখনও কাঠের জোগাড় হয় না। সে সমস্যারও সমাধান হয়। কিন্তু তৈরি হয় আর এক সমস্যা : "*কাঠ শ্মশানে নেবার উপায় কি?*" এই সমস্যা উদ্ভবের কারণটিও গল্পটিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে : "*আগে এমন দিনে কাঠ নৌকয় যেত। এর্‌ফানরা অথবা তাদের অনুগত যারা তারাই গাছ কেটে কাঠ ক'রে নৌকয় বোঝাই দিয়ে শ্মশানে পৌঁছে দিত। কিন্তু এখন তারা নারাজ, ধর্মভীরু হয়েছে।*" এই ধর্মভীরুতার মুল কারণটি মৌলভীর ফতোয়া যা তাদের কাছে "যেমন অভ্রান্ত তেমনি পালনীয়"।

মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যেতে একাধিক লোক প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে "*গণনীয় লোকের মধ্যে খোকাকে নিয়ে চারটি। দু'জনে শব বহন করলেও তৃতীয় একজন কাঁধ দেবার উপযুক্ত লোক হাতের কাছেই থাকা দরকার, বিশেষতঃ শ্মশান যখন হাঁটাপথে দেড় মাইল দূরে।*" সেই সমাধানের দুরূহ বাধাটিও দূরীভূত হয় "*মেঘ না চাইতেই জল*' এর মত একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে রামগতির শ্যালক জনার্দনের আগমনে যে ভগ্নিপতির বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। সে আনন্দে সমস্ত কাঠ শ্মশানে পৌঁছে দেবার ভার গ্রহণ করল।

অনন্তর গল্পে যা ঘটতে থাকে তা জগদীশ গুপ্তের নিরাসক্ত, উচ্ছ্বাসবর্জিত, তীক্ষ্ণ, নৈর্ব্যক্তিক লেখনীর দ্বারাই লেখা সম্ভব :

'*শব আর কাঠ যখন শ্মশানে এল তখন রোদ পড়ে এসেছে, বেলা তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা। চিতা সাজাতে সাজাতে অন্ধকার হয়ে এল।*

চিতা জ্বলা হ'ল, কিন্তু মুস্কিল অত্যন্ত দুর্বার হ'য়ে উঠতে লাগল ঐ দেহটাকে নিয়েই। ... শোথের রুগী, সর্বাঙ্গ ছিল তার জলপূর্ণ, আগুনের আঁচ লেগে জল প্রথমে ফোঁটায় ফোঁটায় চুইয়ে শেষে সোঁ সোঁ শব্দে গড়াতে শুরু করল। চিতা নিবে গেল; বার বার অল্প সময়ের জন্য জ্বলে বার বার ধোঁয়া হ'য়ে নিবে গিয়ে কাঠ যখন নিঃশেষ হ'য়ে ফুরিয়ে গেল তখন মৃতদেহ একেবারে অক্ষত, শুদ্ধমাত্র গায়ের চামড়া তার কালো হয়ে গেছে।"

শবদাহের অভিজ্ঞতা যাদের আছে তারা এই সমস্যাকে উপলব্ধি করতে পারবেন। দাহকার্যের জন্য নির্দিষ্ট কাঠ ফুরিয়ে গেলে তা আর তখন জোগাড় হবে কোত্থেকে? বয়ে আনবেই বা কে? তাই 'সংস্কার বড় কঠিন বস্তু' একথা জেনেও অনন্যোপায় শ্মশানযাত্রীরা জিতেনের অন্তিম সৎকারের যে উপায় ঠাওরায় তা যেমন মর্মান্তিক তেমনই নিষ্ঠুর পরিণামের রসে ভরা :

''*বিশ্রামের জন্য পেতে বসতে যে বস্তাটা আনা হয়েছিল তারই অর্ধেকটা জনার্দন বালি তুলে বোঝাই করে ফেললে। মৃতদেহ চিতার উপর থেকে নামিয়ে তার কোমরের সঙ্গে সেই বস্তাটা বেঁধে সবাই মিলে তাকে নদীর জলে ছেড়ে দিলে। বালির ভারে মৃতদেহ ডুবে গেল। তারপর উচ্চৈঃস্বরে একবার হরিধ্বনি করে শ্মশানবন্ধুরা যে যার ঘরে গেল।...*'' অগ্নিসংস্কার ঘটেও এমন সলিল-সমাধি প্রাপ্তির ঘটনা নিতান্ত বিরল একালে কিন্তু এমন ঘটনা যে ঘটত না এমন নয়। কিন্তু শবদাহের এই অন্তিম পরিণতির ঘটনাতেই গল্প শেষ হয়নি কারণ জগদীশ গুপ্ত জীবন সম্পর্কিত সমস্ত নীতিবোধ ও কল্যাণবোধক মূল্যমানকে শুধুমাত্র অস্বীকার করেই তৃপ্ত হন না, বিশ্ব প্রবাহের অন্তরালে এক অমোঘ শক্তির অস্তিত্ব তিনি অনুভব করেন যা একান্তরূপে বিনাশক, ক্রূর এবং কদর্য। এই গল্পেও তার চিহ্ন রয়ে গেছে :

''*মকরবাহিনীর শবসাধনার প্রয়োজন ছিল না; তিনি সে মৃতদেহ ঠেলে জলের উপরে তুলে দিলেন। বস্তার মুখ বাঁধা হয়েছিল অত্যন্ত অসাবধানে, বস্তার স্থানে স্থানে ছেঁড়াও ছিল; কাজেই শূন্যবস্তাসহ মৃতদেহ ভেসে উঠতে দেরী হল না।*'' নিয়তির অদৃশ্য পরিণামে ''*জিতেনের মৃতদেহ ভেসে উঠে ভাসতে ভাসতে এসে নদীর দুই তীরে এত স্থান থাকতে তাঁদেরই ঘাটে লেগেছিল!*'' আর ''*শোয়াল কুকুবে তা ডাঙ্গায় টেনে তুলেছে, শকুন নেমে এসেছে, কাক জুটেছে; শকুন, শেয়াল, কুকুর, কাক ঝাপটাঝাপটি কাড়াকাড়ি ক'রে সেই দেহ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।*''

এই বীভৎস পরিণাম নিস্পৃহ, নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বর্ণনা করেন গল্পকার জগদীশ গুপ্ত। বসন্তের বয়ানে গল্পকার বলেন : ''*হিঁদুর সব সহ্য হয়, দেহকে সর্বপ্রকারে পীড়িত করে নিজেকে সে অশেষ দুঃখ অক্লেশে দিতে পারে, ... কিন্তু নিজের প্রাণহীন দেহের এ দুর্গতির কল্পনাও সে করতে নারাজ।*'' এই বীভৎস পরিণতির ফল হিসেবে ''*এক মাসের মধ্যে গ্রাম হিন্দুশূন্য হ'য়ে গেল।*'' আর জিতেনের দেহের সেই অন্তিম পরিণতির স্মারকচিহ্ন হয়ে যেন ঝলসে ওঠে গল্পকার জগদীশ গুপ্তের স্বভাবোচিত কড়া চাবুকের মত শাণিত ব্যঙ্গের পংক্তিবিন্যাস : ''*শুনেছি, সেই দেহ যেখানে শেয়াল শকুনে খেয়েছিল, ঠিক তার সোজা ওপারে এখন ওপারের গাঁয়ের শ্মশান।*''

বাংলা কথাসাহিত্যের এক স্মরণীয় রূপকার সদ্যপ্রয়াত বিমল কর (১৯২১ খ্রি. — ২০০৩ খ্রি)। তাঁর দুটি গল্প আমাদের মনে পড়ে যাবে যেখানে শবদাহ তথা শ্মশানভূমি

বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। গল্প দুটি হল 'আঙুরলতা' ও 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভূবন'। 'আঙুরলতা' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায়। গল্পটির অসাধারণ বাস্তবতা বিশেষ সম্পদ। সে বাস্তবতা নিষ্ঠুর। এই বাস্তবতা মানুষের জীবন ও মৃত্যুবোধের, আত্মা ও দেহের এক জটিল সংকট-ভাবনার।

বেশ্যাপাড়ার রূপজীবিনীদের জীবনকথা, মানবিক চেতনায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক গল্প 'আঙুরলতা'। ক্ষুধা মানুষকে নগ্ন ও নিষ্ঠুর করে, করে তোলে করুণ ও অসহায়। দুর্ভিক্ষের দূষিত হাওয়ায় ভর করে দেহব্যবসা, অত্যাচার, যৌন বিকার ও অন্যান্য ব্যভিচার আসে। আর পাশাপাশি এই দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কোনো কোনো মানুষের সহমর্মিতা, বিবেক ও সহানুভূতি জেগে ওঠে। মানুষের বাসযোগ্য ভূমি শুধুই যে শ্বাপদশঙ্কুল নয় তারই প্রমাণ দিতে যেন এই মানুষগুলির আবির্ভাব ঘটে। এই মানবিকতা 'আঙুরলতা' গল্পেও আছে।

গল্পের শুরুতেই গল্পকার বিমল কর এক অদ্ভুত নিরাসক্তিতে বর্ণনা করেন একটি মানুষের মৃত্যুর মুহূর্ত। মানুষটি আর কেউ নয় নন্দ চক্রবর্তী যে ছিল আঙুরের এক পরিচিত খদ্দের এবং জীবনেও প্রথম মানুষ। সে আঙুরকে সেসময়ে স্বামী-স্ত্রীর খেলা খেলে একসঙ্গে এক বছরের ওপর কাটিয়েছে কেননা *"আঙুর তখন বড্ড মিষ্টি, রস্ টুসটুসে।"* তারপর একদিন রস-ছিবড়ানো আঙুরকে ফেলে পালিয়েছিল নন্দ। আবার হঠাৎই একদিন 'লিভার পচে-যাওয়া' নন্দ এসে হাতে-পায়ে ধরে আঙুরের ঘরে মাথা গোঁজার ঠাঁই নিল। সেই অসুস্থ নন্দের প্রাণবায়ু হঠাৎই সতর্ক আঙুরের দৃষ্টি এড়িয়ে চুপিচুপি পালিয়ে গেল। আঙুরের ঘরেই এমন মৃত্যুর ঘটনায় সে মুখোমুখি হয়ে পড়ে এক চরম অসহায় অবস্থার। শরীরে অসুখ থাকায় সে শিকার করতে পারে না, ডাক্তারের বারণ। রোজগারও প্রায় নেই। তার ওপর নন্দ মরে তাকে আরো অসুবিধায় ফেলে দেয়। কেননা আর্থিক স্বচ্ছলতা এমন নয় আঙুরের যাতে সে নন্দের মৃতদেহের সৎকার করতে পারে। কোনরকমে নিজের বাক্সবিছানা হাতড়ে 'একটাকা সাড়ে এগারো আনা' জোগাড় করে সে। তার ভাবনাটিকে লেখক এমনভাবে ব্যক্ত করেন : *"এক টাকা সাড়ে এগার আনায় কি একটা লোককে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া, পোড়ান-টোড়ান সম্ভব। আঙুর যদিও এমন ফ্যাসাদে পড়েনি তবু জানা কথাই গোটা দুয়েক টাকায় শ্মশান খরচ চলে না।"* বেদানা মাসি নন্দর মৃত্যু ঘটনায় রাগে ফেটে পড়ে, আঙুরের কাছে নন্দর মৃতদেহ মেথর মুদ্দফরাস দিয়ে বাইরে টেনে ফেলে আসার যুক্তি দেয় : *" যা যা মেথর মুদ্দোফরাসকে খবর দিগে যা -- হাতে আধুলিটা টাকাটা গুঁজে দিল — না হয় একদিন নিয়ে শুস বিছানায় — ওরাই ধড়টাকে পা ধরে টেনে নিয়ে ভাগাড়ে ফেলে দেবে।"* রূপোপজীবিনী হলেও আঙুর কিন্তু তা ভাবতে পারে না : *"মেথর মুদ্দোফরাস! জিনিসটা কল্পনা করতে গিয়ে মনে পড়ল, মরা কুকুরকে কিভাবে পায়ে*

দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যায় ওরা। ... ... আর সঙ্গে সঙ্গে মন পড়লে নন্দর উপাধিটা। চক্রবর্তী। বামুন।"

সব মিলিয়ে আঙুর যা জোগাড় করে তাতে পতিতাপল্লীর মস্তান বিশু জানায়: "*ছ'টাকা। ছ'টাকায় কি হবেরে, একটা ঠ্যাংও তো পুড়বে না নন্দর। ... ... দেড় টাকা মণ আম কাঠ। তা মণ সাতেক লাগবে। দশ টাকা তো তোর কাঠেই লাগবে। তারপর হাঁড়ি কড়ি ধুনো — ধর আরও এক টাকা। নতুন বস্তর পরাতে চাষ তো*"। কিন্তু নিঃস্বার্থ সমাজসেবা বিশুরা করতে অপারগ। তাই আঙুরের কাছে তার দাবি : "আর আমরা চারজন খাবো চারটে পাঁইট দিবি। তা দু'নম্বরই দিস — দু টাকা ছ'আনা করে ধরে নে — গোটা দশেক টাকা আর কি!"

নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আঙুর বুঝতে পারল "*দায়টা আর কারুর নয় — তারই।*" অগত্যা শেষে দোকানদার কামুক প্রভুলাল, আঙুরের চিরকালের ঘৃণার মানুষ যার একটা চোখ "*ঠেলে* বাইরে বেরিয়ে এসেছে, ঝুলে পড়েছে, মাছের পিত্তির মতন গলগলা, সবুজ' তার কাছেও নানা ছলাকলার পর টাকা ধার চেয়ে ব্যর্থ হয়ে শেষে তাকেই দেহ দান করে টাকা জোগাড় করে আঙুর। নন্দর মৃতদেহ সেই বিছানারই চৌকির নিচে সাময়িকভাবে লুকিয়ে রাখে আঙুর। দেহভোগের মুহূর্তেও আঙুর যেন নদীতে ভাসমান নিঃসাড় এক মৃতদেহ : "*আঙুরের শরীরটা যেন নদীর জলে ভাসছে — সাড় হারিয়ে। কী হচ্ছে ও জানে না, বুঝতেই পারছে না।*" সে শুধু ভাবছে নন্দর সৎকারের কথা : "*রাত কত হল! বিশু কি থাকবে হাঁদুর দোকানে? যদি বৃষ্টি আসে ঝমঝমিয়ে আবার। তবে কি হবে? সারারাত কি ফেলে রাখতে হবে! দোষ ধরল না তো! শনির দুপুরের মড়া।*" পতিতার মনেও মানবিক অনুভূতিগুলি বেঁচে থাকে অথচ অন্যান্য মানুষগুলি নিষ্ঠুরতায় ডুবে আছে।

অতঃপর শ্মশানযাত্রার আয়োজন। সে শবযাত্রার বাহক, রীতিনীতি সবই সভ্যসমাজের সঙ্গে চট করে খাপ না খেলেও একান্ত বাস্তবিক :

"*বিশু বললে, 'বাঁশ এনেছিস তো, লে শালাকে টেনে বের করে বাঁধ!'*

... ...

শ্মশানে এসে পৌছাতে প্রায় মাঝ রাত হয়ে গেল। কেলো গেল কাঠ আনতে, পেঁচো পাইট আনতে। বিশু বিড়ি ফুঁকতে লাগল। আর বীরে একটা সিনেমার গান গাইতে লাগল, সদ্য কেনা হাঁড়িটার পেছনে বোল তুলে।"

শবদাহের আচারও সংস্কার পালিত হল শাস্ত্রের নিয়ম মেনে :

"গঙ্গার জলে ধোঁয়ান হল নন্দর দেহ। চিতে সাজিয়ে শোয়ান হল। এবার মুখে আগুন দেওয়া।" অগ্নিসংস্কারে অরাজী আঙুরলতাও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পেরিয়ে রাজী হল : "*পাঁকাটিটা জ্বালছিল। সে দিকে তাকিয়ে আঙুর কেমন যেন দিশেহারা হয়ে গেল। তারপর হাত বাড়াল বিশুর দিকে।*

জ্বলন্ত পাঁকাটি নিয়ে নন্দর মুখের কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল আঙুর। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে পাঁকাটিগুলো। সেই আলোয় নন্দর শুকনো তোবড়ান, বাসী ডিমের মতো সিদ্ধ মুখটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে।"

তারপর অগ্নিদাহের পূর্ব মুহূর্তে হঠাৎই তার মধ্যে জেগে ওঠে সংস্কার : "*নিজেকে বড় অশুচি অশুচি লাগছিল। এই শাড়ি পরে একটু আগে প্রভুলালের সাথে সে শুয়েছে। এখানো সে ভাগাড় কুকুরটার — ? — না, এই বস্ত্রে কারুর মুখে আগুন দেওয়া যায় না।*" তাই হঠাৎই গঙ্গাস্নানে শুচি হওয়ার কথা ভাবে আঙুর। কিন্তু গঙ্গার জলে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে গন্ধের তীব্রতায় "*আঙুরের চোখের সামনে সত্যিকারের গঙ্গা যেন এইবার আলো হয়ে উঠল। কোথায় সে পাপ ধুতে এসেছে, অশুচি ছাড়াতে — ?*' তারপরই সে পৌঁছে যায় তার দ্বন্দ্বের সমাধানে : "... *অশুচি, কিসের অশুচি? গঙ্গাজল তার কোন্‌টা ধোবে — বস্ত্র না দেহ না মন?*" তারপরই তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার মত : "... *গঙ্গার জলে একটা লাথি মারল আচমকা আঙুর। আর তারপর ছুট। ছুটতে ছুটতে এসে জ্বলন্ত পাঁকাটি ক'টা নিয়ে নন্দর মুখে ঠেসে দিল।*" চিতার আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠলে ঘৃণা আর মমতার দ্বন্দ্বে আঙুর ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল নন্দকে ঘিরে :

" ... *এখানে আগুন, ওখানে আগুন। তা সাজিয়েছে বটে বিশুরা চিতা! শুকনো কাঠ বেছে বেছে এনেছিল। ... নন্দর মুখটা আর দেখা যাচ্ছে না। বীরে খুঁচিয়ে দিচ্ছে এ-পাশ ও-পাশ। লাঠি মারছে।*" কাঠের আগুনে জ্বলতে থাকা নন্দর শবদাহের বর্ণনা লেখকের কলমে আশ্চর্য জীবন্ত হয়ে ওঠে : "*বীরে খোঁচাচ্ছে। বাঁশ দিয়ে পা ভেঙে দিচ্ছে শবের। পেটাচ্ছে। কাঠ পুড়ে পুড়ে ভাঙছে — মট্‌ মট্‌। হাড় ফাটছে নন্দর। ফেটে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে না!*" কিন্তু প্রবঞ্চক নন্দর প্রতি এক ধরনের পৈশাচিক উল্লাস জগতেও গিয়েও আচম্বিতে ঢাকা পড়ে যায় মানবিক মূল্যবোধে! ওই চিন্তার আগুনের আলোতেই আঙুর এক অস্পষ্ট শ্রেণীসাম্য আবিষ্কার করল চকিতেই : "*আঙুর পারছিল না। ওই চিতা দেখছিল নন্দর। আর মনে মনে ভাবছিল সব — সব তোমরা সমান। সবাই। তুমি, হিমু বেদানামাসি, হাসপাতাল, ডাক্তার, আতা, বিশু, মাণিকবাবু, প্রভুলাল-সবাই। তেমনি তোমাদেরই গঙ্গা। সবই তো এ-সংসারেরই কাদা, মাটি, জল। এক ছাঁচ, একই নক্‌শা।*"

নন্দর চিতার আগুন শুধু তার দেহকেই পোড়াচ্ছিল না, সে আগুনের তীব্র দাহ যেন পোড়াচ্ছিল আঙুরকেও। গভীর ঘন অন্ধকার জীবনে অভ্যস্ত আঙুরের অভিজ্ঞতা শ্মশানের চিতার আলোয় সে আর এক নতুন জীবনের আলোর সন্ধান পায়, যে জীবন-উপলব্ধি তাকে নিরাসক্ত ভাবে বাঁচাকে আঁকড়ে ধরতে শেখায় : "*নন্দর চিতার আগুন যেন তার সমস্ত চোখ মন শরীর জুড়ে জ্বলছে। বড় দুঃসহ সে-আগুন। বড় স্পষ্ট।*

সবকিছু তার আলোয় ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। এই সংসার, এখানের ভালবাসা ঘর-গড়া, ঘর-ভাঙা, মানুষ মানুষের ব্যবহার, মন।'' নন্দর শবদাহ নিছক এক জাগতিক নিয়ম হয়ে থাকে না, এই গল্পে মৃত্যু হয়ে ওঠে একটি মানুষের হঠাৎ পাওয়া জীবনদর্শনের অনুষঙ্গ। প্রথমাবধি যে নন্দকে আঙুরের মনে হয়েছিল পাষণ্ড হঠাৎ সেই মানুষটার চিতার আগুনের আলোতেই সে আবিষ্কার করল এক নতুন অভিজ্ঞতা। অবশ্যই তা জীবন, জগৎ, পরিপার্শ্ব, সংসার-মন সব কিছুর মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার একটা স্থায়ী সিদ্ধান্তের ভাবনা : *''না, আঙুর মরবে না। চোখ তুলে বিশুর দিকে চাইছে ও। তারপর আকাশের দিকে। এ-পাশ, ও-পাশ। চিতা ও গঙ্গার দিকেও। যেন এই সংসারের আকাশ, মাটি, মানুষ, জন :— সব তার চেনা হয় গেল। আর সে মরবে না, কাঁদবে না।''* এখানে বিহ্বল মরণের ঘেরাটোপে থেকে জীবনের প্রাচুর্যে পুনরায় ভরপুর হয়ে তীব্র জীবনাকাঙ্খার প্রতিষ্ঠা।

'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন' গল্পটি প্রকাশ পেয়েছিল 'আনন্দবাজার' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায়। প্রকাশকাল ১৯৬৬ খ্রি.। 'আঙুরলতা' গল্পের মত এই গল্পেও মৃত্যু starting point । গল্প শুরু হয়েছে নদীর চরার শ্মশানে জ্বলতে থাকা শিবানীর চিতার আগুনকে কেন্দ্র করে। মৃত্যু এখানে ব্যক্তিমনস্তত্ত্বের সুখ স্পর্শে শিবানীর বিগত যৌবন তিন প্রেমাস্পদ কমলেন্দু, অনাদি আর শিশির বা এই গল্পের 'আমি' ফেলে আসা অতীতে শিবানীর সঙ্গে তাদের গোপন সম্পর্কের স্বীকারোক্তি জানিয়েছে পারস্পরিক কথোপকথনে। তাদের 'সামথিং সিক্রেট' আর গোপন থাকেনি সততাবোধের তাড়নায়।

গল্পের প্রথম পংক্তিটিতেই শবদাহের প্রসঙ্গ : ''নদীর চরায় শিবানীর চিতা জ্বলছিল।'' মৃত্যুকালীন এক বিষণ্ণ পরিবেশ এই গল্পে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। পটভুমি শ্মশানের নির্জন, শান্ত পরিবেশ। শিবানীর অন্তিম সৎকার, উদাস প্রকৃতি এই গল্পের আবহাওয়াকে ভারী করে তুলেছে :

ক. চিতার কাছাকাছি, নদীর ভাঙা পাড়ের আড়ালে চার-পাঁচটি ছেলেছোকরা আর নিত্যানন্দ। তারা মাথায় গামছা বেঁধে, ভিজে তোয়ালে মুখে ঘাড়ে বুকে বুলিয়ে শবদাহের তদারকি করছিল। পুরুতমশাই আর ছোটকিলান অনেকটা তফাতে, মাটির কয়েকটি সরা ও কলসি সামনে নিয়ে গাছের ছায়াতেও ছাতা খুলে বসে আছে।

খ. নিত্যানন্দ চিতার কাছে গিয়ে খোঁচাখুঁচি করতে কাঠ ফেটে শব্দ হলো। সে চেঁচিয়ে কি যেন বলল, তার সহচর দুটি ছেলে তার কাছে গেল। ভুবন মুখ তুলে চিতার দিকে তাকিয়ে আছে।

গ. দাহ শেষ। চিতা ধুয়ে দেওয়া হচ্ছে। ছেলেগুলোর জল ঢালা ফুরোলো। এবার আমরা। ... ... কলসিটা ভেঙে দিয়ে ভুবন ফিরল। আমরা কেউ আর পিছু ফিরে তাকাব না।

বিমল করের অন্যান্য আরও অনেক গল্পের মতই এই গল্পেও মৃত্যু বিষণ্ণ, গাঢ়,

ভারী হয়ে উঠেছে প্রকৃতির উদাসীনতায়, রুক্ষতায়। প্রকৃতির সঙ্গে মিশে আছে যেন অলক্ষে কোথাও মৃত্যুর যোগাযোগ। অসম্ভব নৈপুণ্যে মৃত্যুব পর দাহ, বিষণ্ণতা সবকিছু যেন চেতনায় প্রতিফলিত জগৎ বা পরাবাস্তব জগতেব ছবি তুলে ধরে। জীবনের উজ্জ্বলতাকে যেমন তিনি তুলে ধরেন তেমনই তুলে ধরেন মৃত্যুর স্তব্ধতাকে আর প্রকৃতি হয়ে ওঠে তার চালচিত্র :

"ফাল্গুনের শেষ, উলটো টান ধরে গিয়েছিল দুপুরে। রোদ পাখা গুটিয়ে নিতে শুরু করেছে, নদীর বাঁকের মাথায় আকাশে সূর্য হেলে পড়ছিল।"

এই গল্পের মৃত্যু করুণ; শিবানীর মৃত্যু ঘটেছে আচমকা অসুখে। সেই মৃত্যু উত্তর-চল্লিশ তার তিন প্রেমিককে বেদনার্ত করেছে, জীবনের কোনো না কোনো সময় শিবানীকে কোনো না কোনোভাবে প্রতারণা করার আর্তিতে যন্ত্রণায় আতুর হয়েছে। এই অনুশোচনার তীব্র দাহ মানবিক, সৎ অনুভূতি আর তা জাগিয়েছে শিবানীর চিতার আগুন, শ্মশানের বিষণ্ণ পরিবেশ।

জীবনের গভীর নির্মম কঠিন অভিজ্ঞতার আর এক রূপকাব সমরেশ বসু। সমাজের নিম্নস্তরের লোক, অন্তেবাসী, অবজ্ঞাত গরীব মানুষ তাদের অস্তিত্বকে জানান দিয়েছে তাঁব গল্পে। বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং তীব্র সহানুভূতি তাঁর গল্পগুলিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। শ্মশান বিশিষ্ট তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়েছে তাঁর গল্পেও। আমাদের এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাবে 'শেষ মেলায়', 'মানুষ রতন', 'পাপ পুণ্য', 'অকাল বৃষ্টি'র মত গল্পগুলি।

কিছু কিছু গল্পে সমরেশ সামাজিক মানুষের সীমানা পেরিয়ে অসামাজিক নিম্নবর্গীয় জীবনকে ছেঁকে তোলেন তাঁর গল্পে। এই সমস্ত গল্পে তিনি পুরনো মূল্যবোধ ভাঙেন, পাপপুণ্যের কঠিন তীব্র উপলব্ধির নির্মমতায় আমাদের মুগ্ধ করেন। জীবনকে জানার জন্য জীবনের গভীরে যাওয়ার সাহস তাঁর ছিল। 'মানুষ রতন'-এর মত গল্প তার স্বাক্ষর। রিকশাওয়ালাদের নিয়ে এই গল্প গড়ে তুলেছেন সমরেশ। মানুষের মৃত্যুকে ঘিরে গড়ে ওঠা এই গল্পে সমরেশ যা দেখিয়েছেন তা বাস্তবের বাইরে নয়। মরণোন্মুখ অচেনা-অজানা একটি মানুষের গোপন মৃত্যুর পর মৃতদেহ আবিষ্কার করে সৎকারের আয়োজনে অর্থসংগ্রহের পদ্ধতি পাঠককে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দেয়। রেললাইনের ধারে একটি বেওয়ারিশ লাশকে রিক্সায় করে তুলে এনেছে চারজন — ত্যাবড়া, মনা, পুনিয়া আর সোতে কাউকে না জানিয়ে কিন্তু প্রতিপক্ষ গণশা ও তার সাগরেদ ফটকে টের পেয়ে যায়। সংঘর্ষও বাঁধে। সাধ-আহ্লাদ ও মানবিক দায়িত্ব দুই-ই মেটানোর উদ্দেশ্যে ত্যাবড়ারা আগাম পয়সা জমা করে। এ এক অভিনব শ্মশানযাত্রার আয়োজন :

"ত্যাবড়া ... ... মিটারের হিসাবে, দু'মিটার সাদা কাপড় চাইল।

দোকানদার জিজ্ঞেস করল, 'কোরা না ধোলাই?'

'কোরা। সব থেকে সস্তাটা দিন বাবু।' কাপড়ের প্যাকটা নিয়ে, মুদি দোকানে গেল। সব থেকে সস্তা ধূপকাটি কিনল এক বাক্‌সো। তারপরে গেল ফুলের দোকান। ... ... এমনি বাজে ফুলের দাম শুনে, ত্যাবড়ার মনে হল, ফুল না, সব আগুনের ফুলকি। দাম শুনলে ছ্যাঁকা লাগে।"

রক্তের সম্পর্ক নেই অথচ অজানা মৃত একটি মানুষের অন্তিম সৎকারে তাদের উদ্যোগ সভ্য সমাজের কাছে ঘৃণ্য বলে মনে হতে পারে কিন্তু এও এক মহান কর্তব্যবোধ তা কে অস্বীকাব করবে? কিন্তু শুধুই মহান কর্তব্যসম্পাদানের তাগিদেই তাদের কাছে একমাত্র কারণ নয়। দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার এক সফল রূপায়নও যেন। গল্পে সূত্রগুলি এমনভাবেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে :

"ত্যাবড়া বলল, 'লোকটা মনে হয় ঘুমিয়ে মরে গেছে। এর আগেরটা যেরকম ছিল সে রকম না, চোখের পাতা ঘোলা, মুখটা রাক্ষসের মত হাঁ করা, যেন গিলতে আসছিল।' .. ... ত্যাবড়া ঝোপের নিচে, কাঁটামনসার গোড়ার কাছে পরিষ্কার জায়গাটার দিকে তাকাল। বলল, 'লোকটা ওখানে থাকত। আমি পয়লা একদিন মারক করেছিলাম, পুলের ওপর থেকে। তখনই ঠিক করে রেখেছিলাম।' এ শ্যেনচক্ষুর তারিফ না করে পারা যায় না। তারপর সেই মৃতদেহ বহন করে জনারণ্যে, রেলস্টেশনে নিয়ে আসা শুধুই দাহ নয়, চাঁদা তুলে এও যেন এক ফিস্ট। 'পুণ্যিবান' সেই লোকটার মৃত্যু যেন অমৃতযোগ ত্যাবড়াদের কাছে। অচেনা সেই লোকটি বেওয়ারিশ মৃতদেহ বনে গিয়ে যেন পুনিয়াদের কপাল ফেরানোর উপায় হয়ে ওঠে :

"ত্যাবড়া ওদের দিকে চেয়ে বলল, 'ভেবে দ্যাখ, মাসের এখন পয়লা হপ্তা যাচ্ছে, অ্যাঁ? কাল চটকলে হপ্তা হয়ে গেছে, কেমন? আর আজ শনিবার — শনিবারের দুপুরে লোকটা মরল। উরে শালা কপাল কাকে বলে।"

... ... ত্যাবড়া আদরের ভঙ্গিতে, চুমকুড়ির শব্দ করে, মৃতের মরা চিবুকে হাত বুলিয়ে দিল। বলল, 'বাবা বরাবর যেন তোমার মত পাই।"

এরপর রেলস্টেশনের জনারণ্যে সেই শবদেহ রেখে প্রদর্শনী! এও কি কম অভিনব! ওই শবদাহের উদ্দেশ্যের মধ্যে অর্থ আমদানি না সামাজিক দায়নির্বাহে মানবিকতার অসহায়তা — কোন্‌টা প্রধান এই দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠতে থাকে গল্পে :

"ওরা যখন মড়া নিয়ে ইস্টিশনে এল, সোতে আর জগা বাকী ব্যবস্থা করে রেখেছে। বাকী ব্যবস্থা আর কী, নতুন কোরা কাপড়টা দু-ফালি করে কেটে রেখেছে। ওবা আসতেই, সোতে ইস্টিশানের রোয়াকে ওঠবার সিঁড়ির একধারে এক টুকরো কাপড় পেতে দিল। ... ... তাবড়া আর এক টুকরো নতুন কাপড় দিয়ে বুড়োর শরীর বুক অবধি ঢেকে দিল। পাঁচপাপড়ির টগরের মালাটা বুকের ওপর ছড়িয়ে দিল। শুকনো জবা ফুলটা

একদলা বাসি রক্তের মত দেখাচ্ছে।''

তথাকথিত ভদ্র মানুষদলের চোখে তাদের এই নাট্যদৃশ্যের আয়োজন কিরকম প্রভাব ফেলেছে তাও ব্যক্ত হয় গল্পে :

''আশেপাশের দোকানদারেরা ব্যাপার দেখে হাসাহাসি করছে। 'শালারা যমের অরুচি।' 'এদের কি মশাই ধম্মোজ্ঞান নেই?' 'দেশটা রসাতলে গেল।' 'কীরকম মজার ব্যবসা দেখেছেন।' 'আজ শালাদের ফলার হবে।'

কিন্তু অভিনব এই অর্থসংগ্রহের পরিকল্পনা বা ব্যবসা ফাঁদার ঝঞ্ঝাটও আছে। সেপাই, জি.আর.পি.-র সেপাই, ইউনিয়মের লিডার নান্টা সবাই এই উপার্জনের 'কাটমানি' খায়। চাঁদা তুলে এই অভিনব পিকনিকে আরও কত কি করার বাসনা ত্যাবড়াদের! সে বাসনা পূরণও হয় ঃ

''সোতের আবার ডান হাতে ঘড়ি। সেই হাতটা তুলে ও বলল, 'অনেক দিন শরীরের জাম ছাড়ে নি। আজ একটু জাম ছাড়াতে হবে।'

জগা জিজ্ঞেস করল, 'এক বোতল টানবি?'

'তা জানি না। যতক্ষণ হুঁস থাকবে।' ''

চারমাস পরে আবার এই কপাল খুলে যাওয়ার দিনে আরও ইচ্ছাগুলি পূরণের সাধ জাগে পুনিয়াদের ঃ

'' 'আট আনা পয়সা দে তো, এ মুখটার ওপরে একবার ঝেঁকে আসি।'

ত্যাবড়া একটা খিস্তি করে বলল, 'এই দেব। খাইবার নাম নেই, তুমি এখন জুয়া মারতে যাবে।'

... .. .

সোতে বলল, 'দূর, ওসব কথা আমার ভাল লাগছে না। টাকা দে, একটা পাঁট নিয়ে আসি, মনা খাবে।' ...

সোতে চলে যাচ্ছিল। ত্যাবড়া ডাকল, 'শোন্, কমলা কেবিনের ব্যাচাদাকে বলবি আড়াই কেজি মাংস রান্না করে দিতে হবে, আর ভাত।'

.. ..

'আর মিষ্টি!'

'রাজভোগ কেনা হবে।'

'আর মাল?'

'শনিবার মাসের প্রথম' সময়ে লোকটা সরে গিয়ে যে অর্থের আমদানি ঘটে তা দেখে ত্যাবড়া ভাবে :- *''গোটা শীতকাল ধরে প্রতিটা ছুটির দিনে গাড়িতে লরিতে কত ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা ফিস্‌টি করতে যায়! গান করতে করতে, টুইসট্ নাচতে নাচতে যায়, মাইকে গান বাজাতে বাজাতে যায়। ... এও একরকমের ফিস্‌টি। এও একরকমের চাঁদা। সব জাতের মানুষদের তো আর একরকমের হয় না।''* অনন্তর সবযাত্রার আয়োজন।

কিন্তু সেক্ষেত্রেও শ্যেনদৃষ্টির তারিফ না করে পারা যায় না সোতেদের :

"... সোতে মনার দিকে একবার তাকিয়ে পুনিয়াকে বলল, 'শোন পুনিয়া, একবার গুয়ের ডিপোর কাছে যাস। একটু এগিয়ে গেলে দেখবি, রেললাইনে ঢোকবার গলির মধ্যে একটা বাঁশ পড়ে আছে। ওটা নিয়ে চলে আয়।' ... ...

পুনিয়া ঠিক বাঁশটা আনতে পেরেছে। সেটাকে দু'টুকরো করে কেটে মোটামুটি একটা চালি বানানো হয়েছে।' জীবনের ঘোর বাস্তবতা, অর্থসংগ্রহের এই অভিনব উপায়ে মূল্যবোধও হারিয়ে যেতে থাকে মানুষের : *"ত্যাবড়া মড়ার ঠাণ্ডা কনকনে চিবুক হাত দিয়ে চুমকুড়ি শব্দ করে বলছে, 'আসিরবাদ কর, নিজের বাপকে যেন তোমার মতন এখানে এনে শোয়াতে পারি।'*

অতঃপর প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে শ্মশানযাত্রা। সে শ্মশানের অবস্থান : *"এক দিকে গঙ্গা, আর এক দিকে চটকলের লম্বা পাঁচিল। তারপরে একটা গরীবদের পাড়া। সেই পাড়াটা পেরিয়ে গেলেই শ্মশান।"* এই শববাহকেরা হরিধ্বনি দেয় না, গান গায় নিচু গলায় :

"পুনিয়া সকলের সম্মতি আছে ভেবে নিচু গলায গান ধরল, 'আমরা রিকশা চালাই, আমরা রিকশা ...।' ত্যাবড়া হঠাৎ মোটা গলায়, নিচু স্বরে গেয়ে উঠল, 'মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব ...।'

তারপর শবযাত্রাব এসে পৌঁছয় শ্মশানে। গল্পে তার বর্ণনা : *"গরীবপাড়ার পরে, ছোট্ট একটা মাঠ। তারপরে শ্মশান। শ্মশানে ঢোকবার আগে ওরা এবার গলা ফাটিয়ে হরিধ্বনি দিল। ... শ্মশানটা ফাঁকা, একটাও চিতা জ্বলছে না। ... ... কাঠের চালাটার পাশে টিমটিমে বিজলি আলোর নিজে চণ্ডী এসে খালি গায়ে দাঁড়াল। পাশেই তার নিজের থাকবার ঘর। চণ্ডী শ্মশানের ডোম। সে এসে দাঁড়াতে, গঙ্গার ধারের ছাই গাদা থেকে তিনটে কুকুরও তার পাশে এসে দাঁড়াল।"*

ত্যাবড়াদের এই অভিনব ব্যবসার কথা চণ্ডীরও অজানা নয়। সেও পাই পয়সা তার ব্যবসার বুঝে নিতে চায়, বলে : *"চার মাস আগের হিসাব দিলে। আরো দেড় টাকা দাও, লকড়ির দাম বেড়েছে।' ত্যাবড়া মুখটা বিকৃত করল। মনা বলল, কমছে টা কী, তা তো বুঝি না।'*

চণ্ডী বলল, 'মড়া। মাইরি বড্ড কমে গেছে।'

শ্মশানটি খুব ছোট নয়। *"চারটি চিতা, পাঁচিল ঘেরা। চিতার ঘেরাও থেকে জমি ঢালুতে নেমে গঙ্গায় গিয়েছে।"* সেই শ্মশানের অন্ধকার বসে অন্ধকার জগতের মানুষ রতনেরা বসে মদ খায়, চানাচুর খায়, না-মেটা বাসনা সম্পর্কে, ভাগ্যের অসহায়তা বিষয়ে আক্ষেপ করতে থাকে। সম্বিত ফেরে ডোম চণ্ডীর ডাকে। শবদাহে ঘি আবশ্যক হলেও এখানে ঘি জোটে না। তারপর *"চারজনে ধরে চিতার কাঠের ওপরে মড়া*

শুইয়ে দিল। হাত দুটো গুটিয়ে দিতে গিয়ে দেখা গেল, ভীষণ শক্ত হয়ে গিয়েছে। শরীরের একটা জায়গাও বাঁকাবার উপায় নেই।'' বাপ বেঁচে থাকলেও ত্যাবড়া-জগা-সোতে-মনা-পুনিয়া সবাই মিলে প্যাকাটি জ্বালিয়ে মুখাগ্নি করে। এও কি দেখা যায় সচরাচর? তারপর চিতার আগুন জ্বলে উঠে আর হাতে হাতে ঘুরতে থাকে মদের বোতল। আর ধীরে ধীরে চিতার আগুনে পুড়ে যেতে থাকে তাদের বুকের ভেতরটা। আর সে আগুনে পুড়ে যেতে যেতে ত্যাবড়া অনুভব করে :

'' 'মানুষ যে কী, তা বুঝলাম না!' শবদাহের বীভৎস বর্ণনায় গল্পে যুক্ত হতে থাকে আরও গভীর ব্যঞ্জনা : ''মড়া পুড়ছে, মুখটা পুড়ছে, আর ঠোঁট পুড়ে গিয়ে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে। মাথার চুল পুড়ে, চামড়া উঠে, সাদা খুলি দেখা যাচ্ছে।''

ত্যাবড়া বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, হাসছে।'

চণ্ডী বলল, 'হ্যাঁ, এখনই তো যত রঙ্গ।'

এ রঙ্গ কার? মৃতের? জীবনের? না কি আরও অন্য কারোর?

শ্মশান প্রসঙ্গে সমরেশ বসুর আরও দুটি গল্প সুধী পাঠকবৃন্দের মনে পড়ে যেতে পারে। গল্প দুটি হল 'অকালবৃষ্টি' ও 'পাপপুণ্য'।

'অকালবৃষ্টি' গল্পেও দুই প্রায় সমাজবহির্ভূত মানুষ সিধু ডোম আর পুরসভার কর্মী, মৃতের নাম, তথ্য নথিভুক্ত করার কাজে যুক্ত সিধুর সঙ্গী ভূতেশ হালদারের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার কাহিনী। এই গল্পে শ্মশানের বর্ণনা আসে এমনভাবে : *''ওদিকে পাঁচিল দিয়ে আড়াল-করা শ্মশানের মধ্যে একটা মড়া পুড়ছে। তাপ গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।'* এই শ্মশানের জন্মবৃত্তান্তও গল্পে উপস্থিত : *''কোন এক চটকলের সাহেব এ শ্মশান তৈরি করে দিয়েছে। ইঁটে খোদাই করে ইংরেজিতে লেখা আছে, এস্ট, ১৯২৬। মস্ত উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরাও শ্মশান। মড়া যখন পোড়ে তখন দূর থেকে মনে হয় বুঝি কোন চটকলের চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।''* এই শ্মশানে *''ভূতেশ যদি চিত্রগুপ্ত হয়, সিধু ডোম তা হলে সাক্ষাৎ যম।'* ভূতেশ নারীবিদ্বেষী। কুদর্শন হওয়ায় তার সুরূপা বৌ তাকে ছেড়ে গেছে। এমন এক শূন্যতায় সেই শ্মশানে এসে হাজির হয় আর এক নারী, সে সুন্দরীও; নাম সুলোচনা। সিধু-ভূতেশের দৈনন্দিন জীবনে সুলোচনা দাবি করে তার অপরিহার্যতা কিন্তু বাকি দু'জন গল্প করে শ্মশান-মৃত্যু-মড়া নিয়ে। সুলোচনার ক্ষোভ জন্মায়। হঠাৎ একদিন সে সুলোচনাও ওলাউঠায় মারা যায়। ভূতেশ আর সিধুর সামাজিক বোধের মধ্যে, জীবনবোধের মধ্যে যে সুলোচনা নিয়ে এসেছিল এক প্রবল প্রাণপ্রবাহ তার মৃত্যুতে নারী বিদ্বেষী ভূতেশেরও চিত্ত পরিবর্তন ঘটেছিল। তাই তার অবর্তমানে ভূতেশর স্বীকারোক্তি : *''জান্‌লি সিধে, শ্মশানটা শালা সত্যি শ্মশান হয়ে গেছে।'* — মৃতার নাম লিখতে যাওয়া ভূতেশের হাতের পেন্সিল জীবনে সেই প্রথম কেঁপে উঠেছিল। আপাতদৃষ্টিতে অসামাজিক মানুষের ভেতর জগতের উন্মোচন ঘটেছে গল্পে অকপট ও স্বাভাবিকভাবে।

'পাপপুণ্য' গল্পের বিষয়বস্তু যেমন বিস্ফোরক তেমনই বিশ্বাসযোগ্য। গল্পটি শুধুমাত্র পিতাপুত্রীর জীবন পাঠ নয়, সমাজনৈতিকিতার চ্যালেঞ্জটাও যেন শেখার। গদাইয়ের স্বামীবর্জিত বা বিবাহবিচ্ছিন্ন মেয়ের আত্মহত্যা আর সেই মৃতা বিন্দুর দেহ নিয়ে শ্মশানযাত্রী কেতু, যে চেয়েছিল একদিন বিন্দুকে বিবাহ করতে। এই শবযাত্রার পরিবেশ গল্পে গম্ভীর : *"চাটাইয়ে বেঁধে বাঁশে ঝুলিয়ে দু-জনে কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছে, এসছে। এখন চলেছে মহাশ্মশানে। ... ... সকাল থেকে পাঁচ ক্রোশ পথ আসা গিয়েছে। সূর্য মাথার ওপরে। আরো বারো ক্রোশ, তারপর মহাশ্মশান।"* নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে কেতু গদাইরা চলেছে শ্মশানে। বিন্দুর আত্মহত্যার কারণটি একমাত্র পিতা গদাইয়েরই জানা। সে এক দুর্বিষহ পরিস্থিতি। যে গদাই মদ্যপ অবস্থায় পত্নীর ঘরে ঘোর অন্ধকারে গিয়েছিল, যে কিনা সঙ্গমতৃপ্ত হয়ে পত্নীকে নাম ধরে ডাকে, শুনতে পায় সাপের ছোবলের মতো বিন্দুর কণ্ঠস্বর 'অই গ, তুমি বাপ।' পিতা কন্যার সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত, এই গুরুতর বোধে, যন্ত্রণায়, অন্তর্দাহে বিন্দু বেছে নেয় আত্মহননের পথ। পিতা-কন্যা ব্যভিচারের মাশুল গুনতে হয় কন্যাকে। প্রায়শ্চিত্তের পথ বেছে নেয় বিন্দু আত্মহত্যায়। গদাই বেঁচে থাকে তীব্র বিবেকী তাড়নায়, কন্যার লাশ বহন করে নিয়ে যায় শ্মশানে দুঃসহ পাপ বোধে। অন্ধকার খানখান করে পাঠকের মর্মমূলে বিদ্ধ হয় পাপী গদাইয়ের স্বীকারোক্তি : *'বাপ বলিস না কেতু। কেন কি না, গদাধর বায়েন কারুর বাপ লয়।'*

এই গল্প জীবনেরই। মৃত্যু, শ্মশান হয়ে ওঠে সে জীবনেরই সহোদর।

তবু কত বাদ রয়ে গেল! তারাশঙ্কর বাবুর 'শেষ পথ' গল্পে মৃত্যুপথযাত্রী বুড়ি। চোখে টলটলে জল আর মুখে হাসি নিয়ে বুড়া বলে--

—'বল বুড়ি. কি বুলছ, বল?'

---'মরণ ভারি সুন্দর গো বুড়া, মরণ ভারি সুন্দর। বুড়া হাসতে লাগল, চোখের জল টপ টপ করে পড়ল বুড়িব কপালেব উপর। বুড়া মুছিয়ে দিতে গেল সে জল। বুড়ি বললে, 'না থাক।' হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটা গানের কলি :

"আঁধারে ভাবনা কেনে হায় রে।
আঁধারেই পরাণ পাখি সেই দ্যাশেতে যায় রে!"

অচিন্ত্যকুমাব সেনগুপ্ত আর রমেশচন্দ্র সেনকে বাদ দিলে ভারী অন্যায় হবে। 'ডোমের চিতা'-র হারু আর বদনকে ভুলি কি করে? 'চিতার ধোঁয়া সাপের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া আকাশে উঠিতে লাগল।' কিংবা 'হারুর চিতায় বদনের চাল চড়িল।' এই বাক্য কি ভোলা সম্ভব।

— সম্পাদক

❑ লেখক পরিচিতি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া।

❑ কৃতজ্ঞতা স্বীকার : পীযূষ সিনহা।

মৃত্যু পরবর্তী লোকাচার, বিশ্ববৈচিত্রে

শংকর গুপ্ত

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আদিম জাতিগুলির মৃত্যুর লোকাচার ও তার বৈচিত্র আমাদের কাছে আজ আর অজানা নয়। সেই কবে প্রায় অর্ধলক্ষাধিক বছর আগেও নিয়ানডারথাল প্রজাতির মানুষ মনে করত— মৃত্যুর পর যে মানুষটিকে কবর দেওয়া হয় তারও একটি সচল জীবন আছে। তারমানে পরলোকে গিয়েও ইহলোকের ন্যায় একটি জীবনযাপন প্রক্রিয়া চলে। তাই বোধহয় দু'হাজার বছর পূর্বেও মিশর, চীনে মৃতদেহের সঙ্গে, ফুল, ফল, লতাপাতাই শুধু নয়, খাদ্য, পানীয়, পোষাক, অলংকার, নানাবিধ রত্ন, দাস দাসী, অশ্ব রাখা হতো। যোদ্ধার অস্ত্র, শিরস্ত্রাণও বাদ যেত না। নিয়ানডারথাল মানুষ 'আত্মা'-য় বিশ্বাস করত কিনা জানা নেই। তবে তারা অতিপ্রাকৃত শক্তি এবং সচল, জীবন্ত মৃতদেহ-র কথা বিশ্বাস করত। 'আত্মা' বিষয়টি বোধহয় পরবর্তীকালের ভাবনা।

নিওলিথিক বা নব্য প্রস্তর যুগে (আনু. ৭০০০-৫০০০ খ্রি.পূর্বাব্দ) ইউরোপ ও এশিয়ায় কৃষি ও পশুপালন চালু হয়, নতুন অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে ওঠে। প্রাচীন জনজাতিগুলির জীবনে লোকাচার ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিবর্তিত রূপে দেখা দেয়। তারা মনে করত জীবিত অবস্থার মত মৃত ব্যক্তিরও প্রাণ ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রয়োজন হয়। তাই তারা খাদ্য-পানীয়-আসবাব, হাতিয়ার সব রেখে দিত সমাধির সঙ্গে। এছাড়া সমাধিস্থলে থাকত নারী মূর্তির মুখমণ্ডলের রেখাচিত্র। সাধারণতঃ একে কবরের রক্ষয়িত্রী বা 'কবর দেবী' ভাবা হত। পণ্ডিতরা অনুমান করেন এইসব নারী পুতুল হচ্ছে উপজাতি গোষ্ঠীগুলির অগ্নি কুণ্ডের এবং প্রাচীন পারিবারিক কুণ্ডের নরত্বায়ন। এগুলি তৈরি হতো মাটি বা পাথর দিয়ে। কোথাও গয়না বা পাত্রের গায়ে স্কেচ হিসেবে। এ সময়ে মূলত: কবর দেওয়ার রীতিই প্রচলিত ছিল। তবে ফ্রান্সের উত্তর অংশে দাহ করার উল্লেখ পাওয়া যায়। এবার সংক্ষেপে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের আদিম উপজাতীয় মানুষের মৃত্যু পরবর্তী লোকাচার সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

টাসমানিয়া : অস্ট্রেলিয়ানদের থেকেও প্রাচীন এই জনজাতির আর্থ-সামাজিক কাঠামো এবং জীবন যাত্রা অস্ট্রেলিয়ানদের অনুরূপ। এদের অসুস্থ রুগ্ন ও মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে বাড়ির মেয়েরাই দেখভাল করে থাকে। যাদুবিদ্যায় এরা বিশ্বাস করে না।

এদের কেউ মারা গেলে মাটির নিচে একটি গর্ত করে দেহটিকে সেখানে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। কিংবা দাহ করার পর যে হাড়গুলো থাকে সেগুলোকে মাটির নিচে পুঁতে একটি ঢাকনা দেওয়া হয়। এরা প্রেতকে ভয় করে। অন্ধকার রাতের প্রেত নাকি দুষ্ট ও ভয়ানক।

ওশেনিয়া: নিউগিনি অঞ্চলের পপুয়ান উপজাতি এবং মেলানেশিয়া- পলিনেশিয়ান ভাষাভাষী উপজাতি হলো ওশেনিয়ার প্রধান দুটি উপজাতি। পপুয়ানরা নানারকম জাদু-যথা-মারণ জাদু, জীবিকা যাদু, ও কৃষি যাদুতে বিশ্বাসী ছিল। আর মেলানেশিয়ানরা দেবতায় বিশ্বাস করে না কিন্তু প্রেতে বিশ্বাসী তার পূজাও করে। এদের সমাজে পুরোহিত নেই, তবে— পেশাদার জাদুকর, ওঝা আছে। এরা মানুষের সাফল্যের পেছনে মানব দেহে অবস্থানকারী

'মানা'-র ভূমিকা বড় করে দেখে। এদের পূর্বপুরুষকে শ্রদ্ধা জানানোর পদ্ধতিটি অভিনব। পূর্বপুরুষের একটি মূর্তি বানায়। তার মাথার খুলিকে ঘরের পবিত্র স্থানে রাখে ও পূজা করে তাকে খুশি রাখবার জন্য। কেননা তিনি ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী। এদের ভাবনায় প্রেত দু' প্রকার। ১. প্রকৃতির প্রেত বা ভুঁই—এ এরা থাকে, পাহাড়ে, সমুদ্রে বা গিরিখাতে। এই প্রেতই প্রধান। আর মৃতের প্রেতের নাম 'তামাতে', সে গৌণ ভূমিকা পালন করে।

পলিনেশিয়া : এদের কাছে দলপতি হচ্ছেন ঈশ্বর তুল্য। তাঁর কবরও মন্দিরসম এবং তার প্রেতটিও দেবতার মত। এই দলপতিই আবার অন্যতম পুরোহিত হিসাবে নানান আচার পরিচালনা করেন। এরা প্রেতের মতো দেবতাতেও বিশ্বাসী। এরা মনে করে দেবতার সঙ্গে পুরোহিতের আত্মীয়তার সম্পর্ক। ফলে তাঁর কথাই দেববচন।

সুমাত্রা : এখানকার কুরু উপজাতির ওঝার বিশেষ গুরুত্ব। তার ভর হয় এবং দেবতার সঙ্গে বাক্যালাপ করেন বলে বিশ্বাস। এরা মনে করে যে কোনো মানুষ মরার সময় যদি তার কানে কোনো শব্দ যায় তবে সে প্রেতলোকে ঠাঁই পায়।

মালয়েশিয়া : এখনকার সেমাঙ্গ উপজাতির মানুষদের বিশ্বাস, ওঝা স্বয়ং যে প্রেতের সঙ্গে বাক্যালাপ করে সে মানুষের উপকারী এবং সে বাস করে ফুলের ভেতর। মৃতদেহ মাটিতে কবর দেওয়া হয় কিন্তু আত্মা চলে যায় পশ্চিমদিকে। সেই আত্মা আবার গভীর রাতে পাখি হয়ে ফিরে আসে এবং চিৎকার করে লোককে ভয় দেখায়।

মঙ্গোলিয়া : এখানকার প্রাচীন উপজাতিগুলি মনে করে আকাশের দেবতা প্রেত শক্তিগুলোকে চালনা করে।

ইন্দোনেশিয়া : এখানকার আদিম উপজাতিরা মনে করে অরণ্যকে চালনা করে প্রেতশক্তি। নারী পুরুষ দুজনের সাথেই প্রেতশক্তির যৌনমিলন হতে পারে।

আমেরিকা: পুরোনো আমেরিকার আদিম উপজাতি রেড ইন্ডিয়ান ও এস্কিমোদের কথাই উল্লেখযোগ্য। এরাও প্রেতে বিশ্বাসী। ইন্ডিয়ানরা মনে করত ওঝা মারা গেলে তার আত্মা একটি পশুতে পরিণত হয়। এস্কিমোরা যতটা না মরণকে ভয় করত তার চেয়ে বেশি ভয় করত মরণ যন্ত্রণাকে। নানাপ্রকার প্রেতকেও এরা ভয় করত। যেমন— মৃত মানুষের প্রেত, খাদ্যের জন্য হত্যা করা পশুর প্রেত, এমনকি ভূমি ও বাতাসের প্রেতকে। তারা কিছু বিধিনিষেধ বা 'টাবু' মেনে চলত। তারা বিশ্বাস করত এইসব টাবু ভাঙলে একালেই শাস্তি পেতে হয়। পরকালে তারা বিশ্বাস করত না। এরা মৃতদেহকে একটি কাঠের বাক্সের ভেতর রেখে দিত। এরা বিশ্বাস করত যে পূর্ব পুরুষের আত্মাটিই অধোপুরুষ বা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে আশ্রয় নেয়। বিশেষ করে ঠাকুরদার আত্মা নাতির বা ঠাকুরমার আত্মা নাতনীর শরীরে অবস্থান করে। ফলে শিশু দৌরাত্ম্য করলেও তাকে কোনো শাস্তি দেয় না। তাদের আরো বিশ্বাস যতক্ষণ না শিশুটি শক্ত সমর্থ হচ্ছে ততক্ষণ আত্মাটি শিশুর মধ্যেই থাকে তারপর দূরে কোথাও চলে যায়।

এদেরই গোষ্ঠীভুক্ত একদল লোক কর্তিত মুণ্ড সংরক্ষনে বিশ্বাসী ছিল। যুদ্ধে গিয়ে শত্রুর মুন্ড কেটে নিজের দখলে রাখলে তার আত্মাকেও বশীভূত করা যায়। এমনকি পরকালেও তার আত্মাটি কথা শুনতে বাধ্য হয়— এরকম বিশ্বাস ছিল। এরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। ইহকালের

মত পরকালেও আত্মা দিনযাপন করে বলে বিশ্বাস। বীর ব্যক্তির আত্মা সুখে থাকে, ভীরুদের আত্মা দুরবস্থার ভেতর দিন কাটায়।

আফ্রিকা : আফ্রিকায় তিন প্রকার উপজাতির বাস। (১) বুশসেন ও মধ্য অঞ্চলের পিগমি, (২) হোট্‌টেন্‌টট্‌, বানটু সুদান ও গ্রেট লেক অঞ্চলের অধিবাসী, (৩) মরক্কো, আলজেরিয়া, টিউনিশিয়া, লিবিয়া, মিশর, ইথিওপিয়া ও সোমালিয়া, এরা প্রাচীন সভ্যতার বংশধব। প্রথম গোষ্ঠী যাবাবর, ও শিকার গোষ্ঠী। দ্বিতীয় গোষ্ঠী, মূলত কৃষি ও পশুচারণ করে জীবন কাটায়। বুশমেনের আধিবাসীরা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাসী। এরা মৃত দেহকে ভয় করত তাই বিশেষ আবার অনুষ্ঠান করে কবর দিত। এরা ফড়িংকে এক অদৃশ্য স্বর্গীয় প্রেত- যার চেহারা অর্ধপশু ও অর্দ্ধমানব তার আত্মীয় বলে মনে করত। ফলে ফড়িংকে প্রার্থনা দ্বারা সন্তুষ্ট করত যাতে সেই অদৃশ্য প্রেতও সন্তুষ্ট হয়। কারণ সেই অদৃশ্য প্রেতটি পৃথিবী ও মানুষকে সৃষ্টি করেছে। আবার পিগমিদের কবর নিয়ে তেমন কোনো বিশ্বাস দেখা যায় না, তবে আত্মা সম্পর্কে ধারনা আছে। অফ্রিকার উপজাতি সমাজে দল নেতাই যেন রাজা। এই রাজাই কালক্রমে হল দেবতা। তার পূজাও চালু হল। রাজা ও রানীর ব্রোঞ্জের মূর্তি গড়ে পূর্ব পুরুষের বেদিতে বসিয়ে পূজা করা হতো। মৃত দলনেতার নাম মুখে আনা নিষেধ। তাকে কবর দেবার সময়— ক্রীতদাস, ও মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অপরাধীকেও বলি দেওয়া হত। বিশ্বাস, বলি হওয়া মানুষটি পবলোকে গিয়ে রাজাকে জানাবে তার রাজ্যে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে।

অন্যান্য অঞ্চল : উত্তর রাশিয়া ভূখণ্ডের সাইবেরিয়ায় শিলাকি গোষ্ঠীর লোকেরা মনে করত তিনটি প্রধান প্রেত হচ্ছে—জমি, নদী, ও সমুদ্র। এছাড়াও জঙ্গল, পাহাড়ের অপ্রধান প্রেত আছে। এরা প্রেত পূজা করলেও দেব পূজা করে না। আবার ককেশাসের উপজাতিরা মাটির তলায় পাথর নির্মিত এক গোলাকার ঘরে কবর দেয়। নিয়মিত স্মরণ অনুষ্ঠান পালন করে। আবার ওসসেট অঞ্চলে ওসসেট গোষ্ঠীর কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রী একবছব ধরে প্রতিদিন বিছানা পেতে গভীর রাত পর্যন্ত স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে। সকালবেলা স্বামীর মুখ ধোবার জল পর্যন্ত গুছিয়ে রাখে। ভলগা নদীর মধ্যাঞ্চল ও পশ্চিম উবাল ভূমির অধিবাসীরা মৃতকে ভয় করে। কিন্তু তাকে স্মরণ করার জন্য স্মরণসভার আয়োজন করে মৃত্যুর তৃতীয় বা সপ্তম বা মৃত্যুদিন দিবসে এবং প্রথম মৃত্যু বার্ষিকীতে। এছাড়া গোত্রভুক্ত সকলে বসন্তকালে সমবেতভাবে এক 'স্মরণসভা করে মৃতকে অনুরোধ জানায় যাতে তিনি উৎসবে যোগদান করেন, খানাপিনায় অংশ নেন ও পরিবারের সকলের মঙ্গল করেন। প্রাচীন শ্লাভ জাতির মানুষেরা স্বাভাবিকভাবে মৃত ব্যক্তিকে 'পবিত্র' বলে জ্ঞান করে এবং 'পিতা-মাতা' বলে সম্বোধন করে। কিন্তু অস্বাভাবিক ভাবে মৃতকে ভয় করে, ক্ষতিকারক মনে করে। তারা আত্মাকে ভয় করেনা কিন্তু মৃতদেহকে করে। প্রাচীন জার্মান উপজাতির মানুষেরা পুড়িয়ে এবং কবর দিয়ে উভয় ভাবে মৃতদেহ সৎকার করত। এরা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। দক্ষিণাঞ্চলের দেবতা ওভান মতের দেবতা, মৃত রাজ্যের প্রভু, ও আত্মাকে পথ দেখান। এদের বিশ্বাস নৃত্যরত একদল মৃত জীবিত মানুষকে প্রলুব্ধ করে তাদের মধ্যে নিয়ে যায়। আবার কেল্ট উপজাতির মানুষরা বিশ্বাস করত কেউ মারা গেলে সে-পাতাল অথবা জলের তলায় বা দ্বীপে জীবন কাটায়। এরা পুনর্জন্মে

বিশ্বাসী।

এইভাবে পৃথিবীর আদিম উপজাতি গুলির মৃত্যু ও তৎপরবর্তী লোকাচার নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। নিয়াডারথাল মানুষদের আত্মা সম্পর্কে কোনো ধারণা থাকার কথা নয়। তবে তারা মৃতদেহ যে অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী তা মানত। মৃতদেহও যে পরকালে জীবন্ত থাকে তা তাদের বিশ্বাসে ছিল। তারা পরকালেও বিশ্বাস করত বোধহয়। এছাড়া মানুষের মৃত্যু হলে দেহ থেকে আত্মার নির্গমন ঘটে এই ধারনা ক্রমে গড়ে ওঠে।

মাওরি জাতির আচার

পলিনেশিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মাওরিদের লোকাচারে মিল আছে। তারা মনে করে পূর্বপুরুষদের পারলৌকিক ক্রিয়া যথোচিত করা উচিত; না হলে জীবাত্মা হয়ে ঘুরে বেড়ায়, ও পরিবারের লোকজনকে উত্যক্ত করে। তাই যথোচিত পারলৌকিক ক্রিয়া করে তবে তার হাত থেকে নিস্তাব। এদের মৃতের রাজ্যের নাম—বারো হেঙা। এখনকার পাহারাদার হলেন মহান হিনে বা হিনেলুইও তেপো। তাঁর ছাড়পত্র ছাড়া কেউ পরলোকে যেতো পারে না।

কেউ মারা গেলে তার মৃত দেহকে পবিত্র সভাগৃহের প্রাঙ্গণে এনে রাখা হয়। তারপর বেশ কয়েকদিন চলে পারলৌকিক আচার। এখানেই তার উদ্দেশ্যে শোক প্রকাশ করা হয়। শেষবারের মত দর্শন ক'রে গোষ্ঠী ভুক্ত সবাই। তারপর তাকে পিতৃপুরুষদের বাসস্থানে পাঠানো হয়। যথাযথ পারলৌকিক ক্রিয়ার পর অশৌচ মুক্ত হওয়া যায়। এরা মাটিকে পবিত্র মনে করে। এদের বিশ্বাস মৃত্যুর পর মাটি মায়ের কোলে ফিরে যেতে হবে। ফলে গোষ্ঠীভুক্ত অঞ্চলকে সযত্নে রক্ষা করতে হয়। কেননা এই ভূমি উত্তর পুরুষের জন্য পূর্ব পুরুষরা রেখে গেছেন। এরা মৃতের অবস্থানের স্থলকে পবিত্র বলে মনে করে। মৃত্যু তাদের চোখে শুভ অনুষ্ঠান। অবশ্য একদা শত্রুকে হত্যা করে (অভিজাত বংশ হলে)) তার হৃৎপিণ্ড ও মাংস ভক্ষণ করত। বিশ্বাস এর ফলে মৃত শত্রুর শক্তি আত্মস্থ হবে। আর যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ পাথর কেটে সভাগৃহ বানাত, সেই সভাগৃহের মূল আসনের নীচে একজন ভৃত্যকে হত্যা করে কবর দেওয়া হত। এই সভাগৃহের প্রাঙ্গনেই মৃত্যুর মাঙ্গলিক আচার পালন করা হত।

*এই রচনা, লিখতে গিয়ে গোপেন ভঞ্জ রচিত 'ধর্মমতের ক্রম বিবর্তন' গ্রন্থটিকে অবলম্বন করা হয়েছে।

❐ লেখক পরিচিতি ঃ গবেষক, প্রাবন্ধিক।

মৃত্যু, সৎকার ঃ ভারতের আদিবাসী প্রেক্ষিতে

সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষ কবে থেকে মৃতদেহ সৎকার শুরু করে, সে দিনক্ষণ, তারিখ নির্দিষ্ট করে লেখা না থাকলেও এ-বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য নেহাত দুর্বল নয়। এক্ষেত্রে চাক্ষুষ প্রমাণ নেই একথা সত্যি, কিন্তু বর্তমানের আদিম আদিবাসী গোষ্ঠীর আচার আচরণ দেখে এ সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যায়।

মৃত্যু, মৃতদেহ ঘিরে সংস্কার, যথোপযুক্ত সৎকার বিধি, মৃত্যু পরবর্তী আচার অনুষ্ঠান—এ সমস্ত কিছু ঘিরে সকল সংস্কৃতিতেই একটি বিশেষ আবহ গড়ে ওঠে। এগুলি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সূচক তো বটেই; সেই সঙ্গে কোনো জনগোষ্ঠীর বিশ্ববীক্ষণটিও এতে ধরা পড়ে। পাশাপাশি এর উৎপত্তির ইতিবৃত্তটির মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের কথা পরিবর্তনের ধারাটিকে বুঝতে পারা খুব একটা কষ্টসাধ্য নয়।

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, নিয়েনডারথাল মানবই মৃতদেহ সৎকারের সূচনা করেছিল। ফ্রান্সের লা মুস্তের অঞ্চলে এদের একাধিক কবরের সন্ধান পাওয়া গেছে। জন ফেইফার তাঁর রচনায় প্রায় ষাট হাজার বছর আগে নিয়েনডারথালদের কবর দেওয়ার রীতির কথা বলেছেন। মোটামুটিভাবে মনে করা হয় যে প্রায় ষাট থেকে আশি হাজার বছর আগে মৃতদেহ কবর দানের রীতির সূচনা হয়। এবং কবর দানই সম্ভবত প্রথম সচেতন সৎকার পদ্ধতি। যদিও এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ সংশয় থেকেই যাচ্ছে। কেন তা কয়েকটি আদিবাসী গোষ্ঠীর সৎকার রীতি লক্ষ করলেই বোঝা যাবে।

এখনও বেশ কিছু শিকারী-সংগ্রাহক আদিবাসীদের মধ্যে আমরা মৃতদেহকে উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রাখতে দেখি। প্রাকৃতিক কারণে পচন, নানা মৃতদেহভোজী প্রাণীদের দ্বারা এইসব দেহগুলি সৎকৃত হয়ে যায়। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কিছু আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো ব্যক্তি যে স্থানে মারা যান সেখানেই তাকে ফেলে রাখতে দেখা যায়। একই ঘটনা দেখা যায় শ্রীলঙ্কার আদিবাসী ভেদ্দাদের মধ্যে। ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে নানান নাগা জনগোষ্ঠীর বাস ছিল। এদেরই কয়েকটি গোষ্ঠী যেমন আওনাগা, কোনয়ক নাগারা পূর্বে উপরিউক্ত পদ্ধতিতে মৃতদেহ সৎকার করত।

মৃত্যুর অতি প্রাকৃতিকতাকে কেন্দ্র করে এক ধরনের অ্যানিমিস্টিক বিশ্বাস আদিম মানুষের মনে ছিল। এ বিশ্বাসের কারণে তারা চেয়েছে মৃত্যু পরবর্তীকালেও আত্মার সন্তুষ্টি বিধান করতে। আবার এই সন্তোষ বিধানের প্রচেষ্টার পেছনে কিছু পরিমাণে ভয় যে কাজ করত সে কথা সহজেই বুঝতে পারা যায়। এমনকী এর স্বপক্ষে প্রমাণও দুর্লক্ষ্য নয়। যেমন, কাদার আদিবাসীরা তাদের মৃতদেহগুলিকে গ্রাম থেকে বহু দূরে কবর দেয়। তাদের বিশ্বাস এর ফলে মৃতের আত্মা তার গ্রামে ফিরে আসতে পারবে না। তবে এখানে স্বাস্থ্যের বিষয়টি বোধ করি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মৃতদেহের স্বাভাবিক নিয়মেই পচন হয়। পচনশীল দেহকে পরিত্যাগ করে বা এর থেকে দূরে চলে গিয়ে মানুষ এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছিল। কিন্তু পরিত্যক্ত দেহ পশুপাখির

দ্বারা অনেকসময় আরও বেশি ছড়িয়ে পড়ে। এতে স্বাস্থ্যবিধান প্রচেষ্টাটি মাব খায়। তাই মানুষ অনেক ক্ষেত্রে মৃতদেহের কবরের উপর ভারী পাথর চাপা দিয়েছে। কালক্রমে এটি একটি প্রথায় রূপান্তরিত হয়েছে। মেগালিথ বা স্মৃতিপ্রস্তর স্থাপনের সূচনা হয়তো এভাবেই হয়েছিল।

কবর দান ও পরিত্যাগ করার পাশাপাশি আর একটি প্রধান সৎকার পদ্ধতি হল মৃতদেহ দাহ করা। এইসব বিভিন্ন সৎকার রীতির উৎপত্তি তথা বিবর্তনের পেছনে মূলত তিনটি ধারার চিন্তাভাবনার কথা অনুমান করা যায়।

১) একসময় (অবশ্যই সংস্কৃতির আদিপর্বে) মৃত্যু সম্পর্কে আলাদা কোনো ধারণা হয়তো মানুষের ছিল না। তাই মৃতদেহগুলিকে যথাবিহিত প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে পরিত্যাগ করা হত। মৃতদেহের পচন ও তজ্জনিত প্রতিক্রিয়া তাদের বিকর্ষিত করত বলা চলে। কোথাও কোথাও পরবর্তী সময়ে এটি রীতি রূপে গৃহীত হয়। এরমধ্যে কিছু অদলবদল ঘটানো হয়েছিল। যেমন, এমনি ফেলে রাখলে কুকুর, শিয়াল মৃতদেহের টুকরোগুলিকে বিশ্রীভাবে ছড়িয়ে ফেলবে। শকুন তা করে না। এজন্যই শকুনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মৃতদেহকে উঁচু জায়গায় রেখে দেওয়া হত। যাই হোক সমাজ ক্রমশ জটিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৎকার রীতিতে পরিবর্তন আসে। কোনো কোনো আদিবাসী একপ্রথা ছেড়ে অন্য প্রথা গ্রহণ করে, কেউ বা আবার প্রচলিত প্রথায় কিছু নতুন সংস্কার যোগ করে।

উপরের আলোচনা থেকে এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই, যে আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণা মৃতদেহ পরিত্যাগকারী আদিবাসীদের মধ্যে ছিল না। যদিও প্রাথমিকভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রেরণা, মৃতদেহ সৎকারে বাধ্য করেছে মানুষকে। পরবর্তীকালে আত্মা ও সেই আত্মা থেকে ভয়বোধে মানুষ কবর দানের রীতি গ্রহণ করে।

২) আত্মার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড বার্নেট টাইলর। এই আত্মায় বিশ্বাস আবার ধর্মের উৎপত্তির দিকে ইঙ্গিত করে। যাই হোক, মানুষের শরীরে দুই প্রকার আত্মার উপস্থিতির কথা বলেছেন টাইলর। এগুলি হল দেহ আত্মা ও মুক্ত আত্মা। দেহ আত্মা যখন দেহ ত্যাগ করে তখন মানুষের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু শরীর ত্যাগ করার পরও তার নিশ্চয়ই আর একটা জগৎ আছে। নাহলে তার কবরে ব্যবহার্য জিনিসপত্র রাখা কেন? সম্ভবত এই ধারণার অনুসূত্রে এসেছে দাহ করার প্রথা।

৩) দাহ করলে শরীরের বিনাশ হয়, আত্মার নয়। আত্মা অবিনশ্বর এই বিশ্বাস যাদের তারা দেহকে ভস্মীভূত করার রীতি অবলম্বন করে থাকতে পারে। তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায় একই গোষ্ঠীর মধ্যে দু'ধরনের মৃত্যুর ক্ষেত্রে সৎকারের রীতি ভিন্ন কেন? ওঁরাওদের মধ্যে দেখা গেছে প্রথমে মৃতদেহকে কবরস্থ করতে, তারপর কিছুদিন বাদে দেহটি কবর থেকে তুলে দাহ করা হয়। অর্থাৎ পাশাপাশি দুটি চিন্তা সমান্তরালভাবে সক্রিয় রয়েছে। এগুলির মধ্যে একটি হায়ারআর্কি বর্তমান এমনটি বলা যেতে পারে। অন্যভাবে বললে বলতে হয় দাহ, কবর ইত্যাদির সঙ্গে যে শুদ্ধতার (পবিত্রতাও বলা যায় ক্ষেত্র বিশেষে) ধারণা যুক্ত রয়েছে, তার স্তরায়ণ ঘটেছে। আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রচলিত সংস্কারগুলি থেকে এমনটি অনুমান করা যায়।

সৎকার পদ্ধতি হিসেবে দাহ করা সম্ভবত অনেক বেশি প্রার্থিত তথা শুদ্ধতম হিসেবে

পরিগণিত। দেখা যাচ্ছে কোনো আদিবাসী গোষ্ঠী যখন তার সৎকার রীতিকে পরিবর্তিত করছে, তখন তারা প্রধানত দাহ কবার দিকেই ঝুঁকছে। যে হায়ারআর্কির কথা বলছিলাম, তা করা হলে সবার উপরে থাকে দাহ, মধ্যে কবর, সবার নীচে উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রাখা। বিবর্তনের ধারাটি সম্ভবত একেবারে নীচের থেকে উপর দিকে। আদিবাসীদেব মধ্যে দাহ করার প্রবণতাটিকে এক হিসেবে একটি আরোহণকামী প্রক্রিয়া বলতে পারি। বিষয়টি নীচেব মতো করে সাজানো যায়—
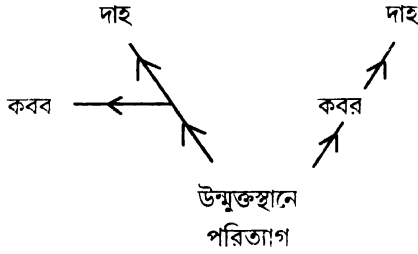
রেখাচিত্র : সৎকারের বিবর্তনের সম্ভাব্য পথরেখা।

বিভিন্ন সৎকার রীতি

ভারতবর্ষের আদিবাসী সমাজে একাধিক উপায়ে মৃতদেহ সৎকাব করা হয়। তবে দাহ করাই সর্বাধিক প্রচলিত রীতি। কোনো কোনো সময়ে একই আদিবাসীদের মধ্যে দুইটি ভিন্ন বকমের সৎকার পদ্ধতি দেখা যায়। শুধুমাত্র অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রেই নয়, একই ভাবে স্বাভাবিক মৃত্যুতেও ভিন্ন সৎকার রীতি দেখতে পাই। গোন্দদের মধ্যে কেউ দুর্ঘটনা, প্রসবকালীন মৃত্যু, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদিতে মারা গেলে তাকে অস্বাভাবিক মৃত্যু রূপে গণ্য করা হয়। এভাবে মৃত্যু ঘটলে কবরদান করাই প্রথা। অবশ্য গোন্দদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হলে, মৃতদেহ দাহ করা হয়। সাঁওতালরা মৃতদেহ সাধারণত দাহ করে থাকে। তবে তাদের মৃতদেহ কবব দিতেও দেখা গেছে। মধ্য পশ্চিম ভারতের আর এক আদিবাসী গোষ্ঠী ভীলদের মধ্যে একই রকম রীতি দেখা যায়। কিছু কিছু আদিবাসী গোষ্ঠী পূর্বে কবব দিলেও, এখন দাহ করার রীতি গ্রহণ করছে এমনটি দেখা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, অন্ধ্রপ্রদেশের আদিবাসী গোষ্ঠী চেঞ্চুদের কথা উল্লেখ করা যায়। উত্তর-পূর্ব ভারতের আওনাগারা পূর্বে মৃতদেহ উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রাখত। এখন তারা মৃতদেহ দাহ করে। এছাড়া নাগাদের আরেক গোষ্ঠী কোনয়ক নাগা, ভেদ্দা, আন্দামানের কিছু আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় মৃতদেহকে উন্মুক্তস্থানে পরিত্যাগ করে যেতে।

মৃতদেহ দাহ করার মাধ্যমে সৎকারের রীতি প্রায় সারা ভারতবর্ষেই দেখা যায়। উত্তর ভারতে মূলত হিমালয় অঞ্চলে খারা, পারিয়াত প্রভৃতি আদিবাসীরা তাদের মৃতদেহ দাহ করে। উত্তর-পূর্ব ভারতে খাসীদের মধ্যে এই একই রীতি দেখতে পাই। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে পশ্চিম ভারতের ভীল, গোন্দদের মধ্যেও একই রীতিতে মৃতদেহ সৎকার করা হয়। দক্ষিণ ভারতে টোডাদের মৃতদেহ দাহ করা ঘিরে একটা বড়সড় সামাজিক জমায়েত দেখা যায়। এখানে কেবল মাত্র টোডা নয় পাশাপাশি বাদাগা, কোটা প্রভৃতি গোষ্ঠীর লোকজনও বাজনা-বাদ্যি নিয়ে উপস্থিত হয়। কুরুভি খারা, চেঞ্চু প্রভৃতি আদিবাসীরাও দাহ করে তাদের মৃত স্বজনদের। পূর্ব

ভারতে মুণ্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল, হো প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে মূলত মৃতদেহ দাহ করার রীতি প্রচলিত—যদিও মৃতদেহের কবর দেওয়া একেবারে অজানা নয়। উত্তর বা উত্তর পশ্চিম ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে মৃতদেহকে কবর দানের রীতি অধিক প্রচলিত বলে মনে হয়। আবার মৃতদেহকে উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রাখা বা পরিত্যাগ করার রীতি মূলত শিকারজীবী-সংগ্রাহক আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যেই দেখা যাচ্ছে। পূর্বে উল্লেখিত ভেদ্দা বা কোনয়ক নাগাই কেবল নয়, এর উদাহরণ আন্দামানের কয়েকটি আদিবাসী গোষ্ঠী, পূর্ব ভারতের সাউরিয়া পাহাড়িযাদেব মধ্যেও ছড়িয়ে রয়েছে।

সৎকার স্থান

কম বেশি সকল আদিবাসীদের মধ্যে সৎকাব স্থান নির্দিষ্ট। সাধারণভাবে এটি বসতি থেকে কিছুটা দূরে বাসস্থানেব প্রান্তসীমায় অবস্থিত। কিন্তু এখানেও কিছু অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়।

সাউবিয়া পাহাড়িয়াদের নিজস্ব কবব স্থান থাকলেও, মহামারীতে মৃতদেহগুলিকে তারা জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসে। কোনয়ক নাগাদেব একটি রীতি ছিল, গ্রামের রাস্তার প্রান্তে একটি উঁচু বাঁশের মাচা করে তাব উপর মৃতদেহটি রেখে দিত। কিছুদিন এভাবে রাখাব পর দেহটি কবরস্থ করা হত, আব তাব আগে এর মস্তকটিকে দেহ থেকে আলাদা কবে নেওয়া হত। এরপর এই মস্তকটিকে পাথরের পাত্রে (যাকে কুবি বলে) সংরক্ষণ করা হত। দক্ষিণ ভাবতের মল্লসারদের সৎকার স্থান বলতে উঁচু পাথব বা গাছকেই বলতে হয়। মৃতদেহটিকে ঘাস বা লতাপাতাব আবরণে ঢেকে সেটিকে গাছেব ডালে ঝুলিয়ে বাখার একটি প্রথা তাদেব মধ্যে দেখা যেত।

ওঁরাওদেব সৎকার স্থানকে বলে কুণ্ডি। ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের মানুষেব জন্য কুণ্ডিতে আলাদা আলাদা স্থান নির্দিষ্ট বয়েছে। মুণ্ডাদের সৎকাবভূমি—সাসান—তাদেব বসতি থেকে বেশ কিছুটা দূরে নির্জনস্থানে অবস্থিত।

একসময় মানুষ তার নিজ গৃহেব মধ্যে মৃতদেহ কবর দিত। প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বে এমন বহু নিদর্শন পাওযা যাচ্ছে। একটি প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করি :

"অন্ত্যেষ্টিকাবীবা অস্থিব উপর কাপড় পরিয়েছে বা জড়িয়েছে, পরলোকে ব্যবহারের জন্য নানা বস্তু দিযেছে সঙ্গে। পুরুষরা সর্বদা স্থান পেয়েছে উত্তর-পুব শয্যাবেদির নীচে, মেয়েরা ও সন্তানরা রান্নার জায়গার কাছে পুব দিকের বেদির তলায়. এর থেকেই মেলার্টের ধারণা যে জীবনকালে শযন ব্যবস্থা ওই রকম ছিল যে যার জায়গায় চিরনিদ্রায় শুয়েছে।"

এ প্রসঙ্গে আন্দামানীদের মধ্যে প্রচলিত সংস্কারের কথা বলি। সেখানে খুব বাচ্চা কেউ মারা গেলে তাকে বাড়ির উনুনের নীচে কবর দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, মৃত শিশুটির বাবা-মা ক'দিন সেই বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যায় না। তাদের বিশ্বাস এখান থেকে তাদের মৃত সন্তান আবার মাতৃগর্ভে প্রবেশ করবে। এখানে উনুনের উৎপাদনমুখী শক্তি ও নারীর সঙ্গে তার নৈকট্য উভয়ই প্রতীকী অর্থে বিশ্বাসের রূপ নিয়েছে।

সৎকার স্থানের কিছু বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সাধারণভাবে নির্জনতা একে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে থাকে। কোনো কোনো সময়ে এই নির্জন নিঃসঙ্গতাটিকে বাড়িয়ে দেয কবরস্থানের বড় বড় খাড়া পাথর।—আদিবাসীদের কিছু গোষ্ঠীব মধ্যে মৃতদেহের বা তার অস্থির উপর এই পাথর স্থাপনের

রীতি এখনও খুব প্রচলিত। এই পাথরগুলিকে বলে মেগালিথ। বাস্তাব, ছোটনাগপুর, ওড়িশার বিস্তৃত অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে এই বৃহৎ প্রস্তর স্মারকস্তম্ভ স্থাপনার রীতি দেখা যায়। মূলত একটি বড় পাথরকে কবরের উপরে খাড়াভাবে স্থাপন কবা হয়। এই ধরনের মেগালিথকে বলে মেনহির। বর্তমানে গ্রাম বাংলায় যে ইটের সমাধি মন্দির তৈবি করা হয, তার পূর্বসূরী কি এই মেনহির?

মেগালিথ স্থাপনার একটি কার্যকরী গুরুত্ব রয়েছে। মৃতদেহ কবর দিলে শ্বাপদরা অনেক সময় মাটি খুঁড়ে এই দেহগুলিকে বেব কবে ভক্ষণ করতে পারে; এ সম্ভাবনা হয়তো বা বাস্তব রূপে প্রাচীনকালের মানুষের সামনে এসেছিল। তাই ভারী পাথর যদি কববেব উপব চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে এভাবে মৃতদেহটি নষ্ট হওয়াব আশঙ্কা থাকে না।

পাথর ছাড়াও কাঠের খোদাই কবা স্মাবকস্তম্ভ স্থাপনার রীতি আদিবাসীদের মধ্যে দেখা যায়। বাস্তার অঞ্চলেই এবকম খোদিত কাঠের স্তম্ভ চোখে পড়ে। উত্তরপূর্ব ভাবতের নাগাদের মধ্যে কাঠেব স্মারক স্থাপনার প্রচলন বয়েছে। এইরূপ স্মারক স্থাপনার একটি উদ্দেশ্য মৃত পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন। সেই সঙ্গে মৃত পূর্বপুরুষের আত্মার শান্তি কামনা কবা হয়ে থাকে। এবিষয়ে একটি অন্যবকম বীতি দেখা যায় উডিষ্যাব সাওরা আদিবাসীদেব মধ্যে। তাদের বাড়ির মেয়েরা দেওয়ালে সুন্দর নকশা অঙ্কন করে—এর উদ্দেশ্য পূর্বপুরুষের আত্মার শান্তিলাভ।

শেষ শয্যার ভঙ্গি

প্রকৃতি সম্পর্কে আদিবাসীদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান যথেষ্ট। দিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তারা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। দিক নির্ণয় জরুরি এই জন্য যে শবদেহের শেষ শয্যায় মস্তক কোন দিকে থাকবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। আদিবাসীরা এই সব নিয়মকানুনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে। আদিবাসী ভেদে এই নিয়মগুলিও ভিন্ন ভিন্ন।

দক্ষিণ ভাবতের আদিবাসী চেঞ্চুরা মৃতের মস্তক দক্ষিণ-পশ্চিম দিক করে রাখে। কাদাররা আবার মস্তকটিকে রাখে দক্ষিণ দিক করে। মৃতের মস্তক পূর্বদিকে রাখার রীতি গোন্দদের মধ্যে পচলিত। উত্তবপর্ব ভারতের খাসীদের নিযম পশ্চিম দিকে মস্তক স্থাপনাব। ভীলরা রাখে উত্তরে দিকে। এখানে একটা কথা বলার, মৃতদেহেব মস্তক কোন অভিমুখে হবে, তার নির্ণয় আদিবাসীদেব বিশ্ববীক্ষণ, পরলোক সংক্রান্ত ধারণা ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত।

একই কথা বলা চলে, মৃতদেহের শেষ শয্যার দেহভঙ্গিমা কেমন হবে সে প্রসঙ্গে। উচ্চ পুরাপ্রস্তর যুগে অর্থাৎ প্লিস্টোসিন ইপকের শেষাশেষি গ্রিমালডি মানবের যে কঙ্কাল পাওয়া গেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে দেহগুলিকে একটি বিশেষ ভঙ্গিমায় হাঁটু ভাজ অবস্থায় কবর দেওয়া হয়েছে। আরও অনেক পরে নব্যপ্রস্তর যুগীয় চাটাল হয়ুকে যে মানব কঙ্কাল পাওয়া যায়, সেখানেও দেখা যাচ্ছে কোনো কোনো দেহ হাঁটু ভাজ করে পাশ ফেরা অবস্থায় শোয়ানো।

সাপ ধরাব দক্ষতার জন্য সুবিদিত ইরুলা আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষেরা মৃতদেহকে একটি বিশেষ ভঙ্গিমায় কবর দান করে। দেহটিকে বসানো অবস্থায় পা দুটি হাঁটু ভাঁজ করে কোনাকুনি রাখা হয়—এভাবেই তাদের কবরস্থ করা হয়ে থাকে। বসানো অবস্থায় কবরস্থ করার রীতি আরও কয়েকটি গোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায়। আন্দামানীরা তাদের মৃতদেহগুলির পা-হাত মুড়ে বুকের

উপর পাট করে দেয়। এভাবেই দেহটিকে মাদুরে মুড়ে কবর দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, মৃতদেহের মস্তক মুণ্ডন করে গায়ে সাদা ও লাল রঙের রেখা এঁকে দেয় তারা।

একটু আগেই বলছিলাম, মৃতদেহ কবর দেওয়াব রীতিব মধ্যে কোন গোষ্ঠীর বিশ্ববীক্ষণটিও ধরা পড়ে। এর পাশাপাশি আর একটা কথা বলা চলে, যে মৃত্যু-জন্ম, প্রভৃতি জীবনচক্রের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়গুলিতে মানুষ প্রকৃতির কাছাকাছি ফিরে যেতে চেষ্টা করে। সেলাই না-করা পোশাক পরা, সহজ পাচ্য সেদ্ধ খাদ্য গ্রহণ, ভূমি শয্যা, চুলে তেল না দেওয়া বেশি বেশি কবে 'প্রাকৃতিক' বিষয়গুলিতে তুলে ধবে। অর্থাৎ এর মধ্যে দিয়ে কৃত্রিমতাহীন একপ্রকাব সবল জীবনযাত্রার দিকে ফিরে যাওয়াব সময় যেন মৃত্যু পববর্তী অশৌচ কাল। হিন্দুদের মধ্যেই কেবল নয়, অশৌচকালীন সময়ে এভাবে আরও বেশি প্রকৃতিব কাছে ফিরে যাওয়ার একটা চেষ্টা কতকটা অসচেতন ভাবেই সংস্কারেব মধ্যে ঢুকে পড়ে। হাঁটু মুড়ে এই যে ভঙ্গিতে কবর-দেওযা তা যেন মাতৃগর্ভে থাকাকালীন দেহ ভঙ্গিমাটিকে স্মবণ কবায। মানুষের কল্পনায এটি যেন মানুষের স্বাভাবিক ভঙ্গি—যাওযা আব আসায় যার কোনো পরিবর্তন ঘটানো উচিত নয।

সৎকার ও স্বজন

জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু এই সমস্ত সময়ে যে সব সামাজিক আচাব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি পালন করা হয বিশিষ্ট সমাজ-বিজ্ঞানী ভ্যান গেনেপ তাকে বলেছেন, 'বাইট ডে প্যাসেজ'—জীবনচক্রেব বা জীবন সংকটের আচার। সকল সম্প্রদায়েই এই সময কিছু অবশ্য পালনীয় আচাব চোখে পড়ে। এই সব আচারগুলিতে আত্মীয স্বজনদের নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকে। আব এই ভূমিকা পালনেব মধ্য দিয়ে বিভিন্ন আত্মীয়দের পারস্পবিক অবস্থানগুলিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এইজন্য সৎকাররীতি সামাজিক দিক দিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সৎকারের সময় কয়েকটি বিষয লক্ষ্য বাখাব। যেমন, মৃতেব মুখাগ্নি কে কবছে, কেই বা প্রথম মাটি দিচ্ছে কবরে, কারা অশৌচ পালন করে, মৃতদেহেব শেষযাত্রায় সঙ্গী হচ্ছে কাবা এবং এখানে কোনো লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন আছে কিনা।

মৃতদেহের সৎকার বা মুখাগ্নি ইত্যাদি কাজ কর্মে কিছু বিশেষ আত্মীয়দের আলাদা নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকে। স্ত্রী, পুত্র, স্বামী এদের ভূমিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধান। কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন গোন্দদের মধ্যে মৃতেব ভায়বা ভায়ের আলাদা গুরুত্ব বয়েছে, কেননা সেই-ই চিতায প্রথম অগ্নি সংযোগ করে। মৃতেব বোনেব ছেলে বা জামাই-এর বিশেষ ভূমিকা থাকে সৎকার অনুষ্ঠানে। ভীলদের মধ্যে এপ্রসঙ্গে একটি প্রথার কথা স্মরণে আসে। সেখানে স্বামী মারা গেলে তার স্ত্রী সেই দেহের পাশে কিছুক্ষণ মৃতবৎ শুয়ে থাকে। আবাব স্ত্রী মারা গেলে স্বামীকেও এমনটি করতে দেখা যায়।

বযসের কাবণে কি সৎকার অনুষ্ঠানে ভূমিকার কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে?—আদিবাসী সমাজের কযেকটি উদাহবণ এর স্বপক্ষেই তথ্য জোগায়। যেমন কাদারদের মধ্যে দেখা যায়, মৃত্যুর পর একাদিক্রমে সাতদিন মৃতের উদ্দেশে কিছু খাদ্য অর্পণ কবা হয়। এই খাদ্যটি গ্রহণ করার একমাত্র অধিকারী হলেন পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য। ভীল আদিবাসী গোষ্ঠীর কেউ মারা গেলে তার মুখে কিছু খাবার দেওয়া হয়। এই খাদ্যটি অর্পণ করেন কোনো বয়স্ক পুরুষই।

এই ঘটনাগুলিতে বয়স্কদের গুরুত্বের কারণ কি প্রজন্মগত নৈকট্য। আত্মীয়তা সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রজন্মের এই গুরুত্ব আমরা সাঁওতালদের উদাহরণটি থেকে হয়তো কিছুটা বুঝতে পারব।

সাঁওতালদের ক্ষেত্রে মৃত পূর্বপুরুষদের (যাদের বলে হাপরামকো) উদ্দেশে বিভিন্ন ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠানে হাঁড়িয়া ও অন্যান্য খাদ্যবস্তু (যেমন, মাংসের পিঠে—যাকে বলে জেল পিঠা ইত্যাদি) নিবেদনের রীতি আছে। সাধারণভাবে পরিবারের কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ সদস্যই এই নিবেদনটি করে থাকেন। এখানে যে বিষয়টি লক্ষ করবার তা হল আত্মীয়তা সম্পর্কের বিস্তৃতিটি ঘটছে মৃত পূর্বপুরুষদের প্রজন্মেও। এবং সেখানে সেই পূর্বপুরুষদের চেয়ে কিছু কম বয়সী কোনো জীবিত বয়োপ্রবীণ ব্যক্তি যোগসূত্রের কাজ করছেন।

সাধারণভাবে মহিলাদের শ্মশানভূমিতে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো কোনো সমাজে বিধিনিষেধ লক্ষ করা যায়। কিন্তু ওঁরাওদের মধ্যে পূর্বে প্রথা ছিল যে মহিলারাই মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাবে। এখন অবশ্য সকলেই যায়।

গোত্রের সদস্যদের অংশগ্রহণের বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়, সংকারকালীন বা তার পরবর্তী সময়ে প্রদত্ত ভোজসভায় উপস্থিতির দ্বারা। এক্ষেত্রে ভীল, গোন্দ, খাসী, নাগা, টোডা ইত্যাদি প্রত্যেক আদিবাসীর মধ্যে একই চিত্র। আওনাগাদের মধ্যে আবার একটি অদ্ভুত সংস্কার দেখা যায়। মৃত্যু পথযাত্রী কোনো ব্যক্তির কাছে তার আত্মীয়রা জোরে জোরে চিৎকার করে, লাফায়, হাত পা ছোড়ে। তাদের বিশ্বাস এর ফলে অশুভ আত্মা দূরে চলে যাবে এবং শুভ আত্মার কল্যাণে মৃতপ্রায় ব্যক্তি জাগ্রত থাকবে। এমনকী অবশেষে সে সুস্থ হয়ে উঠবে।

যে কোনো ভাবেই সৎকার হোক না কেন, আদিবাসীদের কাছে সেটি আবশ্যিকভাবে একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। পারতপক্ষে নির্দিষ্ট গোষ্ঠী, গোত্র বা সম্প্রদায়ের ভূমিকা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত মুখাগ্নির কাজটি মৃতের নিকট আত্মীয়রাই করে থাকে। খাসীদের মধ্যে দেখা যায়, প্রথম অগ্নিদান করে মৃতের নিজ গোত্রের লোকেরা। ওঁরাও, আওনাগা প্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যে প্রত্যেক গোত্রের আলাদা আলাদা সৎকার স্থান আছে।

অবয়ববাদী ব্যাখ্যায় দৈনন্দিন চলমান সমাজ জীবন থেকে এক ধরনের 'দূরত্ব' মৃত্যু অবস্থাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করে। নানাবিধ আচার পালনের মধ্যে দিয়ে এই 'দূরত্ব' ঘোচানো হয়। আমাদের চোখের সামনে খুব পরিচিত উদাহরণ হল, উপনয়নের সময় সূর্যের আলো না দেখে বন্দি-গৃহ যাপন। এমনই একটি প্রথার কথা টার্নার উল্লেখ করেছেন বান্টুদের মধ্যে। ছুন্নৎ করার পর বেশ দীর্ঘ সময় তাদের বাদবাকি সমাজের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে আলাদা বাস করতে হয়। অতঃপর নির্দিষ্ট সময় পার হলে তাদের প্রাপ্তবয়স্ক রূপে নবজন্ম ঘটে। আদিবাসী সমাজে মৃত্যুর মেটাফোর বহুল ব্যবহৃত। টার্নার লিখছেন—

"... we have metaphorical death in tribal rituals, parallel perhaps with "mystical death" in the salvation religions of complex societies, and metaphorical rebirth homologous to "spiritual regeneration." "

মৃত্যুকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা, বলা যায়, ক্রমশ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর চিন্তন স্তরকে

করেছে। যার প্রকাশ আমরা তাদের সমাজবীক্ষণের মধ্যেও কিছুটা দেখতে পাই। কিন্তু সে আরেক আলোচনা। অন্য কোনো পরিসরে তা করা যাবে।
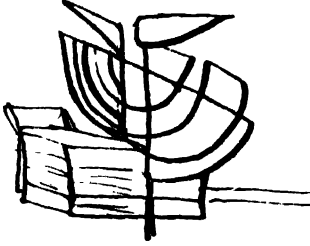
সহায়ক গ্রন্থ তালিকা

Archer, W.G., 'Ao Nagas' Man in India 28(3), 1948.

বসু, শচীন্দ্রনাথ, সভ্যতার আগে।

Bhowmik, K.L., *Tribal India*, 1986.

Biswas, P.C. *Santals of the Santal Parganas*, 1956

Datta-Majumder, N., The Santal–*A study in culture-change*, 1956

Ehrenfel, V.R V., *The Kadars of Cochin* ,1952

Elwin, V., *The Religion of an Indian Tribe*, 1955

Grierson, W.V. ,*The Maria Gonds of Bastar*, 1938.

Haimendorf, C.V.F., The Chenchus–*Jungle Folk of Deccan*, 1943

Mills, J P., *The Ao Nagas*, 1926.

Mukherjee, C , *The Santals*, 1959

Naik, T.B., The Bhills –*A study*, 1956

Radcliffe-Brown, A.R , *The Andaman Islanders*, 1922.

Risley, H.H., *Tribes and castes of Bengal* , 1891

The People of India, 1908

Rivers, W.H.R. ,*The Todas*, 1906

Roy, S.C., *The Oraons of Chotonagpur*, 1915

Oraon Religion and Customs, 1928

Russel, R.V. and Hiralal, *The Tribes and Castes of the central Provinces of India*, 1916

Thurston, E., *Castes and Tribes of Southern India*, 1906

Turner, Victor, *Process, Performance and Pilgrimage*.

□ লেখক পরিচিতি : গবেষক ও প্রাবন্ধিক

বাংলার আদিম জনজাতিগুলির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

উপাসক সেন

আমাদের দেশের আদিম জনজাতিগুলিই আমাদের পূর্বপুরুষ। তাদের জন্ম-মৃত্যুর নানান সংস্কারই বাঙালি সংস্কৃতির বনিয়াদ। কালক্রমে নানান কৌশলে, ও উদ্দেশ্য সাধনে তার পরিবর্তন ঘটেছে। পুরোহিত তন্ত্র, ও রাজতন্ত্রের সম্মিলিত চক্রান্তে এক শ্রেণীর পণ্ডিতদের সাহচর্যে বিভাজিত সমাজে স্তর বিন্যাস ঘটেছে। ক্ষমতাসীনরা নিজেদের সুযোগ সুবিধা বজায় রেখে অন্যদের বেলায় কঠিন কঠোর বিধান দিয়েছেন। ফলে সমস্যা বেড়েছে বহুতর। আমরা সংক্ষেপে কতিপয় আদিম জাতির, অন্ত্যেষ্টি, মৃত্যু পরবর্তী লোকভাবনার অন্বেষণ করব। অবশ্য তার আগে একটি কথা বলে নেওয়া ভালো এইসব আদিম জনজাতিসমূহের নানান লোকাচারের সঙ্গে বর্ণহিন্দুদের নানান লোকাচারের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। তাই বোধহয় ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন—"এ তথ্য সর্বজন স্বীকৃত যে, আর্য-ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ধর্ম-কর্ম, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি সংক্রান্ত বিশ্বাস সংস্কার আচারানুষ্ঠান, নানা দেবদেবীর রূপ ও কল্পনা আহার বিহারের ছোঁয়াছুয়ি অনেক কিছুই আমরা সেই আদিবাসীদের নিকট হইতেই আত্মসাৎ করিয়াছি। বিশেষভাবে হিন্দুর জন্মান্তরবাদ, পরলোক সম্বন্ধে ধারণা, প্রেততত্ত্ব, পিতৃতর্পণ, পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধাদি সংক্রান্ত অনেক অনুষ্ঠান আভ্যুদয়িক ইত্যাদি সমস্তই আমাদের প্রতিবাসীর এবং আমাদের অনেকেরই রক্তস্রোতে বহমান সেই আদিবাসী রক্তের দান।" (বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব)

পাশাপাশি বোধহয় একথাটাও বলে নেওয়া ভালো আদিম জনজাতির মানুষ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী কিছু লোকাচার নিজের আচার-অনুষ্ঠানে সংযুক্ত করেছে। আর্য সংস্কার গ্রহণ করেছে আধুনিক হওয়ার অভিলাষে। যা হোক আদিম জনজাতির নিজেদের মৃত্যু পরবর্তী লোকাচারের মধ্যে অনেক মিল ও অমিল আছে। সাদৃশ্যগুলো এখানে তেমনভাবে উল্লেখ করছি না পুনরুক্তির দোষ ঘটে যাবে বলে। বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য বৈসাদৃশ্যগুলিই মূল লক্ষ্য।

১. সাঁওতাল

এই সম্প্রদায়ের কারো মৃত্যু ঘটলে প্রথমে মাঝি ও পরামানিককে খবর পাঠানো হয়। গ্রামের সব মানুষকে খবর পাঠানো হয় একজন সংবাদ প্রেরকের মাধ্যমে তার নাম গোড়েৎ। প্রত্যেক পরিবার থেকে অন্তত একজন একটি করে কুড়ুল নিয়ে মৃতের গৃহে সমবেত হয়। মৃতের বাড়ির মেয়েরা একটি পাত্রে বাটা হলুদ, ভাজা খই ও কাপাস তুলোর বীজ, চালের খড় ও মুরগি সাজিয়ে রাখে। এরা পরলোকে বিশ্বাস করে তাই মৃতের ব্যবহার্য সমস্ত জিনিস শবের খাটিয়ায় দিয়ে দেবে। পরলোকে এই মৃতের যাতে জীবন কাটাতে কোনো অসুবিধায়

না পড়তে হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু দেওয়া হয়। চারজন শববাহক মৃত ও তার খাটিয়া ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথমে উঠোনে নামায় পরে তিন বা চার মাথার মোড়ে নামিয়ে প্রিয়জনরা তেল-হলুদ মাখায়, কাপাস বীজ ও খই খাট বা চালার চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়। একটি মুরগি দেহে তিনবার বুলিয়ে দেয় ওঝা স্বয়ং। বিশ্বাস যে এই মুরগি মৃতের শরীরের সব যন্ত্রণা-দুঃখ-কষ্ট, রোগ ব্যাধি টেনে নেবে। আর খই ও কাপাস বীজ হল খাদ্য ও বস্ত্রের প্রতীক। তিন বা চার মাথার মোড় মানে মুক্তপথ। আত্মা যেদিকে খুশি যেতে পারে।

এরপর শ্মশানে গমন। এই শ্মশান মৃতের পরিবারের সম্পত্তি হতে পারে বা বারোয়ারি সম্পত্তি যেমন খালপাড় বা বড় দিঘির পাড়। সেখানে মৃতকে নামিয়ে তেল-হলুদ মাখানোর ব্যবস্থা হয়। নতুন বস্ত্রে মৃতদেহ ঢাকা থাকে। উত্তর-দক্ষিণে চিতা সাজানো হয়। একটি মুরগি-বাচ্চা বলি দেওয়া হয়। লোক বিশ্বাস—সে আত্মাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে। সাধারণত বড়ছেলে মুখাগ্নি করে। দাহ সমাপ্ত হলে পুকুর বা নদী-দিঘিতে স্নান সেরে বাড়িতে ফেরে।

মৃত্যুর পাঁচদিন পরে 'তেলনাহান' বা ক্ষুদ্র শ্রাদ্ধ করা হয়। সেদিন তিন বা চার মাথার মোড়ে গিয়ে আচার অনুষ্ঠান করা হয়। বাড়ি ফিরে জ্যেষ্ঠ দেবতা মারাংবুরু ও পরলোক গত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে হাঁড়িয়া মদ ও মুরগি উৎসর্গ করা হয়। এদিন কামানো হয়। সবাই চুল নখ-দাড়ি কাটে। ১০ দিনের মাথায় পূর্ণশ্রাদ্ধ বা ভাণ্ডান অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দুদের কাছে যেমন গঙ্গা পবিত্র নদী তেমনি সাঁওতাল সমাজের কাছে দামদাক>দামুন্দা>দামোদর পবিত্র নদ। এর তীরে পিণ্ডদান, এর জলে অস্থি নিক্ষেপ পবিত্র কর্ম বিবেচিত হয়।

২. মুন্ডা

এরা মনে করে মানুষ মারা গেলে স্বর্গবাসী হয়। শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় এক ধরনের গান গাওয়া হয় যার নাম 'সবদ-গীত'। যার মর্মার্থ হচ্ছে—মরলে কেউ সঙ্গে যাবে না। বৌ প্রথম রাতটুকু মাত্র শোক করে, বোন ছয় মাস, ভাই চোখের জলে বস্ত্র ভেজায়, মা জনমভর কাঁদে। মৃত ব্যক্তি মরণের পর যেহেতু পর ঘরের দেবতা হয়ে যায় তাই তাকে গৃহে আনতে পাহানদের দ্বারস্থ হতে হয়। এরা মূলত কবর দেয়। কোথাও দাহ করা হলে অস্থি ও চিতাভস্ম শ্মশানে একত্রে সমাধিস্থ করে তার উপর পাথর চাপা দেওয়া হয়—যার নাম 'শ্মশান দিরি' বা শ্মশান পাথর।

মৃত্যুর পর ছেলেরা তিন দিন নিরামিষ খায়। তেল নুন খায় না। তেরোদিনের মাথায় শ্রাদ্ধ করা হয়। মস্তক মুণ্ডন করাও এদের প্রথা। মুন্ডা জাতি কোনো গ্রামে বাস করত কিনা কিংবা বর্তমানে করে কিনা তা শ্মশান পাথর দেখে সহজে বোঝা যায়।

৩. ওঁরাও

এই সম্প্রদায়ের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের অনেক কিছুই বর্ণহিন্দুদের মতো। এই সম্প্রদায়ের কেউ মারা গেলে দাহ বা কবর দেওয়া দুই-ই হয়। মৃতা সধবা হলে কপালে সিঁদুর পরানো হয়।

যে ঘরে মৃত্যু হয়েছে সেখানে একটি কুলোর উপর ছাই রাখা হয়। দাহশেষে ফিরে এসে বন্ধ ঘরের দরজা খুলে দেখা হয় সেই ছাইয়ের উপরে মানুষ, বিড়াল কিংবা সাপেব ছাপ পড়েছে কিনা, যদি পড়ে তবে বুঝতে হবে এটা অকাল মৃত্যু আব যদি না পড়ে তবে তা স্বাভাবিক মৃত্যু।

কবরস্থ করার আগে মৃতকে স্নান করানো হয়। কবব দেওয়া হয় বাস্তুব এক কোণে বা কবর স্থানে। দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে মৃতের কবর দেওয়া হয়। দাহ করার সময় পরিজনবা তিনবার প্রদক্ষিণ করে, জ্যেষ্ঠ কেউ মুখাগ্নি করে।

অশৌচ পালনও হিন্দুদের মতো। তবে দশ দিনে শ্রাদ্ধ করা হয়। অতিথি আপ্যায়ন করা হয়—হাঁড়িয়া মদ দিয়ে। শ্রাদ্ধের দিন খড়-মাটি আর পাঁচটি কড়ি দিয়ে মৃতের কুশপুতুল তৈরি করা হয়। তারপর কুশপুতুলকে বাঁশের মাচা বা খাটিয়ায় করে বহন করে কবরস্থান বা শ্মশানে আনা হয়। চারদিকে ৪টি আমডাল পোঁতা হয় এবং সাদা সুতো দিয়ে তিন পোঁচ ঘেরা হয়। এরপর কুশপুতুলে আগুন দেওযা হয়। মৃতের সন্তানাদি মস্তক মুণ্ডন করে একটি টিকি রাখে। শ্মশানযাত্রীরা নাপিতের কাছে খেউরি হয। শ্মশান থেকে মৃতেব ঘবে ফিরে—হলুদ, সর্ষেতেল, দূর্বা, তামা, তুলসীপাতা, দুধ প্রভৃতিব মিশ্রণ গায়ে মাথায় মাখে।

এরপবে একটা ধর্মানুষ্ঠান হয় যাকে বলে 'ভাণ্ডা কাটা। যেটি পরিচালনা করে ওঝা বা রাঁচি থেকে আগত পুরোহিত। সাদরি ভাষায় লেখা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা হয়। ওঝার সঙ্গে সহযোগী বা বৈষ্ণব থাকে। তারা উঠোনে উনুন তৈরি করে—একে একে খই ভাজে, রুটি ও পিঠে তৈরি করে। মাসকলাই, সিদ্ধ চাউল ও ঝামা ভর্তি একটি ঘটের গায়ে পিঠের মালা ঝোলানো হয়। একটি মুরগি কেটে তার নখ, জিভ, ঠোঁট মিশিয়ে বানানো খিচুড়ি ও তামার পয়সা ও মদ উপস্থিত সকলে অল্প অল্প করে ঘটে দেয়। এবারে রুটি দিয়ে ঘটের মুখ বন্ধ করে শ্মশানে আসে। পূর্ব প্রোথিত আমডাল তুলে ফেলে তার গর্তে খই ঢালা হয়। এরপর একজন চিতাভস্ম থেকে কড়ি পাচটি তুলে নেয়। দ্বিতীয় জন জল দিয়ে ধোয় তৃতীয় কেউ সেই কড়িতে চুম্বন করে কলসির মধ্যে ফেলে দেয়।

এর পরে হয় কুণ্ড উদ্ধার অনুষ্ঠান। কলসি সহ একটা জলাশয়ের ধারে গিয়ে মুরগি বলি দেওয়া হয়। তারপর মুরগি ও কলসি তামা তুলসী, গোবর ছুঁয়ে নিজেদের পবিত্র করে নেয়। ঠিক সন্ধের আগে দুই-তিন জন আত্মীয় কুশপুতুল দাহস্থানে এসে একটি কুঁড়েঘর বানায়। তারপর প্রদীপ জ্বলিয়ে ওই ঘরে আগুন লাগিয়ে পূর্বপুরুষগণের নামে একটি মুরগি উৎসর্গ করে ছেড়ে দেয়। পরদিন সকালে তাকে ধরে এনে বলি দেওয়া হয় ও চাল ডাল দিয়ে খিচুড়ি বানিয়ে পাঁচজন আইবুড়ো ওঁরাও যুবককে খাওয়ানো হয়। এরপর তামা-তুলসী, দূর্বা, হলুদ ও দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য মিশ্রিত ডাল মৃতের গৃহে ছিটিয়ে গৃহশুদ্ধি করা হয়।

৪. শবর

শবররা মৃতদেহ দাহ করে না—কবর দেয়। এরা খাটিয়ার উল্টো পিঠে করে শুইয়ে মৃতদেহ জঙ্গলে নিয়ে যায়। স্থায়ী কবরস্থান দেখা যায় না। কবরে মৃতের ব্যবহার্য সমস্ত জিনিসপত্র

দিয়ে দেওয়া হয়। কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি ছোঁয়াচে রোগ হলে মৃতদেহ কবরে না দিয়ে জঙ্গলে ফেলে রেখে আসে। চার বছরের অনধিক বয়স্ক শিশুর মৃতদেহ কোলে করে নিয়ে যাওয়া হয় কবর দেবার জন্য।

এরা এগারো দিন ধরে অশৌচ পালন করে। এগারো দিন পূর্ণ হলে চুল, দাড়ি, নখ কেটে, স্নান সেরে শুদ্ধ হয়। ঘর-দোর গোবর দিয়ে সাফ করে। নতুন বস্ত্র পরে। নতুন হাঁড়িতে রান্না করে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মাছ, মাংস খাওয়ায়।

৫. হো

হো সমাজ মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। তাই এদের সমাজের নারীরা মৃতদেহ সৎকারে অংশ নেয়। মৃতকে তেল হলুদ মাখিয়ে শ্মশানে বা ডিকবিতে নিয়ে যাওয়া হয়। নারীরাও শববাহকের ভূমিকা পালন করে। সাধারণত মৃতদেহ দাহ করার পর তার ছাই এনে পাথর চাপা দেওয়া হয়। কোথাও আবার অস্থি একটি মাটির হাঁড়িতে করে নিজস্ব শ্মশানে পুঁতে দেয়। একে বলে 'জাঙ তোপা'। আবার অপঘাতে মৃত্যু হলে মৃতকে কবর দেওয়া হয়। শিশুদেরও সমাহিত করা হয়। এদের এক একটি অংশ এক একটি 'কিলি' বা সম্প্রদায়ের। এদের অস্থি ও ছাইয়ের কবরের উপর যে লম্বা পাথর পোঁতা হয় সেখানে মৃতের নাম ও স্মৃতি লেখা হয়। এগুলিকে প্রস্তর স্তম্ভ বা প্রস্তর টেবিল্ (dolmen) বলে। খাড়া উঁচু পাথরকে বলে মেনহি, এবং ডলমেন—চারটে বা দুটো পাথরের উপর একটি প্রস্তর খণ্ড। স্তম্ভাকৃতি পাথরকে বলা হয় নিশান। এগারো দিন অশৌচ পালনান্তে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বা পারলৌকিক ক্রিয়া করে থাকে। চুল, দাড়ি, নখ কেটে স্নান করে শুদ্ধ হয়। বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মৃত্যু আবার সমাপ্ত হলে তারা পূর্বপুরুষদের আমন্ত্রণ জানায়—যেন তাদের নির্মিত বেদি বা আদিং-এ তারা এসে উপস্থিত হন।

৬. বীরহোড়

এই সম্প্রদায়ের কারো মৃত্যু হলে সারা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। গড়াৎ সারা গ্রামের লোককে খবর পাঠায়। সকলে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য মৃতের গৃহে উপস্থিত হয়। প্রথম কাঠের টুকরো আড়াআড়ি ও পাশাপাশি বেঁধে মইয়ের মতো তৈরি করা হয়। এরা মৃতকে তার উপরে শুইয়ে সাদা কাপড় ঢাকা দেওয়া হয়। চারজন লোক মৃতদেহ বহন করে সমাধি স্থলে বা ঝর্ণার ধারে নিয়ে যায়। গর্ত খুঁড়ে তিনবার গর্ত প্রদক্ষিণ করে মৃতদেহকে উত্তর শিয়রি শুইয়ে শবযাত্রীরা সমবেত ভাবে বলে—

'আমা নেডে গ চেনাম
আমা গ নেডে গ তাহেন
মি, চিরকি ভিরকি বাং আ।'

এব অর্থ—'এখানেই তোমার মাটি ছিল। তুমি এখানেই থাক। আমাদের যেন কোনো বিঘ্ন কোরো না।'

অরণ্যবাসী বীরহোড়রা কেন দাহ না করে কবর দেয়? এর পশ্চাতে একটি উপকথা আছে। "অতীতে কোনো এক সময় শিকারে গিয়ে শিকার মিলেছিল প্রচুর হরিণ, বন্য শূকর, খরগোশ। দলে ছিলেন একজন বৃদ্ধ। শিকার শেষে মাংস পুড়িয়ে সকলে আহার সংগ্রহে ব্যস্ত। এই সময় বৃদ্ধ মারা যান। এই মাত্র তাঁরা মৃত পশুর মাংস পুড়িয়েছে, হায়! তাদেরকে নিজেদেরই দলবদ্ধ একজন প্রবীণ ব্যক্তিকে দাহ করতে হবে এই দুঃখে তারা ভেঙে পড়েন। নিজেদের মধ্যে আলোচনার পর মৃতদেহটিকে কবর দেন। সেই থেকে মৃতদেহকে কবর দেওয়া হয়ে আসছে।" (রঞ্জিত কুমার / আমাদের প্রতিবেশী বীরহোড়) বীরহোড়রা অদৃষ্টে বিশ্বাসী। তারা মনে করে আত্মার বিনাশ নেই।

দশদিন ধরে অশৌচ পালন করে। দশম দিনের মাথায় দিনের বেলায় ক্ষৌরকর্ম সমাধা করে ও রাত্রে ভোজসভা হয়। প্রথমে তিনটি শালপাতার তৈরি চারটি পাতরি বা পাতাতে ভাত ও হাঁড়িয়া মদ—চারজন লোক নিয়ে গিয়ে মৃতের উদ্দেশে নিবেদন করে আসে। এরপর গ্রামের সবাইকে ভোজসভায় খাওয়ায়। তবে শিশু মৃত্যুর ক্ষেত্রে ভোজ বা দশদিনের পালন নেই। এরা মনে করে পূর্বপুরুষরা সর্বদা মঙ্গল করেন। তাই মৃতকে পূর্বপুরুষের বেদিতে আগমনের প্রার্থনা জানানো হয়। সারা বছর নানান অনুষ্ঠানের সময় তাদের উদ্দেশে খাদ্যপানীয় উৎসর্গ করা হয়। এর একটাই কারণ পরলোকে যাতে খাদ্যাভাব না ঘটে।

৭. চাকমা

এই সম্প্রদায়ের কেউ মারা গেলে মৃতকে সাদা কাপড়ে জড়িয়ে বাড়ির বাইরের ঘরে শায়িত রাখা হয়। মাথার কাছে প্রদীপ জ্বালানো থাকে। কাপড়ের উপর খই, ফুল ও ফুলের মালা রাখা হয়। আত্মীয়স্বজন দর্শন করতে আসে এবং বুকের উপর টাকা রেখে যায় যাকে বলে 'বুগর টাকা'। এরপর বৌদ্ধ ভিক্ষু এসে কিছু লোকাচার করেন। মৃতের দেহে ঔষধ মাখানো হয়। যদি গৃহকর্তা ইচ্ছে করেন তবে বিশেষ বাক্সে করে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থাও করা হয়।

মৃতদেহ বাড়িতে যতদিন থাকবে ততদিন পালন। তবে সাধারণত বেশিদিন রাখা হয় না। একের অধিক দিন রাখলে বিশেষ বাদ্য বাজানো হয়, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, ঢোল বাঁশি বাজানো হয়।

মৃতকে বাঁশের চাটাইয়ের উপর রেখে অলং-এ শোয়ানো হয়। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় দরজার লাল সুতো ছিঁড়ে দেওয়া হয়। বাজনা বাজিয়ে, খই ছড়িয়ে রঙিন কাপড়ে সাজানো চাঙ্গি করে—শ্মশানের পথে যাওয়া হয়। বুদ্ধের নাম স্মরণ করা হয়।

শব পুরুষ হলে মাথা পূর্বদিকে ও নারীর পশ্চিম দিকে করে শব শোয়ানোর রীতি। শ্মশানে গিয়ে গৃহ থেকে রান্না করা ভাত মৃতের মুখে স্পর্শ করানো হয়। এরপর চিতায় আগুন দেওয়া হয়। সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করে জ্যেষ্ঠপুত্র মুখাগ্নি করে। পরে অন্যান্যরা আগুন দেয়।

পরদিন ভোরবেলায় শ্মশানে গিয়ে আত্মীয়স্বজন ছাই অস্থি একটি নতুন হাঁড়িতে ভরে নদীতে ভাসায়। একে বলে হাড় বা অস্থি বিসর্জন। এরপর সকালে স্নান করে শুদ্ধ হয়।

সাতদিনের মাথায় এরা ভোজসভা বসায়। ভিক্ষু, আত্মীয়, শ্মশানযাত্রী সবাই নিমন্ত্রিত হয়। চাকমারা মনে করে আত্মার বিনাশ নেই।

৮. অন্যান্য জনজাতি

সংক্ষেপে অন্যান্য আদিম জনজাতির অন্ত্যেষ্টির পরিচয় দেওয়া যাক। প্রথমেই বলা যায় রাভাদের কথা। এদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। মেয়েরাই শ্রাদ্ধের যোগ্য অধিকারিণী। এরা দাহ করে। ১১ দিন ধরে অশৌচ পালন করে। রাভাদেহ পুরোহিত—দেউলি পারলৌকিক আচার পরিচালনা করে। আবার কোড়া সম্প্রদায় বর্ণহিন্দুদের মতই আচার পালন করে থাকে। মানে দাহ করে। কবরও দেয়। দশদিন ধরে অশৌচ পালন করে। ক্ষৌরক্রিয়া আছে। শ্রাদ্ধ পরিচালনা করে সম্প্রদায়ের পরামানিক বা পুরোহিত। এরা পিতৃতান্ত্রিক। বেদিয়া সম্প্রদায়ও দাহ করে বা কবর দেয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র মুখাগ্নি করে। অস্থি সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে। দশদিনের পালন। ১১ দিনে শ্রাদ্ধ ও আত্মীয়স্বজন ভোজন। ব্রাহ্মণ্য আচারের প্রভাব পড়েছে এদের সংস্কৃতিতে। এদের সংস্কার প্রায় বর্ণহিন্দুর মতো। অস্থি ও ছাই সংগ্রহ করে নিজস্ব শ্মশানে সমাধি ও স্মৃতিস্তম্ভ করার রীতি আছে। তিনদিন তেতো খাওযা বা তেরাত্রি পালন, ১০ দিনে ক্ষৌরকার্য এবং ১২ দিনে শ্রাদ্ধ ও ভোজন। শ্রাদ্ধ পরিচালনা করে পুরোহিত। এইভাবে নানান উপজাতির কথা বলা যায়। কাবো উপরে হয়তো ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বেশি, কারও কম। হিন্দু শ্রাদ্ধ রীতিও গ্রহণ করেছে। তবে বেশির ভাগের শ্রাদ্ধশান্তি ১০ দিনে মিটে যায়। তবে কোনো সম্প্রদায়ই গর্ভাবস্থায় মৃত নারীকে কবরস্থ করে না। পেট চিরে মৃত সন্তানকে বাইরে নিয়ে আসে, তারপর কবর দেয়। সংক্রামক রোগে মৃতকে দাহ না করে গভীর জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসে।

❑ লেখক পরিচিতি--গবেষক, প্রাবন্ধিক।

প্রসঙ্গ ঃ মৃত্যু

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্যু একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মৃত্যু প্রসঙ্গে আলোচনার সময় সামাজিক আচার, আচরণ, রীতি, লোকবিশ্বাস-এর কথা এসে যায়। সামাজিক ব্যবস্থা হল ধর্মীয় ও পরম্পরা চলে আসা নিষেধাজ্ঞা মানা।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'জন্ম হইতে মৃত্যুর দিকে গতি— এরূপ বিচরণকেই সংস্কৃতে বলা হয় "সংসার"; আক্ষরিক অর্থে বলা হয়—জন্ম-মরণচক্র।...'[১]

তিনি আরও বলেছেন, 'দন্তহীন শিশু "হামাগুড়ি" দিতে দিতে পৃথিবীতে আসে, এবং বৃদ্ধও "হামাগুড়ি" দিতে দিতে দন্তবিহীন অবস্থায় পৃথিবী হইতে চলিয়া যায়। ..'[১]

মৃত্যু, শোক, শ্মশান, কবর প্রভৃতি নিয়ে ছড়া, ধাঁধা, গান, লোককাহিনী প্রভৃতি অনেকের মুখে শোনা যায়। আনিসুজ্জামান লিখেছেন, 'কয়েকজন পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হয়ে তিনি পাঁচটি কবিতা লেখেন, সেগুলো "শোকানল" নামে সংগৃহীত হয়। ... প্রথমা পত্নীর উদ্দেশে তিনি বলেছেন :

> "অকালে কোথায় গিয়া করিতেছ বাস,
> কহ ত্বরা করি যাই তব পাশ।
> মনে যত উপজয়
> হৃদয় বিদীর্ণ হয়
> নবম বর্ষীয়া তুমি বালিকা যখন,
> তব সনে হয় মোর বিবাহ-বন্ধন,"
>
> দ্বিতীয় পত্নীর পিতাকে সম্বোধন করে বলেছেন :
>
> "কেমনে ভুলিব পিতঃ ভুলিতে না পারি,
> তব মুখখানি আমি অনুক্ষণ স্মরি।
> পক্‌দাড়ী সুবদন,
> সুসুন্দর ও গঠন,
> হেরিতে বাসনা সদা বলিব কি হায়,
> এই ছিলে অকস্মাৎ লুকালে কোথায়?"'[২]

মৃত্যুতে অবজ্ঞা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেও গান রচিত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত একটি গান এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় :

> 'মিন্‌সে যদি মারা যায়,
> ভাবছি তাই,
> মনের মতন মানুষ পাওয়া হবে দায়।।
> একটু যেমন বয়স হয়েছে,

সে তেমন থাকে না কাছে,
নেশার ঝোঁকে আন্‌মনে আছে,
খিটখিটে নয়, হেসে কথা কয়,
মনের মতন হয়ে সদা রয়—
প্যান্‌পেনে, নয় জড়ানে,
ফিরে না সে পায় পায়।'[৫]

মৃত্যুর দেবতা যম নিয়েও রচিত হয়েছে অনেক ছড়া, গান, প্রবাদ প্রভৃতি। সেকালের একটি গান এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হল :

'যমের বাড়ি নাই কোনও পাঁজি,
তার নাইকো দিন বাছাবাছি।
সেতো মানে নারে বারবেলা, দিকশূল,
গ্রহগুলো রাজ্য হতে তাড়িয়েছে বিল্‌কুল,
অমাবস্যা, ত্র্যহস্পর্শ, কিছুতেই নয় গররাজি।
মাসদগ্ধ, কি ভরণী, পাপ যোগ,
সে কি দেখে কতক্ষণ কাব আছে শনির ভোগ?
সটান টিকি ধবে টেনে নে যায়,
কিসের টিক্‌টিকি হাঁচি?
ভাবছে কান্ত ক'দিন থেকে তাই,
সে ষণ্ডামার্কা কখন এসে ধববে ঠিক ত' নাই।
এখনও কি বইচি ভুলে হরিনাম
রে মন পাজী।।'

আর একটি গানে বলা হয়েছে সংসাবে মায়া এবং পঞ্চভূতের কথা। গানেব কিছু অংশ হল এই :

''ভবেব খেলায় মন মেতেছে,
মিছে কেন আব থামে না।
সব ফুরালে দেখ্‌বে সবে,
এমন দিন ত আর পাবে না।।
পঞ্চভূতের মিলন, এলে গর্ভেতে যখন,
পাঁচকে নিয়ে বৃথা কষ্ট পেতেছে এখন,
আবার বিয়োগকালে ছাড়বে সবাই,
রাখতে কিন্তু পারবে না।।
এই ভবের বন্ধনে, হলে কাতর এ প্রাণে,
মায়ায় মোহিত হয়ে ভ্রান্ত হয়েছ জেনে.

একবার বদন ভরে 'বল হরি
ছাড় বিষয় বাসনা।'[৮]

শ্মশানভূমি নিয়ে সেকালের একটি গানে বলা হয়েছে, এখানে সব একাকার। গানের কিছু অংশ হল এই :

কে বলে শ্মশানভূমি, অতিশয় ভয়ঙ্কর।
জুড়াতে জীবন কোথা, আছে হেন স্থান আর।।
কি তাপী পাপী সকল, কি বলী কিম্বা দুর্বল,
ভীরু কি সৈন্যের দল, বিশ্রামস্থল সবার।।
দারিদ্র দুঃশীল লম্পট, ধনী মানী জ্ঞানীগণ,
দুর্বৃত্ত দৈত্য কি নট, বণিক দাস মহাজন,
পুত্র কন্যা, কি গৃহিণী, শত্রু কি, জনক জননী
বিশ্বস্ত, বিশ্বাস-ঘাতিনী, সমান সবার অধিকার।
বহুজন-ভর্ত্তা কেহ, কেহ পথের ভিখারি,
নিয়ত ধন বিলায় কেহ কেহ দিয়ে লয় হরি,
কেহ বৃদ্ধা প্রৌঢ়া যুবতী, দুর্ভাগা, অসতী সতী,
তুল্য সবাকার গতি তারতম্য নাহি কার।।
রাজা প্রজা একাসনে, বসে দেখ সেই স্থানে,
চর্মকার, কর্মকার কিম্বা চণ্ডাল ব্রাহ্মণে,
কি আতুর কি অন্ধগণ, কি পদ্ম পলাশ লোচন,
কি সুন্দর কুৎসিত জন হয় সেথা একাকার।।---ইত্যাদি

আবদুল হাফিজ তাঁর লিখিত গ্রন্থে উল্লেখ করেন একটি গান। সেই গানের কিছু অংশ হল এই :

'মন ভাবছ কিরে বইয়া, নদীর কূলে
হবে শেষ বিয়া।
যখন বিয়ার চলন হইল,
খোল করতাল সব সঙ্গেই লইল,
তারা যায় গো হরি গুণ গাইয়া
মহাদেবে করে গো গান
ডুম্বুরী বাজাইয়া।।
শিবে পায় কাপড় দিয়া রইছে রে মন ঘুমাইয়া
তারা যায় গো বিয়ার জামাই লইয়া।
শ্মশানঘাটে নিয়ে তারা
বিয়া দিবে গো করাইয়া'
--- (ময়মনসিংহ)।[৯]

তিতাশ চৌধুরী লিখেছেন, যমকুলি (লোকাচার আর লোক সংস্কার) প্রসঙ্গে। মৃত্যু ও আত্মা নিয়ে কয়েকটি লোকাচার উল্লেখ করা হল : 'এই সংস্কার সঞ্জাত ধারাবাহিকতার কারণে তাই দেখা যায় আজো রাত্রিকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে ''আইডাপানি'' বাইরে ফেলতে গুরুজনরা নিষেধ করেন। কারণ আমাদের পূর্ব পুরুষদের আত্মা নাকি ঘরদোরের আশেপাশে তখন ঘুরে ফিরে বেড়ায়। [৮]

তিতাশ লিখেছেন, 'রাত্রে বিলাপের মতো দীর্ঘ একটানা কুকুরের ডাক অসুস্থ ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন বলে মনে করা হয়।' [৯]

তিনি আরও লিখেছেন, 'স্বপ্নে গরুর ডাক শুনলেও নাকি আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কারো মৃত্যু হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়।' [১০]

আবদুল হাফিজ, লোক সংস্কার ও বিধিনিষেধ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাঁর লেখা থেকে কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হল, '.... মাদী মহিষ অনেক হিন্দুর কাছে ''কালপুরুষ'' ও যমরাজার বাহন।. ..' [১১]

তিনি লিখেছেন, '...হিন্দু জনগণ মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা পিণ্ডদান কালে কাককে প্রসন্ন করার চেষ্টা করেন, কারণ তারা বিশ্বাস করেন যে, মৃতের আত্মা কাক রূপে মৃতের উদ্দেশে নিবেদিত খাদ্য খেতে আসে। কাকেব কা-কা ডাক অমঙ্গল ডেকে আনে বলে গোঁড়া হিন্দু কখনও কাক হত্যা করেন না।....' [১২]

তাঁর কথায়—'আত্মা দেহ পরিত্যাগ করতে পারে, আবার শরীরে পুনর্বার প্রবিষ্ট হতে পারে।' [১৩]

'মৃত্যুর পর আত্মা কবরের পাশে ঘোরাঘুরি করে।' [১৪]

আবদুল হাফিজ লিখেছেন, 'মৃত্যুর পর মৃত আত্মার সাহায্যার্থে কিংবা মঙ্গলার্থে জন্তু-জানোয়ারকে বলি প্রদান—আদিম আরববাসীরা গোরে উট বালি দিত। তাদের ধারণা ছিল এই যে, মৃত্যুব পর আত্মাটি উট চড়ে বেড়াতে পারবে।' [১৫]

আবদুল হাফিজ মৃত্যু এবং আচার-ব্যবহার-বিশ্বাস প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন, 'অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় জিনিসপত্র প্রদানের অনুষ্ঠান। মৃত্যুর পর মৃতদেহের সঙ্গে নানারকম উপহার প্রদান। উদ্দেশ্য অবশ্যই মৃতের আত্মাকে সাহায্য করা।... মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম সমূহই এ-তত্ত্বেও বিশ্বাস করে।' [১৬]

হাফিজ সাহেব লিখছেন 'বিজ্ঞানের আলোয় আজ আমরা অনেক আচার-ব্যবহার ও বিশ্বাসকে কুসংস্কার বলছি। কিন্তু একদিন ছিল যখন এগুলি ধর্মকর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের ন্যায় সকলের শ্রদ্ধার সামগ্রী ছিল। (ড. আশরাফ সিদ্দিকী, লোক সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৩, ড মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখিত ভূমিকা, পৃষ্ঠা ২২১) উল্লেখ করেন :

বলা বাহুল্য প্রাচীন জাতি সমূহের বহু সংস্কার আজও আমাদের সংস্কারের মধ্যে জীবন্ত হয়ে আছে। কোনক্রমেই তাকে শুধুমাত্র কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রদত্ত আর একটি মত এখানে উদ্ধৃত করা যায় : পেঁচার ডাককে আজও বোধহয় অজ্ঞ জনসাধারণ অশুভ বলে মনে করে। তবুও গভীর রাত্রে পেঁচার ডাক শুনলে মনটা কেমন যেন ছ্যাঁক করে

ওঠে। এই যে সংস্কার বা কুসংস্কার কত কালের? আমরা ঋগ্বেদে দেখতে পাই, ঋষি পেঁচার ডাককে মৃত্যুব লক্ষণ বলে মনে করেছেন—

যদুলুকো বদতি মোঘমেতদ্ যৎ
কপোতঃ পদমগ্নৌকৃণৌতি।
যস্য দূতঃ গ্রহিত এষ এতৎ তস্মৈ
যমায় নমো অস্তু মৃত্যবে।। (১০/১৬৫/৪)

'এই পেঁচা যা বলছে মিথ্যা হোক। এই কপোত অগ্নিকোণে পা রেখেছে। যাঁর দূত হয়ে এসেছে সেই যমকে, এই মৃত্যুকে নমস্কার।'

এই ঋগ্বেদের উল্লেখ থেকে বুঝলুম অন্তত তিন হাজার বৎসর আগেও লোক পেঁচাকে যমের দূত বলে মনে করত। তারও আগে থেকে যে এই সংস্কার চলে আসছিল তাতে আর সন্দেহ কি! (ঐ, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ২২-২৩)।' [১৭]

আবদুল হাফিজ লিখেছেন, 'লোকসংস্কার এমন বিচিত্র, এমন অদ্ভুত ও যুক্তিহীন বলে মনে হয় যে, অনেক সময় তা বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হয় না। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করতে চাই আর না-ই চাই, জগৎ জুড়ে মানুষ লোক সংস্কারে বিশ্বাস করেই চলেছে। প্রকৃতপক্ষে, লোক সংস্কাব নেই, এমন জাত নেই। লোক সংস্কাব শুধু যে অশিক্ষিত লোক সমাজেই প্রচলিত রয়েছে তা নয়, শিক্ষিত ও ভদ্র ব্যক্তিরাও সংস্কার মানেন ...'[১৮]

মৃত্যু মানব জীবনের শেষ পরিণতি। মৃত্যুর পর মৃতব্যক্তির দেহ প্রিয়জনেরা নিয়ে যায় শ্মশানে কিংবা কবরস্থানে। বাংলা লোক সাহিত্যে ছড়া, গান, ধাঁধায় তার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—ধাঁধা

১. চাইরো পাকে নোহার ঝাড়া,
কোন জাগা দিয়ে যাম্বোঁ কামার পাড়া।
—উত্তর : কবব। (রংপুর)
২. ঘর আছে দুয়ার নাই,
মানুষ আছে কথা নাই।
— উত্তর : কবর। (বরিশাল)। [১৯]

ডক্টর অধীর দে লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ কবি ও দার্শনিক। মৃত্যুকে তিনি নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছেন। নতুন এক জগতের ছবি উন্মোচিত হয়েছে তাঁর চোখে। কোনো বিভীষিকা, কোনো রহস্যময়তা নেই তাঁর ধ্বংস বা মৃত্যু সম্পর্কে। বাহ্যত জীবনের মৃত্যু মনে হলেও তা জীবনের বিনাশ নয়। গানে গানে এই কথা ও ভাব কেমন সুন্দর করে প্রকাশ করেছেন কবি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি,
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।
নতুন নামে ডাকবে মোরে

বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে
আসবো যাবো চিরদিনের সেই আমি

মৃত্যুই যে জীবনের শেষ নয় এবং এর সমাপ্তি সম্পর্কেও যে কোনো সংশয়াতীত ধারণাও কারুর নেই—রবীন্দ্রনাথের আর একটি গানে অনুরূপভাবের কী চমৎকার প্রকাশই না ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

শেষ নাই যে, শেষ কথা কে বলবে
আঘাত হয়ে দেখা দিল, আগুন হয়ে জ্বলবে।

মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাব-সুন্দর মহান কল্পনায় সীমিত করে এক অপূর্ব আস্বাদ্য রূপে বোঝাতে চেয়েছেন। ধ্বংস বা মৃত্যু একেবারে বিলুপ্তি নয়—চূড়ান্ত বা শেষ নিষ্পত্তিও নয়, বরং সাধারণ থেকে অসাধারণ, স্থূল থেকে সূক্ষ্মতায়, জীব হতে আত্মায় ক্রম-রূপান্তর বা লোকান্তর গমনের সোপান পরম্পরা মাত্র। মৃত্যুকে কবি সম্বোধন করে লিখেছেন—

মরণরে।
তুঁহু মম শ্যাম সমান।
মেঘ বরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট,
রক্ত কমল কর, রক্ত অধর-পুট,
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব,
মৃত্যু অমৃত করে দান।[২০]

বাংলার মাটি, আকাশ, বাতাস, জল যেন কাব্যময়। ভিখারি, ফকির, বাউল প্রভৃতিও গান গায়। বাংলার লোকসংগীতেও পাওয়া যায় মৃত্যু প্রসঙ্গ। জীবন হতে জীবনান্তের বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে অনেকে শোকে অভিভূত হয়ে কবিতা, গান রচনা করেছেন। মৃত্যু, শোক, শ্মশান ও গোরস্থান প্রসঙ্গ তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সূত্র নির্দেশ

১. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, (১৪০৩) পৃষ্ঠা ২৪১, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা।

২. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ঐ, ঐ, ঐ, পৃষ্ঠা ২৪৩।

৩ আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা (বাংলাদেশ), ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ৩১২।

৪. দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত, বাঙালির গান, ১৩১২, পৃষ্ঠা ৫৭৬।

৫. দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত, ঐ, ঐ, ঐ, পৃষ্ঠা ৫৭৬

৬. দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত, ঐ, ঐ, পৃষ্ঠা ১০২১।

৭. আবদুল হাফিজ, লৌকিক সংস্কার ও বাঙালি সমাজ, ঢাকা (বাংলাদেশ), ১৯৭৮, পৃষ্ঠা ১৬৯।

৮. তিতাশ চৌধুরী, কুমিল্লা জেলার লোকসাহিত্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা (বাংলাদেশ), ১৩৯০, পৃষ্ঠা ১৩১।

৯. তিতাশ চৌধুরী, ঐ, ঐ, ঐ, পৃষ্ঠা ১৩১।

১০. তিতাশ চৌধুরী, ঐ, ঐ, ঐ, পৃষ্ঠা ১৩২।

১১. আবদুল হাফিজ, লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ, ঢাকা (বাংলাদেশ), ১৪০১, পৃষ্ঠা ৫৩।

১২. আবদুল হাফিজ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃষ্ঠা ৫৩।

১৩. আবদুল হাফিজ, ঐ, ঐ. ঐ, পৃষ্ঠা ৯

১৪. আবদুল হাফিজ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃষ্ঠা ৯

১৫. আবদুল হাফিজ, ঐ. ঐ, ঐ, পৃষ্ঠা ৯

১৬. আবদুল হাফিজ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃষ্ঠা ৯

১৭. আবদুল হাফিজ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃষ্ঠা ৬৭

১৮ আবদুল হাফিজ, ঐ, ঐ, ঐ, পৃষ্ঠা ৭১

১৯. আলমগীর জলীল ও সামীয়ুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশের লোক ধাঁধা, (লোকসাহিত্য সংকলন ১৬), বাংলা একাডেমি, ঢাকা (বাংলাদেশ), ১৩৮৭, পৃষ্ঠা ৩৪।

২০. ডক্টর অধীর দে, সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ, ১৩৭১, পৃষ্ঠা ৮৮।

আকবরের শেষ ইচ্ছা

রোগ শয্যায় শায়িত পিতার পরিচর্যায় রোজ দু তিন ঘন্টা কাটাতেন জাহাঙ্গীর। ১৬০৫ খৃিষ্টাব্দের ৮ অক্টোবর আমীর বর্গ তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলে সম্রাট আকবর তাঁদের যে কয়টি কথা বলেছিলেন, কবি জাহাঙ্গীর পিতার সে কথা কয়টি কবিতায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন যার উপসংহারে বলা হয়েছে —

আজ এই শেষ দিনে ভিক্ষা মাগি আমি
তোমাদের কাছে প্রার্থনা করিও মোর
আত্মার কল্যাণে প্রতিদিন প্রভাতে সন্ধ্যায়।
আমার সমাধি পরে করো বরিষণ
এক বিন্দু প্রেম অশ্রুকণা

* * *

এ দেহ-পিঞ্জর ভেঙে আত্মা মোর চলে যেতে যায়
ধরণীর দুঃখ ত্যাগি, পেতে চায় অনন্ত বিশ্রাম।

□ লেখক পরিচিতি— গ্রন্থকার, গবেষক, স্বাধীনতা সংগ্রামী।

শ্মশানে জড়িত জীবন

মহুয়া বসু

জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যুতে গিয়ে শেষ হয় একটি জীবন। মানুষ সংস্কারে আবৃত জীব। তাই মৃত্যুকেও এই সংস্কার থেকে বাদ দেয়নি, বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ধর্মের মানুষ মৃত্যুর পর তার প্রাণহীন শরীরকে নানা লোকাচারের মধ্যে দিয়ে সৎকার করে। আবার সৎকাবের পরও অনেক ক্ষেত্রে সেই প্রাণহীন শরীরটাও রেহাই পায়না মানুষের হাত থেকে। পঞ্চভূতে বিলীন হওয়া দেহও উঠে আসে মানুষের চিতায়, কল্পনায়, সংস্কারে। ধারণা এর থেকে প্রচুর ক্ষতিও হয়। তাই এই ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে প্রত্যেক মানুষ নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সৎকার নিষ্ঠার সঙ্গে করে থাকে। আমরা সবাই জানি তবুও বলতে হয় হিন্দুদের দাহস্থল শ্মশান। মুসলিমদের সৎকারস্থলকে বলে কবরখানা। খ্রিস্টানরাও মৃতের শরীর কফিনে ভরে মাটিতে পুঁতে দেয় এবং তার উপর সমাধি বানায়।

মৃতের সৎকারের বিভিন্ন ধরন বিভিন্ন নিয়ম বহু প্রাচীন তা আমরা জানি। মিশরের পিরামিড মনে করিয়ে দেয় সেই কথা। যে কথা বলে একটি যুগের, একটা জাতির, একটা সংস্কৃতির। এইভাবে নানান সংস্কারও মাঝেমাঝে রূপ নেয় শিল্পের। যে শিল্প কথা বলে। ঠিক যেভাবে তাজমহল বলে আসছে বহু বহু বছর ধরে। মানুষ অতি সংস্কারবদ্ধ জীব। তাই একটা শরীরে হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরবর্তী পর্যায়ও সংস্কারের ভারে জর্জরিত। বহুযুগ থেকেই মনে করা হয় মৃত্যুর পর মানুষের আর একটা জীবন আছে। যেখানে আত্মা ও শরীর আলাদা। মৃতের আত্মা সর্বত্র বিচরণ কবতে পারে। এই আত্মার ক্ষমতাও প্রচুর। এই জীবনে সেই আত্মারও ভোগ, যোগ, ত্যাগ সবই থাকে। তারা বিভিন্ন রূপও ধারণ করতে পারে। এমনকী প্রাণহীন দেহটাকেও বাদ দেওয়া যায় না। সেই দেহের নিজের আত্মা বা অন্যের আত্মা ঢুকে নানা ক্ষতিকর কাজ করতে পারে। তেমন কিছুকিছু ভাল কাজও করে। ক্ষতিকারক এই আত্মাকে চলতি কথায় আমরা ভূত বলি। তাই সবদিকেই খেয়াল রেখে একটা মৃতদেহের সৎকার করা হয়। মিশরীয় যুগে যেমন মনে করা হত মৃত্যু একটা সাবলীল ঘটনা। মৃত্যুর পরও সব ব্যক্তি বেঁচে থাকে তার বায়বীয় শরীর নিয়ে। তাই মৃতের দেহকে নানা ওযুধ দিয়ে নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পচন থেকে রক্ষা করা হত। এরপর সেই দেহকে একটা কফিন বাক্সের ন্যায় বাক্সে করে রাখা হত একটি ঘরে। সেই ঘরে একটা মানুষের ব্যবহারের জন্য দরকারি সবধরনের জিনিসই রাখা থাকত। তবে বিত্তবানদের ক্ষেত্রে এর আধিক্য লক্ষ করা যেত। এবং বড় বড় পাথর দ্বারা সেই সমাধি ক্ষেত্রকে একটা সুন্দর আকৃতি দেওয়া হত। যাকে আমরা বলি পিরামিড।

যুগ যুগ ধরে দেশ দেশান্তর থেকে নানান জাতি উপজাতি এসে ভারত আত্মার সঙ্গে একীভূত হয়েছে। ইরান মেসোপটেমিয়া থেকে হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে ভারতে আসে আর্যরা। এদেশীয় মানুষের সঙ্গে মিশে যায়। এরা ধর্মে হিন্দু। আর হিন্দুদের কাছে অগ্নি হলো সব থেকে পবিত্র শক্তি। তাই মৃত্যুর পর দেহের সৎকারের কাজে অগ্নিকেই বেছে নিল প্রাচীন আর্য বংশ-উদ্ভুত হিন্দুরা।

পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চলে হিন্দুদের ভাগ তুলনামূলক বেশি, তাই হিন্দু মৃতদেহ সৎকারের জন্য শ্মশানের ভাগও বেশি। আগেকার দিনে শ্মশানে কোনো নির্দিষ্ট চিতা থাকত না। কাঠ সাজিয়ে তার উপর মৃতদেহ রেখে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হত। জায়গাটা সাধারণত নদীর ধারেই হত। যাতে সহজেই জল দিয়ে ধুয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করা যায়। শ্মশান এলাকার কাছে পিঠে কোনো বসতি থাকত না। শ্মশানকে আত্মা, পিশাচ, ডাকিনীর আশ্রয়স্থল ভাবা হতো। এখনও গ্রাম অঞ্চলে এমনই হয়। তবে শহর বা মফস্বল অঞ্চলের রূপটা একটু অন্যরকম। এখানে শ্মশানে পাকাপোক্ত চিতাস্থল থাকে, ফলে দাহের কাজে সুবিধা। আর জনবসতি বাড়ার ফলে শ্মশানের পার্শ্ববর্তীস্থান আর জনশূন্য থাকে না। আগেকার মতো শ্মশানকে মানুষ আর ভয় পায় না। আজকাল শ্মশানও একটা দর্শনীয় স্থান। এছাড়া শ্মশানের আর একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়—শ্মশানে কালী মন্দির। কালী এবং শিবের সঙ্গী হল - ভূত, প্রেত, পিশাচ। তাই তারা যেখানে শিব-কালীও সেখানে।

প্রবাদ আছে শ্মশানে বসে অমাবস্যা রাত্রে শ্মশান কালীর সাধনা করলে নাকি সহজেই 'মা'-এর দর্শন পাওয়া যায়। লোককাহিনী বলে তান্ত্রিকরা শ্মশানে থাকে, এরা পিশাচসিদ্ধ হয়। এরা নাকি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। আবার হিন্দুধর্মে শ্মশানকে সবচেয়ে পবিত্র স্থান বলা হয়। একে শান্তিক্ষেত্রও বলা হয়। প্রবাদ আছে "সুখ স্বপনে শান্তি শ্মশানে।"

হিন্দুধর্মে মৃত্যুর পর দেহটিকে নিয়ে নানা সংস্কারের পর ফুল ও চন্দন দিয়ে সাজিয়ে 'হরি' ধ্বনি দিতে দিতে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সেই দেহটিকে স্নান করিয়ে ঘি, সুগন্ধী মাখিয়ে নতুন বস্ত্র দিয়ে ঢেকে চিতায় তোলা হয়। মৃত ব্যক্তির যদি কোনো পুত্র-সন্তান থাকে তবে সে (যদি একাধিক পুত্র-সন্তান থাকে তবে বড় অথবা ছোট, কেউ না থাকলে কোনো আত্মীয়) মৃতের দেহে অগ্নি দেয়। 'অথর্ববেদ'-এ লেখা—আ রভস্ব জাতবেদস্তেজস্বদ্বরো অস্তুতে। শরীরমস্য সং দহাথৈনং ধেহি সুকৃতাসু লোকে।। অর্থাৎ , হে জাতবেদা অগ্নি। এ মৃতের শরীর সম্যক ভস্মীভূত কর। তারপর এ পুরুষকে সুকৃত লোকে অর্থাৎ পুণ্যবানদের নিবাসস্থল স্বর্গলোকে স্থাপন কর।

—পূর্বো অগ্নিস্বা তপতু শং পুরস্তাছং পশ্চাৎ তপতু গার্হপত্যঃ। দক্ষিণাগ্নিষ্ঠে তপতু শর্ম বর্মোত্তরতো মধ্যতো অন্তরিক্ষাদ্ দিশোদিশো অগ্নে পরি পহি ঘোরাৎ।।

অর্থাৎ , হে অগ্নির দ্বারা দাহ্যমান প্রেত, পূর্ব দিকে দীপ্যমান আহ্বানীর অগ্নি পূর্বদিকে তোমাকে সুখে তাপ দিক সেরূপ গার্হপত্য অগ্নি (গৃহপতি যজমানের অগ্নি) পশ্চিম দিকে সুখে তোমাকে দগ্ধ করুক। দক্ষিণাগ্নি সুখে কবচের মতো তোমাকে তাপদিক (কবচ যেমন

সধাবরক ও সধাছাদক, সেরূপ তোর শরীর আবৃত করে দগ্ধ করুক)। হে অগ্নি উত্তর, মধ্য, অন্তরীক্ষ ও অবান্তর দশদিক থেকে ও ক্রূর হিংসা থেকে রক্ষা কর।।

উদমিদ বা উ নাপরং জরস্যন্যদিতোহ পরম। জায়া পতিমিব বাসসাভ্যেনং ভূমউর্পুহি।।

অর্থাৎ, হে মৃতপুরুষ, জরা অবস্থায় যে অন্নাদি ভোগ করেছ, তাছাড়া আর কোনো ভোজ্য তোমার নেই। এ শ্মশান ছাড়া অন্য স্থানও তোমার নেই। কোনো কাজও তোমার নেই। হে পৃথিবী, শ্মশানে পরিত্যক্ত এ জনকে স্ত্রী যেমন পতিকে বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করে। সেরূপ একে তোমার তেজে আচ্ছন্ন কর।

হিন্দুশাস্ত্রে অগ্নিকে পবিত্র বাহক মনে করা হয় এবং মৃতের আত্মাকে এই অগ্নির সঙ্গে তার নিজলোকে পাঠানো হয়। তাইতো অথর্ববেদ বলে—ইদং ত একং পর উ ত একং তৃতীয়েন জ্যোতিষা সং বিশস্ব। সংবেদনে তন্বা চারুরেষি প্রিয়ো দেবানাং পরমে সধস্থে।

অর্থাৎ , হে প্রেত তোমার পরলোক গমনের জন্য গার্হপত্য জ্যোতি। অপর আহার্য পচনাখ্য জ্যোতি , তৃতীয় আহবনীয় জ্যোতির সাথে তুমি মিলিত হও। অগ্নিসংস্কার জনিত দেবশরীরের দ্বারা তুমি শোভন হও, তার পর উৎকৃষ্ট দেবলোকে ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রীতির বিষয় হও।

—ইদনিদ বা উ নাপরং দিবি পশ্যসি সূর্যম। মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম উন্যুহ। অর্থাৎ, হে মৃতপুরুষ শ্রাদ্ধে আমাদের প্রদত্ত বস্তুই তোমার জীবন, অপর কিছু নয়। এ শ্মশানে থেকে আকাশে সূর্য দেখ। মা যেমন বস্ত্রাঞ্চলে নিজ পুত্রকে আচ্ছন্ন করে, সেরূপ হে পৃথিবী তুমি শ্মশানস্থ মৃতকে নিজ তেজের দ্বারা আচ্ছন্ন কর, যাতে শীতবায়ু উষ্মাদি এ ভোগ না করে।

হিন্দু লোকাচার মনে করে মৃতের শরীর যখন আত্মাশূন্য অবস্থায় থাকে তখন অন্য যে কোনো মায়াবী বা খারাপ আত্মা সে দেহে প্রবেশ করতে পারে। তাই অথর্ববেদ বলে— যে দস্যরঃ পিতৃষু স্রবিষ্টা জ্ঞাতিমুখা আহুতা দশ্চরন্তি। পরাপুরো নিপুরো যে ভরন্ত্যগ্নিষ্টা নস্মাৎ প্রষমাতি যজ্ঞাৎ। অর্থাৎ, উপক্ষয়কারী জ্ঞাতিগণের প্রতিরূপ যে রাক্ষসরা পিতৃপিতামহাদির মধ্যে প্রবেশ করে আহুত লৌকিক অন্ন ভক্ষণ করে (অথবা আহুত অবস্থায় মায়া দ্বারা হবি ভক্ষণ করে পিতৃগণের মধ্যে বিচরণ করে)। পিণ্ডদাতা পুত্র ও পৌত্রাদিকে যারা নাশ করে, সে মায়াবী রাক্ষসদের অগ্নিদেব এ পিতৃগণের উদ্দেশে ক্রিয়মান যজ্ঞ থেকে সরিয়ে দিক।

আবার প্রিয়জনের শরীর জ্বলতে দেখলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কষ্ট হয়। এবং সেই প্রাণহীন শরীর আগুনে পোড়ার জ্বালা যেন নিজের গায়ে অনুভূত হয়। তাই ঋষিরা বলেছেন — মৈনমগ্নে বি দহো মাভি শূস্তচো মাগ্য ত্বচং চিক্ষিপো মা শরীরম। শৃতং যদা করসি জাতবেদ যোমনং স্র হিনুতাৎ পিতৃরূপ।

অর্থাৎ, হে অগ্নি এ প্রেতকে তুমি অতি মাত্রায় দগ্ধ করো না। অত্যন্ত শোক দিও না। এর ত্বক ভেদ করো না। যখন তুমি এর শরীর হবি যোগ্য পক্ব কর। হে জাতবেদা অগ্নি, তারপর একে তুমি পিতৃগণের কাছে পাঠিয়ে দাও।

আত্মার মুক্তির জন্য বলেছে—অব সৃজ পুনরগ্নে পিতৃভ্যো যস্ত আহুতশ্চরতি স্বধাবান্। আয়ুর্বসান উপ যাতু শেষঃ সং গচ্ছতাং তন্বা সুবর্চাঃ।

অর্থাৎ, হে অগ্নি তোমার হরিরূপে কল্পিত এ প্রেতকে পিতৃলোক স্থানে ছেড়ে দাও। যে প্রেত পুরুষ তোমার কাছে আহুতিরূপে প্রদত্ত হয়েছে এবং আমাদের দত্ত হবি স্বধা যুক্ত হয়ে গমন করেছে। আর পুত্রাদি আয়ুষ্মান হয়ে গৃহে ফিরে যাক এবং সে প্রেত শোভন কান্তিতে পিতৃলোকের অবস্থান যোগ্য শরীরে যুক্ত হোক।

বেদ আরও বলে—এদং বর্হির্সদো মধ্যেহভুঃ প্রতি ত্বা জানঞ্চু পিতরঃ পরেতম্। যথাপরত তন্বং সং ভরস্ব গাত্রনি তে ব্রহ্মণা কল্পয়ামি।

অর্থাৎ , হে প্রেত এ চিতায় বিছান কুশে আরোহন কর এবং পিতৃমেধ যজ্ঞের যোগ্য হও। অর্থাৎ দহনের দ্বারা সংস্কৃত হও। পূর্বতন পিতৃপুরুষগণ তোমার অনুমোদন করুক। পূর্বে জীবিতাবস্থায় তোমার অস্থির পর্বগুলি যে রূপ সংহত ছিল এ মন্ত্র প্রভাবে আমি (কুলের জ্যেষ্ঠ) তা পূর্বের মতো সংহত করছি । আবার শুধু পোড়ালেই যে মৃতের আত্মার সদগতি হবে তা নয়। শূদ্রকর্তৃক ব্রাহ্মণের দেহ দগ্ধ হলে সেই ব্রাহ্মণের সদগতি হয় না। সেই পাপক্ষয়ের জন্য ব্রাহ্মণ চন্দ্রায়ন, ক্ষত্রিয় পরাক ও বৈশ্য প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করবে। এই প্রায়শ্চিত্ত অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনে তাদের পুত্রদিগকে করতে হবে।

পুরাণ বলে গর্ভবতী মারা গেলে তার উদর চিরে গর্ভ নিঃসারিত করে অন্য স্থানে ওই গর্ভকে পুঁতবে, পরে তাহা দাহ করিবে। দাহের পর যে কোনো মৃতব্যক্তির অস্থি সঞ্চয় করে পঞ্চগব্য প্রক্ষেপ করে পট্টবস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করে নতুন মাটির ভাঁড়ে রেখে বস্ত্রাচ্ছাদন পূর্বক অরণ্যে অথবা শুদ্ধ বৃক্ষমূলে রেখে দিতে হবে। তারপর গঙ্গায় দিয়ে দিতে হবে। কথায় আছে মানুষের যত অস্থিখণ্ড গঙ্গায় থাকবে তত সহস্র বৎসর সেই ব্যক্তি স্বর্গলোকে বাস করবে। মৃত্যুর দশদিনেব মধ্যে যার অস্থি গঙ্গায় প্রক্ষেপ করা হয়, তার গঙ্গায় মরণসম ফল লাভ হয়। আর যদি কোনো নরাধম ব্যক্তি মাতৃকূল ও পিতৃকূল ভিন্ন অপর কুলোদ্ভব ব্যক্তির অস্থি অর্থগ্রহণ পূর্বক গঙ্গাতে নিয়ে যায়, তাহলে তাকে চন্দ্রায়ন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। আর কোনো ব্যক্তির অস্থি না পাওয়া গেলে ৩৬০টি শরপত্র দ্বারা এবং ৩৬০টি পলাশপত্র দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষের প্রতিমূর্তি করবে। ব্যবহার ও যোগ্যতাবশত শরপত্র দ্বারা বেনা বাঁধলে পুতুল করতে সুবিধা হয় বলে শরপত্র দ্বারা পুতুল করে তার মস্তক প্রভৃতি স্থানে যথাসংখ্যক পলাশপত্র দিবে। স্মার্ত বলেছেন, অস্থি না পেলে এইরূপ সামান্য বিধি আছে, সুতরাং সিংহ, ব্যাঘ্র, কুম্ভীর প্রভৃতি জন্তুগণ যাকে ভক্ষণ করেছে অথচ তার অস্থি পাওয়া যাচ্ছে তাবই পর্ণনরদাহ করতে হবে। পল্লীগ্রামে অনেক স্থলেও কলেরাদি রোগে মারা গেলে শবকে দাহ না করে ফেলে দেওয়া হয়। কুকুর নয় শৃগাল যেখানে সেখানে টেনে নিয়ে যায়। সুতরাং অস্থির অলাভ হয়, সেরূপ স্থলেও পর্ণনরদাহ করবে।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো হিন্দুধর্মের লোকেরাও স্বর্গের মতো নরকে বিশ্বাসী। মৃত্যুর পব প্রত্যেক আত্মাই স্ব কর্ম অনুযায়ী স্বর্গ অর্থাৎ সুখের জীবন এবং নরক অর্থাৎ দুঃখের

জীবন ভোগ করে বলে মনে করে। নরক কোনো স্থান বিশেষ কিনা, এই বিষয়ে শাস্ত্র বিশ্বাসীগণেরও সন্দেহ আছে। কেউ কেউ বলেন, নরকভোগ পৃথিবীতেই, অন্য কোনো নরক নেই। এই বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী মহর্ষিগণ শ্রীমদভাগবতের ৫ম স্কন্ধের ১৬ অধ্যায়ে বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে লিখে গিয়েছেন। তারমধ্যে কিছু উদ্ধৃত করা হল।

১. বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি নরকে গমন করে।

২. দেবস্ব ও ব্রাহ্মণস্ব অপহরণকারীর উদর বিদারণ পূর্বক বিষ্ঠাদ্বারাপূর্ণ করা।

৩. গুরুনিন্দক, দেবনিন্দকের মুখে লৌহ শলাকা নিক্ষেপ করা।

৪. পরদ্রব্যপহারীর করতল তৈলে ভিজাইয়া জ্বলন্ত অঙ্গারে সিদ্ধ করা।

৫. নির্দোষ দোষারোপকারীর মুখ পুঁজ, শোণিত ও কর্দমে ডুবাইয়া ধরা ইত্যাদি।

স্বর্গ নরকের মতো জন্মান্তর নিয়েও প্রচুর মতভেদ রয়েছে। মনীষীরা বলেন, প্রত্যক্ষ দেখা যায় না বলে জন্মান্তরাদি নেই একথা বলতে পার না। অনেক বস্তু মোটেই দেখা যায় না, কেউ দেখেনা অথচ তার সত্তা স্বীকার করতে বাধ্য। যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি দেখা যায় না, অগ্নি ধরালে জ্বলিয়া ওঠে ইহা সকলে দেখে। অতএব না দেখেও দাহিকা শক্তি স্বীকার করতে হবে। দেখা না যাওয়ার নানা প্রকার কারণ আছে। অতি দূরত্বের জন্য আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষী চোখে পড়ে না। আবার অতি নিকটে থাকার জন্য লোচনাস্থ অঞ্জন লক্ষ হয় না। ইন্দ্রিয় দুর্বল হলে দেখা বা শোনা যায় না। মন একদিকে আসক্ত থাকলে অন্যদিকের জিনিসের উপলব্ধি হয় না। সূক্ষ্মতার জন্য স্বর্গ, অদৃষ্ট এবং দেবতা প্রভৃতি দেখা যায় না। মধ্যে দেওয়াল থাকায় অন্তঃপুরে রাজমহিলাদি দৃষ্টিগোচর হয় না। গোদুগ্ধ ও মহিষ দুগ্ধ একত্রে করিলে তাহার পার্থক্য অনুভূত হয় না। এই সকল কারণে দেখবার অসুবিধা হয় বলে তাতে নেই বলতে পার না। যা দেখা যাবে না তার সাধনের জন্য অনুমান প্রমাণ গ্রহণ করতে হবে। অনুমানেও যা স্থির করা যাবে না, তা বুঝতে আপ্তবাক্যের অনুসরণ করবে। সকল প্রমাণেই যা স্থির হবে না, তা না বলে সিদ্ধান্ত হবে। এই যে যম, যমালয় এবং স্বর্গ ও নরকের কথা বলছি তাও দেখবার উপায় নেই। স্থূল চক্ষুর অন্তরালেই এই সূক্ষ্মরাজ্যের সূক্ষ্মতম ঘটনাবলি সংঘটিত হচ্ছে।

হিন্দুধর্মের ন্যায় খ্রিস্টান ধর্মেও এবং মুসলমান ধর্মের ধর্মগ্রন্থ যথাক্রমে 'বাইবেল' ও 'কোরানে' জীবের, স্বর্গ ও নরক সম্পর্কে লেখা আছে। মূল বাইবেল হিব্রু ভাষাতে লেখা হয়েছে। এর বাংলা অনুবাদ গ্রন্থে লেখা আছে যে মানবের মৃত্যু হলে শেষ হয় না। পুণ্যবানের জন্য স্বর্গ এবং পাপীদের জন্য নরক। এর দ্বারাই জীবাত্মার নিত্যত্ব এবং স্বর্গনরকের অস্তিত্ব খ্রিস্টিয়ানদের স্বীকার করতে হচ্ছে। 'কোরান' আরবি ভাষায় লিখিত গ্রন্থ। কোরানে 'রু' এবং 'নকস্' শব্দে জীবাত্মা বোঝায়। কোরানের ২১ সুরঃ (অধ্যায়) ১৬ বচন (সংখ্যা) ১৫ সুরঃ ৪৪ বচন, ১৯ সুরঃ ৭২ বচন, ৩ সুরঃ ২৪ বচন পাঠে জানা যায় মানুষের মৃত্যু সময়ে, স্বর্গীয় দূত এসে নকস্ (জীবাত্মাকে) বের করে নিয়ে যায়। ধার্মিকগণের জীবাত্মাকে মোলায়েমভাবে অতি যত্নপূর্বক বের করে নেওয়া হয়। আর পাপীগণের 'রু' (জীবাত্মাকে)

টেনে হিঁচড়িয়ে নেওয়া হয়। সেখানে নির্মল সুশীতল জলের নদী, দুধের নদী ও মধুরবায় প্রবাহিত হয়। আর পাপীদের জন্যে নরকে উত্তপ্ত জলের নদী রাখা আছে। যা পান করলে কণ্ঠনালী ও উদর জ্বলে যাবে। বাইবেল অপেক্ষা কোরানে স্বর্গ ও নরকের অনেক কথা বলা আছে।

মৃত্যুর সঙ্গে ধর্ম যেমন জড়িয়ে রয়েছে, তেমনি একটি পুরুষের মৃত্যুর সঙ্গে একটি নারীর জীবন জড়িয়ে রয়েছে। একটি পুরুষের মৃত্যুতে কেউ হারায় তার পুত্র, কেউ হারায় তার স্বামী, কেউবা পিতা। সবাই হয় শোকাহত। কিন্তু তার স্ত্রীর শোক বাধা পায় নিয়মের বেড়াজালে। স্বামীর মৃত্যুতে প্রথমেই তাকে বৈধব্য বেশ ধারণ করতে হয়। শাঁখা, সিঁদুরের সঙ্গে তাকে তার বেশও বিসর্জন দিতে হয় জলে। তারপর শুরু হয় খাওয়ার উপর বিধিনিষেধ। তাকে সারাজীবন ধরেই নিরামিষ খাদ্য খেতে হয় এবং একবার অন্নগ্রহণ করতে হয়। স্বামীর মৃত্যুতে তাকে ত্যাগ করতে হয় জীবনের সব সখ, সৌখিনতা। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে এসব কিছুই করতে হয়না। তবে এখন খাদ্যের নিয়মটা অনেকটা নরম হয়েছে, যেমন হয়েছে সতীদাহের প্রথাটা।

'নানা মুনি নানা মত'-এর ন্যায় নানাধর্মে নানা নিয়ম কানুন। আর যত ধর্ম, যত সম্প্রদায় তত নিয়মের বৈচিত্র্য। লোকে ভাবে মরণে মুক্তি কিন্তু ধর্ম মৃত্যুকে মুক্তি দেয়নি। একটি মানুষের জীবনের শেষ মৃত্যু কিন্তু শ্মশানে তার দেহকে পুড়িয়ে ছাই করে দিলেও তার আত্মার মুক্তি নেই। তাই শ্মশানে একটি জীবন শেষ হলেও এই শ্মশান থেকেই আর একটি জীবনের শুরু।

তথ্যসূত্র

১. *বিজনবিহারী গোস্বামীর অনুবাদ ও সম্পাদিত 'অথর্ববেদ'।*
২. হিন্দুক্রিয়াকল্পদ্রুমঃ।
৩. জনৈক ব্যক্তিগণ।

❑ **লেখক পরিচিতি** : গবেষিকা, সাংবাদিকতার ছাত্রী।

খ্রিস্টান সমাধি ঃ বঙ্গ সংস্কৃতির নতুন মাত্রা

সুরঞ্জন মিদ্দে

বঙ্গদেশে খ্রিস্টধর্মের প্রচার হয় চারশো বছব আগে। বঙ্গদেশ তথা উত্তরপূর্ব ভারতের সর্বপ্রাচীন গির্জাটি হল হুগলি জেলার ব্যান্ডেল চার্চ। অবিভক্ত বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষে খ্রিস্টান মিশনারিদের অবদান সর্বজনবিদিত। স্কুল কলেজ ও সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি চর্চায় খ্রিস্টান মিশনারিরা পথিকৃৎ হয়ে আছেন।

কথিত আছে দক্ষিণ ভারতে ৫২ খ্রিস্টাব্দে যিশুখ্রিস্টের সাক্ষাৎ শিষ্য সেন্ট থমাস এসেছিলেন। খ্রিস্টধর্ম তাই ভারতের মাটির সঙ্গে মিশে আছে। কিন্তু বঙ্গদেশে সেই হিসাবে মাত্র চারটে শতক অতিবাহিত করেছে। তবুও এত কম সময়ে বঙ্গসংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে খ্রিস্টান সমাধি।

সাধাবণত গির্জার প্রাঙ্গণে অথবা নির্দিষ্ট ঘেরা জায়গায় খ্রিস্টান সমাধি দেখতে পাওয়া যায়। একটা সবুজ মাঠ। উঁচু মাটির অথবা পাকা কবর। অসংখ্য নানান বকমের ক্রুশ। ছোটবড় মিলিয়ে ক্রুশগুলিকে দূর থেকে দেখতে বড় মনোরম লাগে। সমাধি প্রাঙ্গণে গিয়ে কয়েক মিনিট দাঁড়ালে জীবন-মৃত্যুর অনুষঙ্গ মনকে ভারাক্রান্ত করে দেয়। আনমনা হয়ে যায় আধুনিক মন। সবশেষে এখানে চলে আসতে হবে সবাইকে। মাত্র সাড়ে তিন হাত ভূমি।

শুধু কলকাতা নয় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে খ্রিস্টানদের সমাধি। চুঁচুড়ায় আছে আর্মেনিয়ানদের সমাধি। চন্দননগরে আছে ফরাসিদের। ব্যান্ডেলে আছে পর্তুগিজদের। আর শ্রীরামপুরে আছে ভারতবন্ধু রেভারেন্ড উইলিয়াম কেরী। মার্শম্যান, ওয়ার্ড, জন ম্যাক সহ হানা মার্শম্যান শ্রীরামপুব মিশনের এই ঐতিহাসিক মিশনাবিদেব সমাধিগুলি আজও স্মৃতি বহন করে। ইতিহাসকে জানতে শেখায়। নীবব সাক্ষী হয়ে ইতিহাসকে স্মরণ করায়।

সবচেয়ে স্মরণীয় আর উল্লেখযোগ্য সমাধি আছে কলকাতায়। কলকাতা ভারতের রাজধানী ছিল ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটিশ রাজের একাধিক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের সমাধি এখনও গবেষণাব বিষয়। এখনও আজ একবিংশ শতাব্দীতেই অনেক কিছু অচেনা আর অজানা থেকে গেছে। খ্রিস্টান সমাধি নিয়ে সত্যিকারের গবেষণা হয়নি।

আমি প্রথমে কলকাতার অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য ১০টি খ্রিস্টান সমাধির উল্লেখ করছি।

১) মল্লিকবাজার সমাধিস্থান স্থাপিত হয়েছে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে। জমির পরিমাণ প্রায় ১০০ বিঘা। সমাধি আছে প্রায় ১৫ হাজার। আর সমাধি দেওয়ার জায়গা নেই। দেশি ও বিদেশি উভয়ের সমাধি আছে। এখানে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু অ্যানড্রুজ, শিক্ষাব্রতী বেথুন সাহেব, ডিরোজিওর শিক্ষক ডেভিড ড্রামন্ডের সমাধি আছে। আর আছে প্রথম খ্রিস্টান রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথ মুখার্জি।

২) সাউথ পার্ক স্ট্রিট সমাধিস্থান স্থাপিত হয়েছে ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে। জমির পরিমাণ ২৩ বিঘা। সমাধি আছে প্রায় ২০০০। সমাধি দেওয়ার আর জায়গা নেই। এখানে শুধু বিদেশিদের সমাধিস্থান। ইয়ংবেঙ্গলের পুরোধা লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর সমাধিটাই এখানকার শেষ বিদেশির সমাধি

(যদিও ডিরোজিওকে বিদেশি বলা যায় না, তাঁর মা ভারতীয়)। এখানে জগৎবিখ্যাত প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম জোন্সের সমাধি আছে।

৩) ভবানীপুর সমাধিস্থান স্থাপিত অষ্টাদশ শতাব্দীতে। জমির পরিমাণ ২৫ বিঘা। সমাধির সংখ্যা প্রায় ৫০০০। এটি সৈনিকদের সমাধিস্থান। এটাকে ওল্ড মিলিটারী সেমেট্রি বলা হয়। এখানে প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক চার্লস ডিকেন্সের পুত্র লেফটেন্যান্ট ওয়াল্টার ল্যান্ডের সমাধি আছে।

৪) সেন্ট জনস্ চার্চ সমাধিস্থান। এটি ডালহৌসীর কাছে হাইকোর্ট পাড়ায়। এটিই প্রথম প্রোটেস্ট্যান্ট ক্যাথিড্রাল ছিল। এখানেই জোব চার্নকের সমাধি আছে। অষ্টভুজের এই সমাধি দৃষ্টি নন্দনযোগ্য।

৫) মানিকতলা সমাধিস্থান। মানিকতলা ছায়া সিনেমার কাছে এটি। কবি তরু দত্তের পারিবারিক সমাধি আছে। সমাধি প্রাঙ্গণেই গড়ে উঠেছে একটি লেপ্রসী হাসপাতাল।

৬) টালিগঞ্জ সমাধিস্থান স্থাপিত হয়েছে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে। জমির পরিমাণ ২৭ বিঘা। সমাধির সংখ্যা প্রায় তিন হাজার।

৭) খিদিরপুর সেন্ট স্টিফেন্স সমাধিস্থান। এখানে বিদেশিদের সমাধি আছে। জায়গার পরিমাণ ৮ বিঘা। সমাধির সংখ্যা ১৫০০।

৮) নর্থ পার্ক স্ট্রিট সমাধিস্থান। জায়গার পরিমাণ ১০ বিঘা। সমাধি সংখ্যা প্রায় ৩৫০০।

৯) বেকবাগান স্কটিশ সমাধিস্থান। বিদেশিদের সমাধি আছে। সমাধি সংখ্যা ২৫০০। জায়গার পরিমাণ ২৫ বিঘা।

১০) আর্মেনিয়ান সমাধিস্থান। ক্যানিং স্ট্রিট অঞ্চলে আর্মেনিয়ান চার্চ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে এই সমাধিস্থান গড়ে উঠেছে। এই *সমাধিস্থানটিই কলকাতার প্রথম সমাধিক্ষেত্র।* ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে ১১ জুলাই দানবীর সুখিয়ার স্ত্রী রেজাবিবির সমাধি এখানে দেওয়া হয়েছিল। এই তথ্যের আলোকে বোঝা যায় কলকাতায় জোব চার্নকের বহু আগেই আর্মেনিয়ান বণিকেরা কলকাতায় এসেছিল। এইভাবেই ইতিহাসের অজানার সন্ধান মিলে যায়।

কলকাতার এই স্মৃতিসৌধগুলি পরিচালনা করেন 'খ্রিস্টান বেরিয়াল বোর্ড' নামে একটি সংস্থা। যার সভাপতি সুনীলকুমার মুখার্জি, সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তী। সব মিলিয়ে মালিসহ ৩৭জন কর্মী দেখাশুনা করেন এই সমাধিগুলি। কলকাতার সমাধিস্থানে আর নতুন করে জায়গা বৃদ্ধি পায়নি। তাই পুরানো সমাধিতেই সৎকার করা হয়। মল্লিকবাজার সমাধিস্থানে ১টি সমাধির মূল্য ৪ হাজার ৪ টাকা। আর টালিগঞ্জের ১টি সমাধির মূল্য ২ হাজার ২ টাকা।

কলকাতার বেশিরভাগ সমাধিস্থান এখন জঙ্গলে ভরা। সমাধিস্থানে দ্রুত ঘাস বেড়ে ওঠে। বছরের যে কোনো সময়ে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনেরা তাদের প্রিয়জনের সমাধি চিনতে পারবে না। মানিকতলা আর বেকবাগান সমাধিস্থানের অবস্থা খুব খারাপ। এখন বর্ষাকালে সবুজ জঙ্গলে ভরে গেছে। মানুষ মেরে এখানে ফেলে দিলেও কেউ জানতে পারবে না। সম্প্রতি কবি মাইকেল মধুসূদনের সমাধিটিকে কলকাতা কর্পোরেশন সংস্কার করেছে। ডিরোজিও স্মৃতি সমিতি ডিরোজিওর সমাধি বছরে একবার সংস্কার করে। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে উইলিয়াম জোন্সের সমাধিতে

অনুষ্ঠান করা হয়। কলকাতার খ্রিস্টানদের সমাধিগুলি এক জাতীয় সম্পদ তথা ঐতিহ্য। শুধু ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ছোট ইংরাজ নয়। রবীন্দ্রনাথের অনেক বড় ইংরাজের সমাধি এই সমাধিগুলির মধ্যে হারিয়ে আছে। সেই সঙ্গে দেশীয় কৃতী খ্রিস্টানদের সমাধির মধ্যে লুকিয়ে আছে অনেক রসদ। হাওড়া শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের (একদা বিশপস্ কলেজ, ১৮২০) প্রাঙ্গণে ডিরোজিও শিরোমণি রেভা. কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাধি আছে। এখনো পর্যন্ত রেভারেন্ড লালবিহারী দের সমাধি খুঁজে পাননি গবেষকরা। 'ফোক্ টেল অভ বেঙ্গলের' আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক লালবিহারী দে এই কলকাতার কোনো এক সমাধিতেই আছেন। কিন্তু কোথায় আছেন?

এই জন্য দরকার জনমত গঠন। সরকারি ও বেসরকারি সাহায্য নিয়ে অবিলম্বে এই চলমান ইতিহাসকে রক্ষা করতে হবে। নভেম্বর ২রা তারিখে এই সমাধিতে এক উৎসব জেগে ওঠে। এই দিনটিকে বলা হয় সর্বসাধুর দিন (All Saints Day) বা সর্ব আত্মার দিন (All Souls day)। মোমবাতির আলোয় ২রা নভেম্বর সন্ধ্যায় সমাধিস্থান ভরে যায়। অপরূপ এক মনোমুগ্ধকর পবিবেশ তৈরি হয়। শোকসংগীত আর ধূপের সুগন্ধ। আর হরেক রকমের ফুলে ভরে ওঠে। খ্রিস্টান যাজকের প্রার্থনায় এক স্বর্গীয় পরিবেশ তৈবি হয়। বঙ্গ সংস্কৃতির এই নতুন মাত্রাকে বাঁচিয়ে রাখা তো এক জাতীয় কর্তব্য।

খ্রিস্টান সমাধিতে স্মারকলিপি এক বাড়তি পাওনা। এই 'এপিটাফ'গুলিতে লুকিয়ে আছে বেদনা, হতাশা আর অশ্রুঝবা কান্না। তবুও এই নীরব কান্নাব মধ্যেই সুন্দর সুন্দর কাব্য-কবিতার সন্ধান মেলে। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন আত্মবিস্মৃত পরাধীন বাঙালি জাতির কথা স্মরণ করেই বোধহয় মৃত্যুর আগে নিজের সমাধিলিপি নিজেই রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যে এও এক নবীন ধারার ও নতুন পদ্ধতিব প্রথম প্রচলন খ্রিস্টধর্মীয় নিয়মানুসারে। এরপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু মিত্র, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রেব মহাপ্রয়াণে বহু ভক্ত তাঁদের স্মরণে কবিতা লেখেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণে কালিদাস রায় 'চিত্তচিতা' লেখেন। নজরুল ইসলাম লিখলেন 'চিত্তনামা'। ক্ষুদ্র স্মরণ কবিতার প্রকৃত সার্থক প্রবর্তক হলেন বাংলা সাহিত্যের কাব্যযুগন্ধর রবীন্দ্রনাথ—

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মবণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

সমাধির সামনে দাঁড়ালে চোখে পড়ে মৃত্যুর মহান গম্ভীর রূপ। শ্বেতমর্মরে রচিত সমাধিতে আছে বাইবেলেব শ্বাশত বাণী। আর আছে এলিজি। ইয়ং বেঙ্গলের নেতা ডিরোজিও সমাধিলিপির ভাষা খুব করুণ। এই ইংরাজি লিপির অর্থ হল—'এখানে সব কিছু স্তব্ধ, সে ভালভাবে ঘুমাক, কোনো স্বপ্নও তার গভীর ঘুমের ব্যাঘাত করতে পারবে না। এদিকে কোনও ভ্রমণরত মানুষ এগিয়ে আসবে না। এই কবরের ওপর স্বর্গ থেকে অশ্রুধারা বর্ষিত হবে, অন্য কারও নয়, কোনো তীর্থযাত্রী তাঁর এই সমাধি মন্দিরে নত হবে না, কিন্তু পবিত্র নক্ষত্রগুলিই শুধুমাত্র রাতের দিকে এখানে তাদের সজাগ দৃষ্টি রাখবে।'

প্রাচীন সমাধিলিপির মধ্যেই প্রাচীন মিশর, রোম ও গ্রীসদেশের নিদর্শন আছে। রোমক রাজত্বের মিশরীয় যুগে মৃতজনের সমাধিলিপির প্রচুর সন্ধান মেলে। সমগ্র ইংরাজি সাহিত্যে

বেদনার এক মর্মবাণী অপূর্ব কৃতিত্বে ও ভাবেব গভীবতায় লিপিবদ্ধ। 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার 'ইন মেমোরিয়াম' খুব জনপ্রিয় ছিল। 'ওরিয়েন্টাল ওবিচুয়ারী', 'বেঙ্গল অবিচুয়ারী' প্রভৃতি সমাধিলিপির সংকলনগ্রন্থ জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে। বিখ্যাত কবি গ্রে রচিত 'এলিজির' একই কবিতার একই ছত্র বারবার বহু সমাধিলিপি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। শিলালিপি হয়ে যায় জীবনের সান্ত্বনা।

"বোবা সমাধি! তোমার উপর আমি বিশ্বাস করি
মহামূল্য সেই ধূলির ধনেরে রেখেছ যতনে ধবি।
আপনি নিভৃত গোপন গোরের শিলা ফলকের নীচে
যতদিন তার দয়িতের স্থান তার পাশে পায় পিছে।।"

জাহানারার সমাধিলিপি

শাহজাহানের মৃত্যুর কাহিনিটিকে পড়ে পাঠকের চক্ষু সজল হয়ে উঠবে। জাহানারা লিখছেন, 'আমার পিতাব মৃত্যু হয়েছে। একটি আলোকশিখা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সেই আলোকশিখা অদৃশ্যলোকে আবার জ্বলে উঠবে। পিতার দেহ নিয়ে গেছে সেই শ্বেতমর্মর প্রাসাদে যেখানে আমার মাতা তার জন্যে অপেক্ষা করছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁদের সমাধিতে দুজনের জন্যে আলো জ্বলে উঠবে, দু'জনের জন্যেই কোরাণ আবৃত্তি করা হবে। প্রজাকুল স্নেহময় সম্রাটের শব দেখে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে ভয়ে দুর্গের প্রাচীর ভেঙে দিনের আলো দেখা দিতে না দিতেই বিনা সমারোহে তা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, জাহানারা অতি দুঃখে বেদনার্ত ভাষায় তা প্রকাশ করেছেন।

নিজের মৃত্যুর পর তাঁর সমাধি-সজ্জা কিরূপ হবে সে নির্দেশ সুফী চিশ্‌তী শিষ্যা শাহজাহান কন্যা জাহানারা নিজেকে ক্ষণভঙ্গুর ও বিনতা বলে ঘোষণা করে পারস্য ভাষায় একটি ছোট্ট শ্লোকে লিখে রেখে গেছেন। জাহানারার সমাধির ওপর লেখা সেই শ্লোকটি সম্রাট দুহিতার সারল্য উদারতা ও নির্মলতার পরিচয় বহন করে চলেছে।

জিলকদা, ১৯০২ হিজরী অর্থাৎ ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে রচিত জাহানারার ঐ শ্লোকটি বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায়—

আমার সমাধির পরে অন্য কোনো
আচ্ছাদন আস্তরণ নয়,
চির অবনতা আমি আমার সমাধি শয্যা
তৃণ গুচ্ছে যেন ঢাকা হয়।

□ লেখক পরিচিতি—অধ্যাপক, লোক সংস্কৃতির গবেষক, ফেরীর সম্পাদক।

কবর—তোমারে ডাকিছে পিছে

আবু তাহের কমরুদ্দিন

'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর কষ্ট ভোগ করিবে'—মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে 'আল-কোরান'-এ একথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। কোনো মানুষ মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। কোনো প্রাণীই মৃত্যুর হাত এড়িয়ে অমরত্ব লাভ করেছে—একথার প্রমাণ ইতিহাসে মেলে না। তাই কবি বলেন—

'মরণ থেকে যতই পালাও
মরণ তোমায় লইবে ঘিরি,
যদিও সুদূর আকাশ প'রে
লুকাও সেথায় লাগিয়ে সিঁড়ি।'[১]

এখন প্রশ্ন হল মৃত্যুব পর কি হবে? ইসলাম ধর্ম জন্মান্তরবাদ ও পরকালে বিশ্বাসী। ফলে মৃত মুসলমান ব্যক্তিকে কাফন-দাফনের মাধ্যমে কবরস্থ করা হয়। কবর দেওয়া হয় এই জন্য যে, কবরস্থ উক্ত ব্যক্তিকে কেয়ামতের (পৃথিবী ধ্বংসের) পর হাশরের (মহা-বিচারেব) দিন প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কবর থেকে আবার জীবিত কবা হবে এবং প্রত্যেকের ক্রিয়াকর্মের নিরিখে পাপ-পুণ্যের হিসাব নেওয়া হবে। তারপর যে যার স্বর্গ বা নরকে চিরস্থায়ীরূপে বসবাস কববে। ইসলাম একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হওযায় এক আল্লার এই নির্দেশকে তারা মেনে নিয়েছে। যদিও এই কবর প্রথা খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষও করে থাকেন, তবুও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের সঙ্গে মুসলমানদেব কবর দেওয়ার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে।

বর্তমানে কবরের খবর সম্পর্কিত আলোচনার পূর্বে আমাদের জেনে রাখা দবকার যে, এই কবর প্রথার প্রচলন কবে থেকে হল। বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে জানা যায় পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদমের পুত্রদেব মধ্যে ঝগড়া হয়। এক ভাই ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে অন্য ভাইকে হত্যা করে। এরপর সম্বিত ফিরে পেয়ে সে ভাবতে থাকে এরপর তাঁর কর্তব্য কী? অর্থাৎ মৃত এই ভাইকে নিয়ে সে কী করবে। এমন সময় অনতিদূরে সে দেখল চিল জাতীয় একপ্রকার প্রাণী মরুভূমির বালিয়াড়ির মধ্যে পায়ের নখ দিয়ে গর্ত করার চেষ্টা করছে। পরিশেষে সেই প্রাণীটি গর্ত করে অন্য একটি মৃত প্রাণীকে সেই গর্তে ফেলে বালি চাপা দিয়েছিল। এই ঘটনা লক্ষ করে হত্যাকারী ভাইটি মৃত ভাইকে অনুরূপভাবে বালি খুঁড়ে কবর দিয়েছিল। এইভাবেই শুরু হল কবর দেওয়ার প্রচলন। কিন্তু একথাও স্মরণে বাখা দরকার যে, প্রাচীনকালের সেই প্রথার বহু রূপান্তর ও পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

কবরের আকৃতি সম্পর্কে প্রচলিত মত হল, কবর মৃত ব্যক্তির চেয়ে সামান্য লম্বা হওয়া দরকার এবং প্রস্থ হবে দৈর্ঘ্যের অর্ধেক। কবরের গভীরতা মৃত ব্যক্তির পুরুষ ও মহিলার ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা হওয়া দবকার। পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রে কবর মৃত ব্যক্তির নাভি পর্যন্ত এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে কবব মৃত মহিলাব বুক পর্যন্ত গভীর হবে।

কবর সাধারণত দুই ধরনেব হয়। এক ধরনের কবরকে বলা হয় বগল খোঁড়া ও অন্য আর

একপ্রকার কবরকে বলা হয় সিন্দুকী কবর। অবশ্য মাটির অবস্থা বিবেচনা করে এই কবর খোঁড়া হয়। লাশ কববস্থ করাকে বলা হয় দাফন। পুরুষ ও মহিলা কবরে শোয়ানোর ক্ষেত্রে দু'ধরনের নিয়ম মেনে চলতে হয়। কবরে নামানোর ক্ষেত্রে মহিলা বা স্ত্রী-লোকদের তারাই নামাবেন যারা তাঁকে বিবাহ করতে পারবেন না। অর্থাৎ ইসলাম শাস্ত্রানুযায়ী সেই মৃত মহিলার সঙ্গে যার যার বিবাহ নিষিদ্ধ, একমাত্র তারাই কবরে শোয়াতে পারে। এরা হলেন পুত্র, পৌত্র, পিতা, নিজ ভাই, চাচা, দাদু ইত্যাদি। এমনকী এদের অনুপস্থিতিতে কোনো সৎ আদর্শবান বৃদ্ধ মৃত মহিলাকে কবরস্থ করাতে পারেন। কবরে দেওয়ার সময় স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে পর্দা করতে হয়। অর্থাৎ পরিষ্কার কাপড় দিয়ে আড়াল করে কবরে দিতে হয়। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে যে কোনো আত্মীয় পুরুষ মৃত ব্যক্তিকে বহন করে কবরে শোওয়াতে পারে—এরজন্য কোনো বিধিনিষেধ জরুরি নয়। মৃত ব্যক্তিকে কবরে উত্তর দিকে মাথা ও দক্ষিণে পা রেখে শুইয়ে দিতে হয়, এবং লক্ষ রাখতে হয় যেন মৃত ব্যক্তির মুখ থাকে কেবলার (অর্থাৎ পবিত্র তীর্থস্থান মক্কার কাবাঘর) দিকে।

ইসলাম ধর্মে আস্থাশীল মুসলমানদের বিশ্বাস মৃত্যুর পর আত্মার বিনাশ হয় না। মানুষের দৈহিক শরীর বিনষ্ট হয় মাত্র—কিন্তু প্রকৃত অর্থে কবরে শোওয়ানোর পর মৃতের দেহে তাঁর পূর্ব আত্মাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এবং এই কববে মৃত ব্যক্তির পূর্বকৃত কৃতকর্মের ফল-ভোগ ঘটতে থাকে। সেইজন্য বলা হয় কবর হল পরকালের প্রথম ধাপস্বরূপ। এই কবরেই বোঝা যায় মৃত ব্যক্তির পরিণাম কি হতে পারে। আল্লাব প্রেরিত দূত এবং শ্রেষ্ঠ নবী হজবত মহম্মদ (মঃ) বলেছেন—'কবব আর কিছুই নয়, এটা নিজের কৃতকর্মের সিন্দুক। এর ভিতর প্রবেশ করলে ইহ-জীবনের সমস্ত কার্যকলাপ দেখতে পাবে।'

প্রত্যেক মানুষ মরণশীল। কিন্তু মানুষ মৃত্যুর কথা স্মরণে আনে না। আমরা পৃথিবীতে বসবাসপূর্বক বহুবিধ ভোগ-বিলাসে মত্ত থেকে জীবন অতিবাহিত করি। অথচ এমন একদিনও নেই, যেদিন কবব মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় না যে, একসময় তোমাকে আমার কাছে আসতে হবে। অক্ষয় কীর্তিব অভিলাষী মানুষ দর্পভরে কবরকে অস্বীকার করে। কিন্তু বাস্তব হল আমাদের জীবন ত্রিস্তরের মধ্যে দিয়ে গমনাগমন করতে থাকে। জন্মের পূর্বে মানুষ অবস্থান করে মাতৃগর্ভে, জন্মগ্রহণ করার পর পৃথিবীর গর্ভে এবং মৃত্যুর পর কবরের অন্ধকার মাটির গর্ভে। সেইজন্যই বলা হয়েছে প্রত্যেক মানুষকে কবর আহ্বান করে বলতে থাকে—আমাকে স্মরণ কর। সে আরও বলে—''আনা বায়তুল গারবাতো অ-আনা বায়তুল্ ওয়াদ দাতা অ-আনা বায়তুত্ তোরাবে অ-আনা বায়তুদ

দুদে অ-আনা এইজা দাফেনীল্ আব্দোল্ মুমেনো কালা

লাহোল কাব্রো মারহাবা।''—(আল-কোরান)

অনুবাদ—'আমি গরিব (নিরাশ্রয়) গৃহ, আমি একত্ববাদীর গৃহ, আমিই মৃত্তিকার, আমিই কীট-পতঙ্গ ও পিপীলিকার গৃহ। যখন মোমেন বান্দাকে দাফন করা হয়, তখন তাহাকে ধন্যবাদ (মারহাবা) জ্ঞাপন করিতে থাকি।'

শুধু তাই নয়, হাদিসে (হজরত মুহাম্মদ (মঃ)-এর বাণী) আছে যে, মানুষকে কবরস্থ করার পর যখন কোনো মানুষ কবরের সন্নিকট দিয়ে গমন করে, তখন সেই কবরবাসী পথচারী

মানুষের জুতোর আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পায়। এবং উক্ত মৃত ব্যক্তি বলতে থাকে হে অমনোযোগী, আমি যা জানতে পেরেছি—তুমি যদি তা জানতে, তাহলে নিশ্চয় তোমার মাংস শরীরের ওপর খুলে যেত এবং তোমার চর্বিও দেহের ওপর গড়িয়ে পড়ত। সুতরাং বলা যায় মৃত ব্যক্তির (মুসলমানের) জন্য কবর যেমন অনিবার্য—তদরূপ এও সত্য যে কবরবাসী জীবিত।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মৃতব্যক্তিকে কবরস্থ করার নামই দাফন। এই দাফনের পর মৃত ব্যক্তির নির্জীব দেহে আত্মাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আত্মা দু'ধরনের—কিন্তু দ্বিবিধ হলেও একবস্তু। যথা রুহ্ ও রওয়া (আত্মা ও অনুআত্মা)। তবে এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, আত্মার বিচ্ছেদ হলে শারীরিক সক্ষমতা নষ্ট হয়। অন্যদিকে রওয়া (অনুআত্মা) ঘুমন্ত অবস্থায় দেহ থেকে নির্গত হলেও চৈতন্য প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেহে ফিরে আসে। সেইজন্যই বোধহয় হিন্দুমতে আত্মাকে পঞ্চভূত বলে। অনুআত্মার বিচ্ছেদে শরীরে শক্তি বহাল থাকে, কিন্তু আত্মার বিচ্ছেদে মৃত্যু ঘটে। বলাবাহুল্য, মৃত্যুর সময় ভিন্ন আত্মা মানব শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না বা অন্যত্র গমন করে না। একটা উদাহরণ দিলে স্পষ্ট হয়। জল যখন কোনো বড় পাত্রে থাকে এবং তাতে সূর্যের রশ্মি পড়লে দেখা যায় উক্ত রশ্মির প্রতিচ্ছবি দুলতে থাকে। বাস্তবে কিন্তু কেউ সেই পাত্রকে নাড়াচাড়া করছে না। অনুআত্মাও ঘুমন্ত অবস্থায় শরীর থেকে নির্গত হয়ে যায় এবং সে অনেক কিছু দর্শন করে—একেই বলা হয় স্বপ্ন। স্বপ্নভঙ্গের পরে সে আবার শরীরে ফিরে আসে। মুসলমান ধর্মমতে কবরস্থ মৃত ব্যক্তির দেহে পুনরায় আত্মাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাঁর প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য।

এখন প্রশ্ন হল মৃত ব্যক্তি কবরে কিরূপ অবস্থায় থাকে? কোনো মানুষ মৃত্যুর পর যখন কবরের মাটিতে প্রবেশ করে তখন পুনরায় তাঁর দেহে আত্মাকে প্রবেশ করিয়ে প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন কবরে কি মৃত ব্যক্তি জীবিত থাকে? উত্তরে এককথায় বলা যায়—হ্যাঁ, বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, কোনো ধার্মিক, সৎ মুসলমানের কবরের কাছে গিয়ে যদি কোনো ব্যক্তি সালাম দেয়—তাহলে সেই কবরবাসী সালামের উত্তর দেয়। মুসলিম ধর্মমতের বিখ্যাত ইমাম সুবকী তাঁর 'শিক্ষায়ে সিকামে'—গ্রন্থে এপ্রসঙ্গে বলেছেন, মৃত্যুর পর রূপ জীবিত ও সে জানিতে পারে—এটাই সমস্ত মুসলমানের মত, অর্থাৎ বলা যায় যখন কোনো মানুষের মৃত্যু ঘটে তখন সে ইহলোক বা পৃথিবীলোক পরিত্যাগ করে অদৃশ্য লোকে পৌঁছে যায়, তাকে কবরস্থ করা হোক না হোক—কারণ মৃতদের মাঝে অনুভূতি এবং চেতনা বজায় থাকে। নবীকুলের শ্রেষ্ঠ শিরোমণি হজরত মহম্মদ (সঃ) বলেছেন যে, মৃত লোকদিগকে বাহ্যত আমরা প্রাণহীন মনে করলেও আসলে তাঁরা জীবিতই। হজরত সঈদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বলেছেন যে, কোনো লোক মৃত্যুর পর যখন কবরে প্রবেশ করে তখন তাঁর মৃত আত্মীয়গণ তাঁকে এমনভাবে সম্বর্ধনা জানায় যেমনভাবে পৃথিবীতে কোনো প্রিয় ব্যক্তির আগমনে গৃহকর্তা সন্তুষ্ট হয়ে অভিবাদন জানায়। উদ্ধৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই।— বরং বলা যায় কবরে মৃত ব্যক্তির আত্মা জীবিত থাকে, যদিও তার দেহ নষ্ট হয়ে যায়। মৃত্যুর পর কবরে প্রবেশ আসলে অবস্থার পরিবর্তন মাত্র। এ সম্পর্কে বলা যায় মানুষের মৃত্যুর পর থেকে পৃথিবী ধ্বংসের পূর্ববর্তী সময়কে বলা হয় 'বরযখ' বা 'অদৃশ্যলোক'। এই 'বরযখ' শব্দের অভিধানিক অর্থ হল পর্দা বা প্রতিবন্ধকস্বরূপ। কবর হল সেই অদৃশ্যলোকের প্রথম সোপান—যেখানে মানুষ কৃতকর্মের ফল ভোগ করে থাকে।

আমরা অনেকে দেখেছি যে, মুসলমানদের কবর অনেক ক্ষেত্রে পাকা গাঁথুনি-বিশিষ্ট করা হয়। পীরের থানের ক্ষেত্রেও প্রায় সব কবরস্থানই ইটের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এবং লম্বা গম্বুজ-বিশিষ্ট। যদিও এ-বিষয়ে মতভেদ আছে যে এটি বৈধ কিনা? অর্থাৎ কবরকে ইটের গাঁথুনি দিয়ে ঘেরা যায় কিনা? আমরা বিভিন্ন মতাদর্শকে সামনে রেখে বলতে পারি কবরের উপরিস্থলে এই গাঁথুনি বৈধ। অনেকে হজরত মুহম্মদ (সঃ)-র একটি হাদিসের উল্লেখ করে এটি অবৈধ বলেছেন। উক্ত হাদিসে আছে তিনি বলেছেন কবর পাকা করা, তার ওপর ঘর করা নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। এখানে কবর বলতে তিনি কবরের ভিতরের অংশ অর্থাৎ পৃথিবীর উপরিতলের নীচের স্তর বা মাটির নীচের স্তরকে বুঝিয়েছেন। কবরের ভিতরের অংশে পাকা ইটের গাঁথুনি নিষিদ্ধ। কিন্তু উপরের অংশে গাঁথুনি অবৈধ নয়। এর কারণ স্বরূপ বলা যায় আরব দেশে অন্ধকারময় যুগে অমুসলিম কবরের ওপর অবিকল ঘর তৈরি করত এবং সেই স্থানকে উপাসনাস্থল হিসাবে গড়ে তুলত। এখন অবশ্য এরূপ ঘর তৈরির প্রচলন খ্রিস্টানদের মধ্যে আছে। কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের সমাধিক্ষেত্রে এরূপ ঘরযুক্ত কবরের দৃষ্টান্ত মেলে। সেইজন্য মুসলমানদের কবরের উপরিভাগে ইটের গাঁথুনি দেখা যায়—যা বৈধ না অবৈধ তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থাকলেও বলতে পারি যে, কবরের উপরিভাগে ইটের গাঁথুনি অবৈধ নয়। এর স্বপক্ষে বলা যায় 'ফাতাওয়ায়ে তাহতাবী' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, যদি মৃতের সংলগ্ন পাকা ইট লাগানো হয়, তাহলে এটা অবৈধ হবে। কিন্তু কবরের নিম্নভাগ ব্যতিরেকে অন্যস্থানে পাকা ইটের গাঁথুনি লাগালে অবৈধ হবে না। এছাড়াও কবরকে ঘর বানানো, তার উপব বসা, নিদ্রা যাওয়া এবং সেখানে প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করা—এ সমস্তই নীজাশেষ বা অবৈধ।

এক্ষণে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, কববেব শাস্তি কিরূপ হয়, বা কবরে শোওয়ানোর পর মৃত ব্যক্তিব সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা হয়? এটা অবশ্য স্বীকার্য যে, মুসলমান মৃত ব্যক্তির অদৃশ্য লোকের বা পরকালের প্রথম সোপান হল কবর। এই প্রথম পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হতে পারেন তাদের প্রতি সৃষ্টিকর্তার অনুকম্পা বর্ষিত হয়। মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করাব পর মৃতের দেহে তাঁর আত্মাকে পুনঃপ্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া হয়। তারপর দু'জন স্বর্গীয় দূত বা ফেরেশ্‌তা যাদের নাম মুনকের ও নকীর-এর আগমন ঘটে। এই দু'জন দূত কবরস্থ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেন—

—তোমার সৃষ্টিকর্তা কে?

—তোমার ধর্ম কী?

—তোমাদের কাছে কাকে সৃষ্টিকর্তার দূত স্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছিল?

—পৃথিবীতে বাসকালীন তুমি কি কি কাজ করেছিলে? ইত্যাদি

যে ব্যক্তি এসকল প্রশ্নমালার উত্তর সঠিকভাবে দিতে পারেন—তাদের স্বর্গীয় সুখ অনুভব করানো হয়। তখন স্বর্গীয় বা বেহেশতী শান্তি ও সুঘ্রাণ অনুভব করতে থাকে এবং তাঁর কবরটিকে মৃত ব্যক্তির দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত প্রসারিত করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে যে মৃত কবরবাসী এসকল প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে সঠিক উত্তর প্রদানে অক্ষমতা প্রকাশ করে তাদের নরক বা দোজখের শাস্তি দেওয়া হয়। উত্তরদানে অক্ষম ব্যক্তির জন্য কবরে আগুনের বিছানা করে দেওয়া হয় এবং

তাঁর কবরকে এমন সংকুচিত করে দেওয়া হয় যে কবরের মাটির চাপে মৃতের শরীরের পাঁজর এক দিক থেকে অন্যদিকে চলে যায়। এছাড়াও আরও বহুবিধ কষ্টকর শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

কবরের আজাব সত্য। এ সম্পর্কে মুসলমান ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন পন্থীগণও কবরের আজাব বা শাস্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন বক্তব্যকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে। এইজন্যই বোধহয় ইতিহাস খ্যাত মুসলমান প্রতিনিধি বা ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত ওসমান গনি (রঃ)কে দেখা যেত তিনি যখন কোনো কবরের কাছ থেকে যাতায়াত করতেন, তখন বেশি করে কাঁদতেন এইজন্য যে—এটা হল মৃত্যুর পর পরলোকের প্রথম সিঁড়ি। যে ব্যক্তি কবরে মুক্তি লাভ করে পরবর্তীতে তাঁর স্বর্গলাভে কঠিনতার সম্মুখীন হতে হয় না। ফলে বলা যায় কবরের খবর যেমন সত্য,. তেমনই তার শাস্তিও অনিবার্য সত্য।

কবরের শাস্তি যদি সত্য হয় তাহলে প্রশ্ন উঠে আসে জীবিত মানুষ কেন স্বচক্ষে দেখতে পায় না? আমরা জানি কবরস্থ মৃত ব্যক্তির আওয়াজ জ্বীন ও রক্ত মাংসের জীবিত মানুষ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত প্রাণী শুনতে পারে। আমাদের কৌতূহল হয় যে, এ-দুই জাতির মধ্যে কী রহস্য রয়েছে যে এরা কবরের আওয়াজ শুনতে পায় না? আসলে মানুষ যদি কবরের আওয়াজ অনুধাবন করতে পারত বা কবরের শাস্তি সম্পর্কিত খবরাখবর শুনতে পেত—তাহলে মানুষ সৃষ্টিকর্তার প্রতি নিজেদেব মনকে দৃঢ় করে রাখত। পৃথিবীর অন্য সমস্ত ক্রিয়াকর্ম পরিত্যাগ করে মানব সম্প্রদায় তখন স্রষ্টাব উপাসনায় নিজেকে সর্বদা ব্যাপ্ত বাখত। এইজন্যই পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা কবরের খবর মানুষের কাছে অবিদিত রেখেছেন।

এ প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে, ধর্মেব প্রতি, সৃষ্টিকর্তার (অদৃশ্য) প্রতি, তাঁর অদৃশ্য ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাসের নামই ঈমান। সমস্ত কিছুকে গবেষণাগাবে পরীক্ষা করে বিশ্বাস করার নাম ঈমান নয়। এ জগতে এমন কিছু বস্তু এখনও আছে যাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। কথায় আছে 'ধর্মে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর'। আর বিশ্বাস শব্দের অর্থই হল বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা। এই বিশ্বাসই সৃষ্টিকর্তার কাছে গ্রহণযোগ্য এবং এর বিনিময়ে তিনি 'আল-কোরআন'-এ ঘোষণা করেছেন—

"নিশ্চয় যে সমস্ত লোক আল্লাহকে না দেখিয়াও ভয করে তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার নির্ধারিত।"

কবরের শাস্তি দেখে প্রত্যক্ষ করে তার উপর বিশ্বাস বা ঈমান স্থাপন কবা আল্লার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সেইজন্য তিনি ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ 'আল-কোরআন-এ' ঘোষণা করেছেন—"ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের ঈমান গ্রহণ কোনো কাজে আসিবে না, যেহেতু তারা আমার আজাবের (শাস্তির) নির্দেশ সমূহ দেখে ফেলেছে।"

এছাড়াও আরও একটি কারণ উল্লেখ করা যায়, যেজন্য মানুষ কবরের আওয়াজ কর্ণগোচর করতে পারে না তা হল, কবরের আওয়াজ এত ভয়ঙ্কর যে মানুষ শুনতে পেলে আত্মসংবরণ করতে না পেরে আতঙ্কে অচৈতন্য হয়ে পড়ত। এ সম্পর্কে মহানবী বলেছেন—মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে দেওয়া হয় তখন সে বিলাপ করতে থাকে, তার বিলাপ মানুষ শুনতে পায় না, মানুষ শুনলে চৈতন্য হারিয়ে লুটিয়ে পড়ত। সুতরাং এসকল কারণেব উল্লেখের প্রতি দৃষ্টি রেখে বলতে পারি কবরের শাস্তি মানুষের কানে পৌঁছায় না।

কবর সম্পর্কিত খবরে আরও কয়েকটি কথা বলে শেষ করা যায় যে, কবরের মাটি কারও নিজস্ব সম্পত্তি নয়। এটি যৌথ সম্পত্তির অংশ। এখন অবশ্য দেখা যায় কিছু মানুষ বা কতকগুলি পরিবার কিছু কিছু নিজস্ব কবরখানা তৈরি করছে এবং বিভিন্ন উপায়ে সেই কবরস্থানকে সংরক্ষণ করার চেষ্টাও করছে। বর্তমানে কলকাতা পুরসভাব অধীনে দুটি বিখ্যাত কবরখানা রয়েছে— যেখানে কলকাতাবাসী মৃত মুসলিমদের কবর দেওয়া হয়। কোনো মৃত ব্যক্তির পরিবার কবরে পাকা ইটের গাঁথুনি করতে ইচ্ছুক হলে তাদের উক্ত জায়গাকে কিনে নিতে হয়। এখন অবশ্য কবরকে সংরক্ষণ ও উন্নত করাব জন্য সরকারি উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। এব্যাপারে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম বড় বড় কবরস্থান সংরক্ষণ করার জন্য অর্থ সাহায্য করে থাকে। আমার জানা দু'একটি কবরস্থানের কর্তৃপক্ষ এভাবে সরকারি আনুকূল্যে ও অর্থ সাহায্যে কবরস্থানকে প্রশস্ত ও উন্নততর করেছে।

উদ্ধৃতি : ১. নেয়ামুল কোরআন, শামসুল হুদা, ১৯৯৮, পৃ. ৩৯০।

৪ আগস্ট ১৮২১। ২১ শ্রাবণ ১২২৮

মৃত্যু — দিল্লীর বর্ত্তমান শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের দ্বিতীয় পুত্র মীরজা জাহাঙ্গীর বাহাদুরের ১৮ জুলাই তারিখে মোকাম এলাহাবাদে মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বয়ঃক্রম বত্রিশ বৎসর হইয়াছিল এবং তিনি অতিসুন্দর পুরুষ ছিলেন তাঁহার অপস্মর রোগ অর্থাৎ মৃগী রোগ ছিল। যে দিবস তাঁহার মৃত্যু হইল ঐ দিবস বৈকালে তাঁহার কবর দিতে যখন লইয়া গেল তখন হাতী ও ঘোড়া গাড়ী প্রভৃতি সঙ্গে গেল ও হিন্দু মুসলমান প্রায় ৫০ হাজার লোক সঙ্গে গেল তাঁহাকে উত্তম সিন্ধুকে সবুজ বর্ণ রেশমী বস্ত্রে আবৃত করিয়া ও রেশমী চাদর উপরে টানাইয়া জুম্মা মসজিদে লইয়া গেল। তথাকার জজ ও কালেক্তর ও রেজেস্টর ও সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভৃতি সাহেবেরা সে স্থানে পূর্ব্বে গিয়াছিলেন সকলে থাকিয়া শাহাজাদাকে মসজিদে লইলেন পরে সে দেশের অতিপ্রাচীন নব্বই বৎসর বয়স্ক ও সকল মৌলবীর মধ্যে প্রধান শ্রীযুত শাহ আজমল কোরাণ প্রভৃতি পাঠ করিলেন এবং পাঠ সাঙ্গ হইলে তাঁহার বয়ঃক্রম বৎসরের অনুসারে গড়ে বত্রিশ তোপ হইল এবং মাস্তুলের নিশান অৰ্দ্ধ মাস্তুল পর্য্যন্ত সকল দিন টানান ছিল। পরে মসজিদ হইতে সিন্ধুক সমেত পুনর্ব্বার চসরুর বাগানে লইল তাহার অগ্রে সৈন্য চলিল ও শোক চিহ্ন বাদ্য চলিল পশ্চাৎ সাহেব লোকেরা ও ওমরা লোকেরা চলিলেন সেই বাগানে গিয়া তাঁহাকে কবর দিল। মোকাম কলিকাতাতেও শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব হুকুম দিয়াছেন যে বাদশাহজাদার সংভ্রমার্থে গড়ে বত্রিশ তোপ হইবে ও অৰ্দ্ধ মাস্তুল পর্য্যন্ত নিশান উঠান যাইবেক।

— সমাচার দর্পণ

□ লেখক পরিচিতি—প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ।

পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই

অনুরাধা সরকার

১৯৮৩ সালে মধ্যপ্রদেশে গায়ত্রী। ১৯৮৬-তে এ রাজ্যেরই উমারিয়া গ্রামে ২৫ বছরের এক মেয়ে সেও সতী হয়। ১৯৮৭ সালে রাজস্থানের ১৮ বছরের সুন্দরী ক্ষত্রিয় যুবতী রূপাকানোয়ার। জয়পুর শহরের আধুনিকা, উচ্চবর্ণের রাজপুত। এ গেল বিশ শতকের শেষের দিক। আর ২১ শতকে ২০০২ সালের ৬ই আগস্ট মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের বুন্দেলখণ্ডের তামোলি পাটনা গ্রামের ৬৫ বছরের কুট্টুবাই। তিনি জাতিতে নাপিত। ৭০ বছরের বৃদ্ধ মাল্লু সেননাইয়ের চিতায় অন্তত: হাজার খানেক গ্রামবাসীর সামনে—এই নারীমেধ যজ্ঞের প্রধান হোতা ছিল তাঁরই আদরের বড় ছেলে অশোক। 'সতী মাঈ কি জয়'— এই ধ্বনিতে যখন গোবলয়ের আকাশ বাতাস মুখরিত তখন লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায় আমাদের। রাগে, ক্ষোভে চড় কষাতে ইচ্ছে করে আধুনিক একুশ শতকের চকচকে দু'গালে।

পুরুত ও পুরুষ শাসিত সমাজে নারীকে যুগে যুগে কত যাতনাই না সয়ে যেতে হয়েছে! অথচ বিপদে পড়ে নির্লজ্জের মত সেই পুরুষেরাই দ্বারস্থ হয়েছে নারীর। ওই যেমন মহিষাসুর বধের প্রসঙ্গ। নিজেদের অস্ত্রগুলো নারীকে দিয়ে বীর দেবতারা বলেছেন—ভয় নেই লড়ে যাও, আমরা আছি পিছে, মানে ওই বহুদূরে চালচিত্রের গোপন প্রকোষ্ঠে, নিরাপদ দূরত্বে। নারী যোদ্ধা বিপন্ন হলেই যেখান থেকে নিরাপদে দ্রুত সট্‌কে পড়া যাবে। কিংবা মনে করুন সত্যবাদী পুরুষ যুধিষ্ঠির প্রমুখের জুয়াখেলার দান হয়ে যায় গৃহবধূ দ্রৌপদী। শত শত বীরপুরুষের সামনে তার শরীর দর্শনের লালসা বা দর্শকাম চরিতার্থতায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে তথাকথিত বীরপুঙ্গবের দল। কিংবা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কৌশলে স্বামীর প্রাণশক্তি ফিরিয়ে নেয় সাবিত্রী। আর কি নৃশংস সেই দেবগণ! একে তো মৃত-পচা গলা (গঙ্গার তীরে সতীদাহ পুণ্যের কাজ। তাই চার পাঁচদিন ধরে পায়ে হেঁটে হবু সতীকে গঙ্গার তীরে আসতে হত। এদিকে তখন শব পচতে শুরু করত।) শব ও দুর্গন্ধের ভেতরে দিনের পর দিন কাটিয়ে--অনিদ্রায় অনাহারে শীর্ণা বেহুলাকে পরম শোকাচ্ছন্ন হয়েও দেবসভায় এমন নাচ দেখাতে হয় যার কাছে রম্ভা, মেনকা, উর্বশীরাও হার মেনে লজ্জায় মুখ ঢাকেন। দেবতারা এতটাই খুশি হন যে সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দেন লখীন্দরের পুনর্জীবনের। প্রিয় পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পারছেন রম্ভা, উর্বশী, মেনকারা কোন রাবীন্দ্রিক নৃত্যে ইন্দ্র প্রমুখ শিথিল চরিত্রের লম্পট দেবগণকে খুশ্ করতে পারেননি। তাহলে বেচারি বেহুলাকে তথাকথিত সতীত্বের তকমা পেতে কি বেলেল্লা নৃত্যই না করতে হয়েছিল! অবশ্য পুরাণে আর ধর্মের মোড়কে এসব প্রায় নগ্ন-নৃত্য একেবারে শুদ্ধ, পবিত্র নৃত্যে রূপান্তরিত হয়ে যায় আর কি। কিন্তু আপনার আমার আধুনিক যুক্তিবাদী মন কী বলে?

মন্দ ছিল না বেদের যুগ। অন্তত ঋগ্বেদের। সেকালে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী স্বামীর চিতাপার্শ্বে সতীত্বের প্রতীকী অভিনয় করত। সে যখন মৃত স্বামীর চিতা পাশে শুয়ে আছে—তখন দেবরস্থানীয় কেউ তার হাত ধরে বলত—"হে নারী, সংসারের দিকে ফিরিয়া চল.—গাত্রোত্থান কর, তুমি যাহার নিকট শয়ন করিয়া যাইতেছ, সে গতাসু অর্থাৎ মৃত হইয়াছে। চলিয়া এস, যিনি তোমার

পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই পতির পত্নী হইয়া যাহা কিছু কর্তব্য ছিল সকলই তোমার করা হইয়াছে।'' অসাধারণ। এতো সদ্য বিধবাকে নুতন করে জীবনদান। তারপর এসে গেল বোধহয় নিয়োগ প্রথা। দেবর স্থানীয় কেউ একজন তার স্বামী হয়ে যেত কালক্রমে। কিংবা 'সন্তান' উৎপাদন করতেও পিছপা হত না।

কিন্তু নারীর কপালে সুখ বেশিদিন বোধহয় সহ্য হয় না। অথবা সুখী হতে দেওয়া হয় না। তাই পুরুষ শাস্ত্রকাররা নারীকে কল্পিত স্বর্গের (স্বর্গ সাতটি। যম, ইন্দ্র, বরুণ, কার স্বর্গ কে জানে?) লোভ দেখিয়ে বললেন—হে নারী যারা স্বামীর চিতায় স্বেচ্ছায় সহমৃতা হন তাবা যে সতী, মহাসতী হন। আর মানুষের দেহে যেমন সাড়ে তিনকোটি লোম আছে তেমনি সাড়ে তিন কোটি বছর সেই সতীরা অক্ষয়স্বর্গ লাভ করবে। শুধু কি তাই, প্রতিব্রতা সতীর পরকালের কথা ভাবো। যে পরকাল—শুধু কল্পনার ধুম্রজালে আবৃত। পণ্ডিতেরা বলতে শুরু করলেন পরকালের নানান বানানো শ্লোক আর কল্পগল্প। মহাভারত প্রসঙ্গও এলো। অসুস্থ পাণ্ডুরাজার উপর নির্দেশ ছিল যেন— তিনি স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস না করেন। কিন্তু মাদ্রীর রূপ দর্শনে একদিন এতই কামাতুর হয়ে পড়েন যে রমণরত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এবার কুন্তী আর মাদ্রী দুই সতীনে ঝগড়া বাধে — কে সতী হবে। কুন্তী যেহেতু বড় তাঁর অধিকার বেশি, কিন্তু মাদ্রী বলেন যে অতৃপ্তি নিয়ে আমার পতিপরম গুরু পরলোকে গেছেন—সেখানে সম্ভোগ চরিতার্থ করতে হলে আমাকেই মরতে হবে! আর পরলোকে তো ইহকালের মতন খাওয়া দাওয়ার ফূর্তি আহ্লাদ সব চলে! শেষতক্ কুন্তী হার মানলেন। কিন্তু ওসব গল্প কারা যে কি খেয়ে বানালেন কে জানে! অত যে বিশিষ্ট ও বিতর্কিত পণ্ডিত মনু, তাঁর সংহিতাতেও কিন্তু এ প্রথার উল্লেখ নেই। অথচ তাঁর মৃত্যুর তিনশত বছরের মধ্যে এ প্রথার ডালপালা দ্রুত গজিয়ে মহীরূহে পরিণত হলো।

তাহলে গোলমালটা কোথায়? কি করে এ প্রথা শাস্ত্রসিদ্ধ হলো। কেন বা তার চটজলদি বিস্তার ঘটলো? এই সময় তো জেনিফার লোপেজদের সোনালি একুশ শতক! তবে এখনও কেন ঘটে চলেছে এই অমানুষিক বর্বর নারীহনন যজ্ঞি!

পাঠক, বুঝতে পেরেছেন আমরা সতীদাহের চর্বিত চর্বণ, ক্লিশে ইতিহাস লিখতে চাইছি না। 'কৌলিন্য প্রথা' নামক 'সিফিলিসের' যন্ত্রণাময় পরিণাম লিখনও নয়। শুধু কিছু কার্যকারণ সম্পর্কের অন্বেষণ করেত চাইছি মাত্র।

আপনারা বিশিষ্ট স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন বন্দ্যো-র নাম শুনেছেন— নিশ্চয়। যাঁর উপাধি ছিল ভট্টাচার্য। চৈতন্যের সমসাময়িক এই পণ্ডিত আটাশখানি, স্মৃতিতত্ত্ব' বা 'অষ্টবিংশতি তত্ত্ব' নামে বিখ্যাত গ্রন্থ লিখেছিলেন। এছাড়াও — তীর্থতত্ত্ব, দ্বাদশযাত্রা তত্ত্ব, গযা শ্রাদ্ধ পদ্ধতি, রাসযাত্রা পদ্ধতি এবং 'সঙ্কল্প' চন্দ্রিকা' নামে একখানি স্মৃতিগ্রন্থও লেখেন। তিনি নাকি বেদের শ্লোক কপি করার সময় সুকৌশলে একটি শ্লোক জাল করেন। 'অগ্রে'র স্থলে (অগ্নে) লেখাতেই 'সতীদাহ' শাস্ত্রসিদ্ধি পায়। মূল শ্লোকটি এরূপ—

'ইমা নারীর বিধবাঃ সুপত্নী রাজনেন সর্পিযা সংবিশংতু।
অনশ্রবোহমীবাঃ সুরাত্মাঃ আরোহংত্ব্য জনয়ো যোনিমগ্রে।।

মর্মার্থ : ''এই সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করিয়া, মনোমত পতি লাভ করিয়া, অঞ্জন

ও ঘৃতের সহিত গৃহে প্রবেশ করুন। এই সকল বধূ অশ্রুপাত না করিয়া, রোগে কাতর না হইয়া, উত্তম উত্তম রত্ন ধারণ করিয়া সর্বাগ্রে গৃহে আগমন করুন।''

উপরের ৭০ ঋকের 'যোনিমগ্রে' শব্দটিকে — রঘুনন্দনজী 'যোনিমগ্নে' রূপান্তর করে নাকি কৌশলে সতীদাহ প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন।

এই পণ্ডিত রঘুনন্দনজীর আরো দু একটি কীর্তির কথা বর্ণনা করা যাক। পূর্বে - ''অন্যান্য প্রদেশের ব্রাহ্মণদের পক্ষে সিদ্ধ চাউল, মুসুরির ডাল ও মৎস্য ভক্ষণ নিষেধ, কিন্তু বাঙ্গালার ব্রাহ্মণেরা এই সকলেই অভ্যস্ত ছিল। দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রঘুনন্দন বিধান দিলেন, ইহাতে দোষ নাই।

বাঙ্গালাদেশে বিধবারা পূর্বে নির্জলা একাদশী পালন করিত না, অনেকেই একাদশীতে ফল, মূল, দুগ্ধ প্রভৃতি লঘু আহার করিত। কিন্তু রঘুনন্দন ব্যবস্থা দিলেন, একাদশীতে বালিকা, বৃদ্ধা সকল বিধবাকেই একেবারে উপবাসী থাকিতে হইবে।'' (স্মার্ত রঘুনন্দন/শ্রী নলিনীনাথ দাশগুপ্ত/পুরাতনী পৃ. ১০৯-১১০)।

'পরাশর সংহিতায়' বিধবা বিবাহের সপক্ষে বলা হয়েছে—

''নষ্টে মৃতে প্রব্রর্জিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।

পঞ্চ সাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধয়তি।''

মর্মার্থ - স্বামী মারা গেলে, নিরুদ্দেশ হলে, সংসার ছেড়ে পালালে, ক্লীব স্থির হলে বা পতিত হলে, স্ত্রীলোক পুনরায় বিয়ে করতে পারে। আবার মনুও স্বয়ং তাঁর সংহিতায় বিধবা বিয়েকে সমর্থন করে বলেন -

''যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বায়চ্ছায়।

উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্চতে। ৯/১৭৫

মর্মার্থ - যে স্ত্রী বিধবা কিংবা স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা সে যদি স্বেচ্ছায় পুনরায় বিবাহ করতে চায়, পুত্রবতী হতে চায় - তবে সেই পুত্রকে 'পৌনর্ভব' আখ্যা দেওয়া যাবে।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে শাস্ত্রে সতীদাহের বদলে বিধবার পুনর্বিবাহের নিয়মও উক্ত হয়েছে— তাহলে কেন এই সতীদাহ?

বলা বাহুল্য সতীদাহ প্রথম দিকে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেই চালু ছিল। বিশেষত: কুলীন গৃহে। যাদের নাকি বিয়ের কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। কিন্তু তৎকালীন নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সতীদাহ ছিল না। এমনকি নারীরা শবযাত্রার সঙ্গিনীও হতো না। খুব বড় জোর প্রবেশদ্বারের গো-বরাট পর্যন্ত আসতে পারত। পণ্ডিতেরা বলেন— ''সতীপ্রথার মূল সম্ভবত কোন ভারতীয় উপজাতির আদিম রীতির মধ্যে পাওয়া যাবে। পরবর্তীকালে আর্য ও অন্যান্য আক্রমণকারী যারা এদেশে এসেছিল ও স্থায়ী বসবাস গড়ে তুলেছিল তারাও এই আদিম প্রথাকেই নিজেদের বিধি নিয়মের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিল।'' (কে. এম. আশরফ/হিন্দুস্তানের জনজীবন ও জীবন চর্চা/পৃ. ২০৮)। সতীদাহ প্রথা নাকি খুবই প্রাচীন। টমসন বলেছেন—আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনী পাঞ্জাবে এই প্রথার প্রচলন দেখেছিলেন।

আইন-ই-আকবরীতে সতী হবার পক্ষে ৪টি কারণ দেখানো হয়েছে — "A Hindoo wife

who is burnt with her husband, is either acuated by motives of real affection, or she thinks it her duty to confarm to custom; or she consents to avoids reporach, or else she is forced to it by her relations."

স্বপন বসু বলছেন—"এসব ছাড়াও রাতারাতি লোকের চোখে দেবী হয়ে ওঠার লোভ মেয়েদের সতী হবার একটা বড় কারণ।" (সতী/স্বপন বসু) দু চারজন এরকম থাকতেই পারেন, কিন্তু জলজ্যান্ত মেয়ে মানুষ আগুনে পোড়ার যন্ত্রণা সয়ে দেবী হয়ে উঠবে এযুক্তি একটু সরলীকরণই বলা চলে।

'সতী' হবার পেছনে একটি অন্যতম কারণ আবিষ্কার করেছেন শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি তাঁর গ্রন্থে লিখছেন—"মহা মহোপাধ্যায় কানে বলেন, একজন ইংরেজ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, হিন্দু ধর্মের পীঠস্থান কাশী অঞ্চলে বাঙ্গলা অপেক্ষা কম 'সতীদাহ হইয়াছে, ইহার কারণ কানে প্রদর্শন করেন, কাশীর আইন পুস্তক — মিত্রমিশ্রের 'বীরো মিত্রদয়' বিধবাদের স্বামীর ধনে অধিকারী করে নাই। অন্যপক্ষে আমরা দেখি বাঙ্গলায় প্রাচীনকাল হইতেই জীতেন্দ্রিয়, পরে জীমূতবাহন অপুত্রক, বিধবাকে তাহার স্বামীর ধনে জীবনস্বত্ব — (Life interest) প্রদান করিয়াছেন। ইহা বনিয়াদী স্বার্থের ক্ষতিকারক। এই জন্যই কি ইতিহাসের অর্থনীতির ব্যাখ্যার দ্বারা পরিচালিত হইয়া বেদের শ্লোকের জাল হইয়া সতীদাহ ব্যবস্থা প্রদত্ত হয়।" (ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি/২য় খণ্ড পৃ. ১৪৫-৪৬)

আবার রাজস্থানের ধিওবালা গ্রামের যুবতী 'সতী' রূপ কানোয়ারকে পুড়িয়ে মারার পিছনে নাকি ছিল সম্পত্তি যা তার শ্বশুর সুমের সিংহ এবং দেওর পুষ্পেন্দ্র সিং গ্রাস করে চেয়েছিল? আর ২০০২-এ মধ্যপ্রদেশের তামোলি পাটনা গ্রামের ৬৫ বছর বয়স্কা 'সতী' কুট্টু বাঈয়ের অধিকারে ছিল ৫ একর জমি। সে জমি দুই সুপুত্র আশোক আর রাজকুমার চটজলদি আত্মসাৎ করতেই এই কীর্তি করেছিল। আর তার সঙ্গে ছিল হিন্দুত্ববাদীদের ইন্ধন।

আমাদের এই এখনকার বাম রাজ্যে অতীতে এক মহান নেতা রামমোহন জন্মেছিলেন আর আঘাতটা এসেছিল তাঁর পরিবারের উপরেই। প্রিয়জন, শ্রদ্ধেয়া বৌদি অলকমণির সতী হবার ঘটনাই তাঁকে চরম বিদ্রোহী করে তুলেছিল। সে কাহিনি জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর 'সতী' গল্পে লিখেছেন। বোঝা যাচ্ছে আঘাতটা যদি কোনো নেতার পরিবারের উপরে আসে তবে কাজ হয়। সেকালে একালেও। জানিনা আজিকার গোবলয়ে তথাকথিত রামরাজ্যে কোনো প্রগতিশীল আধুনিক রামমোহন আসবেন কিনা—না হলে কালে কালে নারীকে 'সতীর' মত জ্যান্ত চিতায় পুড়তে হবে কিংবা সীতার মত পুড়ে মরার হাত থেকে রেহাই পেলেও শেষমেশ পাতালে (গভীরখাদে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা?) প্রবেশ করতে হবে, তাই না! পাঠক কী বলেন?

এই রচনা লিখতে সাহস জুগিয়েছে :
ঋগ্বেদের দেবতা ও মানুষ/ মৈত্রেয়ী দেবী
প্রাচীন ভারত/সুকুমারী ভট্টাচার্য
ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি/ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
বেহুলা/দীনেশচন্দ্র সেন

পুরাতনী/নলিনীনাথ দাশগুপ্ত
সতী/স্বপন বসু
জাতি ধর্ম ও সমাজ বিবর্তন/যতীন বাগচী
হিন্দুস্তানের জনজীবন ও জীবনচর্চা/ কে এম.আশরফ
আনন্দবাজার পত্রিকা/ভারততীর্থ—গৌতম চক্রবর্তী
গণশক্তি/একটি সামাজিক হত্যাকাণ্ড —রূপক ঘটক।

হিন্দুনারী শোভাযাত্রা করে সহমৃতা হতে চলেছে, ছবি : উইলিয়াম হজেস

□ লেখকপরিচিতি —গবেষিকা, প্রাবন্ধিক।

মৃতদেহ-সংকার, শ্মশানক্ষেত্র ঃ শুচি-অশুচি ভাবনা

শুভেন্দ্র ভৌমিক

হিন্দুদের শ্মশানক্ষেত্র আর খ্রিস্টানদের কবরস্থানের মধ্যে একটি রূপগত প্রভেদ বেশ প্রত্যক্ষ করা যায়। শ্মশানক্ষেত্র সচরাচর অপরিষ্কার—স্তূপীকৃত ছাইয়ের মধ্যে আধপোড়া কাঠের টুকরো, এমনকী অসম্পূর্ণ দাহের ফলে কোথাও কোথাও নরকঙ্কালের অংশবিশেষ, পরিত্যক্ত ফুল-মালা, বস্ত্রখণ্ড, দাহ-পূর্ব আচার-অনুষ্ঠানের অবশেষ ইত্যাদি দৃষ্টিগোচর হয়। কবরস্থান তুলনায় অনেক পরিচ্ছন্ন, এমনকী ক্ষেত্রবিশেষে সুসজ্জিত। বিভিন্ন স্থানে সুদৃশ্য মর্মরফলক ও বেদি তো আছেই, উপরন্তু ফুলের গাছ থাকাও সেখানে স্বাভাবিক। যেসব কবরস্থান অতটা যত্নলালিত নয়, অথবা পরিত্যক্ত, সেখানে বড়জোর আগাছা জন্ম নেয়, কিন্তু শ্মশানের মতো অপরিষ্কার তা হয়ে ওঠে না; আর হওয়ার সুযোগও পায় না। শ্মশানের মতো আবর্জনাময় হয়ে ওঠা কবরস্থানের পক্ষে কতকটা অসম্ভব। কেননা শ্মশানে যেহেতু শব দাহ করা হয়, তাই দাহজনিত ছাইয়ের মতো এমন পদার্থের উৎপত্তি হয়, যা নিজেই অত্যন্ত 'নোংরা' বলে গণ্য হয়ে থাকে। তাছাড়া অসম্পূর্ণ দাহের ফলে দেহাবশেষ বা কাঠের টুকরো যা রয়ে যায়, তাদের সম্পর্কে একই কথা খাটে। কবরস্থানে গোটা মৃতদেহকেই গভীর গর্তে শায়িত করার পর মাটি দিয়ে গর্তটি সম্পূর্ণ ভরাট করা হয়। খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে মৃতদেহ কফিন নামক কাঠের বাক্সের মধ্যে বন্ধ করা হয়, তাই শ্মশানের মতো অবাঞ্ছিত উপাদান পুঞ্জীভূত হওয়ার সুবিধা সেখানে পায় না। অধিকন্তু খ্রিস্টানদের কবরস্থান প্রায়শ গির্জা-সংলগ্ন অথবা প্রাচীরবেষ্টিত হওয়ায় তা অনেক অবাঞ্ছিত উপদ্রবের হাত থেকে রক্ষা পায়। খ্রিস্টানদের কবরের উপর অনেক সময়ে নির্মিত হয় প্রস্তরবেদি যা একটি অতিরিক্ত বাধা বা সুরক্ষাব্যবস্থা হিসাবে কাজ করে থাকে। শ্মশানের অপরিচ্ছন্নতা এবং কবরস্থানের অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্নতা—এই বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে মুসলিম গোরস্থান বা কবরস্থানকে এই নিবন্ধের পরিধির বাইরে রাখা হয়েছে। পরিচ্ছন্নতা/অপরিচ্ছন্নতার প্রেক্ষিতে এমন একটি আলোচনা জরুরি অবশ্য, তবে তা আপাতত করা সম্ভবপর হল না।

শ্মশানের মধ্যে অপরিচ্ছন্নতার উপাদান আছে, দাহ প্রক্রিয়াটি এই অপরিচ্ছন্নতার সহায়ক— সে কথা না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু তার এই অপকর্মকে সংশোধন করার প্রতিষ্ঠিত, এমনকী শাস্ত্রসম্মত বিধান ও রীতি আছে বলে তো মনে হয় না। এর কারণ কী? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে সনাতন ভারতীয় সমাজ-সভ্যতায় 'নোংরা' বা 'অপরিচ্ছন্নতার' ধারণা-বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করতে হবে।

সম্ভবত সনাতন ভারতীয় হিন্দু সমাজের ঐতিহ্যে, নোংরা বলতে আজ আমরা যা বুঝি, ঠিক তেমন কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। পরিবর্তে আমরা 'অশুচির' সন্ধান পাই, যার সঙ্গে পরবর্তীকালের বা আধুনিক মানুষের 'অপরিচ্ছন্নতা-বিষয়ক আচরণের সাদৃশ্য-সামঞ্জস্য থাকলেও দুটি ধারণা বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র। পরিষ্কার/অপরিষ্কার বৈপরীত্যের বিকল্প হিসাবে শুচি/অশুচি বৈপরীত্যটি হিন্দুসমাজে প্রাধান্য পেয়ে থাকত। প্রশ্ন হল, এই দুটি শব্দজোটের মধ্যে পার্থক্য কী?

সংক্ষেপে বলা যায় যে অপরিষ্কার ব্যাপারটি ক্ষণস্থায়ী এবং অপরিচ্ছন্নতা দূর করার পদ্ধতিগুলি সচরাচর ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র। যেমন হাতে ময়লা লাগলে আমরা জল বা সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলি। এক্ষেত্রে কোনো ধর্মীয় নির্দেশ অনুপস্থিত এবং এর ফলে হাতকে নির্মল বলে মেনে নেওয়া হয়। অশুচির নিরসন করা কিন্তু এমন সহজ-সরল নয়। প্রথমত. অশুচির প্রকোপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য স্পষ্ট ধর্মীয় অনুশাসন থাকে; দ্বিতীয়ত, অশুচির মধ্যে এক ধরনের স্থায়িত্ব আছে, তাই তা অপরিচ্ছন্নতার ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের থেকে অনেক পৃথক এবং অপরিচ্ছন্নতা সচরাচর দৃশ্যমান (visible), কিন্তু অশুচি অনেক ক্ষেত্রেই দৃশ্য নয়। অপরিচ্ছন্নতা দৃশ্যমান বলে তা বাস্তবও বটে; কিন্তু অশুচি প্রায়শ অদৃশ্য, অবাস্তব এবং প্রতীকী। স্বাভাবিকভাবে, অপরিচ্ছন্নতার প্রতিকারও বাস্তব, কিন্তু অশুচির প্রতিবিধান প্রতীকী।

মৃত্যু, শব, শ্মশান—এই বিষয়গুলি হিন্দু সমাজের কাছে অশুচি-সংশ্লিষ্ট। তাই তা পরিষ্কার/অপরিষ্কার বোধের বিবেচনাধীন নয়। এদেরকে কেন্দ্র করে এই সমাজভুক্ত মানুষের আচরণগত ব্যাপারগুলি প্রত্যক্ষ করলে তা বোঝা যায়। অন্যপক্ষে খ্রিস্টানদের কাছে মৃত্যু, শব, কবরস্থান প্রভৃতি বিষযগুলি কিন্তু ভিন্ন তাৎপর্য বহন করে, যার সঙ্গে অশুচির মতো কোনো ধারণার যোগ অনুপস্থিত এবং অপবিচ্ছন্নতা ধারণার যোগ ভিন্নভাবে আছে। আধুনিক কালে এই যোগ অনেকটা hygiene সম্বন্ধীয়—যা আধুনিক যুক্তিবাদী চিকিৎসা বিজ্ঞানের অবদান। সৎকারের পূর্বে মরদেহকে পচনেব হাত থেকে রক্ষা করার বিবিধ ব্যবস্থা ও যথাসম্ভব দ্রুত সমাধির ব্যবস্থা করা। এই বিষয়গুলি অবশ্য সর্বধর্মীয় মানুষরাই অল্পবিস্তর অনুসরণ করেন আজকাল। তবে তা তো প্রাথমিকভাবে ইয়োরোপীয় খ্রিস্টধর্মীয়দের থেকেই শেখা। এছাড়া কবরস্থলটিকে পরিচ্ছন্ন রাখার ভাবনার সঙ্গে public ও private space-কে পরিষ্কার রাখার চিন্তার সম্বন্ধ আছে। তবে সে আলোচনায় প্রবেশ করার আগে আমাদের শুচি/অশুচি ও পরিষ্কার/অপবিষ্কার—এই দ্বিবিধ বিপরীতার্থক শব্দজোটের মর্মার্থকে কিছুটা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

শুচি/অশুচির ধারণা ও তাদেব অন্তর্গত ভেদনীতি প্রায় আগাগোড়া ধর্ম-সামাজিক ব্যাপার। সনাতন হিন্দু সমাজে ধর্মের প্রভাব সমাজদেহে সর্বস্তরে ও সমস্ত পর্যায় জুড়ে পরিব্যাপ্ত। প্রকৃতপক্ষে সেখানে ধর্ম থেকে সমাজকে পৃথক করা যায় না বললেই চলে। আবার হিন্দু সমাজনীতি (বা ধর্মনীতি) পুরোপুরি জাতিভিত্তিক। এই জাতিভিত্তিকতার মূলে আছে জাতিভেদ বা জাতিগুলির পারস্পরিক ভেদের সম্পর্ক। এই পারস্পরিক সম্পর্ক শুচি/অশুচির ভিতের উপরে প্রতিষ্ঠিত। তবে শুচি/অশুচির এই ভেদটি প্রকৃতপক্ষে জাতিভেদ ছাড়াও আরও বহু ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত; জাতিভেদ এই সর্বব্যাপী ভেদের একটি প্রধান রূপ-বিশেষ। হিন্দু সমাজ সমস্ত ধরনের বিষয়কেই বিভিন্ন স্তরে ভাগ ও বিন্যস্ত করে থাকে।[১] একেকটি পর্যায় তার অগ্রবর্তী বা পশ্চাদ্‌বর্তী পর্যায়ের তুলনায় যথাক্রমে অল্প বা অধিক মাত্রাব শুচিতার অধিকারী। অধিকতর শুচিতার অধিকারীরা অপেক্ষাকৃত স্বল্পমাত্রার শুচিতার অধিকারীদের তাদের বৃত্তের বাইরে রাখার ব্যবস্থা করে। যদি বা কখনো তাদের সংস্পর্শ-দোষ ঘটে, তারা প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে সেই দোষ ক্ষালন করে। এই যে বৃত্তের ধারণাটির কথা আমরা বললাম তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ এবং অনুধাবন করবার জন্য

আমরা আরো একটি বিপরীতার্থক শব্দজোটের সাহায্য গ্রহণ করতে পারি—অন্দর ও বাহির (inside and outside)।

'অন্দর' অর্থে কিন্তু শুধুমাত্র অন্তঃপুর নয়, যদিও অন্তঃপুর অন্দরের উল্লেখনীয় বর্গবিশেষ। অন্দরকে আমরা বেশ কয়েকটি সনাতন হিন্দু-ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সমকেন্দ্রিক এবং/অথবা আংশিক সমাপতিত বৃত্তের (concentric and/or partially overlapping) সমন্বয় বলে মনে করতে পারি। যেমন কোনো ব্যক্তির যৌথ পরিবার, জাতি (caste) ও গ্রাম বা 'দেশ'।[৩] এইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই জীবনের যতখানি সম্ভব অতিবাহিত করবার রীতি ছিল ভারতীয় ঐতিহ্যে। অপরপক্ষে 'বাহির' ছিল অনেকটাই অচেনা-অজানা এবং সেইজন্য কতকটা বা ভীতিপ্রদ। তাই তার প্রতি অনুরক্ত ও যত্নবান হওয়ার তাগিদও বিশেষ থাকার কথা নয়। অন্দরের যত্নমণ্ডিত চেহারার বিপরীতে বাহির ব্যাপারে ভারতীয়দের অবিন্যস্ত, যত্নহীন ও বিশৃঙ্খল আচরণ প্রকট রূপ ধারণ করে থাকত। এমন মনোভাবের প্রতিফলন ইদানীংকালের ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতিতেও অনেক ক্ষেত্রে চোখে পড়ে। অন্দরকে পরিচ্ছন্ন (এবং শুচিসম্মত) করে রাখার নিরন্তর প্রয়াসের পাশাপাশি বাহিরকে যথেচ্ছ অপরিষ্কার (অর্থাৎ অশুচিময়) করার ঘটনা অবিরল। অবশ্য অন্দব ও বাহিরের এই বিপ্রতীপ রূপের পশ্চাতে কার্যকারণ-সম্বন্ধ এক ধরনের পরিপূরকতাকে নির্দেশ করে। 'অন্দরকে' শুদ্ধি করা হল উদ্দেশ্য, 'বাহিরের' অশুদ্ধ হয়ে ওঠা কতকটা তার ফল। অর্থাৎ, একটিকে শুদ্ধ করতে গিয়েই অপরটিকে অশুদ্ধ করে ফেলতে হয়। অশুচি অনেকটা স্থায়ী ও চরম হওয়ার দরুন অন্দরের মধ্যেই তাকে শুদ্ধ করা খুব কম ক্ষেত্রে সম্ভব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ কবা যায়—সনাতন ভারতীয় জীবনধারায় দেহকে অশুচি-মুক্ত করতে 'বাহিরের' সাহায্য নেওয়ার রীতিই ছিল প্রশস্ত। মল-মূত্র ত্যাগ থেকে শুরু করে স্নান পর্যন্ত সর্বপ্রকার দেহমল দূরীকরণের প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হত গৃহের বাহিরে। আবার যে ক্ষেত্রে মানুষের জমে থাকা মল বহন করে দূরে নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা নিতে হত, সেখানে এই বহনকারী জাতিকে অস্পৃশ্য ঘোষণা করে তাদেরকেই বহিষ্কৃত করা হত স্বজনগোষ্ঠী ও বসবাস অঞ্চলের বাইরে। সুতরাং শুচি ও অশুচির সম্পর্কটি বিপ্রতীপ হলেও এক অর্থে পরিপূরক, কারণ এক পক্ষের শুচিতা রক্ষার জন্য অন্য কোনো পক্ষকে অশুচি হতে হয়। ডোম জাতির মানুষদের জীবনের ইতিবৃত্তও অনেকটা মেথর সম্প্রদায়ের অনুরূপ। অশুচিময় শবকে নিশ্চিহ্ন করে মৃতের আত্মীয়বর্গকে শুচিতা দান করতে প্রয়োজন হয় ডোমদের। তবে এমন একটি সুশৃঙ্খল ব্যবহারিক (functionalist) ব্যাখ্যা হয়তো কতকটা একদেশদর্শী, নাহলে মেথর ও ডোমদের প্রতিনিয়ত সামাজিক অত্যাচার-অবিচারের শিকার হতে হবে কেন? ওই নিম্নজাতীয়রাও যে এমন উৎপীড়ন সর্বদা নীরবে সহন করে, তা-ও নয়। উচ্চবর্ণের দ্বারা এমন অবহেলা ও দমন-পীড়নের পশ্চাতে স্বজাতি ও নিজ শ্রেণির মানুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা ও সুবিধা ভোগের ব্যাপারটিকে সুনিশ্চিত রাখার চেষ্টাও বোধ হয় কাজ করে থাকে।[৪]

যা হোক, অন্যান্য প্রাণীর মৃতদেহ সহ মৃত মনুষ্যদেহও শেষ বিচারে বর্জনীয়, অতএব তা ত্যাজও বটে এবং 'বাহিরে' নিক্ষেপের যোগ্য। হিন্দু-দর্শনানুসারে যে আত্মা অবিনশ্বর ও পূত, মৃত্যুর পরে তার দেহত্যাগই বিধেয়। 'দেহত্যাগ' শব্দটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ একথা নিঃসন্দেহ।

কিন্তু এই দেহত্যাগ (ritual death) বিষয়টি আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রানুযায়ী শারীরিক মৃত্যুর (clinical death) মতো তাৎক্ষণিক ও চরম (absolute) নয়। বস্তুত, ধর্মীয় ঐতিহ্য প্রাণের থেকে আত্মাকে পৃথক করে দেখে। প্রাণ মুহূর্তমাত্রে চিরতরে দেহ-ত্যাগ করতে সমর্থ, কিন্তু আত্মা এই কাজটি সুসম্পন্ন করতে কিছুটা সময় নিয়ে থাকে। দেহ-বহির্ভূত হলেও তখনো সে দেহের আকর্ষণ থেকে পুরোপুরি মুক্তি পায় নি, ত্রিশঙ্কু এক অবস্থার মধ্যে পড়ে আছে। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দাহ হয়ে গেলেও তাকে অপেক্ষা করতে হয় শ্রাদ্ধের মতো পারলৌকিক ক্রিয়াদির জন্য। দৈহিক মৃত্যু ও আত্মার চূড়ান্ত মুক্তির মধ্যে কালের অস্তিত্বের এই বিশ্বাস হিন্দুদেরই একমাত্র—এমন মনে করা ভুল হবে। এ প্রসঙ্গে ('double obsequies') Robert Hertz তাঁর 'A Contribution to the study of the collective Representation of Death' প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৭]

হিন্দু সমাজে মৃতকে মুক্তিপথের অন্তিমযাত্রায় সহায়তা-দান তাঁর জীবিত আত্মীয়বর্গের কর্তব্য। আত্মীয়তার সূত্রে এক অর্থে তাঁরা এই মৃত্যুর অংশীদারও বটে। এই মুক্তিপথে অধিগমনের প্রথম বাধাটি হল মৃতের নশ্বর দেহখানি। তাই তাকে নিশ্চিহ্ন করাই বোধ করি শ্রেয়। এই ক্ষেত্রে দাহ-কার্য শ্রেষ্ঠ—কেননা দেহ মাটিতে পুঁতে দিলে তা লোকসমক্ষে অগোচর হয় বটে, কিন্তু আত্মার কাছে না-ও হতে পারে। দাহ-প্রক্রিয়া মৃতের লক্ষ্য-চরিতার্থতাকে সহজতর করে তুলবে—সম্ভবত এটি একটি কারণ দাহের মতো দৃশ্যত ও আপাত-নির্মম একটি প্রক্রিয়ার প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে।[৮]

মোট কথা, মৃত্যুর পরে মরদেহ যে শুধুমাত্র নিরর্থক হয়ে পড়ে তা-ই নয়, তা পরলোকগামী আত্মা ও তাঁর আত্মীয়বর্গের কাছে ক্ষতিকর ও বর্জনীয় বলে বিবেচিত হয়। দাহকালে অনেক সময়ে দেহকে যে নির্বিচারে আঘাত করতে হয় (rigor mortis নামক সমস্যার দরুন) এবং তা মৃতের আত্মীয় বন্ধুজন নীরবে, নির্লিপ্তভাবে যে মেনে নেন, তা বোধ করি সম্ভব হত না মরদেহের প্রতি এক ধরনের বিরূপ মনোভাব না থাকলে। পরমাত্মীয়ের দেহও মৃত্যুমাত্রেই 'body' বা 'লাশে' পর্যবসিত হয়—এই ব্যাপারটির সঙ্গে মৃতদেহের প্রতি এমন বিবিধ দুর্ব্যবহার বা ill treatment-এর সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নয়। এবং এইভাবে ভাবলে নিছক পুড়িয়ে ফেলাও কি এক ধরনের ill treatment নয়? তবে একথাও মানতে হবে যে 'লাশ' বলে স্বীকার না করলে প্রিয়জনের দেহকে বিনষ্ট করার শক্তি মৃতের স্বজনরা হয়তো পেত না। অর্থাৎ দাহক্রিয়া ও ill treatment-এর পারস্পরিক সম্পর্কটি ঠিক একমুখী নয়, বরং বলা চলে অন্যান্য বহু সামাজিক সত্যের মতো এক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট সবকটি বিষয় অন্য বিষয়গুলির শর্ত ও ফল—উভয়রূপেই বিরাজ করছে।

এই ill treatment-এর পিছনে মৃতদেহের সঙ্গে জীবিত ব্যক্তিদের ambivalent সম্পর্কের অস্তিত্বও একটি উল্লেখনীয় ব্যাপার। মৃত্যুভয় মানুষের একটি আদিম-অকৃত্রিম অনুভূতি। কিন্তু মৃত্যুর মতো এই ভয়টিও বুঝি-বা সচরাচর প্রচ্ছন্ন ও বিমূর্ত, কেননা মৃত্যুকে অনুভব করা জীবিতের পক্ষে অসম্ভব এবং মৃত্যু-বিষয়ে সে বিস্মৃত থাকতে পছন্দ করে। অথচ মৃতদেহের আবয়বিক উপস্থিতি এই ভয়কে প্রকট ও কতকটা মূর্ত করে তোলে। আবার উদ্দিষ্ট দেহটি যেহেতু জীবিত মানুষদের অনুরূপ, তাই কোনোভাবে হয়তো তারা ওই দেহটির সঙ্গে নিজেদেরকে একাত্ম

করে ফেলে ও আতঙ্কিত হয। স্বজনের মৃত্যুর ক্ষেত্রে এই আলোচনাটি স্বভাবতই অধিক প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে। যে মানুষটি জীবিতের কাছে ছিলেন পরম আদরণীয়, যাঁর দেহটি ক্ষণকাল পূর্বেও হয়তো-বা রমণীয বলে গণ্য ছিল, এবং যে দেহটির সঙ্গে তার এক ধরনের দেহ-সংস্পর্শ বা নৈকট্য ছিল স্বাভাবিক, অর্থাৎ যে দেহের সঙ্গে জীবিতের দেহ কতকটা অভিন্ন ধারায যুক্ত ছিল, সেই মানুষটির শরীর তো কতকটা তারও শরীর তাই এমন মানুষের মৃত্যু হয়তো তাকে নিজ মৃত্যুর নিকটবর্তী করে তোলে মনের গহনে। Ambivalence-এর উৎস এখানেই। আর সেই কারণে কখনো 'লাশ' বলে মেনে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে, কখনো অন্য নানাবিধ ill treatment-এর সহায়তায় (যেমন মৃতদেহকে স্পর্শ করলে জীবিত ব্যক্তিরা যে অশুচি হয়ে পড়ে, তাও তো মৃতদেহকে ক্ষতিকর ও অশুদ্ধি মনে করবার কারণে), এবং সর্বশেষে মৃতদেহকে ভস্মীভূত করার মাধ্যমে জীবিতরা মৃতদেহের সঙ্গে নিজেদের দূরত্ব নির্মাণ করে ও তাকে অদৃশ্য ও অস্তিত্বহীন করে দিয়ে পুনর্বার মৃত্যুর প্রচ্ছন্ন ও বিমূর্ত রূপটিকে ফিরিয়ে আনে। শ্মশানক্ষেত্র যেহেতু এমন অশুচি ও ক্ষতিকর পদার্থের নিশ্চিহ্নকরণের স্থল বা site, তাই তা নিজেও চূড়ান্ত অশুচি। অশুচি-মাত্রে বর্জনীয ও এক অর্থে নিন্দার্হ—শ্মশানের ভাগ্যে তাই যথেচ্ছ দুর্ব্যবহার জুটে থাকে।

প্রসঙ্গত বলা যায়, খ্রিস্টানদের কবরে বৎসরান্তের মৃত্যুদিনে মৃতের আত্মীয়-বন্ধুদের সমবেশ ঘটার রীতি আছে। শ্মশানের ক্ষেত্রে এমনটি সচরাচর দেখা যায় না। অবশ্য মৃতের স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত মর্মর ফলক ও বেদি কবরস্থানের সমাবেশের প্রতীকী উপলক্ষের স্থান নিয়ে থাকে। শ্মশানের এমন সম্মেলন কার্যত অসম্ভব একমাত্র অতি বিখ্যাত কতিপয় মৃত ব্যক্তিদের ক্ষেত্র ব্যতীত। তবে সেক্ষেত্রেও ওই প্রতীকী ফলক-সদৃশ কোনো নির্মাণের প্রয়োজন হয়ে থাকে। খ্রিস্টান কবরস্থানের বেলায় এমন সমাবেশ কিন্তু খ্যাতি অখ্যাতি-নিরপেক্ষভাবেই ঘটতে পারে। খ্রিস্টান কবরস্থানকে পরিচ্ছন্ন, সুসজ্জিত ও কুসুমিত রাখার প্রয়োজন অতএব সহজেই অনুমেয়, এবং সেখানে আত্মীয়-বন্ধুদের সজাগ দৃষ্টি এই পরিচ্ছন্নতা-রক্ষায় ও সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ ভূমিকা নেয় বলে মনে হয।

বস্তুত, খ্রিস্টানরা মৃতদেহকে হিন্দুদের মতো অতটা বর্জনীয় বলে মনে করে না। বরং তার জন্যেও এক ধরনের private বা ব্যক্তিগত বৃত্ত রচনা করে দেয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, সমাধিস্থানে জমি কিন্তু কিনতে হয়, অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির মতো মৃতের জন্যও থাকে স্থাবর সম্পত্তি। তার দলিলও থাকতে পারে যা মৃতের উত্তরাধিকারীর হাতে অর্পণ করা হয়। আবার বেশ কয়েক বৎসরের ব্যবধানে প্রয়াত একই পরিবারের (যৌথ নয়, একক পরিবার) সদস্যদের অভিন্ন স্থানে সমাধিস্থ করার চলও আছে। সনাতনী হিন্দুদের যৌথ পরিবার যেমন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তার ধারা বজায় রাখে, আধুনিক খ্রিস্টানদের বেলায় তার ততটা গুরুত্ব নেই। সেখানে সন্তানদের বিবাহের পরে পরিবার বলতে সচরাচর পড়ে থাকে নিঃসঙ্গ বয়স্ক দম্পতি। তাঁরা জীবনে যেমন, মরণেও তেমন যাতে পাশাপাশি থাকতে পারেন, তার জন্য তাঁদের কাছাকাছি কবর দেওয়ার রীতি আছে। এখানে একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। আদর্শ সনাতনী হিন্দু বলতে আমরা যেমন ভারতীয় হিন্দুদেরকে বুঝছি, আদর্শ খ্রিস্টান বলতে আমরা কিন্তু নির্দেশ

করছি প্রতীচ্যের খ্রিস্টানদেরকে।

কবরস্থানের জমির মূল্য বিষয়টি বেশ আগ্রহের সঞ্চার করে। কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের Lower Circular Road Cemetery-র সব জমিই নাকি বিক্রি হয়ে গেছে। তাই সেখানে আজ শুধুমাত্র মৃতদের অথবা কবরগুলির উত্তরাধিকারীদের সমাধি হওয়া সম্ভব। আবার মৃত্যুর বহু পূর্বে কেউ কেউ তাঁদের নিজেদের মরদেহের জন্য একখণ্ড জমি কিনে বেদি পর্যন্ত প্রস্তুত করে রেখেছেন—যার উপর ছোট্ট শ্বেত পাথরের ফলকে লেখা আছে 'sold'! অধুনা জীবিতের সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যতের চির-আশ্রয়ের সম্পর্কটি অদ্ভুত নিশ্চয়। তবে যেহেতু তিনি বর্তমানে জীবিত এবং ভূমিখণ্ডটি তাঁর সম্পত্তিবিশেষ, তাই তার রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি তাঁরও কিঞ্চিৎ মনোযোগী থাকাটা অসম্ভব নয়! এমন বেশ কয়েকটি 'Sold' লিখিত প্রস্তরবেদিতে এমন যত্নের ছাপ সেখানে চোখে পড়ে।

আবার 'পাকা' ও 'কাঁচা' কবরের জন্য অর্থমূল্যও সেখানে ভিন্ন (কাঁচা কবরের ক্ষেত্রে পাকা কবরের মতো প্রস্তরবেদি অনুপস্থিত)। কবরের উপর বেদি ও মর্মরফলক এবং কবরের অনতিদূরে তোরণ গড়ে দেওয়ার জন্য ঠিকাদাররাও নাকি সেখানে আছেন। বিভিন্ন মূল্য ধার্য করে তাঁরা বিচিত্র কাঠামো গড়ে দেন মৃতের পরিবারের পছন্দ-মতো বা হয়তো কখনো মৃতেরই পূর্ব-ইচ্ছা মতো।[১১]

এই প্রসঙ্গে হিন্দুদের সৎকার-প্রক্রিয়ায় চন্দনের মতো বহুমূল্য কাঠের ব্যবহারের প্রতি-তুলনাটি এসে পড়ে। এই ক্ষেত্রেও অনেক সময়ে মৃত তাঁর জীবদ্দশায় জানিয়ে যান বহুমূল্য কাঠ-সহযোগে তাঁর দেহ-সৎকারের অভিপ্রায়। নিজের মৃত্যু ও পববর্তী পাবলৌকিক ক্রিয়াদি-বিষয়ে উদ্‌বেগ হয়তো বা সব সমাজেই অল্পবিস্তর লক্ষ করা যায়। এবং সেখানে ধনীরা অন্যায্য ক্ষেত্রের মতোই সম্পদের যথেচ্ছ ব্যয়ের ব্যবস্থা করে তাদের শ্রেণি-মাহাত্ম্যকে পরোক্ষে ঘোষণা করে থাকেন।[১২] শ্রেণি-প্রশ্ন ব্যতিরেকে হিন্দুদেব ক্ষেত্রে বরং এমন আগাম বিধি ব্যবস্থার আরো চমকপ্রদ নমুনা মেলে কখনো কখনো। উত্তরপুরুষদের কর্তব্যবোধ ও ধর্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ ধার্মিক হিন্দু মৃত্যুর পূর্বে নিজের পারলৌকিক অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন কয়ে গেছেন কেবলমাত্র দাহ করা ছাড়া—এমন নিদর্শনও দেখা যায়। তবে এ ধবনেব ঘটনা কদাচিৎ ঘটে।

যা হোক, এই ব্যয়ের মাত্রা অথবা নিজের পারলৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ভাবনা ও উৎকণ্ঠা—এমন বিষয়গুলির বেলায় আমরা প্রতি-তুলনাটিকে ব্যবহার করতে বিশেষ উৎসাহী নই। খ্রিস্ট ধর্মীয়রা কবরমূলটিকে এক নিভৃত বৃত্তসীমায় (Private domain) আবৃত রাখতে চান, এবং তার প্রয়োজনেই সাধ ও সাধ্য অনুযায়ী প্রিয়জনের (এবং কখনো কখনো নিজের) জন্য সমাধিক্ষেত্রে কবরস্থলের ভূমিখণ্ডের উপর কিছু না কিছু নির্মাণ করেন. সেখানে ফুলগাছ বা অন্য কোনো গাছ লাগান এবং রক্ষা ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করেন। পার্কস্ট্রিটের Lower Circular Road Cemeteryতে বেশ কয়েকজন মালি আছেন। তারা শায়িত ব্যক্তিদের আত্মীয়জনদের নির্দেশ-মতো অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সমাধিবেদিতে ও সংলগ্ন স্থানেব গাছ ও ফুলের যত্ন নেন।

হয়তো আধুনিক ইয়োরোপে যখন Public ও Private sphere বেশ খানিকটা স্বতন্ত্র রূপ গ্রহণ করল[১৩] তখন থেকে কবরস্থান সংক্রান্ত আবরণ ও বিশ্বাসেরও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। সামান্য-সাধারণ মানুষেব সমাধিকে পর্যন্ত এমন একখানি নিভৃত পরিচর্যিত বেষ্টনী দান করা ও

তার প্রতি অধিকারী ও অনধিকারী ব্যবহারবিধিকে এমনভাবে বেঁধে দেওয়া—Public ও Private sphere-এর যুগলচিন্তা ছাড়া বোধ করি সহজ হত না। এই সুযোগে এই দুটি sphere সম্বন্ধে জরুরি কিছু আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে।

Public শব্দটির যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ তৈরি করার চেষ্টা না করাই বোধহয় শ্রেয়, কারণ এই ব্যাপারটা ভিন্‌দেশি, তাই তাকে প্রকাশ করার মতো উপযুক্ত শব্দ এখানে ঐতিহাসিকভাবে গঠিত হয়নি। Private শব্দের বেলাতেও একই কথা খাটে। তবে তার বাংলা হিসাবে 'ব্যক্তিগত' শব্দটি বেশ চালু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মনে তো হয় না শব্দটির বিদেশি গন্ধ পুরোপুরি ঘুচে গেছে। যা হোক, আমরা ইংরেজি শব্দ-যুগল ব্যবহার করতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করব।

অনেকটা আগে আমরা সনাতন ভারতীয় অন্দর/বাহির (inside/outside) শব্দযুগলের খানিক পরিচয় নিয়েছিলাম। Private/Public শব্দ-দ্বৈতটি কতকটা তার সঙ্গে তুলনীয়। তবে এই তুলনা-মধ্যে সমতা-বিষমতার বিচার করার প্রয়োজন হবে। এই নিবন্ধে আমরা এই দুই ধরনের ধারণাযুগলের সঙ্গে কবর ও শ্মশানের মতো ক্ষেত্রগুলি (sites) কিভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে, তা বুঝবার চেষ্টা করছি। পরিশেষে আমরা পরিচ্ছন্নতা/অপরিচ্ছন্নতার বিষয়টিকে এই প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করব।[১৪]

Private এবং Public-এর পার্থক্যটিকে আমরা চিনে নিই ব্যবহারের অধিকারের সাপেক্ষে। এই দুই প্রতীতির জন্মের সঙ্গে জড়িত ইয়োরোপে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের উন্মেষ, বাজার-অর্থনীতির সুপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনা। ব্যক্তি তাঁর নিজের বা পরিবারের জন্য কিছুটা স্থান (space) বা সামগ্রী বাজার থেকে ক্রয় করতে পারেন। এই space বা সামগ্রী একান্তভাবে তাঁর/তাঁদের নিজস্ব। তাঁর অথবা তাঁদের অনুমতি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির সেই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রবেশ বা সেই বিশেষ সামগ্রীকে ব্যবহারের অধিকার নেই। Public sphere-এর ব্যবহারবিধির ভিত্তি এই private space-এর ব্যবহারভিত্তির সমতুল। উভয় ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট space-এর ব্যবহার নির্দেশ নিয়মতান্ত্রিক; বিশৃঙ্খল নয়। Private sphere-এর বেলায় তা যদি হয় ব্যষ্টিগত, public sphere-এর ক্ষেত্রে তা সমষ্টিগত। সমষ্টির প্রত্যেকের অধিকার কিন্তু সীমা ও নিয়মের যুক্তিতে বাঁধা। আর এখানেই পার্থক্য ভারতীয় ঐতিহ্যের অন্দর/বাহির-ধারণাদ্বয়ের সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্যের private/public ধারণাযুগলের। মনে রাখতে হবে সনাতন এই ভারতীয় ঐতিহ্যকে কিন্তু আজকের ভারতবর্ষেও আমরা নানাভাবে দেখতে পাই। 'অন্দরের' ব্যাপার অবশ্যই হিন্দু শাস্ত্রের ও আচারের নানাবিধ কঠোর নিয়মের শৃঙ্খলে বদ্ধ। কিন্তু নিয়ম প্রতীচ্যের মতো আধুনিক যুক্তির অপেক্ষা করে না, তা ঐতিহ্যনির্ভর এবং আধুনিক যুক্তি-নিরপেক্ষ। অপরপক্ষে 'বাহির' নিতান্তই বিশৃঙ্খল, কেননা তার অন্তত একটি বড় ভূমিকা (function) হল যে সে অশুচির গ্রহীতা। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়বে Peter Berger-এর বক্তব্য—profane ছাড়াও sacred-এর আরো একটি বিপরীত বিষয় আছে—তা হল chaos। Social order বা সামাজিক শৃঙ্খলা যেহেতু ব্যক্তিচেতনা-নিরপেক্ষ নয়, বরং সমাজের ব্যক্তিদের সচেতন কার্যগুলির সম্মেলন ও সমন্বয়, তাই তার রক্ষণের জন্য সেই সমাজ সদস্যদের মনের মধ্যে এক ধরনের বিশ্বাস আনা বোধ করি

প্রয়োজন—যে বিশ্বাস জন্ম দেয় এক প্রকার ধর্মভাবের। এমন যুক্তির কথা ভেবেই Emile Durkheim সমাজ ও ধর্মকে একাকার করে দিয়েছিলেন—অন্তত আদিম সমাজগুলির জন্য।[১৬] অতটা নিশ্চিত না হতে পারলেও এইটুকু বলা যায় যে ন্যূনতম যে সংহতি ব্যতীত সমাজ কথাটিই অসাড় হয়ে যায়, তাকে রক্ষা করতে হলে এক ধরনের বিশ্বাসের প্রয়োজন। সেই বিশ্বাসকে স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য সাধারণ দিনগত ব্যাপারে (Profane) থেকে আলাদা করে রাখতে হয়, কেননা এইসব বিশ্বাস ওই দৈনন্দিনতার মধ্যে নিহিত শত সহস্র বিয়োজক-বিভাজব উপাদানকে প্রতিহত করতে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এই ধরনের বিশ্বাসকে Durkheim sacred বা 'পবিত্রের' অংশ বলবেন। আব আমবা দেখি এভাবেই sacred এবং order-এব ধাবণা দুটির মধ্যে এক ধরনের সমতা (identity) সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাদের বিপরীত অর্থ দুটির (অর্থাৎ Berger-এর মতে সাধারণ দিনগত ব্যাপার (Profane বা secular বা mundane) এবং বিশৃঙ্খলা বা chaos) মধ্যে অবশ্য এভাবে সমতা-বিধান কবা যায় না। sacred ও secular পবিপূরকতার অর্থে বিষম—তাই বিপবীত।

অর্থাৎ sacred আছে বলেই secular-এর অস্তিত্ববক্ষা সম্ভব হয়—কতকটা যেন নর-নারীব সম্পূরক বৈপরীত্যের অনুকূল এই সম্পর্কটি। অবশ্য এই পবিপূরকতার বিষযটি পূর্ব থেকে বা দৈববশে (providentially) নির্ধারিত হয় না, ববং মানুষদের ক্রমাগত সচেতন সামাজিকতার চর্চার ফলে এবং তাদেব পারস্পরিক প্রভাবে-প্রতিঘাতে নিতান্ত ঘটনাকে এই পরিপূরক সম্পর্কের উদ্ভব হয়।

ইয়োবোপের Public/private দ্বৈতকে আমরা এই তাত্ত্বিক আধারে বুঝবাব চেষ্টা করতে পারি। public ও private—উভয sphere-ই সচরাচর secular ভুক্ত, তবে তাদের প্রতিষ্ঠা এবং সুস্থিতির জন্য sacredকে কখনো কখনো প্রয়োজন হয। secular-এর ভিত্তি যদি যুক্তি হয়ে থাকে, তবে শেষ বিচারে যুক্তিব ভিত্তি কিন্তু বিশ্বাস। সম্বৎসরেব রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড secular হতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতা দিবসের মহিমা ও নানান অনুষ্ঠানেব আড়ম্বর কিন্তু ভক্তি ও বিশ্বাসের গোড়াকে মজবুত কববাব জন্যই দরকাব অর্থাৎ তা sacred পর্যায়ভুক্ত। সাধারণত, কোনো সংকটকালে অথবা পরিবর্তনের সময়ে sacred কিছুকালেব জন্য secular-কে আংশিক স্তব্ধ করে রাখে; বিপদ বা ক্রান্তিকালটি কেটে গেলে পুনর্বার secular বা profane তার দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ শুরু করার অনুমতি পায়। Rites of passage বা ব্যক্তির জীবনচক্রের পর্বান্তরকালীন অনুষ্ঠানগুলি যেমন জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যু—তাই sacred পর্যায়ভুক্ত। তারপব আবার sacred চলে যায় অন্তরালে, তবে তার সজাগ দৃষ্টি থাকে profane-এর উপর। অনেকটা দিনের আকাশে তারাদের উপস্থিতির মতো তখন তার অবস্থা। Sacred-এর শাসনের সময়েও কিন্তু secular একেবারে লুপ্ত হয় না। Public/private-এব মধ্যে দিয়ে দৈনন্দিনতার নিত্যচর্চা ক্রমে এতটাই মজ্জাগত হয়ে গেছে বহু বৎসরের সামাজিক অভ্যাসে, যে এমনকী সমাধিক্ষেত্রেব মতো পবিত্র বা sacred-এর রাজ্যপাটেব মধ্যেও public/private sphere তাব নানাবিধ নির্দেশ নিয়ে উপস্থিত হয় সেখানে—এ আলোচনা আমরা করেছি। বস্তুত ইয়োরোপে public/private এবং secular/sacred—এই দুই যুগল কতকটা ভিন্ন ক্ষেত্র বা মাত্রার (order) ব্যাপার। তবে

উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অবশ্য আছে। আর এই সম্পর্কটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে কোনো কারণে sacred নিজেই বিপন্ন হলে। সব কিছুর ভিত্তি 'বিশ্বাসের' মূল টলে গেলে সমাজে শুরু হয় অরাজকতা যাকে আমরা chaos বলে থাকি। তখন public/private—এই কথাগুলিও অসার হয়ে যায়। এইভাবেই sacred-এর chaos বিপরীত হয়ে ওঠে।

ঠিক এই ধারায় ভারতীয় সমাজকে বুঝতে গেলে outside-কে বিশৃঙ্খল (chaotic) বলে তাকে sacred-এর বাইরে রাখতে হবে। Outside বা 'বাহির' যে বিশৃঙ্খল তাতে সন্দেহ নেই। অন্দরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখতে তাকে যে বিশৃঙ্খল হতেই হবে সে আলোচনা আমরা করেছি। কিন্তু ভারতীয় সমাজে অন্দর ও বাহির যেহেতু পরিপূরকতার সম্বন্ধে বিজড়িত, তাই সেই সমাজের sacred এই যুগলের একটিকে তার নিজের বিপরীত বলে মনে করবে কী করে? সম্ভবত ভারতীয় ঐতিহ্যে 'অন্দরের' শৃঙ্খলা এবং 'বাহিরের' বিশৃঙ্খলাকে সম্মেলিত করে রচিত হয়েছে এক 'cosmic order',[১১] আর sacred বোধ করি তারই পৃষ্ঠপোষক। হয়তো এটি একটি কারণ ভারতীয় সমাজের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই sacred এবং secular-এর এতটা একাকার হয়ে থাকার। আর সেই কারণেই শ্মশানক্ষেত্র অশুচির আধার, তাই outside; কিন্তু এতৎসত্ত্বেও পবিত্র বা sacred। শ্মশান chaotic, কিন্তু এই chaos-কে বাদ দিয়ে হিন্দু Cosmic Order তৈরি হয় না। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মধ্যে প্রলয় তো বিশৃঙ্খলা বটেই, কিন্তু তাকেও প্রয়োজন আছে মহাবিশ্ব-শৃঙ্খলা বা Cosmic Order এর। শ্মশান যেন এই প্রলয়েরই প্রতিভূ, তাই তার আবর্জনাময়, অবিন্যস্ত হওয়াটাই নিতান্ত স্বাভাবিক, তা ভারতীয় ঐতিহ্যের মূলসুর অনুসারী। মৃত্যু নিজে একটি শারীরিক বিশৃঙ্খলা-বিশেষ, আর মৃত্যুও এক ক্ষুদ্র মাত্রার প্রলয়, আবার শ্মশানের সঙ্গে যোগ এই মৃত্যুর। এইভাবে শ্মশানের সঙ্গে chaos ও প্রলয়ের যোগ আরো দৃঢ় হয়।[১২]

দীর্ঘদিন ইয়োরোপের সংস্পর্শে থাকার পরেও পশ্চিমের মতো private ও sphere-এর স্পষ্ট ধারণা যে এ দেশে গড়ে ওঠেনি, তার একটি কারণ নিশ্চয় এই, যে এই ধারণাগুলি ভারতীয় ঐতিহ্যের এই বিশ্ববীক্ষার (worldview) সঙ্গে বেমানান। তবে বিপরীত ইয়োরোপীয় ধারার নানাবিধ দৈনন্দিন চর্চার অভিঘাত প্রভাবিত করেছে ভারতীয় ঐতিহ্যকেও। তাই ভারতে অন্দর/বাহিরের চর্চা private/public জনিত আচরণের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে সহাবস্থান করছে এবং নানারকম সংকর ব্যবহারবিধি তৈরি করেছে। ভারতীয়রা যে এখনো সহজেই নিজের বাড়ির চত্বরের ঠিক বাইরেই নোংরা ফেলে দিয়ে আসে অথবা কেউ কেউ প্রকাশ্যে (অর্থাৎ বাহিরে) মূত্রত্যাগ করে থাকে—তা সেই সনাতন অন্দর/বাহির ভেদটিকে সংস্কৃতির গভীরে বহন করে চলার কারণে। অশুচি মাত্রেই তাকে বাইরে নিক্ষেপ করতে হবে—সামূহিক পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি এ ক্ষেত্রে গৌণ। এ দেশের আধুনিক, পরিশীলিত শ্রেণির লোকেরা যে আজকাল অনেকেই প্রকাশ্যে মূত্রত্যাগে বিরত থাকেন অথবা দ্বিধান্বিত হন, তার মূলে পরিচ্ছন্নতাবোধ যতটা কাজ করে, তার চেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ হল লোকলজ্জা, সংকোচ। অর্থাৎ বাধা যদি বা আসে তা ভিতর (within) থেকে নয়, আসছে বাইরে (beyond) থেকে। Public/private যুগলের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটি আদৌ তা নয়। দুটি ক্ষেত্রকেই মনুষ্য-ব্যবহারের উপযোগী অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন করে তোলা

তাই জরুরি।

সংক্ষেপে বলা যায় 'শ্মশান' ক্ষেত্রটি 'বাহির' বা Outside-এ পড়ে, কারণ তার কাজ অশুচি মৃতদেহকে গ্রহণ ও ধ্বংস করা। গ্রামের প্রান্ত অথবা নদীর অন্য পারে যে শ্মশান প্রতিষ্ঠার প্রশস্ত স্থান বলে বিবেচিত হত, তা বোধ করি শুধুমাত্র ভীতিজনিত বা স্বাস্থ্যসম্মত কারণে অথবা নিছক কাকতালীয় নয়। এই প্রসঙ্গে আরো মনে হয় মৃতপ্রায়কে গৃহের বাইরে নিয়ে আসার প্রথার কথাটি। গৃহমধ্যে মৃত্যু ঘটলে সেখানে অশুচি-দোষ ঘটে—এটি কি অন্তত একটি কারণ হতে পারে না এই আপাত-নির্মম রীতির পশ্চাতে?

অপরপক্ষে, আধুনিক যুগের খ্রিস্টান সমাধিক্ষেত্রে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম Private/Public sphere-এর নানাবিধ বিষয়কে। Public/Private sphere-এর নিয়ম অনুযায়ী তাই এখানে পরিচ্ছন্নতাই স্বাভাবিক ও বিধেয়।

অবশ্য ইদানীং শ্মশানেরও বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে—যেমন ইলেক্‌ট্রিক চুল্লির ব্যবহার। কিন্তু তা নিতান্ত বাহ্য প্রক্রিয়াজনিত ব্যাপারস্যাপার। হিন্দুর বিশ্বাসের স্থলে এখনো অশুচি ও বাহিরের (outside) সামঞ্জস্য-বিধানের প্রশ্নটি রয়ে গেছে। Private/Public যুগল যে ঐতিহ্যবাহী অন্দর/বাহিরকে বিশেষ স্থানান্তরিত করতে পারে নি ভারতবর্ষে—তা আমরা আলোচনা করেছি। অবশ্য আধুনিকতা-পূর্বযুগে খ্রিস্টান কবরস্থানের বিষয়টিও ঠিক এই রকম হয়তো ছিল না। তবে তা স্বতন্ত্র সন্ধানের ও গবেষণার অবকাশ রাখে। যাই হোক আজ তা অতীত। হিন্দুর শ্মশানের ক্ষেত্রে অতীত ও বর্তমান কিন্তু অশুচি ও বাহির-নির্ভর বিশ্বাসের ধারাকে আজও কতকটা বহন করছে, এবং তার নিজস্ব বিশ্ববীক্ষায় (cosmology) এই বিশ্বাসকে সে পাকা আসন দিয়ে রেখেছে। তাই বোধ করি শ্মশানের অপরিচ্ছন্নতা ভারতীয় সমাজে এতটা সহজভাবে গৃহীত হতে পারে। তবু তাকে ঘিরে আজ যে প্রশ্ন জাগছে, সেই প্রশ্নটিই বোধ করি আধুনিকতার (modernity) দান। ঐতিহ্যকে আধুনিকতা বিচার করবে; প্রয়োজনে ও যুক্তিহীন মনে করলে, তার বিরোধিতা করবে—এখানেই তো tradition বা ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার দ্বন্দ্ব। Public/ Private-এর মতো, অথবা ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্যচেতনার (sense of individual and social hygiene) মতো যুক্তিনির্ভর বিচারবোধ আজ অনেকটাই গড়ে উঠেছে ভারতীয়দের মনে। তাই বাহিরের অপরিচ্ছন্ন, আবর্জনাময় রূপের ব্যাপারে সে আর পূর্বের মতো উদাসীন থাকতে পারে না। তবু শ্মশানের ক্ষেত্রে সে আজও বেশ খানিকটা নির্বিকার। বস্তুত, যার আত্মজনের মৃত্যু ঘটে, সে পরিচ্ছন্নতার মতো আপাত-তুচ্ছ বিষয়ে তখন মনোযোগী হতে পারে না। নিজেই তো নির্লিপ্ততার দ্যোতক! আবার শ্মশান সচরাচর লোকালয় থেকে দূরে হওয়ায় সাধারণভাবে মানুষের মনে তার সংস্কারের প্রশ্ন খুব বেশি জাগ্রত হয় না। তাছাড়া, অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে হলেও মৃত্যুর মতো ব্যাপারে Secular Order-এর বিচার খুব বেশি কার্যকরী হতে পারে না। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তন আনতে Secular Order-ই সক্ষম। মৃত্যু ও শ্মশান মূলত Sacred Order-এর অন্তর্গত। তাই সেখানে ঐতিহ্য ও তার অতি ধীর বিবর্তনই স্বাভাবিক। আর ভারতবর্ষের মতো ঐতিহ্যবাহী দেশের পক্ষে এ কথাটি আরো বেশি সত্য।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি 'cleanliness is godliness'-এর মতো ধর্মনৈতিক বচনটিকেও—যা অনেক সময়ে গির্জাগাত্রে উৎকীর্ণ থাকে। এই আলোচনায় পরে আমরা দেখব যে হিন্দু ধর্মস্থানে পরিচ্ছন্নতার ধারণাকে আচ্ছন্ন করে থাকে শুচিতার ভাবনা। যা হোক, সচরাচর পরিচ্ছন্ন গির্জা সংলগ্ন সমাধিস্থানটিকেও পরিষ্কার রাখা প্রয়োজনীয় হয় বলে মনে হয়।

২. Louis Dumont লিখিত 'Homo Hierarchicus' (Delhi : Vikas Publications; 1970) দ্রষ্টব্য। জাতি (caste) ও শুচি/অশুচি বিষয়ক বিস্তারিত বিশ্লেষণ আবো পাওয়া যায় M. N. Srinivas লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থে। 'Religion and Society among the Coorgs of South India' (London : Oxford University Press; 1952) এবং 'Caste in Modern India and Other Essays' (Bombay : Asia Publishing House; 1962) বই দুটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩. 'দেশ' শব্দটির তাৎপর্য একাধিক। এব সঙ্গে পিতৃপুরুষের জন্মস্থানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। 'দেশ' ব্যক্তির বংশগত identity যা আত্ম-পরিচিতি ব্যঞ্জক। এমন আত্ম-পরিচিতি তখনই যথার্থ মূল্যবান হয়ে ওঠে যখন ব্যক্তি উদ্দিষ্ট 'দেশ' থেকে দূরে গমন করে। এই গমন অনেক সময়ে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর পরিযাণ বা migrationও হয়ে থাকে। তখন 'দেশ' শব্দটি যেন এক ধরনের সামূহিক স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে কাজ করে। তবে 'দেশে'ব স্থানগত (গ্রাম্য অঞ্চল বা ক্ষেত্রবিশেষে পরগনা ও আধুনিক জেলা) উপাদানের সঙ্গে তার বসতবাটী, যৌথ পরিবাব সম্বন্ধীয় উপাদানগুলিও সংশ্লিষ্ট থাকে।

৪. সামাজিক সত্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক তাত্ত্বিক সমাজকে প্রধানত একটি সুসংহত entity হিসাবে কল্পনা করেছেন, যার মধ্যে বিভিন্ন বিষম বর্গভুক্ত মানুষরা নিজেদের যোগ্য কাজগুলি সম্পন্ন করে সমাজকে সুশৃঙ্খল রূপ দেন। অর্থাৎ এই চিত্রকল্পে সমাজের মধ্যে ঐক্যের ভাবটিই বড়। এই তাত্ত্বিকদের functionalist বলে অভিহিত করা হয়। Emile Durkheim এই ধারার একজন পথিকৃৎ। Karl Marx-এর মতো চিন্তাবিদরা আবার সমাজকে এমন সুসংহত entity ভাবার বিপরীতে তাকে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীস্বার্থগুলির সংঘাতময় অস্তিত্ব রূপে চিত্রিত করেছেন। এই ধারার সমর্থকরা মনে করেন যে ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীগুলি ছলে বলে কৌশলে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করে তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে।

৫. দ্রষ্টব্য Robert Hertz-এর 'Death and the Right Hand' (Claudia এবং Rodney Needham কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত এবং 1960 সালে London থেকে Cohen & West দ্বারা প্রকাশিত)।

৬. অবশ্য অন্যান্য ধর্মীয় কারণও থাকা সম্ভব, যেমন মনুষ্যদেহও শেষ বিচারে দেবতার অর্ঘ্য। তাই অগ্নি বা ব্রহ্মাকে উৎসর্গ করার পন্থা হিসাবে দেহকে অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করা হয় যেন। প্রকৃতপক্ষে সৎকার-কার্য অনুষ্ঠানটির সঙ্গে হোমানুষ্ঠানের বহুবিধ মিল পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে Veena Das তাঁর 'Structure and Cognition' গ্রন্থে (New Delhi-র Oxford University Press কর্তৃক 1990 সালে প্রকাশিত) সবিস্তার আলোচনা করেছেন।

শ্মশানে মরদেহ দাহ হওয়ার সঙ্গে 'পঞ্চভূতে' বিলীন হওয়ার একটি শাস্ত্রীয় সম্বন্ধও বোধ করি আছে। যে সব পদার্থকণা-যোগে নরদেহ পূর্ণতা পায়, মৃত্যুর পরে সেই সবকিছুকে প্রকৃতিমধ্যে পঞ্চভূতে (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) মিশিয়ে দিয়ে একমাত্র অবিনশ্বর আত্মাটিকে উদ্ধার করার মধ্যে দিয়ে যেন জীবন-মরণব্যাপী আবর্তন-চক্র রচিত হয়। সম্ভবত ব্যক্তিজীবনের এই চক্রের সঙ্গে সংসারব্যাপী সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের চক্রেরও যোগ আছে। প্রলয়-প্রসঙ্গ আমাদের নিবন্ধে পরেও আসবে। আপাতত আমাদের আলোচনার পক্ষে বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে যে কথাটি তা হল শ্মশানে অগ্নি, নদীর জলধারা (গঙ্গার মতো পুণ্যতোয়া হলে অতি উত্তম), বায়ু, মৃত্তিকা (এবং ভস্ম) ও শূন্যতার যুগপৎ উপস্থিতি মৃতকে বেশ কয়েকটি মুক্তিদানকারী প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে স্থাপন করে। এই প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে দিয়ে মৃত্যুজনিত অশুচিবও কতকটা লাঘব হয় বলে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। আগুন, জল, বাতাস ও বায়ু বাহিত ধূলিকণা—এই সবের প্রবাহ যে হিন্দু সমাজে শুদ্ধিকারী বা purifier-এর ভূমিকা নিতে পারে তা R. Thomas Rosin তাঁর 'Wind, Traffic and Dust : The Recycling of Wastes' প্রবন্ধটিতে আমাদের দেখিয়েছেন। এটি গবেষণা-পত্রিকা Contributions to Indian Sociology (N.S)-র 34তম খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যায় 2000 সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

৭. Niza Yanay 2002 সালে প্রকাশিত Theory Culture & Society গবেষণা-পত্রিকাব 19-তম খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যায় 'Hatred as Ambivalence' নামে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন প্যালেস্তিনীয়দের সঙ্গে ইজরায়েলিদের দেহগত মিল ও সাযুজ্য ইজরায়েলিদেব মনে কিভাবে এক অদ্ভুত অস্বস্তি, এমনকী আতঙ্কেব জন্ম দেয় এবং তাদের মনের মধ্যে প্যালেস্তিনীয়দের প্রতি ঘৃণা ও হিংস্রতার উৎপত্তি ঘটাতে সহায়তা করে। আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রের (অর্থাৎ মৃতের প্রতি তাঁর আত্মজনদের মনোভাবের ক্ষেত্র) ভীতি ও বিরূপ ভাব অবশ্য এতটা চড়া ও প্রকট নয়। তবে Yanay-র আলোচনাটিকে অন্তত প্রাসঙ্গিক মনে করা যেতে পারে।

৮. মৃত ও মৃতদেহের সঙ্গে এমন ambivalent সম্পর্ক শুধুমাত্র হিন্দু বা অন্যান্য দাহকারী ধর্মগোষ্ঠীরই আছে, এমন ভাবার কারণ অবশ্য কিছু নেই। তাহলে যারা শবদাহ না করে মরদেহকে মমতা ভরে সমাধিস্থ করে, তাদের আচরণকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? এ প্রসঙ্গে বলা যায়, সামাজিক সত্যগুলি খুব কম ক্ষেত্রেই একমুখী ও প্রত্যক্ষ বা positivistic। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক কারণে একক সমাজে একেক ধবনের সামাজিক বিধি গড়ে ওঠে। যে সব সমাজে কবর দেওয়ার চল আছে, সেখানেও নিশ্চয় মৃতেব সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ambivalence-এর শিকার কতকটা হয়ে থাকে তাঁর আত্মীয়-বন্ধুরা, কিন্তু তার সমাধানের পথটি হতে পারে স্বতন্ত্র, এবং এমন ambivalence-এর অনুভূতির তীব্রতায় পার্থক্য থাকাও সম্ভব। অন্তত খ্রিস্টধর্মীদের সঙ্গে হিন্দুদেব একটি তুলনামূলক বিচাব এ ক্ষেত্রে করা যেতে পারে। জাতি (caste) ও যৌথ পরিবার-ভিত্তিক সনাতন হিন্দু সমাজের নরনারীরা এক পরিবারের এমনকী এক জাতিভুক্ত অন্যান্য মানুষদের, যেন কতকটা অভিন্ন দেহের অংশ বলে মনে করে। তাই তাদের ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা হয়তো বা একটু বেশি মাত্রায় শারীর-মানসিক। তুলনায় খ্রিস্টধর্মীরা অনেক বেশি

ব্যক্তিত্ববাদী বা individualistic অবশ্য এ কথা বলতে চাই না যে কবর দেওয়ার চল যখন সেই সুপ্রাচীনকালে Semite-দের মধ্যে শুরু হয়, তখন তাদের সমাজে ব্যক্তি বা individual সম্পর্কে আজকের মতো সুস্পষ্ট কোনো ধারণা গড়ে উঠেছিল। তাদের ক্ষেত্রেও সম্প্রদায়গত (community-based) মনোভাবটি ছিল প্রবল। সারা পৃথিবীতেই এককালে গোত্রভিত্তিক (clan-based) সম্বন্ধগুলি ছিল সবচেয়ে জরুরি। তবু হিন্দু-ভারতীয় ঐতিহ্য যতখানি সমষ্টিময়, এবং সেই সমষ্টির ভাব ও ধারণা যতটা পোক্ত, তা হয়তো অন্য সব ক্ষেত্রে ছিল না।

সামাজিক বাস্তবতার আরো একটি উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। ইদানীংকালের সমাজবিজ্ঞান নির্ধারণবাদ বা determinism-এর নিশ্চযতায় বিশেষ বিশ্বাসী নয়। অমুক কারণের ফলেই নির্দিষ্ট ঘটনাটি ঘটতে পারল অথবা কোনো বিশেষ ঘটনাক্রমের জন্য অমুক বিষযটি ছিল একান্তভাবে প্রয়োজনীয় —এমন স্থির নিশ্চয়তার স্থান সমাজবিজ্ঞানে কম বরং তার ক্ষেত্রে Max Weber কথিত 'elective affinity' অর্থাৎ সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাপারগুলির পারস্পরিক নির্বাচন, এবং সম্ভাব্যতা নির্ভর (probabilistic) কার্যকারণ সম্বন্ধ (causality) অনেক বেশি প্রযোজ্য।

৯ তবে শ্মশান অশুচি (impure) হলেও পবিত্র (sacred)। অনেক শ্মশানে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত থাকে। মনে রাখতে হবে করালবদনা কালীর সংহারক ভূমিকার কথা। মুণ্ডমালিনী এই দেবীর তান্ত্রিক সাধকরা শ্মশানে শবসাধনা করে থাকেন। উপরন্তু কালীর সঙ্গে জড়িয়ে আছেন ভগবান শিব -- সৃষ্টি-স্থিতি লয়ের লীলাখেলায় যাঁর কর্তব্যের ভাগে পড়েছে শেষেরটি অর্থাৎ প্রলয়। প্রলয়ের ধারণার সঙ্গে শ্মশান-ব্যাপারের গঠনগত (Structural) মিল নিয়ে মূল নিবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। যা হোক, শ্মশান পবিত্র স্থান --একথা নিঃসন্দেহ। ক্ষতিকর মরদেহকে শ্মশানে নিশ্চিহ্ন করা হয় বলে এবং জীবিত ব্যক্তিরা সেখানে শেষ পর্যন্ত স্বস্তি ও স্বাভাবিকতা পুনরায় অর্জন করার দিকে অন্তত কতকটা এগিয়ে যেতে পারে বলে (সবটার জন্যে পারলৌকিক ক্রিয়াদির অন্তর্গত পরবর্তী পর্যায়গুলি — যেমন শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হওয়া দরকার) শ্মশানকে অতিজাগতিক শক্তিধর এবং তাই পবিত্র বলে মনে করা হয় বোধ করি। শ্মশানক্ষেত্রে এমন অশুচি ও পবিত্রের Paradoxical সম্মেলনের আরো এক নিদর্শন আমরা দেখতে পাই 'মহাব্রাহ্মণের' ভূমিকার মধ্যে। মহাব্রাহ্মণ দাহ-পূর্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানটির পরিচালক, অথচ তিনি কিন্তু অধম ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীভুক্ত। তাঁর মরদেহ সম্বন্ধীয় ভূমিকা তাঁর এই হীন অবস্থার জন্য দায়ী, কিন্তু সেই ভূমিকাটি পবিত্র-সম্বন্ধীয়ও বটে। পূর্বোক্ত 'Structure and Cognition' গ্রন্থে Veena Das এই বিষয়টির উল্লেখ করেছেন। আবার মহাব্রাহ্মণের এমন দুরবস্থা মৃতদেহের প্রতি অসম্মান ও অশ্রদ্ধার ভাবটিকে পুনর্বার প্রকাশ করে।

১০. ৮নং টীকাকে অনুসরণ করে বলা যায় যে শ্মশান ব্যাপারটি হিন্দুদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভাবের সঙ্গে বেশ মানানসই। সেখানে দাহের ফলে মৃত ব্যক্তি তার সমস্ত পরিচয় হারিয়ে বিলীন হয়ে যায় প্রকৃতির মধ্যে। খ্রিস্টানরা তাদের আত্ম-পরিচিতির মূল্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে বেদি ও মর্মরফলক প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে।

অবশ্য জাতিভিত্তিক হিন্দুসমাজে সর্বসাধারণের জন্য লীন হয়ে যাওয়ার অভিন্ন বিধিব্যবস্থাটি প্রাথমিক বিচারে কতকটা বিসদৃশ ঠেকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে হিন্দু ঐতিহ্য অনুযায়ী 'মৃতদেহ'

মাত্রই অশুচি—তা সে ব্রাহ্মণেরই হোক অথবা শূদ্রবর্ণভুক্ত কোনো জাতির মানুষের। সেই একই মরদেহ আবার অগ্নির কাছে বলিপ্রদত্ত বলে তারা পবিত্রও বটে।

মৃত ব্যক্তির আত্মা কিন্তু মৃত্যুর পরেও তার জাতিসত্তা অটুট রাখতে সমর্থ। হয়তো তাই বিভিন্ন বর্ণের জাতিভুক্ত সদস্যদের জন্য পারলৌকিক ক্রিয়াদির নিয়মও বিভিন্ন।

মৃতের আত্মাকে স্মরণ করবার উক্ত খ্রিস্টধর্মীয় পদ্ধতির সঙ্গে তর্পণের মধ্যে দিয়ে মৃতের শরণ নেওয়ার হিন্দু পদ্ধতির প্রকৃতিগত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। পিতৃতর্পণের উদ্দেশ্যটি স্পষ্টত যৌথ পরিবারকেন্দ্রিক, অর্থাৎ পরিবারের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনায় পালিত হয় এই অনুষ্ঠান। এবং মৃত্যুদিবসও এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে প্রথম বৎসরান্তে বাৎসবিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পরে। পরিবর্তে সাধারণভাবে পঞ্জিকাই নির্দিষ্ট করে পিতৃ-তর্পণের দিনটি কী হবে। অর্থাৎ ব্যক্তির মৃত্যুদিবসের স্বাতন্ত্র্যকে মুছে ফেলা হল অচিরে। এর বিপরীতে খ্রিস্ট-ধর্মাবলম্বীদের স্মরণ-সমাবেশ কিন্তু বিশেষ দিন-ভিত্তিক। ব্যক্তি সেখানে মৃত্যুর পরেও যেন তার অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে।

১১. তথ্যের জন্য লেখক Lower Circular Road Cemetery-র চিরঞ্জীব মাধব বসু এবং অন্যান্য কর্মীদের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।

১২. এমন বিজ্ঞাপন নানান ক্ষেত্রে হতে পারে। Thorstein Veblen এ ব্যাপারে অসামান্য আলোচনা করেছেন তাঁর 'conspicuous consumption' এবং 'theory of leisure class' বিষয়ক আলোচনায়।

১৩. Jurgen Habermas প্রণীত 'The structural Transformation of the Public Sphere' (Frederick Lawrance-এর সহায়তায় Thomas Burger কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত এবং 1989 সালে Polity Press থেকে প্রকাশিত) গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

১৪. ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এই শব্দদ্বৈতগুলিকে (Public/Private এবং inside/outside) নিয়ে বেশ কিছু মনোগ্রাহী আলোচনা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে Dipesh Chakrabarty-র প্রবন্ধ 'Of Garbage, Modernity and the Citizen's Gaze' (Economic and Political Weekly নামক গবেষণা-পত্রিকায় 1992 সালের 27তম খণ্ডের 10 এবং 11নং যৌথ সংখ্যায় প্রকাশিত) এবং Sudipta Kaviraj-এর 1997 সালে Public Culture গবেষণা-পত্রিকার দশম খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ 'Filth and the Public Sphere' প্রণিধানযোগ্য।

১৫. Peter Berger তাঁর 'The Social Reality of Religion' (1969 সালে Harmondsworth-এর Penguin থেকে প্রকাশিত) গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। একথা Veena Das-ও আমাদের জানাচ্ছেন তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থ 'Structure and Cognition' এবং তাঁর 'The Uses of Liminality' প্রবন্ধে। এটি 1976 সালে Contributions to Indian Sociology (N.S) গবেষণা-পত্রিকার দশম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৬. দ্রষ্টব্য Emile Durkheim রচিত 'The Elementary Forms of Religious Life' (J.W. Swain অনূদিত এবং 1964 সালে London থেকে Allen & Unwin কর্তৃক প্রকাশিত)।

১৭. Veena Das তাঁর 'The uses of liminality' প্রবন্ধে (পূর্বোক্ত) এবং 'Structure

and Cognition' গ্রন্থে (পূর্বোক্ত) 'cosmic order' এবং 'social order' ধারণাদুটি ব্যবহাব কবেছেন।

১৮. বাহিরের (Outside) চরম বিশৃঙ্খলাময রূপ যে শুধু নিন্দনীয় নয়, তার পরিচয় আমরা পেতে পারি মেলা, হাট ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি মানুষের আকর্ষণকে খেয়াল করলে। অন্দরের (inside) শৃঙ্খলার থেকে এ যেন আত্মার মুক্তি। সাধু-সন্ন্যাসীর পক্ষে এই মুক্তি জীবনব্যাপী। উল্লেখ করা যেতে পারে যে সাধু-সন্ন্যাসীর দেহ ও বসন ধূলিলাঞ্ছিত, অবিন্যস্ত হওয়াই স্বাভাবিক। অর্থাৎ বাহিরকে একমাত্র অশুচির গ্রহীতা (receptor) বলে ভাবলে চলবে না। বস্তুত, তার চরম বিধি বিসর্জিত উন্মুক্ততার মধ্যে পড়ে অশুচিও যায় শুদ্ধ হয়ে—এমন একটি Paradoxical ভাবনা আছে হিন্দু বিশ্ববীক্ষায। শ্মশানের ক্ষেত্রেও কতকটা যে এমন ঘটে তা আমবা আলোচনা করেছি ৬ ও ৯নং টীকায়। Nita Kumar তাঁর 'Open Space and Free Time' শীর্ষক প্রবন্ধে (1986 সালে Contributions to Indian Sociology (N.S.) গবেষণা-পত্রিকাব ২০-তম খণ্ডেব প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত) বারাণসীর প্রেক্ষিতে দেখিয়েছেন যে শহরের মানুষ কিছুট বাড়তি সময় পেলে শুধুমাত্র বিনোদন উদ্দেশ্যে ঘরেব বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ত—যে রাস্তা ছিল শৃঙ্খলাহীনতার এক চূড়ান্ত নিদর্শন। অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছে এই নিবন্ধের লেখকেবও পুরুলিয়া জেলার কাশীপুরেব সাপ্তাহিক হাটের দিনগুলিতে।

সাধারণভাবে 'অপরিচ্ছন্নতার' সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্যের বিষয়ে এবং নির্দিষ্টভাবে শ্মশানের আবর্জনায় অপবিষ্কাব দিকটির প্রতি আমার আগ্রহকে অধ্যাপক ড. অঞ্জন ঘোষ সর্বদা উৎসাহিত কবেছেন এবং বহু অমূল্য পরামর্শ দিয়ে আমাকে তিনি সাহায্য করেছেন। অবশ্য শ্মশান-বিষয়ক বিশেষ এই নিবন্ধটিব যাবতীয় ত্রুটিবিচ্যুতির দায়, বলা বাহুল্য, একান্তভাবে আমার।

রণপুরের শ্মশান ঘাট, ছবি · আমিনুল হক

□ লেখক পরিচিতি—পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয়ের Sociology বিভাগের শিক্ষক।

শ্মশানঘাটে বীরবন্দনা

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার নিমতলা শ্মশানঘাটে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিসৌধটি যেদিন প্রথম দেখি, ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম বাংলা ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ দিনটির কথা। যে-মানুষটিকে দেশের লোক কবিগুরু বা গুরুদেব বলে বন্দনা করত, তাঁর শেষযাত্রা আর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় জনতার উন্মত্ত অশালীন আচরণ নিমতলা শ্মশানঘাটকে সেদিন কলঙ্কিত করে দিয়েছিল, এ-কথা ভাবলে শুধু বিস্ময় নয় আত্মগ্লানিতেও ভরে যায় সারা মন। কলকাতার প্রবীণদের মুখে শুনেছি, বেশ কয়েকটি সাধাবণ মানুষের মৃতদেহ সেদিন পিষ্ট হয়ে গিয়েছিল প্রমত্ত জনতা আর পুলিশের পায়ের চাপে।

শ্মশানঘাটকে লোকে মনে করে পুণ্যস্থান। কালীঘাটের মন্দিরে পুজো দিয়ে কেউ কেউ একবার কেওড়াতলা শ্মশানটাও ঘুরে যায়। জ্বলন্ত চিতা দেখার মধ্যেও নাকি একটা পুণ্য আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যাত্রা' গল্পটির কথা মনে পড়ে। নববিবাহিত বরবধূ নদীতীরে চিতা জ্বলছে দেখে ভেবেছিল 'পথে চিতা দেখলে শুভ হয়'। পুরীতে যারা জগন্নাথ দর্শন করতে যান, তাঁরাও একবার ঘুরে আসেন স্বর্গদ্বারের শ্মশানঘাট। এর পিছনে ঠিক কী ধরনের বিশ্বাস বা সংস্কার আছে জানিনা; তবে শহিদ, স্বাধীনতা সংগ্রামী, জননেতা বা কোনো মহৎ ব্যক্তির শেষকৃত্যের দিনে শ্মশান সত্যিই পুণ্যক্ষেত্র হয়ে ওঠে বহু মানুষের চোখের জলে আর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদনে।

ওই নিমতলা শ্মশানঘাটেই বিনয়-বাদল-দীনেশের বিনয় বসুকে কলকাতার মানুষ শেষ পারানির গান শুনিয়েছিল পুলিশের নির্দেশ অমান্য করে, মুহুর্মুহু 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিয়ে। সেটা ১৯৩০ সালের ১৩ ডিসেম্বর। পুলিশের নির্দেশ ছিল, কোনো শোক মিছিল করা যাবে না; শ্মশানে কোনো ধ্বনি দেওয়াও চলবে না। কলকাতার মানুষ সেই শীতের রাতেও উপস্থিত ছিল নিমতলা শ্মশান ঘাটে। শহিদের দেহের উপর ফুল ছড়িয়ে আর 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিতে আকাশ কাঁপিয়ে তারা সেদিন হতবাক করে দিয়েছিল পুলিশকে। সেই ঘটনার কথা লেখা আছে পরের দিনের অমৃতবাজার আর লিবার্টি পত্রিকায়।

দীনেশ গুপ্তর ফাঁসি হয়েছিল পরের বছর ৭জুলাই, ১৯৩১ ভোররাতে। এক বিশাল জনতা আগের দিন রাত থেকেই আলিপুর জেলের সামনে অপেক্ষা করছিল ফুল নিয়ে। কিন্তু সেই ফুল শহিদের উদ্দেশে নিবেদন করা যায়নি; কোনো শোকমিছিলও হয়নি। দীনেশের দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয় জেলের মধ্যেই। ভোরবেলা ধোঁয়া দেখে জনতা চিৎকার করে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিয়ে ওঠে; তারপর ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই হাঁটতে হাঁটতে ময়দানে এসে প্রতিবাদ সভা করে। এই বিবরণও পাওয়া যাবে পরের দিনের অমৃতবাজার পত্রিকায়।

বীরবন্দনায় কেওড়াতলা শ্মশান বিশিষ্ট হয়ে আছে নানা কারণেই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের গগনস্পর্শী স্মৃতিমন্দির, শহিদ যতীন দাসের স্মারক-সৌধ আজও এখানে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেশবন্ধুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিনে গান্ধিজী শ্মশানে ঘাটে উপস্থিত ছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর স্মৃতিকথায় পড়ি, শোকবিহ্বল জনতাকে তিনি বারবার শান্ত হবার জন্য আবেদন জানাচ্ছিলেন। ভিড়ের চাপে শেষে তিনি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, যতীন দাস, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিধানচন্দ্র রায়, ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায়—অনেক বরণীয়-স্মরণীয় মানুষের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে। তবে দুটি দিনকে তার ভেতর বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায় শহিদ বন্দনার পুণ্যস্মৃতিতে। প্রথম দিনটি হল ১০ নভেম্বর,১৯০৮—যেদিন সকালে শহিদ কানাইলাল দত্তের মরদেহ জেল থেকে এসে পৌঁছোল শ্মশানঘাটে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার সেই শেষ যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন। 'বাংলা-দেশেব-ইতিহাস' ৪র্থ খণ্ডে তিনি লিখেছেন: সকাল ৭টা নাগাদ যখন জেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কানাইলালের দেহ পাওয়া গেল, তা বহন করার জন্য তখন 'কাড়াকাড়ি' পড়ে যায়। কালীঘাটের রাস্তা দিয়ে শেষযাত্রা যখন শ্মশানের দিকে এগিয়ে চলেছে, দু-পাশেব বাড়ি থেকে ফুল আব খই ছড়ানো হচ্ছিল। শঙ্খধ্বনি করছিলেন নারীরা। লোকে শহিদের চিতাভস্ম তুলে নিয়েছিল, তাই দিয়ে সন্তানের জন্য মাদুলি তৈরি করে নেবে বলে। কালীঘাট মন্দিরের ফুল-বেলপাতা ছড়িয়ে দিয়েছিল শহিদের দেহে। শ্মশানঘাটের সেই আবেগোন্মত্ত দৃশ্যটির বিশদ বর্ণনা করেছেন মতিলাল রায়, তাঁর 'বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল' গ্রন্থে। 'যুগান্তব' বিপ্লবী গোষ্ঠীর অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যর ভাই উপেন্দ্রচন্দ্র নিজের উদ্যোগে কানাইলালের মৃতদেহের ছবি তোলার বন্দোবস্ত করেছিলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ৩০০০ ছবি বিক্রি হয়ে যায়। বাকিগুলো পুলিশ কেড়ে নিয়েছিল। শ্মশানঘাটে সেদিনের দৃশ্য সরকারকে এতটাই উদ্বিগ্ন করে যে, এর কয়েকদিন পরে সত্যেন বসুর ফাঁসির পর আর শোকমিছিলের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

কেওড়াতলা শ্মশানঘাটের দ্বিতীয় মহাস্মরণীয় দিনটি হল ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯—যতীন দাসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন। লাহোর থেকে তাঁর দেহ হাওড়ায় এসে পৌঁছেছিল তার আগের দিন বিকেলে। ১৬ তারিখ সকালে মৃত্যুঞ্জয়ী যতীনের মৃতদেহ নিয়ে প্রায় এক মাইল দীর্ঘ যে শোকযাত্রা, কলকাতার ইতিহাসে তা অনন্য হয়ে আছে। হাওড়া থেকে হ্যারিসন রোড হয়ে মধ্য কলকাতা ঘুরে রসা রোড ধরে দীর্ঘ পথ। শেষযাত্রা পরিচালনা করছেন সুভাষচন্দ্র বসু আর বিধানচন্দ্র রায়। রাস্তার দু-পাশের বাড়ি থেকে ফুল ছড়ানো হচ্ছে। শহিদের উদ্দেশে নিবেদিত সেই পুণ্যপুষ্প লোকে কুড়িয়ে নিচ্ছে পথ থেকে। দেয়ালে-দেয়ালে পোস্টার : 'রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা'। মিছিলের লোক কখনও চিৎকার করে ধ্বনি দিচ্ছে কখনও কান্নায় ভেঙে পড়ছে। প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের সমাগম; কিন্তু পুলিশ নিষ্ক্রিয়। তারা জানে, কলকাতা আজ পাগল হয়ে গেছে। যতীন দাসের অনশন, মৃত্যু আর শেষযাত্রার অনুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন যতীনেব ভাই কিরণ দাস।

শহিদের দেহে অগ্নিসংযোগ করার আগে তাঁর বৃদ্ধ পিতা বঙ্কিম দাস বলেছিলেন : নিজেদের দেশকে বিদেশের হাতে তুলে দিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষরা যে-পাপ করেছিলেন, তারই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমার প্রিয় পুত্রকে আমি তোমার কাছে উৎসর্গ করছি, হে ঈশ্বর।

মন্ত্রের মতো কয়েকটি কথা। কেওড়াতলা শ্মশান সেদিন সত্যিই পুণ্যতীর্থ হয়ে উঠেছিল কলকাতার মানুষের কাছে।

আরও কত অনামা অখ্যাত শহিদের স্মৃতি নীরবে বহন করেছে কেওড়াতলা শ্মশান। সত্তরের দশকে দেখেছি, শ্মশানের দেয়ালে কারা যেন রক্ত দিয়ে লিখে রেখেছে : ... তোমায় ভুলছি না।

রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি

রাজা রামমোহন রায় ১৮৩২-এ ফ্রান্সে যান। সেখানে (রাজা) লুই ফিলিপের কাছে তিনি হৃদ্য আচরণ লাভ করেন। মহামান্য রাজা তাঁকে দুবার ভোজ সভায় আপ্যায়িত করেন। এখানে ফরাসী ভাযা শিখে ১৮৩৩-এ তিনি ইংল্যান্ড ফিরে যান। ব্রিস্টলের নিকট স্টেপলটন গ্রোভে মিস ক্যাসল্ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। তাঁর বাড়ীটি তিনি রাজার ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দেন। এখানে তাঁর সঙ্গে নিত্য সাক্ষাৎ করতে আসতেন মি: জন ফস্টার ও ড: কার্পেন্টার। তিনি আয়ার্ল্যান্ড ও অন্যান্য বহুস্থান থেকে প্রেরিত সম্বর্ধনা পত্র পান। দিল্লীর বাদশাহের পক্ষ থেকে তিনি ইংল্যান্ডের মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে সফল মীমাংসায় উপনীত হন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর চিকিৎসা করেন ডা: প্রিচার্ড এবং ক্যারিক। কিন্তু চিকিৎসায় কোন ফল হয় না। ১৮৩৩-এর ২৭ সেপ্টেম্বর তিনি ব্রিস্টলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইতালীয় ভাস্কর পাগের (Pugh) এক সঙ্গী (তিনিও ইতালীয়) রাজার মুখমণ্ডল ও মাথার চাঁচ তুলে দেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কুমারী ক্যাসলকে বলে যান, ইংল্যান্ডেই যদি তাঁর মৃত্যু হয় তাহলে যেন এক টুকরো সুন্দর নিষ্কর জমি কিনে তাতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। সমাধির উপর যেন নির্মিত হয় সুন্দর একটি কুটির এবং সেটি দেখাশোনা করবার জন্য তাতে বাস করবেন কোন পণ্ডিত অথচ দুঃস্থ ব্যক্তি। ১৮৩৩-এর ১৮ অক্টোবর সুন্দব একখণ্ড জমিতে তাঁকে সমাহিত কবা হয়। এই জমিদান করেন কুমারী ক্যাসল্। ১৮৪৩-এর ২৯শে মে তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু প্রখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর ঐ স্থান থেকে ব্রিস্টলের নিকটবর্তী আর্নস্ ভেল নামক স্থানে নির্মিত সুদৃশ্য একটি সমাধিতে তাঁর শবাধারটি স্থানান্তরিত করে পরের বছর অর ওপর চমৎকার একটি স্মৃতি স্তম্ভ স্থাপন করেন।

কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত // লোকনাথ ঘোষ

❑ লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, সমাজকর্মী—অন্যধারার গবেষক।

শ্মশান, শ্রাদ্ধ ও বাবু প্রসঙ্গ

প্রণব সরকার

সেকালে হিন্দুরা যতটা পরকাল নিয়ে ভাবিত ছিলেন ইহকাল নিয়ে ততটা নয়। তাই পারলৌকিক ক্রিয়ার ঘটা ছিল সাংঘাতিক রকমের। বিপরীতে মুসলমান সম্প্রদায় বা খ্রিষ্টানরা ইহকালকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন, ফলে তারা ইহকালের যাবতীয় কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করে রাখতে আগ্রহী ছিলেন। মধ্যযুগের সুলতান, বাদশাহ, আমীরবর্গ দরবারের ঘটনা লেখক বা 'ওয়াকিয়া নবিস' নিযুক্ত করতেন। এরা প্রভুর জীবনের জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, যুদ্ধের কাহিনীও লিখে রাখতেন। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে সশরীরে উপস্থিত থেকে বিবরণ লিখতেন। বাদশাহরা নিজেরাও অনেকে জীবনী লিখতেন। মৃত্যুর আগে বা পরে সমাধি সৌধ বানিয়ে সেখানে সমাধিলিপি খোদাই করা থাকত। খ্রিষ্টানদের সমাধিলিপি তো সর্বজনবিদিত। পরবর্তী কালে ইতিহাস রচনায় এগুলির সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু হিন্দুরা দাহ প্রথায় বিশ্বাসী ছিল এবং পরকাল নিয়ে এতটাই ভাবিত ছিল যে, সে রকম কোনো তথ্যাদি পাওয়া কষ্টকর ছিল। রোমিলা থাপাব তাই বোধ হয় বলেছিলেন—দাহ প্রথা ইতিহাসের পক্ষে সহায়ক নয়।

হিন্দুদের কাছে যেহেতু পরকাল বিশেষ গ্রহণযোগ্য ছিল তাই পারলৌকিক আচারের ঘটা, দান ধ্যান, কাঙালী বিদায়, শ্মশান ক্ষেত্র বা শ্মশান ঘাটের উন্নযন মূলক কাজ কর্মে বিত্তশালীরা মনোযোগী হয়েছিলেন। এমনকি তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতাও চলতো। কুৎসিৎ দলাদলিরও সাক্ষ্য মেলে। তাই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বিচিত্র বিবরণ সেকালের সংবাদপত্রে মুদ্রিতও হয়েছিল।

আর একটা ব্যাপার বলে রাখা ভালো, সেকালে হিন্দুরা মনে করত, গৃহে মরাটা অমঙ্গলের তাই গঙ্গাতীরে গঙ্গাযাত্রীদের জন্য ছোট ছোট ঘর করা হত, সেখানে বৃদ্ধ, মুমূর্ষুদের এনে রাখা হত। * তারপর সকাল বিকাল চলত অন্তর্জলির অনুশীলন। তীব্র শীতেও বয়স্ক মানুষকে গলাপর্যন্ত জলে ডুবিয়ে রাখা হত; দিনের পর দিন এভাবে চলতে থাকায় তিনি একদিন মারা যেতেন। তারপর তাব দেহটা গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হত। কিংবা অনেক দেহ জোয়ারের তোড়ে ভেসে চলে যেত। আত্মীয় স্বজন ছাড়াও একদল লোক ছিল যারা অন্তর্জলীতে সাহায্য করত। অন্তর্জলি করা মানুষদের নাম মাত্র মুখাগ্নি করা হত। গরীবরাও নামমাত্র মুখাগ্নি করে মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলে দিত। সে সময় দু'টাকায় একটা মড়া পোড়ানো যেত, কিন্তু গরীবরা তা জোগাড় করতে পারত না। এছাড়া শাস্ত্র সম্মত দাহ না করে যেসব মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলা হত রাধারমণ মিত্র তাঁর একটা তালিকাও দিয়েছেন — ''ক) মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ কিংবা দু'বছরের কম বয়সের শিশু খ) কুষ্ঠ ইত্যাদি কতকগুলি রোগগ্রস্থ লোক গ) আত্মহত্যাকারী ঘ) সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তি ঙ) কতকগুলি রাষ্ট্রীয় বা

---

* উদা. ২৪ পৌষ তারিখে কলিকাতা নিমতলার ঘাটে কৃষ্ণ গোবিন্দ সেন পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। — সমাচার দর্পণ।

ধর্মীয় অপরাধে অপরাধী বা অভিযুক্ত ব্যক্তি চ) বৈষ্ণব (বোষ্টম) প্রভৃতি কতকগুলি ভিক্ষাজীবী সম্প্রদায়ের ব্যক্তি ছ) সন্ন্যাসী এবং জ) যুগী নামধারী অনুন্নত তাঁতি সম্প্রদায়ের লোক।" যে গঙ্গার জল লোকে পান করত তার দুরবস্থার বিরণ দিয়ে ৫-৩-৩৪ তারিখে বাংলা প্রদেশের স্যানিটারি কমিশনের প্রেসিডেন্ট জন স্ট্যাচি লেখেন — "যে নদী কলিকাতার অধিকাংশ লোককে পানের ও রন্ধনের ইত্যাদি গৃহ কার্যের জন্য জল যোগায় সেই নদীতে প্রতিবছর ৫ হাজারের উপর মানুষের মৃতদেহ নিক্ষেপ করা হয়। মাত্র সরকারি হাসপাতাল গুলি থেকেই এক বছরে ২০০ মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলা হয়েছে।" এ ছাড়া জন্তু জানোয়ারের মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলা হত। সব মিলিয়ে সে ছিল এক নারকীয় কান্ড।

এবার বাবু প্রসঙ্গ। সেকালের গঙ্গাযাত্রীদের জন্য কলকাতার বিখ্যাত শ্মশান ঘাটগুলোর পাশে গৃহ থাকত। অনেকে পুণ্যের লোভে এই রকম গৃহ নির্মাণ করে দিতেন। রানী রাসমণির স্বামী বাবু রাজচন্দ্র দাস নিমতলা শ্মশান ঘাটের দক্ষিণ দিকে গঙ্গা যাত্রীদের জন্য একটি পাকা গৃহ নির্মাণ করে দেন। কেউ কেউ শ্মশান যাত্রীদের জন্য পাকা শ্মশানঘাট তৈরি করে দিতেন। কেউ আবার শ্মশান বা শ্মশান ঘাটের জন্য জমি দিতেন। আর নড়াইলের জমিদার, বাবু চন্দ্রকুমার রায় ও তাঁর ভাই কাশীপুর শ্মশান ঘাটের জন্য জমিদান করেছিলেন। আর কলকাতা শহরতলির মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যবহারের জন্য এই শ্মশানঘাট ১৮৭৪-৭৫ সনে তৈরি করিয়ে দিয়েছেন। কাশী মিত্রের শ্মশানঘাট স্বয়ং কাশীশ্বর মিত্র ১৭৭৮ সালে তৈরি করে দেন। অপুত্রক, এই ধনী নিঃসন্তান ছিলেন। এই ঘাটের পুবপাশে তাঁর বিরাট বাড়ি ছিল। 'কলিকাতা দর্পণ'-এ পাই "কাশী মিত্রের শ্মশানের আয়তন গোড়ায় ছিল মাত্র নয় কাঠা। এই শ্মশান এক সময় অবস্থাপন্ন হিন্দুরা ব্যবহার করত, কিন্তু এখন গরিবেরাই বেশি ব্যবহার করে। বিভিন্ন হাসপাতালের কাটা ছেঁড়া মড়াও এখানে আগে পোড়ানো হতো। ১৮৮২ ৮৩ সনে বাবু অক্ষয়চন্দ্র গুহ নিজ খরচে একটি গঙ্গাযাত্রীর আবাস তৈরি করে দেন।। ১৮৫৪ সনে এই কাশীমিত্রের ঘাট থেকেই ৩৯৮২ টি মানুষের মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলা হয়।" নিমতলা ঘাটে গঙ্গাযাত্রীদের জন্য দোতলা গৃহ তৈরী করে দেন বাবু গিরীশচন্দ্র বসু।

শোভাবাজারের রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ দেব বাহাদুর কুমারটুলিতে একটি শ্মশান নির্মাণে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। এই শোভাবাজারেরই রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর সাহেবদের পুরানো সমাধিস্থল ও সেন্ট জন গীর্জার জন্য জমিদান করেন। হাটখোলার দত্ত পরিবারের মদন মোহন দত্ত গয়ায় প্রেতশীলা পর্বতের চূড়া পর্যন্ত সিঁড়ি নির্মাণ করে দেন। আর শ্যাম বাজারের দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসু সে সময়ে রামলীলা পাহাড়ের সিঁড়ি নির্মাণ করে দেন যাতে পিণ্ডদাতাগণ পিণ্ড দিতে গিয়ে পড়ে না যান। মহারানী স্বর্ণময়ী ছিলেন দানশীলা। যদি কেউ পিতা মাতার শ্রাদ্ধের জন্য সাহায্য চেয়ে তাঁর দ্বারস্থ হতেন, তিনি খালি হাতে ফিরতেন না।

সেকালের বাবুদের শেষকৃত্যের পছন্দসই বা বাঁধাধরা ঘাট ছিল। অনেকে পছন্দের গঙ্গ াযাত্রী নিবাসে শেষ কটা দিন কাটিয়ে স্বর্গবাসী হতেন। অনেকের গঙ্গাতীরে নিজস্ব বাসা-বাটী থাকত—সেখানেই শেষ দিনগুলো কাটাতেন। কেউ আবার গৃহে মারা গেলেও তাঁর পছন্দের পূর্বকৃত পছন্দের ঘাটে শেষকৃত্য সম্পন্ন হত। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে নিমতলা ঘাটে শবদাহ

চালু হলেও পাথুরিয়া ঘাটার রাজা সুখময় রায় বাহাদুরের স্ত্রী বাংলা ১২৩৬ সনের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার দুপুরে দুই প্রহরের সময় পরলোক গমণ করেন। **সমাচার দর্পণ** লিখছে— "তাঁহার দুই পুত্র শ্রীল শ্রীযুত রাজা নৃসিংহ চন্দ্র রায় বাহাদুর মহারাণীর শব লইয়া নৌকা যোগে কাশীপুরে তাঁহারদিগের নিজঘাটে জাহ্নবীর তটে কাষ্ঠে ও ঘৃত ধূনাদি দ্বারা দাহ করিয়াছেন ...।"

কান্দীর রাজবংশের নানান অনুষ্ঠান আমাদের চমকে দেয়। দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ কান্দীতে তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে কুড়ি লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন। কাশী, মিথিলা, নবদ্বীপ থেকে শুধু নয়, বর্ধমান, পাটুলী, যশোর থেকেও বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শিষ্য-সামন্ত নিয়ে সেই শ্রাদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। এসেছিলেন নাটোরের রাজা। তবে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই অনুষ্ঠানে যোগ দেননি। কারণ তিনি কায়েতের বাড়ির নেমন্তন্নে যেতেন না। অথচ দেওয়ানজীকে উপেক্ষা করা যায় না তাই তাঁর পুত্র শিবচন্দ্রকে পাঠালেন। শিবচন্দ্র গিয়ে দেখলেন এলাহি কাণ্ড; রাজা, ব্রাহ্মণ, ভিখারীতে লোকারণ্য। এক সপ্তাহ আগে থেকেই খাওয়া দাওয়া দান ধ্যান চলছে। সব কিছু দেখে তিনি পুলকিত হয়ে শ্রাদ্ধের সুখ্যাতি করে বলেন—"এ যে সাক্ষাৎ দক্ষযজ্ঞ"। সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাগোবিন্দ জবাব দিলেন—"সে কি, সে যজ্ঞে যে শিব ছিল না, এখানে সাক্ষাৎ শিবচন্দ্র উপস্থিত।"

এই গঙ্গা গোবিন্দের ভাইপো দেওয়ান বিজয় গোবিন্দ সিংহ এক ঐতিহাসিক পিণ্ড দানের উদযোগ করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে ২৮টি বজরা, ভাউলে, ও পিনিসে পরিবারের লোক, কুলগুরু, পুরোহিত, পণ্ডিত, বৈষ্ণব আত্মীয় স্বজন ও এস্টেটের কর্মচারী সব মিলিয়ে ৮০০ শতাধিক লোককে নিয়ে গয়ার পথে যাত্রা করেন। ১২২৯ বঙ্গাব্দের ১৭ই বৈশাখ পাটনা হয়ে গয়ায় পৌছান। এখানে শুধু দেওয়ান সাহেব নয় সকলের পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করেন এবং ব্যয়ভার নিজেই বহন করেন।

শোভাবাজার রাজপরিবারের প্রবর্তক রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর পলাশী যুদ্ধের পর তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে ৭ লাখ টাকা ব্যয় করেছিলেন বলে মার্শম্যান তাঁর History of Bengal গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যদিচ মহারাজের জীবন চরিত থেকে জানা যায় তিনি উক্ত শ্রাদ্ধে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। রানী ভবানীর জীবন চরিত থেকে জানা যায়—তাঁর স্বামী মহারাজ রামকান্ত রায়ের শ্রাদ্ধে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। সিমলার বাবু রামদুলাল দে (রাম দুলাল সরকার) ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের ১লা এপ্রিল ৭৩ বছর বয়সে বেলা আড়াইটা প্রহরের সময় গঙ্গাতীরে জ্ঞানপূর্ব্বক পরলোক গত হইয়াছেন। তাঁর শ্রাদ্ধ বেশ ধুমধামের সঙ্গে হয়। খরচ হয়েছিল আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকা। আর ব্রাহ্মধর্মের নেতা রাজা রামমোহন রায়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধে ১ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল বলে জানা যায়।

সেকালে হিন্দুরা মনে করত কাঙালী ভোজন, উপযুক্ত দান ধ্যান ও দরিদ্রের দুঃখ মোচন না করলে মৃত ব্যক্তির সদ্গতি হয় না তাই তারা মহা সমারোহে শ্রাদ্ধ করতেন। অবশ্য সেকালে কাঙালী ভোজন এবং কাঙালী বিদায় নিয়ে কম সমস্যা ছিল না। কেউ যদি একাজে অসমর্থ্য হতেন তবে কাঙালীরা নগর বাজারের সমস্ত মালপত্র লুটপাট করত। একটি সংবাদে দেখা যাচ্ছে—"বাবু গোপাল কৃষ্ণ মল্লিকের মাতৃশ্রাদ্ধের সময়ে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ কাঙ্গালী বিদায়ে অক্ষম হওয়াতে কাঙ্গালিরা আহারাভাবে নগর বাজার সকল লুট করিয়াছিল।"

(সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র / বিনয় ঘোষ ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৯)। এই ঘটনার জেরে কলকাতার তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা বাবুগণের পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধে আগাম অনুমতি নেবার বিধান দেন। কলুটোলার বাবু মতিলাল শীল ১৮৫৪ সালের ২০শে মে পরলোক গমন করেন। তাঁর পুত্রেরা পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করবেন স্থির করেন। কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট জানায় রবাহুত-অনাহূত কাঙালী বিদায়ে ত্রুটি হলে তারা নগরবাসীদের যদি কোন ক্ষতি করে, সেই ক্ষতি পূরণের জন্য অগ্রিম এক লক্ষ টাকা জমা রাখতে হবে। শুধু কি তাই, কোনো বাবুর শ্রাদ্ধে একাধিক পুত্রের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো শ্রাদ্ধের খবচ দিলেন বাকীরা দিলেন না, তখন সেই অর্থ আদায়ের জন্য সুপ্রিম কোর্টে খরচ বহনকারী ভাইয়েরা মামলা দায়ের করতেন।

বড় বাজারের ধার্মিকাগ্রগণ্য বাবু নিমাইচাঁদ মল্লিক (নিমাইচরণ) ৭১ বছর বয়সে তিন রাত্রি গঙ্গা তীরে বসবাসের পর ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর শনিবার পরলোক গমণ করেন। ধুমধাম সহকারে তাঁর শ্রাদ্ধ হয়। গরীব, কাঙালী সেই শ্রাদ্ধে যে বিদায় পেয়েছিলেন তার তুলনা নেই। ভোলানাথ চন্দ্র National Magazine-এ জানুয়ারী ১৮৯৭ সখ্যায় এ বিষয়ে লেখেন—Each of the eight sons got up a silver Dan Sagar. They also distributed eight lacs of rupees to the poor. One Braman who had a hand in the distribution coolly appropriated a cart-load of silver to himself this was the Sradh that gave currency to the saying chotta and Burra kangali Bidaya. It arose thus : There was a house with a large compound in the north-eastern quarter of the town. Though payment was going on from morning to dewy eve the kangalis shewed no diminition in number. Coming to know that they were being privity let in again through a back door, proper guard was taken nd a de novo payment was made. A few surplus bags remained after distribution, and their contents were scattered broadcast on the compund for the Burra Kangalis. নিমাইচরণ মল্লিকের স্ত্রীর শ্রাদ্ধও বিরাট ধুমধাম সহকারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 'কলিকাতাস্থ শোভাবাজাব নিবাসী মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের জীবনচরিত'-এ তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধের বিবরণে চরিতকার লেখেন—"এই সংবাদ প্রচার হইতে না হইতে ভাট, ফকির, কাঙ্গালী এবং অপরাপর অর্থ প্রয়াসী লোক পঙ্গপালের মত ক্রমাগত তাঁহার সদনে আসিতে লাগিল। শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে মহানগরী ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দের দুর্ভিক্ষের ন্যায় কাঙ্গালীতে পরিপূর্ণ হইল। ... নবকৃষ্ণ এই সকল কাঙ্গালীদের জন্য যে সকল পর্ণ কুটীর প্রস্তুত এবং খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়াছিলেন তাহা পর্যাপ্ত হইল না; ক্রমে বাজারের তণ্ডুল, ফলমূল, তরকারি ফুরাইয়া গেল, ... এমন সময়ে নাগরিক এবং উপনগরস্থ ভদ্রলোকেরা স্ব স্ব ভবনে তাহাদিগের আতিথ্য সৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইল—অসংখ্য দর্শকবৃন্দ সভার শোভা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। একটি সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ড কাষ্ঠফলক দ্বারা পরিবেষ্টিত; উপরে চন্দ্রাতপ দোদুল্যমান, প্রবেশদ্বারে সৈনিক পুরষেরা প্রহরী, প্রাঙ্গণ মধ্যে বিপ্র এবং শূদ্রদিগের বসিবার পৃথক পৃথক আসন, একদিকে গায়কেরা হরিগুণ কীর্ত্তন করিতেছে, অপরদিকে বারানসী ও নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে সমাগত মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ন্যায় স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের বিতণ্ডায় কোলাহল

করিতেছেন; সম্মুখে দ্বাত্রিংশটী কাঞ্চন এবং রজত ষোড়শ, তৈজসগুলি অনতিতুঙ্গ পর্ব্বত শ্রেণীর ন্যায় চন্দ্রাতপকে স্পর্স করিতেছে। শাল বনাত প্রভৃতির স্তূপ দর্শনে দর্শকদিগের মনে হইল বুঝি বড় বাজারের দোকান সকল শূন্য হইয়াছে। গজ, অশ্ব, সবৎস ধেনু, শিবিকা, শয্যা, ছত্র, পাদুকা, আসন প্রভৃতি পর্য্যায়ক্রমে সজ্জিত হইয়া সভার শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। সভার অনতিদূরে ভাণ্ডার মহলে দধি, দুগ্ধ, তৈল প্রভৃতি তরল দ্রব্যের হ্রদ কাটান হইয়াছে। মিষ্টান্ন এবং পক্কান্নের স্তূপ দেখিলে এক একটী দেউল বলিয়া ভ্রম হয়; বহু সংখ্যক হালুইকর ব্রাহ্মণ এবং মোদক অনবরত মেঠাই সন্দেশাদি প্রস্তুত করিতেছে; এবং তন্ডুল, দ্বিদল, ময়দা প্রভৃতি আড়তের ন্যায় রাশীকৃত ঢালা হইয়াছে।"

বলা বাহুল্য এই বিরাট শ্রাদ্ধটি যাঁর সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়েছিল তিনি হলেন বাবু নবকৃষ্ণের দেওয়ান গোকুল ঘোষাল মহাশয়।

এতো গেল শ্রাদ্ধের বিবরণ। শ্রাদ্ধ নিয়ে সেকালে দলাদলিও কম ছিল না। কখনো দুই বাবুর মধ্যে, কখনো দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বা ব্রাহ্মণদের মধ্যে। টোল চতুষ্পাঠীর সম্মানীয় অধ্যাপক মহাশয় সশিষ্য সম্প্রদায়কে হয়তো কোনো শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দিতে না দিয়ে আটকে দিতেন এই বলে যে, অমুক বাবুর শ্রাদ্ধে যোগ দেওয়া যাবে না। কারণ ওই অনুষ্ঠানে ত্রুটি আছে। ত্রুটি নানাবিধ। যেমন বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর যোগদান, কিংবা নিমন্ত্রণ যথোচিত হয়নি বা ব্রাহ্মণ বিদায়ের অর্থ বা নগদ দক্ষিণা অতীব কম। এই ভাবে চাপ দিয়ে দু'রকমের স্বার্থ সিদ্ধি হত। এক. সশিষ্য সম্প্রদায়কে বসে রাখা (আঁটে রাখা) যেত, দুই. ব্রাহ্মণ, অধ্যাপক বিদায়ের নগদ দক্ষিণা দ্বিগুণ, চতুর্গুণ বেড়ে যেত। জানা যায় এই ভাবে শেষ পর্যন্ত অধ্যাপকদের বিদায় নগদে ১০১ টাকায় উঠেছিল। শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ষষ্ঠ পুত্র মহারাজা কমল কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের শ্রাদ্ধেও দলাদলি হয়। বাগবাজারের 'বাবু' *নন্দলাল বসুর দিনলিপিতে* পাই—"১২ ডিসেম্বর ১৮ অগ্রহায়ণ।। কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ ও বরদা চরণ মিত্র এসেছিলেন কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করতে। দলাদলি। .....

১৯ ডিসেম্বর, ৫ পৌষ।।

আজ কমলকৃষ্ণের শ্রাদ্ধ সভা। বিকালে নীলমণি বাবু ও কামাক্ষা তর্কবাগীশ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কাছ থেকে এলেন। তাঁরা আমাকে জানান ভুবন বিদ্যারত্ন এবং নবদ্বীপের অন্যান্যরা কেউই (শ্রাদ্ধ) সভায় যাচ্ছেন না। তাঁরা ব্রাহ্মণ বিদায় নেবেন না। ....

২০ ডিসেম্বর ৬ পৌষ।।

ন্যায়রত্ন মহাশয়কে চিঠি লেখা হল একথা জানিয়ে যে কায়স্থকুল সংরক্ষণী সভা পণ্ডিতদের ৭০ টাকা দেবে। ন্যায়রত্ন মহাশয় এসে আমাকে জানালেন এই বিষয়ে তিনি একটি কথাও বলবেন না।.....

২৬ ফেব্রুয়ারি ৩ ফাল্গুন।।

বিশেষ কিছু ঘটেনি কেবল কমলকৃষ্ণের শ্রাদ্ধের সভা কলকাতার পণ্ডিতদের অর্থ প্রদান করেছে।"*

কলকাতার বাবু সমাজে দেব আর দত্তের লড়াই সুবিদিত। রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সঙ্গে বাবু চূড়ামণি দত্তের মামলা হয়। এই মামলায় জয়লাভের সংবাদ মৃত্যুর পূর্বেই দত্তবাবু

* আগ্রহী পাঠকেরা রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "বাবু বিবি এবং তাহারা' গ্রন্থে বাবু নন্দলাল বসুর দিনলিপি দেখতে পারেন।

শুনেছিলেন। আসলে একপুরুষে ধনী নবকৃষ্ণের আর্থিক উন্নতি দত্তরা সহ্য করতে পারছিলেন না। দত্তদের মোসাহেবরা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরকে 'নবা' বলে অপমানজনক মন্তব্য পর্যন্ত করতেন।। চূড়ামণি দত্ত পরলোক গত হয়েছেন। তাঁর শবদেহ শোভাযাত্রা সহকারে শোভাবাজার রাজবাড়ির পাশ দিয়ে চলেছে। পরিষদবর্গরা ব্যঙ্গ করে ছড়া কেটে চলেছেন, ঢুলিরাও ঢোলে সেই বোল তুলেছে—

"যম জিনিতে যায় রে চুড়ো যম জিনিতে যায়,
জপ তপ কর কিন্তু মরতে জানলে হয়।
সবাইকে ফেলে চুড়ো যম জিনিতে যায়
নবা তুই দেখবি যদি আয়।"

অবশ্য এর ফল খুব একটা ভাল হয়নি। চুড়ামণি দত্তের শ্রাদ্ধে কলকাতার ব্রাহ্মণরা যাতে যোগ না দেয় সে জন্য ষড়যন্ত্র হয়। উপায়ন্তর না পেয়ে যাবতীয় দোষ চুড়ামণি দত্তের পুত্র কালিপ্রসাদ দত্তের ঘাড়ে চাপানো হয়। এ ছাড়া সন্তোষ রায়কে কালিঘাটের মন্দির তৈরীর জন্য অর্থ দান করে সে যাত্রায় চূড়ামণির শ্রাদ্ধ পণ্ডের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা হয়।

এবার ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি রাজা রামমোহন রায়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধের প্রসঙ্গ। রামমোহনের পুত্র উকিল বাবু রমাপ্রসাদ রায় হিন্দু ধর্ম মতে মায়ের শ্রাদ্ধ করছেন। বরাদ্দ ১ লক্ষ টাকা। শহরের সমস্ত গোষ্ঠীকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। কাশী থেকে কর্ণাট পর্যন্ত আমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হয়েছে। হুঁতোম লিখছেন রমাপ্রসাদ বাবু "মার সপণ্ডিকরণে পৌত্তলিকতার দাস হয়ে শ্রাদ্ধ করবেন কার না কৌতূহল বাড়ে।"

হুঁতোম প্রদত্ত বিস্তৃত বিবরণের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা যাক। তিনি চতুষ্পাঠী ওয়ালা ভট্টাচার্যদের লোভ লালসাকে যেমন ব্যঙ্গ করেছেন, তেমনি বাদ যায়নি ব্রাহ্ম ওয়ালারাও। সে প্রসঙ্গ থাক, এখন শ্রাদ্ধের পূর্ব দিনের বিবরণ, "আগামীকাল সপিণ্ডন। আজকাল সহরে দলপতিদের অনেকেই বুলপানা চক্করের দলে পড়েছেন, নামটা ঢাকের মত, কিন্তু ভিতরটা ফাঁকা— রমাপ্রসাদ বাবু* সহরের প্রধান উকীল, সাহেবসুবোদেয় প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ তাহাতেও আরও কত কি হয়ে পড়বেন, সুতরাং দলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের পত্র ফিরিয়ে দেওয়াটাও ভাল হয় না, কিন্তু রমাপ্রসাদ বাবু ও *** প্রভৃতি নানা প্রকার তর্ক-বিতর্ক চলতে লাগলো।"

দলপতিরা হুঙ্কার ছাড়লেন, এ শ্রাদ্ধে যাওয়া যাবে না। সেই মত নোটিশ পড়লো। অনেকে আগে ভাগে রমাপ্রসাদ বাবুকে পত্র লিখে জানিয়ে দিলেন যে আপনার দলের সঙ্গে 'আচার ব্যাভার চলিত নাই' ফলে যাওয়া সম্ভব হবে না! অনেকে দু'নৌকায় পা দিয়ে চললেন। ভট্টচায্যিদের কড়া পাহারা, নজরদারি সত্ত্বেও অনেকে ডুবে ডুবে জল খাবার ধান্দা শুরু করলেন। 'শ্রাদ্ধের দিন রমাপ্রসাদ বাবুর বাড়ী লোকারণ্য হয়ে গেলো গাড়ী বারেন্ডা থেকে বাবুর্চ্চি খানা পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ পণ্ডিতের ঠেল ধরলো, এমকি, শ্রীক্ষেত্রে রথ যাত্রায় জগন্নাথেব চাঁদমুখ দেখতেও এত লোকারণ্য হয় না।'

---

* হাইকোর্টের সরকারী উকিল ছিলেন। পরে এদেশীয়দের মধ্যে প্রথম জজ হন। ২৪ পরগণায় জমিদারী ছিল।

আর সপিণ্ডনের দিন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন বাড়তে লাগলো। "এক দিকে রাজ ভাটেরা সুর করে বল্লালের গুণগরিমা ও আদিশূরেব গুণকীর্ত্তণ কত্তে লাগলো, একদিকে ভট্টাচার্যদের তর্ক লেগে গেল, দু-দশজন-ভেতর মুখো কুলীন দলপতিরা ভয় ও লজ্জায় সোয়ার হয়ে সভাস্থ হতে লাগলেন। দল দল কেত্তন আরম্ভ হলো, খোলের চাঁটিতে ও হরিবোলের শব্দে ডাইনিং রুমের কাচের গ্লাস ও ডিশেরা যেন ভয়ে কাঁপতে লাগলো।"

সেকালে কলকাতার ব্রাহ্মণ ভোজনের সরস ও জীবন্ত চিত্র হুঁতোম তাঁর নকশায় এঁকেছেন— "কলকেতার ব্রাহ্মণ ভোজন দেখতে বেশ-হুজুরেরা আঁতুরের মেয়েটিকেও বাড়ীতে রেখে ফলার কত্তে আসেন না—যার যে কটি ছেলেপুলে আছে ফলারের দিন বেরোবে। এক একজন ফলার মুখো বামুনকে ক্রিয়ে বাড়ীতে ঢুকতে দেখলে হঠাৎ বোধ হয়, যেন গুরু মশাই পাঠশালা তুলে চলেছেন। কিন্তু বেরোবার সময় বোধ হয় এক একটা সর্দ্দার ধোপা,—লুচি মণ্ডার মোটটি একটা গাধায় বইতে পারেনা। ব্রাহ্মণেরা সিকি, দুয়ানি ও আধুলি দক্ষিণা পেয়ে, বিদেয় হলেন, দই-মাখন এঁটো কলাপাত, ভাঙ্গ। খুরী ও আঁবের আঁটীব নীল গিরি হয়ে গেল।"

শুধু ব্রাহ্মণ নয়, কায়স্থ ভোজের বিবরণও আছে :

"শেষে কায়স্থের ভোজ মহাড়ম্বরে সম্পন্ন হলো। কুলীনেরা পর্য্যন্ত কই মাছের মুড়ো-মুণ্ডী পেলেন—এক একটা আধ বুড়ো আফিমখোর কুলীনের মাছেব মুড়ো চিবানো দেখে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা ভয় পেতে গালগোল। এক এক জনের পাতগো-ভাগাড়কে হাবিয়ে দিল।"

সন্ধ্যে নামতে না নামতেই কাঙালীদের ভিড় বাড়তে লাগলো। তাদের সঙ্গে দোকানদার, ভারী, উড়ে বেয়ারা, রেয়ো ও গুলি খোরেরাও যোগ দিয়েছিল। উপায়ন্তর না পেয়ে সন্ধ্যে সাতটার সময় বড় বড় উঠোনওয়ালা লোকেদের বাড়িতে তাদের পোরা হলো। শেষে সিকি, আধুলি, দু'আনি পয়সা দিয়ে তাদের বিদায় করা হলো। হুঁতোম লিখছেন—"প্রায় ত্রিশ হাজার কাঙালী জমেছিলো, এর ভিতর অনেকগুলি গর্ভবতী কাঙ্গালীও ছিল, তারা বিদেয়ের সময় প্রসব হয়ে পড়াতে নম্বরের বিস্তার বাড়ে।"

দুপুরে শুরু হয়ে রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত ভোজ সভা চলে। সব মিলিয়ে ১৫ দিন ধরে ধুমধাম সহকারে এই সপিণ্ডনের কর্ম চলেছিল।

যে সব দলপতিরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেননি তারা ঘোট পাকাতে শুরু করেন। যেসব ভট্টাচায্যিরা খেয়ে দেয়ে বিদায় নিয়ে এসেছিলেন তারাও নিজ নিজ দলপতির কাছে গঙ্গাজল ছুঁয়ে, শালগ্রাম শিলার সামনে দিব্যি খেয়ে বললেন—তারা শহরেই ছিলেন না, অনেকে আবার বললেন—রমাপ্রসাদ বাবুকে তিনি চেনেনই না। কেউ কেউ ধরা পড়ে প্রায়শ্চিত্ত করলেন। গোবর খেয়ে বিষ্ণু নাম স্মরণ করে ভুরু কামালেন।

সবশেষে রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরের প্রসঙ্গ। তিনি ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল বৃন্দাবনে তাঁর আশ্রমে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর তিনদিন আগে থেকে তিনি মারাত্মক সর্দি কাশিতে ভুগছিলেন। মৃত্যুর দিন সকালে ওষুধও খাননি। তাঁর বেয়াই তাকে ওষুধ খেতে বললেও তিনি খাননি। তিনি বলেছিলেন—'ঔষধ রোগ নিরাময় করে, মৃত্যুর পথ রোধ করতে পারেনা।" এরপর মালা জপ করা শেষে হলে ভৃত্য নবীনকে সামান্য দুধ দিতে বলেন।। দুধ পানের পর তাকে বলেন—'আজ আমি দেহত্যাগ করব। পুরোহিতকে

ডেকে পাঠা।' শেষ পর্যন্ত পুরোহিত এলেন। তিনি স্থানীয় বাসিন্দা ও বৃন্দাবনে বসবাসের সময় নিয়োজিত। এরপর দেব বাহাদুর নানা গ্রন্থ পাঠ করে শেষকৃত্য সম্পর্কে যেসব গূহ্য তথ্য পেয়েছিলেন তা ব্যক্ত করলেন। এসব তথ্য 'দি ফ্রাইডে রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি ভৃত্য নবীনকে তাঁর শেষকৃত্য বিষয়ে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা হলো : "আমার মৃত্যুর পর, দেহের সৎকার কিভাবে করতে হবে তোকে আগেই বলেছি। আবার তোকে বলছি ভালভাবে শুনে নে। মৃত্যুর পর দেহটিকে ভালভাবে স্নান করাবি। তারপর সেটিকে নতুন ধুতি পরাবার পর, তাতে গন্ধমাল্য ও বিভিন্ন প্রকারের ফুল সাজিয়ে দিবি। তারপর দেহ নিয়ে যমুনা তীর পর্যন্ত শোকযাত্রা হবে, সঙ্গে হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে যাবেন বৈষ্ণব সমাজ। ঘাটে দেহটিকে আবার স্নান করাবি, আবার পুরোহিতকে শেষকৃত্য সম্পর্কে যে উপদেশ দিয়েছি, এখনও বললাম, সেই মত প্রতিটি অনুষ্ঠান যেন সুচাররূপে করা হয়। চিতা সাজাবি কেবল তুলসী ও চন্দন কাঠ দিয়ে, অন্য কোনরকম কাঠ যেন না দেওয়া হয়, দেখবি (উল্লেখ করা যায় যে তিনি নিজে এই উদ্দেশ্যে প্রচুর তুলসী কাঠ সংগ্রহ করে রেখেছিলেন) জীবিত অবস্থায় আমি যেভাবে শুই, ঠিক সেই ভাবে চিতায় আমার দেহ শোয়াবি, চিতার চার কোণে চারটে বেশ উঁচু বাঁশ পুঁতে তাতে আমার মশারী টাঙিয়ে দিবি; কিন্তু তাতে চিতার আগুন যাতে ধরে যেতে না পারে সেই রকম উঁচুতে মশারিটা খাটাবি। তারপর আমার উপদেশ অনুযায়ী দাহকার্য হবে। দেহের একসের মাত্র যখন অবশিষ্ট থাকবে সেই সময় চিতা নিবিয়ে ফেলবি। না পোড়া এই দেহাবশেষটিকে তিনভাগে ভাগ করে, একভাগ কচ্ছপদের খাওয়াবি, এক অংশ যমুনার গভীর জলে বিসর্জন দিবি আর শেষ অংশটি বৃন্দাবনের মাটিতে সমাধি দিবি; কিন্তু সাবধান, সমাধির গর্ত যেন বেশ গভীর হয় যাতে কোন জন্তু জানোয়ার সেটা মাটি খুঁড়ে তুলতে না পারে। দাহকার্য শেষ হবার পর নিঃশব্দে বাসায় ফিরে আসবি; বাসায় যেন সেদিন কোন রান্না না হয়; খুব ক্ষিদে পেলে অন্য কোথাও গিয়ে কিছু খেয়ে নিবি। আমার মৃত্যুর দশদিন পর যমুনায় দশটি পিণ্ড দিয়ে বৃন্দাবনের ব্রাহ্মণদেব ভাল ভাবে ভোজন করাবি: এইসব শেষ হলে তোরা দেশে ফিরতে পারিস।"

বাবু সমাজের এসব বিচিত্র কীর্তি উনবিংশ শতকের সমাজ ইতিহাসের মূল্যবান দলিল হতে পারে। এ রকম আরো বিবরণ আছে। যেমন, দ্বারকানাথ ঠাকুরের শ্রাদ্ধের প্রসঙ্গ। তবে তা এক্ষণে বলার আবশ্যক দেখিনা।

গ্রন্থ সূত্র ঃ

১. সচিত্র কলকাতার কথা/প্রমথনাথ মল্লিক (অখণ্ড সংস্করণ)
২. কলকাতারা বাবু বৃত্তান্ত/ লোকনাথ ঘোষ।
৩. হুঁতোম প্যাঁচার নকসা / কালীপ্রসন্ন সিংহ।
৪. কলিকাতা দর্পণ / রাধারমণ মিত্র।
৫. কৃষ্ণনাথ, রামদাশ, হুইলার ও সমসাময়িক মুর্শিদাবাদ সমাজ / দেবব্রত ধর।
৬. বাবু বিবি ও তাহারা / রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়।
৭. সংবাদ পত্রে সেকালের কথা / ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৮. সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র / বিনয় ঘোষ।
৯. অন্যান্যগ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা।

কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার শ্মশান দূষণ

সাবেক চব্বিশ পরগণা ও কলকাতার শ্মশানগুলি আদিগঙ্গা ও গঙ্গার তীরে গড়ে উঠেছিল। কেননা হিন্দুদের শ্মশানের সঙ্গে শ্মশান ঘাটের একটা সম্পর্ক আছে। হিন্দুর চিতায় জল ঢালা, এবং শ্মশান যাত্রীদের স্নান, শব দাহধিকারীর স্নানান্তে শোকসূচক বস্ত্র ও প্রতীক ধারণ বেশ গুরুত্বপূর্ণ আচার। যে সময় এসব শ্মশান ও শ্মশানঘাট গড়ে উঠেছিল তখন এসব অঞ্চল ছিল জনশূন্য, ফাঁকা এলাকা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এসব জায়গায় ঘন বসতি গড়ে ওঠে। তখনই দেখা দেয় দূষণ সম্পর্কিত সমস্যা।

কলকাতায় মোট ৮টি শ্মশান আছে। প্রায় সব কটায় বৈদ্যুতিক চুল্লী আছে। কিন্তু সবগুলোতে পলিউশন কন্ট্রোল ডিভাইস বসানো নেই। ফলে শ্মশানের পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দারা নানা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। যেগুলোতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বসানো আছে সেগুলোও মাঝে মধ্যে খারাপ হয়ে যায়। ফলে মড়া পোড়ানোর দুর্গন্ধ এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড গুঁড়োয় এলাকা বাসীদের নাভিশ্বাস উঠছে। কলকাতা পুরসভা চালিত এই সব শ্মশানগুলো নিয়ে আশপাশের বাসিন্দাদের ক্ষোভও আছে। যেমন কেওড়াতলা মহাশ্মশানের ছাই এবং দুর্গন্ধের জন্য চেতলা ব্রিজ দিয়ে যাওয়াটাই সমস্যার হয়ে দাঁড়ায়। আবার নিমতলা মহাশ্মশানে চারটি ইলেকট্রিক চুল্লী এবং বারোটি কাঠের চুল্লী আছে। এখানে চব্বিশ ঘন্টাই শবদাহ চলে। ফলে ইস্টার্ণ ব্যাঙ্ক রোড ধরে হাঁটা দায় হয়। জোড়াবাগান কাঠগোলা এলাকা এবং পোর্ট কমিশনের আবাসনের বাসিন্দারা চরম দুর্ভোগ পোহান। কাশী মিত্র শ্মশান ঘাটে একটি মাত্র ইলেট্রিক চুল্লী। দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বসানো থাকলেও মাঝে মধ্যেই বিকল হয়ে যায়, ফলে কুমারটুলি এলাকায় পরিবেশ দূষণ চরমে ওঠে। আবার দক্ষিণের গড়িয়া মহাশ্মশানে অবস্থাটা আরো সাংঘাতিক। এখানে ইলেকট্রিক চুল্লির সংখ্যা দুই। কিন্তু পলিউশন কন্ট্রোল ডিভাইস যন্ত্র নেই। ফলে পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে মড়া পোড়ানো ছাই ও শবদাহের দুর্গন্ধ। এখানেই আছে মাদার টেরেসা যক্ষ্মা হাসপাতাল। মিতালী মাঠ, পূর্ব পাড়া, রামকৃষ্ণ নগরের বাসিন্দাদের ছাইয়ের দাপটে প্রাণ ওষ্ঠাগত। সে তুলনায় কাশীপুরের রামকৃষ্ণ মহাশ্মশান ও সিরিটি শ্মশান এলাকায় অভিযোগ কম। ধাপা এলাকায় বেওয়ারিশ লাশ পোড়ানোর জন্য যে শ্মশান রয়েছে সেখানেও তেমন কোনো অভিযোগ নেই।

শুধু কলকাতায় নয় পার্শ্ববর্তী জেলা গুলোতেও শ্মশান দূষণের অভিযোগ রয়েছে। যেমন উত্তর ২৪ পরগনার আড়িয়াদহের শিবতলার শ্মশান পাড় এলাকা। কামারহাটি পুরসভার ১০ এবং ১২ নম্বর পুরসভার বড় অংশের কয়েক হাজার মানুষ শ্মশান-দূষণের শিকার। ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ আনন্দবাজার পত্রিকা লিখছে : 'কালো ধোঁয়ার ছেয়ে যায় আকাশ। ছাই আর দুর্গন্ধ ভরিয়ে দেয় চতুর্দিক। দূর থেকে মনে হয়ে যেন কারখানার পরিবেশ। .... মানুষ হারিয়ে ফেলেছে স্বাভাবিক জীবন। 'অসহায়' শিশুদের চপলতাও উধাও হয়ে গিয়েছে। দিনের বেশির ভাগ সময় ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে থাকতে গিয়ে কখন যেন হারিয়ে যায় শৈশব।'' বলা বাহুল্য, এখানে কাঠের চুল্লির বদলে এসেছে ইলেকট্রিক

চুল্লী। কিন্তু পলিউশান কন্টোল ডিভাইস নেই। ফলে সমস্যা বেড়েই চলেছে। সমস্যা কম-বিস্তর আছে খড়দহের নাথুপাল শ্মশান এলাকায় এবং বরানগর, পানিহাটি, টিটাগড়ের শ্মশান পার্শ্ববর্তী এলাকায়। এর মধ্যে খড়দহে কাঠের চুল্লি আছে, ইলেকট্রিক চুল্লি নেই। অন্যগুলোয় ইলেকট্রিক চুল্লী থাকলেও সবগুলোর দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র নেই। দিন দিন জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে এবং বসতি এলাকার বিস্তার বাড়ছে তাতে এই সব এলাকায় শ্মশান দূষণ সম্পর্কে এক্ষুনি সচেতন না হলে ভবিষ্যতে এলাকা বাসীকে ভুগতে হবে। ৬ই জানুযারী কলকাতার মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন—সিরিটি, গড়িয়াসহ কলকাতার যেসব শ্মশানে দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বসানো নেই, সে মত চারটি শ্মশানে শীঘ্রই দূষণ নিযন্ত্রণ যন্ত্র বসানো হবে। এর জন্য ব্যয় হবে এক কোটি টাকা। এ ছাড়া শ্মশানগুলোতে কাঠের নিয়মিত যোগান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

কিছু তথ্য

১. কলকাতায় মহাশ্মশান—২টি। ১. কেওড়াতলা, ২. নিমতলা। এগুলোতে মাসে গড়ে ১০০টি করে শবদাহ করা হয়। এজন্য মাসে গড়ে ২৫ হাজার টাকা কর আদায় হয়। আর ব্যয় হয় শুধু বিদ্যুতে মাসে গড়ে ৫০ হাজার টাকা। এছাড়া ২৪ ঘন্টা কর্মরত পুরকর্মীদের বেতন, জল, নিকাশি খরচ ও বর্জ্য অপসারণ খরচ আছে।

২. কলকাতার ৭টি শ্মশানের ১৫টি ইলেকট্রিক চুল্লীতে বছরের প্রায় ৬০ হাজার মৃতদেহ দাহ করা হয়। এর ৫৫ শতাংশ কলকাতার বাইরের বাসিন্দা। ১২ বছরের বেশি বয়স্ক শবের দাহ বাবদ পুরসভা নেয় মাথাপিছু ১৭০ টাকা।

৩. ২০০৩ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর মোট ৫০,২৫৪টি শব দাহ করা হয়েছে কলকাতার বিভিন্ন শ্মশানে। তাদের সংখ্যা এরূপ—(ক) নিমতলা মহাশ্মশান—১৭,৫১৪টি, (খ) কেওড়াতলা মহাশ্মশান—১৫,৯৯৪টি, (গ) গড়িয়া—৩৮৮১টি।

তথ্যসূত্র : দৈনিক বর্তমান, আনন্দবাজার ও সংবাদ প্রতিদিন।

বাংলার রবি অস্তমিত

সংবাদ সাহিত্য

(কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ও শেষ কৃত্য সম্পর্কে গল্প গুজব ও উড়ো গল্প আজও আমাদের মধ্যে চালু আছে। কতক বক্তব্য তো রীতিমত আপত্তিকর। অথচ সেদিনের প্রকৃত ঘটনা কি ঘটেছিল তা জানতে আমরা পাঠকের কাছে **শনিবারের চিঠি** পত্রিকা থেকে প্রতিবদেনটি হুবহু তুলে দিলাম- সম্পাদক)

গত ২২এ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ইংরেজী ৭ই আগস্ট বেলা ১২টা ১৩ মিনিটের সময় ঝুলন-পূর্ণিমার ঠিক সমাপ্তিমূলে বাংলার রবি অস্তমিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স আশি বৎসর তিন মাস পূর্ণ হইতে দুই দিন বাকি ছিল।

* * *

এই প্রসঙ্গে ইহার অধিক লিখিবার প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ও শেষকৃত্য সম্বন্ধে বহু শিক্ষিত বাঙালীর মুখে মুখে এবং দুই একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বহু লজ্জা ও গ্লানিকর সংবাদ প্রচারিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের শবদেহ লইয়া বহুবিধ অনাচার ও তাণ্ডবের কথা শুনির্তেছি। অনেকে ইহার মধ্যে কোনও কোনও ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের গোপন মতলব চরিতার্থ হইতে দেখিয়াছেন, এবং কেহ কেহ কবির মৃত্যুতে বাংলাদেশের শোককাতর অধীব জনতার পৈশাচিক মনোবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া পীড়িত হইয়াছেন। আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে বলেতেছি যে, এরূপ কিছুই ঘটে নাই, —জীবিত বা মৃত রবীন্দ্রনাথের প্রতি অসম্মান-প্রদর্শনের বিন্দুমাত্র চেষ্টাও কুত্রাপি পবিলক্ষিত হয় নাই; যাহা রটিয়াছে তাহা মিথ্যা অথবা ভ্রান্তিপ্রসূত। যে অধীরতা ও চাঞ্চল্যকে কেহ কেহ মৃতের প্রতি অসম্মান কল্পনা করিয়াছেন, তাহা কাহারও স্বেচ্ছাকৃত নয়, বিপুল জনতার প্রবল চাপে জীবধর্ম্মী মানুষের অনিচ্ছাকৃত আত্মরক্ষার চেষ্টায়, ব্যষ্টির পীড়নে ব্যক্তির কাতরতায় যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মনুষ্য-স্বভাবের অনুযায়ীই হইয়াছে; কোনও দানবীয় ইঙ্গিতে নির্দ্দিষ্ট কিছু ঘটা সেদিন সম্ভব ছিল না।

* * *

যে সকল অভিযোগ কানে আসিতেছে, তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি এই—(১) রবীন্দ্রনাথ যখন অন্তিম নিশ্বাস ফেলিতেছিলেন, জনতা তখন লোহার গেট ভাঙিয়া বন্যার মত ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছিল। (২) এক দল মতলববাজ লোক মৃতদেহ অধিকার করিয়া নিজেদের ইচ্ছা ও সুবিধা অনুযায়ী শবযাত্রার আয়োজন করিয়াছিল। (৩) কলিকাতার আবালবৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষকে শেষ দেখা দেখিবার সুবিধা দেওয়া হয় নাই; সকলে সমবেত হইবার পূর্ব্বেই শবযাত্রা শুরু হইয়াছিল। (৪) শবযাত্রা অতি দ্রুত শ্মশানে উপস্থিত হইয়াছিল। অনেকে চেষ্টা করিয়াও ফুলমাল্য দানে, শেষ সম্মান প্রদর্শন করিতে বা শবযাত্রা দেখিতে পান নাই। (৫) শ্মশানে শবদেহ নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছিল। (৬) শেষকৃত্য করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথকেও শ্মশানে রাস্তা দেওয়া হয় নাই। (৭) হিন্দু জনতার প্রাধান্য হেতু রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার উত্তরাধিকারীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও হিন্দুমতে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। আমরা একে একে এই অভিযোগগুলির উত্তর দিতেছি।

* * *

এক, রবীন্দ্রনাথের শেষ নিশ্বাস পড়িবার পূর্ব্বেই কলিকাতার নানা স্থানে গুজব উঠিয়াছিল, তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন; এমন কি, শুনা যাইতেছে যে, কলিকাতার সিটি কলেজের মত প্রতিষ্ঠানও সম্পূর্ণ সংবাদ না লইয়াই প্রাতঃকালেই কলেজ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, সাধারণ মানুষ কি করিবে বলাই বাহুল্য। অথচ বেতার ও টেলিফোন মারফৎ ঘণ্টায় ঘণ্টায় রবীন্দ্রনাথের সংবাদ কলিকাতায় প্রচার করা হইয়াছিল। উক্ত গুজবের ফলে সকাল হইতেই ধীরে ধীরে রবীন্দ্র-ভবনের সম্মুখে জনতার সমাগম হইতে থাকে। তাহারা যখন শোনে, তিনি তখনও জীবিত আছেন, তখন অনেকে চলিয়া যায় এবং কেহ কেহ নীরবে প্রতীক্ষা করিতে থাকে; তাঁহাদিগকে যথাসম্ভব রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে যাইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। ডাক্তারেরা যখন তাঁহার মৃত্যু-সংবা প্রচার করেন, তখন বাড়ির সম্মুখে বিপুল জনতা। দোতলায় যে ঘরে তিনি ছিলেন, সে ঘরের বারান্দায় তখন অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যশালী রবীন্দ্রভক্তদের ভিড় জমিয়াছিল। গোলযোগের সূত্রপাত সেইখানে। সেই ভিড়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া জনতা দাবি করিয়া বসে, তাহারাও শেষ দর্শন করিবে, লোহার গেট বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে বাধা দেওয়া হয়। কর্ত্তৃপক্ষের উচিত ছিল, তখনই গেট খুলিয়া সকলকে সমান অধিকার দেওয়া। এইরূপ হইলে তাহারা এক সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া অন্য সিঁড়ি দিয়া পুনরায় বাহিরে আসিতে পারিত। শেষ পর্য্যন্ত গেট ভাঙিয়া অবাধ-প্রবেশ সত্ত্বেও তাহারা এইভাবেই দর্শন করিয়াছিল। গেট কোনও একজন বা দশজনের চেষ্টায় ভাঙে নাই, কারণ যাহারা ভিড়ের ঠিক সম্মুখে ছিল, তাহাদের নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও গেট ভাঙিয়াছিল এবং সেই হতভাগ্যদের লাঞ্ছনা হইয়াছিল সর্ব্বাধিক। বিপুল জনতা একটি নিরেট বস্তুর মত গেটে চাপ দিয়াছিল, কোলাপ্‌সিব্‌ল গেট সে চাপ সহ্য করিতে পারে নাই। প্রত্যেকেই কবিকে শেষ দর্শন করিবার জন্য অধীর ছিল। অসম্মান করিবার প্রবৃত্তি দেখি নাই। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে জনতা উপরে উঠিবার চেষ্টাও করে নাই।

দুই, রবীন্দ্রনাথ যে কত বড় সৌভাগ্যশালী ছিলেন এবং দেশের লোকের চিত্তকে কি ভাবে অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তিমকৃত্যে তাহার প্রমাণ পাই। শবযাত্রায় আত্মীয়পর সমাজ বা সভার কোনও প্রাধান্য ছিল না; কোনও বাছাই করা দলের পক্ষেই তাঁহার শবদেহ উত্তোলন বা বহন করা সম্ভব হয় নাই; সকলেরই সমান দাবি ছিল এবং ঘটিয়াছিলও তাই; সেই ভিড়ের মধ্যে জীবন তুচ্ছ করিয়া যাহারাই কাঁধ দিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহারাই কাঁধ দিয়াছে, কিন্তু ভিড়ের চাপে তাহারা পরক্ষণেই স্থানচ্যুত হইয়াছে। বস্তুত নিঃসংশয়ে বলা যায়, সমগ্র বাংলাদেশ সেদিন রবীন্দ্রনাথের শবদেহ বহন করিয়াছিল— ঠাকুরবাড়ি, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী বা ব্রাহ্মসমাজের কোনও বিশেষ দাবি টেকে নাই, টিকিতে পারে না; জীবনে যাঁহারা তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ছিলেন, সেদিন ভিড়ের মধ্যে তাঁহারাও স্থান সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। ইহা আনন্দের কথা, ইহাতে কাহারও অভিমান হওয়া উচিত নয়।

* * *

তিন, ঠাকুরবাড়ির কুলপ্রথানুযায়ী রথীন্দ্রনাথ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতার শবদেহ শ্মশানে লইয়া যাইতে যেন অনাবশ্যক বিলম্ব করা না হয়। কলিকাতার ব্ল্যাক-আউট ব্যবস্থার জন্য পুলিসের কর্ম্মকর্ত্তারাও সেই অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। তাঁহারা ইহাও

বলিয়াছিলেন যে, অল্পকালের মধ্যে যেরূপ বিপুল জনসমাগম হইয়াছে, অধিক বিলম্ব করিলে এবং রাত্রিতে শবযাত্রা ঘটিতে দিলে অন্ধকারে ভিড়ের চাপে অসংখ্য দুর্ঘটনা ঘটিবে, রবীন্দ্রনাথের মত মহামানবকে কেন্দ্র করিয়া এরূপ ঘটিতে দেওয়া সঙ্গত হইবে না। বস্তুত সে সময় প্রায় সকলেরই চিন্তাশক্তি লোপ পাইয়াছিল; যাঁহারা দীর্ঘদিন ধরিয়া দিবারাত্র কবির সেবা করিতেছিলেন এবং যাঁহারা ইচ্ছা করিলেই সমগ্র ব্যাপারটার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিতেন, রবীন্দ্রনাথের বিয়োগে তাঁহারা সকল কর্ম্মোদ্যম হারাইয়া নিষ্ক্রিয় ও মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহাদের প্রত্যেকেরই দেহ ও মনে অবসাদ ঘনাইয়া আসিতে দেখিয়াছি; তাঁহাদের চিরপূজ্য গুরু ও আশ্রয় রবীন্দ্রনাথের নিষ্প্রাণ দেহ লইয়া কি হইতেছে বা হইবে, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান ছিল না; তাঁহাদের কেহই কোনও কর্ত্তৃত্ব করিবার চেষ্টা মাত্র করেন নাই। সুতরাং তাঁহারা শবদেহ বাংলাদেশের জনমণ্ডলীর হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই জনতার কাছে এক রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অপর কোনও ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের কোনও বৈশিষ্ট্য বা প্রাধান্য সেদিন ছিল না; মৌলভী ফজলল হক, সার্ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র বসু প্রভৃতি প্রধানেরা সকলেই সাড়ে বত্রিশ ভাজার মত জনতার মধ্যে মিশাইয়া গিয়াছিলেন; মহিলাদের কোনও স্বতন্ত্র সম্মান ছিল না। আমরা ইতিপূর্ব্বে বাংলাদেশে আর কোনও ব্যাপারে এমনটি ঘটিতে দেখি নাই; ইহাকে অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার বলা চলে। শবদেহ একদিন সম্মানের সহিত রক্ষা করা, ক্রিমেটোরিয়াম, ক্যাওড়াতলা অথবা শান্তিনিকেতনে শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার কথাই উঠে নাই।

* * *

চার, শবযাত্রা বেলা সাড়ে তিনটায় বাহির হইয়া নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ নিমতলায় পৌছিবে— এইরূপই হিসাব ছিল। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল, পিছনের বিপুল জনতার প্রবল ঠেলায় সকলেরই ইচ্ছার বিরুদ্ধে শবযাত্রা ঝড়ের বেগে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এই বেগ প্রশমিত করা কাহারাও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। ইহা যে এত দ্রুত শ্মশানে পৌছিবে, শববাহক ও শবানুগামী কাহারও তাহা কল্পনাতেও ছিল না। পূর্ব্ব-নির্দ্ধারণ অনুযায়ী সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে শবযাত্রা শ্মশানে পৌছে নাই বলিয়াই শ্মশানের ব্যবস্থাও ঠিকমত হইতে পারে নাই; কর্পোরেশন-কর্ত্তৃপক্ষ বেড়া দিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান সুরক্ষিত করিবার ভার লইয়াছিলেন, সময়াভাবে তাঁহারাও তাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

* * *

পাঁচ, কি কারণে জানি না, এক দল লোক রটাইয়া বেড়াইতেছেন যে, শ্মশানে রবীন্দ্রনাথের শবদেহ নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা বড় গলা করিয়া স্বজাতি-নিন্দা করিতে পাইয়া আত্মপ্রসাদও লাভ করিতেছেন। এত বীভৎস কুৎসিত মিথ্যা যে মানুষে সজ্ঞানে রটনা করিতে পারে, ইহা ভাবাও কঠিন; মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধার এমন জঘন্য অর্থ পাষণ্ডদের পক্ষেই করা সম্ভব। মৃতদেহ শ্মশানে নীত হইয়া যেখানে রক্ষিত হইয়াছিল, সেখানে তৎপূর্ব্বেই জনতা সমবেত হইয়াছিল; ঢালু পিচ্ছিল সঙ্কীর্ণ স্থানে সোজা দাঁড়াইয়া থাকা কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না; তদুপরি উত্তরোত্তর জনতার চাপ বৃদ্ধি পাইতেছিল, ফলে দুই এক-জন নিতান্ত অনিচ্ছায় হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া শবাধার স্পর্শ করিয়া থাকিবে— এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধকে তাঁহারা

স্বেচ্ছাকৃত চুলদাড়ি ছেঁড়া বলিয়া আসর জমাইতেছেন, পদদলন করা বলিতেছেন, তাঁহাদিগকে কি বলিব! মুখাগ্নির অব্যবহিত পরে অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণে স্থানটি অধিকতর কর্দ্দমসঙ্কুল ও পিচ্ছিল হইয়া পড়ে, তথাপি সংস্কার কার্য্যের কোনও বাধা উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা জানি না। ঐরূপ অবস্থায় ঐরূপ স্থানে এবং ঐরূপ ভিড়ে যে তাহা সম্ভব হইয়াছিল ইহাতে জনতাকে প্রশংসাই করিতে হইবে।

* * *

ছয়, রথীন্দ্রনাথ পূর্ব্ব হইতেই অতিশয় অসুস্থ ছিলেন এবং পিতৃবিয়োগের কালে তিনি একধারে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। শবযাত্রার বহু পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, এই অবস্থায় শেষকৃত্য করিবার জন্য তাঁহাকে শ্মশানে লইয়া যাওয়া সঙ্গত হইবে না; ডাক্তারেরা এবং স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ এই বিধান দিযাছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই স্থির ছিল যে, সত্যেন্দ্রনাথের পৌত্র, সুরেন্দ্রনাথের পুত্র সুবীর ঠাকুর শেষকৃত্য করিবেন, তিনি প্রস্তুত হইয়াই শ্মশানে গিয়াছিলেন এবং যথানির্দ্ধারিত শেষকৃত্য করিয়াছিলেন। রথীন্দ্রনাথ ভিড়ের মধ্যে পথ পান নাই বলিয়া শেষকৃত্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই, ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। শবযাত্রা শ্মশানে পৌঁছিলে তিনি শ্মশানে গিয়াছিলেন ইহা ঠিক, জনতা তাঁহার পথরুদ্ধ করিয়াছিলেন ইহাও ঠিক, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়াতেই তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন; তাঁহার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হইলে পথ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া অসম্ভব হইত না।

* * *

সাত, রবীন্দ্রনাথের শেষকৃত্য সমস্তই আদি ব্রাহ্ম সমাজ মতে সম্পন্ন হইয়াছিল, এই মত হিন্দুমতের প্রায় অনুরূপ; মুখাগ্নি, চিতাভস্মে কলসী করিয়া জল নিক্ষেপ, গঙ্গাজলে অস্থি বিসর্জ্জন সকলই হইয়াছিল, সুবীর ঠাকুরের পৈতাগাছও গোপনে ছিল না; জনতা হরিবোল-ধ্বনিও করিয়াছিল। ইহাতে কি প্রমাণিত হয়, অধিকারীদের অনিচ্ছাক্রমে হিন্দুমতে তাঁহাকে দাহ করা হইয়াছে? উপাসনাদি মন্ত্রপাঠ সকলেই দেখিযাছেন, শ্মশানে হরির নামেও আপত্তি হইবার কথা নয়— এসব সত্ত্বেও যাঁহারা মিথ্যা রটনা করিতেছেন, তাঁহাদের কথার জবাব দিবার আবশ্যক ছিল না। কলিকাতার জনসাধারণের প্রতি যে অকারণ দোষারোপ করা হইয়াছে, তাহারা প্রতিবাদেই এই প্রসঙ্গ লিখিত হইল; সত্যই ইহা লিখিবার মত বিষয় নয়। অপোগণ্ড ছাত্রদের দুই একটি অশোভন আচরণ যদি কোথাও ঘটিয়া থাকে, তাহার জন্য সমগ্র জাতিকে অপরাধী করা চলে না।

এই প্রসঙ্গে আরও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক, কেন না দেখিতেছি, কোনও কোনও স্থলে এক আধটি ভুল সংবাদ প্রচারিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথকে ২৫-এ জুলাই চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আনা হয়; ৩০ জুলাই বুধবার প্রাতঃকালে তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচার হয়। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি সকলের সহিত কথাবার্ত্তাও বলিযাছিলেন, হাস্য-পরিহাসও করিয়াছিলেন, সেইদিন প্রাতে অপারেশনের আগে তিনি মুখে মুখে একটি কবিতা রচনা করেন, কবিতাটি মুদ্রিত হইয়া শান্তিনিকেতন শ্রাদ্ধ-বাসরে (৩২ শ্রাবণ) বিতরিত হয়। আমবা নিম্নে তাহা পুনর্মুদ্রিত করিলাম। ইহারাই পূর্ব্বদিন তিনি "মৃত্যু" নামে যে কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকা (অনুবাদ-সহ) ও 'প্রবাসী'তে (ভাদ্র) প্রকাশিত হইয়াছে।

সেটিও আমরা প্রকাশ করিলাম।

বুধবার হইতেই রবীন্দ্রনাথ বিশেষ দুর্ব্বল হইয়া পড়েন ও তাঁহার কথাবার্ত্তা হাস্য-পরিহাস কমিয়া আসে। শুক্রবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি কথা বলিয়াছিলেন; তাঁহার শেষ প্রকাশিতব্য কথা অবীন্দ্রনাথের জয়ন্তী সম্পর্কে। মৃত্যুর প্রায় ৭০ ঘণ্টা তিনি সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন।

* * *

শেষ রচনা

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি'
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত;
তার তরে রাখোনি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তা'রে
যে-পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।
বাহিরে জটিল হ'ক অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে।
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেয়েছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার॥

জোড়াসাঁকো, কলিকাতা
৩০শে জুলাই, ১৯৪১
সকাল ৯ ঘটিকা

মৃত্যু

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে।
এক মাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কষ্টের বিকৃত ভাল, ত্রাসের বিকট ভঙ্গী যত,
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।

যতবার ভয়ের মুখোস তার করেছি বিশ্বাস,
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হা'র-জিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ কুহক,
শিশুকাল হ'তে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা,
দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।

* * *

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 'ডাকঘরে'র পুনরভিনয় ব্যবস্থা করিতেছিলেন, সেই সময় বইটির কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, অনেক গানও নূতন সন্নিবিষ্ট হয়। শেষ পর্য্যন্ত অভিনয় হয় নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নূতন গানের মধ্যে একটিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করিয়া দেন ও বলেন যে, তাঁহার দেহাবসানের পর যে উহা গীত হয়। গত ২২এ শ্রাবণ তাঁহার মৃত্যুদিনে শান্তিনিকেতনে গানটি গীত হয়। ৩২-এ শ্রাবণ শ্রাদ্ধবাসরেও উহা গীত হইয়াছিল। গানটি এই—

সমুখে শান্তি-পারাবার,
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথী,
লও লও হে ক্রোড় পাতি',
অসীমের পথে জ্বলিবে
জ্যোতির ধ্রুবতারকা।

মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।

হয় যেন মর্ত্ত্যের বন্ধনক্ষয়,
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি' লয়,
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা অজানার॥

পুনশ্চ, শান্তিনিকেতন
৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩৯
বেলা একটা

'শনিবারের চিঠি' ভাদ্র ১৩৪৮ হতে পুনর্মুদ্রিত

মধু-স্মৃতি

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম

দেখিতে-দেখিতে প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। মধুসূদন আর ইহজগতে নাই—কিন্তু তাঁহার মধুময়ী স্মৃতি মধুর সৌরভে ভুবন ভরিয়া রাখিয়াছে। মধুর সমাধি প্রকৃতি-দেবী শ্যাম তৃণাচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন। তখন পর্য্যন্ত তাঁহার স্বদেশবাসী একজনও তদুপরি একখণ্ড ইষ্টকও রাখিয়া দেন নাই; তাহা স্মরণীয় করিতে তখন পর্য্যন্ত কাহারও অনুরাগ লক্ষিত হয় না। সেই পূত-পবিত্র ভূমিখণ্ড তেমনই অনাবৃত রহিয়াছে—নিদাঘের প্রচণ্ড রৌদ্র সেই ভূমি তৃণহীন করিতেছে; তাহাকে ছায়াদান করিতে কোন পত্রপল্লব- প্রসারিত তরু রোপিত হয় নাই; ঘনঘোর প্রাবৃটের অবিশ্রান্ত ধারায় সেই তীর্থ সদৃশ পুণ্যভূমি সলিলসিক্ত হইতেছে—তদুপরি কোন ছত্রবৎ চন্দ্রাতপ রচিত হয় নাই। শরতের পূর্ণচন্দ্র শারদ-কৌমুদি প্রপাতে সেই ভূমি প্লাবিত করিতেছে—হেমন্তের নৈশ শিশির-আসারে—শীতের প্রখর হিমবর্ষণে, সেই ভূমি স্নিগ্ধ হইতেছে—উজ্জ্বল বসন্তের রক্তিম ঊষায় সেই ভূমি সুরঞ্জিত হইতেছে—কিন্তু কোন মানবহস্ত তখন পর্য্যন্ত সেই ভূমির উপব কোন স্মৃতিমঠ নির্ম্মাণ করিয়া কবি প্রতিভার উপযুক্ত পূজার ব্যবস্থা করে নাই। কবির মহানিদ্রার সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁহার দেশবাসীরাও মহানিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন! মধুসূদন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে লক্ষ্য করিয়া যে কথা বলিয়াছিলেন,—হায়, তাঁহার সমাধিস্তম্ভ সম্বন্ধে সে কথা যে তাঁহাকেও লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে!—

"নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতা-ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে?"

যিনি কীর্ত্তিমঠে চির অমর হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব সমাধি-স্তম্ভের প্রয়োজন কি? মধুসূদন ভিক্টর হ্যুগোকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাঁহাকেও এ ক্ষেত্রে সে কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—

"হে কবীন্দ্র, জয়ী তুমি এই মর-কুলে!
আসে যবে যম, তুমি হাসো হে সাহসে।
অক্ষয় বৃক্ষের রূপে তব নাম রবে
তব জন্ম দেশ-বনে কহিনু তোমারে;
প্রস্তরের স্তম্ভ যবে গল্যে মাটি হবে,
শোভিবে আদরে তুমি মনের সংসারে!"

সে যাহাই হউক, তাঁহার দেশবাসীরও ত তাঁহার প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে ! তিনি কীর্ত্তিবলে অমর হইলেও, তাঁহাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ত তাঁহার অবশ্য প্রাপ্য। বিধাতার

বিধানে তাঁহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল, তাঁহারা জাগ্রত হইয়া শুভ্র-মর্ম্মরে মধুসূদনের সমাধি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া, মহাকবির সম্মান রক্ষা করিয়া, কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির স্রকচন্দনে তাঁহার চরণতলে প্রতিবৎসর পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে কৃতার্থ হইতেছেন। মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভের ইতিহাস নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ইংরেজী ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের এক বৈশাখী অপরাহ্নে একটি সপ্তদশ বর্ষীয় বঙ্গীয় যুবক, লোয়ার সার্কুলার রোড সমাধি-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া, মাইকেলের সমাধিস্তম্ভ (Tomb) অন্বেষণ করিতে লাগিল। যুবক কিছুদিন পূর্ব্বে 'কাব্যসিন্ধু' নামক একখানি ক্ষুদ্র-কলেবর কবিতা গ্রন্থে "কবিবর মাইকেলের কবর দর্শনে" শীর্ষক অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত একটি কবিতা পাঠ করিয়াছিল; কবিতাটির প্রথমাংশ এইরূপ ছিল—

কবিবর মাইকেলের কবর দর্শনে
"দাঁড়াও ক্ষণেক তরে, হেরি একবার,
মিলি আঁখি দুটি ওই কবরের পানে!
কোন্ মহাজন হেথা বিরামের তরে
লভিছেন চিরনিদ্রা অনন্ত শয়নে
এই নিরজনে। দেখি, কি কথা বলিছে
খোদিত প্রস্তর ওই? ডাকি পান্থগণে
'দাঁড়াও'—সকলে বলি; ইত্যাদি

উপরিউক্ত কবিতাটি পাঠ করিয়াই তাহার হৃদয়ে কবির সমাধি-দর্শনের স্পৃহা বলবতী হয়। কিন্তু কোন্ সমাধিক্ষেত্রে মাইকেলের অস্থি-কঙ্কাল নিহিত আছে, কবিতায় তাহার কোন উল্লেখ ছিল না। কবিতাটি যে লেখকের কল্পনামাত্র, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। কলিকাতার কয়েকটি খৃষ্টায় সমাধিক্ষেত্রে অনুসন্ধানেব পর, সেই যুবক লোয়ার সার্কুলার রোডের বিশাল-বিস্তৃত সমাধি-ভূমিতে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে মাইকেলের সমাধি খুঁজিতে লাগিল! কত শত সুন্দর-সুন্দর সমাধি-স্তম্ভে উৎকীর্ণ প্রস্তরফলক চিরবিস্মৃতির নিবিড় অন্ধকার হইতে কতশত অজ্ঞাতনামা চিরবিস্মৃত নরনাবীর মুহূর্ত্তস্থায়ী ক্ষীণ পরিচয় প্রদান কবিতে লাগিল; কিন্তু হায! মধ্যাহ্ন-সূর্য্যেব ন্যায় স্মৃতি-রশ্মি-সমুজ্জ্বল কবি মধুসূদনেব পবিচয় কোন জীর্ণ ভগ্ন বার্দ্ধক্য কম্পিত, পতনোন্মুখ সমাধিও প্রদান করিল না। যুবক নিরাশ হৃদয়ে সমাধিক্ষেত্রের দ্বারে ফিবিযা আসিয়া একটি পারসী কোট ও পেণ্টালুন পরিহিত খর্ব্বাকৃতি ভদ্রলোককে* দেখিয়া সংশয়াকুল-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়! মাইকেলের সমাধি কোথায়? আপনি জানেন কি?' যুবকের এই কথায ভদ্রলোকটি ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে বিস্মিতনেত্রে তাকাইয়া বলিলেন, 'মাইকেল এই সমাধিক্ষেত্রেই সমাধিস্থ আছেন'—তাঁহার কথা শেষ না হইতেই চঞ্চল যুবক বাধা দিয়া বলিল, 'কোনখানে মহাশয়? আমাকে অনুগ্রহ কবিয়া দেখাইয়া দিন।' ভদ্রলোকটি

* ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সাহা, ইনি সমাধিক্ষেত্রের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। এক্ষণে অবসর প্রাপ্ত হইয়া বিশ্রাম ভোগ করিতেছেন।

ঈষৎ হাস্য করিয়া একটু ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন, 'কি দেখিবে? তাঁহার সমাধির উপর ত কোন চিহ্নই নাই? বহুদিন পূর্ব্বে তথায় একটি মৃত্তিকা-স্তূপের উপর একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্রুশ ছিল— এক্ষণে তাহাও নাই; কালের গতিতে স্তূপ ও ক্রুশ অন্তর্হিত হইয়া সেইস্থান সমভূমি হইয়া রহিয়াছে! তুমি দেখিবে কি?' তাঁহার উত্তরে যুবকটি ক্ষুণ্ণমনে বলিল, 'মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেই স্থানটিই আমাকে দেখাইয়া দিন, তাহা হইলেই আমার এ স্থানে আগমন সার্থক হইবে।' যুবকের নিতান্ত আগ্রহ দেখিয়া ভদ্রলোকটি তখন একজন কর্ম্মচারীকে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের Burial Register নামাইতে বলিলেন। পুরাতন র‍্যাকের উচ্চ স্তর হইতে ধূলিমাখা প্রকাণ্ড Register বহি নামান হইলে, তিনি গোরস্থানের চাপরাশীকে ধূলা ঝাড়িতে বলিলেন। ধূলা ঝাড়া হইলে, তিনি পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মাইকেল সমাধিক্ষেত্রের কোন্ স্থানে সমাহিত আছেন, তাহা বাহির করিলেন। রেজিষ্টারী বহিতে সমাধির স্থান-নির্দ্দেশ এইরূপে লিখিত আছে,—

"*30 June, 1873* Michael Madhoosoodun Datta, aged 40 years, Barrister at Law, buried by Thomas & Co. in a cutcha grave 30 feet south of Mrs. L. J. McCarthy's Headstone, 5th range of graves, 6th walk, south from the 1st Gate, South East Quarters C.R.B.G."

মাইকেলের পত্নীর সমাধির স্থান-নির্দ্দেশ উক্ত রেজিষ্টারী বহিতে এইরূপ আছে—

"*26th June 1873* Emelia Henrietta Sophia Datta, aged 27 years. Wife of Michael, buried by J. Lewis & Co. in a cutcha grave 23 feet south of Mrs. L. J. McCarthy's Headstone, 5th range of graves, 6th walk, south from the 1st Gate, South East Quarters. C.R.B.G."

যুবকটি উহা পাঠ করিয়া বুঝিলেন যে, কবি ও তাঁহার পত্নীর বয়ঃক্রম লিখিতে অত্যন্ত ভুল হইয়াছে। আরও বুঝিলেন যে, তাঁহারা উভয়ে পাশাপাশি সমাহিত আছেন।

তত্ত্বাবধারক মহাশয়, রেজিষ্টার হইতে উক্ত লেখা একটু কাগজে লিখিয়া লইয়া, মাপের ফিতা লইয়া, উক্ত যুবক এবং চাপরাসীর সঙ্গে মাইকেলের সমাধিভূমির নিকট গমন করিয়া, রীতিমত মাপ-জোপ করিয়া একটি অনাবৃতভূমিখণ্ড দেখাইয়া বলিলেন, 'দেখ, এইস্থানেই মাইকেল মধুসূদন ও তৎপার্শ্বে তাঁহার পত্নী সমাহিত রহিয়াছেন। যিনি তাঁহার স্বদেশকে, তাঁহার জাতিকে সমগ্র জগতের সম্মুখে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সমাধির এই দশা!' তত্ত্বাবধারক মহাশয় একজন বিশিষ্ট কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি; তিনি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ডিরোজিও সাহেবের কবিতাবলী সম্পাদিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি বঙ্গদেশবাসীর কৃতঘ্নতা ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি বলিলেন, 'ইংলণ্ড হইলে যাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ গগন স্পর্শ করিত, তাঁহার সমাধির উপর একখণ্ড ইষ্টকও নাই, এ পরিচয় কি কোন শিক্ষিত জাতি অপর কোন সুসভ্য জাতির সম্মুখে প্রদান করিতে পারে?' তাঁহার কথায় যুবকটি মরমে মরিয়া গেল, লজ্জায় কোন উত্তর করিতে পারিল না। তত্ত্বাবধারক মহাশয় আবার বলিতে লাগিলেন, 'গত চতুর্দ্দশ

বৎসর ধরিয়া মাইকেলের সমাধি অনাবৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, আর তাঁহার স্বদেশবাসীরা নির্ব্বিকার মনে বসিয়া আছেন, ইহা যে কতদূর দুঃখের বিষয় বলিতে পারি না।' যুবকটি তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু বিধাতার বিধানে সেই বৎসরেই এক অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইল।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার একেশ্বরবাদী পাদ্রী ডল সাহেবের (Rev. C. H. A. Dall) মৃত্যু হইলে তাঁহার সমাধি উপলক্ষে উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভদ্র ব্যক্তিগণ সমাধিক্ষেত্রে সমবেত হন। সেই সময়ে তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে অবগত হইলেন যে, মাইকেলের সমাধি স্থানের উপর কোন স্মৃতি-চিহ্ন নাই; তদুপরি কোন স্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হওয়া একান্ত আবশ্যক । তদনুসারে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দেই স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখ কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত সমাধি নির্ম্মাণ ফণ্ড' নামে একটি কমিটি গঠন করিয়া স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেনকে সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী, ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব, মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ধনকুবের রাজা-মহারাজা এবং পল্লীনিবাসী সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত মধুসূদনের সমাধি নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়া কবির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেন। এই সময়ে মনস্বী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়, নরেন্দ্র বাবুকে যে পত্র লেখেন, তাহা নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

"Camp Jamalpore,
Mymensingh, 15th December, 1887.
My dear Narendra Babu,

I hasten to send my humble contribution towards the erection of a tombstone or monument over the grave of the greatest man that Bengal has produced within this century. I am sure all Bengali gentlemen, who appreciate our national literature, still young, will respond to your call and that you will quickly realize much larger amount than what you have asked for. A suitable mounment can thus be raised to the memory of Madhu Sudan Datta, and future generations of our countrymen will visit the tomb as European tourists visit Stratford on Avon or Dryburgh Abbey.

Yours Sincerely
(sd.) R. C. Dutta
To Babu Narendra Nath Sen"

এই স্থানে সমাধিস্তম্ভ-নির্ম্মাণ-কমিটি সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক। মধ্যবঙ্গ সম্মিলনীর (Central Bengal Union) সভ্যগণ প্রথমে কমিটি গঠন করিয়া স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে তাঁহাদের অবৈতনিক সম্পাদক এবং ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু মধুসূদন যশোহরের অধিবাসী বলিয়া যশোহর-খুলনা-সম্মিলনী তাঁহাদের

সহিত একযোগে কার্য্য করিবার জন্য স্বীকৃত হইলে, পূর্ব্বোক্ত সম্মিলনী পরমাহ্লাদে তাঁহাদের সহিত একত্রীভূত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। দেশের আপামর-সাধারণ এ কার্য্যে সোৎসাহে অর্থ প্রদান করিয়া তাঁহাদের সঙ্কল্প-সিদ্ধির উপায় করিয়া দিলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় অল্পকাল মধ্যেই আশাতিরিক্ত অর্থ সংগৃহীত হইল। ইতিমধ্যে তাঁহারা পরামর্শ করিয়া মধুসূদনের দেহাবশেষ গবর্ণমেন্ট সমাধিক্ষেত্র হইতে উত্তোলিত করিয়া নগরীর মধ্যভাগে হেদুয়া কিম্বা গোলদীঘির সরোবর-কূলে প্রোথিত করিয়া তদুপরি সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণের প্রস্তাব করেন। সে জন্য তাঁহারা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের নিকট আবেদনও করিয়াছিলেন। কিন্তু কি জন্য তাঁহারা সে সঙ্কল্প ত্যাগ করেন, তাহা বলিতে পারি না। টাউনসভার কার্য্যবিবরণী নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"*Proceedings of the 38th Meeting of the town Council held at the Municipal Office, on Saturday, the 24th March, 1888, at 3p.m.*

Proposed Removal of Human Remains. The application from the Secretary, 'Central Bengal Union," for permission to remove the remains of the late Michael Madhu Sudan Datta from the Government Cemetery in Lower Circular Road and to inter them in either of the two Squares—"College" or "Cornwallis," was not further considered as no further proposal had been received from the applicants."

অচিরেই উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইলে, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর ও স্তম্ভনির্ম্মাণকারী Messrs LLewelyn and Co. কবির সমাধিস্থলে সুন্দর মর্ম্মর নির্ম্মিত সমাধিস্তম্ভ সংস্থাপিত করিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাসমারোহে সাধারণের সম্মুখে স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করিলেন। বঙ্গদেশের সেই একটি স্মরণীয় দিন। সেই দিনের উৎসব-বৃত্তান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া আমরা মধুময় মধু-স্মৃতি সমাপ্ত করিলাম।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর, শনিবার, অপরাহ্ন বেলা সাড়ে তিনটার সময় বঙ্গের বহু শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সাধারণ জনমণ্ডলী, বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রের দ্বারদেশে মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা দর্শনের নিমিত্ত সমবেত হন।

সমাধিক্ষেত্রের প্রবেশদ্বার হইতে ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সেই বিপুল জনসঙ্ঘ ধীরে-ধীরে সমাধি-অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; ক্রমে সমাধির নিকট উপস্থিত হইলে জনমণ্ডলী সমাধিস্তম্ভের চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সমাধির সম্মুখে কয়েকটি সম্ভ্রান্ত মহিলা, বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, মনোমোহন ঘোষ, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, চন্দ্রনাথ বসু, প্রমুখ বিশিষ্ট

ব্যক্তিবর্গ সমাধির নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন। মধুসূদনের গৃহে-শ্মশানে চিরবন্ধু বৃদ্ধ গৌরদাস বসাক মহাশয় সমাধির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নতশিরে নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। মধুসূদনের পুত্র আলবার্ট দত্ত নতমস্তকে অধোবদনে লোকান্তরিতপিতৃদেবের সমাধিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রথমে একটি ধর্ম্মসঙ্গীত গীত হইলে, নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় কমিটির কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিলেন। তৎপরে তিনি ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষকে কবির স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা ও সভার কার্য্য আরম্ভ করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ ইংরাজীতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন; আমরা আমাদের পাঠক পাঠিকার অবগতির নিমিত্ত তাহার বঙ্গানুবাদ করিলাম।

মনোমোহন ঘোষ বলিলেন—"বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন এবং মধুসূদন দত্ত স্মৃতিসভার সভামহোদয়গণ! আমি আপনাদের নিমন্ত্রণে অদ্যকার সভার কার্য্যের গুরুভার অতি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতেছি। সেই সঙ্গে ইহাও বলিতে চাহি যে, যে বিশ্ববিখ্যাত কবি ও পণ্ডিতবরের স্মৃতিপূজার জন্য আমরা অদ্য সমবেত হইয়াছি, সে কার্য্যের ভার আমার উপর অর্পিত না হইয়া কোন যোগ্যতম সাহিত্যিকের হস্তে ন্যস্ত হইলে আমার অপেক্ষা এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। যে কারণে এই উৎসব আমার দ্বারা নির্ব্বাহ করিতে আপনারা প্রণোদিত হইয়াছেন—তাহা এই যে, স্বর্গীয় দত্ত মহোদয়ের শেষজীবনে আমি তাঁহার একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলাম। আমি স্বীকার করিতেছি যে, যদি এই কারণেই আপনারা আমার উপর এই গুরুভার অর্পণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনাদের মনোনয়ন উপযুক্তই হইয়াছে; কারণ ইহা আমার পক্ষে অতি সৌভাগ্য ও সুযোগের কথা বলিতে হইবে যে, আমি দত্তজ মহোদয়ের সহিত তাঁহার জীবনের শেষ এগার বৎসর য়ুরোপে এবং ভারতবর্ষে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলাম। যখন আমার পরলোকগত বন্ধুর পার্থিব-অবশেষ এই স্থানে নিহিত হয়, তখন কোন অনিবার্য্য ও অপ্রত্যাশিত বিঘ্নে এখানে উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহাকে যে অর্ঘ্য, যে সম্মান, যে বন্ধুত্বের প্রীতি-নিদর্শন প্রদানে বঞ্চিত হইয়াছিলাম. অদ্য সেই সুযোগ পুনরাগত হওয়ায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। তাঁহার মৃত্যুর চারিদিন পূর্ব্বে যখন আমি ঠিক এই স্থানে দাঁড়াইয়া, তাঁহার জীবনের বহুবৎসরের সঙ্গিনী, সুখ-দুঃখ-ভাগিনী মহিয়সী রমণীর মৃত্যুর জন্য শোকাশ্রুবর্ষণ করিতেছিলাম, তখন আমি কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই যে, সেই সমাধি বিবর সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কবিবর তাঁহার পত্নীর পার্শ্বশায়ী হইবেন। ভদ্র-মহোদয়গণ, অদ্য আমরা পঞ্চদশ বৎসর পরে, প্রকাশ্য সভায় বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভাকে যে পূজার্ঘ্য প্রদানেব নিমিত্ত সমবেত হইয়াছি, তাহা বহুকাল পূর্ব্বেই তাঁহাকে প্রদান করা কর্ত্তব্য ছিল। চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী দেশের ইতিহাস-বিশ্রুত ভরসেলস্ নগরীতে দত্তজ মহাশয় যখন কবিগুরু-দান্তের সম্বন্ধে তাঁহার সুপরিচিত চতুর্দ্দশপদী কবিতা বচনায ব্যাপৃত ছিলেন, (যাহা সম্ভবতঃ আপনারা সকলেই পাঠ করিয়াছেন) তখন তাঁহার সহিত আমার যে কথোপকথন হয়, তাহা অদ্যকার এই স্মৃতি-উৎসবে আমার সুস্পষ্টরূপে স্মরণ ও প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। চতুর্দ্দশপদী কবিতাটি জগৎ-প্রসিদ্ধ ইতালীয় কবির (দান্তেব) ত্রিশত-

বাৎসরিক সম্মান-উৎসব উপলক্ষে রচিত হইতেছিল। সেই সময় দত্তজ মহোদয় আমার নিকট যে দুইটি মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা এই স্থলে পুনরুল্লেখ করিব। প্রথমতঃ তিনি বলেন যে, সকল দেশেই কবিগণ তাঁহাদের মৃত্যুর পর বহুবৎসর অনাদৃত হইয়া থাকেন; আর দ্বিতীয়তঃ তিনি যখন উপরিউক্ত কবিতাটি ফরাসী ভাষায় অনূদিত করিতেছিলেন, তখন বলেন যে, যে কেহ বিদেশীয় ভাষায় যতই উৎকৃষ্ট অধিকার লাভ করুক না কেন, নিজের মাতৃভাষা ভিন্ন অন্যভাষায় যেন কবিতা রচনার চেষ্টা না করে। তাঁহার মন্তব্য স্মরণে আমার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে যে, যিনি আপনার মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধি-শালিনী করিতে এতদূর করিয়া গিয়াছেন, এবং যে ভূমিতে তাঁহার দেহাবশেষ নিহিত রহিয়াছে, সেই চিরপুণ্য ভূমির কোন উদ্দেশ না লইয়া আমরা পঞ্চদশ বৎসর কালস্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছি। এতদ্ভিন্ন আমি বিবেচনা করি, এ কথা বলিলে অসঙ্গত ও অন্যায় হইবে যে, মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবি-প্রতিভা তাঁহার সমকালবর্ত্তী সমাজ ও বংশাবলীর দ্বারা সমাদৃত হয় নাই।

তাঁহার দ্বিতীয় মন্তব্যের যাথার্থ্য তাঁহার নিজের সম্বন্ধে চিত্রবৎ প্রকটিত ও যথাযথ প্রযুজ্য হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় বহুভাষাবিদ্ সুপণ্ডিত তাঁহার সমকালবর্তী বিদ্বজ্জনের মধ্যে ত কেহ ছিলেনই না; এমন কি বর্ত্তমানকালে তাঁহার স্বদেশীয়গণের মধ্যে এমন ব্যক্তি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যিনি প্রাচীন ও নব্য য়ুরোপীয় সাহিত্যের সুগভীর জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন। ইহার সত্ত্বেও তিনি নিজ জীবনে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, যদি তিনি তাঁহার মাতৃভাষায় কবিতা রচনা না করিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই অত বড় কবি হইতে পারিতেন না।

দত্তজ মহোদয় যে সকল কাব্যগ্রন্থের দ্বারা চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তৎসমূহের গুণকীর্ত্তন এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। আমি অতি সংক্ষেপে আমার অন্যান্য মন্তব্য ব্যক্ত করিব। আমরা এই কমিটিকে সমাধি নির্ম্মাণের আয়াসের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ করিতেছি। তাঁহার এই আয়াস-স্বীকার না করিলে যে স্থান পরিবেষ্টিত করিয়া অদ্য আমরা একত্র হইয়াছি, অতি অল্পদিনেই তাহার সমস্ত চিহ্ন তিরোহিত হইত। আপনারা সকলেই জানেন, যে সমাধিস্তম্ভের প্রতিষ্ঠা আমি এখনই করিব, তাহা সাধারণের অর্থসাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সমাধিস্তম্ভের আড়ম্বরশূন্য সরল গঠন দেখিয়া অনেকে মনে করিবেন যে, বঙ্গদেশবাসী বাঙ্গালা-সাহিত্যে মধুসূদনের কার্য্য, যেরূপ উচ্চ প্রশংসার সহিত করিয়া থাকেন, সেই উচ্চ-প্রশংসার উপযোগী সমাধিস্তম্ভ রচিত হয় নাই। ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, এই আড়ম্বর-বিরহিত স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে, কত বিয়োগ-বিধুর পতি, কত শোক-কাতর জনক-জনকী, তাঁহাদের লোকান্তরিত প্রিয়জনের নিমিত্ত কত দৃষ্টিরম্য সুন্দর সমাধি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা অবশ্য মনে রাখিবেন যে, পরলোকগত কবির স্মৃতি চিরস্মরণীয় করা অপেক্ষা, এই স্থানটিকে কোন চিহ্নদ্বারা নির্দ্দেশ করাই কমিটির মুখ্য উদ্দেশ্য। মাইকেল মধুসূদন নিজেই যে স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভক্ত স্বদেশবাসী তাহাদের ঐশ্বর্য্যরাশি ও শিল্পনৈপুণ্যের দ্বারা আহরণ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তাঁহার গ্রন্থাবলী ভবিষ্যদ্‌বংশীয়েরা বিস্ময়ের সহিত পাঠ করিবে, এবং যত দিন

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব থাকিবে, তত দিন কখনও "শ্রীমধুসূদন" নাম বিলুপ্ত হইবে না।

আমি যখন এই স্মৃতিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করিব, তখন আপনারা দেখিবেন যে, ইহার একপার্শ্বে কবির মৃত্যুর বহুবর্ষ পূর্ব্বে, অননুকরণীয় অমিত্রছন্দে তাঁহার স্বরচিত করুণ সমাধিলিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। অতুল্য সারল্য-ময় সমাধিলিপি এবং সমাধিস্তম্ভের নিরলঙ্কৃত কমনীয় গঠন সত্ত্বেও, আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, আপনারা সকলেই একবাক্যে আমার কথার অনুমোদন করিবেন যে, দত্তজ মহোদয়ের নিজের প্রিয়কবি মিল্টন, অপর এক বিশ্ববিখ্যাত মহাকবির কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার (মাইকেল মধুসূদনের) নিজের প্রতিও অতি বিচিত্র রূপে আরোপিত ও প্রযুজ্য হইয়াছে :—

"And so sepulchured in such pomp do it lie.
That kings for such a tomb would wish to die."

এইবার সমাধিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করিলেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়; কিন্তু তৎপূর্ব্বে অদ্যকার কার্য্যাবলির বিধিবদ্ধ নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম করিবার অধিকার গ্রহণ করিয়া আমি এমন একটি প্রস্তাব করিব, যাহা নিশ্চয়ই আপনারা সকলে স্বাভাবিক সহৃদয়তাবশে অকুণ্ঠিত চিত্তে অনুমোদন করিবেন। আমি মনে করি যে, আমাদের জাতীয় ধর্ম্মবুদ্ধি ও প্রচলিত রীত্যনুসারে, এই শুভ্র স্মৃতিস্তম্ভোপরি আমার মাল্যদাম প্রদানের পূর্ব্বে, যে তরুণ যুবক আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, প্রথম পূজোপহার তাঁহারই প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি অত্যধিক-শৈশবতা-নিবন্ধন পরলোকগত পিতামাতার মৃত্যুকালে তাঁহাদের প্রতি স্নেহ ও সম্মানের অর্ঘ্য প্রদানে বঞ্চিত ছিলেন, এবং যে স্নেহবান পিতামাতাকে তিনি অতি শৈশবেই হারাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের সমাধির উপর ভক্তি ও স্নেহের অর্ঘ্য প্রদানের জন্য তিনি অধীর হইয়াছেন।

এই বলিয়া ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়, সমাধিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করিলেন। মধুসূদনের একমাত্র পুত্র আলবার্ট দত্ত অগ্রসর হইয়া স্বর্গীয় পিতার সমাধির উপরে পুষ্পস্তবক প্রদান করিলেন, তৎপরে মনোমোহন ঘোষ মহাশয়, সমাধিস্তম্ভ পুষ্পদামে বিমণ্ডিত ও সুশোভিত করিয়া বলিলেন, "In the name and on behalf of the people of Bengal I place this wreath round the tomb of Michael Madhu Sudan Datta."

তৎপরে রেভারেণ্ড ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন,—"শ্রীমধুসূদনের বন্ধু ও স্বদেশবাসীগণ! আমি আপনাদিগকে বঙ্গভাষায় দু'একটী কথা বলিতে চাই; কারণ যাঁহার স্মৃতিচর্চ্চার জন্য আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি, যাঁহার উৎকৃষ্ট কাব্যের গুণেই আমরা এখানে আকৃষ্ট হইয়াছি তিনি বাঙ্গালী ছিলেন এবং তাঁহার কাব্যসমূহ বাঙ্গালা ভাষাতেই লিখিত হইয়াছিল। যখন কোন দেশে বিপুল পরিবর্ত্তনের যুগ উপস্থিত হয়, তখন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাও নিজেদের যোগ্যতা সম্যক পরিস্ফুট করিতে পারেন না। যখন পূর্ব্বতন মত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এবং নূতন মত সেই স্থান অধিকার করিতে পারিতেছে না, যখন দেশেব সনাতন ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল শিথিল হইয়া গিয়াছে অথবা যাইতেছে, যখন সভ্যতা এবং আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি

নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইতেছে, সে সময়ে, এমন কি, প্রবল মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তিরাও তাঁহাদের বক্তব্য জনসাধারণের কর্ণগোচর করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন। এই প্রকার বিশৃঙ্খলা ও অসামঞ্জস্যের সময় যিনি জাতীয় সাহিত্যের নেতৃস্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তিনি সত্যসত্যই একজন মহাপুরুষ। শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত এই মহাপুরুষ ছিলেন। শ্রীমধুসূদন তাঁহার স্বজাতীয় মহান ব্যক্তিগণের ন্যায় বিশেষ প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন। অনাদৃত বাঙ্গালীজাতির মহান্ আদর্শ আছে, অন্যজাতির ভাব ও চিন্তা অধিগত করিবার বিপুল ক্ষমতা আছে, এবং তাঁহারা যাহা অনুভব করেন, সে কথা, সে চিন্তা, সে কল্পনা আশ্চর্য্যভাবে প্রকাশ করিবার অতুল ক্ষমতার তাঁহারা অধিকারী। এই সমস্ত শক্তি শ্রীমধুসূদনে অলৌকিক রূপে ও বিপুল পরিমাণে পুঞ্জীকৃত ছিল। এই অতুল শক্তি, এই অদম্য মনীষা শ্রীমাইকেলের স্বজাতীয় আমাদের মধ্যে কেন এমন সুপ্ত ভাবে থাকে? আমাদের পল্লী হ্যামডেনেরা কেন আত্মপ্রকাশ করেন না? কেন আমাদের মৌন মিল্টনগণ মৌনভঙ্গ করেন না? যে অসাধারণ মনস্বীর সমাধিস্তম্ভ পবিত্রীকৃত করিবার জন্য আমরা এখানে সম্মিলিত হইয়াছি, তাঁহার মধ্যে এমন কি শক্তি নিহিত ছিল, যাহাতে তাঁহাকে এমন শীর্ষস্থানে অধিরূঢ় করিয়াছিল? শ্রীমধুসূদনের মধ্যে শক্তি ও সামর্থ্যের সহিত অপূর্ব্ব শিক্ষা ও সাধনার সমবায় হইয়াছিল। তিনি মানসিক ধী-শক্তিতে যেমন তাঁহার স্বদেশবাসী মহাপুরুষগণের প্রতিনিধিরূপ ছিলেন, তেমনি তিনি শিক্ষায়, দীক্ষায় তাঁহার স্বদেশীয়গণকে অতিক্রম করিয়া, অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা ও ইংরাজী এই দুই ভাষাই তাঁহার মাতৃভাষা হইয়া পড়িয়াছিল। এবং তিনি হিন্দু ও য়ুরোপীয় দেবভাষায় (Classics) অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং সেই সুগভীর পাণ্ডিত্যের সহিত তিনি ফরাসী, জর্ম্মণ, এবং ইতালীয় নব্যভাষা সমূহের অতুল্য জ্ঞানসমষ্টির সংযোগ করিয়াছিলেন। যিনি এত ক্ষেত্র হইতে শস্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয় যে উন্নত হইবে ইহা ত স্বাভাবিক; কিন্তু তিনি নিজের মানসিক ঔৎকর্ষ্যেই পরিতৃপ্ত না হইয়া তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য, অপূর্ব্ব প্রতিভা, ও অদম্য স্বদেশানুরাগের ফল তাঁহার গুণমুগ্ধ দেশবাসীর মনকে উন্নত করিতে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এখানে, এই সমাধিস্তম্ভের চতুষ্পার্শে যে সকল যুবককে আমি উপস্থিত দেখিতেছি, তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া আমি বলিতেছি যে, তাঁহারা 'মেঘনাদ' ও 'তিলোত্তমা'র কবির বিরাট সাহিত্য সাধনার অনুকরণ করুন, এবং অসাম্প্রদায়িক ভাবে পৃথিবীর ভিন্ন-ভিন্ন-মধুচক্র হইতে মধু সংগ্রহ করুন। ইহাই একমাত্র কথা নহে। আমাদের মহাকবি অতুল্য মাধুর্য্যের অধিকারী ছিলেন এবং অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে তাঁহার কবিতারাজ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-ভাবের কি সুন্দর সামঞ্জস্য-বিধান করিয়াছিলেন! ভারতের ভবিষ্যৎ সাহিত্য সম্পূর্ণ সংস্কৃতমূলক হইবে না, এবং তাহা সম্পূর্ণ প্রতীচ্যও হইবে না। ভারতের ভাবরাজ্যে, ভারতের বিধিব্যবস্থায়, ভারতের ভাষায় ভবিষ্যতে য়ুরোপের আদর্শ, য়ুরোপের সভ্যতা, য়ুরোপের তেজ ও য়ুরোপের সামর্থ্য অনুপ্রবিষ্ট হইবেই; এই বিশাল সাহিত্য-সৌধের অপূর্ব্ব-নৈপুণ্য ও কৃতিত্বের প্রথম শিলাবিন্যাস করিয়াছেন শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত;—তাঁহার অপূর্ব্ব মহাকাব্যই সেই প্রথম শিলা। আমি জানি, তাঁহার দেশের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাকবিগণের ন্যায় তাঁহারও ত্রুটি

ছিল, তাঁহারও চপলতা ছিল। কিন্তু তিনি এখন যে দেবলোকে বিবাজ করিতেছেন, সেই কবিদিগের বৈকুণ্ঠে মহাকবিগণের সিংহাসনের মধ্যে—যেখানে কবিকুলরাজ হোমার, দান্তে, মিল্টন এবং আমাদেরই কালিদাস ও ভবভূতি সগৌরবে আসীন রহিয়াছেন,—সেখানে আমাদের গৌরবরবি প্রিয়তম কবি শ্রীমধুসূদনও উন্নত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। সেইখানেই তিনি বিরামলাভ করুন। আর যাঁহার মাতৃভাষায় আমরা কথোপকথন করি, যাঁহার প্রতিভা আমরা সগৌরবে মহিমা-মণ্ডিত করি, যেখানে তাঁহার পার্থিব অবশেষ আমরা মৃত্তিকা-প্রোথিত করিয়া সগৌরবে রক্ষা করিয়াছি, তাহাবই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহারই স্বদেশবাসী, স্বভাষা-ভাষী আমরা সেই পুণ্যভূমি পবিত্রীকৃত করিয়া একমাত্র সান্ত্বনা অনুভব করি। শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম বঙ্গে—কেবল বঙ্গে নহে, সমগ্র ভারতে অমর হইয়া থাকুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।"

প্রতাপ বাবুর বক্তৃতার পর আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"মাইকেল মধুসূদনের ন্যায় মহৎ ব্যক্তি সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, তাহার পর আমার কিছু বলার বিশেষ প্রয়োজনই দেখিতেছি না। তাঁহার সমাধির পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইযা আমাদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, ধর্ম্ম-বিষয়ে যাহার সহিত মতভেদ থাকুক না কেন, আমরা যেন যুগাবতারদিগের প্রতিভার পূজা করিতে বিরত না হই—ইহাই মাইকেলের ন্যায় প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি আমাদের হৃদয়ে জাগরুক করিয়া দিয়াছেন। মাইকেল মধুসূদন বাঙ্গলা-সাহিত্যকে যে অমূল্য রত্ন দান করিয়া গিয়াছেন, তাহাই চিরকাল তাঁহার স্মৃতিকে অমর করিয়া রাখিবে। কিন্তু আমাদের জাতির ন্যায়পরতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার প্রতিভা যে আমাদিগকে এখানে সমবেত হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছে, তাহা তাঁহার কবি-কীর্ত্তি হইতে অধিক না হইলেও তুল্য-মূল্য বলিয়া আমি মনে করি।"

তৎপবে সমাধি-স্তম্ভেব এবং উপস্থিত জনমণ্ডলীর ছায়া-চিত্র গৃহীত হইলে, একটি স্তোত্র-গীতির পর সভার কার্য্য শেষ হইলে, উপস্থিত নরনারীগণ সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ কবির স্বরচিত সমাধি লিপি (Epitaph) পাঠ করিতে লাগিলেন। কবি নিবিড় তমসাচ্ছন্ন সমাধির অলক্ষ্যে থাকিয়া বাঙ্গালার পথিককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধি স্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।
যশোরে সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।"

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সমাধি-স্তম্ভের অপর পার্শ্বে (পশ্চিমমুখে) ইংরেজি ভাষায় নিম্নলিখিত সমাধি-লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে—

IN MEMORY OF
MICHAEL MADHUSUDAN DATTA
ONE OF THE GREATEST POETS
OR BENGAL
ESPECIALLY DISTINGUISHED
AS AN EPIC POET
AND AS THE FIRST BENGALI WRITER
OF BLANK VERSE
BORN AT SAGARDARI IN THE
DISTRICT OF JESSORE,
IN 1824 A.D.
DIED ON THE 29TH JUNE,
1873 A.D.
THIS TOMB IS ERECTED
IN THE YEAR 1888
BY HIS GRATEFUL AND ADMIRING
COUNTRYMEN
LLEWELYN & CO.

সমাধি-লিপি পাঠান্তে দর্শক-বৃন্দ সমাধিস্তম্ভের উপরে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সেই পুষ্পবৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে **একটি মনোমুগ্ধকর** পরম রমণীয় স্মৃতি-উৎসব সমাপ্ত হইল।

সেই বৎসর হইতেই প্রতি বৎসর ২৯শে জুন, কবির সমাধি-ক্ষেত্রে স্মৃতি-উৎসব হইয়া থাকে। দেশের ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় মনস্বীবর্গ কবি-শ্মশানে সম্মিলিত হইয়া মধুসূদনের স্মৃতি-পূজা করিয়া থাকেন। উদীয়মান যুবক কবিগণ মহাকবির উদ্দেশে কবিতার ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্ঘ্য দান করেন। যত দিন যাইতেছে, ততই বঙ্গবাসীরা মধুসূদনের গুণানুরক্ত হইতেছেন—এমন কি অনেকের ইচ্ছা যে, তাঁহার দেহাস্থি—সমাধিস্তম্ভ উত্তোলিত করিয়া আমাদের পল্লীমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। জনৈক দেশবিখ্যাত মনস্বী সম্পাদক তদুপলক্ষে সম্প্রতি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কয়েক পংক্তি আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম :—

"মধুসূদন সত্যই বাঙ্গালার মধুসূদন। মানে খৃষ্টান, কিন্তু তাঁহার কোন মহাকাব্যে, কোন খণ্ড কবিতায় বিদেশীয় বিজাতীয় ভাব, খৃষ্টান ধর্ম্মের ইঙ্গিত কণামাত্রও প্রকট হয় নাই। মেঘনাদ ও ব্রজাঙ্গনা পড়িলে মনে হয় না যে, উহা খৃষ্টান কবির লেখা। উপাদেয় ভাষা, ভাব, অলঙ্কার শব্দবিন্যাস সবই আমাদের দেশের ও সমাজের অলঙ্কারশাস্ত্রের সম্মত। মেঘনাদের দুই এক স্থানে ইউরোপীয় সাহিত্যের পরিচয় একটু-আধটু পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে কেবল ভাবের ছায়া মাত্র; ভাষা ও শব্দবিন্যাস সম্পূর্ণ বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালীর। সীতা ও সরমার উক্তি পড়িলে মনে হয় না যে উহা খৃষ্টান কবি লিখিয়াছেন। মনে হয় কোন ভক্ত ভাবুক হৃদয়ভরা ভক্তি ঢালিয়া সীতার মাতৃমূর্ত্তি আঁকিয়াছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, মাইকেলেরও দুর্ভাগ্য যে এমন কবি, এমন মহাপ্রাণ খৃষ্টান হইয়াছিলেন—দেশের নামাবলি ছাড়িয়া হ্যাটকোট

পরিয়াছিলেন। এমন দুর্ভাগ্য ত অনেকই সহিতেছি,—বিশ্বনাথের মন্দিরের পার্শ্বে মসজিদও রাখিয়াছি,—মাইকেলের খৃষ্টানীও সহিব না কেন? কেবল সহ্য নহে, সেই খৃষ্টান পদ্ধতি যথাসম্ভব অবলম্বন করিয়া তাঁহার আত্মার কল্যাণকামনা করিয়া সকল জাতিব ও সকল ধর্ম্মের অধীশ্বর জগদীশের উপাসনা করিব।

***

"বড় লজ্জার কথা, আজও মধুকে পর করিয়া ঘরের বাহিরে রাখিয়াছি। তাঁহার সমাধি আমাদের আয়তনের মধ্যে থাকিবে, নিত্য পুষ্পপত্র দিয়া তাঁহাকে সাজাইব, নিত্য আসিয়া তাঁহার সমাধির সম্মুখে নতজানু হইয়া কাঁদিব, প্রার্থনা করিব। মেঘনাদ ও ব্রজাঙ্গনার কবি ত আমার পর নহে।

***

"মধুসূদনের সমাধি তুলিয়া লইয়া আমাদের অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সে পক্ষে চেষ্টা রীতিমত করিতে হইবে।"

ইংলণ্ডের মহাকবি মিল্টন ইংলণ্ডের অন্যতম মহাকবি সেক্ষপীয়র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন,—আমরাও মাইকেল সম্বন্ধে সেই কথার পুনরুক্তি করিয়া "মধু-স্মৃতি'র উপসংহার করিলাম।

What needs our Madhusudan for his honoured bones,
The labour of an age in piled stones?
Or that his hallowed reliques should be hid
Under a star-y-pointing pyramid?
Dear son of Memory, great heir of Fame,
What need'st thou such weak witness of thy name?
Thou in our wonder and astonishment
Hast built thyself a livelong monument.

* * *

And so sepulchered in such pomp dost lie,
That kings, for such a tomb, would wish to die.

38, Upper Circular Road, Calcutta.

যখন মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টি বিষয় লইয়া খ্রীষ্টান-সমাজে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল, যখন মতভেদ-নিবন্ধন পাদরীগণ লর্ড বিশপ মহোদয়ের অনুমতি গ্রহণের জন্য যুক্তি ও পরামর্শ করিতেছিলেন,—তৎপূর্ব্বেই সেন্ট জেমস্ গির্জ্জার ধর্ম্মাচার্য্য (Chaplain) স্বাধীনচেতা, সৌম্যদর্শন, পণ্ডিত চূড়ামণি, মহামতি রেভারেণ্ড ডাক্তার পিটার জন জারবো (Rev. Dr. Peter John Jarbo M.A.,. Ph.D., D.D.) স্ব-ইচ্ছায় মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টি-নির্ব্বাহের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি কাহারও মতামত গ্রাহ্য করিলেন না। এমন কি, তিনি মধুসূদনেব পারলৌকিক ক্রিয়ার নিমিত্ত লর্ড বিশপের অনুমতির অপেক্ষাও রাখেন নাই। মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টি-সমস্যার সময়, মহামতি জারবো নির্ভীক চিত্তে মতবিরোধী পাদরীদিগকে

বলিয়াছিলেন "যখন তিনি খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজ (Baptised) হইয়া মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছিলেন, তখন কেন আমরা তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিব না? তাঁহার যে খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস ছিল না, এ কথা কে বলিতে পারেন?" ধন্য বিধাতার কৌশল! মধুসূদন যেমন চিরদিন দোর্দ্দণ্ড স্বাধীন প্রকৃতির মনুষ্য ছিলেন, তদুপযুক্ত উন্নতমনা, সৎসাহসী নির্ভীকহৃদয় ধর্ম্মাচার্য্য তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধা কবিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ক্রমে আষাঢ়ের মেঘচ্ছায়াসমন্বিত স্নিগ্ধ অপরাহ্ণে জন-সমূহ পরিবেষ্টিত শবাধারবাহী শকট (Hearse) সমাধিস্থানের দ্বারদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে, শবাধার শববাহকগণের স্কন্ধারূঢ় হইয়া সমাধিক্ষেত্রে চার্চ্চ অব্ ইংলণ্ড সম্প্রদায়ের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত ভূমিখণ্ডাভিমুখে চলিল;— অগ্রে-অগ্রে পুরেহিত-পরিচ্ছদভূষিত সৌম্যমূর্ত্তি ডাক্তার পি. জে. জারবো মহোদয় ধীরে-ধীরে চলিয়াছেন;—ছত্রধর তাঁহার মস্তকোপরি প্রকাণ্ড ছত্রধারণ করিয়া পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিয়াছে— শ্রেণীবদ্ধ শোককাতর জনমণ্ডলী নীরবে ধর্ম্মাচার্য্যের অনুগমন করিতেছেন। কবির শবাধার সমাধি-বিবরের উপরিভাগে সুরক্ষিত হইলে রেভারেণ্ড জারবো মহোদয় Anglican Church-এর ক্রিয়া পদ্ধতি ও বিধি অনুষ্ঠানানুযায়ী মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ডাক্তার জারবো এবং কবির আত্মীয়-স্বজন সকলে এক এক মুষ্টি মৃত্তিকা শবাধারের উপর নিক্ষেপ করিলে, শেষ ক্রিয়া সমাধার পর বন্ধুবর্গ ও উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী শবাধার পুষ্পে পুষ্পে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে শববাহকেরা উন্মুক্ত ধরিণীগর্ভে কবিদেহ-সমন্বিত শবাধার নামাইয়া দিল। তৎপরে মৃত্তিকারাশির দ্বারা সমাধি-বিবর পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ সোম সমীপেষু !

মহাশয় !

আমি স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের শেষক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা অবগত আছি, তাহা লিখিতেছি।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহোদয়ের মৃত্যু সময়ে আমি শ্রীরামপুর কলেজে অধ্যয়ন করিতাম। তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া দর্শনের নিমিত্ত, আমি ও আমার অপর দুইজন বন্ধু, শ্রীরামপুর হইতে কলিকাতায় আসি। কেবল শ্রীরামপুর হইতে নহে, হুগলী প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ব্যক্তি এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ তাঁহার অন্ত্যেষ্টি কার্য্যে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। প্রায় এক সহস্র লোক তাঁহার শবাধারের অনুগমন করিয়াছিলেন।

আমরা যখন লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম, তখন মাইকেলের সমাধিকার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তখনও প্রায় তিন চারিশত লোক গোরস্থানে উপস্থিত ছিলেন। আমি তৎকালে শুনিয়াছিলাম যে, তাঁহার অন্তিম কার্য্যাদি সম্বন্ধে কোনও কারণে খৃষ্টীয় পাদরী ও মিশনারীদিগের মধ্যে মতভেদ, বাদানুবাদ ও গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে সকল অন্তরায়ের নিষ্পত্তি হইয়া, নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

নিবেদক

(স্বাঃ) জে. বিশ্বাস

সৌজন্য ❑ ভারতবর্ষ : ১৩২৪

অপরাজেয় কথাশিল্পী: সাহিত্যচার্য্য শরৎচন্দ্রের, জীবন ও সাহিত্য

প্রবোধকুমার সান্যাল

বিগত ২রা মাঘ, ১৩৪৪, ইং ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৮ রবিবার সকাল ১০টার সময়, কলিকাতা ৪নং ভিক্টোরিয়া টেরেস পার্কসার্কাস নার্সিংহোমে সর্ব্বজন-প্রিয় গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর ৪ মাস হইয়াছিল। অত অল্পসময়ের মধ্যে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ কলিকাতার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। কয়েক মিনিটের ভিতরে কলিকাতা হইতে রেডিয়ো যন্ত্রের সাহায্যে ভারতের সর্ব্বত্র এবং সমগ্র পৃথিবীতে সেই সংবাদ প্রচার করা হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর দুই ঘণ্টার মধ্যে কলিকাতার কয়েকটি ইংরাজি ও বাঙ্গলা দৈনিক পত্রের 'বিশেষ শরৎ সংখ্যা' বাহির হয়। সেদিন কলিকাতা শহরের ভিতরে ও শহরতলীতে শরৎচন্দ্রের মৃত্যু বিশেষ চাঞ্চল্য আনিয়াছিল; দলে দলে নরনারী পথে ঘাটে সমবেত হইয়া স্বর্গতঃ সাহিত্যিকের উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে থাকেন। একজন ঔপন্যাসিকের মৃত্যুতে সমগ্র দেশের মর্ম্মস্থলে এতখানি গভীর বেদনাবোধ জাগিয়াছে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। অনেকেই বলিতে থাকেন, জগতের সাহিত্যের ইতিহাসে আর কোনও সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের মতো এত অল্প সময়ের মধ্যে এতখানি সম্মান ও যশের অধিকারী হন নাই।

কলিকাতার নাগরিকগণ শহরের নানা স্থানে সভা করিয়া বিপুল জনতার সম্মতিক্রমে পরলোকগত সাহিত্যিকের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

শরৎচন্দ্রেব মৃত্যুর সাত মিনিট পবে সেই সংবাদ টেলিফোন যোগে কলিকাতার নানাস্থানে ও সংবাদপত্রের দপ্তরে পাঠানো হয়। তাহার পরে— যাঁহারা শরৎচন্দ্রের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন— ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়, ক্যাপ্টেন ললিত ব্যানার্জ্জি, সুবোধ দত্ত, এস সি চ্যাটার্জ্জি, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (শরৎচন্দ্রের মাতুল), হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব ইত্যাদি— তাঁহারা শবদেহ মোটরযোগে শরৎচন্দ্রের বালীগঞ্জের বাড়ী ২৪নং অশ্বিনী দত্ত রোডে লইয়া আসেন। সম্মুখের দালানের উপর একখানি পালঙ্ক শয্যায় ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর মৃতদেহ রাখা হয়। দেখিতে দেখিতে কলিকাতার চারিদিক হইতে সকল শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মোটরযোগে ও পদব্রজে আসিয়া স্বর্গতঃ কথাশিল্পীর গৃহাঙ্গনে সমবেত হইতে থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, ডাঃ প্রভাবতী দাশগুপ্তা, মণীন্দ্রলাল বসু, তুষারকান্তি ঘোষ, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ক্যাপ্টেন এস, চাটার্জ্জি, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়, মুরলীধর বসু— প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ। কলিকাতা শাখা পি-ই-এন্ ক্লাবের পক্ষ হইতে শোকসূচক পুষ্পমাল্য পরলোকগত সাহিত্যিকের শবাধারের উপর রাখা হয়। সেই সময় অন্ত:পুরের মহিলাগণ, আত্মীয় ও আত্মীয়াগণ, বন্ধু, অনুরাগী— সকলেই অশ্রুবর্ষণ

করিতে থাকেন।

বেলা ৩-১৫ মিনিটের সময় অসংখ্য পুষ্পমাল্যে ও স্তবকে সুসজ্জিত শবাধার লইয়া মহাসমারোহে শোকযাত্রা বাহির হয়। অশ্বিনী দত্ত রোড, মনোহরপুকুর, লান্সডাউন রোড, এল্‌গিন্‌ রোড, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড হইয়া শোকযাত্রা কালীঘাট কেওড়াতলা শ্মশানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এলগিন রোডে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বাটি, স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাটী ও খালসা স্কুলের শিখ গুরুদ্বারের সম্মুখে শবাধার থামাইয়া মাল্যদান করা হয়। সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র বসুর সহিত অপরাজেয় কথাশিল্পীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই শোকাযাত্রা পরিচালনা করিবার ভার দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাতীয় পতাকা হস্তে লইয়া 'বন্দে মাতরম' ও শরৎচন্দ্রের জয়ধ্বনি করিতে করিতে সহস্র সহস্র নরনারীর এক বিশাল জনতা শবাধারের সম্মুখে ও পিছনে চলিয়া শ্মশানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বাঙ্গালার বহু বিশিষ্ট জননায়ক, রাজনীতিক, সাহিত্যিক, কলেজের ছাত্র ছাত্রী, সম্পাদক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, কলেজের ছাত্র ছাত্রী, সম্পাদক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, আইন-পরিষদের সভ্য, সমাজ সংস্কারক, বক্তা, দেশসেবক, উকীল, ব্যারিষ্টর, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র— ইহা ছাড়া বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের নরনারীগণ, উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন— সকল জাতের লোক, সকল শ্রেণীর মানুষ, অগণ্য জনসাধারণ তাহাদের একজন পরমাত্মীয় বিয়োগের ব্যথায় বিষণ্ণ মুখে শবাধারের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিলেন। বিভিন্ন কলেজের ছাত্রগণ শবাধার বহন করিয়াছিলেন।

শবাধারে মাল্যদান

শোকযাত্রার পথের দুইধারে বাড়ীর বারান্দা, জানালা, ছাদ, উঠান সর্ব্বত্র হইতে শরৎচন্দ্রের ভক্ত ও অনুরাগীগণের শ্রদ্ধাঞ্জলি বর্ষিত হইতে থাকে. পরলোকগত ঔপন্যাসিকের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতার বহু সাধারণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে শবাধারের উপর মাল্যদান করা হয়। তাহাদের মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজ, বিদ্যাসাগর, স্কটিশচার্চ্চ, সেন্ট জেভিয়ার্স, আশুতোষ, সিটি, রিপণ ও বঙ্গবাসী কলেজের নাম করা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ভাইস চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় শবাধারের উপর মাল্যদান কবেন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, যথা —সলিলা শক্তি মন্দির, শিমলা ব্যায়াম সমিতি, শিখ গুরুদ্বার, শ্রীহর্ষ, খেয়ালী সঙ্ঘ, কালীঘাট শক্তি মন্দির, বাসন্তী বিদ্যাবীথি, রবিবাসর, ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিট্যুশন্‌, সাউথ সুবারবন স্কুল, প্রেসিডেন্সী কলেজ ইউনিয়ন, যশোহর সাহিত্য সঙ্ঘ প্রভৃতির পক্ষ হইতেও মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য উপযুক্ত মাল্যদান করা হয়।

শ্মশানে

আদিগঙ্গার তীরে যেখানে ভারতবর্ষের কয়েকজন বরেণ্য মহাপুরুষের মৃতদেহ চিতাগ্নিশিখায় ভস্মীভূত হইয়াছে, যেখানে চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন, আশুতোষ, শাসমল, যতীন

দাস প্রভৃতির নশ্বর দেশ লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইখানে 'শ্রীকান্ত'র অমর রচয়িতা, চিরদুঃখদরদী, আধুনিক কথাসাহিত্যের নবজন্মদাতা, দরিদ্র-বান্ধব—শরৎচন্দ্রের রোগক্লিষ্ট কঙ্কালখানি চিতায় তুলিয়া দেওয়া হইল। শরৎচন্দ্রের সহোদর শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ শেষকৃত্য সম্পন্ন করিলেন। সেই চিতাশয্যার চতুর্দ্দিকে, মহীশূর উদ্যানে, পথে ঘাটে, আদিগঙ্গার ওপারে, নদীর তীরভূমিতে সেদিন যে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল, তাহা আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কোনও সাহিত্যিকের মৃত্যুতে ঘটে নাই। বহুদূর হইতে পুরবাসিনী মহিলাগণ আসিয়া শ্মশানের প্রায়ান্ধকার তটভূমিতে দাঁড়াইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। আধুনিক বাঙ্গলার নারী আন্দোলনের ভাবনায়ক ছিলেন 'নারীর মূল্যের' লেখক শরৎচন্দ্র!

শীতকালের মলিন সন্ধ্যা। ৫-৪৫ মিনিট সময়ে শরৎচন্দ্রের চিতায় অগ্নি-প্রদান করা হয়। প্রকাশচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মুখাগ্নি করেন। উমাপ্রসাদ শবদেহের বস্ত্র গ্রন্থিগুলি মোচন করিয়া দেন। দেখিতে দেখিতে চন্দনকাষ্ঠ সজ্জিত চিতা লেলিহান শিখায় জ্বলিয়া উঠে। যে শিখায় পুড়িয়াছিল 'দেবদাস', 'নিরুদিদি', 'জ্ঞানদার মা, দুর্গাসুন্দরী', সেই শিখায় আধুনিক বাঙ্গলার সমাজবিদ্রোহের মন্ত্রগুরু জ্বালিয়া জ্বালিয়া ভস্মরাশিতে পরিণত হইলেন।

বিশিষ্ট শ্মশানবন্ধুগণ

শোকযাত্রা ও শ্মশানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়চৌধুরী, অনারেবল সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, গুরুসদয় দত্ত, রায় বাহাদুর জলধর সেন, ডাঃ জে-এম-দাশগুপ্ত, নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যতীনন্দ্রমোহন বাগচী, কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, বরদাপ্রসন্ন পাইন, কালিদাস রায়, মিঃ ও মিসেস মুকুল দে, রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, মাখনলাল সেন, মিঃ কে আমেদ, হরেন ঘোষ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রনাথ রায়, গোপাললাল সান্যাল, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুধীর সরকার, গিরিজাকুমার বসু, জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রিয়রঞ্জন সেন, শচীন সেন, অবিনাশ ঘোষাল, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বিমলপ্রতিভা দেবী, জ্যোৎস্না সান্যাল, সতী দেবী, রামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্র নিয়োগী, ভবানী মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার সরকার, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক— প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

❑ সৌজন্যে ঃ ভারতবর্ষ ❑ ২৫ বর্ষ ❑ ২য় খন্ড ❑ ৩য় সংখ্যা ❑ ফাল্গুন-১৩৪৪ থেকে পুনর্মুদ্রিত। পুরানো বানান অবিকৃত।

জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

রাক্ষসী

সৈয়দ মুজতবা আলী

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'নওজোত পরবটা কি?' বললেন, 'এলেই দেখতে পাবেন। হিন্দুদের যেমন পৈতে হয়, পার্শীদের তেমনি 'নওজোত'। শুধু 'কস্তি' অর্থাৎ পৈতেটা বাঁধতে হয় কোমরে, আর সঙ্গে পরতে হয় একটি ছোট ফতুয়া—নাম 'সদরা', এই 'কস্তি' সদরা দু'য়ে মিলে হল পার্শীদের দ্বিজত্ব প্রাপ্তি।

ওযাডিয়ার বউ রৌশন বললেন, 'যত সব সিলি সুপারস্টিশনস্।''

রুস্তম বললেন, 'লঙ লিভ সচ্ স্যুপারসটিশন্স্! এদেরই দৌলতে দু'মুঠো খেয়ে নিই। শালা বোমানজীর পেটে বোমা মারলেও সে একপেট খাওয়ায় না। তার বাপ শালা (সবাই শালা!) বিয়ে করেছিলো বিলেতে, শ্যাম্পেনটা কেকটা ফাঁকি দেবার জন্য।'

পার্শীদের পাল্লায় পড়লে বুঝতেন। রববার বিকেলবেলা রুস্তম বউ, বেটাবাচ্চা নিয়ে গাড়ি করে আমার বাড়িতে উপস্থিত—পাছে আমি ফাঁকি দিই।

গাড়িতে বসে বললেন, 'পার্সীদের কি নাম দিয়েছে আর সব গুজরাতিরা জানেন? 'কাগড়া' অর্থাৎ ক্রো। তাব প্রথম কারণ, আমরা কালো কোট টুপি পরি, দ্বিতীয় কারণ পাঁচটা পার্সী একত্র হলেই কাকের মত কিচির-মিচির করি, তৃতীয় কারণ কাকের মত খাদ্যাখাদ্য বিচার করিনে—জানেন তো আর সব গুজরাতিরা শাক-খেকো, চতুর্থ কারণ আমাদের নাকটা কাকের মতো। বাঁকানো আর শেষ কারণ মরে গেলে কাকে আমাদের মাংস খায়' তার পর হো-হো করে খুব খানিকটা হেসে নিয়ে বললেন, 'গুজরাতিদের রসবোধ নেই, সবাই জানে, কিন্তু এ রসিকতাটা মোক্ষম।'

আমি বললুম, 'সব হিন্দুই একবার স্মোক্ করে, সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস থাক আর নাই থাক্ সেটা জানেন?'

বললেন, 'কি রকম?'

'তাদের তো পোড়ানো হয়, দেন্ দে স্মোক।'

রৌশন বললেন, 'তবু ভালো, শকুনির ছেঁড়াছেঁড়ির চেয়ে স্মোক্ করা ঢের ভালো।

আমি বললুম, 'কেন? চারটে শকুনি যদি এক পেট খেতে পায় তাতে আপত্তিটা আর

কি? এই আপনাদের বোমানজী যদি জ্যান্ত অবস্থায় কাউকে খাওয়াতে না চায় তবে না হয় মরে গিয়েই খাওয়াল।"

রৌশন বললেন, 'আপনি জানেন না তাই বলছেন। বোম্বায়ে টাওয়ার অব সায়লেন্সের আশ-পাশের কোনো বাড়িতে কখনো বাসা বাঁধলে জানতেন। একটু শকুনি হয়ত একটা মরা বাচ্চার মাথাটা নিয়ে উড়ে যাচ্ছে আপনার বাড়ির উপর দিয়ে, আরেক শকুনির সঙ্গে লাগলো তখন তার লড়াই। ছিটকে পড়ল মুণ্ডুটা আপনার পায়ের কাছে, কিংবা মাথার উপরে। ভেবে দেখুন তো অবস্থাটা। তিন বছরের বাচ্চার মুণ্ডু. গলাটা ছিঁড়েছে শকুনে—

আমি বললুম, 'থাক্ থাক্।' কিন্তু আশ্চর্য, ওয়াডিয়ার বাচ্চা দুটো শিউরে উঠলো না কিংবা মাকে এসব বীভৎস বর্ণনা দিতে বারণ করল না। অনুমান করলুম, এরা ছেলেবেলা থেকেই এ বিষয়ে অভ্যস্ত।

নওজোত অনুষ্ঠান হচ্ছিল একটা প্ল্যাটফর্মের উপর। সাদা জাজিমে মোড়া। দুটি আট-ন' বছরের বাচ্চা দাঁড়িয়ে, আর চারজন 'দস্তুর' (পুরোহিত) আবেস্তা, পহ্লবী ভাষায় গড়গড় করে মন্ত্র উচ্চারণ করে যাচ্ছেন। এককালে যজ্ঞোপবীত দেবার সময় পুরোহিত ছেলেটাকে মন্ত্রোচ্চারণ দিয়ে বোঝাতেন যজ্ঞোপবীতের দায়িত্ব কি, আজ যে সে উপবীত ধারণ করতে যাচ্ছে তার অর্থ—মায়ের কোল আর খেলাধুলো তার জন্য শেষ হল, সে আজ সমাজে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এখন ক'টা ছেলে এ সব বোঝে তা জানিনে, কিন্তু এটা স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, 'নওজোত'ও উপনয়নের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে—যে মন্ত্র উচ্চারণ করা হচ্ছে তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছে।

ফিস ফিস করে কথা বলতে মানা নেই। আমি রুস্তমকে আমার গবেষণামূলকত্ত্ব-চিন্তাটি অতিশয় গাম্ভীর্য সহকারে নিবেদন করাতে তিনি বললেন, 'আপনার তাতে কি, আমারই বা তাতে কি? রান্নাটা ভালো হলেই হলো।'

বুঝলুম, 'ইতর জনের জন্য মিষ্টান্ন'—প্রবাদটি সর্বদেশে প্রযোজ্য।

নওজোত শেষ হয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে নামল ঝমাঝ্ঝম বৃষ্টি। অকালে এ রকম বৃষ্টির জন্য কেউ তৈরি ছিলেন না। নিমন্ত্রিত রবাহূত সবাই ছুটে গিয়ে উঠলেন বাড়ির বারান্দায়। তারপর বৃষ্টির ঝাপটা খেয়ে একদল ড্রইংরুমে, আরেক দল ডাইনিং-রুমে, আত্মীয় কুটুমরা বেডরুমে ঢুকলেন। আমাকে রুস্তম নিয়ে গেলেন ছোট্ট একটা কুঠুরিতে, বোধ হয় বাচ্চা দুটোর পড়ার ঘর।

আমরা জনা-বারো সেই কুঠুরিতে কাঁঠাল-বোঝাই হয়ে বসলুম। সকলের শেষে এসে ঢুকলেন এক বুড়ো পার্সী দু'বগলে মদ নিয়ে। আমরা কয়েক জন হিন্দু মুসলমান নিরামিষ ছিলুম, আমাদের জন্য এল আইসক্রীম, লেমনেড।

বুড়ো একটা বোতল ছেড়ে দিলেন মজলিসের জন্য। অন্য বোতলটা নিজে টানতে লাগলেন নির্জলা। বিলেতে পালা পরবে, ঘরে বাইরে সর্বত্রই মদ খাওয়া হয়, তাই এন্তার মদ খাওয়া দেখেছি কিন্তু দশ মিনিট যেতে না যেতেই বুঝলুম, এ বুড়ো তালেবর ব্যক্তি। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে পেশাদারী ব্রাহ্মণের পাইকারি বাহান্ন ভক্ষণের মত এঁর পাইকারি পান দ্রষ্টব্য বস্তু।

মদ খেলে কেউ হয়ে যায় ঝগড়াটে, কেউ বা আরম্ভ করে বদ রসিকতা, কেউ করে খিস্তি, আর কেউ হয়ে যায় যীশুখ্রীষ্ট,—দুনিয়ার তাবৎ দুঃখ কষ্ট সে তখন আপন স্কন্ধে তুলে নিয়ে যায়। আর সবাইকে পায়ে পড়ে টাকা ধার দেয়; পরের দিন অবশ্য চাকরের উপর চালায় চোট-পাট, ভাবে (পার্সী হলে) ঐ শালাই মোকা পেয়ে টাকাটা লোপাট মেরেছে।

আমি গিয়েছিলুম এক কোণে, দেয়ালে হেলান দিয়ে বসব বলে। বোতলটি আধঘন্টার ভিতর শেষ করে বুড়ো এসে বসলেন আমারই পাশে। আমি একটু সঙ্কুচিত হয়ে স্থান করে দিলুম। বুড়ো শুধোলেন, 'আপনি এ শহরে নূতন এসেছেন?' আমি কথাটা অস্বীকার করলুম না। বললেন, 'তাই ভাবছেন আমি মাতাল?'

বুঝলুম উনি যীশুখ্রীষ্ট টাইপ নন, ইনি হচ্ছেন মেরি ম্যাগডলীন টাইপ,—অনুশোচনা ক্ষতবিক্ষত। বললুম, 'কই আপনি তো দিব্য আর পাঁচজনের মত কথা কইছেন।'

বললেন, 'এক বোতলে আমার কিছু হয় না, পাঁচ বোতলেও কিছু হয় না, দশ বোতলেও না—যদিও অতটা কখনো খেয়ে দেখিনে।' সত্যি, লোকটার গলা সাদা, চোখের রঙ থেকেও বিশেষ কিছু অনুমান করা যায় না—বুড়ো বয়সের ঘোলাচোখে রঙের ফেরফার সহজে ধরা পড়ে না। পাকা বাঁশে তেল লাগালেও একই রঙ।

বললুম, 'তাহলে না খেলেই পারেন।'

বললেন, 'খাই না তো, হঠাৎ ও-রকম অকালে বৃষ্টি না নামলে।'

মদ খাওয়ার নানা অজুহাত বাজারে চালু আছে। এটা নূতন। বৃষ্টির জলের সঙ্গে নামল বটে কিন্তু ধোপে টিকবে না। বললুম, 'হুঁ।'

'আপনিও খেতেন।'

'? ? ? ?'

সে অবস্থায় পড়লে।

আমি শুধালুম, 'কোন অবস্থায়?' তারপর বললুম, 'কিন্তু আপনি অমাকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন কেন? বিশেষতঃ আপনার ধর্মে যখন ও জিনিস বারণ নয়।'

'আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করছি কারণ আর সবাই জানে—'

আমি বললুম, 'তাহলে বলুন।'

বললেন, 'রুস্তম বলছিল, আপনি নাকি পূব-ভারতের লোক, পার্সীদের আচার-ব্যবহার পালা-পরব সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। টাওয়ার অব সায়লেন্স কাকে বলে জানেন?'

আবার 'মৌন শিখর'। বললুম, 'আজই প্রথম শুনেছি।'

বললেন, 'কুয়োর মত গোল করে গড়া হয়। আর দেয়ালের ভিতরের দিকে বড় বড় শেলফের মত কুলুঙ্গি বা 'নিশ্' কাটা থাকে। সেগুলোর উপর মড়াকে বিবস্ত্র করে শুইয়ে দেওয়া হয়। বোম্বাই-টোম্বাই অঞ্চলে বিস্তর শকুনি ওত পেতে বসে থাকে, তিন মিনিটের ভিতর হাড্ডিগুলো ছাড়া সব কিছু সাফ করে দেয়। কিন্তু ভিতরে গিয়ে এসব দেখবার হুকুম নেই। একমাত্র 'শববাহকই' ভিতরে যায়। এই যে নওজোতের সময় 'দস্তুর'দের দেখলেন

তেমনি পার্সীদের ভিতরে বিশেষ 'শববাহক' সম্প্রদায় আছে। টাওয়ার অব সায়লেন্সের ভিতর যা কিছু করার তারাই সব করে। এমন কি 'দস্তুর'দেরও ভিতরে যাওয়া বারণ।

'আমার জন্ম মধুগাঁয়ে, সেখানেই প্রায় সমস্ত জীবন কাটিয়েছি। মধুগাঁও সি-পিতে। আপনি কখনো যাননি? তাহলে বুঝতেন গ্রীষ্মকালে সেখানে কি রকম গরম পড়ে। আর সে গরম একদম শুকনো—বোন্-ড্রাই। দেয়ালের ক্যালেন্ডার বেঁকে যায়, বইয়ের মলাট বাঁকতে বাঁকতে কেতাব থেকে খসে পড়ে, টেবিলটা পর্যন্ত পিঠ বাঁকিয়ে বেড়ালটার মত লড়াইমুখো হয়ে ওঠে। এমন কি মানুষেরও রস-কষ শুকিয়ে যায়। হাতাহাতির ভয়ে গরমের দিনে একে অন্যে কথাবার্তা পর্যন্ত হয় নিক্তি-মেপে।

'সেই গরমে মারা গেল এক আশি বছরের হাড্ডিসার বুড়ি। আমার ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন যুবতী—বকা ছোঁড়ারা তখনই তাঁর নাম দিয়েছিল 'ঝরাপাতা', 'কুকুরের জিভ'। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুকোতে শুকোতে শেষ পর্যন্ত রইল চামড়ায় জড়ানো খান কয়েক হাড্ডি। আর স্বভাব ছিল এমনি খিটখিটে যে আমরা পারতপক্ষে তার বাড়ির সমানের রাস্তা দিয়ে যেতুম না। বিশ্বাস করবেন না, বেটি বারান্দায় বসত একগাদা নুড়ি নিয়ে। কেউ ভুলেও তার বাড়ির সামনে দাঁড়ালে বুড়ি সেই নুড়ি ছুঁড়তে আরম্ভ কবত তাগ করে।—আর সে কী মোক্ষম তাগ! 'প্র্যাক্‌টিস মেক্‌স্ পার্ফেক্ট' রচনায় এক ছোঁড়া বুড়ির উদাহরণ নিয়ে আমার কাছ তেকে ফুল মার্ক পেয়েছিল।

'বুড়ির ত্রি-সংসারে কেউ ছিল না, প্রকাণ্ড একটা কুকুর ছাড়া। কিন্তু কুকুরটার উপর তো আর বুড়ির শেষ ক্রিয়ার ভার ছেড়ে দেওয়া যায় না। ভারটা পড়লো আমাদের ঘাড়েই। মহাবিপদে পড়ল মধুগাঁয়ের পার্সী সম্প্রদায়।

'এককালে মধুগাঁয়ে বিস্তর পার্সী বসবাস করতো বলে তারা শহরের মাইল খানেক দূরে ভাল টাওয়ার অব সায়লেন্স বানিয়েছিল। আপন শববাহকও জন আষ্টেক ছিল। কিন্তু সে হল সত্তর-আশি বৎসরের কথা। ইতিমধ্যে পার্সী সংখ্যা ক্রমে ক্রমে কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র দশ বারোটি পরিবারে। তাই মৃত্যুর হার এসে দঁড়িয়েছে বছরে এক কিংবা তার চেয়েও কম। টাওয়ার অব সায়লেন্সের শকুনগুলো পর্যন্ত পালিয়েছে না খেয়ে মর-মর হয়ে। মানুষের বুদ্ধি শকুনের চেয়ে বেশি তাই, 'শববাহকে'র দল শকুনগুলোর বহুপূর্বেই মধুগাঁও ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

''তাই সমস্যা হল বুড়ীকে বয়ে নিয়ে যাবে কে? এসব ব্যাপারে পার্সীরা বামুনদের চেয়ে তিনকাঠি বেশি গোঁড়া। 'শববাহক' না হলে তো চলবে না— বরঞ্চ পার্সী সম্প্রদায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে তিন দিন কাটিয়ে দেবে তবু 'শববাহক' ভিন্ন কেউ মড়া ছুঁতে পারবে না।

'টেলিগ্রাম করা হল এক আঁটা—চতুর্দিকের পার্সীদের কাছে, পার্সী ধর্ম লোপ পায়, পার্সী ঐতিহ্য গেল গেল, তোমরা সব আছো কি করতে, চারটে 'শববাহক' না পেলে মধুগাঁও উচ্ছন্নে যাবে, সৃষ্টি লোপ পাবে।

'শববাহকেরা শেষটায় এল। এক ছোকরা 'দস্তুর' তখনো মিসিং লিঙ্কের ন্যাজের মত খসি-খসি করে মধুগাঁয়ের পশ্চাদ্দেশে ঝুলছিল, সে মন্তর-ফন্তরগুলো সেরে দিলে—হোলি জিসসই জানেন তার কতটা শুদ্ধ কতটা ভুল।

'সেই মার্চ মাসের আগুনের ভিতর দিয়ে চারটে শববাহক, 'দস্তুর'জী আর আমারই মত আরো দুই মুর্খ গেলুম টাওয়ার অব সায়লেন্সে। গেটের কাছে শববাহক ছাড়া আর সবাইকে দাঁড়াতে হল। একটা গাছ পর্যন্ত নেই যার ছাওয়ায় একটু কম গরম হই। সান্ত্বনা এইটুকু যে শববাহকেরা রেকর্ড টাইমের ভিতর বেরিয়ে এল। গেটে তালা মেরে আমরা সবাই ধুঁকতে ধুঁকতে শহরে ফিরে এলুম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম আর যদি কখনো ঐ হতভাগা টাওয়ারে যেতে হয় তবে যাব, শেষবারের মত শববাহকদের কাঁধে চেপে।

'কিন্তু খুদার কেরামতির কে ভেদ করবে বলো? তিন মাস যেতে না যেতে মরলেন আমার বিধবা পিসি—বাবা বিদেশে, মা বহুকাল পূর্বেই গত হয়েছেন। বাড়িতে সোমত্থ আর কেউ নেই। আমি পাগলের মত শববাহকের সন্ধানে দুনিয়ার চেনা অচেনা সবাইকে তার করলুম। মে মাসের অসহ্য গরম পড়েছে আকাশ ভেঙে—মধুগাঁয়ে যে ক'ফোঁটা বিষ্টি হয় সে জুলাই মাসে, তার পূর্বে ও মুল্লুকে কখনো মেঘ করেনি, বৃষ্টি ঝরেনি। ধরণী যে ঠাণ্ডা হবেন তার কোনো আশা-ভরসা নেই জুলাই মাস পর্যন্ত। 'দস্তুর'টিও ইতিমধ্যে ন্যাজটার মত খসে পড়েছেন, তারই বা সন্ধান পাই কোথায়?

'ভ্যাগ্যিস্ আমি ইস্কুল মাস্টার। আমার ছেলেরা ছুটলো এদিক ওদিককার শহরে। তারা সব হিন্দু, দু'একটি মুসলমান—কিন্তু গুরুর দায় বুঝতে পেরে কেউ সাইকেলে চড়ে, কেউ লোকাল ধরে এমনি লাগা লাগলো যে মনে হল তারা বুঝি কুয়েশচেন পেপার লীক হওয়ার সন্ধান পেয়েছে। ভগবান তাদের মঙ্গল করুন, সবকিছুই ব্যবস্থা হয়ে গেল।

'ছেলেদের বললুম, বাবারা আমায় বাঁচালে। কিন্তু আর না। তোমাদের আর সঙ্গে আসতে হবে না। আর শোনো, এই গরমে যদি টাওয়ার যেতে আসতে আমি মরি তাহলে আমাকে পুড়িয়ে ফেলো, না হয় গোর দিয়ো।''

আমি বললুম, 'সে কি কথা?'

'আমার কতা যেন আপদেই শুনতে পাননি সেই রকম ভাবে বলে যেতে লাগলেন, যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কড়াইয়ে গরম তেল ফুটছে আর আমি তারই ভিতর সাঁতার কেটে কেটে টাওয়ারের দিকে চলেছি। এক পা ফেলি আর ভাবি এ দুনিয়ায় এই শেষ পা ফেলা, পরের কদমেই দেখব জাহান্নমের বুকিং আপিসের সামনে 'কিউয়ে' পৌঁছে গিয়েছি—স্বর্গে যাওয়ার হলে ভগবান এই কড়াইভাজার প্র্যাকটিস কপালে লিখবেন কেন?

'টাওয়ার অব সায়লেন্সের সমানে এসে বসে পড়েছি। দস্তুরজীর শেষ মন্ত্রোচ্চারণ আমার কানে এসে পৌঁছচ্ছে যেন কোন দূরদুরান্ত থেকে। বোঝা-না-বোঝার মাঝখান দিয়ে যেন কিচু দেখছি, কিছু শুনছি, শববাহকেরা ক্লান্ত শ্লথ গতিতে মড়া নিয়ে টাওয়ারের ভিতর ঢুকল।

'তার পরমুহূর্তেই আমার সমস্ত চৈতন্য ফিরে এল, টাওয়ারের ভিতর থেকে একসঙ্গে অনেকগুলো তীব্র তীক্ষ্ণ চীৎকার শুনে। সে চীৎকারে ছিল মাত্র একটা জিনিস—ভয়। যারা চীৎকার করলো তারাই যে শুধু ভয় পেয়েছে তা নয়, সে চীৎকার যেন স্পষ্ট ভাষায় বললো, আর কারো নিস্তার নেই।

'সঙ্গে সঙ্গে চারজন শববাহকের দুজন পাগলের মত হাত পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে এদিক ওদিক টাল খেয়ে খেয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো গেট দিয়ে। একজন আমাদের দিকে তাকিয়েই একমুখ ফেনা বমি করে পড়ল 'দস্তুরজী'র পায়ের কাছে, আরেকজন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সেই রকম টাল খেয়ে খেয়ে যে কোন দিকে চলল সে জানে না, দস্তুরজীও একবার তার দিকে তাকান আরেকবার তাকান ভিরমি-যাওয়া লোকটার দিকে। টাওয়ারের ভিতর থেকে আর কোনো শব্দ আসছে না, কিন্তু যে পাগলটা ছুটে চলেছে সে চীৎকার করে করে যেন গলা ফাটিয়ে দিচ্ছে—সে কী অমানুষিক বীভৎস কণ্ঠস্বরের বিকৃত পরিবর্তন।

'দস্তুরজী আর আমি এমনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছি যে আমাদের মাথায় কর্তব্যাকর্তব্য কিছুই ফেলছে না, পা দুটো যেন মাটিতে শকড় গেড়ে বসে গিয়েছে। হতভম্ব হয়ে গিয়েছি বললে অল্পই বলা হল, কারণ অদ্ভুত এক ভীতি আমাকে তখন অসাড় করে ফেলেছে।

'কতক্ষণ এ রকম ধারা কাটলো আমার মনে নেই। আস্তে আস্তে মাথা সাফ হতে লাগল, কিন্তু ভয় তখনো কাটেনি। দস্তুরজী বললেন, আর দুটো শববাহকের কি হল? তারা বেরুচ্ছে না কেন? আমার মনেও সেই প্রশ্ন, উত্তর দেব কি?

'দস্তুরজী আমার দুজনেরই ভিতরে যাওয়া বারণ? দস্তুরজীর কর্তব্য-বোধ রয়েছে না কি, কে জানে, বললেন, "চলুন ভিতরে যাই।"

'আমার এখনো মনে হয়, দস্তুরজী তখন সম্পূর্ণ সম্বিতে ছিলেন না; আমি জানি আমি নিশ্চয়ই ছিলুম না। তাঁর পিছনে পিছনে কোন্ সাহসে ভর করে গেলুম বলতে পারব না। আমি এ বিষয়ে বহু বৎসর ধরে আপন মনে তোলপাড় করেছি! খুব সম্ভব যুগ যুগ ধরে দস্তুরজীদের হুকুম তামিল করে করে আমরা সাধারণ গৃহী বিপদকালে মন্ত্রমুগ্ধের মত এখনো তাঁদের অনুসরণ করি।

'ভেতরে ঢুকে বাঁ দিকে মোড় নিয়েই দেখি—'

ভদ্রলোক হঠাৎ থেমে গেলন। আমি বললুম, 'কি, কি?'

আমার দিকে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে বললেন, 'এই যেরকম আমি আপনার দিকে তাকালুম, ঠিক সেই রকম তাকিয়ে আছে টাওয়ারের দেয়ালের একটা শেলফের ভিতর পা ছড়িয়ে বসে, ঘাড় আমাদেব দিকে ফিরিয়ে সেই হাড্ডিসার বুড়ী—যাকে আমরা তিন মাস আগে এই টাওয়ারে রেখে গিয়েছিলুম। গায়ের চামড়া আরো শুকিয়ে গিয়েছে, আর, আর, চোখের কোটর দুটো ফাঁকা, কালো দুই গর্ত। আমি অজ্ঞান হয়ে পডলুম।'

হুঙ্কার দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'কেউ আমাকে একটা বোতল দেবে না নাকি রে?' অথবা ঐ রকম কিছু একটা; আমি স্পষ্ট শুনতে পাইনি। ভয়ে আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। কি করে যে এরকম ব্যাপার সম্ভবপর হতে পারে সে কথা জিজ্ঞেস করবার

মত হিম্মৎ বুকে বেঁধে উঠতে পারছিনে, পাছে আরো ভয়ঙ্কর কোনো এক বিভীষিকা তিনি আমার চোখের সামনে তুলে ধরেন।

হঠাৎ যেন আমার প্রতি ভদ্রলোকের দয়া হল পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'ভয় পাবেন না। আমি সবকিছু বুঝিয়ে বলছি।

'যখন জ্ঞান ফিরে পেলুম তখন দেখি আমার কে যে ন বালতি বালতি জল ঢালছে। তারপর বুঝলুম নেমেছে। আমার চতুর্দিকে স্কুলের ছেলেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'সেই যে শববাহক পাগলের মত ছুটে গিয়েছিল ওরকম অবস্থায় একা দেখতে পেয়ে ছেলেরা আমার সন্ধানে এখানে এসে পৌঁচেছে।

'যে দুজন শববাহক ভিতরে অজ্ঞান হয়ে পরেছে তারা আর কখনো জ্ঞান ফিরে পায় নি। সে বাইরে ভিরমি গিয়েছিল সে সুস্থ হল বটে কিন্তু তার মাথা সম্পূর্ণ ঠিক হয়নি—আর যে পাগলের মত ছুটে এসেছিল তাকে এখনো পাগলা গারদে বেঁধে রাখা। একমাত্র 'দস্তুর'জীই এই বিভীষিকা কাটিয়ে পেরেছেন।

'অথচ ব্যাপারটা পরে পরিস্কার বোঝা গেল ছিল হাড্ডিসার, গায়ে একরত্তি চর্বি ছিল না, যেটুকু ছিল তা না থাকারই শামিল। তিন মাসের গরমে বুড়ী হয়ে এমনি এক অদ্ভুত ধরনের বেঁকে গিয়েছিল যেন ছড়িয়ে দিয়ে উঠে বসেছে—শুধু চোখ দুটো একদম গিয়েছে। সর্বশবীরের কোথাও এতটুকু আঁচড় আপনাকে আগেই বলেছি মধুগাঁও থেকে সব শকুন পূর্বেই পালিয়ে গিয়েছিল।

'এক সাধুর কৃপায় আমি সুস্থ হয়ে উঠলুম অকালে বৃষ্টি নামলে আমাকে এখনো বোতল বোতল খেয়ে ছবিটা মগজ থেকে মুছে ফেলতে হয়।'

বন-এ ছাত্র : ১৯৩৪

❑ পার্সী সম্প্রদায়ের শেষকৃত্য পদ্ধতির মর্মন্তুদ বিবরণ এই লেখায় প্রকাশিত। 'চাচা কাহিনী' থেকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অংশ বিশেষ পুনর্মুদ্রিত হলো তাঁর জন্ম শতবর্ষে। —সম্পাদক

সৈয়দ বাবার দরগা

অমিতাভ চৌধুরী

হঠাৎ আজনের ডাক শুনে চমকে যাবেন না। কিংবা হঠাৎ সাত আটশো পায়রা গাছের শাখা থেকে উড়তে শুরু করে। এইখানেই সৈয়দবাবার দরগা। ঐ যে দরগা ঘিরে কী যেন ঝুলছে সারি সারি। ওগুলো উটপাখির ডিম।'

হজরত সৈয়দ আলী শাহর দেশ ছিল আরব মুলুক। মুসলমানরা যখন দিল্লির বাদশাহ, তখন তিনি আসেন হিন্দুস্থানে। তারপর শতাধিক বর্ষের পুণ্য জীবন সমাপ্ত করে আজ থেকে প্রায় আড়াইশ বছর আগে দেহরক্ষা করেছেন এইখানে—এই ঝুরিনামা শান্তশীতল বটের তলায়। খিদিরপুর পুলের কাছে হেস্‌টিংস ময়দানে।

সামনেই গড়গড় করে চলেছে খিদিরপুর, বেহলার ট্রাম। ট্রাম লাইনের ঐ পারে রেসকোর্স। শনি রবিতে হাজার হাজার টাকার খেলা। গাড়ির ভিড়। লোকের ঠেলাঠেলি। ডাইনে বাঁয়ে মিলিটারির গুদাম। পিছনে বস্তি। আর উথালপাতাল জনসমুদ্রের মাঝখানে হেস্‌টিংস ময়দানে দ্বীপের মতন দাঁড়িয়ে আছে শান্তি আর পবিত্রতায় ঘেরা সৈয়দবাবার দরগা। রাজপথে কান পাতলে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে এই দরগা থেকেই সকাল সন্ধ্যা শোনা যায় আজানের ডাক।

কলকাতায় মন্দির মসজিদের কমতি নেই। কিন্তু সৈয়দবাবার এই দরগা অনেকের হয়তো নজরে পড়ে না। 'আসা-যাওয়ার পথের ধারে' এই নিরবচ্ছিন্ন শান্তিব আলয়, নিরাড়ম্বর পবিত্রভূমি পথ-চল্‌তি লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কিন্তু দৈবাৎ যদি নজরে পড়ে, দু'দণ্ডের জন্যেও আপনাকে এইখানে থামতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে দরগার দিকে। এমন চমৎকার জায়গা কলকাতায় বড় বেশী নেই। ট্রাম স্টপ থেকে কয়েক পা এগিয়েই সবুজ ঘাসে ছাওয়া ছোট্ট মাঠ। এককোণে ঝুরিনামা অতিবৃদ্ধ অতিকায় বট। তার তলায় শুয়ে আছে ক্লান্ত পথিক, একতারাতে গুণগুণোচ্ছে কোন বৈরাগী। কিংবা নামাজ পড়ছে কেউ। আর পরম নিশ্চিন্তে ঘুবে বেড়াচ্ছে সাত আটশ' পায়রা। বটগাছের কোলেই তাদের আস্তানা। সবই বাবার নামে মানত করা। পুণ্যকামীরা এসে এসে এদের রোজ খাইয়ে যায়।

আরও একটু এগোলেই দেখবেন বাবার কবর। একপাশে 'জেনানাকে লিয়ে' বিশ্রামঘর। অন্যপাশে মর্মর চত্বরে ঘেরা কবরস্থান। বাবা শুয়ে আছেন উত্তর দিকে মাথা রেখে। বাবার ইচ্ছেতেই কবরের ওপর শুধু মাটির প্রলেপ। ভক্তরা, পুণ্যকামীরা রোজ ফুল দিয়ে যান। কবরের চারধারে নূতন তৈরী মর্মর দেবী, তোরণ। তার গায়ে কোরানের বাণী খোদাই করা। সেখানে অসংখ্য লোকের অবিরাম আসা যাওয়া। হাতজোড় করে সকলেই চাইছে বাবার 'দোয়া'।

কবরের চারধারে ঝুলছে সারি সারি উটপাখির ডিম। জাহাজীরা বিদেশ থেকে ফিরেই

সটান চলে আসেন দরগায়। তাঁরাই ঝুলিয়ে দিয়ে গেছেন এই ডিম। এক পাশে নামাজের জায়গা, অন্যপাশে মোহাফিজের থাকার ঘর। ধূপের গন্ধ আর পুলের সৌরভের মাঝখান থেকে সরে যেতে আপনার ইচ্ছে করে না।

দরগার মোহাফিজ সুলতান আহাম্মদ। তাঁর বাবাও ছিলেন মোহাফিজ। তাদেব বাড়ি ছিল গাজীপুরে। এখন কলকাতার লোক। সুলতান সাহেব একগাল হেসে বললেন—"বাবুজী, সৈযদবাবার মতোন এমুন রাগী আদমী বহুৎ কম আছে। বাবার নামে কুছু খাবাপ কথা বলছেন তো জান খতম। আব বাবার, দোয়া হলো তো কাম হাসিল।

এই দেখুননা, গত লড়াইয়েব সময় মিলিটারী আদমীরা একরোজ এসে বলল—'দবগা উঠাও।' হামরা বললাম, 'কভি নেহি।' চলল হাঙ্গামা হুজ্জুত। বড়ি গোলমাল। হামরা সাফ জানিযে দিলাম—বাবার কবব উঠবে নাই। জান কবুল।

মিলিটাবী আদমীবা বোজ রোজ হুজ্জুত করে। দরগায় ঢুকে হাল্লা করে। হামরা নামাজ পড়ি, কাওয়ালী গাই, আজান দিই। উরা বলে—'উসব চলবে না।' মাহা মুসকিল। লেকিন সব ফয়সালা কবে দিলেন খোদ 'বাবা'।

এক রোজ হয়েছে কি, এক হাওয়াই জাহাজ দরগার উপুরে উড়বাব সময বদাম্ কবে গিরে গেল। আগুনে আগুনে সব কাবাব। হামরা সমঝালাম, ঠিক হয়েছে, বাবা গোসা দেখিযেছেন। তাবপব হামরা মিলিটাবী আদমীদের কাছে গেলাম, ধরাধরি করলাম। বললাম, 'হুজুর, বাবাকে শান্তিতে থাকতে দেন।' উরা রাজী হয়ে গেল। তারপব কুছ গোলমাল নাই।

এখুন হিন্দু, মুছলমান, খিরিস্তান সব লোক আসে, সিন্নি দেয়, মানত করে। সিন্নিখরচে হামাদেব চাব পাঁচ আদমীর পেট চলে।"

আমি জানতে চাইলাম বাবার জীবন-ইতিহাস। মোহাফিজের বক্তব্যে সে সম্পর্কে কোন পরিস্কার ধারণা হল না। শুধু অসংখ্য কিংবদন্তী আর অলৌকিক কাহিনী। মোহাফিজ স্বীকার করলেন, বাবার ঠিক ঠিক ইতিহাস তাঁদের কারও জানা নেই। শুধু জানেন, আরব মুলুক থেকে এসে হিন্দুস্তান ঘুরতে ঘুরতে তিনি আসেন এই বাংলা মুলুক। মারাও গেলেন এইখানে। বাবা বেঁচেছিলেন একশ বছরের বেশী। মারা যান ১১১৭ হিজরীতে। এখন ১৩৭৯ হিজরী।

প্রতি হপ্তায় বৃহস্পতিবারে বৃহস্পতিবারে দরগার সামনের মাঠে মেলা বসে। বৃহস্পতিবার মানত দেবার, সিন্নি দেবার দিন। তাছাড়া নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে প্রতি বছর দুদিন ধরে বসে খুব বড় মেলা। বাবার উর্স্। ২৬এ ও ২৭এ জমাদিওল আউল তারিখে। এইদিন একেবারে মহোৎসব।

বিদায় নেবার অগে সুলতান সাহেব বললেন—আদাব বাবুজী, আসবেন আবার। ওদিকে তখন সন্ধ্যের আজান শুরু হয়ে গেছে।

সৌজন্যে : 'অচেনা শহর কলকাতা'।

শোকসভা

জ্যোতির্ময়ী দেবী

এখন বলি অন্তঃপুরে একসময়ে একটি শোকের ব্যাপারে গিয়েছিলাম। সে হচ্ছে রাজোয়াড়ার রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে শোকসভা বা শোকপ্রকাশ। কোনো একটি নির্দিষ্ট দিন ঠিক করে যাঁরা যাবেন তাঁদের জানানো হয় যেতে। যেদিন খুশি তা করবার নিয়ম নেই।

সহসা কোন এক সময়ে তখনকার রাজার একটি লালজীসাহেব, মানে— বাঁদী থেকে যিনি উন্নতপদে উন্নীত হয়েছেন 'পাশোয়ানজী' খেতাব নামে— তাঁর একটি পুত্রের সহসা মৃত্যু হ'ল। সেই পাশোয়ানজী তখন 'বসন্তরায়' নামে খেতাবে ভূষিত ছিলেন। কি কারণে মা আর এই শোকজ্ঞাপন সভায় যেতে পারলেন না। আমি আর আমার এক পিসিমা গেলাম।

নিয়ম-প্রথামাফিক রথ এল। সেদিন দু'খানি। এবং দুপুরবেলা। আমরা রথ আরোহণে এবং মর্যাদা অনুযায়ী দুটি দাসী নিয়ে প্রাসাদ অভিমুখে গেলাম।

চন্দ্রমহলের শেষ তোরণে অন্তঃপুরের এলাকায় কানাতঘেরা প্রাঙ্গণে রথ এসে থামল। যথারীতি রথের গাড়োয়ান সঙ্গের সেপাই চোপদারমগুলী সব বেরিয়ে গেল।

রথের পর্দা-ঢাকা তুলে দাসীরা এবং খোজারা বললে, 'নেবে আসুন সবাই।' নামলাম। দেখলাম আরও রথ এসে দাঁড়িয়েছে, তা থেকেও দীর্ঘ অবগুণ্ঠিতা মহিলারা নামছেন। আমরা দু'জনে কন্যা-মেয়ে, একটু ঘোমটা কম দিলে নিন্দা নেই। তবুও দাসীরা বললে 'ঘুঘট্ কাড়ো' (ঘোমটা টানো)। দেখবার কৌতূহলে ঘোমটার ফাঁক রেখে দাসীদের ও অন্য সহযাত্রিনীদের সঙ্গে অন্তঃপুরের সুড়ঙ্গপথে প্রতি কোণে-কোণে সেই রাত্রিবেলার মতো প্রকাণ্ড প্রদীপ জ্বেলে আলো জ্বালা রয়েছে।

সুড়ঙ্গ-ভরা যাত্রিনীরা চলছি।

সহসা যেন একটু অদ্ভুত গুঞ্জনসুর দূর থেকে ভেসে আসতে লাগল, যেন একটানা ঝিঁঝির ডাকের মতো নিঃশব্দ নিস্তব্ধ পথ-যাত্রিনীদের কানে।

সুড়ঙ্গ পার হয়ে এবার একটা প্রাঙ্গণে পড়লাম। এবারে আর সরু সুরের গুঞ্জন নয়। বুঝলাম একটা সমবেত উতরোল, কান্নার শব্দ দূর থেকে শুনছিলাম।

ঘোমটা তখন বাড়ানো। ঝিয়েদের নির্দেশে একটি প্রকাণ্ড ঘরে প্রবেশ করলাম। একটু ঘোমটা সরিয়ে দেখলাম। ঘরে লোকের যেন শেষ নেই— যত লোক ধরে সব বসেছে। আর তাদের মাঝে বা ঘরের মাঝখানে অনেকগুলি নারী মাথা চাপড়ে বুক চাপড়ে উতরোল আকুল হয়ে কাঁদছে— হায় হায় শব্দে নানা সুরে কথার বিলাপ করে। কান্নার যেন আর শেষ নেই, সীমা নেই।

কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই খোজারা আর প্রাসাদের দাসীরা কাছে এসে বললে, 'এবারে ওঠ, শোক-বৈঠক তোমাদের শেষ হয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে আমরা ও অন্য শোকপ্রকাশের সহযাত্রিনীরা দলে দলে সবাই উঠলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম যেমন একদল বেরিয়ে এলেন প্রাঙ্গণে আর আরও দলে দলে অনেক মহিলা এসেছেন তাঁরা ঐ ঘরে ঢুকছেন।

এবং আমরা কানাত-ঘেরা প্রাঙ্গণে পৌঁছবার সঙ্গেই দেখতে পেলাম আবার দলে দলে আগন্তুক যাত্রিনীদের এবং ফেরৎ যাবার দলে সুড়ঙ্গ গলি ও প্রাঙ্গণ বারে বারে ভরে-ওঠে আর

খালি হয়ে যায়।

এই হ'ল শোক বৈঠকের চিরাচরিত নরনারী নির্বিশেষে রাজস্থানের প্রথা। যাঁরা আসবেন তাঁরা নীরবেই কয়েক মিনিটের জন্য বসবেন। কোন বিলাপ বা ভাষণ-বাচনের প্রয়োজন নেই। দু'একটি কথা অথবা শুধু নিঃশব্দ উপস্থিতিই নিয়ম। অন্যত্রও এবং বাড়িতেও দেখেছি এই কয়েক মিনিটের উপস্থিতিই শোকজ্ঞাপনের ওখানকার প্রথা। নারী ছাড়া পুরুষ সমাজেও এই সাধারণ প্রথা।

শোক-বৈঠক থেকে আমরা তো ফিরে এলাম।

পরে শুনলাম পিতার কাছে। রাজপ্রাসাদেও বড় বড় ঘরে এইসব শোকের কান্নার জন্য বাইরে থেকে ভাড়া করে লোক আনা হয়। শোক-বৈঠকের দিন তারাই এসে ঐখানে সমবেত হয় এবং নানাভাবে বিলাপ করে কাঁদে। সেই সভায় অথবা রাজপ্রাসাদে অন্যত্র যাঁরা শোক বা অন্য স্বজন বন্ধু সেখানে কেউই থাকেন না। দিনও নির্ধারিত করে রাখা হয় আগন্তুকদের জন্য। যখন-তখন যে-সে আসবার নিয়ম নেই।

রাজস্থানে সাধারণ শবযাত্রাক্ষেত্রেও এই বৈঠকের দিন নির্ধারণ এই ধরনের প্রথা আছে।

শবযাত্রা ঃ

প্রাসাদে এইসব অকুলীন অর্থাৎ রাজপরিবারভুক্ত কেউ নয় নিতান্তই দাসী ও সাধারণ সখীশ্রেণীদের কারুর মৃত্যু হলে প্রাসাদের পিছনের দিকে মেথর আসবার পথের পাশের খানিকটা দেওয়াল ফেলে শবযাত্রা করান হত। প্রধান তোরণপথে যেখানে উৎসবযাত্রা হয়, প্রতিদিন প্রত্যূষে মাঙ্গলিক সংগীতের সানাই বাঁশী বাজে, সেপথে সাধারণত মৃত্যুপথযাত্রীর আগম-নিগমের কোন অধিকার নেই। সেটা অলক্ষণ মনে করা হয়।

একদিন তারা প্রাসাদের কোন অন্ধকার সুড়ঙ্গময় পথে প্রাসাদে প্রবেশ করেছিল, সেদিন সমারোহ বা আবাহন তাদের জন্যে ছিল না। দণ্ডিত মৃত্যু অথবা স্বাভাবিক মৃত্যুর দিনেও তাদের প্রাসাদের পিছনের বিজন-বিপথ দিয়েই মৃত্যুর সিংহদ্বার অতিক্রম করতে হত। কার চরম দণ্ড হল সেদিন তার হিসাব কে জানে।

লোক শুধু দেখতো প্রাসাদের পিছনের খানিকটা ভাঙা হল এবং মেরামত হ'ল রাজকোষের খরচে। এবং মন্ত্রীরাও দেখতে ও শুনতে পেলেও হতবুদ্ধির মতো চুপ করে থাকতেন। কাকে অভিযুক্ত করবেন? কার কাছে সে অভিযোগ করা হবে?

কিন্তু যতই গোপনে রাখা হোক এই শাস্তি বা অত্যাচার-অনাচার কেমন করে লোক-সমাজে কানুঘুষোয় প্রচার হয়ে যেত।

'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গানের মতো নিম্নশ্রেণীর লোককবিরা মুখে-মুখে ছড়া আর গান রচনা করে শহরে ছড়িয়ে দিত। কোনো রাণীর অনাচারে অত্যাচারে কোন রাজপ্রেয়সী প্রতাপান্বিতা পাশোয়ানজীর অত্যাচারে কোন বাঁদী আত্মহত্যা (নিহত?) করেছে।

কেন শুদ্ধান্তঃপুরের পিছনের দিকে মেথরের যাবার পথের একটা দেওয়াল ভাঙা হল— সেই পথে তিনটি তরুণী সখীর শবদেহ নিম্নজাতীয় কয়েকজন বহন করে নিয়ে গেল। কি হয়েছিল তাদের, শহর ভরে গুঞ্জন ওঠে, গান গেয়ে বেড়ায় কতজন। জিজ্ঞাসার চিহ্নে জনমনেও শহরময় গান ভরে ওঠে— মৃত্যু না হত্যা—কে নেত্রী-কি অপরাধ?...

কিন্তু 'হাতি চলে বাজারমে কুত্তা ভুকে হাজার'— দুর্বলের চিৎকারে প্রতাপান্বিতের কিছু আসে যায় না।

একবার অন্তঃপুরে বসে আমরাও শুনলাম পরম রূপবতী তিনটি নবযৌবনা সখীর কথা।

যারা গত রাত্রে ঘরে আগুন লেগে মারা গেছে। যাদের প্রাসাদের পিছনের জঞ্জাল-ফেলা পথের দেওয়ালের পাশের খানিকটা ভেঙে সৎকার করতে পাঠানো হয়েছে। পোস্টমর্টেম বা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো বা ডাক্তারের সার্টিফিকেট দরকার হল কি? না-রাজার অন্তঃপুরে অতি প্রেয়সী পাশোয়ানজীর প্রিয়সখী ছিল তারা— এই শোচনীয় ঘটনাতে সারা অন্তঃপুর এবং স্বয়ং পাশোয়ানজী কত কাতর হয়েছেন...। কিন্তু অপঘাত মৃত্যু— সাধারণ শ্মশানে স্থান পাবার অধিকারও তো নেই। কিন্তু কোন মানবী-রূপিনী মৃত্যু কোন্‌পথে দিয়ে নিঃশব্দ রাত্রে তাদের চুলির মুঠি ধরে জরী রেশম জড়ানো বেণীতে তাদের রাত্রিবাসের ওড়নাতে অগ্নিসংযোগ করেছিল? এবং প্রত্যুষে 'মোরী' (নর্দমা) পরিষ্কারের পথপার্শ্ব ভেঙে তাদের কোন মহাশ্মশানে পাঠিয়ে দিল!

রাজা, অন্য রাণীরা, মন্ত্রীরা, নিঃশব্দে শুনলেন। সাধারণ অন্তঃপুরবাসিনীরা এবং সাধারণ শহরবাসীরা অবাক বিস্ময়ে নীরবেই শুনলেন। কত রূপসী নারী পৃথিবীতে আছে— মাত্র তা থেকে তিনটি গেল। এই তো! যাদের আগেও কেউ ছিল না। তখনো নেই। যারা তখনো কারুর কন্যা নয়, ভগিনী নয়। পত্নী বা মাতার স্থানও ভাগ্যে জোটে না যাদের— তারা সেই শ্রেণীর নারী। যাদের জন্য এককোঁটা চোখের জল ফেলবার মতো কেউ ত্রিভুবনে ছিল না, থাকে না— তারা সেই মেয়ে।

গেরাসিম লেবেদফের স্মৃতিফলক

ভারতে প্রথম রুশ্ সংস্কৃতির দূত গেরাসিম লেবেদফ। তিনি ৩৬ বছর বয়সে মাদ্রাজে এসে পৌছান। দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান—একমাত্র সাংগীতিক প্রতিভা নিয়ে বিশ্ব পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। ছ'বছর মাদ্রাজে কাটিয়ে অবশেষে কলকাতায় আসেন। সংগীত সাধক ও সংগীত শিক্ষক এই মহৎ প্রাণ মানুষটি বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়েব প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ। কিন্তু মনে রাখা দরকাব প্রাচ্য বিদ্যা বিশেষ করে ভারতবিদ্যারও পথিকৃৎ তিনি।

১৮১৭ সালে তাঁব মৃত্যু হয়। পিটার্সবার্গ (বর্তমান লেনিন গ্রাদ) সমাধি ক্ষেত্রে তাঁর স্মৃতি ফলকে লেখা আছে : Here lies Lebedev, Gerassim Stepanovich, Foreign collegium, translater of Indian vernaculars, Court counseller and caveliar He died on July 15, 1817 at the age of Seventy. এবপর অছে কবিতার একটি স্তবক :

> He was First of Russiaos Sons
> To East India to travel
> List the Indian customs
> And to Russia their tongue unravel.

— কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত / লোকনাথ ঘোষ

❑ জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন-২ থেকে। সৌজন্যে : দেজ পাবলিশিং।

ছত্তিশগড়

গোন্ড ও মারিয়া সম্প্রদায়

জন্ম এবং মৃত্যুতে নানা সংস্কার

মৃতদের হিন্দু নিয়মে দাহ করা হয়। কিন্তু বসন্ত বা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত মৃতদের কবর দেওয়া হয়। মৃতদের কবরস্থ করতে কখনও দেরী করা হয়। দূর গ্রামের আত্মীয়জন না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়। মৃতের ব্যবহৃত কাপড়, অন্যান্য টুকিটাকি দেহের সঙ্গে কবরে দেওয়া হয়। গোণ্ডদের বিশ্বাস ব্যবহৃত জিনিসগুলি মৃতের ব্যবহারে লাগে। কবরের ওপরে ফলক বা পাথর খাড়া রাখা হয়। অবশ্য মৃত মানুষটি যদি সাবালক হয় তবেই। বিশেষ মানুষের ক্ষেত্রে দীর্ঘ ফলক গাঁথা হয়। কুণ্ডলা অঞ্চলে নারায়ণপুর— পারালকোট পথের পাশে এইরকম প্রায় ৩৮০ টি ফলক দেখা যায়। দীর্ঘতম ফলকের উচ্চতা প্রায় আট ফুট। কোথাও বা প্রশস্ত বেদী নির্মিত। প্রেতাত্মারা নাকি এখানে বিশ্রাম করেন। তামুক সেবন করেন। সুখ-দুঃখের গল্পগুজব করেন। এখানে প্রেতাত্মাদের উদ্দেশ্যে শুয়োর গরু উপহার দেওয়া হয়। এই প্রথার নাম 'কুটেম'।

মৃত্যুর কারণ হিসেবে অনেক সময়ে ভূতপেত্নীর ক্রিয়াকলাপ বা ডাকিনীতন্ত্রের প্রভাব অনুমিত হয়। পারালকোটে ডাকিনীতন্ত্রের বিশ্বাস প্রবল। মৃত্যুর পরে অশৌচ পালন করা হয়। ব্যবহৃত হাঁড়ি, মাটির বাসন ফেলে দেওয়া হয়। গৃহদেবতার সামনে প্রদীপ জ্বেলে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়। প্রায় হিন্দু নিয়মে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। অভাবী গ্রামবাসীদের সাধ্যমতো খাওয়া দাওয়া। এই প্রথার নাম 'মুক্তা'। বাস্তারে এই প্রথা 'খিলাওন' নামে প্রচলিত। মৃত্যুর দশদিন পরে মৃতের পরিবারে সদ্য বিধবার পুনর্বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। জংলি লতাপাতায় ফুলের চুড়ি, মুল বা কাঁচের চুড়ি পরিয়ে সদ্য বিধবাকে দেবর বা কোন নিকট আত্মীয় পত্নীত্বে বরণ করে।

এই প্রথা বা সংস্কার পালনে একটি নিপুণ শৃঙ্খলা বর্তমান। গ্রামের সরপঞ্চ বা মোড়লকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়। এই নির্দেশ যতই আদিম বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হোক, গ্রামের মানুষ বিনা প্রতিবাদে পালন করে। সন্তানের জন্মকাল থেকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত সরপঞ্চের নির্দেশিত অনুষ্ঠান প্রতিবাদহীন শৃঙ্খলায় প্রতিপালিত হয়।

ডাকিনীতন্ত্র বা ভোজবিদ্যায় আদিবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস। বস্তার অঞ্চলে মারিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ এই সম্পর্কে এক উপকথায় বিশ্বাসী।

নন্দরাজ গুরু ভোজবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। এক সময়ে স্বর্গের দেবতারা এই বিদ্যা আয়ত্ত লাভের ইচ্ছায় গুরু নন্দরাজের শরণাপন্ন হন। নন্দরাজ সাতজন দেবতাকে তাঁর শিষ্যত্ব দানের অনুমতি দেন। নির্জন বনপ্রান্তরে শিক্ষাব্রতী দেবতারা শিক্ষালাভ করেন। এক মারিয়া যুবক শিকারের সন্ধানে সেই গহন অরণ্যে উপস্থিত। সে গুরু নন্দরাজের পাঠ অলক্ষ্যে শুনে কৌতূহলী হয়। গুপ্তবিদ্যা শিক্ষার আকাঙ্খা তাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। পরের দিন থেকে সকলের অলক্ষ্যে বৃক্ষান্তরালে গুরুর পাঠ গ্রহণ করতে থাকে। শিক্ষা সমাপ্ত হলে, দেবতারা গুরুকে নানা উপহার দক্ষিণারূপে দান করে। নানা ভোজ্য উপাচারে গুরু সাত শিষ্যকে আহারে আহ্বান জানান। কিন্তু তিনি বিস্ময়ে দেখলেন, সাত শিষ্যের জন্য বিতরিত আহার্য আটটি পাত্রে

বিভক্ত। গুরু জানলেন নিশ্চিত কোনও অষ্টম ব্যক্তি আমার শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করেছে। শিষ্যদের আদেশ দিলেন, অষ্টম ব্যক্তির খোঁজ নাও। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পরে, গাছের ডালে বসে থাকা সেই মারিয়া যুবককে পাওয়া গেল। গুরু নন্দরাজ যুবককে দেখামাত্র উদ্বিগ্ন হলেন। কোনও মানব এই বিদ্যার অধিকারী হলে, অমরত্ব লাভ করবে। যন্ত্রণামুক্ত হবে। ছদ্ম শরীর ধারণে যখন খুশি অদৃশ্য হবে। মানবের বিনাশ ঘটবে না। মানুষ তখন দেবতাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হবে। নন্দরাজ কৌশলের আশ্রয় নিলেন। তিনি মারিয়া যুবককে বললেন, বৎস তোমার শিক্ষালাভে আমি প্রীত কিন্তু গুরুদক্ষিণা না দিলে শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ হয় না।

যুবক উত্তর দিল, প্রভু আমি অরণ্যচারী, দীন, দরিদ্র। বনের ফল এবং পশু-পাখির মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করি। আপনাকে যোগ্য দক্ষিণা দানের ক্ষমতা আমার নেই।

গুরু জানেন, এই যুবক যদি আপন সন্তানের যকৃত ভক্ষণ করে, অধীত বিদ্যার অপপ্রয়োগ হবে। বিদ্যা ডাকিনীতন্ত্রে রূপান্তরিত হবে। মানুষের যন্ত্রণা বাড়বে, শান্তি বিঘ্নিত হবে। বিদ্যার সুপ্রয়োগ বিনষ্ট হবে। তিনি মারিয়া যুবককে বললেন, তোমার সামান্য দানেই আমি তুষ্ট।

আমার সংগৃহীত কোন দ্রব্য যদি আপনার যোগ্য বিবেচিত হয়, আদেশ করুন। অবশ্যই পালন করব।

গুরু বললেন, তোমার গৃহে একটি পারাবত আছে। সেটি আমাকে উপহার দাও। তোমার কুটীরের চালায় আমি একটি পারাবত দেখতে পাচ্ছি। তোমার ইচ্ছা থাকলে, আমি সেটি গ্রহণ করতে পারি।

কিন্তু আমার পালিত পারাবত নেই।

আমি শিষ্যদের অনুমতি করলে, তারা সেটি সংগ্রহ করে আনবে। তোমার আপত্তি নেই তো?

মারিয়া যুবক আভূমি নত হয়ে বলল, আপনি যেমন বিবেচনা করেন প্রভূ।

গুর নন্দরাজের নির্দেশে দেব-শিষ্যরা মারিয়া যুবকের সন্তানকে হত্যা করে, যকৃতটি গুরুর চরণে নিবেদন করেন। নন্দরাজ সেই যকৃতটি মারিয়া যুবককে ভক্ষণের আদেশ করেন।

গুরুদেবেব হীন চক্রান্ত না বুঝেই মারিয়া যুবক যকৃতটি ভক্ষণ করে। গুরুদেবের আশীর্বাদ নিয়ে ঘরে ফেরে। যকৃতহারা মৃত সন্তান দেখে নিজের প্রতি ঘৃণায় ব্যাকুল হয়। ঘৃণা ক্রোধে পরিণত হয়। ক্রোধ প্রতিহিংসায়। যুবকটি শিক্ষার বিকৃত প্রয়োগে পারদর্শী হয়। অনেক শিশুর যকৃত তার উদরস্থ হয়। ক্রমে সে ক্ষমতাবান, শ্রদ্ধেয় এবং ভীতিপ্রদ মানুষে রূপান্তরিত। তার প্রতিপত্তি ও ক্ষমতায় আকৃষ্ট কিছু যুবক শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। পুরুষানুক্রমে ডাকিনীতন্ত্র চলতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে আরো বহু চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণ শোনা যায়। এই সমস্ত ঘটনা অবিশ্বাস্য এবং রোমহর্ষক। বুকের ওপর নল রেখে যে কোন মানুষের রক্ত শোষে দূর পাহাড়ের কোন ডাকিনী। দৃষ্টিবাণে পঙ্গু করে দিতে পারে অদৃশ্য কোন ডাকিনীর কোপ। অবশ্য বর্তমানে পুলিশি তৎপরতায় ডাকিনীতন্ত্রের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে কিছু মানুষ সন্দিহান। বহু বিচিত্র ও অবিশ্বাস্য কাহিনি পরে মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ায় ডাকিনীতন্ত্রের দুষ্ট প্রভাব অনেকাংশে লুপ্ত।

কিছুদিন আগেও বস্তারে ডাকিনী সন্দেশে কিছু মানুষ জনতার রুদ্র রোষে নিহত।

ভূতে পাওয়া বা দেবসিদ্ধ মানুষ বা অপদেবতার ভয় সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাস প্রচলিত। জিন্দা জিন বা বরমদেওর সাক্ষাৎ পেয়েছে, এমন মানুষ অপ্রতুল নয়। ভূত, প্রেত এবং অপদেবতাদের বিশ্বাস গ্রাম্য মানুষের মনের গভীরে প্রোথিত। এই অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্তিলাভের উপযুক্ত শিক্ষা এখনও সহজলভ্য নয়।

সমাজসৃষ্ট কিছু প্রচলিত সংস্কারের ব্যাপক প্রচলন আছে। চিপকিলি বা টিকটিকির পতন বিপদ সম্ভাবনার ইঙ্গিতবাহী। প্রভাতে জাগরণের পর তেলির মুখদর্শন হলে, দিনমান খাদ্য জোটে না। কাক দম্পতির একত্র আহার অতিথি আগমনের বার্তাবাহী। শিকার যাত্রার পূর্বে স্ত্রী-সহবাস মৃত্যু সম্ভাবনা বা ব্যর্থতার কারণ। কাকর হরিণ বাঘের আবির্ভাব সম্পর্কে গ্রামবাসীকে আগাম সতর্ক করে। কাকর হরিণ তাই অবধ্য। দর্শনমাত্র তাকে ঘাস ও ফল উপহার দেওয়া বিধেয়। মহামণ্ডল নামের এক দীর্ঘাকৃতি সাপ গভীর শ্রদ্ধায় পূজিত। দুধ, কলা, মাছ ইত্যাদি নিবেদিত হয়। কাক বা কোন, বন্য প্রাণী নিবেদিত নৈবেদ্য স্পর্শ করে না। সর্পদেবতা সকলের অগোচরে হৃষ্টচিত্তে নৈবেদ্য গ্রহণ করে।

সংস্কারের প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তায় এই অরণ্যে মানুষ অটল। কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য নয়। এমন কি সূর্যের আবর্তন ও পৃথিবীর স্থিরতায় তারা অধিক বিশ্বাসী। দাবানল, অনাবৃষ্টি বন্যা ইত্যাদি দেবরোষ রূপে বিশ্বাস কবা হয়।

অস্থি-রক্ষা প্রথা

আগে অস্থি রক্ষা করিয়া রাখার প্রথা ছিল না। বুদ্ধের মৃত্যুর পব তাঁর অস্থি রক্ষা করা হয় এবং অস্থি ও ভস্ম বিভক্ত কবিয়া নানা স্থানে তাহা বক্ষা কবা হয় এবং সেই সকল ভস্ম ও অস্থিব উপব স্তূপ নির্মাণ করা উল্লেখ পাওয়া যায়। এই স্তূপ ভাবতবর্ষের চারিদিকে হইতে লাগিল এবং অর্হৎ বা সাধুদিগের মৃত্যু হইলে দাহ করিয়া বা মৃৎ-সমাধি দিয়া তাহার উপর স্তূপ নির্মাণ করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সাধারণ লোক নিজেব পিতা-মাতার জন্যে স্তূপ করিতে আরম্ভ করিল। বিক্রমপুব একসময় বৌদ্ধদিগেব কেন্দ্র ছিল এইজন্য বিক্রমপুরে স্তূপ ও মঠবাড়ী প্রথা এখনও প্রচলিত। ক্রমশঃ স্তূপের আকার খর্ব হইয়া ছোট আকার ধারণ করিল। পরে যখন বৈষ্ণব ধর্ম প্রবল হইল তখন এই খর্বাকৃতি স্তূপের উপর তুলসী গাছ বসিল। এইরূপে শবদাহের স্থানে তুলসী মঞ্চ বা গাছ আবির্ভূত হইল। কিন্তু প্রকৃত তুলসী গাছের উৎপত্তি কথা বিশেষ জানা যাইতেছে না।

❑ কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা — মহেন্দ্রনাথ দত্ত / ২য় সংস্করণ / ১৯৭৫

সৌজন্যে ঃ কানাই কুণ্ডু প্রণীত- 'ছত্তিশ গড়ের লোকজীবন ও সংস্কৃতি

জামশেদপুর : সুবর্ণরেখা শ্মশানঘাট এবং খড়কাই পার্বতীঘাট

আবীর কর

"সবাই সমান আঁতুড় ঘরে, বলের দেমাক মিছাই করা
সবাই সমান শ্মশান ধূলে, বড়াই ধুয়া মিছাই ধরা।"

ছান্দসিক কবি তাঁর জীবন দর্শনকে এই ভাবেই ছন্দে গেঁথেছেন, বাস্তবিক শ্মশান যেন সেই ভূ-খণ্ড যেখানে কোনো শ্রেণি বৈষম্য নেই। আঁতুড়ঘর-এ সদ্যোজাত শিশুর বিপ্রতীপে শ্মশানগামী ব্যক্তিব অসহায়ত্বের সাদৃশ্যে মধ্যদিনের পারস্পরিক লড়াইকে অনর্থক মনে হয়। কিন্তু এই সাদৃশ্য অনুভবকারী ব্যক্তি তো সাধারণ পঙ্‌ক্তির নন, ঠিক যেরকম অসাধারণত্ব ছড়িয়ে থাকে আঁতুড়ঘর এবং শ্মশানভূমির উপর। স্থানমাহাত্ম্যে সাধারণ মানুষও ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকাবী হয়, আর সে ক্ষমতা থেকে কোনো অংশে কম নয় জন্মানোর কালে দাইমা এবং অমোঘ মৃত্যুর সময়ে ডোমের ভূমিকা। আজ এই একুশ শতকের যন্ত্রযুগেও এরা শেষ পর্যন্ত টিকে আছে, বলা ভাল আধুনিকতা এদের কাছে হার মেনেছে। গ্রামীণ জীবনে সমাজের এই দুই অন্তেবাসী মানুষগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে নিয়ন আলোয় মোড়া আধুনিক শহরেও যে কি প্রকার ঋণী তা টের পেলাম একটি শহরের শ্মশান পরিক্রমায়।

পশ্চিমবঙ্গ লাগোয়া শহর জামশেদপুর। রাজ্য সীমানা নিরিখে ঝাড়খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। ইস্পাতনগরী জামশেদপুরে জীবন-জীবিকার তাড়নায় বিভিন্ন জন ও জাতির এক অনন্য সমাবেশ। আর এই নানা জাতির মানুষের অন্ত্যেষ্টির আয়োজনে শহরের প্রধান দুটি শ্মশানভূমি সদ্য জাগ্রত।

সুবর্ণরেখা বার্নিং ঘাট (SUBARNAREKHA BURNING GHAT)

সুবর্ণরেখা নদীর তীরে স্বাধীনতার সমান বয়সী এই শ্মশানঘাট। বর্তমানে সুসজ্জিত, পাঁচিল তোলা শহুরে 'বার্নিংঘাট', দাহ করার ব্যবস্থাপনায় কাগজপত্র, নিয়মকানুন, প্রয়োজনীয় অর্থ যথাযথ। কিন্তু মূল শ্মশানক্ষেত্রটি স্বমহিমায় নিজেকে মেলে ধরেছে। রেলিং যুক্ত চুল্লি, শ্মশান পরিভাষায় শ' ছ'টি। কয়েকবছর হল দুটি ইলেকট্রিক চুল্লির ব্যবহার শহুরে বার্নিংঘাটের আধুনিকতা এবং ব্যস্ততা সর্বোপরি দূষণ মুক্ত(!)-র পরিচয় বহন করছে। ইলেকট্রিক চুল্লি কক্ষ সংলগ্ন একটি বৃহৎ বিশ্রামাগার অর্থাৎ মড়া ঘর, মড়া সহ তার আত্মীয়-স্বজনের আশ্রয়। যার দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে স্বামীজি, লোকনাথ, নিগমানন্দ, বুদ্ধর মূর্তি এবং তাদের জীবন অভিজ্ঞতার নির্যাসবহ 'জীবন মৃত্যুর' আশ্চর্য দর্শন। শ্মশানক্ষেত্রটির অনতিদূরে সুবর্ণরেখা নদীর কোল ঘেঁষে শ্রীশ্রীপঞ্চবটি শ্মশানকালী। মৃন্ময়মূর্তি, মায়ের পুজোতে পুরোহিত নিযুক্ত,

প্রয়োজনে যিনি শবশুদ্ধির পুজো আচ্চাও করেন। যদিও আত্মার কল্যাণে. শবশুদ্ধিতে কণ্ঠা পণ্ডিত অনিবার্য, আর প্রয়োজন পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য সহযোগে কানাকড়ি, তিল, চন্দনকাঠ। এই পুজোর পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে জাতি ভিত্তিক, এমনকী শব আনয়ন, শব সাজানো, চিতা প্রজ্বলনেরও রকমফের ঘটে। জামশেদপুরে শিল্প কেন্দ্রিক জীবন-জীবিকার বিবিধ সংমিশ্রণে এই বৈচিত্র্য অন্ত্যেষ্টিতেও বর্তমান। যেমন তেলিহি সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের প্রিয়জনের মৃতদেহ পালকিতে বয়ে নিয়ে আসে। মৃত ব্যক্তি জীবিতকালে আমিষপ্রিয় থাকলে বা অন্তিম ইচ্ছায় মাংস খেতে চাইলে তার চিতার আগুনে জীবন্ত মুরগি উড়িয়ে দেওয়া হয়।

সুবর্ণরেখা বার্নিংঘাটের একটি পরিচ্ছন্ন কমিটি আছে। যার সভাপতি এই শহরের বিখ্যাত আইনজীবী শ্যামল চৌধুরি, সম্পাদক কে.পি. মোদী। শ্মশান ঘাট এবং সংস্কারের দায়িত্বে আছেন ডি.ডি. মাহাতো, এইচ.সি. মাহাতো এবং বিপিন সিং সর্দার। এছাড়া চারজন ডোম এবং একটি পুরোহিত পরিবার সুবর্ণরেখা শ্মশানঘাট নির্ভর। এছাড়া মাঝে মাঝে তান্ত্রিক, কাপালিক গোত্রের এবং তাদের ভিড়ে আধপাগল ভবঘুরেরাও চুল্লির শেডে আশ্রয় নেয়। তবে তারা গেঁড়ে বসার আগেই বার্নিংঘাট কমিটির সজাগ দৃষ্টি থাকে তাদের উপর। আর সার্বিক পরিচ্ছন্নতার কারণে বার্নিংঘাট কমিটির তহবিলে 'ঘাট জমা' বাবদ মৃতদেহ পিছু ২৫ টাকা জমা দিতে হয়। চুল্লিতে দাহ করতে লাগে সংস্কারের ২৫ টাকা সহ আরো ৪০০ টাকা। সুবর্ণরেখা বার্নিং ঘাট কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদনের পরিসংখ্যান মতে দৈনিক গড়ে ৭/৮টার মতো শব এখানে দাহ করা হয়। তবে মৃতের পরিমাণ শীত গ্রীষ্ম ভেদে ভিন্ন রকম হয়। জামশেদপুর, ঘাটশিলা, পটমদা, চাণ্ডিলের অধিকাংশ মড়া এখানে পোড়ানো হয়।

সুবর্ণরেখা দাহ ক্ষেত্রের উল্লেখ্য বিষয় এর পরিচ্ছন্নতা। ছ'টি লোহার রেলিং যুক্ত শ'-এর এদিক ওদিক কিছু কাঠ কয়লা ছড়ানো ছাড়া বাকি জায়গা পরিষ্কার নিকানো, অধিকাংশ ভূমিটি শান বাঁধানো। এরই সূত্র ধরে শান বাঁধানো সিঁড়ি নেমে গেছে সুবর্ণরেখায়, যার জলে মৃতের আত্মীয়রা অবগাহন করেন। মৃতদেহের শুদ্ধি ঘটানো, দাহ শেষে চুল্লি নেভানোর প্রয়োজনেও সুবর্ণরেখা। মূল শ্মশানক্ষেত্রটি পরিষ্কার ও মুক্ত রাখতে দাহের কাঠ কয়লা সুবর্ণরেখার পাড়ে স্তূপীকৃত হয়েছে। এমনকী অপরিণত মৃতদেহ বা বেওয়ারিশ লাশের অন্ত্যেষ্টি যখন অন্য শ্মশানভূমিতে স্থান হয় না তখন সুবর্ণরেখা তার অপার-মমতায় সেই সব হতভাগ্যদের ঠাঁই দিয়েছে তার তীরে। সর্বোপরি যে সব মৃতদেহের মালিক ঘাট জমা বাবদ ২৫ টাকা দিতেও অক্ষম তাদের জন্য সর্বদা উদার সুবর্ণরেখা নদী তীর।

তারা মন্দির সমাধিস্থান

'সুবর্ণরেখা বার্নিংঘাট'-এর প্রাচীর সংলগ্ন প্রায় ৮/১০ বিঘা জমি জুড়ে তারা মন্দির সমাধিস্থান। উল্লেখ্য, এ সমাধিস্থল শুধুমাত্র হিন্দু মৃতদেহের জন্য। অধিকাংশ সময় শিশু ও কিশোরের শব দাহ না করে সমাধি দেওয়া হয় বা মৃতের আত্মীর স্বজনেরা দাহ স্থানে মৃতের আত্মার উদ্দেশে কোনো স্মৃতি ফলক, বেদি নির্মাণ করেন, যা 'বার্ণিংঘাট'-এ স্থান সংকুলানের আশঙ্কায় দেওয়ার নির্দেশ নেই—তারা তারামন্দির সমাধিস্থলে ভিড় করেন। এখানে শুধু যে সমাধি দেওয়া হয় তা নয়, দাহেরও সুযোগ আছে। তবে কোনোরূপ স্থায়ী চুল্লির ব্যবস্থা নেই,

মৃতের আত্মীয় পরিবার চুল্লি নির্মাণ করে দাহ করতে চাইলে সঞ্জিত সাধুর দল সাহায্য করে, সাহায্য বাবদ কোনো দাবি নেই, দান চলতে পারে। এই অব্যবস্থার মধ্য দিয়েই এই ব্যবস্থা চলে আসছে অনাদি কাল থেকে, যার বয়স নির্ণয় দুঃসাধ্য। তবে শ্মশানভূমির উপর বগলা শ্যামা মন্দিরটির বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হল। ভিতরে ছ'ফুট দৈর্ঘ্যের মৃন্ময়ী মূর্তি। অদূরেই একটি খাপরার চালাঘর, যার অভ্যন্তরে শিব-কালীর মিশ্র বিগ্রহ, একটি নরমুণ্ডর করোটি এবং বেশ কিছু অস্থি, দুটি সিঁদুর চর্চিত অস্থি বিগ্রহের পাদদেশে আড়াআড়ি রাখা— সঞ্জিত সাধুর সাধনাকক্ষ। বাতাসে গাঁজাব কটু গন্ধ এসে স্থানটির শ্মশান চরিত্রটিকে প্রকট করে তুলেছে।

সর্বোপরি বয়সে নয়, স্থান মাহাত্ম্যে এবং শ্মশান সুলভ গরিমায় কোথায় যেন সুবর্ণবেখা বার্নিং ঘাট থেকে তারামন্দির সমাধিস্থল উদার এবং বৃহৎ। টুসু এবং দীপাবলির রাতে সেখানে আলোর বন্যা ছোটে। গাঁজার ধোঁয়ায় ভারী হয়ে ওঠে বাতাস।

পার্বতীঘাট শ্মশান (BISHTUPUR PARBOTIGHAT)

জামশেদপুর শহরের বিষ্টুপুর এলাকার শ্মশানভূমি পার্বতীঘাট। সমগ্র শ্মশান স্থানটিকে খড়কাই নদী তার বাহুবেষ্টনীর মধ্যে ধরে রেখেছে। শ্মশানের সঠিক বয়স কারো জানা নেই, তবে সুবর্ণরেখা বার্নিং ঘাটের চেয়ে এটি বয়সে প্রবীণ। বলা যায় টাটানগরের সমবয়সি। কথিত আছে কোনো এক বাঙালি দত্ত পরিবার নাকি এই শ্মশানভূমিটি দান করেন। তারপর থেকে ৫/৬ বিঘার শ্মশানজমিটি গামারিয়া, পরশুডি, জুগসলাই, কদমা, বিষ্টপুর, আদিত্যপুর এলাকার মানুষের হিতার্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

মূল শ্মশানভূমিতে কোনোরকম মূর্তিপূজার বালাই নেই। দাহক্ষেত্রে কোনো জাত পাতের বিচার নেই। হিন্দুধর্মাবলম্বী যে কোনো জাতের মৃতদেহ, তাদের আত্মীয় স্বজনের নিযম মেনে দাহ করা হয়। স্থায়ী চিতা চারটি। দাহের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ ২০০ টাকা কুইন্ট্যাল দরে খোদ পার্বতীঘাটেই পাওয়া যায়। ১৯৯৬ সাল থেকে ১১,৬০০ ভোল্টের একটি বৈদ্যুতিক চুল্লির ব্যবস্থাও হয়েছে, যেখানে দাহ করতে গেলে শ্মশানঘাট জমা ২৫ টাকার সঙ্গে বিদ্যুৎ বিল হিসাবে আরো ৪০০ টাকার প্রয়োজন। পার্বতীঘাট শ্মশানেও একটি নির্দিষ্ট কমিটি বর্তমান যার সভাপতি পদে প্রেম সেহগল এবং সম্পাদক আসনে জামেশেদপুর শহবের বিশিষ্ট বাঙালি নীরু চ্যাটার্জি। এছাড়া সংস্কার, পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বে এস. সরকার। চিতা সাজানো, শ' নির্মাণ এবং দাহতে সাহায্য করার জন্য ডোমের ভূমিকায় শোনু, রামু। মৃতের পরিবারের কাছে তাদের কোনো দাবি নেই। তারা স্বেচ্ছায় যা দেয় তাই সই। তাদের মনের কথা ওই নেশাটুকু হলেই তারা খুশি। দৈনিক ১২ ঘণ্টার অধিক অনলস পরিশ্রমের বিনিময়ে তারা ৪০০ টাকা পায় মাসোহারা। বৈদ্যুতিক চুল্লি নির্মাণের পরেও তাদের প্রয়োজন, চুল্লির মধ্যে দেহ চলে গেলেই দাহ পর্ব শেষ হয় না। মাঝে মাঝেই 'খুদনি' হাতে ছাই ঝাড়তে হয়। মড়া যতক্ষণ না পুরো ছাইয়ে ঝেড়ে ফেলা হচ্ছে ততক্ষণ ডোমেদেব অবসর নেই। তাদেব পরিভাষায়— 'ওই বিটি ছায়ের কমর আর বেটা ছায়ের ছাতি পুড়তে বহুৎক্ষণ লাগে।'

বৈদ্যুতিক চুল্লি কক্ষ সংলগ্ন একটি বৃহৎ হল ঘর, যেখানে প্রাথমিকভাবে মৃতদেহ রাখা, ঝড়-জল-গরমে মৃতের আত্মীয়দের আশ্রয়ও। নিয়ম মেনে দেওয়ালের চারপাশে অমৃতকথা, সারকথা, মহান বাণী। পার্বতীঘাট শ্মশানেও কোনো তান্ত্রিক, কাপালিকের ভিড় নেই। মাঝে মাঝে তাদের আগমন হয় বটে, তবে কর্তৃপক্ষের আদেশে স্থায়ী বাস ঘটে না। সমাধি, স্মৃতি ফলক নির্মাণের ব্যাপারেও কমিটি বছর দশেক হল বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে—স্থানাভাবের কারণেই। পুরানো কিছু ফলক খড়কাই-এর কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে, যাদের বুকে মৃতদের নাম-ধামের সঙ্গে জন্ম-মৃত্যুর সালটি পার্বতীঘাট শ্মশানের প্রাচীনত্বের দিকটি নির্দেশ করছে। সুবর্ণরেখার মতো এখানেও শ্মশানজমিটির সঙ্গে খড়কাই-এর ঘনিষ্ঠতা আছে। জমিটির সূত্র ধরে সিঁড়ি নেমে গেছে খড়কাইয়ের জলে। এছাড়া তার পাশে একটি প্রাচীন বটগাছ তাতে মানতের অগমন ঢিল সুতো বন্দি হয়ে দুলে চলেছে, অস্থির বাতাসের ধাক্কায়।

"জীবন মে আপ কিতনি ভি যাত্রা করো, আপকি অন্তিম যাত্রা শ্মশানযাত্রা হি হ্যায়।"

'মৃত্যু' একটি অনিবার্য শব্দ। জীবনের কাছে অমোঘ তার আবেদন, সর্বোপরি জয় তার সুনিশ্চিত। মাঝখানে জীবনযুদ্ধে জয়-পরাজয়ের বাসনা। আঁতুড়ঘর এবং শ্মশান দুই সীমানাজ্ঞাপক দণ্ডের মাঝে আমাদের জীবন। তাই অন্তিম যাত্রা শ্মশান যাত্রাই। পরবর্তী যাত্রা যদি কিছু থেকে থাকে সে তো বিদেহী আত্মার নবজীবন লাভের যাত্রা।

মৃত্যুর সমান্তরালে শ্মশানও আমাদের অলঙ্ঘনীয় স্থান। যেখানে সত্যিকারের সাম্য। কোনোরকম ভেদাভেদ নেই, নেই জাতপাতের বালাই। সর্বোপরি স্থানভেদে সর্বত্রই শ্মশান এক অভিন্ন বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে আছে। তারাপীঠের শাল নদীর তীরবর্তী শ্মশান আর সুবর্ণরেখা নদী তীরের শ্মশান এক হয়ে যায় এব উদারতায়, এখানে সেখানে কাঠকয়লা ছড়ানো ছিটানো স্বাভাবিক প্রদর্শনে, ডোমেদের আশ্চর্য জীবন দর্শনে, কাপালিক তান্ত্রিকদের নরমুণ্ডী সাধনায় আর জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীন এই মানুষগুলির ভয়ঙ্কর জীবন যাপনের বাস্তবতায়।

কৃতজ্ঞতা : সুবর্ণরেখা বার্নিং ঘাটের প্রহরী শশীভূষণ মাহাতো, মন্টুদা এবং সন্টু—যাকে ছাড়া এই প্রতিবেদন লেখা সম্ভব ছিল না।

লেখক পরিচিতি : শিক্ষক, সাকচী উচ্চবিদ্যালয়, ধলভূম রোড, জামশেদপুর।

নরমুন্ড শিকারিদের শ্মশান

জয়ন্ত সরকার

সময়টা ১৯৭৬ সালের শীতকালে।

মুঙনাই আমাকে তাদের গ্রাম ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিল। প্রায় আড়াইশ'র মত বাড়ির গ্রাম এই পঙচাও। উত্তর-পূর্ব ভারতে অরুণাচল প্রদেশের তিরাপ জেলার পূর্ব দিক যেখানে মইনমারের সীমারেখা ছুঁয়েছে, সেখানে পাহাড়ের কোলে একেবারে সুনসান ভাবে শুয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে জল ভরা কালো সাদা মেঘ গ্রামের ভেতর দিয়ে আনাগোনা করে নিস্তব্ধতা আরো স্যাঁতসেতে করে তুলছে। মুঙনাই ওয়াঙসা এই গ্রামের একমাত্র যুবা যে স্মরণকালের মধ্যে গ্রাম ছেড়ে বাইরে গেছে চাকরির সন্ধানে। তাও আবার যে সে চাকরি নয়। ফৌজে। মোটামুটি হিন্দিটা বলতে শিখেছে।

ভাবতে বেশ ভাল লাগে যে এই কিছুকাল আগেও যে ওয়াঙচু আদিবাসীদের কাছে নরমুন্ড শিকার সমাজে অসাধারণ গুরুত্ব পেত তাদেরই একজন এখন আমাদের সৈনিক।

পাহাড়ের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত মাটি ঘেঁসা টক্কু পাতার ছাউনির ঘরগুলো শুয়ে রয়েছে। মোটামুটি একই রকম দেখতে সব। শুধু গ্রামের চৌফাব (রাজা) ঘর বাইরে থেকে দেখলেই চেনা যায়. অন্যের থেকে একবারেই আলাদা। পঙচাও ছাড়া এই রাজার অধীনে। আরও একটি গ্রাম আছে নাম বোনিয়া।

পাহাড়ের ওপরে গ্রামের সীমানার ভিতরে এক জায়গায় বড় বড় গাছপালার নিচে অনেক খানি ছোট ছোট ঝোপঝাড়। দেখলাম তারই কিছুটা জায়গা পরিস্কার করে বাঁশ আর কাঠ দিয়ে তৈরি প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু একটা মাচা রয়েছে। অনেকটা তেল ঢালার চোঙের মত তবে নিচের দিকটা খুব একটা সরু নয়। এই চোঙের ওপরে মাচা তৈরি করা রয়েছে। মাচাটার চারপাশ থেকে খুঁটি উঠে গেছে। সে গুলোতে সরু সরু গাছের ডাল আটকান। আর সমস্তটার ওপরে পাতা দিয়ে মাচার ওপর ছাউনি করা রয়েছে। এই মাচার ঠিক পিছন দিকেই রয়েছে গাছের ডাল আর পাতা দিয়ে ঢাকা একটা ছোট্ট চৌকো ছাউনি। একটু ঠাহর করে দেখলাম সেখানে বেড়ার গা থেকে ঝুলছে মিথুন, গরু, হরিণ, শুয়োরের মাথার খুলি, ছোট ছোট শুকিয়ে যাওয়া কুমড়ো।

মাচার গায়ে পোঁতা একটা খুঁটিতে টাঙানো রয়েছে ওয়াঙচুদের পরার মাথার টুপি। লম্বা একটা দা।

বেশ পচা দুর্গন্ধে ভরে আছে জায়গাটা।

মুণ্ডনাই এর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে বলল-আমাদের গ্রামের একটা 'গুকখা'। তোমাদের শ্মশান। যে ঘেরা জায়গাটা দেখছ ওটাকে আমরা বলি 'গুক'! এখানে মরা মানুষের শরীর রেখে দেওয়া হয়। ঐ যেমন ঢাকা দেওয়া রয়েছে।

মৃতদেহ শুইয়ে রাখা হয় শুনে আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। হয়তো আমার মুখ চোখ দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল ছেলেটা। তাই বলেছিল — ''তোমাদের মত আমরা মরে যাওয়া মানুষকে আগুনে পোড়াই না। মাটিতে পুঁতেও দিই না। রেখে দিই 'গুকে'র মাথায়। এই 'গুকে'ই তো কিছুদিন আগে রাখা হয়েছে এই দেহটা।

মাংস পচা গন্ধটা যেন অনেকক্ষণ থেকেই পাচ্ছিলাম। এখন আরো ঘন হয়ে ঢুকে পড়ল নাকে। তবু প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে মাচার যতটা সম্ভব কাছাকাছি যাওয়া যায় গিয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া শরীরটা দেখতে চেষ্টা করলাম। ঢাকা দেওয়া রয়েছে পাতা দিয়ে। তবে মাথার দিকটায় বেশ অনেকখানি চুল বেরিয়ে আছে। মাথাটা গ্রামের দিকে ফেরান। পা গ্রামের সীমানার বাইরের দিকে।

এর পাশে রয়েছে আর একটা ছোট্ট পাতার ছাউনি। বেশ কিছু কাঠ ধিকি ধিকি করে জ্বলছে। মুণ্ডনাই এর কাছ থেকে জানলাম প্রথম যেদিন মৃতদেহ এনে মাচায় রাখা হয় তার পরদিন থেকে রোজ 'গুকে'র কাছে কাঠ কুটো দিয়ে আগুন জ্বালায় পরিবারের লোক। এই রকম আগুন প্রতিদিনই জ্বালান হবে, যতদিন না মাথার খুলিটি আদালা করে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রতিদিনই পরিবারের কেউ না কেউ এখানে এসে মৃতের শরীরের ঢাকনা সরিয়ে দেখে মাংস খুলে পড়ে কঙ্কাল বেরিয়ে এসেছে কিনা।

মাথার খুলিটি যখন আলাদা করার অবস্থায় এসে যাবে তখন 'গম্পা'কে মানে গ্রামের পুরুতকে খবর দেওয়া হবে। 'গম্পা' মৃতের পরিবারের লোকজন নিয়ে 'গুক' এ মৃতের কঙ্কাল থেকে খুলিটি আলাদা করে নেবে।

খুলিটি আলাদা করে নেওয়ার দিন মৃতের পরিবার গ্রামের বুড়ো মানুষদের জন্যে ভোজের ব্যবস্থা করবে পরিবারের লোকজন। পরিবারের সবাই, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব ঐ দিন 'গুক' এ মাংস আর এক দোনা 'জু', মানে ঘরে তৈরি মদ নিয়ে গিয়ে মৃতের খুলির উদ্দেশ্যে বলবে এই শেষবারের মত তোমাকে আমরা খাবার দিচ্ছি। এরপর আমাদের কাছ থেকে তুমি আর কিছু আশা করো না। আমাদের স্বস্তিতে থাকতে দাও।

পরে জেনেছি নরমুন্ডর সঙ্গে যেহেতু ওয়াঙচুদের অনেক বিশ্বাস আর সংস্কার জড়িয়ে রয়েছে তাই মৃতের শরীরকে এই ভাবে পচিয়ে তার মাথার খুলিটি নিয়ে এসে সযত্নে বাঁশের বা মাটির ঢাকনা দেওয়া পাত্রে মাটির তলায় পরিবারের অন্য মৃতের খুলির সঙ্গে রেখে পাথর দিয়ে গর্তের মুখ চেপে দেয়। এই জায়গাটাকে এরা 'গোখামুপু' বলে।

বছরে, দু'বছরে এমনকী সামর্থ্য না থাকলে বেশ কয়েক বছর পরেও এ গুলিকে 'গোখামুপু' থেকে বের করে নিয়ে 'গম্পা'কে ডেকে তাদের উদ্দেশে খাবার উৎসর্গ করে।

দম বন্ধ করে বেশিক্ষণ থাকায় বেশ কষ্ট হচ্ছিল। মুণ্ডনাই যেতে চাইল। বলল-চল তোমাকে 'গুকখা' দেখাব। এখানে 'বদবু' আসছে। ফিরে আসতে আসতে বলল, ''আমাদের সমাজে

মারা যাওয়ার পর দেহটাকে পরিবারের কয়েকজন মিলে ঘরের একটি কোণে নিয়ে গিয়ে রাখে। একটা 'ডাম' মানে বাঁশের চাটাই নিয়ে আসে একজন। যদি ঘরে 'ডাম' না থাকে তাহলে বাড়িব একজন তক্ষুণি চাটাই বুনতে বসে যায়। চাটাই এর ওপর শুইয়ে দেয় শরীরটাকে। একদিন রেখে দেয় যাতে দুর থেকে খবর পেযে লোক আসতে পারে। গাঁয়ের 'গম্পা'কে খবর দেওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে।

'গম্পা' এসে প্রথমেই মরা মানুষটির দেহটাকে বসিয়ে 'জু' দিয়ে ঘরের মধ্যেই মুখ ধুইয়ে দেয়। মাথাব চুল কেটে ঐ যেমন চুল দেখলে সেই রকম শুধু পিছনের দিকে টিকির মত করে রেখে দেয়। পরে মাথার খুলি নেওয়ার সময় এই চুল ধরে টান দিলে সেটা বেরিয়ে আসে।

চুল কাটা হয়ে গেলে 'গম্পা' মৃতের নাম করে খাবার দেয়। পাতার তৈরি প্যাকেট 'জাম্পো তোমকোপু'র মধ্যে অল্প অল্প খাবার পরিবারের লোকেরা মড়ার কাছে রাখে।

এই সব চলতে থাকাব সময়ই পরিবারের লোকের সঙ্গে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব গ্রামের লাগোয়া কোন একটি 'গুকখা'র কাছে গিয়ে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে একটা 'গুকে'র জায়গা তৈরি করে ফেলে।

গ্রামের বুড়োদের দু'চারজনকে নিয়ে 'গম্পা' বাঁশ আর বল্লি কাটায় হাত লাগায়। তারপরে যে রকম দেখলে ঐ রকম 'গুক গাইপু' মানে মাচা চটপট তৈরি কবে ফেলে।

মৃতেব উদ্দেশে খাবার দেওযার পরে তার পরিবারের লোকের সাহায্যে দেহটি তুলে ধরে। গাঁয়ে সব থেকে বয়জ্যেষ্ঠ পুরুষটিই সাধারণত মরা মানুষটির মাথা তুলে ধরে বলে- এবার তোমার ঘর ছেড়ে যাওয়ার সময় হযেছে, তৈরি হও।

মৃতদেহ ঘরেব বাইরে নিয়ে যাওয়ার আগে আত্মীয় স্বজনরা পাতায় মুড়ে খাবার আর বাঁশের চোঙায় ঘরে তৈরি মদ 'জু' নিয়ে আসে। 'জু' ভর্তি বাঁশের চোঙাগুলো 'গম্পা' তার থেকে অল্প একটু করে মড়াব ঠোঁটের ওপরে ঢেলে দেয়।

দেহটি ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার সময় 'গম্পা' মরা মানুষটির উদ্দেশে বলে তোমাকে রোজ খাবার দেওয়া হবে, তুমি পরিবারের লোকজনকে বিরক্ত কোর না।

দেহটি এরপর ঘরে তৈরি বাঁশেব চাটাই 'ডাম' দিয়ে ঢেকে বেতের ছিলকা দিয়ে বেশ শক্ত করে বেঁধে ফেলে।

পঞ্চাওয়ের নিয়মে গ্রামের দু'চার জন বুড়ো মানুষ এই বেত জঙ্গল থেকে নিয়ে আসে। তারপর 'গুকে'র দিকে যাওয়া শুরু হয়।

'গম্পা' মরা মানুষটির ব্যবহাব করা চামড়ার তৈরি লড়াই এর ঢাল, শক্ত বেতের তৈরি মাথার টুপি নিয়ে 'গুকখা'র দিকে রওনা হয়।

সাধারণত কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে 'গুকে'র মাচায় শুইয়ে দেয়।

মুঙনাই এর কথা শুনতে শুনতে আমরা একটি পুরনো 'গুকখা'র সামনে এসে দাঁড়ালাম। এখানে দেখলাম কতগুলো হাড়গোড় ছড়ানো রয়েছে 'গুক গুপাই'এর ওপরে। মাথার খুলিটা নিয়ে গেছে।

দু'টো কাঠের তৈরি মূর্তি 'গুক' এর কাছে রয়েছে। মুঙনাই বুঝিয়ে দিল, একটা রাখা হয়েছিল

মাথার দিকে অন্যটা পায়ের দিকে। এগুলো হচ্ছে 'সাথঙ'। একটা মরা মানুষটির জন্যে আর একটা অপদেবতাদের জন্যে যাতে কোন ক্ষতি না করে।

'গুকে'র এক ধারে প্রায় ভেঙে পডা একটা পাতার ছাউনি দেখিয়ে মুঙনাই বলল, পাহাড়ের গায়ে যখন হালকা ছায়া নেমে 'গুকগুপাই' এ ঢাকা দেওয়া শরীরটায় এসে পড়ে তখন মৃতের পরিবারেব লোকেরা এর নিচে এসে বসে কাঁদতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ কান্নার রেশ পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়ে মৃতকে জানান দেয়।

এখানেই শেষ নয়।

পরদিন নুন, লঙ্কা, চাল আরো কিছু খাবার পাতায় মুড়ে বাঁশের চোঙায় ভরে পরিবারের একজন 'গুকগুইপা' এর পাশে পোঁতা খুঁটিতে ঝুলিয়ে রেখে আসে।

বিশ্বাস করে পুর্বপুরুষদের কাছে যাওয়ার জন্যে পথে এগুলোর প্রয়োজন হবে।

পাঁচ দিনের মাথায় গাঁয়ের সকলকে খাওয়ান হয়। এ ক'দিন গ্রামের কেউ খেতি করে না। পুবো গ্রামে অশৌচ থাকে।

পঙচাও বেশ বড়সড় গ্রাম। 'গুকখা' ও তাই অনেক গুলো। প্রত্যেক 'গুকখা'তে ওয়াঙচু সমাজের চারটি ভাগ ওয়াঙহাম, ওয়াঙসা, ওয়াঙসু আর ওয়াঙপানদের জন্যে আলাদা আলাদা জায়গা আছে যেখানে মৃতদেহ রাখার জন্যে 'গুকগুপাই' তৈরি করা হয়।

তবে 'সম্পা', মানে রাজা যখন মারা যায় তাকে কিন্তু তার ঘরের ঠিক খুব কাছেই 'গুক' তৈরি করে রাখা হয়। 'সম্পা'কে তাঁর মৃত্যুর পরেও কাছে রাখতে চায়।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা গ্রামের ভিতরে 'সম্পা'র ঘরের কাছে এসে পৌছুলাম। ঘরের অল্প একটু দূরে বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে ছোট ছোট বল্লি দিয়ে খেরা জায়গাটা দেখিয়ে মুঙনাই বলল ওটা 'সম্পা'র 'গুক'। কাছে গিয়ে দেখলাম পুরোন একটা ভাঙ্গা মাচাও রয়েছে। তবে সব থেকে যা বেশি নজবে পড়ল তা হল দু'টো প্রায় ছোটখাট চেহারার মানুষের সমান কাঠেব মূর্তি। রোদে জলে ধুয়ে গেছে তার গায়ের রঙ। একটু আগে অন্য 'গুক' এ দেখেছিলাম দেড় দু'ফুট এর মত লম্বা কাঠের মূর্তি। 'সম্পা'র 'গুক' এর গুলো চার ফুটের থেকে কোনমতেই কম হবে না। আমাদের দেখে 'সম্পা'র ভাই ঘরের দাওয়া থেকে উঠে এল। কৌতূহল মেটাতে ওকে বললাম এত বড় মূর্তি কে বানায়? আমরাই তৈরি করি। বলল ও। এগুলো একদিনের মধ্যেই বানাতে হয় মানুষ মারা যাওয়ার পরেই। একদিনে এত বড় দু'টো মূর্তি! বেশ আশ্চর্য হলাম।

কখনো কখনো 'গম্পা'র ঘরে থাকে। না থাকলে সঙ্গেই সঙ্গেই এই 'সাথঙ' তৈরি করতে হয়। শুধু তৈরি করা নয়। ঐ দেখ একজনকে আমাদের যোদ্ধার মত সাজান হয়েছে। দেখলাম। মাথায় রয়েছে শুয়োরের দাঁত আর পাখির পালক দেওয়া টুপি। কাঁধে বন্দুক, হাতে ওয়াঙচু দা। গলায় প্রচুর ঘাস আর পুঁতির মালা। কাঁধে একটা সুন্দর রঙিণ ওয়াঙচুদের ঝোলা। অন্য মূর্তিটির এক হাতে দা আর অন্য হাতে একটি ছোট্ট কাঠের তৈরি নরমুন্ডের প্রতীক। মাচার গায়ে পড়ে আছে দু'টো বর্শা, একটা চামড়ার লম্বা ঢাল। এটা কার 'গুক'? প্রশ্ন করলাম।

আমার বাবার বাবার। এক বছর আগে মারা গেল। বলল ও।

'সম্পা' মারা গেলেও কী তোমরা একই নিয়ম কর? জিজ্ঞেস করলাম।

রাজা মারা গেলে তো একটু আলাদা নিয়ম হবেই।

কী রকম? জানতে চেয়েছি।

রাজা মরার খবর তাঁর যে যে গ্রাম আছে সেখানে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে দেওয়া হয়, যাতে সবাই এসে শেষ বারের জন্যে শ্রদ্ধা জানাতে পারে তাই মৃতদেহ দরকার হলে দু'চারদিনও রেখে দেওয়া হয়। রাজার অধীনের প্রত্যেকটি গ্রাম থেকে লোক আসে শুয়োর বা নিদেন পক্ষে একটি মুরগি নিয়ে। মৃতের সম্মানে দেয় এগুলো। আসে বারুদ ভর্তি করা নিজস্ব বন্দুক কাঁধে নিয়ে।

তারা একে একে মাচার ওপরে রাখা রাজার শরীরের সমানে গিয়ে ফিস ফিস করে বলে তুমি আমাদের 'সম্পা' ছিলে। শত্রুর মাথা কেটে আমাদের গৌরব বাড়িয়েছ। তুমি সময়ে অসময়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করেছ। আমরা এখন অসহায় হয়ে পড়লাম। তুমি এখন অন্য জগতে চলে যাচ্ছ সেখানে পূর্ব পুরুষদের দেখা পাবে। আমরাও একদিন সেই জগতে গিয়ে তোমার দেখা পাব। তোমার শোকে আজ আমরা তাঁই কেঁদে চলেছি।

এরপরে যারা তাদের গাদা বন্দুক নিয়ে এসেছে তারা 'সম্পা'র আত্মাকে শ্রদ্ধা জানাতে বন্দুকের আওয়াজ করে। 'সম্পা'কে কিন্তু সাধারণ আর পাঁচজনের মত কাঁধে করে নিয়ে যায় না। ঘরের কাছেই 'শুক' তৈরি হয় তাই চার জন ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে শরীরটা মাচার ওপরে শুইয়ে দেয়। মাথা থাকে পশ্চিম দিকে। 'শুক' থেকে ফিরে কেউই সঙ্গে সঙ্গে মৃতের ঘরে ঢোকে না। 'গম্পা' ঘরে ঢোকার মুখে বাঁ দিক ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকে। যারা 'শুক' এ গিয়েছিল তারা সারি দিয়ে একে একে এগিয়ে এসে বাঁ হাত 'গম্পা'র দিকে বাড়িয়ে দেয়। 'গম্পা' বাড়িয়ে দেওয়া হাতের কড়ি আঙুলটি ধুয়ে দেয়। অন্য মানুষের দেহ অবশ্য কাঁধে করে নিয়ে যায়। তখন কিন্তু 'গম্পা' শ্মশান ফেরত দের বাঁ কাঁধ থেকে পুরো হাত ধুইয়ে দেয়। অন্য মানুযের দেহ অবশ্য কাঁধে করে নিয়ে যায়। তখন কিন্তু 'গম্পা' শ্মশান ফেরতদের বাঁ কাঁধ থেকে পুরো হাত ধুইয়ে দেয়। সম্পার 'শুক' এর সামনে রোজ আগুন জ্বালানোর জন্যে একটি মেয়েকে রাখা হয়। আগুন জ্বালান ছাড়াও সব ছাউনি গুলোর যাতে কোন ক্ষতি না হয় সে দিকেও নজর রাখে।

মেয়েরা মারা গেলে কী কর?

সবই এক রকম থাকে। উত্তর পেয়েছি। তারা যেসব জিনিস ব্যবহার করে সে গুলো রাখা হয়। শুধু 'সাথঙ' দেওয়া হয় না। — কেন? স্বভাবতই জিজ্ঞেস করেছি। কোন জবাব দিতে পারেনি। তবে পরে 'গম্পা' বলেছিল পুরুষরা লড়াই এ যায় তাই ওদের সঙ্গী দিতে হয়। যুক্তি হিসেবে বলেছিল 'সম্পা'র প্রথম বৌ কে তো গ্রামের বাইরে থেকে ঝামেলা মাথায় নিয়ে বিয়ে করে আনতে হয়। সেই জন্যে তার 'শুক'এ একটি 'সাথঙ' রাখার নিয়ম।

'গম্পা' এরপরে তাদের একটা বিশ্বাসের কথা বলেছিল। মানুষেব কাজ শেষ হয়ে গেলে ভগবানের কাছে চলে যায়। তবে অপদেবতার নজর পড়লে মানুষ অপঘাতে মরে। সেটা

গ্রামের পক্ষে ভাল নয়। সেই জন্যে অপঘাতে মরলে দেহটা এভাবে গ্রামের ভেতরে 'গুকখা' তে রাখা হয় না।

কী কর? প্রশ্ন।

গ্রামের বাইরে জায়গা আছে, আমরা 'হাউ গুক' বলি। সেখানে রেখে আসি। অপদেবতার নজর যাতে গ্রামে না পড়ে সেই জন্যে যারা দেহ নিয়ে যায় তাবা গ্রামের বাইরে ঝরণাতে হাত ধুয়ে আসে, মৃতের ঘরের সামনে নয়। যদি কেউ নদীতে ডুবে মরে তা হলে তার শরীর নদীর ধারে উঁচু মাচা করে রেখে আসে। আগেকার দিনে লড়াই করতে গিয়ে কেউ গ্রামের সীমানার বাইরে মারা গেলে তার দেহও গ্রামে ঢোকান হত না। তবে লড়াই করে গ্রামে ফিরে মারা গেলে তাকে গ্রামে 'গুকখা'তেই রাখা হত।

ঘরের পাশে শ্মশান কেন? পরে একদিন 'সম্পা' কে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

তার উত্তরে যা বলেছিল তাতে কিছু যুক্তি ছিল। বলেছিল আমরা মাথা কেটে আনতাম। আশপাশে সব শত্রু গ্রাম থাকত। গ্রামের বাইরে যাওয়ার ভয় ছিল সবসময়। হয়তো সেই জন্যে এই নিয়ম হয়েছে। মাংস পচার দুর্গন্ধে পরিবেশ ভারি হয়ে উঠলেও তাই গ্রামের মানুষের কোনো বিকার থাকে না। পঙচাও এ আবার গিয়েছিলাম পঁচিশ বছর পরে ২০০২ সালে। গ্রামে ঢোকার মুখেই দেখলাম তৈরি হয়েছে গির্জা। গ্রামের ভিতরে পাকা সিঁড়ি উঠে গেছে উপর পর্যন্ত। গ্রামে ঘোরার সময় নজরে পড়েনি কোন 'গুক'। জিজ্ঞেস করতে একজন বলেছে গ্রামে প্রায় সবাই খ্রিস্টান হয়ে গেছে।

তারপর দেখাতে নিয়ে গেছে গ্রামের শেষ সীমানায় ছিমছাম কবরস্থান। কবরের সামনে কাঠের ক্রস পোঁতা। সেখানে ছিল না কোন মড়া পচার গন্ধ। যদিও রাখাছিল সেই আগের মত মিথুন আর হরিণের মাথার খুলি। ওয়াঙচু দাও ছিল।

বুঝলাম নতুন দিনের আলো এদের মধ্যে থেকে এখনও পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলতে পারেনি পূর্ব পুরুষের পুরনো সংস্কার।

❑ লেখক পরিচিতি — নৃতাত্ত্বিক, প্রাক্তন পরিচালক: অ্যানথ্রপলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া।

মণিপুর

নাগাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

অন্যান্য আদিম জাতির মতো মণিপুরী নাগারাও উপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্। অদ্ভুত গঠনের প্রস্তরখণ্ডগুলোকে এর 'লাই-ফাম'* বা উপদেবতার অধিষ্ঠানস্থল বলে নির্দ্দেশ করে। টাংখুলদের বিশ্বাস উরি এবং উরা নামে দু'জন দেবতা আছেন, তাঁদের প্রত্যেকের চারটা করে হাত, চারটা ক'রে পা। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে এদের ধারণা এই যে, আকাশ হচ্ছে পুরুষ আর পৃথিবী হচ্ছে প্রকৃতি। এদের দৃঢ়বদ্ধ নিবিড় আশ্লেষের ফল ভূমিকম্প, আর তাই থেকে পৃথিবীতে প্রাণ-লীলার বিকাশ।

মণিপুরের সকল শ্রেণীর নাগারাই মৃতদেহ গোর দেয়। টাংখুলরা খুব ঘটা ক'রে মৃতদেহ সমাহিত করে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন কবর খনন করা হ'লে সম্পন্ন গৃহস্থেরা একটি মহিষ বলি দেয়। মহিষটার নাড়ীভুঁড়ির অর্দ্ধেকটা নেয় মৃতব্যক্তির আত্মীয়স্বজনরা, বাকী অর্দ্ধেকটা নেয় কবরখননকারীরা। প্রাণীটার হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, প্লীহা, ফুসফুস, বৃক্ক (Kidney) ইত্যাদি জোটে 'শেরা' বা গ্রাম্য পুরোহিতের ভাগ্যে। এগুলো রান্না ক'রে সে কতকগুলো মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক 'কামিও' বা উপদেবতার উদ্দেশে নিবেদন করে। পুরোহিত কর্ত্তৃক কতকগুলো ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন হবার পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে সমবেত লোকদের এই রান্নাই করা মাংস এবং ভাত পরিবেশন করা হয়, এবং সকলে মিলে মহা আনন্দে গোরস্থানে ভোজে প্রবৃত্ত হয়। ভোজনপর্ব্ব শেষ হলে শুরু হয় মৃতদেহ সমাহিত করবার আয়োজন। মৃতের একটি আত্মীয় জ্বলন্ত মশাল হস্তে কবরের ভিতর ঢুকে, মশালটি ঘুরাতে ঘুরাতে স্বর্গত পিতৃপুরুষদের নিকট এই প্রার্থনা জানায়, তারা যেন মৃত ব্যক্তির 'কাজাইরাম' (পরলোক) যাত্রার পথে তার সঙ্গে এসে দেখা করেন। তারপর মৃতের হাত দুখানি জল দিয়ে খুব ভাল করে ধুইয়ে দেওয়া হয়। তখন তার আত্মীয়স্বজনরা সকলে এক জায়গায় জড় হয়ে মড়াকান্না জুড়ে দেয় এবং কবরটিকে দু-তিন বার প্রদক্ষিণ করে। তারপর মৃতদেহটিকে শবাধারের সঙ্গে খুব শক্ত করে বেঁধে কবরে রাখা হয় এবং যাতে মৃতদেহে মাটি না লাগতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কবরের ভেতর পাথর দিয়ে তারা একটি বেষ্টনী নির্ম্মাণ করে। কবরে মাটি চাপা দেওয়া হলে পর 'শেরা' বা পুরোহিতকে মৃত্তিকাস্তূপের ওপর একটি টাঙ্গি রাখতে হয়। সর্ব্বশেষে সমাধিক্ষেত্রে একটি দেবদারু কাঠের মশাল জ্বালিয়ে রেখে সকলে মৃতব্যক্তির গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এদের বিশ্বাস যে সমাহিত হবার পর দিন কবরের অন্ধকার গহ্বর থেকে মৃতব্যক্তির আবার পুনরুত্থান হয়, সেদিনই অশরীরী আত্মা আবার তার আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে ফিরে আসে। তাই ক্রমাগত কয়েকদিন পর্য্যন্ত রাতদিন সকল সময়েই লোকান্তরিত প্রিয়জনের জন্যে তাদের গৃহদ্বার অবারিত থাকে।

* কথাটা 'মৈ-তাই' বা মণিপুরী ভাষা থেকে ধার করা।

মণিপুরের নাগাসম্প্রদায় ❑ ভারতবর্ষ ❑ আষাঢ়, ১৩৫১

মোগল আমলে মসজিদ নির্মাণের প্রাচীন রীতিই অনুসরণ করা হয়। বিশাল মসজিদের বিভিন্ন অংশে আলাদাভাবে নির্মাণের ফলে এর সামগ্রিক ঐক্য বিনষ্ট হয়। কাজেই এর বিশালত্বের পরিমাপ করতে হলে প্রতিটি অংশের প্রতি স্বতন্ত্রভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়। ১৬শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিজাপুরের জামে মসজিদ। এর কেন্দ্রস্থলে আছে একটি বিশাল গম্বুজঘর। স্তম্ভযুক্ত হলের প্রতিটি বর্গাকৃতির অংশে আছে একটি করে ছোট গম্বুজ। ফতেপুর সিক্রীর মসজিদে পাশাপাশি তিনটি উপাসনালয় নির্মাণ করা হয়। একটি সুবিশাল খিলানযুক্ত প্রাঙ্গণ এবং একদিকের প্যাভিলিয়ন সদৃশ্য সুউচ্চ প্রবেশতোরণের এক সংকীর্ণ পার্শ্বদেশে এই তিনটি উপাসনালয় অবস্থিত। আগ্রার সুবিশাল মসজিদের নির্মাণ কার্য শুরু করেন সম্রাট আকবর এবং সে কাজ শেষ করেন জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীর লাহোরেও একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। কিন্তু সম্রাট শাহজাহানের আগে দিল্লীতে কেউ মসজিদ নির্মাণ করেন নি। দিল্লীর মসজিদ একটি বিশাল ভিত্তির ওপর অবস্থিত। একটি তিনতলা প্রবেশ তোরণ, প্রবেশ পথের একটি সুদীর্ঘ ইউয়ান এবং তার দুই পাশে দুটি হালকা মিনারসহ বিশাল আকারে এই মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। এর পেছনেই রয়েছে হামরামের তিনটি পেঁয়াজ সদৃশ গম্বুজ। সম্রাট শাহজাহান ১৬৪৮ থেকে ১৬৫৫ সালের মধ্যে আগ্রার রাজপ্রাসাদে বিখ্যাত মতি মসজিদ নির্মাণ করান। নিখুঁত আকৃতির দিক থেকে এর কোন জুড়ি নেই। লাল রংয়ের বেলে পাথরে তৈরি এই মসজিদের ভিতরের দিকটা সম্পূর্ণরূপে মার্বেল পাথরে আবৃত। এতে চমৎকারভাবে ঢালাই করা সূঁচালো খিলান ব্যবহার করা হয়। দিল্লীর প্রাসাদে যে ক্ষুদ্রতর মসজিদটি আছে সেটিও মতি মসজিদ নামেই অভিহিত হয়ে থাকে। সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণরূপে মার্বেল পাথর দিয়ে এটি নির্মাণ করান।

মোগল আমলের অন্যান্য স্থাপত্য নিদর্শনের তুলনায় মসজিদেই সাধারণতঃ বেশী ইরানী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়— যদিও সে আমলে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশগত চাহিদা পূরণের দাবিই সব থেকে বেশী প্রাধান্য লাভ করত। মসজিদের ক্ষেত্রে আর একটি বৈচিত্রময় বৈশিষ্ট্য ছিল এর বিশাল প্রবেশ পথ; সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে এটি নির্মাণ করা হত।

মূল জার্মান: আর্নস্ট কূহনেল. ইংরেজি অনুবাদ; ক্যাথরিন ওয়াটস্। বঙ্গানুবাদ · মোসলেম আলী বিশ্বাস।
সৌজন্যে: বইঘর, চট্টগ্রাম। সংকলক: অনুরাধা সরকার।

বেণীপুর গোরস্থান (মুর্শিদাবাদ), ছবি সাহারুল ইসলাম
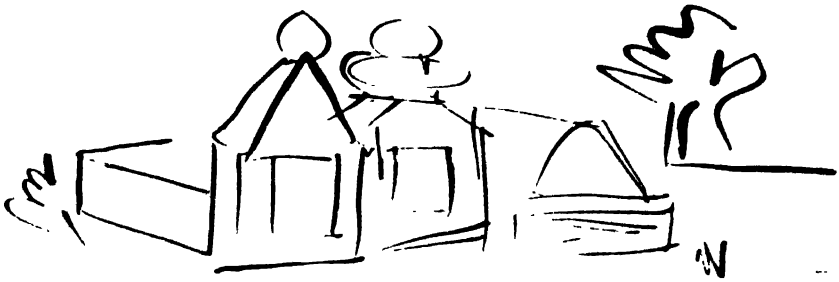
শ্মশানক্রিয়া, ছবি : এস বি. জানা

হালিশহরের শ্মশান ঃ পাপকাষ্ঠের আগুন ও চৈতন্যের দীপ্ত বলয়

অলোক মৈত্র

যদি কেউ বলেন তিনি ঈশ্বর মানেন না তবে তিনি নাস্তিক এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। যদি দেখা যায় তিনি তাঁর নিকটজনের মৃত্যুর পর অশৌচান্ত ক্রিয়াকর্ম ও শ্রাদ্ধাদির কাজ করছেন, তিনি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিচ্ছেন এমনটিই ধরা হবে। অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়াটা আস্তিকতারই লক্ষণ। দেহ থেকে আত্মা যে মুহূর্তে চলে যায় সেই ক্ষণটিকে বিচার করে মৃতের দোষ নির্ণয় করে থাকেন গণৎকারেরা। একপদ, দ্বিপদ, ত্রিপদ ইত্যাদি নানা দোষের সন্ধান দেন পঞ্জিকার পণ্ডিতেরা। এইসব সংস্কার সমাজ-জীবনে এখনও রয়ে গেছে। উত্তর চব্বিশ পরগনার একেবারে উত্তরের প্রান্তিক অঞ্চল হালিশহরের শ্মশানঘাটে শবদেহ দাহ করলে নাকি মৃত ব্যক্তির কোনো দোষ স্পর্শ করতে পারে না। পরন্তু শ্মশানবন্ধুরা শবদেহ দাহ করার পর একটু এগিয়ে এসে রামপ্রসাদ সেন যে ঘাটে ব্রহ্মময়ীকে পাওয়ার জন্য নিজেকে সলিল সমাধিস্থ করেন, সে ঘাটে স্নান করে বাড়ি ফিরলে তাদেরও কোনো দোষ স্পর্শ করতে পারে না। এজন্য সুদূর নদীয়া জেলার রানাঘাট থেকে মৃতদেহ হালিশহরে এনে দাহ করতে দেখা যায়।

হালিশহরের শ্মশান ঠিক করে থেকে নির্দিষ্ট হয়েছে তা বলা যায় না। সাবর্ণ চৌধুরীদের খাসতালুক ছিল এটি। কিছু উচ্চশ্রেণির মানুষ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ গঙ্গার ধার ঘেঁসে বসবাস করতেন। কবি রামপ্রসাদ হালিশহরে জন্মেছিলেন (১৭২০ ১৭৮১ খ্রি)। তিনি তাঁর রচনায় বারবার শ্মশানের কথা উল্লেখ করেছেন তবে সে শ্মশানের কনসেপ্ট আলাদা। পৌরাণিক শ্মশানবাসী ভোলা মহেশ্বর ও শ্যামা মায়ের যে প্রতীক সেই চেতনার 'অতি দীপ্তি' কালো রূপে বিবাজিত। আমাদের জাগতিক শ্মশানের সঙ্গে মেলানো ভার। উচ্চবর্ণের বিত্তশালীদের জন্য ওই কালে শ্মশান থাকাটা ধর্মীয় সংস্কার অনুযায়ী থাকা স্বাভাবিক, তবে নিম্নবিত্ত তথা নিম্নবর্গের মধ্যে মৃতদেহ দাহ করার রেওয়াজ কি আদৌ ছিল? মৃতদেহ গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলে মৃতের আত্মার পক্ষে ভাল হবে—এ ধারণা থেকে তখনকার দিনে নিম্নবর্গের মানুষেরা শবদেহ গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতেন। ক্যালকাটা রিভিউ, ১৮৪৬, ভল্যুম ২, পৃ. ৪০৭, একটি হদিশ দিচ্ছে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়েও হালিশহরের কাছে মল্লিকবাগে যমুনা নদীতে মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হত যাতে জোয়ারভাটার সময় স্রোতের খেলায় শবদেহ সোজা গঙ্গায় চলে যেতে পারে। আমাদের মতে মল্লিকবাগের কাছে যেটি ছিল সেটি 'বাগের খাল', যমুনা নদী নয়। তবে হালিশহরের পুবদিকের গ্রামগুলিতে কুর্মি, কৃষক, জেলে, মালো—এই সব নিম্নবর্গের মানুষের মুখেই (Oral Traditional history) শোনা যায় তারা যমুনা, বাগের খাল ও গঙ্গায় শবদেহ ভাসিয়ে দেবার কথা পূর্বপুরুষদের মুখ থেকে শুনেছেন। আর বর্তমান লেখকও তাঁর ছেলেবেলায় ভরা কোটালের সময় গঙ্গা দিয়ে শবদেহ ভেসে যেতে দেখেছেন। তা হলে হালিশহরের শ্মশানের এত চাহিদা কেন বর্তমান সময়ে?

আগেকার দিনে নিয়ম ছিল পুববাংলার জমিদারেরা গঙ্গার ধারে নিজেদের অট্টালিকা বানিয়ে রাখতেন, বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গার তীরে কালাতিপাত করবেন এই আকাঙ্ক্ষায়। যশোরের চাঁচড়ার জমিদার আতপুরে, বারোভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া প্রতাপাদিত্য জগদ্দলে, বিদ্যাধর রায়, ইন্দুরেখা দেবী, নৃপেন মুখার্জি প্রভৃতিদের হালিশহরে ভদ্রাসন ছিল। মৃতদেহ দাহ করার পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যরীতি এরা অনুসরণ করে চলতেন। হালিশহরে শ্মশান এই দিক থেকে প্রাচীনত্বের দাবি করতে পারে। তবে সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেনের আবির্ভাব হালিশহরকে আরো মহিমান্বিত করে তোলায় এটি একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন মঠ, আশ্রম, মন্দির—এ সবের সমাহারে এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য এত বেড়েছে, মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনেরা হালিশহরের শ্মশানেই শবদেহ দাহ করাটা কাঙ্ক্ষিত মনে করে। ১৮৮০-৮৫ খ্রি. নাগাদ এ অঞ্চলে শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা হবার পর হালিশহরের শ্মশানের গুরুত্ব বেড়ে যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবেশ সচেতনতা, এবং পৌরসভা গঠিত হবার পর মৃতদেহ দাহ করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বনের ও সরকারি নথিভুক্ত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। হালিশহরের শ্মশান এ কারণেই এ অঞ্চলে সমধিক গুরুত্ব পায়।

হালিশহর পৌরসভার অন্তর্গত রামসীতাগলির পশ্চিমের শেষপ্রান্তে গঙ্গার ধারে শ্মশানটি অবস্থিত। এই শ্মশান সম্পর্ক আমরা নানান গল্প শুনেছি হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে। সে সব গল্প এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তবে ইতিহাসের প্রয়োজনে কিছু তথ্য মেলে হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যেরই লেখা 'হালিশহরের মানুষ' গ্রন্থটি থেকে। তিনি এখন পরলোকগত। তাঁরই লেখা থেকে কিছু বিবরণ এখানে উল্লেখ করছি। প্রায় দেড়শো বছর আগে রামসীতাগলির পশ্চিমদিকে শীর্ষবিন্দুতে দক্ষিণ দিকে গঙ্গার তীরে এক বাড়িতে বসবাস করতেন রামজীবন মুখোপাধ্যায়। তাঁর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত মৃন্ময়ী মূর্তি কালীর নিত্যপুজো হত বারোমাস। রামজীবনের বাড়ির কাছেই গঙ্গাগর্ভের ঢালু ভূমিতে ওই অঞ্চলের শ্মশানঘাট ছিল। সেই সময়ে এবং তারপরেও বহু সময় ধরে প্রত্যেক গলির গঙ্গার ঘাটেই সেই সেই অঞ্চলের শ্মশান থাকত। রামজীবনের বাড়ির কালী শ্মশানকালী নামেই লোকে জানত এবং পরের দিকে বিগ্রহের কলেবরের পরিবর্তন ঘটলেও এখনও শ্মশানকালী বলেই লোকে জানে। রামজীবন নিঃসন্তান থাকায় ১২৩২ বঙ্গাব্দে (১৮২৫ খ্রি) তাঁর দূর সম্পর্কের পিসতুতো ভাই বালক নটবর চক্রবর্তীকে মেদিনীপুর জেলার রসকুণ্ড গ্রাম থেকে আনিয়ে নিজের কাছে ছেলের মতো প্রতিপালন করতে থাকেন। মৃত্যুর আগে রামজীবন নটবর চক্রবর্তীকে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে যান এবং নটবরই শ্মশানকালীর পুজো করতে থাকেন। কিছুকাল পরে বাজারপাড়া নিবাসী ভৈরবচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর ১২৮২ বঙ্গাব্দে (১৮৭৫ খ্রি.) স্থানীয় মানুষদের পরামর্শ ও অনুরোধে নটবর চক্রবর্তী বিদ্যাসাগর মশায়ের গৃহদেবতা পাষাণময়ী কালীমূর্তি একশো-এক টাকায় কিনে নিয়ে মৃন্ময়ী মূর্তির অবসান ঘটান। নটবরের দৌহিত্র দেবীদাস চক্রবর্তী হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে এমন কথাও বলেছেন যে ওই মূর্তি কিনে নেবার পর বিদ্যাসাগর মশায়ের বৃদ্ধা বিধবাকে তাঁর বেঁচে থাকার জন্য নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন। হীরেন্দ্রনাথ লিখছেন : তার আগেই পাশেই অবস্থিত শ্রীশ্রীরাসবিহারী জিউর আখড়াবাড়ির কর্তৃপক্ষ, রামজীবনের সঙ্গে নটবরের বিশেষ সম্পর্ক নেই—এই অভিযোগে নটবরের

সম্পত্তির অধিকার এবং পুজো করার অধিকারের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেন। বৈষ্ণবরা কেন যে শক্তি পুজোয় আগ্রহী হয়েছিলেন তা বলা যায় না। তখন স্থানীয় বিশিষ্ট মানুষদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে দেশের সর্বোচ্চ আদালত নটবর চক্রবর্তীই ওই সম্পত্তির ও পুজোর বৈধ অধিকারী এই রায় ঘোষণা করেন। অপুত্রক নটবরের তিনটি বিয়ে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রী নিঃসন্তান হলেও তৃতীয় স্ত্রীর কন্যা রাধারানির বিয়ে হয় ভাটপাড়ার তুলসীচরণ চক্রবর্তীর ছেলে প্রসাদচরণের সঙ্গে। বিয়ের পর প্রসাদচরণ হালিশহরে শ্বশুরবাড়িতে বাস করতে থাকেন এবং নটবরের মৃত্যুর পর শ্বশুরের সম্পত্তির অধিকারী হয়ে শ্মশানকালীর পূজারী হন। তাঁর চার ছেলের মধ্যে সবচেয়ে বড় দেবীদাস তার ভগ্নিপতি জামালপুর নিবাসী শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে বিনয়ভূষণকে শ্মশানকালী পুজোর অধিকারী করেন। বিনয়ভূষণের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেরাই এখন শ্মশানকালীর পুজো-সেবা চালাচ্ছেন।

কিন্তু এছাড়াও শ্মশানভূমিতে একটি ছিন্নমস্তার মন্দির রয়েছে। গত ৪০/৫০ বছর ধরে এই মন্দিরে রাতে পুজো হয়, কখনো-বা সকালে। চারিদিকে নরমুণ্ডের খুলি, শিয়াল, বিড়াল, কুকুর এই সবের খুলি ছড়িয়ে রাখা আছে মৃন্ময়ী ছিন্নমস্তা মূর্তির সামনে। এই মন্দিরের যিনি সাধক তিনি নিজেকে তন্ত্রসিদ্ধ বলে মনে করেন। তন্ত্রের মাধ্যমে পুজোর যা যা অনুষঙ্গ সবই এই সাধক অনুসরণ করেন। সন্ধেবেলায় হুংকার দিয়ে ডাকলে শিয়াল এসে উপস্থিত হয়। সাধক প্রবর শিয়াল কুকুর সবকে খাবার দেন। রাতে কোথাও পেঁচা দেখতে না পেলে অন্তত হালিশহর শ্মশানে পেঁচা দেখতে পাবেন এটি নিশ্চিত। পেঁচা, কুকুর, শিয়াল, মৃতদেহ এসব নিয়ে সাধক প্রবর দিব্যি শ্মশানে বাস করেন। মারণ উচাটন বশীকরণ এই সবে সিদ্ধহস্ত বলে অঞ্চলের লোকেরা মনে করে। অপুত্রক দম্পতি এই শ্মশানে সেই সাধক প্রবরের কাছে আসেন সন্তান লাভের কামনায়। মৃত্যুর মিছিল যেখানে, সেখানে জীবনেরও সন্ধান চলে। শ্মশানে এ যাবৎ পুরোনো রীতিতেই শবদাহ করা হত। কাঠ দিয়ে সাজিয়ে মৃতদেহকে ঘি মাখিয়ে ধর্মসংস্কার অনুযায়ী দাহ করা হত। এজন্য পুরোহিতও আছে আলাদা। বর্তমানে বিদ্যুৎচুল্লি বসানোতে কাঠের ব্যবহার কমে গেছে। বিদ্যুৎচুল্লি কোনো কারণে বন্ধ থাকলে সেদিন কাঠের চিতা সাজানো হয়। গঙ্গার এই নিম্নভূমিতে চিতার আগুন জ্বলে। শোকসন্তপ্ত পরিবারের কান্না। সন্ধের সময় এর সঙ্গে যুক্ত হয় শিয়াল কুকুর পেঁচার আগমন। চারিদিকে ধোঁয়া ও মাংসপোড়ার গন্ধ। আর মাঝে মাঝে সাধক প্রবরের চিৎকার। একেবারে আধিভৌতিক আধিদৈবিক ভয়াল পরিবেশ উপস্থিত হয়। আবার এরই মাঝে ঠিক পাশেই অবস্থিত ডোমদের কুটির। সেখান থেকে কোনো যৌবনবতী ডোমকন্যা বেরিয়ে আসে শ্মশানঘাটে। যুবতীকে দেখে ডোম যুবকের জীবনেরও সন্ধান চলে।

'শ্মশানের ডোম' বলে একটি কথা খুবই প্রচলিত। এই কথায় আমরা ডোমদের শ্মশাননির্ভর জীবিকাটিকেই যেন নির্দিষ্ট করে দিই। কিন্তু ডোমদের সকলেরই শ্মশাননির্ভর জীবিকা নয়। হালিশহরের ডোমদের বসতি খুবই পুরোনো। আশেপাশের গ্রামগুলো যেমন যদুনাথবাটি, শালিদহ, জেটিয়া দাসপাড়া এইসব গ্রামেও ডোমদের বসতি মেলে। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে এই এলাকায় শিল্পায়ন শুরু হলে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে অবাঙালি ডোমরা বসবাসের জন্য আসতে শুরু করেন। শিল্পায়নের পূর্বে এই এলাকায় ডোমরা অধিকাংশ লেঠেল বা পাহারাদার

হিসেবে কাজ করতেন। যাঁরা জমিদারদের অধীনে দলপতি হয়ে সৈন্য পরিচালনা করতেন তাঁদের অবশ্য কেউ কেউ সমাজপতির মতোই সম্মান অর্জন করেছিলেন। হালিশহরের সাতকড়ি ডোম জমিদার নৃপেন্দ্র মুখার্জির পূর্বপুরুষদের লাঠিয়াল ছিলেন। তাঁকে লাঠিয়ালদের সর্দার করা হয়েছিল। তাঁর কাজ ছিল জমিদারকে রক্ষা করা ও খাজনা আদায়ের সময় পাহারা দেওয়া। এই এলাকায় বেশ কিছু ধর্মপূজার হদিশ মেলে যার প্রধান পুরোহিত ছিলেন ডোমপণ্ডিত। ডোমরা এমনই একটি জাতি যাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের কাজ ও ব্রাহ্মণের কাজ একই সঙ্গে জীবিকা হিসেবে সম্পৃক্ত হয়েছিল। শিল্পায়নের পর ডোমদের জীবিকার পরিবর্তন দেখা যায়। ডোমদের একাংশ শবদেহ দাহ করার কাজে যোগ দেয়। সাম্প্রতিককালে শ্মশানঘাটে বিদ্যুৎচুল্লি বসানোয় তাদেরও জীবিকায় টান পড়েছে। বেতের কাজ ও বাঁশের কাজও এঁদের অন্যতম জীবিকা। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শূকর পালনও এঁরা করে থাকেন। বর্তমানে আর একটি জীবিকা হল—গরু, ছাগল বা অন্যান্য জীবজন্তুর হাড় গরম জলে সিদ্ধ করে পচা মাংস ছাড়িয়ে নিয়ে সেই হাড় মেশিনে গুঁড়ো করে সার (fertiliser) হিসেবে বিক্রি করা।

হালিশহরের শ্মশান বা তার আশেপাশে একটু পরখ করে দেখলেই বোঝা যায় বাঙালি ডোমরা অবাঙালি ডোমদের সঙ্গে সংস্কৃতিগত বা অনেকাংশে ভাষাগতভাবেও অভিন্ন হয়ে গেছে। পুরোনো ডোমদের সমাজব্যবস্থা কপালী, চণ্ডাল, শিউলি, ঋষিদাস ও তাদের বিভিন্ন 'থাক' মিলেমিশে গেছে। ডোমদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার কাল পরম্পরায় বিনষ্ট হয়ে গেছে। অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত যে সমস্ত ডোম নিজেদের সামাজিক অবস্থানকে উন্নত করতে পারেননি তারাই আজ বাধ্য হয়েছেন নিকৃষ্ট জীবিকা গ্রহণে। হালিশহরের শ্মশান সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সত্যেরও সন্ধান দেয়।

শ্মশান আমাদের কাছে বড় রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছে। রোজগেরে স্বামীর মৃত্যুর পর তিনটি কচি বাচ্চা নিয়ে অসহায় স্ত্রীর বিলাপ আকাশ বাতাস মথিত করেছে; আবার অনেকগুলি গাড়ির কনভয় নিয়ে বাদ্য সহযোগে শোভাযাত্রা করে বানাঘাট থেকে জনৈক ব্যবসায়ীর শবদেহ দাহ করতে এনে, শুধুমাত্র শ্মশানের রসিদে সই করবে কে এই নিয়ে বাগবিতণ্ডা, রক্তারক্তি এসবও হয়েছে। ওয়ারিশনদের ধারণা যে সই করবে সেই সমস্ত বিষয় সম্পত্তির মালিকানা পাবে। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে মৃতদেহ দাহ করতে হয়েছে। শ্মশানের একটি উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব আছে। সে তত্ত্ব আমাদের মতো মুখ্যুসুখ্যু লোকের পক্ষে বোঝা সম্ভবও নয়। শ্মশান বৈরাগ্য কথাটি অত সহজ কথা নয়। শ্মশানে গেলে আমাদের বৈরাগ্য টৈরাগ্য আসে না, যেটি আসে সেটি আবেগজনিত শোক। প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোক আসা স্বাভাবিক তবে সে শোক কোনো শ্লোক বা সৃষ্টির জন্ম দেয় না। নিজেদের সংহতও করে না। বস্তুবাদী জগতে সকলেই জীবন সংগ্রামে ব্যাপৃত। তবু সামাজিক বিবেক বলে একটি বিষয় আছে, সেটিও আমাদের আন্দোলিত করে না। শ্মশান থেকে বাড়ি ফিরে এসে আবারও লোভ, রিপু-লালসায় মগ্ন হয়ে যাই। মঠ, মন্দির ও আশ্রমের বিভিন্ন মোহান্ত, সাধু অন্তেবাসীরা হালিশহরে অন্য এক উচ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন থাকেন। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন ধারার চর্চা হয় এখানে। আমরা সাধারণ মানুষেরা লোভ-লালসা-রিপু তাড়িত হয়ে জীবন শেষ করার পর পাপরূপ কাষ্ঠের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে

যাই। কিন্তু মঠাশ্রমের মোহান্ত সন্ন্যাসীর মৃত্যু হলে (দেহরক্ষা বলা হয়) তাঁদের আশ্রম প্রাঙ্গণে মাটিতে সমাহিত করা হয়। পাপকাষ্ঠের আগুন তাঁদের স্পর্শ করে না। নিগমানন্দ আশ্রম, যোগানন্দ আশ্রম, স্বরূপানন্দ আশ্রম, পূষণ আশ্রম সব আশ্রমেই এই প্রথা। হালিশহরের শ্মশানে শুধুমাত্র পাপ-কাষ্ঠের আগুন জ্বলে, কিন্তু গোটা হালিশহর জুড়ে রয়েছে এক আধ্যাত্মিক চিন্তার দীপ্ত বলয়। শ্মশানের তত্ত্ব সত্যিকারের যিনি বুঝেছিলেন তিনি তো হালিশহরেরই সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেন। শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে তিনি ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছেন। শ্মশানের যে বিষম তত্ত্ব তাঁর মতো কে বুঝেছিলেন? তাই তাঁর গানে আছে :

কালী সব ঘুচালে লেটা।
আগম নিগম শিবের বচন
মানবি কিনা মানবি সেটা।।
শ্মশান পেলে ভাল বাস মা,
তুচ্ছ কর মণিকোটা।

গানের শেষের দিকে বলেছেন :

চাকলা জুড়ে নাম রটেছে
শ্রীরামপ্রসাদ কালীর বেটা।
এ যে মায়ে পোয়ে এমন ব্যবহার
ইহার মর্ম বুঝবে কেটা।।

রামপ্রসাদ সেন শ্মশানে কাষ্ঠের আগুনে ভস্মীভূত হন নি। তিনি শ্যামা নামেই পরম ব্রহ্মকে লাভ করার উদ্দেশে গঙ্গায় সলিল সমাধিস্থ হন। আসলে দেহের মধ্যে সুজন যেজন তার সঙ্গে যে ঘর করেছে তাঁর আবার চিন্তা কী! তাঁর দেহ দাহ হবে কি হবে না—এসব রয়েই গেল।

দিলরসবানু বেগমের সমাধি সৌধ ঃ ঔরঙ্গাবাদ

আজ যাকে বলে আরওঙ্গবাদ। দৌলতাবাদ থেকে আট মাইল দূরে। এখানে আগে একটি গ্রাম ছিল। গ্রামের পাশেই সুবৃহৎ হ্রদ। আহমেদ নগরের মালিক অম্বর হ্রদটিকে অক্ষত রেখে ফতেহনগর নামে একটি ক্ষুদ্র শহর গড়ে তোলেন। এখানেই মারা যান সম্রাট আওরঙ্গজেবের পত্নী দিলরসবানু বেগম। ওই হ্রদের পশ্চিম তীরে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। স্থানটির পরিবেশগত সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ও পত্নীর কবরকে মর্যাদা দানের জন্য আওরঙ্গজেব এখানে একটি মসজিদ, সমাধি সৌধ ও সরাইখানা তৈরী করেন। ফতেনগর বদলে হয় ওরঙ্গবাদ।

□ লেখক পরিচিতি— গ্রন্থকার, গবেষক, প্রাবন্ধিক।

শ্মশান কথা

শৈলেন্দ্রনাথ কাবাসী

ঘোড়ারস কবরস্থান :

ঘোড়ারস-কুলীন গ্রাম। গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন ১৮৯৭ দাগে ১৪ একর ৪০ শতক দিঘির পাড় সংলগ্ন ১২ একর ৩৪ শতক কবরস্থানের খতিয়ান ২৬৯, দাগ নং ১৯৮২তে ২ একর ৫৫ শতক। খতিয়ান ২৬৫, দাগ নং ১৮৯৬তে ২ একর ৫৭ শতক, খতিয়ান ২৬৫, দাগ নং ২০২৩-এ ১ একর ২১ শতক, খতিয়ান ২৬১, দাগ নং ২০২২-এ ৩৪ শতক জমি সরকারি রেকর্ডে কবরস্থান হিসাবে চিহ্নিত। ওই এলাকার কিছু অশুভশক্তি সম্পন্ন মানুষ ওই কবরস্থান ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহারের জন্য আমবাগান করেছে। কবরস্থান সংলগ্ন একটা নিমগাছ তলায় গভীর রাতে বছরে একবার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ পুজো-অর্চনা করে থাকে। ১৯৮২ দাগ নং কবরস্থানে ২৫/৩০ ঘর আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করছে। কবরস্থানের খাস এই জমি দখলি নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলের চাপান-উত্‌রন আছে দীর্ঘদিনের। কবরস্থান বিষয়ে নানা অসন্তোষের কারণে বসিরহাট থানার কেস নং জি. আর. ৩২৪/৯১, জি. আর. ৮৩/৯২ কবরস্থান সংলগ্ন গাছ কাটা নিয়ে হাইকোর্টে আবেদন করা হয়। তার নং ডব্ল্যু পি ৬০০৯৯ (ডব্ল্যু) ২০০০, ২৪.০৯.২০০০। বর্তমানে ওই কবরস্থান ওয়াকফ বোর্ডের অধীন। বর্তমানে কবরস্থানের ন'জন কমিটির সভাপতি আব্দুলা হিল করিম। কবরস্থান সংক্রান্ত বিষয়ে একাধিকবার পুলিশ ও জেল হাজতে রাত বাস করেছে করিম সাহেব। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হওয়ায় মাঝে মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে অনেকে জড়িয়ে পড়েন—অশান্তি সৃষ্টি হয়। এলাকার মানুষের মনের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। থানা-পুলিশ-কোর্ট -কাছারি হয়েছে বহুবার। করিম সাহেবের অভিমত বুকের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে বিরোধীদের চক্রান্তে জল ঢেলে দিয়ে পবিত্র এই কবরস্থান রক্ষা করবই।

মসলন্দপুর সমাধিক্ষেত্র :

মসলন্দপুর এক নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন গ্রামে সাহেব বাড়ি রোমান ক্যাথলিকদের দশ কাঠা জমি সমাধিক্ষেত্রের জন্য স্থান সংরক্ষিত আছে।

টাকি :

টাকির জমিদার ও শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মাতৃদেবী স্বর্ণময়ী'র নামে টাকিতে শ্মশানঘাট নির্মাণ করে দেন এবং তার পরিচালনার ভার তুলে দেন টাকির পুরসভার উপর।

টাকির জমিদার কালীনাথ রায়চৌধুরীর আমলে নতুন নতুন জমিদারি ও বিষয় সম্পত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। বরানগর ও দক্ষিণেশ্বরে জমিদারি ছিল।

চব্বিশ পরগনা কালেক্টরেট থেকে কাশীপুরের কুটিঘাটা অঞ্চলের তহশীলদারি নেন টাকির জমিদার বৈকুণ্ঠনাথ। এ বিষয়ে সংবাদপত্রে ছাপা সংবাদ—শবদাহনার্থ কাশীপুরের যে ঘাট আছে তাহার উপরে ভগবানচন্দ্র নামক এক ব্যক্তি দাওয়া করিতেছেন এবং তিনি ওই ঘাটে

একজন তহশীলদার নিযুক্ত করিয়া মুদ্দফরাসেরদের স্থান হইতে ফি-শব ৩টাকা করিয়া লইতেছেন। কালীনাথ রায়চৌধুবীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী চব্বিশ পরগনার কালেক্টরের স্থান হইতে তহশীলদার নিযুক্ত রাখিয়া মুদ্দফরাসেরদের স্থানে শব প্রতি ৩ টাকা লইতেছেন। তাহাতে উপরিউক্ত বিষয় শ্রীযুক্ত কমিশনাব পিণ্ড সাহেবের নিকটে রিপোর্ট হওয়াতে তিনি এই অন্যায় কর বসায়নের যথাসাধ্য শীঘ্র তত্ত্ববধারনার্থ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে হুকুম দিয়াছেন।

অভিযোগ পেয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কী করলেন, তাব হদিশ পাওয়া যায় না। জমিদারদের নিযুক্ত কর্মচারীর ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল। তারা হিসাব বহির্ভূত বহু ধরনেব রোজগার করতেন। কিন্তু সেসব কথা জমিদারদের কানে উঠত না। এ জাতীয় রোজগার তহবিলে জমা তো দূবে থাক বৈকুণ্ঠনাথও জানতেন না।

ব্রাহ্ম সমাজেব পক্ষ থেকে সতীদাহ নিবারণ বিষয়ক এক সভা ডাকার নোটিশ : কাল শ্রীযুত ইঙ্গলন্ডাদ্যধিপতি গত জুলাই মাসের একাদশ দিবস, বুধবারে প্রবি কৌন্সেলে হিন্দুদেব স্ত্রী দাহ বিষয়ে ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বরের আজ্ঞা গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং এদের কজন হিন্দু যে পুনরায় স্ত্রীদাহ হয় এজন্য আবেদন লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা গ্রাহ্য করেন নাই এজন্য স্ত্রীদাহ নিবারণের অনুরাগীরা শ্রীল শ্রীযুতের উপকার স্বীকাবেব কি কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনাজন্য ভবিষ্যৎ শনিবার ২৬ কার্তিক ১০ নভেম্বর দুই প্রহর ছয় ঘণ্টা দিবার সময়ে জোড়াসাঁকোর ব্রাহ্মসমাজ গৃহে একত্র হইলে। অতএব এই আহ্বান লিপি প্রকাশে জানাইতেছি যে যাঁহারা স্ত্রীদাহ নিবারণে অনুরাগ করেন তাঁহারা উক্ত সময়ে ও দিবসে সাধারণ গৃহ ব্রাহ্মসমাজে আগমন করিবেন ইতি

১২৩৯ সাল ২২ কার্তিক

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ রায়
শ্রীরামনাথ ঠাকুর
শ্রীরাধাপ্রসাদ রায়
টবস্টাস

বিথারী শ্মশান :

বিথারী হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন রানি রাসমণির জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাস-এর জমিদারিতে তিন বিঘা জমিতে প্রায় দুশো বছরেব প্রাচীন একটা পাকা চুল্লিসহ শ্মশান ঘাট আছে। এই শ্মশানে শবদেহ দাহর জন্য আসে গোয়ালপোতা, বিথারী, দত্তপাড়া, হাকিমপুর, স্বরূপদা প্রভৃতি গ্রাম থেকে। এই শ্মশানে শবদেহ দাহ কার্য সম্পন্ন করতে প্রায় তিনশো টাকা লাগে। হতদরিদ্র শবদেহ দাহকারীরা পঞ্চায়েতের অনুমতি নিয়ে শবদেহ দাহ করাব জন্য রাস্তার পাশের গাছ কেটে দাহ কাজে ওই কাঠ ব্যবহার করে থাকে।

শ্মশান যাত্রীদের বিশ্রামাগার ও কালীমন্দির নির্মাণ করে দেন হাকিমপুর নিবাসী রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল। সাধন দেবনাথ (বিথারী) লোহার চুল্লি নির্মাণ করে দেন। বিথারী, গোয়ালপোতা, দত্তপাড়া, হাকিমপুর, স্বরূপদা গ্রামের মানুষজন নিয়ে দশ বারোজনের শ্মশান কমিটি আছে। শ্মশান কালীমন্দিরে পুজো অর্চনা করেন দেবদাস চক্রবর্তী। এছাড়া সবসময়ের জন্য থাকেন রঞ্জন দাস (গোঁসাই)।

জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহে চারদিনব্যাপী শ্মশান উৎসবে কয়েক হাজার মানুষের কোলাহলে মুখরিত হয়। দোকানপাট বসে। উৎসবে মনোরঞ্জন মূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। এই শ্মশানে জমিদার মথুরামোহনের বাবা, মা ও জমিদার পরিবারের মানুষজনের দেহ দাহ করা হয়েছে। সে আমলের ম্যাট্রিকুলেশনে প্রথম বিভাগে পাশ—বিশিষ্ট সমাজসেবী ও চিকিৎসক ডা. চিত্তরঞ্জন আচার্য-এর শবদেহ বিথারীর এই মহাশ্মশানে দাহ করা হয়। ডা. চিত্তরঞ্জন আচার্য-এর ছেলে হলেন ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক ও কলকাতা বইমেলা গিল্ডের সভাপতি অনিল আচার্য। বিথারীর অনতিদূরে গোয়ালবাথান ও শাঁড়াপুল শ্মশানে শবদেহ দাহ হয়ে থাকে।

গোপালপুর শ্মশান :

হাড়োয়া বিধানসভার হাড়োয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন গোপালপুর গ্রামে ত্রিমোহনী মৌজায় দশ শতক জমিতে মন্দির ও চার শতক জমিতে একটা শ্মশান চুল্লিসহ প্রায় তিনশো বছরের প্রাচীন শ্মশানঘাট। গাছ-গাছালিতে পাখ পাখালির গলা সাধা আর সুন্দর ও মনোরম পরিবেশের মধ্যে এই শ্মশানঘাট। বিকেল থেকে অধিক রাত পর্যন্ত গ্রামের সব বয়সের মানুষ মন্দিরে বসে গল্প-স্বল্প করে। সন্ধ্যায় কীর্তনের আসরে গলা মেলায়।

শ্মশানঘাটের জমি নরেন্দ্রনাথ পরামানিকের কাছ থেকে ক্রয় করেন ৺কালীচরণ সাহা (পিতা ললিতমোহন সাহা) কালীচরণ সাহার ছেলে রামচন্দ্র সাহা জানান, তাঁর বাবা আন্‌রেজিস্ট্রার দানপত্র করে যান শ্মশানঘাটের জন্য। শ্মশানের পূজারি অতুলানন্দ ব্রহ্মচারীর মৃত্যুর পর একাধিক পুরোহিত আসেন ও চলে যান। তারপর আসেন আনন্দ মহারাজ। আনন্দ মহারাজ আমৃত্যু এই শ্মশান মন্দিরে পুজো-অর্চনা করেন। আনন্দ মহারাজের মৃত্যু হয় ১৩৯০ সালে ২ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, সকাল ৯.৩৫ মিনিটে। মহারাজের সমাধির উপর পাকা মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। মহারাজে.. মৃত্যুর পর মন্দিরে পুজো অর্চনা করেন তপনকুমার আচার্য। সমাধি মন্দিরের পাশেই আছে গ্রহরাজ শনি ঠাকুরের মন্দির ও কালী মায়ের মন্দির। বার্ষিক শ্মশান উৎসবে কয়েকশো মানুষের খিচুড়ির পাতা পড়ে। মন্দির ও শ্মশান চুল্লি আলাদাভাবে চারদিকে পাকা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আছে। গোপালপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন গোপালপুর গ্রামের পাকা রাস্তার পাশেই প্রায় দুবিঘা জমিতে নানা রকমারি ফুলের গাছ-গাছালি আর সুদৃশ্য মনোরম পরিবেশের মধ্যে শ্মশানঘাট। চতুর্দিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মন্দিরসহ শ্মশান সংলগ্ন প্রায় সবটাই পাকা। চতুর্দিক পাকা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এখানে এলেই দুদণ্ড বসতে মন চাইবে।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে পাঁচু সাহা শ্মশানের চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দেন ও টালির ছাউনির একটা মন্দির নির্মাণ করে দেন। পরে টালি সরিয়ে পাকা ছাদ করে দেন অশোক দাস। পাচিল ভেঙে গেলে স্থানীয় সমাজসেবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনৈক অর্জুনকুমার সান্ডেল পিতা ৺হাজারীলাল সান্ডেল ও মাতা ৺নীহারবালা সান্ডেলের স্মৃতির উদ্দেশে মোজাইক করা বাবা তারকনাথ ও শ্মশানকালীর নবনির্মিত জোড়া মন্দির ও ভেঙে পড়া পাঁচিল পুনঃ নির্মাণ করে দেন ১ আষাঢ় ১৪০৬ সালে। কালীপদ লাঠ স্মরণে জলধর লাঠ পুকুরঘাট পাকা করে দেন ১৯৯২ সালে। মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বর্তমানে পুজো অর্চনা করেন

নিত্য ঠাকুর। মন্দির ও শ্মশান কমিটির মাধ্যমে শ্মশানে নানা কাজকর্ম হয়। শ্মশানে দুটি চুল্লি আছে। বৈশাখ ১৩ তারিখে বার্ষিক অনুষ্ঠানে দূর-দূরান্তসহ গ্রামবাসী মানুষের খিচুড়ি ভোগের পাতা পড়ে। শ্মশান উৎসব একটা মেলার রূপ নেয়। গোপালপুরেব এই শ্মশান প্রায় তিনশো বছরের প্রাচীনত্বের দাবি কবে থাকে স্থানীয় মানুষজন।

ইছামতী মহাশ্মশান :

স্বরূপনগর বিধানসভাব বাঁকড়া-গোপালপুর ও স্বরূপনগর বাংলানী পঞ্চায়েত এবং গোপালপুব মৌজায় তেঁতুলিয়ার ইছামতী নদীর ধারে প্রায় দু'বিঘা জমি সংলগ্ন তেঁতুলিয়া ইছামতী মহাশ্মশান প্রায় দুশো বছরের প্রাচীন। এই শ্মশানে বারোটা গ্রাম থেকে শবদেহ আসে। গ্রহরাজ শনি ঠাকুরেব মন্দির, কালীমন্দির, শিব মন্দির ত্রিশঙ্কু রাজার পুত্র রাজা হরিশচন্দ্র ও সর্পদংশনে মৃত পুত্র সন্তান রোহিতাশ্বকে কোলে শৈব্যার মন্দির এবং হনুমানের দুহাতে রাম লক্ষ্মণ-এব মন্দিব সংলগ্ন দুটো শবদাহ চুল্লি। মাঘী পূর্ণিমায় তিন দিন ধবে শ্মশানে উৎসব হয়ে থাকে। প্রথমদিন রামায়ণ গান, দ্বিতীয়দিনে কীর্তন, তৃতীয়দিনে বাউল, তবজা, গ্রাম বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি লোকশিক্ষার বাহন যাত্রাপালা হয়ে থাকে। দোকানপাট বসে। শ্মশান উৎসব শ্মশান মেলায় রূপ নেয়। শ্মশান কমিটি : সম্পাদক রণজিৎ ঘোষ (রামচন্দ্রপুর), সহ-সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ (তেঁতুলিযা), সভাপতি অরুণ রায় (হরিশপুর), সহ-সভাপতি রামচন্দ্র সরকার (গলদা)। ইউ.বি.আই ব্যাঙ্কে তিনজনের নামে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট আছে। তাদের মধ্যে একজন হলেন হোমিও ডাক্তার অমূল্য রায়। শ্মশান কমিটির প্রধান উপদেষ্টা অরুণ বসু (তেঁতুলিয়া), উপদেষ্টা সুবোধ মণ্ডল (হরিশপুর)।

এই মহাশ্মশানে বসিরহাটের বর্তমান সাংসদ অজয় চক্রবর্তীব প্রপিতামহ-এর শবদেহ দাহ করা হয়। শ্মশান সংস্কারে সরকারি কোনো সাহায্যের হাত এগিয়ে আসেনি। সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে এমনকী সাংসদের সঙ্গে বহুবাব যোগাযোগ করা হলেও কোনো আশ্বাস মেলেনি। এতদ্ অঞ্চল ছিল বর্তমান সাংসদ শ্রীচক্রবর্তীব পৈত্রিক নিবাস।

শ্মশান উৎসবে বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে গ্রাম থেকে চাল-পয়সা চাঁদা তোলা হয়। অনুষ্ঠান চালিয়ে কোনো বছর দু-পাঁচ হাজার টাকা বাঁচানো সম্ভব হয়। এছাড়া গ্রহরাজের পুজোর চাল-ডাল-তরিতরকারি-প্রণামীর পয়সা পূজারি নিয়ে নিলেও, প্রতি পুজোব যাত্রীর কাছ থেকে তিন টাকা সংগ্রহ করা হয় শ্মশানমন্দিব সংস্কার ও উন্নয়ন কাজের জন্য। এছাড়া প্রতি মন্দিরের প্রণামীর বাক্স থেকে কিছু অর্থ আসে। এছাড়া মন্দিরের গায়ে উৎসর্গকৃত পাথর বসাতে হাজার-এক টাকা দান গ্রহণ করা হয়। একটা পুকুর কেটে লিজ্ দেওয়া হয়েছে। শ্মশান সংলগ্ন জমিতে চিলড্রেন পার্ক, গার্ডেনিং এবং মিটিং রুম নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। শ্মশান সংলগ্ন ইছামতী নদীতে বিজয়া দেখতে তেঁতুলিয়া ব্রিজে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের সমাগম হয়। দোকানপাট বসে। একটা মেলার রূপ নেয়। গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরিকল্পনা আছে বিজয়া উপলক্ষ্যে শ্মশানের জমিতে দোকানপাট বসানো। বিজয়ার মেলা থেকে যেমন আয় হবে তেমনি যানবাহন

সচল থাকবে। এছাড়া আগামী দিনে একটা ট্যুরিস্ট স্পট করার পরিকল্পনা আছে। তেঁতুলিয়া শ্মশানের অনতিদূরে তেঁতুলিয়া উচ্চমাধ্যমিক স্কুল, স্থাপিত ১৮৯৩ সাল। এই স্কুলের পিছনে খাদ্য আন্দোলনের শহিদ নুরুল ইসলামের স্মৃতি ফলক ও কবরস্থান সুন্দর করে ইমারতে ঘেরা আছে।

মুক্তিধাম শ্মশান ও গীতা শ্মশান :

হাবড়া পুরসভার ৮নং ওয়ার্ডে ১২১৭ দাগে ১.৩৯ একর খেলার মাঠ সংলগ্ন ১২১৮ দাগে ২ ২৮ একর জমি নিয়ে মুক্তিধাম শ্মশান। সরকারের কাছ থেকে পুরসভার হাতে শ্মশান হস্তান্তরিত হয় ১৯৮১ সালে। শ্মশানঘাটের ব্যবহারের স্নানঘাট হিসাবে ৪/৫ বিঘার সুন্দর সুসজ্জিত ভাবে বাঁধানো পুকুর আছে। পায়খানা-প্রস্রাবের সুবন্দোবস্ত আছে। নজর কাড়া ফুলবাগান আছে। প্রয়োজন মতো আলোব ব্যবস্থা আছে। যাত্রী নিবাস আছে। এছাড়া বসার জন্য একাধিক সিমেন্টের স্ল্যাব আছে। শ্মশান কালীমন্দিরের পুজো অর্চনা করেন ভোলা চক্রবর্তী। নীল পুজোর সময় বার্ষিক শ্মশান উৎসবে কয়েক হাজাব মানুষের কোলাহলে মুখরিত হয় মুক্তিধাম শ্মশান। চারটে পাকা চুল্লি আছে। এখানে শবদেহ দাহ কবতে মোট খরচ হয় তিনশো দু'টাকা। দরিদ্র মানুষের জন্য পুরসভা থেকে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়। ১৭নং ওয়ার্ডে দু'বিঘা জমি সংলগ্ন গীতা শ্মশান ঘাট বর্তমানে পাঁচিল দিয়ে ঘেরাব কাজ চলছে। এই শ্মশান ঘাট চলে বেসরকারিভাবে। আগামী দিনে এই শ্মশান হাবড়া পুরসভার অধীনে আনার তার কাজকর্ম শুরু হয়েছে।

অশোকনগর-কল্যাণগড় :

অশোকনগর-কল্যাণগড় পুরসভার ১৩নং ওয়ার্ডে প্রায় চার বিঘা জমি সংলগ্ন বিদ্যাধবী খালেব পাশে শ্মশানঘাট আছে। শ্মশান-কালী মন্দির আছে। ভাদ্র মাসের অমাবস্যায় বার্ষিক শ্মশান উৎসবে কয়েক হাজাব মানুষ সমবেত হয়। একটা পুকুব আছে। শ্মশান সংলগ্ন জমিতে পিকনিক স্পট গড়ে উঠেছে। তিনটি পাকা চুল্লির অংশটুকু কেবল পাঁচিল দিয়ে ঘেবা। ৪নং ওযার্ডে আব একটা শ্মশান আছে।

আবদুর রহিম মুনশি'র কবরস্থান :

যদুরহাটি উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন মহম্মদপুর ওরফে মামুদপুরে একশো বছর আগে সাহিত্যিক সাংবাদিক আবদুব রহিম মুনশি জন্মগ্রহণ করেন। আবদুর রহিম লিখিত হজরত মহম্মদের সম্পূর্ণ জীবন চবিত বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বলে কলকাতা গেজেটে সমালোচিত হযেছিল। তা পাঠ কবে লন্ডনের এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষ তা কয়েকখণ্ড ক্রয় করেন। 'মিহির ও সুধাকর' এবং 'মোসলেম হিতৈষী' পত্রিকার সম্পাদক। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কিত কয়েকটি গ্রন্থের বচযিতা। আবদুর রহিম মুনশি লিখিত বই-পত্র-পত্রিকা ও অধিকাংশ বংশধর বর্তমানে বাংলাদেশে থাকেন। বাংলাদেশে আবদুর রহিম মুনশি'র নামে রাস্তা আছে। বিখ্যাত এই সাহিত্যিক স্বদেশে লোকচক্ষুর আড়ালে বিস্মৃতই থেকে গেলেন। ১৯৩১ সালে এই বাংলার অখ্যাত গ্রামে মৃত্যু হলেও তাঁর কবরস্থান কোনো সংরক্ষণ ছাড়াই অনাদরে অবহেলায় পড়ে আছে।

বনগাঁ শ্মশানে ডোম তারাদেবী :

তারাদেবীর স্বামী অশোক দাস পঙ্গু হয়ে পড়ার পর ডোমের কাজ শুরু করেন তারাদেবী। শিয়ালদহ শাখার বনগাঁ থেকে বামনগাছি এবং রাণাঘাট শাখার বনগাঁ থেকে রাণাঘাট পর্যন্ত রেললাইনে কাটা পড়ে কারোর মৃত্যুর খবর শোনা মাত্রই তারাদেবীকে ছুটে যেতে হয় ঘটনাস্থলে। সেখান থেকে মৃতদেহ বনগাঁ রেল পুলিশ থানায় এবং বনগাঁ হাসপাতালে শব পৌঁছে দেওয়ার কাজটাও তারা ডোম করে থাকে। আগে ৩/৪ জনকে সঙ্গে নিয়ে বাঁশের ঝোলায় করে দেহ আনত। এখন পুরসভার দেওয়া ঢাকনাওয়ালা ভ্যান চালিয়ে শব হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে থাকে। দাবিদ্র্যের জ্বালায় চলন্ত ট্রেনের সামনে পড়ে অশোক দাস আত্মহত্যা করেন। স্বামীর ছিন্নভিন্ন দেহ শ্মশানে এবং শবদেহ দাহ করেন তারা ডোম।

জসীম উদ্দীন ও ভূতের মন্ত্র

একবার আমি এক তান্ত্রিক সাধুর শিষ্য হইয়া শ্মশানে শ্মশানে ঘুরিয়াছিলাম। তাহা ছাড়া অনেক ভূতান্তরী মন্ত্রও আমার জানা ছিল। কতক স্মৃতি হইতে, কতক উপস্থিত তৈরি কবিয়া আমি ডাক ছাড়িয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিলাম। প্রথম শরীর বন্ধন করিয়া সরিষা চালান দিলাম। পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তর-মেরুতে, দক্ষিণ-মেরুতে ষোলশ ডাকিনীর সঙ্গে আমার সরিষা উধাও হইয়া ছুটিল —

পিঙ্গল বরণী দেবী পিঙ্গল পিঙ্গল জটা
অমাবস্যার রাতে যেন কালো মেঘের ঘটা,
সেইখানে যারা সরষে ইতিউতি চায়
কাটা মুণ্ড হাতে দেবীর রক্ত ভেসে যায়।
এই ভাবে সরষে ঘুরিতে ঘুরিতে —
তারও পূবেতে আছে এক খানা শ্বেতদ্বীপ,
নীল সমুদ্রের উপরে যেন সাদা টিপ।
সেইখান থেকে আয় আয় দেও দানা আয়,
নীল আসমান তোর ভাইঙ্গা পড়ুক গায়।

* * *

আয় আয় কালকে চণ্ডী আয়, শ্মশান কালী আয়—"

— ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় / জসীম উদ্দীন

□ লেখক পরিচিতি — গবেষক, প্রাবন্ধিক।

হিঙ্গলগঞ্জের শ্মশান ও গোরস্থান

অরুণকুমার দাশ

শ্মশান

'চিতাতেই সব শেষ', না মৃত্যুর পর আবার নতুন করে জীবনের শুরু? এ প্রশ্ন সর্বকালের, সর্বযুগের। মৃত্যুর পর মানুষের কী পরিণতি হয় তা জানার জন্যে মানুষের কৌতূহল অদম্য। প্রাচীনকালে উপনিষদের যুগেও মানুষের কৌতূহল ছিল—মানুষের মৃত্যুর পর কী পরিণতি হয় তা জানার। কঠ উপনিষদে নচিকেতা অল্পবয়সে ঘটনাচক্রে যমপুরীতে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। এখনও তার যমপুরীতে আসার সময় হয়নি বলে যমরাজ তাঁকে মর্ত্যে ফিরে আসতে বলেন। কিন্তু বালক নচিকেতা মর্ত্যে ফিরে আসতে রাজি হলেন না। যমরাজ তাঁকে বর দিতে চাইলেন। বালক নচিকেতা অভাবনীয় এক বর চাইলেন যমরাজের কাছে। "মৃত্যুর পর মানুষের কী হয়?" যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে" এই যে মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের বিতর্ক 'অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে'—কেউ বলে তার অস্তিত্ব থাকে, কেউ বলে থাকে না, নচিকেতা তার সঠিক উত্তর চেয়েছিলেন যমরাজের কাছে।

ভারতীয় ষড়দর্শনে জন্মান্তববাদ স্বীকার কবা হয়েছে। মৃত্যুর পর মানুষকে কর্মফল অনুসারে জন্ম নিতে হয়—একথা জন্মান্তববাদীবা সকলেই স্বীকাব করেন। জন্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অনেকে আজীবন সাধনাও করে গেছেন। মৃত্যুকে জয় করতে অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথাও বলা হয়েছে ষড়দর্শনে।

সর্ব উপনিষদের সাব গীতা মহাগ্রন্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানুষের জীবনের পবিণতি কী তা বর্ণনা করতে গিয়ে ওই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৮ নং শ্লোকে বলেছিলেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পবিবেদনা।"

হে ভারত! সকল প্রাণী জন্মের পূর্বে অপ্রকট ছিল এবং মৃত্যুর পরেও অপ্রকট হবে, কেবল মধ্যভাগ প্রকট বলে মনে হচ্ছে, সুতরাং এতে শোক করার কী আছে?

গীতার এই শ্লোকেও মানুষের মৃত্যুব পর কী হয় সে প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি। মৃত্যু রহস্যের সমাধান করতে পারেনি আধুনিক যুগের উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা এবং অত্যাধুনিক বিজ্ঞানও। মৃত্যু রহস্যের পূর্ব প্রচলিত সংস্কাব এখন অনেকটা শিথিল হতে চলেছে। তবু মৃত্যু রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা এখনও অনেকের মনে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে এই মৃত্যুচিন্তা বাব বার নানাভাবে ঘুরে ঘিরে এসেছে। রবীন্দ্রনাথও এই সমস্যা সমাধানেব সঠিক পথ নির্ধারণ করতে পারেননি।

আর সাধারণ মানুষের কাছে মৃত্যুরহস্য আরও রহস্যাবৃত হয়ে থাকারই কথা। মৃত্যু

প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে মানুষের সামনে আসে। মৃতের সৎকাবের জন্যে মানুষ তৎপরও হয়। মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে কেউ শ্মশানে, কেউ গোরস্থানে যায়। তার সৎকার করে মৃত ব্যক্তিকে চির শান্তির নীড়ে পৌঁছে দিয়ে তারপর আত্মীয়স্বজনরা নিজ নিজ ঘরে ফেরে।

আগের দিনে মৃত বক্তিকে নিজের বাস্তু ভিটাতেই দাহ করা হত। কাউকে সমাধি দেওয়া হত; আবার কাউকে কবরস্থ করা হত নিজের নিজের ভিটাতেই। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষের বসতবাড়ির পরিমাণ কমতে শুরু করে। তখন মৃত ব্যক্তিকে নিজের বাস্তুভিটায় সৎকার করার মানসিকতা অনেকটা কমে যায়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকার সৎকার করার জন্য একটা নির্দিষ্ট জায়গা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। একসময় সর্বসম্মতভাবে মৃতের সৎকারের জন্য একটা জায়গা নির্দিষ্ট হয় এবং সেখানেই সব মৃতদেহ সৎকার করার ব্যবস্থা চালু হয়। হিন্দুরা যেখানে মৃতের সৎকার করে তাকে শ্মশান এবং মুসলমানরা যেখানে মৃতদের কবরস্থ করে তাকে গোরস্থান বলা হয়।

প্রত্যেক জনবসতিপূর্ণ এলাকায় এধরনের শ্মশান বা গোরস্থান আছে। হিঙ্গলগঞ্জ ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকা। প্রথম যখন শ্মশানে শবদাহের ব্যবস্থা শুরু হয় তখন দক্ষিণ হিঙ্গলগঞ্জের ফুলের মাঠে কালিন্দী নদীর তীরে শ্মশানঘাট নির্দিষ্ট করা হয়। ফুলের মাঠের এই শ্মশানে হিঙ্গলগঞ্জ, বাঁকড়া, মামুদপুর, স্যান্ডেলের বিল এলাকার যাবতীয় শব সৎকাব করা হত। কিন্তু এলাকায় যখন জনসংখ্যা আরও বাড়তে লাগল, বাংলাদেশ থেকে প্রচুর লোক এখানে বসবাস শুরু করলেন। হিঙ্গলগঞ্জ হাট যখন বমবমা তখন এলাকার মানুষ শ্মশান ঘাটের স্থান পরিবর্তনের কথা ভাবতে লাগলেন। মোকাম সংলগ্ন স্থানে শ্মশানঘাট হলে সৎকারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহজলভ্য হবে, তাছাড়া ইছামতী কালিন্দী ও যমুনার ত্রিবেণী সঙ্গমে শ্মশানঘাট হলে বেশি পুণ্য সঞ্চয় হবে এমন মানসিকতা যখন সাধারণ মানুষের মনে তখন ফুলের মাঠেব শ্মশানের অপরপাবে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে যায়।

শ্মশানের ওপারেই অধুনা বাংলাদেশ। নদীর পাড়েই ইউ.এন.ডান-এর নামে একটি স্কুল। স্কুলের ছেলেরা নদীব তীরে দাঁড়িয়ে দেখত ৩/৪টি কুমিব জলে ভাসছে। কখনও দেখত জাল ফেলে জেলেরা বড় বড় মাছ ধরছে। নদীর পাশেই ছিল রাইস মিল। এই মিল থেকে গলগল করে কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে সবসময় বেরোত। কেওড়া, বানি, হরগোজা গাছে ভরা নদীর পাড়ে বাস করত মঙ্গলা নামে এক বিখ্যাত ফকিব। অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারত বলে তার খুব নামডাক ছিল। হাড়দ্দহ গ্রামের এক সুদর্শন তরুণ খ্যাপলা জাল কাঁধে নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল নদীতে। হঠাৎ তরুণটি দেখতে পেল একটা শেয়াল পিছনভাবে একটা কেওড়া গাছে উঠছে আবার কিছু সময় পরে পিছন ফিরে নামছে। এই দৃশ্য দেখে তরুণটি খুব ভয় পায়। বাড়ি ফিরেই প্রচণ্ড জ্বর হয়। ডাক্তার, কবিরাজ, মন্ত্র, তুকতাক করেও

ছেলেটিকে বাঁচানো যায়নি। মঙ্গলা ফকিরের কেরামতি কার্যকর হল না। মঙ্গলা ফকির বিষয়টা নিয়ে চিন্তিত। অবশেষে মঙ্গলা ফকিরই কুলের মাঠের শ্মশানে শবদাহ করতে বারণ করেন। মঙ্গলা ফকিরের বারণ অমান্য করার সাহস সাধারণ মানুষের ছিল না। সাধারণ মানুষ তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইছামতী, কালিন্দী ও যমুনার ত্রিবেণী সঙ্গমে একটা ফাঁকা জায়গায় শ্মশান করার সিদ্ধান্ত নেন এবং সেখানে আজও মৃতদেহ সৎকার করা হয়।

হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের অধীন হিঙ্গলগঞ্জ গ্রামপঞ্চায়েতের হিঙ্গলগঞ্জ মৌজার সাবেক ২৩১নং খতিয়ানে সাবেক ১৩৭৯ দাগে চর জমি ১-৪৮ শতকের মধ্যে ৪৯ শতক মোট জমি। ৪৯ শতক জমির মধ্যে ৩৩ শতক জমি বিক্রি বাদে ১৬ শতক জমি হিঙ্গলগঞ্জ নিবাসী কনক ঘোষ মহাশয় শ্মশান ঘাটের জন্য দান করেন। দলিল নং ৬৯/১৪ তারিখ ইং ১০-০৭-১৯৬২ সাল। ৪৯ শতক জমির দলিলের উল্টো পিঠে স্বর্গত কনক ঘোষ মহাশয় লিখে গেছেন— "এই জমি হইতে হিরালাল ও কালিপদ মালোর নিকট ৩৩ শতক বিক্রি দেওয়া—তাহার ভিতর ভেড়ীর গা হইতে শ্মশানঘাট বা সেখান হইতে দেওয়া হইয়াছে ১৩ হাত করিয়া ৫ কাঠা জমি আমাদের আছে, তাহার মধ্যে আরও জমি আছে।" সম্ভবত ছেলেদের বোঝার সুবিধার জন্য এ ধরনের কথা কনকবাবু লিখে থাকবেন। তাঁর পুত্র শ্রীসুকুমার ঘোষ মহাশয় জানালেন তাঁর বাবা ৺কনক ঘোষ মহাশয় ১০ কাঠা জমি শ্মশানঘাটের জন্য সর্বসাধারণকে দিয়ে গেছেন। এলাকার মানুষ সবাই জানেন এটি কনক ঘোষের শ্মশান।

বাংলা ১৩৫৮ সালে নদীর পাড়ে ফাঁকা পতিত জমি দেখে এখানে শবদাহ করার সিদ্ধান্ত নেন এলাকার মানুষ। এই জমি আগে চামেলী মিত্রের ছিল। জমিদারি ভাগাভাগির পর চামেলী মিত্র তাঁর অংশের জমি কনক ঘোষ, কিশোরী মল্লিককে বিক্রি করেন ও হিঙ্গলগঞ্জ স্কুলের বল খেলার মাঠের জন্যে কিছু জমি বিক্রি ও কিছু জমি দান করেন। বল খেলার মাঠের উত্তরপ্রান্তে হিঙ্গলগঞ্জের শ্মশান বিদ্যমান। প্রথমে যখন এই শ্মশানে শবদাহ শুরু হয় তখন এর পাশে ছিল ঘন জঙ্গল। হরগোজা, গেমো, কেওড়া, বানি ইত্যাদি গাছে ভর্তি জঙ্গলে ছিল নানা ধরনের বিষধর সাপ। সাপের ভয় কোনো মানুষ এখানে সাহস করে আসত না। এমন বিপদ সঙ্কুল এবং নির্জন স্থানে এলাকার মানুষ শবদাহ করতে আসে অথচ শবযাত্রীদের বসার কোনো জায়গা নেই দেখে ভূমিদাতা কনক ঘোষ মহাশয় এখানে একটা ভিত তৈরি করে দেন। শ্মশানঘাটের উন্নতি করার ইচ্ছা তাঁর থাকলেও পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে তিনি তাঁর সাধ পূর্ণ করতে পারেননি।

ইং ১৮/১/১৯৯৯ সালে হিঙ্গলগঞ্জ নিবাসী শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত তাঁর স্বর্গতা মাতৃদেবী সুবোধবালা দেবীর স্মৃতি রক্ষার্থে হিঙ্গলগঞ্জ শ্মশানঘাটে একটা পাকা 'চিতা-বেদী' তৈরি করে দেন। এ ব্যাপারে বিভূতিবাবুর ছেলে পল্লব দত্তের (হাবু) ভূমিকা ছিল অনেকখানি। এই

'চিতা-বেদী' তৈরি করে গিয়ে নানা অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় হাবু দত্ত মহাশয়কে। সব বাধা অতিক্রম করে সকলের সহযোগিতা নিয়ে পাকা চিতা-বেদীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান খুব ঘটা করেই অনুষ্ঠিত হয় ১৮/১/১৯৯ সালে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন তৎকালীন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীবিমলকৃষ্ণ দাস এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হিঙ্গলগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীনৃপেন গায়েন।

বর্তমানে পাকা 'চুল্লি-বেদী'কে ঘিরে পাকা পাঁচিল উঠেছে। চুল্লির পশ্চিম প্রান্তে তৈরি হয়েছে পাকা কালী মন্দির। প্রতিবছর বাড়ি ফিরে যান। সামাজিক রীতি অনুসারে কেউ ১০ দিন, কেউ ১৩ দিন, কেউ ১৫ দিন, কেউবা একমাস অশৌচ ভোগ করেন। প্রথামতো ঘাট, ও সামর্থমতো শ্রাদ্ধ সমাধা হলে আত্মীয় পরিজনদের প্রীতিভোরে ব্যবস্থা থাকে।

জনশ্রুতি আছে—হিঙ্গলগঞ্জ শ্মশানে 'বাঁকা সাধু' কিছুদিন শব সাধনা করেছিলেন। এই সাধনা বলে তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন। জলের উপরে বসে ধ্যানস্থ অবস্থায় ভেসে যেতে পারতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। যোগ সাধনা করলে এরকম ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু লোভ বা গর্ব এসে গেলে সে ক্ষমতা তখন আর থাকে না। বাঁকা সাধুর মধ্যেও গর্ব এবং পয়সা রোজগার করার লোভ এসে যাওয়ায় তার ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে যায়। তারপর ওই সাধু এলাকা ছেড়ে চলে যান। বাঁকা সাধু ছাড়া আর কেউ এই শ্মশানে শবসাধনা করেছেন এমন কথা জানা যায়নি।

এই শ্মশানকে কেন্দ্র করে কোনো শ্মশানকেন্দ্রিক সাহিত্য রচিত হয়নি, রচিত হয়নি কোনো লোকসংগীতও। তবে হিঙ্গলগঞ্জ শ্মশানকে ঘিরে আছে অনেক বেদনাঘন স্মৃতি। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ বেদনায় ভারাক্রান্ত হতে দেখা গেছে অনেক পুত্রহারা মাকে, স্বামীহারা স্ত্রীকে, পুত্রহারা বাবাকে, স্ত্রীহারা স্বামীকে। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ বেদনায় ভারাক্রান্ত মনে যখন প্রিয়জনকে শেষ বিদায় জানিয়ে বাড়ি ফেরেন তখনকার বেদনাঘন চিত্র দেখে চোখে জল ধরে রাখা সত্যিই কষ্টকর হয়। বিশেষ করে সেই মৃত্যু যদি অকাল মৃত্যু হয় তাহলে সেই মর্মান্তিক বেদনার ছবি সমগ্র গ্রামকে কাঁদায়।

শ্মশান এবং শ্মশানযাত্রার মধ্যে একটা বিশেষ দর্শন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। মৃত্যুতেই যদি সব কিছু শেষ হয়ে যেত তাহলে শ্মশানযাত্রা এবং মৃত ব্যক্তির পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনায় কেউ কিছু করত না। এইসব পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে জন্মান্তরবাদীরা মৃতব্যক্তির পরবর্তী জীবন সুখময় হোক এই আশা পোষণ করে এবং পরলোকগত আত্মার উর্দ্ধগতি কামনা করে। জন্ম হলে যেমন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তেমন মৃত্যু হলে তার আবার জন্মটাও অবশ্যম্ভাবী। কারণ যে আত্মা দেহে অবস্থান করে তার তো বিনাশ নেই, মৃত্যু নেই। আত্মা এক দেহ পরিত্যাগ করে আর এক দেহ ধারণ করে। পরবর্তী জীবনে যাতে সেই

আত্মা উর্ধ্বগতিপ্রাপ্ত হয় সেই কামনাই করেন মৃতের নিকট আত্মীয়রা। তাঁর পরলোকগত আত্মার উর্ধ্বগতির জন্যই পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম করে থাকেন আত্মজরা। আত্মা যে অবিনাশী সে কথা তো গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৩নং শ্লোকে সুন্দরভাবে বলা হয়েছে।

" নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।"

শস্ত্র দ্বারা এই জীবাত্মাকে ছেদন করা যায় না, অগ্নি একে দহন করতে পারে না। জল একে ভেজাতে পারে না এবং বায়ু একে শুষ্ক করতে পারে না। তাৎপর্য হল এই যে, অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা শরীর মৃত হলেও জীবাত্মা মরে না, বরং তেমনই নির্বিকার ভাবে থাকে। তাহলে প্রশ্ন জাগে মানুষের মৃত্যুর পর এই জীবাত্মা কোথায় যায়? এ প্রশ্নের উত্তরও গীতা মহাগ্রন্থে আছে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২২নং শ্লোকে বলা হয়েছে —

"বাসাংসি জীর্নানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরানি
তথা শরীরানি বিহায জীর্ণ
অন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"

যেমন মানুষ পুবাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহীও পুরাতন শরীর ত্যাগ করে অন্য নতুন শবীব প্রাপ্ত হয়।

মানুষ যখন শবীরের সঙ্গে একাত্মবোধ করে তখন শরীরের মৃত্যুকে মৃত্যু বলে মেনে নেয় এবং দুঃখিত হয়। কিন্তু শরীরের সঙ্গে নিজের একাত্মতা যে মেনে নেয না, সে মৃত্যুবরণ করতে দুঃখিত হয় না বরং আনন্দিত হয।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে মৃত্যু সম্বন্ধীয় নানা প্রশ্ন বারবার আলোড়িত করেছে। মৃত্যু কী, মৃত্যুর উদ্দেশ্য কী, মৃত্যুতেই কী জীবনেব অবসান, অথবা জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কি না? এসব প্রশ্নেব উত্তব খোজার চেষ্টাও রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। তাই মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর যুবক বয়সের উপলব্ধি—"জীবন সব কিছুকে রাখে, আর মৃত্যু সব কিছুকে চালায়। প্রতি মুহূর্তেই মরছি আমি, আর সেই মরার ভিতর দিয়েই আমি বাঁচার রাস্তায় এগোচ্ছি, যেন আমার মধ্যে সেলাইয়ের কাজ চলছে—গাঁথা পড়ছে অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান। মুহূর্তকালীন মৃত্যুপরম্পরা দিয়ে মর্ত্যজীবন এই যেমন বেড়ে চলেছে প্রবাল দ্বীপের মতো, তেমনি মৃত্যুর পর মৃত্যু আমাকে দিয়ে লোক লোকান্তরের অভিজ্ঞতার জাল বিস্তার করে চলবে—আমার চেতনার সূত্রটিকে নিয়ে মৃত্যু এক এক ফোঁড়ে এক-এক লোককে সম্বন্ধসূত্রে গাঁথবে।"

মৃত্যু চিন্তাব সাথে জীবনের শেষ পরিণতি, জন্মরহস্য, জন্মান্তর ইত্যাদি নানা প্রশ্ন জড়িয়ে

আছে। মৃত্যু সম্পর্কে কবি, দার্শনিক, ও ধর্মপ্রবক্তারা যুগে যুগে তাঁদের নিজস্ব চিন্তা ভাবনাকে, তাদের নিজস্ব বিশ্বাসকে নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যক্ত করার চেষ্টা করে গেছেন। আমাদের দেশের বিভিন্ন সাধক সম্প্রদায় তাঁদের সধনার মাধ্যমে এক আউল, বাউল, ভাটিয়ালি, দোঁহা, ভজন প্রভৃতি গানে, শাক্তপদেও বৈষ্ণব পদাবলিতে নানাভাবে মৃত্যু চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। "জীবন-মৃত্যুর স্বরূপ উপলব্ধির এই চেষ্টার পিছনে যে মনোভাবটি বিশেষরূপে সক্রিয় তা হল—যা প্রিয় বা কাম্য, তা সত্য হোক, স্থায়ী হোক এই আকাঙ্খা। কিন্তু মৃত্যুতে জীবন দৃশ্যত সমাপ্ত, তাই মৃত্যুর স্বরূপ, জীবনের পরিনাম ইত্যাদি প্রশ্নে মানুষ আলোড়িত হয়। কেউ এ-জন্মেই সব শেষ বলে মনে করেন, কেউ পরজন্মকে মহিমান্বিত করে তোলেন, কেউ বা জীবনচক্রের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন।"[১]

মৃত্যু সম্বন্ধে নানা ভাবনা বিভিন্ন মানুষকে নানাভাবে ভাবিত করলেও এর সঠিক সমাধানসূত্রে কেউ আজও আসতে পারে নি। সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে মানুষের মনে মৃত্যু সম্বন্ধে যে কৌতূহল, যে জিজ্ঞাসা ছিল তা আজও বিদ্যমান। কারণ মানুষের চিন্তা ভাবনা ভিন্ন ভিন্ন, বিশ্বাস সংস্কারও ভিন্ন ভিন্ন তাই মৃত্যু সম্বন্ধে সর্বজন গ্রাহ্য কোনো বিশ্বাস আজও গড়ে ওঠে নি।

Sinha T.C. 'Samiksa' তে জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধীয় ধারণা কিভাবে ব্যক্ত হয়েছে তার সামান্য একটু ধারণা দিয়েই এ প্রসঙ্গের ইতি টানব।

"মৃত্যুতে জীবের বাহ্য-দেহ-রূপের অবসান ঘটে এ-সত্য সকলের দৃষ্টিগোচর। কিন্তু বস্তুগত দিক থেকে দেহের পরিণতি যা-ই হোক না কেন একেই চরম সত্য বলে মেনে নিতে চায় না মানুষ। জীবন-মৃত্যুর সম্পর্ক, দেহ আত্মার সম্বন্ধ নিয়ে তার মনে নানা প্রশ্ন জেগে ওঠে। আর এর সমাধানে ব্যক্তির বিশ্বাস- -সংস্কার আবেগ অনুভূতি কাজ করে।"[২]

গোরস্থান

মুসলমান যেখানে মৃতদেহ কবরস্থ করে সেইস্থানকে গোরস্থান বলা হয়। হেঙ্কেল সাহেবের আবাদ-পত্তনের আগে আমিন নগরে (বর্তমান হিঙ্গলগঞ্জ) মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা ছিল বেশি। মুসলমানদের অনেক পুরানো কবরস্থান হিঙ্গলগঞ্জ এবং আশেপাশের গ্রামে আছে।

হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের হিঙ্গলগঞ্জ গ্রামসভার সা-পুর গ্রামের গোরস্থানটি সবচেয়ে পুরনো। এই গোরস্থানটি কতদিনের পুরনো সেকথা সঠিকভাবে বয়ঃবৃদ্ধরাও বলতে পারেন না। সা-পুর থেকে ন-নম্বর স্যান্ডেলের বিলগামী ইটের রাস্তার দক্ষিণপাশে একবিঘা জমি কবরস্থানের জন্য

১. Leadwater, C.W. The otherside of death, 1909, P-47

২. Sinha, T.C. 'Samiksa', Journal of India psycho-analytical society, special issue, 1963, P-1

নির্দিষ্ট আছে। কবরের উপর কবর দেওয়ার রীতি থাকায় জায়গার সমস্যা দেখা দেয় না। অন্যান্য জায়গা থেকে কবরস্থানটি আলাদা রাখা হয়েছে। পবিত্র কবরস্থানকে পবিত্র রাখার জন্য সবসময় সচেষ্ট গ্রামের মানুষ। এই কবরস্থানের মালিক ছিলেন কলিমগাজী। বর্তমানে সর্বসাধারণ এই কবরস্থান ব্যবহার করেন। ৯৭ নং হিঙ্গলগঞ্জেব ৩নং সিটে সাবেক ১৮৪৮ দাগে এই কববস্থান। পরিমাণ প্রায় এক বিঘা।

মৃতকে কবরস্থ করার আগে মুসলমান সমাজে বেশ কঠিন নিয়ম পালন করা হয়। মৃত্যুব অব্যবহিত আগে থেকেই নিয়মকানুন শুরু হয়ে যায়। মৃত্যুব পূর্বলক্ষণ দেখা দিলে অর্থাৎ মুমূর্ষু ব্যক্তির দু-পা শিথিল হয়ে গেলে এবং নাক বেঁকে গেলে, কানপট্টি বসে গেলে মৃত্যু দ্রুত শিয়রে ভেবে নেওয়া হয়। তখন মুমূর্ষু ব্যক্তির মাথা থেকে বালিশ বের করে তাকে উত্তর শিয়রে "কেবলামুখী" অর্থাৎ পশ্চিমদিকে মুখ করে শোয়ানো হয়। কাছে বসে নিকটজনেরা জনে জনে কালিমায়ে তাইয়েবাহ বা শাহাদৎ পড়তে থাকে। মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কালিমাহ পড়াব জন্য জোব কবা হয় না। যদি কষ্ট করে একবার পড়তে পাবে তাহলেই যথেষ্ট। এসময় মুমূর্ষুর খুব কাছে বসে সুরা ইয়াসীন পড়া হয় যাতে তিলাওয়াতেব বা কালিমাহের শব্দ তার কানে যায়। এতে ব্যক্তিটির জাঁকান্দানীব কষ্ট কম হয়। এ সময় অনেকে সুরা ইয়াসিন পড়েন।

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে রুহ বা জান বের হয়ে গেছে অর্থাৎ মৃত্যু হয়েছে নিশ্চিত জেনে হাত পা সোজা করে দেওয়া হয়। এ সময় "বিসমিল্লাহে ওয়া আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লাহি" বলতে বলতে চোখ, মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সাবা দেহ একটা পাক (পরিস্কার) কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। লোবান বা আগরবাতি জ্বালানো হয়। মৃত্যুব পব গোসল (স্নান) না দেওয়া পর্যন্ত লাশের কাছে বসে কুবআন শবীফ পড়া ভালো বলে মনে করেন। এসময় অপবিচ্ছন্ন কোনো লোককে লাশেব পাশে যেতে দেওয়া হয় না।

একটা লম্বা, চওড়া তক্তা বা চৌকিব চাবদিকে ৩/৫ বাব মোমবাতির খুশবু ধুনি ঘুবিয়ে লাশকে শোয়ানো হয় এবং তক্তা বা চৌকিব চারদিকে সুতিব মশারি বা কাপড় দিয়ে ঘিবে দেওয়া হয়, যাতে মৃত ব্যক্তিকে কেউ দেখতে না পায়। এরপব পরনের পোশাক খুলে নিয়ে পুরুষের জন্যে নাভি থেকে হাঁটু, মেয়েদের গলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় ঢাকা দেওয়া হয়। মৃত ব্যক্তিকে দক্ষিণদিকে মাথা ও উত্তরদিকে পা করে শোয়ানো হয়।

ওজু কবার পরে মৃতব্যক্তিকে স্নান করাতে হয়। কুল বা নিমপাতা সিদ্ধ জল, ঠান্ডা পবিষ্কার জল মজুত বাখা হয় মৃতদেহ পবিষ্কাব করার জন্যে। সুগন্ধ সাবানগোলা ঠান্ডা জলও বাখা হয়। যারা স্নান করান তাবা পরিষ্কাব নেকড়া হাতে জড়িয়ে মৃতব্যক্তির কাপড়েব নীচে হাত ঢুকিয়ে জল দিয়ে পরিষ্কাব করে। স্নানের পর মৃত ব্যক্তিকে সাবধানে ওজু করানো হয়। তাবপর নানান প্রক্রিয়ায় নানা অঙ্গ পরিষ্কার করা হয়। প্রথমে সিদ্ধ জল, তারপর সাবান জল

এবং সব শেষে ঠান্ডা জল ব্যবহার করা হয়। মৃত ব্যক্তিকে ডানদিকে ফিরিয়ে শুইয়ে বাঁ পাশের উপর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ধোয়ানো হয়। পরে বাঁ পাশকে একই নিয়মে ধোয়ানো হয়। পরে মৃতব্যক্তিকে ঠেস দিয়ে বসিয়ে পেটে আস্তে চাপ দিয়ে পেটের জমা ময়লা বের করে দেওয়া হয়। তারপর সারা দেহ শুকনো কাপড় বা তুলো দিয়ে ভালো করে জলহীনভাবে মোছা হয়। জল থাকলে কফিন ভিজে যাবে। এসময় দেহটাকে সাবধানে নাড়াচাড়া করা হয়। কারণ মৃত ব্যক্তির দেহ ফোঁড়ার মতো ব্যথা বলে এঁদের ধারণা।

স্নানের পর লাশকে কফিনে রাখার সময় স্ত্রীলোক হলে মাথায় এবং পুরুষ হলে মাথায় ও দাড়িতে আতর লাগানো হয় এবং অন্য অঙ্গে কর্পূর লাগানো হয়।

স্ত্রী মৃত স্বামীর গোসল দিতে পারে কিন্তু পুরুষ স্ত্রীর গোসল দিতে পারে না। এককথায় স্ত্রী লোকেরাই গোসল দেয়।

গোসলের পর মৃত ব্যক্তিকে কফিন পরিয়ে জানাজার নামাজ পড়া হয়। পুরুষের কফিন তিনখানা (১) কোর্তা (২) ইয়ার (৩) লেফাফা। মহিলাদের পাঁচখানা— (১) কোর্তা (২) ইয়ার (৩) সারবন্দ (৪) লেফাফা (৫) সিনাবন্দ।

প্রথমে লেফাফা বিছানো হয় তারপর ইয়ার রাখা হয়। তার উপর কোর্তার নীচের অংশ বিছানো হয়। তার উপর লাশ রেখে কোর্তার অংশ টেনে নেওয়া হয়। প্রথমে ডান ও পরে বাম দিক থেকে ওটা গোটানো হয় এবং ডানের অংশ বামের উপর থাকে। ইয়ারের মতো লেফাফাও গোটাতে হয়।

মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রথম সিনাবন্দ বিছানো হয়, পরাবার সময় কোর্তা পরানো হয়, চুল যাতে কোর্তার উপর থাকে সেদিকে নজর দেওয়া হয়। তারপর সারবন্দ রাখা হয়, সিনাবন্দ সব কাপড়ের উপরে থাকে। লেফাফা খুলে যাওয়ার ভয় থাকলে সুতো বা কাপড়ের ফিতে দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়।

স্ত্রী, পুরুষ শিশু সব রকমের লাশকে সামনে রেখে ইমাম (মৌলবি) লাশের মাথা বরাবর নামাজে দাঁড়ান এবং ৪ তকবীর বলা হয়। তারপর নিয়্যাত করা হয়।

"নাওযাইতুআন উআদ্দিয়া আরবা' আতাকবীবাতে সালাতিল
জানাযাতে ফারখিল কিফায়াতে, অছদনাও লিল্লাহি তালা
ওয়াস সালাতু আলান্নাবিয়ো ওয়াদ্দোআউ লিহা-খাল
মাইয়োতি —আল্লাহ্ আকবার।"

জানাজার ফরযে কফায়াহ্ নামাজ ৪ তকবীর সহ ইমামের পিছনে পড়া হয়। যদি স্ত্রীলোক মারা যায় তাহলে লিহাযানের জায়গায় লিহায়েহিন বলতে হয়।

ইমাম উচ্চশব্দে তকবীর বলে তাহরীনা (বুকে হাত বাঁধা) বাঁধবে মুক্তাদীরা (পিছনে যারা

দাঁড়াবে) নীরবে তকবীর বলে তাহরীয়া বাঁধবে এবং ইমামও মুক্তাদি সকলে সানা পড়েন - "সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তালা যাদ্দুকা ওয়াজাল্লা ছানাউকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।"

কেবল প্রথম তকবীরের সময় হাত কান পর্যন্ত তোলা হয় বাকি ৩ তকবীরের সময় হাত তোলা হয় না, ২য় তকবীর বলে দরদ (কালিমাহ্) পড়ার নিয়ম মৃত যদি নাবালক ছেলে বা মেয়ে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দু-আ হল—

"আল্লাহুম্মা জাল আলহু লানা ফারার্তাও

ওয়জআলদ্ লানা আজরাঁও ওয়া যুখরাঁও ওজআলহু

লানা শাকেআঁও ওয়া মুশফফাআ।

মৃত যদি বালিকা হয় তাহলে 'হু'এর জায়গায় 'হা' বলা হয়।

জানাজা নামাজ পাড়ার বা মহল্লার একজন যদি পড়ে তাহলে সকলের আদায় হয়ে যায়। ইমাম ছাড়া যদি পাচজন উপস্থিত থাকে তাহলে ১ম কাতারে দুজন, ২য় কাতারে ২জন, এবং ৩য় কাতারে একজন দাঁড়াতে হয়। লোক বেশি হলে ৭/৯ বিজোড় কাতার করা হয়। বিনা নামাজে দাফন (কবর দিলে) করলে লাশ ফেটে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কবরে জানাজা পড়া যায়। তবে পিছনে থাকলে জানাজা হবে না।

গোসল, কাফন, জানাজার মতো দাফন অবশ্য করণীয়। ভূমিষ্ঠ হবার পর যে শিশু সরে যায় তার নামকরণ করতে হয় এবং উপরের নিয়মে সব ব্যবস্থা করা হয়। মৃত শিশু প্রসব করলে কোনো নিয়ম মানা হয় না। শুধু কাপড় জড়িয়ে কবরস্থ করা হয়।

কাঁধে খাট ধরার সময় প্রথমে লাশের ডান হাতের দিকের পায়া তুলে ওই ব্যক্তি দশ পা এগিয়ে গিয়ে পিছনের পায়ে কাঁধে নেবে। বাঁ পাশের সামনের পায়া, শেষে বাঁদিকের পিছনের পায়া কাঁধে নেবে। প্রতিবারে দশ পা চলবে, এইভাবে প্রত্যেকের চল্লিশ পা চলবে। হাদিসে আছে মুর্দাকে নিয়ে চল্লিশ পা গেলে চল্লিশটা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। লাশ কাঁধে করে "লাই লাহা ইল্লা লাহা ইল্লালাহু মহম্মদ রসুইল্লা' এই জানেজা উচ্চারণ করে মৃতকে কবরস্থানে নিয়ে যায়।

কবর লাশের চেয়ে কিছু লম্বা, প্রস্থ তার অর্ধেক এবং বুক বা নাভি পর্যন্ত গভীর করা হয়। সিন্দুকী ও বগলী দু-রকমের কবর করা হয়। কবরের নীচে জমি পুবে থেকে পশ্চিমে ঢালু রাখা হয় যাতে মাথা পশ্চিমদিকে ঝুঁকে যায়। কবরের পশ্চিমদিকে লাশ নামিয়ে ঘাড় উত্তরদিকে রেখে কবরে পশ্চিম মুখে দাঁড়িয়ে লাশকে হাতের উপর নামিয়ে নেওয়া হয়। লাশের মুখ পশ্চিমদিকে রাখা হয়। কবরে যারা নামে তাদের সংখ্যা দুই বা তার বেশি।

মেয়েদের লাশ পর্দায় ঢেকে বহন করা হয়। যাদের সঙ্গে বিয়ে চলে না—ভাই, ছেলে,

ভাগ্নে, ভাইপো তারাই লাশ বয়ে নিয়ে যায়, লাশ নামায়। কবরে বাঁশ চাপা না দেওয়া পর্যন্ত অন্যান্য পুরুষরা দূরে থাকে। কবরে লাশ রাখার সময় বলতে হয়—"বিসমিল্লাহি ওয়া আলামিল্লাতি রাসুলিল্লাহি" অর্থাৎ আল্লাহোর নামে আর রসুলের দ্বীপের উপব সমর্পণ কবলাম। কবরে রাখার পর কফিনের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়। তারপর বাঁশ বা কাঁচা ইট বা পাকা ইট কবরের উপরে সমান করে বিছিয়ে মাটি চাপা দেওয়া হয়। কবর মাছের পিঠের মতো করা হয়। চৌকোনা করা হয় না। কবর থেকে যে মাটি বেরোয় তাই কবরে দেওয়া হয়।

উপস্থিত জনতা প্রত্যেকে ৩ মুঠো মাটি দু-হাতে নিয়ে মাথার দিক থেকে আস্তে আস্তে কবরে রাখে। দূর থেকে ছুঁড়ে দেওয়া হয় না। প্রথম মুঠো হাতে করে বলা হয়—"সিনহা খ্যলাক্কনাকুম"—এই মাটি থেকে তুমি সৃষ্টি হয়েছো। ২য় মুঠোয় বলা হয়—"ওয়ামীনহা নুখবিজুকুম তা-রাতানউখরা" এই মাটি থেকে পুনরায় তোমাকে বার করা হবে। মাটি দেওয়ার পর কবরের মাথার দিক থেকে জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। তারপর তাজা খেজুরের ডাল মাঝখান থেকে চিরে কবরের মাঝখানে পুঁতে দেওয়া হয়। যারা যেখানে থাকবেন সেখানে দাঁড়িয়েই কলিমাহ ও তছবীহ পড়বেন মনে মনে। কবরের সৌন্দর্যের জন্যে সৌধ বা গম্বুজ করা যায় না।

আত্মা যে অবিনাশী তা মুসলমানরাও স্বীকার করেন। পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনাও উর্ধ্বগতি লাভের জন্যেই নানাবিধ নিয়ম পালন করেন। অবিনাশী আত্মাকে উদ্দেশ্য করে কিছু প্রশ্ন করার রীতি এদের মধ্যে আছে। কবর থেকে চল্লিশ পা দূরে সরে এসে মৃতব্যক্তির আত্মা বা রূহকে প্রশ্ন করা হয়। এই প্রশ্ন ভিন্নজনের মতে বিভিন্ন হলেও সুনকাব - নকীব নামে দুজন ফেরেশতা এই প্রশ্ন করেন - ১) তোমার রব্ব (প্রতিপালক) কে? ২) তোমার নবী কে? ৩) তুমি কার উম্মত? ৪) তোমার ধর্ম কী? ৫) তুমি কোন ধর্মাবলম্বী ছিলে? যদি মৃতব্যক্তি নেককার (সৎ) হয় তাহলে প্রশ্নের জবাব সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়। ১। আমার প্রতিপালক আল্লাহ ২। হজরত মহম্মদ আমার নবী। ৩) আমি তাঁরই একান্ত বিশ্বাসী উম্মত। ৪) আল্লাহের মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলামই আমার ধর্ম। ৫) আমি ইসলামধর্মে একান্ত বিশ্বাসী।

মৃতদেহের রূহ যদি মুনকার ও নকীরের প্রশ্নের জবাব সঠিক দিতে পারে তাহলে আল্লাহ পাক একটু দূরে থেকে ফেরেশতাদ্বয়কে নির্দেশ দেন— "হে ফেরেশতাদ্বয়! উহাকে তোমাদের আব কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না। আমি উহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমরা কবর হইতে একটি সুড়ঙ্গ করিয়া দাও, যেন সে যথাস্থানে শুইয়া বেহেশতের (স্বর্গের) সুগন্ধি অনুভব করিতে পারে।" ফেরেশতাদ্বয় তার কবর থেকে বেহেশত পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ করে দেবে। শেষ বিচারের আগে কেয়ামতের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত ওই ব্যক্তি যথাস্থানে শুয়ে বেহেশতের শান্তি পাবে।

তারপর ফেরেশতাদ্বয় মৃতব্যক্তির আত্মাকে নিয়ে আসমানে চলে যাবে এবং আল্লাহ পাকের পবিত্র আরশের নীচে ঝাড়বাতির মত একরকম পূরের তৈরি বাতির মধ্যে রেখে দেবে। ওই পবিত্র আত্মা বা রূহ কিয়ামত পর্যন্ত ওই পূরের বাতির মধ্যে অবস্থান করবে।

মৃত্যুর পরে পরলোকগত আত্মার পরিণতি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত। হিন্দুদের মতো মুসলমানরাও আত্মাকে অবিনাশী বলে মনে করেন। তাই কবর সম্বন্ধীয় এই ধারণা তাদের মধ্যে বিদ্যমান।

কবরস্থানকে মুসলমানরা অত্যন্ত পবিত্র স্থান বলে মনে করে। কবরস্থান যাওয়া এঁদের এক পুণ্যকর্ম। বিশেষ করে পুরুষদেব কবরস্থানে যাওয়া রসুলের হুকুম। কবরস্থানে গেলে নিজের জীবনের শেষ পরিণতি যে মৃত্যু একথা মনে পড়ে। জীবনের পরিণতি যাতে সুখকর হয় সে জন্যে তার পুণ্য কর্ম করাব প্রবণতা বাড়ে। হাদিসের কথা এঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেন। সেই হাদিসে আছে শুক্রবার অর্থাৎ জুম্মাব দিন বাবা মার কবরে যিয়ারত করলে অনেক গুনাহ মাপ হয়। কবরস্থানে যিয়ারত করলে অনেক পুণ্য সঞ্চয় হয়। কবরস্থানে যিয়ারত করার আগে ভালো করে ওজু করতে হয় এবং কবরের কাছাকাছি গিয়ে নীচে দোঁয়াটি মাঝাবি আওয়াজে পড়ার রীতি আছে।

"আসসালামু আলহিকুম ইযা আহলাল কবুরে
ইযাগাফরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম ওয়া আনতুম
সালাফুলা ওয়া নাহনু বিল আহব।"

তাবপর সুরা ফাতিহা ১বাব, দরুদ শরীফ ৩/১০বার, সুরা ইয়লাস ৩বার, সুরা মাউন ৪ বার পড়ে কবরবাসীর নামে পৌঁছে দিতে হয়। তবে টাকা পয়সা দিয়ে ভাড়াটিযা এনে কবর যিয়ারত করলে কোনো ফল হয় না, এতে মৃতেব আত্মা শান্তি পায় না।

ধর্মীয় এবং বিজ্ঞানসম্মত দুটি কারণে কবর দেওয়া হয়। মুসলমান শাস্ত্র অনুসারে মানুষের জীবন দুটি—মরণের আগে একটি এবং মবণেব পরে একটি। মরণের পরে মানুষের যে জীবন —সেই জীবনের সুখ কামনায় বা স্বর্গ কামনায় মৃতের আত্মজবা বা নিকট আত্মীয়রা মৃতদেহ কবরস্থ করে। শাস্ত্র অনুসারে প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর পর কবর দেওয়া ফরজ, সুতবাং প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীদেব কবর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। আর বিজ্ঞানসম্মত কাবণ হল — মৃতদেহ রেখে দিলে তা পচে দুর্গন্ধ হবে পরিবেশকে দূষিত করবে। জীবিত মানুষের কাছে ওই মৃতদেহ ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে তাই মৃতদেহ কবরস্থ করা হয়।

মুসলমান সমাজে মৃত্যুর ৪০ দিনে শেষ কাজ করার রীতি প্রচলিত। মৃত্যুর চার দিনে ছোট করে একটা অনুষ্ঠান করা হয়। শেষ দিনে অনুষ্ঠান বড় কবে করতে হয়। যেসব প্রতিবেশীরা জানেজা পড়েন, যে মৌলবি জানেজা পড়ান এবং গ্রামের মানুষ ও আত্মীয়

পরিজনদের ডেকে ওইদিন খাওয়ানো হয়। আর্থিক অবস্থা অনুসারে অনুষ্ঠানের কলেবর বাড়ানো কমানো হয়।

সা-পুর গ্রামের ৫৯ বছরের রজত আলি গাজী জানালেন—বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সম্পন্ন ব্যক্তিরা নিজের ভিটাতেই বাবা মার গোর দিয়ে থাকেন। কারণ এর মধ্যে একটা আভিজাত্য আছে। কিন্তু যাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ, যাদের প্রশস্ত বাস্তুভিটে নেই তারা সকলেই এই কবরস্থানে মৃতদেহ কবরস্থ করতে আনেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বর্তমানে আর তেমন প্রশস্ত ভিটে কারুর নেই। গ্রামের এবং আশেপাশের প্রায় সকলেই এই কবরস্থানে আসেন।

সা-পুরের গোরস্থানটি অনেক পুরনো। এই কবরস্থানকে ঘিরে নানা আজগুবি গল্প প্রচলিত আছে। আছে অনেক অলৌকিক কাহিনি। তবে কবরকেন্দ্রিক কোনো সাহিত্য নেই। নেই কোনো যাদু।

মৃত্যুতেই জীবনের শেষ নয়, মৃত্যুর পরে আর নতুন জীবনের শুরু একথা বিশ্বাস করেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা। সেই নতুন জীবনের শুভ কামনা করেন এঁরা মৃত্যুর পর আত্মা বেহেস্তে চলে যায় বলে সাধারণ মানুষ মনে করেন। মৃত্যুতে যদি জীবনের শেষ না হয় তাহলে জীবনের শেষ কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে কবিগুরুর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলা যায়—"শেষ নাই যার, শেষ কথা কে বলবে?

তথ্যসংগ্রহ :

১ গোষ্ঠবিহারী দাস—হিঙ্গলগঞ্জ (দাসপাড়া). ২ পল্লব দত্ত (চন্দ)—হিঙ্গলগঞ্জ (বাজার). ৩ বাসুদেব হালদার—হিঙ্গলগঞ্জ (মালোপাড়া). ৪ মহাদেব হালদার—হিঙ্গলগঞ্জ (মালোপাড়া). ৫. মহঃ রজত আলি গাজী—সাপুর. ৬ আলাউদ্দিন গাজী—সাপুর. ৭ সাকিলা খাতুন—কাটাখালি ৮ হালিমা খাতুন—কাটাখালি।

শাহজাহানের সমাধি

তাজমহলের বিপরীত দিকে যমুনার অপর তীরে সাজাহান আরম্ভ করেছিলেন নিজের সমাধি রক্ত প্রস্তর দিয়ে। সেই রক্তবর্ণ সমাধি সম্রাটের শৌর্য বীর্য ও ঐশ্বর্যের প্রতীক। আর তাজবিবির সমাধি হবে শ্বেত শুভ্র মর্ম্মরের—শুচি, শক্তি ও সৌন্দর্যের প্রতীক। দুইটি সমাধিকে সংযুক্ত করে দেবে একটি ঘন কৃষ্ণ মর্ম্মরের সেতু। কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর হবে মৃত্যুর প্রতীক। সাজাহানের সমাধি সম্পূর্ণ হয়নি, কারণ তার পূর্ব্বেই সাজাহান হলেন বন্দী। ঔরংজেব বল্লেন-বন্দী শাহজাহানের আবার বিলাস কেন? তবু মৃত্যুর পরে ঔরংজেব কৃপা করে শাহজাহানের মৃতদেহ তাজবিবির পার্শ্বে সমাধিস্থ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। অনুগ্রহ বৈকি!

— জাহানারার আত্মকথা/অধ্যাপক মাখনলাল রায়চৌধুরী

□ লেখক পরিচিতি—প্রাবন্ধিক, গবেষক, শিক্ষক।

কলকাতার শ্মশান ঃ নিমতলা

হরিপদ ভৌমিক

সেকালে কলকাতা বলতে বোঝাত উত্তরে বাগবাজার, দক্ষিণে কালীঘাট, পূর্বে লবণহ্রদ ও পশ্চিমে গঙ্গা। এই সীমানার মধ্যে রয়েছে তিনটি শ্মশান—কাশী মিত্রের ঘাট, নিমতলা শ্মশান ও ক্যাওড়াতলা শ্মশান। এই তিনটির মধ্যে প্রাচীন নিমতলা। কাশী মিত্রের ঘাটে যে শ্মশান সেটি তৈরি করেছেন কাশীরাম মিত্র। কবে তৈরি হয়েছে জানা যায় না, তবে ১৭৮৪-৮৫ খ্রিস্টাব্দে মার্ক উডের এবং ১৭৯২-৯৩ সনের এ. আপজনের ম্যাপে এই ঘাটের নাম 'Casheram Meeters Gaut'-এর নাম রয়েছে। ১৮৫২-৮৬ খ্রি. পি. ডবলিউ সিমসের ম্যাপে এবং ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে হেশ্যামের ম্যাপে Cassy Mitter's Gt.-এর নাম পাওয়া যাচ্ছে। আঠারো শতকে কাশীরাম মিত্র এবং উনিশ শতকের ম্যাপে কাশী মিত্র ঘাট নাম থাকলেও শ্রদ্ধেয় রাধারমণ মিত্র ব্যক্তির নাম কাশীরাম মিত্রের নামটি সঠিক বলে মনে করেন নি। তিনি জানিয়েছেন, ম্যাপে ওই নামটি ভুল আছে, আসল নাম হল কাশীশ্বর মিত্র। ঘাটের কাছেই তাঁর খুব বড় বাড়ি ছিল, ইনিই এই শবদাহের ঘাটটি তৈরি করে দেন। কোন তথ্যের ভিত্তিতে শ্রদ্ধেয় রাধারমণ মিত্র এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন তা তিনি জানান নি, তাই ঘাটের প্রতিষ্ঠাতা কাশীরাম মিত্রই যে কাশীশ্বর মিত্র এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হচ্ছে না। এই ঘাটটিতে সতীদাহ হত বলে 'সতীদাহের ঘাট' নামেও ঘাটটি পরিচিত ছিল। সতীদাহ আইন পাশ হলে, ১৮২৯ সনে শেষ সতী এই ঘাটেই হয়েছিল।

দক্ষিণে কালীঘাটের ক্যাওড়াতলা শ্মশানটি উনিশ শতকের মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে লেখা সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায় 'কালীক্ষেত্র দীপিকা' গ্রন্থটিতে 'শ্মশানভূমি' শিরোনামে এই শ্মশানের ইতিহাসে লেখা হয়েছে—"অতি পূর্বে কালীঘাটের কোনো স্থানে শ্মশান ভূমি ছিল কি না তাহার কোনো নির্দশন পাওয়া যায় না। না থাকারই কথা। লোক জনের বসবাস না থাকিলে শ্মশানভূমির কি প্রয়োজন হইতে পারে? কালীঘাটের লোক সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানভূমির আবশ্যকতা হইয়াছিল। পূর্বে কালীর সম্মুখীন গঙ্গার ঘাটেই শব দাহ হইত। পরে মিউনিসিপ্যালিটির সংস্থাপনের পরে ওই সকল স্থানে শব দাহ বন্ধ হইয়া যায়। সমস্ত উপনগরের শবদাহার্থ ১৮৬২ সালে বর্তমান শ্মশান ভূমি নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু ধরিতে গেলে এ অঞ্চলের রীতিমতো শ্মশান টালিগঞ্জের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে। এজন্য ওই স্থানকে তর্পণ ঘাটা কহে। অদ্যাবধি ওই স্থানে শব প্রোথিত করিবার নিয়ম রহিয়াছে।

শব দাহার্থ বর্তমান শ্মশানভূমি কালীঘাটের নৈঋত কোণে গঙ্গার তীরে অবস্থিত। মধ্যস্থলে কালীমন্দির, উহার ঈশান কোণে নকুলেশ্বর এবং অন্য দিকে নৈঋত কোণে শ্মশান। পূর্বে এই শ্মশানের অবস্থা এত কদর্য ছিল যে তথায় শব দাহ করিতে গেলে লোকের বিলক্ষণ কষ্ট হইত। তথায় কিছুই ছিল না কেবল অনাবৃত ভূমিখণ্ড, অঙ্গার ও ভস্মে আবৃত। থাকিবার মধ্যে কএকটা ক্যাওড়া গাছ মাত্র ছিল এজন্য ওই স্থানকে অদ্যাবধি লোকে ক্যাওড়াতলা কহিয়া থাকে।

কালীর সেবাইত ঁগঙ্গানারায়ণ হালদারের বনিতা সর্ব প্রথমে শ্মশানভূমির উন্নতির দিকে মনোযোগ প্রদান করেন। যে কালীঘাটের সেবাইত পুরুষগণ স্ব স্ব স্বার্থ লইয়া নিয়ত ব্যস্ত, স্থানের

উন্নতির দিকে যাহাদের কটাক্ষ মাত্র নাই, সেই কালীঘাট গ্রামের অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দু রমণী হইয়া সর্বাগ্রে সাধারণ লোকের কষ্ট নিবারণে যত্ন ও ব্যয় করা সাধারণ শ্লাঘার বিষয় নহে। এই সাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষিণী হিন্দু রমণী শ্মশানে গঙ্গার ঘাট এবং শবদাহার্থে আগত লোকের রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষার জন্য ইষ্টক নির্মিত একটি ঘর নির্মাণ দ্বারা এবং শ্মশানে যাইবার সুগম পথ বাঁধাইয়া দিয়া সাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

এস্থলে হাইকোর্টের বেঞ্চক্লার্ক বরিশাল নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয়ের নামোল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। স্থান পিতার স্মরণার্থ উক্ত শ্মশানে শবদাহার্থ আগত লোকজনের বিশ্রাম জন্য বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া দিয়া সাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। ইহার যত্নে ও ব্যয়ে শ্মশানটি এমনি হইয়াছে যে বর্ষাকালের অন্ধকার রাত্রিতেও শবদাহ করিতে গেলে লোকের কোনো কষ্ট অনুভূত হয় না। যাহা হউক ইহাদের যত্নে শ্মশানের পূর্বেকার ভীষণ অবস্থা এখন লোকের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।''

কলকাতার পুরানো শ্মশান নিমতলা। সেকালের রীতি অনুযায়ী নিমতলায় অন্তর্জলী যাত্রা বা গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পিতামহীকে গঙ্গাযাত্রায় নিমতলায় নিয়ে আসার পর, সেই পূর্ণিমার রাতটি তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছিল। সে রাতের কথায় স্বরচিত জীবন চরিত'-এ তিনি লিখেছেন—''১৭৫৭ শকে (১৮৩৫ খ্রি.) দিদিমার যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত, তখন আমার পিতা এলাহাবাদ অঞ্চলে পর্যটন করিতে গিয়াছিলেন, বৈদ্য আসিয়া কহিল রোগীকে আর গৃহে রাখা হইবে না। অতএব সকলে আমার পিতামহীকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য বাড়ির বাহিরে আনিল। কিন্তু দিদিমা আরও বাঁচিতে চান, গঙ্গায় যাইতে তাঁহার মত নাই। তিনি বলিলেন যে, 'যদি দ্বারকানাথ বাড়িতে থাকিত, তবে তোরা কখনই আমাকে লইয়া যাইতে পারিতস নে।' কিন্তু লোকে তাহা শুনিল না। তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাতীরে চলিল। ... আমি সেই সময়ে গঙ্গাতীরে তাঁহার সঙ্গে নিয়ত থাকিতাম। দিদিমার মৃত্যুর পূর্বদিন রাত্রিতে আমি ওই চালার নিকটবর্তী নিমতলার ঘাটে একখানা চাঁচের উপরে বসিয়া আছি। ওই দিন পূর্ণিমার রাত্রি—চন্দ্রোদয় হইয়াছে, নিকটে শ্মশান। তখন দিদিমার নিকট নাম সঙ্কীর্তন হইতেছিল। 'এমন দিন কি হবে, হরিনাম বলিয়া প্রাণ যাবে।' বায়ুর সঙ্গে তাহা অল্প অল্প আমার কানে আসিতেছিল। এই অবসরে হঠাৎ আমার মনে এক আশ্চর্য উদাস ভাব উপস্থিত হইল। আমি যেন আর পূর্বের মানুষ নই। ঐশ্বর্যের উপর একেবারে বিরাগ জন্মিল। ...শ্মশানের সেই উদাস আনন্দ, তৎকালের সেই স্বাভাবিক সহজ আনন্দ মনে আর ধরে না। ... এই ঔদাস্য ও আনন্দ লইয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় আমি বাড়িতে আসিলাম। সে রাত্রিতে আমার আর নিদ্রা হইল না। এ অনিদ্রার কারণ আনন্দ। সারা রাত্রি যেন একটা আনন্দ জ্যোৎস্না আমার হৃদয়ে জাগিয়া রহিল। রাত্রি প্রভাত হইলে দিদিমাকে দেখিবার জন্য আবার গঙ্গাতীরে যাই। তখন তাঁহার শ্বাস হইয়াছে সকলে ধরাধরি করিয়া দিদিমাকে গঙ্গার গর্তে নামাইয়াছে এবং উৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে 'গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম' নাম ডাকিতেছে। দিদিমার মৃত্যু হইল। আমি নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, তাঁহার হস্ত বক্ষঃস্থলে, এবং অনামিকা অঙ্গুলিটি উর্ধ্বমুখে আছে। তিনি 'হরিবোল' বলিয়া অঙ্গুলি ঘুরাইতে ঘুরাইতে পরলোকে চলিয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া আমার বোধ হইল, মরিবার সময় উর্ধ্বে

অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমাকে দেখাইয়া গেলেন 'ওই ঈশ্বর ও পরকাল'। দিদিমা যেমন আমার ইহকালের বন্ধু ছিলেন, তেমনি পরকালেরও বন্ধু।'' নিমতলা মহাশ্মশানের চিতাগ্নির দিকে তাকিয়ে কত মানুষেব হৃদয়ে যে বৈরাগ্য ভাব জন্মেছে তার কোনো হিসেব নেই। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আত্মকথা লিখেছেন বলে তাঁর হৃদয়-বৈরাগ্যের ভাবের কথা ধরা পড়েছে।

নিমতলা মহাশ্মশানে কত জ্ঞানী, গুণী, সাধারণ মানুষ যে চিরনিদ্রায় শুয়ে রয়েছে তার আংশিক হিসেব পুরসভার শ্মশান রেকর্ড বুকে থাকলেও তা কখনো প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত হয়নি বলে ইতিহাস কিন্তু স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে নি। ওই ১২৯৮ সনের ১৩ শ্রাবণের সকালে কবি মানকুমারী দেবী এসেছেন গঙ্গাস্নানে। তিনি দেখলেন নিমতলাঘাটে 'জাহ্নবী বক্ষে ধু ধু করে চিতার আগুন জ্বলছে। ওই আগুনে বাংলার সর্বনাশ হচ্ছে। বাংলার 'পিরামিড' ভস্মসাৎ হচ্ছে। ওই ধুধু করে আগুন জ্বলছে, ওই আগুনে বাংলার সম্মান গৌরব পুড়ে ছাই হচ্ছে। ওই জ্বলন্ত আগুনে বাঙালির প্রধান অহঙ্কার প্রধান গর্ব পুড়ে যাচ্ছে। ওই চিতার আগুনে আজ কত কি ফুরাল। সহস্র সহস্র বক্ষ শ্মশান হল। কত কাঙাল গরিব একত্রে পিতামাতা হারা হল। আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়েব নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক দেব-দেহ চিতায ভস্ম হচ্ছে।'

একইভাবে ভস্মীভূত হয়েছিল আর একটি পুণ্য দেহ ১৯৪১ সনের ৭ আগস্ট তারিখে। ১৬ আগস্ট তারিখে 'দেশ' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—''শ্রাবণী পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র যখন সবেমাত্র পূর্বাকাশে উদিত হইতেছিল এবং পবিত্র সলিলা গঙ্গাবক্ষে তাহার শত সহস্র প্রতিবিম্ব তরঙ্গায়িত হইয়া ভগবানেব একত্ব ও অসীমত্বের সাক্ষ্য দিতেছিল তখন সেই একত্ব ও অসীমত্বের চির-পূজারি রবীন্দ্রনাথেব নশ্বব দেহকে কেন্দ্র করিয়া লেলিহান অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়া ওঠে এবং কয়েক ঘণ্টাব মধ্যে উহাকে পঞ্চভূতে বিলীন করিয়া ফেলে।''

নিমতলায় স্মৃতি রোমন্থন করা যায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এমনি অনেকেব। এঁদের মতো আরো স্মরণীয় বরণীয় অনেকেই শেষ শয্যা নিয়েছিলেন নিমতলার মাটিতে। এই ইতিহাসেব পাশাপাশি গঙ্গার পাড়ে নিমগাছের তলায় শেষযাত্রার স্থান নির্বাচন, শ্মশানের পাকা ঘব নির্মাণ সহ নানান ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে এই নিমতলা মহাশ্মশানেব শরীবে। পাঠককে সেই ইতিহাসের সামনে দাঁড় করিয়ে বলা যেতে পারে 'হে অতীত কথা কও' —

নিমতলার আদি শ্মশান ঘাট

নিমতলা ঘাট স্ট্রীট ও স্ট্যান্ড রোডের সংযোগস্থলে রয়েছে আনন্দময়ী মায়েব কালী মন্দির। এই মন্দিরের দরজার সামনে দিয়ে প্রবাহিত হত গঙ্গা। এই গঙ্গার গড়ানো কিনারাতেই মন্দিরের গায়ে ছিল শবদাহেব স্থান। শ্মশানের মধ্যেই পর্ণকুটিরে মা অধিষ্ঠিতা ছিলেন। এই কারণে আনন্দময়ী মাকে শ্মশান কালী বলা হয়।

মা যে শ্মশানেই ছিলেন, তেমন প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাণকৃষ্ণ দত্তের লেখায়। তিনি জানিয়েছেন—''এই কালীর প্রতিমা ইতিপূর্বে রাস্তা হইতে অনেক নিম্নে স্থাপিত ছিল। কয়েক বৎসর হইল উর্ধ্বে তুলিয়া বসানো হইয়াছে। যখন এই কালীর সম্মুখে মিউনিসিপ্যাল ড্রেন বসানো হয়, তখন নিম্ন স্থান হইতে রাশি রাশি অঙ্গার, অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠ এবং নরকঙ্কাল বাহির

হইযাছিল। আনন্দময়ী পশ্চাতে একটি নীচু চাঁদনি ও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খিলানযুক্ত পাকা ঘাট ছিল।''

মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখাতেও এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন—''নিমতলার দিকে বাঁধানো ঘাট কিছুই ছিল না। আগে আনন্দময়ীর তলাতেই ঘাট ছিল এবং একটা চাঁদনি বহু দিন ছিল। .. তখন মড়াপোড়াবার (স্থায়ী) ঘাট ছিল না।.. ইট, পাটকেল ও মড়ার হাড় চারিদিকে ছড়ানো থাকিত এবং অনেক শকুনি, হাড়গিলে আশে পাশে বসিয়া থাকিত। অসাবধানে চলিলে পায়ে মড়ার হাড় ফুটিয়া যাইত। আমার পায়ে একবার ফুটিয়া ঘা হইয়াছিল। তখন কাঠ, বাঁশ দিযা মড়া খানিকটা পোড়ানো হইত, বাকিটা শকুনি খাইত। সে অতি ভীষণ দৃশ্য ছিল। এখনও মনে করিলে ভয় হয়। শ্মশান তো প্রকৃতই শ্মশান ছিল।''

পরে গঙ্গার স্রোত-প্রবাহ খানিকটা পশ্চিম দিকে সরে গেলে, লটারি কমিটির টাকায় স্ট্র্যান্ড রোড তৈরি হয। গঙ্গাতীরে গঙ্গাজলীযাত্রা ও শবদাহ কারণে শ্মশান আনন্দময়ীতলা থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা নিমতলা শ্মশান যে সত্যিই মহাশ্মশান ছিল তা ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুন তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি পড়িলেই বোঝা যাবে—''৪ঠা জুন তারিখের পূর্বাহ্ণে হাটখোলার থানাদার পোলিশের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের নিকটে একজন ফকিরকে আনিয়া কহিলেন যে, আমি ইহাকে নিমতলার ঘাটে শব ভক্ষণ করিতে দেখিয়াছি তাহাতে ওই শবখাদককে তৎক্ষণাৎ শহর বদল করিতে হুকুম হইল।''

নিমতলায় শুধু মানুষের শব নয়, কলকাতাকে পরিষ্কার রাখার জন্য শহরে ডোমদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পশুপাখির অসংখ্য মৃতদেহ প্রতিদিন সংগ্রহ করে নিমতলা শ্মশানের একপাশে তা জড়ো করা হত। এদের চামড়া ছাড়ানোর জন্য বহু মানুষ ভিড় করত এই শ্মশানে। পরে কন্ট্রাকটর নিয়োগ করা হয়, এরা চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে দেহগুলি আবার গঙ্গায় ফেলে দিত। কমিশনারগণ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে টেন্ডার ডেকে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হত ১৮৫৩ খ্রি এক বিজ্ঞাপনে জানানো হয়েছিল—'১৮৫৪ সালের নিমিত্তে নিমতলা ঘাটের চামড়ার জন্য খাজনা দিতে হইবে।

১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে ২ মার্চ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন—'যবন ও খ্রিস্টানদিগের গোরের জন্য যে প্রকার বিপুলার্থ ব্যয় হইতেছে, হিন্দু প্রজাদিগের নিমিত্ত সেইরূপ ব্যয় কিছুই দেখা যায়না।' বরং উল্টোটা হয়েছে বলে মন্তব্য করা হয়েছে—'হিন্দুদের শব দাহের নিমিত্ত এই রাজধানী মধ্যে কেবল নিমতলার শ্মশান নিরূপিত আছে, তাতে মিউনিসিপ্যাল বিষয়ের অর্থ ব্যয় হওয়া দূরে থাক, ওই শবদাহের ঘাটের এক ভাগে মৃত পশুর দেহ নিক্ষেপ করার নিয়ম থাকাতে পশু চর্ম বিক্রয়ের কন্ট্রাক্ট দ্বারা প্রতি বৎসর অনেক টাকা উৎপন্ন হচ্ছে।'

মনুষ্য শব ও পশু শব মিলে নিমতলা শ্মশানের চেহারা ভয়াবহ হয়েছিল। এখন যেখানে শবদাহ করা হয় তার কিছু দক্ষিণে ছিল পুরানো নিমতলার শ্মশানঘাটটি।

নিমতলায় পাকা ঘাট নির্মাণ

নিমতলার গঙ্গাতীরে নির্দিষ্ট স্থানে শবদাহ হলেও, শবদাহ চলাকালে জোয়ারের জলে চিতা ভিজে গিয়ে এক বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি করত। আধপোড়া মৃতদেহ নিয়ে ভাটা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা

করতে হত, অনেকে এত সময় অপেক্ষা না করে অর্ধদগ্ধ মৃতদেহটি গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে চলে যেত। বিষয়টির একটি স্থায়ী রূপ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেছিলেন অনেকেই। কিন্তু বাস্তবরূপ দিতে কেউ এগিয়ে আসেননি। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকায় শবদাহ স্থান পাকাপাকিভাবে নির্মাণের জন্য জনমত তৈরির চেষ্টা শুরু করেন। জনহিতকর ওই প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানায় সমাচার দর্পণ পত্রিকা। ১লা জুলাই তারিখে স্থায়ী শবদাহ স্থান তৈরি বিষয়ে পত্রিকায় কিছু বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। সেই বিষয়গুলি হল—

১) "আমরা জানি না যে এ বিষয়ে রাজ সরকারের নিয়মিত রূপে দরখাস্ত অদ্যাপি হইয়াছে কিনা যদি না হইয়া থাকে তবে প্রার্থনাপত্র দিলে ইহার উপায় হইতে পারে।"

২) "এ শহরে প্রায় ষাট হাজার বাটী আছে ইহার দুই ভাগ হিন্দু হইবেক ইহারা বৎসরে যে টেক্স দেন তাহার চতুরাংশের একাংশ এক বৎসরের নিমিত্ত মাজিস্ট্রেট বা লাটিরি কমিটি সাহেবদিগকে দেন তা হলে কিছু হতে পারে।"

৩) "সকল যোত্রাপন্ন (অবস্থাপন্ন) হিন্দুরা চাঁদা করিয়া অর্থ সঙ্গতি করেন। তাহলে শবদাহ স্থান হতে পারে।"

৪) "যত লোক মরে বা যত শব কলিকাতার ঘাটে জ্বালায় তাহার উপর নিশ্চিত কর স্থাপন করিয়া তদ্যুৎপন্ন অর্থ সংগ্রহ করিয়া গঙ্গাতীরে শবদাহ স্থান তৈরি করা সম্ভব।"

শুধু কি করলে কি হবে বলেই বসে থাকেন নি এঁরা। গঙ্গার জলের ভেতর থেকে তিন দিকে দেওয়াল তুলে মাটি ভরাট করে শবদাহের স্থান করার পরামর্শ দেওয়া হয়। সঙ্গে একটি নকশা ও খরচের আনুমানিক হিসেবও করে দিয়েছিলেন এঁরা। পত্রিকায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল— "গঙ্গাতীরে রাস্তার ধারে জলের ভিতর ভিত্তি উঠাইয়া তিন দিকে দেওয়াল দেওয়াইয়া দুইটি চত্বর নির্মিত করা যায় তাহাতে পশ্চিম দিক খোলা থাকে পোতা মৃত্তিকাতে ভরাট হয় তাহাতে ওই শবদাহ কার্য হয়।

যদি পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ এ বিষয়ে পৌষ্টিকতা করেন তবে ইহার নকশা ও ব্যয়ের সংখ্যা ইত্যাদি আমারদিগের নিকট প্রস্তুত আছে প্রকাশ করিব।"

না, কোনো ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিমতলায় শবদাহ ঘাটের কাজ শুরু হয়নি। পরে বাবুদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে অস্থায়ী ঘাটকে স্থায়ী রূপ দেবার চেষ্টা শুরু হয়। নিমতলার সঙ্গে কলকাতার জন্য আরো দুটি ঘাটকে জুড়ে মোট তিনটি ঘাটের জন্য চাঁদা তোলা ঠিক হয়। এই শুভ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে 'অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার স্থান' শিরোনামে ১৫ মাঘ ১২৩৩ সনের সমাচার দর্পণ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—"আমরা অত্যন্ত আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে পূর্বোক্ত বিষয়ে আমারদিগের অনির্বচনীয় যে ক্লেশ আছে তাহা নিবারণার্থে কোনো ২ মহানুভব মহাশয়েরদিগের চেষ্টা দ্বারা উপযুক্ত উপায় হওনোদ্যোগ হইয়াছে শুনিলাম যে নিমতলা হইতে বাগবাজার পর্যন্ত তিনটি শবদাহের নিমিত্তে স্থান হইবেক।"

তিনটি শবদাহের ঘাট তৈরি করার জন্য যাঁরা চাঁদা দেবেন বলে জানিয়েছেন তাতে হাজার বিশেক টাকা ওঠার কথা। ১৫ মাঘ (১২৩৩ সন) তারিখে এই আনন্দ সংবাদটি দিয়ে 'সমাচার দর্পণে' লেখা হয়েছিল—"কতিপয় জনের চান্দাতে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা দস্তখত হইয়াছে, আর

অবশিষ্ট লোকেরদের এতদ্বিষয়ে যে অনুরাগ দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় যে অত্যল্পায়াসে বিংশতি সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ হইতে পারে আর ওই টাকায় তিনটি ঘাট হইয়া এতৎ সংক্রান্ত আর ২ কর্মও সম্পন্ন হইতে পারিবেক।

চাঁদা সংগ্রহ এবং একটি বছর কাজ করার পর নিমতলার শবদাহের স্থানটি সম্পূর্ণ হয়। ১৭৬ বছর আগে ১৭মার্চ (১৮২৮ খ্রিঃ) সোমবার নিমতলায় নূতন স্থায়ী নির্মাণের শ্মশানে শবদাহ শুরু হয়। সেই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সংবাদ ছাপা হয়েছিল 'সংবাদ তিমির নাশক' পত্রিকায়। ওই পত্রিকা থেকে সংবাদ নিয়ে 'অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার নতুন স্থান' শিরোনামে ২২ মার্চ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় সংবাদটি ছাপা হয়েছিল এই বলে—"মোং নিমতলার ঘাটে যে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার স্থান নির্মাণ হইতেছিল তাহা এক্ষণে প্রস্তুত হইয়াছে। বিশেষত, গত সোমবার অবধি ওই স্থানে শবের সৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে ইহাতে অনেকের পরিশ্রম দূর হইয়াছে।"

নিমতলায় স্নানের ঘাট

রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করে গঙ্গার তীরদেশ বাঁধিয়া সুন্দর পুরুষ ও স্ত্রীলোকের স্নানঘাট তৈরি করে দেন। শবদাহ করার পর শুদ্ধ হতে গঙ্গাস্নানের প্রয়োজন, সুতরাং শ্মশানঘাটের পাশে এই স্নানঘাট নিজ ব্যয়ে তৈরি করে দিয়ে রাধামাধব দেশবাসীর শ্রদ্ধাভাজন হন। এই ঘাটটি তৈরি হয়েছিল ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে। অক্টোবর মাসে এই ঘাটের কথা প্রথম প্রকাশিত হয় সমাচার চন্দ্রিকা পত্রিকায়। পরে ৩০ অক্টোবর ছাপা হয় 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায়। এই ঘাটের কথায় পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—'...শ্রীযুক্ত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধনব্যয়করণক এতন্মহানগর প্রতীচীদিগ্বর্ত্তিনী অখিল জন পাবনি মোক্ষদায়িনী সুরধনী তীরৈকদেশে অর্থাৎ নিমতলার ঘাটে সকল জন মনোরঞ্জনীসোপান শ্রেণি শিল্পিতমকর্তৃক ইষ্টকাদি দ্বারা অপূর্ব ঘাট নির্মিত হইয়াছে তাহার শোভা অতিশয় মনোলোভা। প্রথমত, জলোপরি সোপান শ্রেণি অর্থাৎ সিঁড়ি তদুপরি বিস্তৃত সমস্থলী তদুপরি স্তম্ভ সমূহোপরি ইষ্টকাচ্ছাদন ... ওই ঘাটের এক পার্শ্বে স্ত্রীলোকদিগের স্নানাদি ও অন্য পার্শ্বে পুরুষের স্নান পূজনাদি হইবে.. ।'

নিমতলায় গঙ্গাযাত্রীর ঘর

রানি রাসমণির স্বামী বাবু রাজচন্দ্র দাস রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি স্নানঘাটের দক্ষিণে 'আসন্নকালে গঙ্গাতীরে নীত ব্যক্তিদের ওই স্থানে থাকিয়া সেবা শুশ্রূষাদি রূপ উপকার' জন্য একটি গঙ্গাযাত্রীর ঘর তৈরি করে দিলেন। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে এই ঘাটটির কাজ শুরু করা হয়েছিল বলে ১ জানুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা থেকে জানা যায়—"অত্যল্পকালের মধ্যেই ওই অট্টালিকা প্রস্তুতার্থ ৬০০০ টাকা ব্যয় হইবে... অতএব বাবু রাজচন্দ্র দাস মুমূর্ষু ব্যক্তিদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া যে রূপ বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি অত্যন্ত প্রশংসনীয়।" এই ঘাটটি পরবর্তীকালে মহেন্দ্রনাথ দত্তও দেখেছেন, তিনি জানিয়েছেন—'মাড়েদের গঙ্গাযাত্রীর ঘর এখনও আছে।'

গঙ্গাতীরে গঙ্গাযাত্রীর ঘর কেন সেকালে এত প্রয়োজনীয় ছিল তা বুঝতে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের

২ মে তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের সারমর্মটি পড়তে হবে। সেখানে বলা হয়েছে—'গঙ্গাতীরে নিয়ে গিয়ে রোগী ব্যক্তিকে যাচ্ছেতাই যে একটা 'খড়ুয়া' ঘরে রাখা হয় তাতে দিনের রৌদ্র ও রাতের শিশির নিবারণ হতে পারে না। এই জায়গায় দু-তিন দিন থাকতে হলে যে দুরবস্থা হয় তা বলা যায় না। আসলে মূর্খ চিকিৎসকের পরামর্শে এই ব্যক্তিদের গঙ্গাতীরে নিয়ে যায়। তারপর তাকে ওই ঘর থেকে উঠিয়ে গঙ্গায় অর্ধেক শরীর ডুবিয়ে রেখে প্রচণ্ড রোদের তাপে আর্দ্রভূমিতে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। শেষে দু-একজন আত্মীয় স্বজন তার পায়ের আঙুল মাটির মধ্যে ঠেসে ধরে, কেউ তার বুকে গঙ্গামাটি লেপন করে হরিবোল হরিবোল বলতে বলতে একটু একটু গঙ্গাজল মুখে ঢালতে শুরু করে। এমনও হতে পারে মূর্খ চিকিৎসক রোগ বুঝতে না পেরে এই মুহূর্তে মরবে এমন সম্ভাবনা নেই যে রুগীর, সে চিৎকারে বলতে থাকে আমি এখন মরব না, আমাকে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাও। তাতে আত্মীয-স্বজনরা ওই যমসম চিকিৎসককে আবার জিজ্ঞাসা করলে তিনি মনে করেন যে এখন ফিরিয়ে নিয়ে গেলে তাঁর অসম্ভ্রম হবে, তাই তিনি বাড়ির লোকদের ডেকে বলে দেন, এর মৃত্যু হতে আর দেরি নেই, একে ফিরিয়ে নিতে হবে না। সুতরাং রুগীর চিৎকারে কেউ মনোযোগ দিল না। শুরু হয়ে গেল গলায় অনবরত জল ঢালা। এর মধ্যে যদি জোয়ার আসে তবে রোগীর কোমর পর্যন্ত জল উঠে যায়, তাই তখন রোগীকে কোনো রকমে টানাটানি করে ডাঙার দিকে তোলা হয়। ওই ভাবেই দেহটাকে ফেলে রাখা হয় মাটির উপর। মৃত্যু আসন্ন বুঝে আবার দেহটা মাটির উপর থেকে নিয়ে জলে ফেলাইল, এবং চাকর দিয়ে মুখে গঙ্গা জল গেলাতে থাকেন। অনবরত জল গিলে শেষে বেশি জল গিলতে না পেরে মরে যায়।'

গিরিশ বসুর গঙ্গাযাত্রীর বাড়ি

বিখ্যাত কাঠের ব্যবসায়ী গিরিশচন্দ্র বসু গঙ্গাযাত্রীদের থাকার জন্য তৈরি করে দিয়েছিলেন একটি দোতলা বাড়ি ও মহিলাদের স্নানের ঘাট। ঘাটে একটি ফলকে সেই স্মৃতি-কথা আজও লেখা রয়েছে—

স্ত্রীলোকদের স্নানের ঘাট
কলিকাতা নিমতলা ঘাট স্ট্রীটের
মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র বসু
মহাশয়ের ব্যয়ে পোর্ট কমিশনারদিগের দ্বারা নির্ম্মিত।
ইংরেজি সন ১৮৯৫ বাংলা ১৩০১ সাল।

গঙ্গাযাত্রীদের দোতলা বাড়ি হবার পর। একদিন এক গঙ্গাযাত্রী গিরিশবাবুকে একটি অসুবিধার কথা জানান, তাঁর নিকট আত্মীয় রাতে মারা গেছেন কিন্তু সময় বুঝতে পারেন নি কারণ মধ্যরাতে সময় দেখার কোনো ব্যবস্থা নেই। পারলৌকিক ক্রিয়ায় সময়ের গুরুত্ব রয়েছে। সময় অনুসারে যদি কোনো দোষ পায় তাহলে প্রায়শ্চিত্ত করে শ্রাদ্ধ করতে হয়। এই অসুবিধা দূর করতে গিরিশচন্দ্র বসু বিলেত থেকে দুটি বড় ঘাড় আনিয়ে একটি গঙ্গাযাত্রীর বাড়ির উপরে বসিয়ে দেওয়া হল, অন্য ঘড়িটি তাঁর বাড়িতে লাগিয়ে রাখেন। গঙ্গাযাত্রীদের জন্য লাগানো

ঘড়িটি পুরানো স্মৃতি নিয়ে আজও রয়েছে।

নিমতলায় শ্মশান স্থানান্তরের প্রস্তাব

ইংরেজি ১৮৬৪ সন। ইংলিশম্যান পত্রিকায় কলকাতার গঙ্গাজল দূষণের জন্য নিমতলার শ্মশানকে দায়ী করা হয়। অন্ধবিশ্বাসে তখন অন্তর্জলী যাত্রায় মৃত্যু হওয়া ব্যক্তিকে বেশিরভাগই সৎকার না করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হত। অন্যদিকে কলকাতাকে পরিষ্কার রাখতে পশু পাখির মৃতদেহও গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হত। জল থেকে এই দেহ তুলে নিমতলা শ্মশানের পাশেই চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে দেহ ফেলে দেওয়া হত। ফলে নিমতলা অঞ্চল এবং গঙ্গা দুটো স্থানের পরিবেশই প্রচণ্ডভাবে দূষিত হয়ে গিয়েছিল। এই বিষয়টির দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে জোরালো ভাষায় ইংলিশম্যান পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হলে সরকার পক্ষ নড়ে চড়ে বসে। বাংলার ছোটলাট বিডন সাহেব ঠিক করেন, নিমতলা থেকে শ্মশানটি হাওড়া বা কলকাতার উপকণ্ঠে কোনো জনবিরল স্থানে সরিয়ে দেবেন।

কলকাতার নগর পরিষেবার দায়িত্বে তখন 'জাস্টিসেস অভ দ্য পিস' কমিটি। ছোটলাট বিডন সাহেবের সেক্রেটারি এফ আর কাক্রেল সাহেব জাস্টিসেস অভ দ্য পিস-এর সভাপতিকে এবিষয়ে একটি চিঠিতে লেখেন--

ফোর্ট উইলিয়ম ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪ সাল

জুডিসিয়াল সংক্রান্ত।

আজ মহানগর কলকাতার পুলিশ কমিশনার সাহেবের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে, সেই চিঠি বিষয়টি কার্যকর করতে জাস্টিসেস অভ দ্য পিসেরা বিশেষভাবে যত্নবান হবেন, যেহেতু রাজধানী কলকাতার সীমা মধ্যে গঙ্গাতীরে শবদাহ করার নিয়ম বন্ধ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নিমতলা ঘাটে শবদাহ ও মৃত পশুর চামড়া কেটে নেওয়ার নিয়ম থাকায় জনাকীর্ণ ওই পল্লীর লোকেদের নানান কষ্ট ও অসুবিধে হচ্ছে।

নিমতলা ও নিকটবর্তী ঘাটে শবদাহ করা ও মৃত পশুর চামড়া ছাড়াবার নিয়ম থাকার মানুষের যে শুধু কষ্ট হচ্ছে তা-ই নয়, বিশেষত ওখানে গঙ্গাজলে শব ফেলায় লোকেদের যন্ত্রণা বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, অতএব এই ঘৃণিত নিয়ম আর প্রচলিত রাখা ঠিক হবে না। কলকাতার মতো রাজধানীর মধ্যে নদীর তীরে প্রকাশ্য শবদাহ করার নিয়ম বহুকাল ধরে স্থায়ী হওয়ায় অত্যন্ত অন্যায় হচ্ছে, যদিও তা হিন্দুদের ধর্মসম্মত, তা হলেও সাধারণের পক্ষে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ও লজ্জাকর হওয়ায় সুসভ্য গবর্নমেন্টের উপর কলঙ্ক আরোপ হচ্ছে।

নদীয়া বিভাগের কমিশনার সাহেবকে চিঠি লেখা যাবে যে, তিনি নিজে মনোযোগী হয়ে বা জেলা ২৪ পরগনার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে দিয়ে রাজধানী কলকাতার বাইরে অথচ নগরের কাছে হিন্দুদের শবাদির সৎকার্য করার উপযুক্ত জায়গা ঠিক করে জাস্টিসদের হস্তান্তর করবেন। এক বা একাধিক জায়গার প্রয়োজন হলে জাস্টিসগণ শীঘ্রই তা গ্রহণ করবেন এবং যাতে শীঘ্র কলকাতা মধ্যে শবদাহের ঘাট বন্ধ করা যায়, এমত উপায় করবেন।

এই চিঠি সম্পর্কে ১০ মার্চ তারিখেই (১৮৬৪ খ্রি.) 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় বিস্ময় প্রকাশ

করে লেখা হয়েছে—"লেপ্টেনান্ট গবর্নর বাহাদুরের এইপত্র পাঠ করিলে হিন্দু মাত্রেই চমৎকৃত হইবেন, এতদিনের পর লেপ্টেনান্ট গবর্নর মেং বিডন সাহেব প্রজা সমাজে সুখ্যাতিভাজন হইবার নিমিত্ত আপনার সুচিক্কন বুদ্ধি হইতে বিলক্ষণ একটি নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, প্রায় দেড়শত বর্ষ হইল, এই রাজধানী কলিকাতা ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের শাসনাধীন হইয়াছে, ইহার মধ্যে অনেক মহাশয় এখানকার শাসন কর্তৃত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, অনেক সময়ে রাজধানীর পীড়া প্রভাবের কারণানুসন্ধান নিমিত্ত বিচক্ষণ ডাক্তারগণ কমিটিরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু কেহই গঙ্গাতীরে হিন্দুদিগের শবদাহের ঘাট বন্ধ করণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নাই।"

বাদ প্রতিবাদ চললেও, বিডন সাহেব নিমতলা শ্মশান সরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হল।

গঙ্গাজলে মৃতদেহ নিক্ষেপ

ইংলিশম্যান পত্রিকায় নিমতলা সম্পর্কিত প্রকাশিত সংবাদ সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে নিমতলা শ্মশানে মৃতদেহ নিক্ষেপ বিষয়ে শ্মশান বন্ধের চেষ্টায় দেশীয় সংবাদপত্র তার প্রতিবাদ জানায়। ২ মার্চ তারিখে (১৮৬৪ খ্রি.) 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ক্ষোভের সঙ্গে লেখা হয়েছিল ইংলিশম্যান সম্পাদক যে লিখেছেন, এখন বেশি সংখ্যায় মৃতদেহ গঙ্গার জলে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তা ইতস্তত ভেসে বেড়াচ্ছে এবং তা বিকৃত হয়ে গঙ্গার জল দূষিত ও বাতাস অপরিশুদ্ধ করাতে জাহাজে যে লোকেরা থাকে তাদের মধ্যে ওলাওঠা সহ নানান রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। ইংলিশম্যানের এই লেখা যদিও সত্য নয়, কারণ অন্যান্য বছর গঙ্গার জলে যে পরিমাণ মানুষের শব নিক্ষিপ্ত হয়, তা বাড়েনি, তা সত্ত্বেও আমাদের লেপ্টেনান্ট গবর্নর বাহাদুর একেবারে ইংলিশম্যানের লেখার প্রতি দৃঢ়তর বিশ্বাস করে শ্মশান বন্ধ করার অন্যায় অনুমতি প্রদান করেছেন। কিন্তু গঙ্গার জলে নিক্ষিপ্ত শবদেহের সঙ্গে শবদাহের ঘাটের কি সম্পর্ক আছে তা বোঝা গেল না।

গরিব মানুষেরা অনেক সময় অর্থাভাবে শব দাহ করতে না পেরে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করে, এটা নূতন রীতি নয় প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে। ওই দুঃখীদের নিক্ষিপ্ত শবই যদি গঙ্গার জল মলিন হয়ে রোগের কারণ হয়, তাহলে গবর্নমেন্টের পক্ষে ওই গরিবদের শব দাহ করার কোনো উপায় করা উচিত, তাতে যে খরচ হবে তা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে দেওয়া হবে। তাহলে গঙ্গা জলে কেউ আর শব নিক্ষেপ করবে না।

গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করার জন্য যখন ঘাটে শব নিয়ে আসা হবে তখন গঙ্গায় নিক্ষেপ করতে না দিয়ে একত্র রেখে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আগুনে জ্বালিয়ে দিলেই হবে। আর যদি মেডিকেল কলেজে শরীর তত্ত্ব বিভাগের জন্য যে শবের দরকার তা এখান থেকে দিলেই হবে। এটা করলেই গঙ্গার জলে আর বেশি মৃতদেহ ভাসতে দেখা যাবে না। কিন্তু বিডন সাহেব যে নির্দেশ দিয়েছেন তাতে গঙ্গায় ভাসমান শবের সংখ্যা কমার কোনো সম্ভাবনা নেই, এই নির্দেশে শুধু হিন্দু প্রজাদের ধর্মের প্রতি ছোটলাটের বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ হয়েছে।'

নিমতলা শ্মশান বন্ধের সঙ্গে মৃতদেহ গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই জানিয়ে হিন্দু সমাজ নিমতলা শ্মশান যাতে বন্ধ না করা হয় তার জন্য প্রতিবাদে মুখর হয়।

নিমতলা নিমতলাতেই ছিল

নিমতলা শ্মশান বন্ধ করে দেওয়া হবে, ছোটলাট বিডন সাহেবেব ঘোষণায় চারিদিক থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। ২রা মার্চ (১৮৬৪ খ্রি.) তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ইংরেজ সরকারকে মনে করিয়ে দেওয়া হল, 'হিন্দুরা নিজের ধর্মের নিযম মতো গঙ্গাতীরে শবদাহ করে থাকে দেহ আগুনে ভস্মাবশেষ হলে সেই ভস্ম ও সামান্য বিদগ্ধ মাংস গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করে থাকে। এই প্রথা পুরাকালাবধি প্রচলিত হয়ে আসছে, এর মধ্যে বাজশাসনের প্রণালী অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু কোনোকালেই ওই প্রথার অন্যথা হয়নি, যবনেরা বাহুবলে সমস্ত হিন্দুস্থানের অধিপতি হয়েছিল, হিন্দুধর্মের প্রতি যবন রাজগণের বিজাতীয় বিদ্বেষভাব ছিল, ইতিহাসে তার প্রচুব প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু তাবাও গঙ্গাতীরে হিন্দুদের শবদাহ করায় নিষেধ করেনি। শতবর্ষেব বেশি হল এই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু ওই পর্যন্ত কোনো গবর্নব জেনারেল বা শাসনকর্তাগণ এমন অনুমতি প্রদান করেন নি। গঙ্গাতীরে শবদাহের নিয়ম রহিত করলে হিন্দুজাতির ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করা হয়। এই কারণে তা বন্ধ করা দূরে থাকুক। গবর্নমেন্ট ভাগীরথী তীরে হিন্দুদেব শবদাহের ঘাটগুলি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সুতরাং বাংলার বর্তমান লেফটেনান্ট গবর্নব বাহাদুর কি বিবেচনায় শ্মশান বন্ধের অনুমতি দিলেন, তার কারণ বুঝতে অক্ষম হলাম।'

প্রাচীনকাল থেকে যখন একই স্থানেই শ্মশান ছিল, এখন আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে—হিন্দু সমাজ এই মতে একমত হলেন।

কোথায় যাবে নিমতলা শ্মশান

ছোটলাট বিডন সাহেব নির্দেশ দিয়েছিলেন, রাজধানী কলকাতার বাইরে অথচ নগবেব কাছে উপযুক্ত স্থানে নিমতলার শ্মশানের স্থান পরিবর্তন হোক। এই বিষয় নিয়ে চারিদিকে যখন আন্দোলন হচ্ছে, তখন সরকার বিপাকে পড়েন। এর মধ্যে অবশ্য শবদাহেব জন্য স্থান চিহ্নিত করা হয়ে গেছে। সরকার পক্ষকে সমর্থন করে ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদক লিখেছিলেন, 'লেফটেনান্ট গবর্নর বাহাদুর রাজধানীর মধ্যে শবদাহের ঘাট বন্ধ করার অভিপ্রায় করেছেন বটে, কিন্তু হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধাচরণ তাঁর ইচ্ছা নয়, কালীঘাটের দক্ষিণে টালিখালের পাশে একখণ্ড জমি ঠিক করেছেন, সেখানে হিন্দুদের শব দাহের কাজ করা যাবে। লেপ্টেনান্ট গবর্নর বাহাদুর দক্ষিণ রেল কোম্পানির সঙ্গে নিয়ম করেছেন যে, তাঁরা কলকাতা থেকে শব ওই শ্মশানে নিয়ে যাবে।

ইংরেজি পত্রিকার এই লেখা দেখে দেশীয় পত্রিকা উপবের তথ্যকে 'বিলক্ষণ কৌশল' বলে মন্তব্য করেছেন। হিন্দুসমাজ থেকে এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয় বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। 'ইন্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় অন্য আর একটি প্রস্তাবের কথা পাওয়া যায়। এই প্রস্তাবে নিমতলা শ্মশানকে নদীর অপর পারে হাওড়ার দিকে নেওযার কথা বলা হয়। নদীব এপার থেকে ওপারে শব নিয়ে যাওয়া হবে কি করে? বলা হয়েছে, নিমতলা ঘাটে একটা ফেরি স্টিমার বাখা থাকবে, বিনা খরচে এপার থেকে শব ও শবযাত্রী নিয়ে ফেরি স্টিমার যাতায়াত করবে। প্রশ্ন উঠল, এই স্টিমারের খরচ দেবে কে? কর্পোরেশন এই ব্যয় বহন করলে ঠিক আছে, কিন্তু প্রস্তাবে তারা রাজি হয়নি। প্রস্তাবটি অবাস্তব ও হাস্যকর বলে মন্তব্য করা হয়েছিল। নিমতলা শ্মশান কোথায় যাবে তা নিয়ে প্রতিদিনই প্রচুর গুজব শোনা যেতে শুরু করল। শেষে নাকি ঠিক হয়েছিল, ধাপার মাঠে যাবে।

রূপচাঁদ পক্ষীর একটি গানেও এই কথা আছে—'শবদাহ নিমতলার ঘাটে তুলে দিত ধাপার মাঠে।/রামগোপাল ঘোষ সে সঙ্কটে হিন্দুধর্ম রাখিলে।'

টাউন হলে সভা

নিমতলা শ্মশান স্থানান্তর বিষয়ে আন্দোলন জোরদার হলে, বিষয়টি সরকারকে ভাবিয়ে তোলে। নাগরিক মতামতের জন্য ৭ মার্চ তারিখে টাউন হলে এক সভা ডাকা হয়। আলোচনার বিষয় রাখা হয় পাঁচটি। তার মধ্যে দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় ছিল 'গঙ্গাজলে মৃতদেহাদি নিঃক্ষেপ করণের নিষেধ বিধান এবং নিমতলার শবদাহের ঘাট স্থানান্তরে স্থাপনার্থ লেফটেনান্ট গবর্নর বাহাদুর যে পত্র লেখেন।' বিজ্ঞাপনটি দিয়েছিলেন আর. টরনবুল, সেক্রেটারি 'জুস্টিস অভ দি পিসদের কার্যালয়, নম্বর ১ চৌরঙ্গির রাস্তা।

এই সভায় হিন্দু সমাজকে রক্ষা করতে অসাধারণ যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রেখেছিলেন বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ। রামগোপাল ঘোষ বলেন—'গবর্নমেন্ট তিনটি জিনিস করতে চান। প্রথমত, তারা নিমতলা ঘাটে পশুপাখিদের ছাল চামড়া ছাড়ানোর কাজ বন্ধ করতে চান। এ কাজের জন্য অবশ্য কোনো জনবিরল স্থান নির্দিষ্ট হতে পারে। এই কাজটি খুব ভাল, এতে কারুর আপত্তি নেই। কাল বিলম্ব না করে এই কাজটি করা হোক। দ্বিতীয়ত, মৃত ব্যক্তি ও পশুপাখিদের দেহ গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়ার প্রথা অবিলম্বে বন্ধ করা হোক। সরকারের সঙ্গে আমি একমত এবং আমি চাই এবিষয়ে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

তৃতীয়ত, আমি জিজ্ঞেস করি, এ বিষয়ে কোনো যোগ্য ব্যক্তিদের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে কি? আশেপাশের লোকেরা তো কেউই কোন অভিযোগ করে নি। তা যদি হয় তাহলে কারা প্রমাণ করেছে যে নিমতলায় শ্মশান ঘাট থাকলে তাদের স্বাস্থ্যহানি হবে? সবার আগে জানতে চাই নিমতলার কাছাকাছি এমন কোনো উপযুক্ত স্থান আছে কি যেখানে শ্মশানটি সরানো যেতে পারে?

এরপর রামগোপাল ঘোষ আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলেন, 'আজ সকালেই দুজন ব্রাহ্মণ আমার কাছে এসে জানতে চান, সত্যিই কি গবর্নমেন্ট গঙ্গার তীরে মড়া পোড়ানো বন্ধ করতে চান? তাঁদের মধ্যে একজনের তো পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপতে থাকে আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে থাকেন। অন্যজন তো টলমল করতে করতে চেয়ারে বসে পড়েন, আর তাঁর চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। আমি সরকারকে জিজ্ঞেস করি, এদের মনে আঘাত দেওয়াই কি সরকারে ইচ্ছা?

আমি দেখেছি, যখন কোনো ব্যক্তির জীবনের অন্তিম সময় আসে, যখন তাঁর নাড়ির স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে আসে, চক্ষু দুটি যখন কোঠরাগত ও অশ্রুসজল হয় এবং কণ্ঠ যখন প্রায় নির্বাক হয়ে আসে তখন এই শেষ সময়ে সৎ হিন্দুমাত্রই করজোড়ে ও কম্পিত হস্তে তার রোরুদ্যমান আত্মীয়-স্বজনদের কাছে এই প্রার্থনা জানায়—'আমাকে গঙ্গায় নিয়ে চল, আমাকে আশ্বাস দাও, আমার শেষকৃত্য যেন গঙ্গার তীরেই সম্পন্ন হয়। তোমরা তোমাদের দেশবাসীদের এই সান্ত্বনা থেকে বঞ্চিত করো না।' কমিটির প্রতি লক্ষ্য করে রামগোপাল ঘোষ আরো বলেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি, ঈশ্বরের দোহাই, আপনারা যে ব্যবস্থা গ্রহণ

করতে চলেছেন তা গ্রহণ করার আগে আবার ভেবে দেখুন। এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না যার জন্য আপনাদের অনুতাপ করতে হয়।'

রামগোপাল ঘোষের এই বক্তব্যে জাস্টিসরা দুভাগে ভাগ হয়ে যান, দেশীয় জাস্টিসগণ প্রায় সকলেই এর বিরোধিতা করেন। ফলে নিমতলা শ্মশান স্থানান্তর বিষয়টি বাতিল বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দেশীয় সংবাদপত্রে অভিনন্দন জানানো হল রামগোপাল ঘোষকে। টাউন হলের সভার বিস্তারিত বিবরণ ছাপা হয়েছিল 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায়। ১১ মার্চ তারিখে (১৮৬৪ খ্রি.) ওই দিনের ঘটনার কথায় লেখা হয়েছিল—'নিমতলা শবদাহের ঘাট স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব গত সোমবার দিন জাস্টিসদের সভা হয়েছিল। দেশীয় জাস্টিসদের মধ্যে সকলেই তার বিপক্ষ হয়েছিল। বিশেষত, বাবু রামগোপাল ঘোষ ওই প্রস্তাবের প্রতিকূলে যে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তাতে তাঁর ন্যায়পরতা এবং অসাধারণ বাক্‌পটুতা প্রকাশ হয়েছে। তিনি যথার্থই বলেছেন যে, হিন্দুদের সামাজিক নিয়ম অন্যান্য জাতির মতো নয়, পরমাত্মীয় ছাড়া অন্য কেউ শববহন করতে স্বীকার করে না। বিশেষত, সেই আত্মীয়দের মধ্যে আবার অনেকে তাতে না যাওয়ার জন্য নানা রকম কৌশল করে থাকে। সুতরাং বহু দূরে শব নিয়ে যেতে হলে নগরবাসী হিন্দুদের ক্লেশের সীমা থাকবে না, এবং পরম প্রেমাস্পদ পিতামাতা অথবা পুত্রকন্যার মৃত্যুতে যখন কাতর হয়, তখন যদি আবার শব বহুদূরে বহন করে নিয়ে গিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করতে হয় তারা একেবারে জর্জরীভূত হয়ে যাবে। গবর্নমেন্টের প্রতি তখন তাদের আক্ষেপের সীমা থাকবে না। একে নিমতলা ঘাটই অনেকের দূর হয়েছে, আবার বেশি দূরে হিন্দু শ্মশান করলে কোন মতেই তা ঠিক হবে না। আর রাজধানী কলকাতার মধ্যে গঙ্গাতীরে শব দাহের নিয়ম বন্ধ করলে হিন্দুদের ধর্ম বিরুদ্ধাচরণ করা হবে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। গবর্নমেন্ট এখন কলকাতার গঙ্গাতীরে শবদাহের ঘাট বন্ধ করার ইচ্ছা করেছেন, পরে পুণ্যধাম বারাণসী এবং প্রয়াগে নদীতীরে শবদাহের ঘাট বন্ধ করতে বলবেন, তাহলে শাস্ত্র বিহিত ক্রিয়ার অন্যথা জন্য হিন্দুমণ্ডলীর মনোমধ্যে যে বিষমতর দুঃখের সঞ্চার হবে তা বলে ব্যক্ত করা যাবে না।'

ওই সভায় তিনি আরো অনেক কথা বলেছেন, পত্রিকা সম্পাদক সেই কথা জানিয়ে বলেছেন—'বাবু রামগোপাল ঘোষ এইরূপ অনেক সদ্বক্তৃতা করিয়াছেন, আমরা স্থানের সংকীর্ণতা বশতঃ তৎসহকারের তাৎপর্য্যও গ্রহণ করিতে পারিলাম না।'

নিমতলা নিমতলাতেই রইল

শ্রদ্ধেয় রামগোপাল ঘোষের অসাধারণ যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যে টাউন হলের 'জাস্টিস অভ দি পিস'-এর সভায় সিদ্ধান্ত হয় নিমতলার শ্মশান স্থানান্তরিত করা উচিত হবে না। তবে এখন যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় রাখা অকর্তব্য। দাহ কাজ যাতে অনায়াসে সম্পন্ন হতে পারে এবং দাহকারীদের কোনো অসুবিধা না হয়, সঙ্গে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের কোনো যন্ত্রণা ভোগ না করে এমন কাজ করতে হবে।

জাস্টিসদের এই সিদ্ধান্তে অর্থাৎ নিমতলা শ্মশান স্থানান্তরিত করা উচিত হবে না বলায় 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। দেশীয় পত্রিকা এই ক্ষোভ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন এই বলে—'জাস্টিসদের এই সিদ্ধান্তে আমাদের দৈনিক সহযোগী ইংলিশম্যান

সম্পাদক মহাশয় সন্তুষ্ট হন নি, নগরবাসীদের শবদাহের ঘাট টালি খালের ধারে ঠিক হলে তাঁর মনোনীত কাজ হত, তিনি লিখেছেন, সোমবারের সভায় এদেশীয় জাস্টিসদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় নিমতলার শবদাহের ঘাট স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব পাশ হয়নি। যা হোক, এদেশীয় মানুষের প্রতি বিদ্বেষভাব বশত, ইংরেজি পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় যা লিখুন আমাদের লেফটেনান্ট গবর্নর বাহাদুর ওই বিষয়ের বিচারের ভার যখন নগরীয় জাস্টিসদের প্রতি সমর্পণ করেছেন, তখন তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।'

দেশবাসীর ক্ষোভ নিবারণ করার জন্য 'জাস্টিস অভ দ্য পিসেস'-এর সিদ্ধান্তে নিমতলার শ্মশান নিমতলাতেই রইল। কিন্তু ছোটলাটের সম্মানের তাহলে কি হবে! ইংরেজি সংবাদপত্র 'ফিনিকস' সম্পাদক বিডন সাহেবের হয়ে কলম ধরলেন। তিনি একটি নূতন তথ্য দিলেন, নূতন কথা শুনে ২৩ মার্চের (১৮৬৪ খ্রি.) 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় 'ফিনিক্স সম্পাদক মহাশয় লিখেছেন, নগরবাসী হিন্দুদের শবদাহের শ্মশান নিমতলা ঘাট হতে স্থানান্তর করার প্রস্তাব আমাদেব লেফটেনান্ট গবর্নর মান্যবর মেং বিডন সাহেবের সুবিমল বিবেচনা শক্তি হতে উদ্ভাসিত হয়নি, গবর্নর জেনারেল স্যার জন লরেন্স বাহাদুর প্রথমত তা উপস্থিত করেন, এই সংবাদ যদি সত্য হয় হিন্দুরা বিবেচনা করবেন যে তিনি এদেশে এসে নিজের কার্যভার গ্রহণ করেই হিন্দুদের ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে হাত লাগিয়ে বহুকালের প্রচলিত প্রথা বন্ধ করার চেষ্টা করেছেন তখন তিনি হিন্দুদের ধর্ম বিরোধী হবেন এবং প্রজা সমাজে সুখ্যাতি লাভ করতে পারবেন না।'

বড়লাট হোক ছোটলাট হোক যিনিই নিমতলা শ্মশানকে সারিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন, দেশবাসী মনোভাব বুঝতে পেরে তা থেকে সরে আসায় নিমতলা নিমতলাতেই রয়ে গেল। তবে জাস্টিস অভ দ্য পিস একটি কমিটি তৈরি করেন। 'মহানগর কলকাতার হেলথ অফিসার ডাক্তার টনিয়ার সাহেব'কে দায়িত্ব দেওয়া হয় নিমতলা অঞ্চলের কারো কোনো এ বিষয়ে অভিযোগ আছে কিনা। শ্মশান উন্নয়নের জন্য কি কি করণীয় তা খতিয়ে দেখার দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হয়। ১৮ মার্চ তারিখে এই কমিটি নিয়োগের কথা পাবলিক নোটিশে জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনে বিষয়টি ছিল এমন—

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা ক্যন্সরবেন্সি

বর্তমান মাসের ৭ তারিখে জাস্টিসদের এক বিশেষ কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, মহানগর কলকাতার হেলথ অফিসার সাহেব নিমতলা ও কাশী মিত্রের ঘাটের শ্মশানে উপস্থিত হয়ে সমস্ত কিছু দেখবেন ও পরীক্ষা করবেন। এসব দিয়ে ওই বিষয়ের এক রিপোর্ট তৈরি হবে। অতএব এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাচ্ছে যে, আজ অপরাহ্ণ ৬টা থেকে ৮ টার মধ্যে তিনি ওই কাজটি সম্পাদন করার জন্য কাশী মিত্রের ঘাটে এবং আগামীকাল পূর্বাহ্ণে ৬টা থেকে ৮টার মধ্যে নিমতলার শবদাহের শ্মশানে উপস্থিত হবেন। তিনি উভয় ঘাটে ডক বা জাহাজ নির্মাণের গদিতে উপস্থিত থাকবেন। উভয় শবদাহের ঘাট হতে কি অনিষ্ট উৎপন্ন হচ্ছে, এই বিষয়ে যে কোনো ব্যক্তির যে কোনো আপত্তি উক্ত হেলথ অফিসার সাহেবকে যে কোনো বিষয়

বলার ইচ্ছা করেন, তাঁরা উল্লেখিত সময়ের মধ্যে উক্ত ঘাটদ্বয়ে উপস্থিত হয়ে তাঁব সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্ত বিষয় বলবেন।

Fort William
Dated 18th March 1864

By order
Robert Turnbull
Secretary to the Justices
of the Peace for the Town of Calcutta.

এই বিজ্ঞাপন পড়ে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারে এটা বুঝতে পেরে ১৯ মার্চে 'সংবাদ প্রভাকরে' জানিয়ে দেওয়া হয়—'অদ্য প্রাতে ছয় ঘণ্টা থেকে ন' ঘণ্টার মধ্যে নিমতলা ঘাটে যাবেন। ওই উভয় ঘাটের বিষয় প্রজাদের যে অভিপ্রায় আছে তা শুনবেন, শবদাহের ঘাট স্থানান্তরিত করণের যে প্রস্তাব হয়েছিল, জাস্টিসদের সভার বিচারে তা রহিত হয়েছে, এখন ওই উভয় ঘাটে শবদাহর জন্য কি সদুপায় করা উচিত, এখন তাই ঠিক হবে। শব দাহ ঘাটের নিকটের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যবিধান নিমিত্ত দুর্গন্ধাদি নিবারণ করা উচিত বটে, কিন্তু তা এমনভাবে নিবারণ করতে হবে, যাতে ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ না হয়।'

সাহেবি কোনো প্রচেষ্টাতেই নিমতলা ঘাট থেকে শ্মশান অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া যায় নি।

রামগোপাল ঘোষের মৃত্যুর পর, দেশবাসী নিমতলার শ্মশানে কাঠের চুল্লিব প্রবেশ দ্বারে একটি ফলক স্থাপন করে শ্রদ্ধার সঙ্গে বামগোপালকে চিবস্মরণীয় করে রেখেছেন। ফলকটিতে লেখা রয়েছে ঃ

অপূর্ব বাগ্মিতা বলে
সনাতন প্রথায় গঙ্গাগর্ভে হিন্দুর সৎকার অধিকার অক্ষুণ্ণ বাখিয়া যিনি
হিন্দু সমাজকে চিরঋণী করিয়াছেন
সেই বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের মন্ত্রগুরু
লোকশিক্ষার অকৃত্রিম সুহৃদ
বঙ্গ জননীর একনিষ্ঠ সাধক
দেশপূজ্য জননায়ক কর্মবীর বাগ্মিপ্রবর
মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের
পুণ্যস্মৃতি রক্ষার জন্য তাঁহারই প্রযত্নরক্ষিত শ্মশানতীর্থে
এই স্মৃতিচিহ্ন
তাঁহার কৃতজ্ঞ দেশবাসীগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল।
জন্ম ৬ই কার্তিক ১২২১ মৃত্যু ৮ই মাঘ ১২৭৪।

নিমতলার শ্মশান চিমনি

ভারতবর্ষে প্রথম শ্মশান নিমতলা, যেখানে পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে বাঁচাতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। তৈবি করা হয়েছিল কমিটি। মড়া পোড়ানোর ধোঁয়ায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষের জন্য যাতে অসুবিধা না হয়, সেই কারণে চিমনির সাহায্যে উপরে ধোঁয়া নিয়ে ফেলার প্রস্তাব গ্রহণ করে কাজ শুরু হয়।

এবারও প্রতিবাদ উঠল। মানুষ ভুল বুঝল, সাধারণের ধারণা হল কলে মানুষ পোড়ানো

হবে। হুতোম প্যাঁচার নকশাতে তাই মন্তব্য করা হল এই বলে—"মলেও শান্তি পাবে না, মুখাগ্নির দফারফা কলেতে করবে সৎকার।" ধোঁয়াকল তৈরি হল বটে কিন্তু সৎকারের কাজে তা লাগানো গেল না। মহেন্দ্রনাথ দত্ত দেখেছেন এই কল, তিনি বলেছেন 'মড়া পোড়ানোর কলটার চিমনি অনেকদিন ছিল এখন আর নেই। কিন্তু কলে মড়া পোড়ানো হয়নি। কল তৈরি হয়েছিল মাত্র।' হ্যাঁ, রামগোপাল ঘোষের আন্দোলনের জন্যই এই কল চালু করা যায়নি, দুর্গাচরণ রায় 'দেবতাদের মর্ত্যে আগমন' গ্রন্থে সে কথা জানিয়েছেন—'এক সময় এই ঘাটে কলে মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষের বক্তৃতার চোটে হতে পারে নি।'

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সচিত্র ব্যঙ্গ পত্রিকা 'বসন্তক' (১২৮০)-এ এই শ্মশান চিমনি নিয়ে বেশ মজার মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল এইভাবে—'কোনো এক জমিদার তাব পারিষদ সমভিব্যহারে হাওড়ায় উপস্থিত হয়ে নিমতলার দাহঘাটের ধূমস্তম্ভ দর্শন করে জিজ্ঞাসা করলেন। 'কেমন হে এই কি কাশিপুরের চিনির কলের চিমনি?' পারিষদ উত্তর করলেন, 'আজ্ঞা ঠিক বলেছেন, ওই তাই বটে।' বাবু পার হয়ে কলকাতায় এসে দেখেন ওটা শবদাহ চিমনি, বললেন, 'ওহে এযে শবদাহ চিমনি?' পারিষদ উত্তর কবল—'আজ্ঞা ঠিক বলেছেন এ তাই বটে।' জমিদার হাসলেন।

শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি

বহু আন্দোলনের ফলে উনিশ শতকে নিমতলাব শ্মশান নিমতলাতেই থেকে গিয়েছিল। ওই সময় থেকেই সরকারের নজর ছিল নিমতলা উন্নয়নের। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে উন্নয়নও হয়েছে। স্বাধীনতার পরে নিমতলায় বৈদ্যুতিক চুল্লি করার ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। ১৯৬৭ সালে কলকাতা পুরসভার স্থায়ী অর্থ ও সংস্থা কমিটির চেযারম্যান গোবিন্দচন্দ্র দে নিমতলা শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লির ভিত্তিপ্রস্তব স্থাপন করেন এবং ১৯৭৫ সালে ১৪ জানুয়ারি তারিখে পুরমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় তা উদ্বোধন করেন।

গঙ্গা দূষণ ও পলতার জল

কলকাতার মানুষের জন্য পানীয় জল বিশুদ্ধকরণের ব্যবস্থা করা হয় কলকাতা থেকে প্রায় ১৬-১৭ মাইল দূরে, কিন্তু কেন? এই 'কেন'র সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নিমতলা প্রভৃতি অঞ্চলে ভাসিয়ে দেওয়া মৃতদেহ এবং রাতেব কলকাতাব যত পায়খানা তা গঙ্গায় ফেলার কারণ।

অন্তর্জলী যাত্রার দেহগুলি সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়ে গঙ্গাতেই ভাসিয়ে দেওয়া হত। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে সরকার এই ব্যবস্থা বন্ধের চেষ্টা করে, কিন্তু হিন্দুদের প্রবল আপত্তিতে তা বন্ধ করা যায়নি। তখন সরকারের পক্ষ থেকে পুলিশকে দায়িত্ব দেওয়া হয় বিষযটির প্রতি নজব রাখার জন্য। পুলিশ কমিশনার কিছু ডোম ও নৌকা বাখল। ডোমদের কাজ হল গঙ্গায় টহল দিয়ে দেখা পাড়ের দিকে জলের উপর কোনো মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছে কিনা। দেখলেই সেইগুলোকে মাঝ গঙ্গায় নিয়ে ডুবিয়ে দিত। এই কাজে সরকারকে নৌকার জন্য মাসে ৯৭ টাকা, বছরে ১১৬৪ টাকা খরচ করতে হয়। এতে খুব একটা উপকাব হল না। মৃতদেহ পচে শুধু জল দূষিত করল না, এর দুর্গন্ধে গঙ্গায় নামা দুষ্কর হয়ে পড়ল।

কি বিচিত্র সমস্যায় তখন গঙ্গা দূষণ হয়েছিল, একটি রিপোর্টের কথা পড়লেই তা পরিষ্কার

হয়ে যাবে। বাংলা প্রদেশের স্যানিটারি কমিশনের প্রেসিডেন্ট জন স্ট্র্যাসি ৫ মার্চ ১৮৬৪ সনে লেখেন—' যে নদী কলকাতার অধিকাংশ লোককে পানের ও রান্না ইত্যাদি গৃহকাজের জন্য জল জোগায় সেই নদীতে প্রতি বছর ৫ হাজারেব বেশি মানুষের মৃতদেহ নিক্ষেপ করা হয়। শুধু সরকারি হাসপাতালগুলো থেকেই এক বছরে দেড় হাজার মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলা হয়েছে।' গ্রান্ট সাহেবও ১৮৫৪ খ্রি. একটা হিসেব দিয়েছিলেন, তিনি বলেন 'কলকাতার উত্তর প্রান্তের এক বিশেষ ঘাটে (কাশী মিত্রের ঘাট) ৩৯৮২টি মানুষের মৃতদেহ নদীতে নিক্ষেপ করা হয়।'

জলে ভেসে যাওয়া মৃতদেহের কিছু কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হত ছাত্রদের শব ব্যবচ্ছেদের জন্য, কাটা ছেঁড়া সেই শবগুলো আবার ফিবে আসত গঙ্গায। মানুষ, জীবজন্তু সকলের মৃতদেহ থেকে নিমতলা-কাশী মিত্র ঘাট অঞ্চলের গঙ্গাব জল দূষিত হয়ে খাবার ও স্নানের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কলকাতার বাবু বাড়িব পবিষ্কাব করা পায়খানা, বস্তিবাড়ির মেথরটাট্টিব পায়খানা সব মেথররা গঙ্গার পাড়ে এক ঘাটে নিয়ে গিয়ে জলে ঢেলে দিয়ে আসত। এই ঘাটের এই কারণে নাম হয়ে গিয়েছিল বিষ্ঠা ঘাট। বড়বাজারে পুরানো টাঁকশালের কাছে। গঙ্গাস্নানে নাগরিকদের অসুবিধার কারণে পরে, মিউনিসিপ্যালিটি থেকে বেশ কিছু নৌকো বাখা ছিল। এই নৌকা করে সব বিষ্ঠা ভাঁটিতে গঙ্গাজলে ফেলা হত।

একদিকে পচা-গলা মৃতদেহ, অন্যদিকে গোটা কলকাতার বিষ্ঠায় গঙ্গাজল এমন দূষিত হল যা নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তব চিন্তিত হয়ে পড়েন। পুবসভা যখন কলের সাহায্যে কলকাতার জন্য পানীয় জল সরবরাহের কথা ভাবলেন তখন গঙ্গার দূষিত জল একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। এই কারণে দূষণ এড়াতে জল পরিশুদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হল কলকাতা থেকে অনেক দূরে পলতায়।

নিমতলা মহাশ্মশান ছবি : অভিজিৎ রায়

□ লেখক পরিচিতি--গ্রন্থকার, প্রাবন্ধিক, বিশিষ্ট গবেষক।

কলকাতায় মুসলিম কবরখানা

অর্কপ্রভ সরকার

জনবসতি থাকলেই শব সৎকারের প্রশ্ন ওঠে। আদিমতা ছেড়ে সভ্যতার পথে মানুষের যখন থেকে হাঁটি হাঁটি পা পা যাত্রা শুরু হয়েছিল, প্রায় তখন থেকেই শব সৎকারের চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। গোড়ার দিকে সেটা ছিল এক ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান, তারও আগে পারিবারিক অনুষ্ঠান। এই পরিবার আয়তনে বড় হতে হতে গোষ্ঠী, কৌম, সমাজ হয়েছে। পরিবারের কেউ গতায়ু হলে শোকপ্রকাশ নানাভাবে করা হয়, যেমন হিন্দুদের ক্ষেত্রে অশৌচ পালন করা। এই সামাজিক রীতি শাস্ত্রকারদের হাতে পড়ে একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সব ধর্মের মধ্যেই তার প্রমাণ আছে। ইসলাম কোনো ব্যতিক্রম নয়।

মুসলমানদের শব সৎকার খ্রিস্টানদের মতো, ইহুদিদের মতো কবর দেওয়ার সঙ্গে যুক্ত। অনুমান করা যায় জুডাইজম থেকে খ্রিস্টধর্ম হয়ে শব সৎকারের এই রীতি ইসলামে প্রবেশ করেছে। তাই শব সৎকারের মধ্যে দুটো প্রধান দিক দেখা যায়ঃ শবদেহের ব্যবস্থা, আর তার সঙ্গে যুক্ত ধর্মীয় কার্যকলাপ। ইসলামে একেই এককথায় বলা হয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। ইসলাম শবানুগমন করাকে অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছে।

কলকাতায় শহর গড়ে ওঠার অনেক আগের থেকে, হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমানদেরও বাস ছিল। সুতানুটি, গোবিন্দপুর বা আশপাশের কিছু অঞ্চল যেমন দক্ষিণে বেহালা, ফলতা; তেমনই উত্তরে ছিল বরানগর, পানিহাটি প্রভৃতি আরো অনেক গ্রাম। তাদের জীবন ও জীবিকা ছিল জমি আর জলের সঙ্গে যুক্ত। এর সঙ্গে হয়তো জঙ্গলকেও যোগ করা যায়। বোঝা যায় এরা ছিল বেশির ভাগ নিম্নবর্গের মানুষ; এই জনসংখ্যায় কালচক্রের নিয়মে জন্মের মতো মৃত্যুও ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু হিন্দুরা যেখানে শব দাহ করত গঙ্গার ধারে নির্দিষ্ট কোনো শ্মশান না থাকলেও গঙ্গার ধারেই দাহ করা হত। সেখানে মুসলমানরা শব সৎকার করত নিজের বাড়িরই আশেপাশে। কবরস্থান বলে কোনো আলাদা জায়গা ছিল না। জসিমুদ্দিনের কবিতায়, "ওইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে" পঙ্‌ক্তিটি কেবল পূর্ববাংলার গ্রামের ছবি তুলে ধরে না, সারা বাংলার মুসলমান অধ্যুষিত এলাকার কথাও বলে।

কবরস্থানের ধারণা তাই কলকাতা 'শহর-কলকাতা' হয়ে ওঠার আগে তেমনভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। দলিলে দস্তাবেজে শহর কলকাতার আদি বৃত্তান্ত যা পাওয়া যায়, সেখানে কবরস্থানের উল্লেখ উনিশ শতকের মাঝামাঝির আগে বড় একটা পাওয়া যায় না। তাও যেটুকু পাওয়া যায় এই সময় থেকে সেটা শহর কলকাতা ধীরে ধীরে জনবসতিতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার পর। তার কারণ হল মুসলমানরা তখন আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে শহর কলকাতায় থাকার বদলে ধীরে ধীরে এক একটি এলাকায় বসবাস শুরু করে। "মুসলমান পাড়া লেন" কথাটির মধ্যে রাস্তার পরিচয়ের চেয়েও অনেক বড় পরিচয় হল মোটামুটি মুসলমান অধ্যুষিত এক একটি অঞ্চল বা পাড়া গড়ে ওঠার পরিচয়। তাঁতিপাড়া, মুচিপাড়া, ডোমপাড়া নামগুলি থেকে এই ধারণারই সমর্থন মেলে।

মুসলমান সমাজের গোষ্ঠীগত ঐক্য চেতনা থেকেই এইভাবে জনবসতির ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে শব সৎকারের জন্যে এক একটা এলাকা চিহ্নিত করার তাগিদ দেখা দেয়। কবরস্থান এই সূত্রেই শহর কলকাতার ইতিহাসে ঠাঁই করে নেয়। এখানেই দেখা যায় উনিশ শতকের গোড়ায় যেসব কবরস্থানের উল্লেখ রয়েছে, সেগুলি হল মুখ্যত পারিবারিক। যেমন টিপুর বংশধরদের টিপু সুলতানের আচরণের জামিনদার হিসেবে কলকাতায় নিয়ে এসে বসবাসে বাধ্য করার পর, তাদের পরিবার নিজস্ব একটা কবরস্থান চালু করার তাগিদ অনুভব করেছিল। টালিগঞ্জের পুঁটিয়ারি অঞ্চলে এই নির্বাসিত সুলতান পরিবার বসবাস করতে থাকলে প্রথমে তারই কাছাকাছি এলাকায় একটি শাহি কবরস্থান স্থাপন করার তাগিদ অনুভব করেন। আগেকার রসারোড ধরে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর বাঁদিকে মোড় নিয়ে প্রিন্স আনোয়ার শা রোডের মোড়ে যে সুন্দর মসজিদটি আছে, তার পাশেই রয়েছে ওই শাহি কবরস্থান। এরপর স্থান সঙ্কুলান না হলে শাহি পরিবারের দ্বিতীয় কবরস্থান 'সাহেব বাগান কবরস্থান' (৫১/১এ, সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬) খোলা হয়।

নবাব মিরজাফর ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর কিছুদিন এসে নিরুপদ্রবে বাস করার জন্য প্রথমে চিৎপুরে, পরে গার্ডেনরীচে একটা বাসগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। ক্লড মার্টিনের ১৭৬৮ সালে রচিত মানচিত্রে সেটি দেখানো হয়েছে। অল্পকালের জন্যে তিনি পটলডাঙা এলাকাতেও বাস করেছিলেন। তাঁর নামেই রাস্তার নামকরণ হয়েছিল। মিরজাফরের পরিবারের যাঁরা আর মুর্শিদাবাদে ফিরে যাননি, তাঁদের কবর রয়েছে বাহির মির্জাপুর নামের রাস্তায় (৩৮, বাহির মির্জাপুর রোড)।

অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ কলকাতার মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে নির্বাসিতের জীবন কাটাতে বাধ্য হলে তিনি যেমন এই এলাকায় একটা 'নয়া লখনউ' বসিয়েছিলেন তেমনই মেটিয়াবুরুজের নবাব পরিবারের কবরস্থানও করেছিলেন। টিপু সুলতান এবং ওয়াজেদ আলি শাহের পরিবার তাঁদের পারিবারিক কবরস্থানে ছোটবড় যেসব সৌধ রচনা করেছিলেন, শহর কলকাতায় মোগল যুগের শেষ পর্বের স্থাপত্য রীতির কিছু নমুনা সেখানে রয়েছে।

কিন্তু এই রকম পারিবারিক কবরস্থান কলকাতায় বেশি গড়ে ওঠার কোনো সুযোগ তেমন ছিল না। কলকাতার মুসলমান জনসংখ্যার মধ্যে ইংরেজ আমলের গোড়া থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিত্তবান, সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার বলতে এই তিনটি শাহি পরিবার ছাড়া আর উল্লেখ করার মতো কোনো পরিবার ছিল না। এখানকার মুসলমানদের জনবিন্যাসের যে ছবি পাওয়া যায় সেখানে ১৭১০ সালে কলকাতার মোট লোকসংখ্যার ১২ হাজারের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ২১৫০ জন। সুবে বাংলায় তখন চলেছে নবাবী আমল পুরোমাত্রায়। তাই এই জনসংখ্যার মধ্যে ধনী কিংবা অভিজাত কোনো মুসলমান পরিবারের থাকা প্রায় অসম্ভব ছিল। ১৮২১ সাল, কোম্পানি শাসনের বিপুল ক্ষমতা ও প্রভাবের সময়, কলকাতার মোট জনসংখ্যা ১,৭৯,৯১৭ জনের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৪৮,১৬২ জন। তখন টিপু সুলতান আর নবাব মিরজাফরের পরিবার কলকাতার বাসিন্দা হয়ে পড়েছে। ১৮৭১ সালে প্রথম শুমারির জনসংখ্যাগত যে রিপোর্ট কয়েক বছর পরে প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে দেখা যায় শহরের মোট ৪,২৯,৫৩৫ জন বাসিন্দার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ১,২৩,৫৫৬। আর ১৯০১ সালের শুমারিতে পাওয়া যায় কলকাতার মোট ৫,৭৭,০৬৬ জন বাসিন্দার মধ্যে ১,৫২,২০০ জন মুসলমান।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার কলকাতায় মুসলমান সমাজের জনবিন্যাসের যে চিত্র তুলে ধরে, সেখানে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্যই শিক্ষিত, জীবনে প্রতিষ্ঠিত এবং সরকার ও সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত অনেক মুসলমান বিশিষ্ট হয়ে উঠলেও তাঁরা নিজেদের পারিবারিক কবরস্থান বানানোর মতো মানসিকতা কিংবা সমৃদ্ধির অধিকারী ছিলেন না। অথচ ইসলামের বিধান অনুযায়ী শব সৎকারের ব্যবস্থা করতে জমি জায়গার দরকার হয়ে পড়েছিল। এই সূত্রেই কলকাতায় স্থানীয় শাসনব্যবস্থা চালু হওয়ার পর তখনকার সরকার ও পৌরসংস্থাকে খ্রিস্টানদের মতো মুসলমানদের জন্যেও 'সাধারণ কবরস্থান' প্রতিষ্ঠার দিকে নজর দিতে হয়। কলকাতা পুরসংস্থার উদ্যোগে মুসলমানদের কবরস্থান স্থাপনের আদি যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখনীয়। সেটি হল কলকাতার মুসলমান নাগরিক এবং তাঁদের নানা সংগঠনের পক্ষ থেকে 'মুসলিম বারিয়াল বোর্ড' স্থাপনের কথা। ঠিক কোন বছরে এই বোর্ড প্রথম গঠিত হয়েছিল তার পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া না গেলেও প্রাসঙ্গিক খবর থেকে অনুমান করা যায় ১৮৯০ সালের গোড়ার দিকে কোনো সময় এই বোর্ড গঠিত হয়েছিল। উনিশ শতকের সত্তরের দশক পর্যন্ত কলকাতায় সাধারণ মুসলমানদের জন্য যে সব কবরস্থান ছিল, যার মধ্যে বেশিরভাগই ছিল পারিবারিক কিংবা একান্তভাবে এলাকাভিত্তিক, সেগুলির স্থান নির্বাচনে জনস্বাস্থ্যের দিকে তেমনভাবে নজর আসেনি। ফলে চালু কিংবা পরিত্যক্ত কবরস্থানগুলির পরিবেশ নানা কারণে খারাপ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। সরকার নানা ধরনের মড়ক-মহামারী ঠেকাতে, সংক্রামক কোনো জ্বর প্রতিষেধক ঔষধের অভাবে পরিবেশ উন্নত করতে মাঝে মাঝেই কমিটি নিয়োগ করে সুপারিশ চাইতেন। ফিভার হসপিটাল কমিটির কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে। তিরিশ ও চল্লিশের দশকে এই ধরনের একটা কমিটির রিপোর্টকে কেন্দ্র করে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা ও তার সম্প্রসারণ করা হয়। এই ধরনের একটা কমিটির রিপোর্ট গত শতকের সত্তরের দশকে একটা জোরালো সুপারিশ করে জানায় যে জনবহুল স্থানে কবরস্থান তৈরি করা নিষিদ্ধ হোক। ১৮৭৬ সালে সরকার এই নিষেধাজ্ঞা চালু করে।

এরপরেই সুবারবান কমিশনারদের একটা কমিটি ১৮৭৯ সালে সরকারকে এক রিপোর্টে জানান যে, শহরে মুসলমানদের কবরস্থানগুলির জায়গা না বাড়ানো হলে অদূর ভবিষ্যতে নানা সমস্যা দেখা দেবে। কমিটি বলেন তখনই বছরে গড়ে প্রায় ৯ হাজার মুসলমানের কবরের ব্যবস্থা করতে হত। কমিটির এই রিপোর্ট সরকারের কাছে তেমন আমল পায়নি। বাংলার ছোটলাট ১৮৮৭ সালে কবরের স্থান সমস্যা বিবেচনার জন্য স্যার হেনরি হ্যারিসনের সভাপতিত্বে আবার একটি কমিটি গঠন করেন। ১৮৮৮ সালের নভেম্বরে পেশ করা কমিটির রিপোর্টে খ্রিস্টান বারিয়াল বোর্ডের আদলে মুসলমানদের জন্য একটা বোর্ড গঠনের সুপারিশ করা হয়। ১৮৮৯ সালে "মুসলিম বারিয়াল বোর্ড অ্যাক্ট ৪" পাশ করা হয়। এই বোর্ড তার পরেই গঠিত হয়েছে। ১৮৯৪ সালে কলকাতা পুরসভা এই বোর্ডকে তিলজলা এলাকার গোবরা গোরস্থানের সম্প্রসারণের জন্য ২০ বিঘা জমি কেনার খরচ বাবদ ২৮,০০০ টাকা দিয়েছিল। ১৮৯৭ সালে এখানে গোবরার নতুন কবরস্থান চালু হয়। ততদিনে কিন্তু গোবরার পুরোনো কবরস্থান, নিউ কাশিয়াবাগান, তালবাগান এবং খয়রাতি কবরস্থান স্থানাভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

কাশিয়াবাগান কবরস্থান ছিল উডবার্ন পার্ক রোডের কাছাকাছি এলাকায়। ফোর্ট উইলিয়াম তৈরি করে তার পাশে এসপ্ল্যানেড তৈরির জন্যে যে বিরাট মাঠ সামরিক কর্তৃপক্ষ নিজের দখলে নেয়, সেখানে আগেকার কিছু কবর ও সন্নিহিত এলাকা এই দখলীকৃত জমির মধ্যে পড়ে। তাই তার বদলে কর্তৃপক্ষ প্রায় ৪০ বিঘা জমি দিয়েছিল এই এলাকায় যেখানে কাশিয়াবাগান কবরস্থান স্থাপন করা হয়। তালবাগান ও খয়রাতি কবরস্থান ঠিক কোনখানে ছিল এখন তা শনাক্ত করা মুশকিল। জনশ্রুতি এই যে কসবা অঞ্চলে এই দুটি কবরস্থান ছিল, যা বহুদিন আগে ভেঙে বাসযোগ্য এলাকায় পরিণত করা হয়। বন্ধ হয়ে যাওয়া কবরস্থানে পরবর্তীকালে বাস কিংবা আপিসের জন্যে দালানকোঠা তৈরির ঘটনা কলকাতার ইতিহাসে আগে এবং পরে অনেক ঘটেছে। যেমন পার্কসার্কাস এলাকায় যেখানে বর্তমানে হজ আপিস, একদা সেখানে কবরখানা ছিল। পার্ক স্ট্রিট বেনিয়াপুকুরে যেখানে সার্কুলার রোডে পড়ছে, সেখানে অ্যাসেম্বলি অভ গড চার্চ হাসপাতাল ও তার আশপাশের আপিস বাড়িগুলি যে জমির উপরে নির্মিত হয়েছে, তার সবটাই ছিল কোম্পানির আমলের গোড়ার দিকের খ্রিস্টান কবরস্থান। পুরোনো কলকাতার মানচিত্রে পাওয়া যায় সেকালে এই অঞ্চলে অনেকগুলি খ্রিস্টান কবরস্থান ছিল বলে পার্কস্ট্রিটের সাবেক নাম ছিল 'বারিয়াল গ্রাউন্ড রোড'। ১৯৬৪ সালে কাশ্মীরে হজরতবাল হঠাৎ চুরি হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বেধে যাওয়া দাঙ্গা একটা পর্বে কলকাতাতেও ছড়িয়েছিল। তখন তিলজলার পিকনিক গার্ডেন এলাকার কবরস্থান স্থানীয় যুবকরা ভেঙে মাঠ করে দেয়। সেটাই এখন সবুজ সঙ্ঘের মাঠ নামে পরিচিত।

উত্তর কলকাতায় মানিকতলার মোড়ের কাছে সারকুলার রোডের ধারে একটা পুরোনো কবরখানা অনেকদিন ধরে চালু আছে। নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লা পলাশীর যুদ্ধের কিছু আগে কলকাতা আক্রমণ করলে তাঁর সেনাবাহিনী শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানা জায়গায় শিবির করেছিল। হালসিবাগান এলাকা সেরকম একটি অঞ্চল। তারই পাশে স্থাপন করা হয়েছিল এই কবরখানা। তবে এটি নিয়মিত কবরখানা হিসাবে চালু হয় আরও অনেক পরে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কোনো এক সময়ে। তখন এর নামকরণ করা হয় 'নাখোদা' কবরস্থান। এখানে যেসব বিখ্যাত মানুষের কবর আছে তাঁরা হলেন তিন মুসলিম সাধক, হায়দার শা বাবা, করম শা বাবা, এবং আরিফ শা বাবা। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পিতা গত শতকের শেষে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন। মৌলানা আজাদের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়েছে এই শহরে, বিখ্যাত 'আল হিলাল' উর্দু পত্রিকা প্রকাশনার মধ্যে দিয়ে। তাঁর আব্বা এবং আম্মিজানের কবর রয়েছে এখানে। আর একজন বিশিষ্ট মানুষ এখানে শায়িত আছেন যাঁর নাম গুলাম পালোয়ান। ১৮৯৭ সালে ফ্রান্সের রাজধানী পারী শহরে 'বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতায়' অংশগ্রহণ করার জন্য মোতিলাল নেহেরু তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তুরস্কের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগির আবদুল কাদেরকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হন।

গত শতকের শেষেই মানিকতলার এই কবরস্থানের জায়গা অকুলান হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে, তার থেকে প্রায় একমাইল দূরে বাগমারি এলাকায় ১৯০৭ সালে বাগমারি কবরস্থান স্থাপন করা হয়। প্রথমে ২৭ বিঘা জমি নিয়ে গঠিত এই কবরস্থানের নাম দেওয়া হয়েছিল 'মক্‌বরা-ই-

আম'। ১৯০৯ সালে আরও ১২৩ বিঘা জমি নিয়ে তার এলাকা প্রসারিত করা হয়। এই ১৫০ বিঘা জমির উপরে গঠিত 'মক্‌বরা-ই-আম' এশিয়ার বৃহত্তম কবরস্থান নামে পরিচিত। এটি উত্তর ও পূর্ব কলকাতার অত্যন্ত চালু কবরস্থান, যেখানে শহরতলি থেকেও শবদেহ নিয়ে আসা হয়।

মুসলমানদের আর একটি যথেষ্ট পুরোনো এবং বিশিষ্ট কবরস্থান হল একবালপুরের 'ষোলো আনা' কবরস্থান। এর জমির মোট পরিমাণ হল সাড়ে আঠারো বিঘা। প্রথমে ছিল ১৮ বিঘা পরে ১০ কাঠা যুক্ত করা হয়েছে। মাত্র ষোলো আনার বিনিময়ে এই জমি পাওয়া গিয়েছিল বলেই তার নাম ষোলো আনা কবরস্থান রাখা হয়েছে। এখানে সমাধিস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন কলকাতার প্রথম খিলাফৎ কমিটির সভাপতি মোল্লা জান মহম্মদ। ষোলো আনা কবরস্থানে আর একটি বৈশিষ্ট্য হল জাম-এ-মসজিদ। মসজিদ আর কবরস্থান পাশাপাশি থাকায়, এই অঞ্চলে মসজিদকে 'ষোলো আনা মসজিদ' বলে। ইসলামে বিশেষ নির্দেশ হল সমাধিস্থ করার আগে সমবেত সকলে একটি নমাজে অংশগ্রহণ করেন। এই বিশেষ নমাজকে বলে 'জানাজা'। ঘটনাচক্রে কোনো মৃতদেহ পাওয়া না গেলে তিনি যদি খুব সম্মানিত ব্যক্তি হন, তাহলে তাঁর উদ্দেশে একটি কফিন সামনে রেখে জানাজা অনুষ্ঠিত হতে পাবে। তাকে বলা হয় 'গায়েবি জানাজা।'

ষোলো আনা কববখানায় সমাধিস্থ হওয়া মানুষ খুব সম্মানজনক বলে মনে করে। কারণ কবর দেওয়ার সময় মসজিদে উপস্থিত সমস্ত মানুষ শবানুগমন করে। এটাও ইসলামের অন্যতম পবিত্র অনুশাসন। তাই মৃত ব্যক্তি ও তাঁর আত্মীয়স্বজনের পক্ষে এই ঘটনা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। ইতিহাসে পাওয়া যায় পুরনো কলকাতার এই এলাকায় ষোলো আনা কবরস্থান স্থাপিত হবার আগে শবদেহ গঙ্গার তীবে কোনো জায়গা বেছে সমাধিস্থ করা হত। গঙ্গার জোয়ার ভাঁটায় কবরের উপর আলগা মাটি ধুয়ে যেত, শবদেহ কখনো বেরিয়ে পড়ত অথবা জন্তু জানোয়ারের টানাটানিতে বেরিয়ে আসত। মুসলমানদের কাছে ছিল সেটা এক দুঃখজনক ঘটনা। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের প্রধান দেহরক্ষী এক বালুচি মুসলমান বড়লাটকে বলে স্থানীয় মানুষদের এই সমস্যার প্রতিকারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বেন্টিঙ্কের উদ্যোগেই গঙ্গা থেকে অনেকদূরে এই কবরস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

কলকাতায় বসবাসকারী মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যায় খুব কম হলেও কিছু মুসলমান আছে যারা কার্যত নিঃস্ব। এই সব নিঃস্ব মানুষদের কবব দেওয়ার ব্যবস্থা কবে মুসলিম বারিয়াল বোর্ড। বোর্ড সমাধিস্থ করাব জন্য যেটুকু খরচ দরকার, যার মোট অঙ্ক শ্মশানের ঘাট খরচার চেয়ে কম, বোর্ড সেই টাকা দেয়। নিঃস্বদের জন্য, বিশেষত বেওয়ারিশ লাশ হলে, তাদের জন্য গোবরা পার্ট-ওয়ান এবং পার্ট-টু কবরস্থানের মধ্যে আর একটি কবরস্থান করা হয়েছে। তার নাম হল 'আঞ্জুমান পপার বারিয়াল গ্রাউন্ড'। আঞ্জুমান সংগঠনটির পুরো নাম 'আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম', প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ খান বাহাদুর, এস এম ডুপলে, নবাব সিরাজুল ইসলাম এবং কাজি মকবুল আহমেদ। ১৮৬০ সালের সোসাইটি আইন (অ্যাক্ট ২১) অনুযায়ী ১৯০৫ সালে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত ও রেজিস্ট্রিকৃত হয় (২০, নুর আলি লেন, কলকাতা-১৪)। আঞ্জুমান শব্দটির আরবি, যার অর্থ 'সংগঠন' বা 'সমিতি'। মুসলমানদের বিশেষ ধরনের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই তার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সুতরাং নিঃস্বদের নানাভাবে সাহায্য করা এবং

বেওয়ারিশ লাশের শেষকৃত্যসম্পন্ন করা তার কর্তব্য ও কর্মের অন্তর্গত। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত নিঃস্বদের .কবরখানায় কতজনের শব সৎকার হয়েছে তার পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। ১৯৯২-৯৫ পর্যন্ত চার বছরের পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে জানুয়ারি থেকে জুন প্রথম ছয় মাসের। (দ্রষ্টব্য সারণি : ৬)।

গোবরার কবরস্থানগুলি যে অঞ্চলে তিলজলা এলাকার সেই স্থানীয় রাস্তার নাম গোরস্থান রোড রাখা হয়েছে। গোবরায় মোট চারটি কবরস্থান আছে। উপরোক্ত নিঃস্ব লাশদের জন্য আঞ্জুমান গোরস্থান বাদ দিয়ে রয়েছে গোবরার পার্ট-ওয়ান, পার্ট-টু এবং পার্ট-থ্রি কবরস্থান। পার্ট-ওয়ান বা পুরানো কবরস্থান ১০০ বছর আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। এই কবরস্থানে গত ১০০ বছরে বাংলাদেশের বহু খ্যাতিমান মানুষ সমাহিত হয়েছেন। প্রখ্যাত সুফি সাধক কাদ্রী সাহেব, দুজন প্রখ্যাত যুক্তিবাদী সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক কাজি আবদুল ওদুদ, আবু সৈয়দ আইয়ুব, প্রখ্যাত দন্ত্য চিকিৎসক ড. রফিউদ্দিন আহমেদ, প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ, যেমন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফ্‌ফর আহমেদ, বিশিষ্ট নেতা আবদুল হালিম, প্রাদেশিক কৃষকসভার সভাপতি ও সম্পাদক পদে দীর্ঘকাল আসীন ছিলেন এমন মানুষ আবদুল্লাহ রসুল, পার্ক সার্কাস অঞ্চলের একাধিকক্রমে পাঁচবার নির্বাচিত বিধায়ক ও কমিউনিস্ট নেতা ডাঃ এ এম ও গণি, যিনি ছিলেন আবু সৈয়দ আইয়ুবের দাদা, হালিমজায়া অশ্রুকণা হালিম, বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের পরিবারের বেশ কিছু মানুষসহ তাঁর প্রিয় নাতনি তাকসেনা বানুর কবর আছে। মাত্র গত বছরে বামফ্রন্টের শাসনকালীন বিধানসভার প্রথম স্পিকার ও মন্ত্রী সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ্‌কে এখানেই সমাহিত করা হয়েছে। প্রয়াত মুজফফ্‌র আহমেদের কবরের উপর একটি বেদি নির্মাণ করে তার উপরে তাঁর লেখা 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' গ্রন্থটিসহ আর কয়েকটি গ্রন্থের কংক্রিটের মডেল করা আছে।

গোবরার এই কবরস্থানে সাধারণ মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে বড় আকর্ষণের লক্ষ্য হল 'শহীদায়ন কবর'। এখানে শায়িত আছেন জন্মসূত্রে লাহোরবাসী দুই যুবক আমির আহমেদ আর আবদুল্লা আহমেদ। প্রকাশ্য দিবালোকে কলেজ স্ট্রিটে স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের লেখক ও প্রকাশক ভোলানাথ সেনকে তাঁরই দোকানের মধ্যে হত্যার দায়ে ফাঁসি হয়েছিল। ফাঁসির তারিখটি ছিল ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩২, স্থান আলিপুর সেন্ট্রাল জেল। ভোলানাথ সেন 'প্রাচীন কাহিনী' নামে প্রকাশিত একটি প্রাথমিক শ্রেণির ছাত্রদের জন্য লিখিত ইতিহাসে লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে বহু আয়াসে সংগৃহীত হজরত মহম্মদের একটি ছবি ছেপেছিলেন। ইসলামে হজরতের ছবি ছাপা ও দেখা চরম গুনাহ। শুধু এই কারণেই এই দুই যুবক ভোলানাথ সেনকে হত্যা করে এবং আদালতে দোষ স্বীকার করে। আইনের চোখে তাঁরা খুনের আসামি, তাই শাস্তি হয় প্রাণদণ্ড। কিন্তু মুসলমান সমাজের চোখে তাঁরা মহান শহিদের মর্যাদা পেয়েছিলেন। উল্লেখ্য, গোবরা কবরস্থানে তাঁদের কবরদুটি সবচেয়ে ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

কলকাতার যত কবরস্থান আছে, সাধারণ এবং মুসলমানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কবরস্থানগুলিতে ধনী দরিদ্র, খ্যাতিমান অখ্যাত নির্বিশেষে সকলেরই কবর আছে। সমাজে যারা 'রইস আদমী' নামে পরিচিত, তাদের পারিবারিক কবরস্থান না থাকলে নিম্নবর্গের মুসলমানদের

মতো একই কবরস্থানে শেষ শয্যা পাতা হয়। বলা বাহুল্য, ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক কবরস্থানে অবশ্যই নানা তারতম্য ঘটতে পারে। আগে কোনো কবরস্থানে সম্পন্ন ব্যক্তিরা স্থান পছন্দ করতে পারতেন। তার জন্যে জমি কেনা যেত। কিন্তু ১৯৮৪ সালে কলকাতা পুরসভা নিয়ম করে স্থান পছন্দ এবং জমি কেনা বন্ধ করে দিয়েছেন। এখন চলতি বিধি হল কলকাতাব মেয়ব এবং মুসলিম বারিয়াল বোর্ড কবরখানায় যে জায়গাটি মৃতের জন্য নির্দিষ্ট করে দেবেন, তার কোনো হেরফের ঘটানো যাবে না। বর্তমানে কবরের জন্য জমি পেতে কোনো পয়সা লাগে না। দুটি কবরের মধ্যে কতটা জমি ফাঁকা রাখতে হবে সেটাও বোর্ড ঠিক করে দেয়। কোনো কবরের উপর কোনো ফলক লাগানো কিংবা সৌধ নির্মাণ মৃতের পবিবারের ব্যয়ে করা যেতে পারে। তাব জন্যেও অনুমোদন চাই, এবং সেখানে কিছু শর্ত আছে। খরচের হিসাবে পাওয়া গেছে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ৫০ টাকার একটা নথিভুক্তকরণের ফি লাগে। মৃতের বয়স ১২ বছরের কম হলে ফি লাগে ৩৫ টাকা। '৮৪ সালেব পূর্বোক্ত বিধিতে ফলক বা সৌধ নির্মাণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

যে কোনো কবরস্থানে স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, কিশোব নির্বিশেষে সকলেরই কবব দেওয়া যায। বড় বড় কবরস্থানগুলিতে কেবল আশপাশের এলাকা নয়, দূর থেকেও শব সৎকাবেব জন্য আনা যায়। কলকাতা পুর এলাকায় ব্যক্তিগত ও পারিবাবিক কবরস্থানগুলি ছাড়া বড় সমস্ত কবরস্থান কলকাতা পুর সংস্থার পবিচালনাধীনে রয়েছে। মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিয়া, সুন্নি, বোহরা, খোজা, ইসমাইলিযা প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আলাদা কবরস্থান আছে (দ্রষ্টব্য পবিশিষ্ট . ৩)। পুবসভাকে কবরস্থান সংক্রান্ত সমস্ত কাজ বা পবিষেবার বিষযে মুসলিম বাবিয়াল বোর্ড পবামর্শদাতার কাজ করে। তবে এই ব্যবস্থা পুরসভা পবিচালিত কবরখানায় প্রযোজ্য। সাম্প্রদায়িক গোরস্থানগুলি সেই সব সম্প্রদায়েব উদ্যোগে গঠিত কোনো বোর্ড বা কমিটির নির্দেশে পরিচালিত হয়।

কেন একটি কববেব উপর একালে কোনো ফলক বা সৌধ নির্মাণ করা যায় না, তার কারণ সহজেই বোঝা যায। আগেই বলা হয়েছে কলকাতার মুসলমান সমাজে মৃতের গড় বার্ষিক হার হল ৮৫০০ থেকে ৯০০০ জন। প্রত্যেকের জন্য আলাদা কবব চিরকালীন ভিত্তিতে ব্যবস্থা করতে হলে কবরস্থানেব এলাকা ৫ কিংবা ১০ বছর অন্তর হয় ক্রমাগত বাড়াতে হবে, নয়তো নতুন কবরখানা খুলতে হবে। এই মহানগর যেভাবে শুধু বসতবাড়ির জন্যে দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে, সেখানে কবরখানার জমি বাড়ানো কিংবা নতুন কবরখানা স্থাপন দুটোই অসম্ভব। দীর্ঘদিন ধরে তাই মুসলিম বারিয়াল বোর্ডের অনুমোদনক্রমে একটা ব্যবস্থা চালু ছিল যে, দশ বছর কিংবা তার চেয়ে বেশি পুবানো কবরের উপর আবার কবর দেওয়া যাবে। স্থান সংকুলানের জন্য এর চেয়ে স্বতন্ত্র কোনো ব্যবস্থা চালু হতে পারে না। ১৯৮৪ সালের পর এই সময়সীমা কমিয়ে ৫ বছর করা হয়েছে। তাই খ্রিস্টানদের মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সমাধিস্থলে বছরে একটি বা দুটি যেসব দিনে আত্মীয়-পরিজনরা সমবেত হন, মুসলমান সমাজে প্রথম কয়েক বছব ছাড়া কার্যত তার কোনো সুযোগ নেই। কলকাতার মুসলমান সমাজে তাই কবরস্থানে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য জমায়েত হওয়া, নিয়মিত বাতি এবং ফুল দেওয়া প্রথম কয়েক বছরের পরে করা অর্থহীন। মুসলমান সংস্কৃতিকেও এই বাস্তবতার প্রভাব পড়েছে। মুসলিম শব সৎকারের বিশেষ যেসব

ধর্মীয় নিয়মকানুন আছে, হিন্দু বা খ্রিস্টানদের থেকে কয়েকটি জায়গায় পার্থক্য চোখে পড়ে। যেমন হিন্দু কোনো পরিবারে শহর কলকাতায় মৃত্যু হলে আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী বাঁশ ও দড়ি দিয়ে তৈরি খাট কিংবা কাঠের খাট পরিবারের ব্যয়ে কিনে আনতে হয়। খ্রিস্টানরা সামর্থ্য অনুযায়ী কম বা বেশি দামের কফিন কেনে। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভাবে খাট বা কফিন কিনতে হয় না। তাদের ধর্মীয় অনুশাসন হল মুসলিম মহল্লার যে মসজিদ থাকবে সেখানেই কয়েকটি কাঠের রেলিঙ দেওয়া হাতল লাগানো অপেক্ষাকৃত সরু লম্বাটে ধরনের খাট থাকবে। মৃতের পরিবার মসজিদ থেকে আনা সেই খাটে শবদেহ কবরস্থানে কাঁধে করে অথবা গাড়িতে বহন করে নিয়ে যাবে। শবানুগমনকারীরা সকলেই মাথায় শাদা টুপি পরবে, অভাবে মাথায় রুমাল কিংবা কোনো কাপড় দিয়ে চুল ঢেকে রাখবে। শবানুগমন করার সময় কোনো ধ্বনি দেওয়া হবে না, হিন্দুদের 'বল হরি হরি বোল', অবাঙালির হিন্দুদের 'রাম নাম সত্ত হ্যায়' জাতীয় আল্লার নাম স্মরণ করে কোনো ধ্বনি দেওয়া হবে না। নিম্নবর্ণের অবাঙালি হিন্দুরা মৃত্যুকে মুক্তি মনে করে যেভাবে ব্যান্ড বাজিয়ে শব শ্মশানে নিয়ে যায়, মুসলমান সমাজে সেটি অকল্পনীয়। যে খাটে করে মুসলমানের শব বহন করা হয় আরবিতে তাকে বলে 'তাবুৎ'।

শবদেহ সম্পূর্ণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ধোয়া বা 'গোসল' করা হয়। তারপর চার-পাঁচটি নতুন শাদা কাপড়ে দেহ সম্পূর্ণ মুড়ে ফেলা হয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে কেবল মুখ খোলা থাকে। নারীর শব সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করা হয়। এই কাপড়কে বলে 'কফন'। শহরের বিশেষ কিছু দোকানেই এই কাপড় পাওয়া যায়। শবের গায়ে সেলাই করা কোনো কাপড় থাকবে না। হিন্দুদের নিয়ম আছে শ্মশানে শবদেহকে সমস্ত বন্ধনমুক্তি করতে হয়। অর্থাৎ কাপড়ের গিঁট খুলে দেওয়া হয়, কোমরের ঘুন্সি ছিঁড়ে ফেলা হয়। কবরখানায় শব কবরে শায়িত করার আগে পবিত্র কুর-আনের একটি পঙ্‌ক্তি উচ্চারণ করা হয় : "বিসমিল্লাহ্-ফী-সাবীলিল্লাহ ওয়া আলা মিল্লাতি রসুলিল্লাহ।" যার অর্থ হল, "আল্লার নাম নিয়ে আল্লার পথে এবং আল্লার দূতের নিয়মানুসারে এঁকে সমাহিত করলাম।"

কবরখানায় কবর খোঁড়া হয় উত্তর-দক্ষিণে লম্বা করে। কবরের সাধারণ মাপ হল লম্বায় ৮ ফুট, চওড়ায় ৫ বা ৬ ফুট, এবং গভীরতায় ৫ ফুট। শব মাঝারি মাপের হলে দৈর্ঘ্য কমে ৬ ফুট হতে পারে, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ৪ ফুট এবং প্রস্থ ৪ ফুট হবে। কিন্তু গভীরতা সবক্ষেত্রেই ৫ ফুট হতে হবে। কবরের নীচের জমি অর্থাৎ যেখানে শব শায়িত থাকবে, কবর খোঁড়ার পর জায়গাটি যথাসাধ্য সমান করে, তার উপরে কাপড় বিছিয়ে তবেই শব শোয়ানো হবে। শবানুগমনকারীরা মাটি চাপা দেওয়ার সময় সকলেই নিজের হাতে কিছু মাটি ছড়িয়ে দেবে। ধর্মীয় অনুশাসন হল কবরের মধ্যে শবের মাথা উত্তরে আর পা দক্ষিণে থাকবে। মৃতের মুখ কিছুটা মক্কার দিকে ঘুরিয়ে রাখতে হবে। এগুলি সব হল অবশ্য পালনীয় বিধি। কবর খোঁড়ার কাজ থেকে শুরু করে গোর দেওয়া সংক্রান্ত সমস্ত কাজ কলকাতা পুরসভার অধীন কবরখানাগুলিতে করার জন্যে পুরসভার নিযুক্ত কর্মী আছে। কবর খননকারীদের ইংরাজিতে গ্রেভডিগার-ই বলা হয়। তাদের ৮ ঘণ্টা পালা করে কাজে যোগ দিতে হয়। কবরখানায় যিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করান, তাকে 'মহাফিজ-ই-জানাজা' বলা হয়। শ্মশানে শেষকৃত্য করার জন্য যে ব্রাহ্মণ থাকেন, মহাফিজের কাজ তার

সঙ্গে তুলনীয়।

এশিয়ার বৃহত্তম বাগমারি কবরখানার ভিতরের চিত্রটা এবার একটু ভালোভাবে দেখা যাক। কলকাতা কর্পোরেশনের পরিচালনাধীন এই কবরখানা ৫৬টি ব্লকে বিভক্ত। কবরখানার ভিতরে দুটি বড় ঝিল আছে। ঝিল দুটি মাছ চাষের জন্য লিজ দেওয়া হয়। এখন ঝিলের পাড় ক্রমাগত ভাঙতে থাকায় বহু কবর জলের মধ্যে চলে যাচ্ছে। কলকাতাব হ্যোমিওপ্যাথিক কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্য ও শিক্ষক হিসাবে বাষ্ট্রপতি পদকপাপ্ত ফিরোজ আবিদ সাহেব জানালেন : "ক্রমাগত ঝিলের পাড় ভাঙতে থাকায় অনেক পুরোনো কবর ভেঙে জলের মধ্যে চলে যাচ্ছে। ফলে আশেপাশের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। মুসলিম বারিয়াল বোর্ডের সদস্যরা এই উত্তেজনার অবসান ঘটাতে চিফ ল অফিসারের অনুরোধ করেছেন যাতে তিনি ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে একটা জরুরিভিত্তিক পদক্ষেপ নিতে পারেন।" সৈয়দ আহমেদ পাটোয়ারি নামে এক ভদ্রলোক বছরে ৮০০ টাকা লিজ হিসাবে এই ৪০ বিঘা ঝিলে ৩ বছরের জন্যে মাছ চাষের অনুমতি পেয়েছিলেন ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। চুক্তিব শর্তানুসারে তার লিজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে। ১৯৮৬ সালের জানুয়ারি মাসে কর্পোরেশন সৈয়দ পাটোয়ারিকে লিখিতভাবে জানায় যে, মার্চ মাসে তার সঙ্গে কর্পোরেশনের চুক্তি শেষ হচ্ছে। সুতরাং মার্চ মাস থেকে এই ঝিলে মাছ চাষ করার কোনো অধিকার সৈয়দ আহমেদ পাটোয়ারির থাকবে না। সৈয়দ পাটোযারি, ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে কলকাতা কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন। সেই মামলার ফয়সালা এখনো অবধি না হওয়ার দরুন আদালতের নির্দেশে ঝিলের সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া যাচ্ছে না। মুসলিম বারিয়াল বোর্ডের সদস্য ও বিশিষ্ট সমাজসেবী আবু সুফিযানকে ঝিল সম্পর্কিত সমস্যার কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "কোর্টে মামলা ঝুলে থাকায়, কর্পোরেশনকে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হচ্ছে। আগে বাৎসরিক মোট ৮০০ টাকার ভিত্তিতে পুরো ঝিল লিজ দেওয়া হয়েছিল। এখন বাজারদর অনুযায়ী লিজ দিলে কর্পোরেশন প্রতি বিঘা জমিতে লিজ হিসাবে বাৎসরিক ১০০০ টাকা পেতে পারে। তবে আমরা চেষ্টা কবছি কোর্টে ঝুলে থাকা মামলাটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিটিয়ে ফেলতে যাতে ভবিষ্যতে কর্পোরেশনকে আর বড় কোনো ধরনের আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে না হয়।"

একবালপুরের ষোলো আনা কবরস্থানের ভিতরকার পরিবেশ মোটামুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ষোলো আনা কবরস্থানের প্রাক্তন সাব রেজিস্ট্রার ড. হায়দাব আলি খান জানালেন যে, "এমনিতে সাধারণত পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনোরকম অসুবিধা না হলেও, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট কিছু স্থানীয় মানুষ কবরস্থান পরিচালনায় ক্ষেত্রে নানাভাবে হস্তক্ষেপ করায় মাঝে মাঝে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।" গোবরা কবরস্থানের প্রধান সমস্যা হল কবরস্থানেব ভিতর দিয়েই সাধারণ মানুষকে রোজ যাতায়াত করতে হয়, ফলে কবরস্থানের ভাবগম্ভীর পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হয়। কবরস্থানের জমি ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করার ফলে কবরস্থানটি বড় বড় ঘাস আর আগাছাপূর্ণ জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। গোবরা পার্ট-১ কবরস্থানের ভিতরে এখন একটি মসজিদ তৈরির কাজ পুরোদমে চলছে। গোবরা কবরস্থানের ভিতরে একাধিক ছোট ছোট পুকুর আছে, এই পুকুরগুলি স্থানীয়

লোকেরা বাসনমাজা থেকে শুরু করে স্নান করা পর্যন্ত সব কাজে ব্যবহার করায় পুকুরের জল দূষিত হয়ে পড়েছে।

মুসলিম কবরখানাগুলিতে 'সাব-রেজিস্ট্রার' পদে ডাক্তার ছাড়া আর কাউকে নেওয়া হবে না বলে কলকাতা কর্পোরেশন ১৯৯০ সালে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। একই সঙ্গে অর্থাৎ ১৯৯০ সালে কর্পোরেশন সাব-রেজিস্ট্রার পদে কিছু লোক নেওয়ার ব্যাপারে মনস্থ করে। ১০ জন সাব-রেজিস্ট্রারকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এমপ্লয়মেন্ট এক্‌চেঞ্জ কিছু হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের নাম সম্বলিত একটি চিঠি কর্পোরেশনকে পাঠায়। লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউতে উত্তীর্ণ হলে তবেই প্রার্থী সাব-রেজিস্ট্রার পদের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪০০ জন চাকরিপ্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেয় এবং তার মধ্যে থেকে মাত্র ২৫ জনকে ইন্টারভিউতে ডাকা হয়। এরপর ২৫ জনের মধ্যে থেকে প্রথমে ১৫ জনের নাম প্যানেলভুক্ত করা হয়। ১৫ জনের মধ্যে থেকে প্রথমে ১০ জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। তারপরে আর দুজনকে ক্যাজুয়াল হিসাবে নিয়োগ করা হয়।

কিন্তু যে সমস্ত সাব-রেজিস্ট্রারকে চাকরিতে স্থায়ী করা হয় তাদেরকে সরাসরি সরকারি অফিসের জুনিয়ার ক্লার্কের বেসিক বেতনক্রমের আওতায় নিয়ে আসা হল (বেসিক ১০৪০-১৯২০)। কিন্তু এই সাব-রেজিস্ট্রার পদে যে সমস্ত অ্যালোপ্যাথ ডাক্তাররা ছিলেন তাদেরকে পশ্চিমবঙ্গ হেলথ সার্ভিস অনুযায়ী ২২০০ টাকা বেসিক দেওয়া হচ্ছিল। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার সমস্ত ডাক্তারদের বেতন, বেসিকের হার এক রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সুতরাং সাব-রেজিস্ট্রার পদে হোমিওপ্যাথ ডাক্তাররা অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারদের মতো একই হারে বেতন কাঠামো গঠন করার দাবি জানাতে থাকেন।

কিন্তু কর্পোরেশন এখনো অবধি হোমিওপ্যাথ ডাক্তারদের দাবি মেনে বেতন কাঠামো সমান করতে সম্মত হননি। এই ঘটনায় হোমিওপ্যাথ ডাক্তারদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তারা কর্পোরেশনের এই বিমাতৃসুলভ আচরণ মেনে নিতে পারছেন না। এই প্রসঙ্গে বাগমারি কবরস্থানের সাব-রেজিস্ট্রার ড. শেখ মোসাদ্দেক হুসেন জানালেন : "আমরা মনে করি কর্পোরেশন আমাদের অর্থাৎ হোমিওপ্যাথ ডাক্তারদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার যখন সমস্ত ডাক্তারদের বেতন কাঠামো সমান করে দিয়েছেন, তখন কর্পোরেশনেই এই আচরণ দৃষ্টিকটু। একই ধরনের কাজ, একই পদ একই রকম কাজের সময় অথচ বেতন কাঠামোয় বৈষম্য। আমরা তাই ক্ষোভের সঙ্গে এখানে কাজ করছি। আমরা মনে করছি ডাক্তার হিসাবে সরকার আমাদের স্বীকৃতি দিলেও কর্পোরেশন তা মেনে নিতে চাইছে না।" এই প্রসঙ্গে বাগমারি কবরখানার অপর সাব-রেজিস্ট্রার ড. হায়দার আলি খান জানালেন, "বেতন কাঠামোয় এই বৈষম্য দূর করতে সাব-রেজিস্ট্রার অ্যাসোসিয়েশন সিটু-র নেতৃত্বে ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে পারে।" তিনি আরো বলেন যে জুলাই মাসের ২০ তারিখে দি স্টেটসম্যান পত্রিকায় কলকাতা কর্পোরেশন সাব-রেজিস্ট্রার পদে লোক নেওয়ার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে সাব-রেজিস্ট্রার পদে মূল বেতন হবে ১০৪০-১৯২০ টাকা। একই কাগজে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মেডিকেল অফিসার পদে লোক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে যে এই পদে মূল

বেতন শুরু ২২০০ টাকা থেকে।

যখন কবরের উপর সৌধনির্মাণে কোনো বাধা ছিল না, তখন অবিভক্ত বাংলার সরকার এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করে সমগ্র বিষয়টি কিছু নিয়মনীতির ভিত্তিতে এক ধরনের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় :

"কোনো কবরের উপর গম্বুজাকৃতি অথবা অন্য কোনো সৌধনির্মাণ করে কবরটি আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হলে, এই সৌধ অথবা কোনো কাঠামো নির্মাণ বাবদ সম্ভাব্য ব্যয়ের ১৫ শতাংশ আগাম কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো কাজ আরম্ভ করার পূর্বে জমা দিতে হবে, যাতে সঞ্চিত অর্থ ভবিষ্যৎ মেরামতিব কাজে ব্যবহার করা যায়"—(সরকারি বিজ্ঞপ্তি নং : ২০১৬ এম, ১৬ জুন, ১৯৩০)

এই নির্দেশ স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, কবরখানায় জীর্ণ সৌধেব খণ্ডহর না ঘটতে দেওয়ার জন্যে সরকার এই বিধি চালু করেছিল। উপেক্ষিত স্মৃতিসৌধ যাতে কবরখানার মধ্যে সমাধিস্থানেব ভাবগম্ভীর পরিবেশ ক্ষুণ্ণ না করে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। মোট খবচের ১৫ শতাংশ একটা বিশেষ তহবিলে সঞ্চিত হলে সৌধেব মেবামতির কাজ বজায় বাখা যাবে, এটাই ছিল প্রত্যাশা।

যেকোনো কবরখানায় সম্পন্ন ব্যক্তিরা জমি কিনে নিজের এবং পরিবারের জন্যে মনোমত জায়গা বাছাই করতে পারতেন। তখন সরকার আর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন : "কোনো ব্যক্তি কোনো কবরস্থানে নিজের এবং পবিবারেব সদস্যদেব জন্য কবরের জমি বাছাই করতে চাইলে তাঁকে সংশ্লিষ্ট কবরস্থানের সচিবের কাছে আবেদন কবতে হবে, এবং আবেদনকারী সর্বোচ্চ ২৪ ফুট x ১০ ফুট = ২৪০ বর্গফুট পবিমাণ জমি (একটিমাত্র কবব অথবা সর্বোচ্চ ৬টি কবরের জন্য) পেতে পারেন, যার মূল্যস্বরূপ ৫টাকা বর্গফুট হিসাবে আগাম জমা দিতে হবে।"

বিজ্ঞপ্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় স্বতন্ত্রভাবে জমি কিনে কোথাও পারিবারিক কবরস্থান কবা না হলে কোনো সাধাবণ কবরস্থানে কোনো ধনী ব্যক্তির পক্ষেও ২৪০ বর্গফুটের বেশি জমি কেনা যেত না। কারণ জমির দাম ৫টাকা বর্গফুট ছিল বলে অনেকের পক্ষেই আর বড় মাপের জমি কিনতে চাওয়া স্বাভাবিক ছিল। সরকার সেই আগ্রহে উৎসাহ দেননি। বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়েছে : "কোনো সমাধিসৌধ এবং কবরস্থানেব মধ্যে কোনো পারিবারিক এলাকা চিহ্নিত করার জন্য দেয় ফি থেকে ৩০ টাকা সবিয়ে রাখা হবে ভবিষ্যতে সেই সৌধ জীর্ণ এবং ভগ্নদশায় পরিণত হলে অথবা পারিবারিক এলাকায় প্রাচীর ভেঙে পড়লে তার মেরামতির জন্যে।

এই ব্যবস্থা করার কারণ স্বরূপ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয অনেক সময় মৃতের স্বজন এবং উত্তরাধিকারীদের খোঁজ না পাওয়ার জন্য অবহেলিত সৌধ বা প্রাচীর কবরস্থানের সামগ্রিক চিত্র ক্ষুণ্ণ করে।"—(বিজ্ঞপ্তি নং ১৪৫৭ এম, ১৪ জুন, ১৯৪৫) বিজ্ঞপ্তির এই অংশও প্রমাণ করে সরকাব কবরখানার মধ্যে কোনো পাবিবারিক এলাকা চিহ্নিত করতে দিলেও তার মেরামতির জন্য একটি তহবিল গড়তে আগ্রহী ছিলেন। অনাদরে অবহেলায় কবরখানা হতশ্রী হয়ে পড়ে, সেটি এড়াতেই এই ব্যবস্থা।

সরকারি আর-একটি বিজ্ঞপ্তি হল এইরকম : "কোনো কবরস্থানে সৌধনির্মাণ কেবল নির্দিষ্ট

এলাকাতেই করা যাবে, যে এলাকায় কোনো সৌধ নেই সেখানে কোনো সৌধনির্মাণ করা যাবে না। একটি কবরস্থানে সৌধনির্মাণের জন্য স্বতন্ত্রভাবে এলাকা চিহ্নিত করা যেতে পারে। যে কোনো সৌধনির্মাণের পূর্বে দেয় অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে মৃতকে সমাহিত করার পূর্বেই দিতে হবে।''—(সরকারি বিজ্ঞপ্তি নং এম-৪ বি-৫/৫১, ৪ ডিসেম্বর, ১৯৫২)।

এই বিশেষ সরকারি বিজ্ঞপ্তি নানাদিক থেকে উল্লেখনীয়। প্রথমত, মুসলিম কবরখানায় অন্তত শব সৎকারে কোনো তারতম্য করা হয় না—ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্য এখানে চোখে পড়ে তা হল, কবরখানায় যে অঞ্চলে কোনোরকম সমাধিসৌধ রচনা করার মতো আর্থিক সামর্থ্য মৃতের পরিবারের নেই, সেখানে কাউকে সমাধিসৌধ করতে দেওয়া হবে না। তার জন্য আলাদা ব্লক বা এলাকা থাকবে। ১৯৮৪ সালের পর থেকে সমাধিসৌধ রচনার বিষয়টি বিশেষ অনুমোদনসাপেক্ষ করা হয়েছে। সমগ্রভাবে সমাজে বিশিষ্ট জন ছাড়া, যাঁর সমাধির উপর সৌধনির্মাণ সর্বজনীনভাবে কাঙ্ক্ষিত, তা ছাড়া আর অনুমোদন পাওয়া কঠিন। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখের এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল সৌধ নির্মাণের জন্য কবরস্থান কর্তৃপক্ষকে দেয় টাকা, আর প্রস্তাবিত সৌধের নির্মাণ ব্যয় সমাধিস্থ করার সময়েই দিয়ে দিতে হবে।

আলোচনার শুরুতে যে তিনটি কবরখানার প্রসঙ্গ বার বার চলে এসেছে (বাগমারি, গোবরা, ষোলো আনা) সেগুলি ছাড়াও কলকাতা শহরে আরো অনেকগুলি ছোটবড় ব্যক্তিগত বা প্রাইভেট কবরখানা আছে। এই কবরখানাগুলির সূচনাকালের কথা বিশেষ জানা যায় না। কবরখানাগুলির প্রতিষ্ঠার সন তারিখ জানতে চেয়ে বিভিন্ন জনকে প্রশ্ন করলে বিভিন্ন রকমের উত্তর পাওয়া যায়। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সূচনাকালের ইতিহাস অনাবৃতই থেকে যায়। কলকাতা শহরের প্রায় সবকটি কবরস্থানেই ঘোরার সুযোগ হয়ে গেল এই তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধটি লেখার সূত্রে। কলকাতার বেশিরভাগ ব্যক্তিগত কবরস্থানগুলি সুন্নি সম্প্রদায়ের। তবে শিয়া, বোহ্‌রা, খোজা কবরস্থানেরও সন্ধান এক-আধটা পাওয়া যায়।

সাহার বাংলা মুসলিম কবরস্থান। শ্যামবাজার থেকে বিটি রোড ধরে চিড়িয়ামোড় অবধি এগিয়ে বাঁদিকে কাশীপুরের দিকে ঘুরে কয়েক মিনিট হাঁটলেই বাঁ হাতে চোখে পড়বে নুড়ি মসজিদ। মসজিদের পিছনে সাড়ে আট বিঘা জমির উপরে সাহার বাংলা মুসলিম কবরস্থান (ঠিকানা : ১/৫ খগেন চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা-২)। মসজিদের ইমাম হলেন মৌলানা উমর কাদেরি। এটি একটি সুন্নি কবরস্থান। কবরখানাটির প্রতিষ্ঠার সন তারিখ যথাযথভাবে না বলতে পারলেও কাদেরি সাহেবের কাছ থেকে জানা গেল কবরস্থানটির সূচনা হয়েছিল নবাবী আমলে। রাজিয়া বেগম সাড়ে আট বিঘা এই জমিটি তাঁর নায়েব গুলাম রসুলকে দিয়েছিলেন উপহার হিসাবে। পরে গুলাম রসুলের ব্যক্তিগত উদ্যোগেই এখানে কবরখানা গড়ে ওঠে। তাই খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে এই কবরখানাটির বয়স দেড়শো বছরের কম নয়। সৈয়দ বাবা এবং জালাল-উদ্দিন বাবা নামে দুইজন মুসলিম সাধকের সমাধি এখানে আছে। বিখ্যাত শাস্ত্রীয় সংগীত গায়ক ও সেতারবাদক ওস্তাদ মুস্তাক আলি খানের কবর এখানে রয়েছে। এখনো এখানে নিয়মিত কবর দেওয়া হয়। বেলগাছিয়া, ঝিল রোড, সওদাগড় পট্টী, লিচুবাগান, ৯৬, ৯৯, ৯৩, ২২নং বস্তি

প্রভৃতি অঞ্চল থেকে মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা এখানে কবর দিতে আসেন। তীব্র স্থানাভাবের দরুন ৩ বছর অন্তর অন্তর পুরানো কবর খুঁড়ে সেই জায়গায় নতুন কবর দেওয়া হয়। এখানে কবর দেওয়ার জন্য ১২ বছরের ঊর্ধ্বে যাদের বয়স তাদের জন্য লাগে ৩০ টাকা আর ১২ বছরের নীচে বয়স হলে লাগে মাত্র ২০ টাকা। কবরখানাটি দেখাশোনা করার জন্য একটি পরিচালন সমিতি গঠন করা হয়েছে। পরিচালন সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩২ জন। পরিচালন সমিতির সভাপতি হলেন জনাব হাজি আবদুল রশিদ সাহেব। সাধারণ সম্পাদক হলেন মহম্মদ ইলিয়াস খান।

কলকাতার আর-একটি বিখ্যাত মুসলিম কবরখানার নাম 'দিল্লিওয়ালা কবরস্থান' (২৪/১ মুনশি পাড়া লেন, কলকাতা-৬) বর্তমানে এটি ওয়াকফ বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন। এক সময় বিরাট অঞ্চল জুড়ে এই কবরখানাটিব অস্তিত্ব ছিল। তবে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কবরখানা ভেঙে বহু বাড়ি ও কলকারখানা তৈরি হয়েছে। এখন যেখানে মোহিনী বেকারির কারখানা সেটিও এককালে এই কবরখানার অন্তর্গত ছিল। বিগত ১০-১৫ বছর ধরে এই কবরখানায় কোনো কবর দেওয়া হচ্ছে না। এটি সুন্নি মুসলমানদেব কবরস্থান। দেড়শো, দুশো বছরের পুরোনো এই কবরখানা প্রতিষ্ঠার সঠিক সন তারিখ কেউই জানাতে পারলেন না। তবে নামের থেকে এটুকু বোঝা যায় দিল্লিবাসী কোনো ধনী মুসলমান এই কববখানাটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কোনো 'appointed' কেয়ারটেকাব না থাকার জন্য ওয়াকফ বোর্ডেব জয়নাল সাহেব এই কবরখানাটি দেখাশুনো করেন। বর্তমানে কবরখানা সংলগ্ন অঞ্চলটি অসামাজিক কার্যকলাপের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। রাতের অন্ধকাবে এখানে অবাধে মদ, গাঁজার ব্যবসা চলে। এখানে দুস্থ ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস তৈরির একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুজন মোতয়ালির পারস্পরিক বিবাদ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে হাইকোর্টে তার জন্যে মামলা দায়ের করতে হয়েছিল। নিশীথ বটব্যাল তখন ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। মোতয়ালিদের পারস্পরিক বিবাদের দরুন শেষ অবধি ছাত্রাবাস তৈরির পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়। আয়েসিয়া দরবার শরিফ হজরত সুফিওয়াসি কিবলার দববারে প্রতি বাংলা মাসের ২০ তারিখ বাদ—মাগবীব ফুরফুরা শরিফের হুজুর, কিবলাদের উপস্থিতিতে হালকায়ে জিকির ও দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লিওয়ালা কবরস্থানের উল্টোদিকে রয়েছে 'তাজ মহম্মদ কবরখানা'' নামে একটি শিয়া কবরস্থান (২ এবং ৩ মুনশিপাড়া লেন, কলিকাতা-৬)। বর্তমানে এটি একটি আগাছাপূর্ণ মাঠে রূপান্তরিত হয়েছে। মানিকতলা পোস্ট আপিস থেকে মানিকতলা মোড়ের দিকে আসতে বাঁদিকে চোখে পড়বে একটি সাজানো গোছানো বাড়ি। প্রায়শই নানা অনুষ্ঠানে বাড়িটি ভাড়া দেওয়া হয়। যে জমির উপর বর্তমানে এই বাড়িটি সেটি ৭০-৭৫ বছর আগে ছিল একটি খোজা কবরস্থান (১৪৪, মানিকতলা মেন রোড)।

কলকাতা মুসলমান সমাজের জীবনযাপন প্রসঙ্গে প্রকৃত খানদানের দিক থেকে যাঁদের উল্লেখ অপরিহার্য, তাঁবা হলেন তিনটি শাহি পরিবার। এঁদের মধ্যে অবশ্য বাংলার হতমান নবাব মীরজাফর ও তাঁর বংশধররা খ্যাতির দিক থেকে অনেক পিছিয়ে পড়া। তাঁরাই কিন্তু ছিলেন কলকাতার প্রথম বনেদি শাহি পরিবার, পলাশীর যুদ্ধে কার্যত একদশক পর থেকে তারা কলকাতার বাসিন্দা

হয়ে পড়েন। কিন্তু যে বিখ্যাত শাহি পরিবার নিয়ে কলকাতার মুসলমান সমাজ এমনকী অন্যান্য ধর্মের মানুষও ব্যক্তিগত পরিচয় ও সামাজিক সম্পর্কের সূত্রে যথেষ্ট শ্লাঘা বোধ করতেন, তাঁরা হলেন মহীশূরের টিপু সুলতানের পরিবার। টিপু সুলতানের বংশধরদের কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসের কোনো কারণ ঘটত না, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তারী নীতি অনুসৃত না হলে। সংক্ষেপে সেই ইতিহাস কবরস্থান প্রসঙ্গেই বলা দরকার।

বড়লাট কর্নওয়ালিসের পর বিলাতে কোম্পানির ডিরেকটররা এমন এক ব্যক্তিকে বড়লাট নিয়োগ করে পাঠান, যিনি এদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তার করা প্রায় ব্রত হিসাবে নিয়েছিলেন। তিনি বড়লাট ওয়েলেসলি। ভারতে কোম্পানি শাসন তখন ইউরোপে নেপোলিয়নের সঙ্গে ইংরাজ রাজশক্তির সংঘর্ষের সূত্রে জড়িয়ে পড়েছে। মহীশূরের অধিপতি টিপু সুলতান কেবল নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখা নয় ভারতে ইংরেজ শাসন সঙ্কুচিত এবং সম্ভব হলে উচ্ছেদ করার জন্য যে কোনো উদ্যোগ গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন। তিনিই নেপোলিয়নের দরবারে দূত পাঠিয়ে কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে একটা যৌথ উদ্যোগের প্রস্তুতি চালিয়েছিলেন। ওয়েলেসলির পক্ষে এই উদ্যোগ অঙ্কুরে বিনষ্ট করা জরুরি মনে হয়েছিল। ১৭৯৭-৯৮ সালে তিনি বারবার মহীশূরের সামরিক অভিযান চালান। টিপু-ফরাসি সামরিক মৈত্রী তাঁকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি। এই ধরনেরই এক সফল সামরিক অভিযান চালিয়ে ওয়েলেসলি টিপুর ভবিষ্যৎ সদ্ভাব বজায় রাখার জামিনস্বরূপ তাঁর দুই শিশুপুত্রকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। টালিগঞ্জ এলাকার পুঁটিয়ারি অঞ্চলে টিপু সুলতানের পরিবারের বসবাসের স্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। বিলাতে ইন্ডিয়া হাউসে এক বিরাট তৈলচিত্রে টিপু সুলতানের দুই শিশুপুত্রের হাত ধরে ওয়েলেসলি সগর্বে কলকাতা প্রত্যাবর্তনের ঘটনাটি অঙ্কিত আছে। তার কিছুদিন পর শ্রীরঙ্গপত্তনের যুদ্ধে টিপু সুলতান পরাজিত হলে বিজয়ী ইংরেজ সেনাপতি খোলা তরবারি তাঁর বুকে বিঁধিয়ে তাঁকে হত্যা করেন। কলকাতার রাজভবনে এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সেই ছবি আছে। নিহত টিপু সুলতানের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মহীশূরে রাখা রাজনৈতিক কারণে অসমীচীন মনে করে, ওয়েলেসলি তাঁদেরও কলকাতায় পুঁটিয়ারি অঞ্চলে বাস করতে বাধ্য করেন। টালিগঞ্জের আনোয়ার শা সহ বক্তিয়ার শাহ, সুলতান আলম, গোলাম মহম্মদ শাহ রোডগুলির নামের আগে যে প্রিন্স শব্দটি যুক্ত দেখা যায়, সেটি সেই স্মৃতি বহন করে।

টিপু সুলতানের পারিবারিক কবরস্থানের কথা এই নিবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। কালীঘাট ট্রামডিপোর পিছনে সাহেববাগানে টিপু সুলতানদের পারিবারিক কবরস্থান রয়েছে। এখন এই কবরখানা সংলগ্ন অঞ্চলে মসজিদ বাড়ি বস্তি গড়ে উঠেছে। গত ৫-১০ বছরে প্রায় ৭০০ টার মতো ঘর তৈরি হয়েছে এই শাহি কবরখানায়। ওয়াকফ বোর্ড সরকারিভাবে এই কবরখানা দেখাশোনা করার দায়িত্বপ্রাপ্ত। নবাব হুসেন শাহ, যিনি সম্পর্কে সুলতান বংশের সঙ্গে যুক্ত, ওয়াকফ বোর্ডের পক্ষ থেকে এই কবরখানা দেখাশোনা করার জন্য নিযুক্ত। ১নং লোয়ার সার্কুলার রোডের বাসিন্দা কেরোসিনের ডিলার এই ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের উদাসীন আচরণের প্রতি সর্বজনবিদিত কবরখানার হতশ্রী উদ্ধারের জন্য তিনি কোনোদিনই কোনো কার্যকর ভূমিকা নেননি। স্থানীয় কংগ্রেসি বিধায়ক ডাঃ হৈমী বসু ভোটের মরশুমে শুধুমাত্র ভোটভিক্ষার জন্য

এসে নিজের কর্তব্য পালন করে থাকেন।

মির্জা গালিব লক্ষ্ণৌর নাম দিয়েছিলেন 'পুবের বোগদাদ'। সেই লক্ষ্ণৌ ছেড়ে ওয়াজেদ আলি শা কলকাতায় চলে এলেন। বলা ভালো তিনি নির্বাসিত হলেন। লক্ষ্ণৌ থেকে নির্বাসিত হয়ে বিষণ্ণ নবাব গান লিখেছিলেন—'মহল মহল বেগম রোয়েঁ, গলি গলি রোয়েঁ পাথুরিয়া। সত্যি সত্যিই নাকি তাঁর জন্য কেঁদেছিল এমনকী চকের মেয়েরাও। কলকাতায় নবাব নির্বাসিত হওয়ার পরে, তাঁর পরিবারের স্থান সঙ্কুলানের জন্য তৎকালীন মুচিখোলা বর্তমানে গার্ডেনরিচ রোডে নির্মিত হয়েছিল ১৮টি রাজপ্রাসাদ। ক্ষমতাচ্যুত নবাব সেই মুচিখোলাতেই বসিয়ে ফেলেছিলেন 'নয়া-লক্ষ্ণৌ'। এখন এই প্রাসাদপুঞ্জের মধ্যে অনেকগুলিই দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সদরদপ্তর। নবাবের সঙ্গেই কলকাতায় এসেছিলেন লক্ষ্ণৌর প্রায় ৪০ হাজার বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী মানুষ। শ্রীপান্থ তাঁর 'মেটিয়াবুরুজের নবাব' গ্রন্থে এই নয়া-লক্ষ্ণৌব জীবনধারা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'সেই জীবন, সেই জবান, সেই কবি, সেই আসর, সেই প্রমোদ উপকরণ। সেই মুর্গীবাজি, বটেরবাজি, আফিমখোর, ফানুস, ঘুড়ির নেশা। সেই কথকতা, মর্সিয়া, তাজিয়াদারি, সেই ইমামবাড়া ও কারবালা।''

ওয়াজেদ আলি ফোর্ট উইলিয়মে বন্দি ছিলেন ১৮৫৭ সনের জুন থেকে ১৮৫৯ সনের জুলাই অবধি। ছাড়া পেয়ে তাবপর আবার মেটিয়াবুরুজে। নবাব জেনে গিয়েছেন রাজ্য ফিরে পাওয়ার কোনো আশা আর নেই। রাজত্বের বিনিময়ে বছরে ১২ লাখ টাকা ভাতা গুণে দিয়েই অযোধ্যার নবাবদেব প্রতি তাদের সব দায়-দায়িত্ব চুকিয়ে দিয়েছিলেন ইংবেজ সরকার। ফেরত দেওয়া হয়েছিল বাজেয়াপ্ত করা রাজকীয় গহনাপত্র। তখনকার দিনে তার মূল্য ছিল ষাট হাজার পাউন্ড। এই সমস্ত অর্থ দিয়ে অযোধ্যার নবাব আবার নতুন করে শুরু করলেন তাঁর জীবন। আবার সেই হারানো নবাবীয়ানা। সেই নাচগান কবিতা। মেটিয়াবুরুজ ছিল যেন গৌরবের দিনের লক্ষ্ণৌর প্রতিচ্ছবি।

ওয়াজেদ আলি শা-র মৃত্যু ১৮৮৭ সনে। ওযাজেদ আলি শা দেহরক্ষা করেছেন মাত্র ১১০ বছর। তবু কোনো কল্পনাবিলাসীর পক্ষেই সম্ভব নয় আজকের এই ধূলিশয্যায় তাঁর মেটিয়াবুরুজেব পুনর্নির্মাণ। ছন্নছাড়া শহরতলি। হতশ্রী, ছন্দহীন, বর্ণহীন জীবন। আকাশ জুড়ে জাহাজের ধোঁয়া, ক্রেনের আঁকিবুকি। একদিকে বস্তির পর বস্তি, তার মধ্যে সার সার একতলা বাড়ি। খোলা নর্দমা। তার মধ্যেই কিলবিল কিলবিল করছে হাজার হাজার মানুষ। এদের বেশিরভাগই গরিব। মাটি কাঁপিয়ে ধুলো উড়িয়ে অফিসযাত্রী ঝুলন্ত মানুষ নিয়ে ১২ নম্বর বাসের ছোটাছুটি। কোথায় সেই নবাবী আমলের মেটিয়াবুরুজ।

১৮৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত, বিখ্যাত মেটিয়াবুরুজ সিব্যয়তনাবাদ ইমামবাড়া মৎস্য-প্রতীক শোভিত তাঁর বিশাল তোরণ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গার্ডেনরিচ রোডের ওপরে বাংলা বাজারের বর্ণহীন নৈরাজ্যকে অগ্রাহ্য করে। এখানেই শায়িত আছেন লক্ষ্ণৌর শেষ 'বাদশা' মেটিযাবুরুজের নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ। শ্বেতপাথরের চত্বর পেরিয়ে ইমামবাড়ার মূল ঘর। বাঁদিকে রয়েছে নানা অলঙ্কারে শোভিত নবাবের সমাধি। একপাশে পড়ে রয়েছে গিল্টি করা নকল সিংহাসন। এখানেই ঘুমিয়ে আছেন বিরজিস কাদের এবং তাঁর বেগম মহাতাব আরা। পাশাপাশি, কাছাকাছি

শুয়ে আছেন নবাব বংশের আরো কেউ কেউ। শ্বেতপাথরের মেঝেতে কালো রেখা দিয়ে চিহ্নিত করা রয়েছে তাঁদের সমাধি। ছাদ থেকে ঝুলছে কাচের অসংখ্য রঙিন ঝাড়বাতি, লণ্ঠন। একদিকে মহরমের মিছিলের জন্য তাজিয়াদারির রকমারি সাজসরঞ্জাম। দেওয়ালে রয়েছে কিছু ধর্মীয় ছবি। তবে আর সব কিছুর আগে প্রথমেই দৃষ্টি চলে যায় নবাব ওয়াজেদ আলি শা-র একটি প্রতিকৃতির দিকে। নবাব যেন সোজাসুজি তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে। ওপরতলায় রয়েছে ইমামবাড়া ট্রাস্ট অফিস। ট্রাস্ট গঠিত হয় ১৯০১ সালে। নবাব বংশীয় অঞ্জুম কাদের সম্প্রতি (২৩ জুলাই, ১৯৯৭) মারা গিয়েছেন দিল্লিতে। ২৫ জুলাই তাঁর শবদেহ বিশেষ বিমানে দিল্লি থেকে কলকাতায় নিয়ে এসে, এই ইমামবাড়ায় তাঁর পূর্বপুরুষদের পাশে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। মেটিয়াবুরুজ থেকে ওয়াজেদ আলি শাহের স্মৃতি কিছুতেই মোছা যায় না। ইমামবাড়া থেকে বেরিয়ে ফেরার পথে নিজেই তার প্রমাণ পেলাম। গার্ডেনরিচ রোডের উপর মতিলাল শ্রীমালীর পানের দোকান। সবাই তাকে বলে শাহি পানওয়ালা। তিনি বললেন, "আমার পূর্বপুরুষরাই একদিন গোলাবি খিলি সররবাহ করতেন নবাবকে। তাই দোকানে আমি এখন ঝুলিয়ে রেখেছি নবাবের একাধিক বড় বড় ছবি। খদ্দেররা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছবিগুলো দেখেন। আমিও পান সাজতে সাজতে নবাবের নানা গল্প খদ্দেরদের বলি।" এভাবেই তিনি এখনো বেঁচে আছেন মেটিয়াবুরুজের আমজনতার মধ্যে।

আনোয়ার শা রোডের উপরে আছে 'প্রিন্স গুলাম মহম্মদ কবরখানা' (৩০৭, প্রিন্স আনোয়ার শা রোড, লেক গার্ডেন্স, কলকাতা-৪৫)। এই কবরখানাটি বর্তমানে ওয়াকফ বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন। রহিম বক্স ওস্তাগর ১৮৯০ সালে এই কবরখানাটি তৈরি করেন। এখানে এখনো কবর দেওয়া চালু আছে। এই কবরস্থানটির পাশেই আছে দাদা পীর সাহেবের মাজার। তিনি ১৯৪৮ সালে দেহরক্ষা করেন। মুমতাজ হুসেন সাহেব তাঁর মৃত্যুর পর এই মাজার তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মুমতাজ সাহেব মারা যান ১৯৮১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি। তাঁর জন্মদিন ৩ আগস্ট খুব ধুমধামের সঙ্গে পালন করা হয়।

চেতলার মুন্সিপাড়ায় মুসলমানদের একটি ব্যক্তিগত কবরস্থান আছে (২/১এ পীতাম্বর ঘটক লেন, কলকাতা-২৭)। এটি শুধুমাত্র সুন্নি মুসলমানদের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট। চেতলায় আর একটি কবরস্থান রয়েছে, তার নাম 'মারবল হক্ কবরখানা' (৬৮/১ আলিপুর রোড, কলকাতা-২৭)। প্রায় ৫০ বছর হল এই কবরখানা বস্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে, যার এখনকার নাম 'মুস্তাফা খাটাল'। বোহ্‌রা সম্প্রদায়ের ধনী মুসলমানদের পারিবারিক কবরস্থান আছে বেলেঘাটার আলোছায়া সিনেমা হলের পিছনে রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোডে। বোহ্‌রা-রা শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। এই কবরখানাটির আসল নাম 'দাউদি বোহ্‌রা কমিউনিটির কবরখানা' চলতি নাম 'বাগী মহম্মদী কবরখানা' (১, রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলিকাতা-১০)।

রাজাবাজারের তসবীর মহল সিনেমা হলটির পাশের রাস্তা হারশি স্ট্রিট ধরে কিছুটা এগোলেই পর পর তিনটি কবরখানা চোখে পড়ে। প্রথমটির নাম 'সুরতি জামাত কবরখানা' (৪নং হারশি স্ট্রিট, কলিকাতা-৭)। মুসা শেঠ প্রতিষ্ঠিত এই কবরখানাটি সুন্নি সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট। এখানে প্রায় ৫০০-এর বেশি কবর আছে। এখানে পীরবাবা সৈয়দ-শা-ফকরু-উদ্দিন চিরনিদ্রায় শায়িত

আছেন। ৩নং, নর্থ শিয়ালদহ রোডে শিয়া সম্প্রদায়ের একটি কবরস্থান আছে। এই কবরখানাটির নাম দি ওযাকফ এস্টেট অভ নবাব নাজির সিদ্দি আলি খান বাহাদুর (৩, নর্থ শিয়ালদহ রোড, কলকাতা-৯)। এই কবরস্থানটির ঠিক উল্টোদিকে আছে 'কুরেশি কবরখানা' (৬, নর্থ শিয়ালদহ রোড, কলকাতা-৯)। কুরেশি শব্দের অর্থ হল 'কসাই'। ১৯৩৪ সালে ৪ বিঘা জমি নিয়ে এই কবরখানাটির সূচনা হয়। বর্তমানে এখানে কবর দেওয়া চালু আছে।

গার্ডেনরিচ, মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে মুসলমানদেব চারটি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কবরস্থান আছে। এই কবরখানাগুলি স্থানীয় মানুষদের কাছে ১নং, ২নং, ৩নং এবং ৪নং কবরখানা রূপে পরিচিত। এই সবকটি কবরখানাকে একসঙ্গে 'গার্ডেনরিচ কবরখানা' বলা হয়। ১নং কবরখানাটি শিয়া মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট। রামেশ্বরপুর রোডে প্রায ২০ বিঘা জমির উপরে তৈরি এই কবরখানাটি এখন সবরকমের অসামাজিক কার্যকলাপের ক্ষেত্র। ২নং কবরখানাটি সুন্নি কবরস্থান। ১০০ বছরের পুরানো এই কবরখানাটি পাহাড়পুর রোডে অবস্থিত (জে-১৪৯, পাহাড়পুর রোড, কলিকাতা-২৪)। ১০ বিঘা জমির এই কবরস্থানটি দেখাশোনা করেন শেখ জুম্মান। টেক্সটাইল ওয়ার্কারদের নেতা এবং শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি কমঃ জনাব এস কে মবদুল্লা ফারুকির সমাধি এখানে আছে। প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক এম শাহাজাদাও এখানে সমাধিস্থ রয়েছেন।

গার্ডেনরিচে কাচ্চি মোড়ে নেমে বাঁদিকের রাস্তা ধরে সোজা কিছুটা হেঁটে গেলে একটা চৌমাথা পড়বে. চৌমাথার বাঁদিক বরাবর যে রাস্তাটা চলে গেছে তার নাম রামনগর লেন। ১০০ বছরেরও বেশি পুরানো ৩নং কবরখানাটি রামনগর লেনে অবস্থিত (৩, রামনগর লেন, কলকাতা-২৪)। কবরস্থানটিতে জমির পরিমাণ প্রায় ৩ বিঘা। আঞ্জুমানের পরিচালনাধীন রামনগর সমিতির ক্লাবের সংলগ্ন এই কবরখানাটি একটি সুন্নি কবরস্থান। এখানে এখনো কবর দেওয়া হয়। মহম্মদ হাসিম এই কবরখানাটির দেখভাল করেন। ৪নং কবরস্থানটির নাম 'জাদিদ ষোলো আনা' (১১, রামনগর লেন, কলকাতা-২৪)। বয়স ১০০ বছরেরও বেশি। আবদুল হক (আঞ্জুমান) এই কবরখানাটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। এই সুন্নি কবরস্থানে এখনো কবর দেওয়া হয়। ৩-৪ জন স্টাফ থাকা সত্ত্বেও তাদের কারোরই নির্দিষ্ট কোনো বেতনক্রম নেই। শিয়া, সুন্নি উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের জন্যে এই অঞ্চলে 'মেহেল মন্দির কবরখানা' নামক একটি গোরস্থান আছে।

"এদিন চলিয়া যাবে ক্ষণকাল পরে/কর্মফল রয়ে যাবে চিরদিনের তরে", এই কথাগুলো কোথায় লেখা আছে বলুন তো? যদি জানতে চান তাহলে আমার সঙ্গে আপনাকেও যেতে হবে কৈখালির 'মণ্ডলগাঁথি কবরস্থানে।' নেতাজি সুভাষ বিমানবন্দরগামী যে কোনো বাসে উঠে পড়ে কৈখালি স্টপেজে নেমে পড়লেই হল। নেমে যে কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই বলে দেবে কবরস্থানের ঠিকানা। ভিআইপি রোডের উপর কৈখালি বাসস্টপে নেমে বাঁ দিকে মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই 'মণ্ডলগাঁথি মুসলিম কবরস্থান' (৫২ নং কৈখালি রোড, কলিকাতা-৫২) একশো বছরেরও বেশি পুরানো এই কবরস্থানে জমির পরিমাণ প্রায় ১২ বিঘা। মূলত, সুন্নিদের কবরস্থান হলেও কবর দেবার সময় শিয়া-সুন্নি ভেদাভেদ করা হয না। নাগেরবাজার, গোরাবাজার, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, হসপিটাল বস্তি প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে মানুষ আসেন কবর দিতে। স্থানাভাবের দরুন কোনো কবরের উপর ৩ বছর অন্তর অন্তর আবার নতুন কবর দেওয়ার

ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। তাই কবরের উপর সৌধনির্মাণ বিগত ১৫ বছর ধরে বন্ধ আছে। কবরখানাটি দেখাশোনা করার জন্য ২৬০ জনের একটা মাথাভারী কমিটি থাকলেও কার্যক্ষেত্রে সাকিল, মুস্তাক এবং আবদুল নামের তিনজন মানুষের উপরই সমস্ত দায়িত্বভার ন্যস্ত। তাই কবরস্থানটির রক্ষণাবেক্ষণের দিকটি অনেকদিন ধরেই উপেক্ষিত। পরিচালন সমিতির সভাপতি এবং স্থানীয় মসজিদের ইমাম সুলেমান বিশ্বাস জানালেন, "প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য না পাওয়ার জন্যই কবরস্থানটির আজ এই দুর্দশা। আমরা ওয়াকফ বোর্ড সহ বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের কাছে আর্থিক সাহায্য চেয়ে অনেকবার অনুরোধ করেছি, কিন্তু কেউই শেষপর্যন্ত আমাদের অনুরোধে কর্ণপাত করেননি। বেশ কিছুদিন আগে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার গুলাম নবি নামে এক ভদ্রলোক এই কবরস্থানটির সংস্কারের জন্য এককালীন বেশ কিছু টাকা পরিচালন সমিতিকে দিয়েছিলেন। তিনি দেহত্যাগ করার পরে তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁকে এখানেই সমাধিস্থ করা হয়েছে।"

খানকাশরিফ জীবিত পীরের বাসস্থান। আর পীর যেখানে চিরনিদ্রায় শায়িত থাকেন সেই স্থানকে বলা হয় আস্তানা কিংবা দরগা শরিফ। কেবলমাত্র সুন্নি মুসলমানদের মধ্যেই পীরপ্রথার প্রচলন রয়েছে। সুন্নিদের মধ্যে আবার 'আহলে-হাদিস' এবং 'জামায়েত ইসলামি' গোষ্ঠীর অনুগামীরা পীর প্রথার একেবারে বিরোধী। বিভিন্ন গোষ্ঠীর শিয়ারাও পীর-প্রথা মানেন না। মুসলমানদের এইরকম পবিত্রস্থান কলকাতায় আছে অন্তত ২০টি। এদের মধ্যে ১৩টি আস্তানা বা দরগা, বাকি সাতটি খানকা। দরগা, আস্তানায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলে আসেন। কলকাতার বিভিন্ন দরগা, আস্তানার নাম নিম্নরূপ :

১. দরগা হজরত মৌয়ালা আলি শাহ (মৌলালি, ধর্মতলা)
২. আস্তানা খাজা মিসকিন আলি শাহ (বেনিয়াপুকুর)
৩. আস্তানা হজরত মেহর আলি শাহ (২০, লোয়ার সার্কুলার রোড)
৪. আস্তানা হজরত রুস্তম শাহ চিস্তি (খিদিরপুর গোরস্থান)
৫. আস্তানা হজরত জুমা পীর (রাজাকাটরা, বড়বাজার)
৬. আস্তানা রজব আলি শাহ (হেস্টিংস)
৭. আস্তানা লাট্টু শাহ চিস্তি (টালিগঞ্জ, বড় মসজিদের দক্ষিণে)
৮. আস্তানা শাহি সুফি আজান গাছি (বাগমারি গোরস্থান)
৯. দরগা বাবা হাসান রেজা শাহ ওয়ারেশি (গোবরা)
১০. দরগা শাহ আমন আলি কাদেরি চিস্তি (খিদিরপুর)
১১. দরগা পাঞ্জা শাহ হুসেনি (কাশীপুর)
১২. আস্তানা বাবা মহম্মদ শাহ ওয়ারেশী (তিলজলা)
১৩. দরবার শরিফ, খানকা চিস্তি নিজামিয়া (মফিদুল ইসলাম লেন)

(এগুলি প্রতিষ্ঠার সন তারিখের হদিশ বিশেষ পাওয়া যায় না।)

জন্মের উত্তরাধিকারী মৃত্যু। এই সত্য চিরকালীন এবং অমোঘ। তাই জনবসতি গড়ে উঠলেই শব সৎকারের ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়। সেখানে আছে মানুষের বিশ্বাস, ধর্ম অনুযায়ী নানা ধরনের কৃত্য। মুসলমানদের গোর দেওয়া সেই ধরনেরই এক কৃত্য। সেই অনুষঙ্গেই এসে পড়ে কবরস্থান

নির্দিষ্ট করা, রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা। মহানগর কলকাতায় সেই ব্যবস্থা পুরসভার তত্ত্বাবধানে যথেষ্ট সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হলেও, কবণীয় আর কিছু আছে। সরেজমিন তদন্তে শুধু নয়, মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, কবরস্থানের সংরক্ষণ করার কাজ আর কিছু ব্যবস্থা দাবি করে। ঝোপঝাড়, আগাছা ভর্তি অনেক কবরখানায় যেমন অসামাজিক কাজের আখড়া হয়ে পড়েছে, তেমনই যেসব মানুষদের প্রিয়জন সেখানে সমাহিত আছেন, তার মেয়াদ ১০ বা ৫ বা ৩ বছর যাই হোক না কেন অন্তত সেই সময়টুকুতে তাঁদের অবাধে যাতায়াত এবং নিরাপত্তা সবসময় বজায় রাখা যায় না। আর যেসব কবর মানুষের মনে গভীর শ্রদ্ধা এবং স্মৃতির উৎস, সেগুলি হারিয়ে যাওয়া সত্যিই মর্মান্তিক। সাখাওয়াত স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা বেগম রোকেয়ার কবর সেইরকমই একটি লজ্জাজনক ঘটনা। এটা কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের নয়, এই দায় সমগ্র সমাজের। ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনাব পুনরাবৃত্তি ঘটবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সবকার থেকে শুরু করে সকলেই তার কথা ভাবছেন কি?

পরিশিষ্ট : ১

১৯৯৩ সালে গঠিত মুসলিম বাবিয়াল বোর্ডের সদস্যবা হলেন ·

১. অসীম বর্মন (পুরকমিশনার, কলকাতা পুরসভা, সভাপতি পদাধিকার বলে)

২ ড. এস কে ঘোষ, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (সদস্য পদাধিকাব বলে)

৩. মহম্মদ ঈশাক

৪. মহম্মদ ইয়াকুব (পুবপিতা)

৫ ড. শহিদ আহম্মদ শহিদ

৬ ডঃ নাজির আহম্মদ

৭. আবু সুফিয়ান

৮ রাজা গুপ্ত (অ্যাটর্নি)

৯. মোহন ভট্টাচার্য (সহকারী ইঞ্জিনিয়াব, স্বাস্থ্য)

১০. এ কে অধিকারী (সহকাবী ইঞ্জিনিয়ার, স্বাস্থ্য)

১১. ড. মণিরুল ইসলাম মোল্লা

১২ মুস্তাক হুসেন (সচিব, মুসলিম বারিয়াল বোর্ড)

অফিস : ১ নম্বর হাজি মহম্মদ মহসীন স্কোয়াব, কলকাতা-১২।

পরিশিষ্ট : ২

কলকাতা পুরসভা পরিচালনাধীন কবরস্থান সমূহ :

১. মক্‌বরা-ই-আম (বাগমারি মুসলিম কবরখানা)

জমির পরিমাণ—১৫০ বিঘা। ৫২, বাগমারি রোড, কলকাতা-৫৪

২. গোবরা কবরস্থান (তিনটি পার্ট আছে) জমির মোট পরিমাণ ১৩৯ বিঘা। ১নং পার্ট : তিলজলা (সাময়িকভাবে বন্ধ) ১নং রাইচরণ পাল লেন। ২নং পার্ট : গোর-ই-গোরিবান (সাময়িকভাবে বন্ধ) ৩২. গোবরা গোরস্থান রোড, গোবরা। ৩নং পার্ট : তিলজলা সম্প্রসারিত

কবরখানা (পুনরায় চালু হয়েছে) ২০, মহেন্দ্রনাথ্ রায় লেন, গোবরা।

৩. ষোলো আনা মুসলিম কবরস্থান, জমির মোট পরিমাণ প্রায় ২০ বিঘা। ৭০/১এ, একবালপুর রোড, কলকাতা-২৩। (ফ্যান্সি মার্কেটের বিপরীতে)।

পরিশিষ্ট : ৩

কলকাতা পুরসভার সাধারণ নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পারিবারিক ও সাম্প্রদায়িক কবরস্থান সমূহ :

১. দাউদ বোহরা সম্প্রদায়ের কবরস্থান (শিয়া) বাগী মহম্মদী কবরস্থান (শুধুমাত্র দাউদি-বোহ্‌রা) ১, রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলকাতা-১০

২. মানিকতলার নাখোদা কবরস্থান (শুধুমাত্র শিয়া সম্প্রদায়ের জন্যে) ২৪৮/এ, এ পি সি রোড, কলিকাতা-৬

৩. প্রিন্স গুলাম মহম্মদ কবরখানা (শুধুমাত্র সুন্নি সম্প্রদায়ের জন্য) ৩০৭, প্রিন্স আনোয়ার শা রোড, লেক গার্ডেন্স, কলিকাতা-৪৫

৪. চেতলা মুনশিপাড়া কবরস্থান (পারিবারিক ও সুন্নি গোষ্ঠীর মুসলমানদের জন্যে) ২/১এ, পীতাম্বর ঘটক লেন, কলিকাতা-২৯

৫. মারবল হক কববখানা (শুধুমাত্র সুন্নি সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য) ৬৮/১ আলিপুর রোড কলিকাতা-২৭

৬. দিল্লিওয়ালা কববস্থান (সুন্নি মুসলমানদেব জন্যে) ২৪/১, মুনশিপাড়া লেন, কলিকাতা-৬

৭. তাজ মহম্মদ কবরখানা (শিয়া মুসলমানদের জন্যে) ২ এবং ৩ মুনশিপাডা লেন, কলিকাতা-৬

৮. সুরতি জামাত কবরস্থান (সুন্নি কবরস্থান) ৪নং হারশি স্ট্রিট, কলিকাতা-৯

৯ দি ওয়াকফ এস্টেট অভ লেট নবাব নাজির সিদ্দি আলি খান বাহাদুর (শিয়া কবরস্থান) ৩, নর্থ শিয়ালদহ রোড, কলিকাতা-৯

১০. কুরেশি কবরস্থান (কসাইদের জন্য) ৬নং নর্থ শিয়ালদহ রোড, কলিকাতা-৯

১১. গার্ডেনবিচ মুসলিম কবরখানা। (শিয়া, সুন্নি উভয় সম্প্রদায়ের কববস্থান) ১নং কবরস্থান (শিয়া কবরস্থান) রামেশ্বরপুর রোড, কলিকাতা-২৪। ২নং কবরখানা (শুধুমাত্র সুন্নিদের জন্যে) জে-১৪৯ পাহাড়পুর রোড, কলিকাতা-২৪। ৩নং কবরখানা (সুন্নি কবরস্থান) ৩নং রামনগর লেন, কলিকাতা-২৪। 'জাদিদ ষোলো আনা কবরস্থান' (সুন্নি কবরস্থান) ১১নং রামনগর লেন, কলিকাতা-২৪

১২. মেটিয়াবুরুজ ইমামবাড়া। (অযোধ্যায় নবাবদের কবর আছে) গার্ডেনরিচ রোড, কলিকাতা-২৩

১৩. 'সাহেব বাগান মুসলিম কবরস্থান' (টিপু সুলতানের বংশধরদের পারিবারিক কবরস্থান) ৫১/১এ, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

১৪. 'মণ্ডলগাঁথি মুসলিম কবরস্থান, ৫২, কৈখালি রোড, কলিকাতা-৫২

পরিশিষ্ট : ৪

গোবরা কবরস্থানে ১৯৮৯-৯০ বার্ষিক হেলফ অফিসারের বিবরণীতে মোট ১৩৬৫ জনের গোর দেওয়ার তথ্য আছে :

কবরের আয়তন	পুরুষ	মহিলা	মোট	মন্তব্য
প্রাপ্তবয়স্ক	৬৭২	৬৭০	১৩৪২	শহরের বাইরে থেকে আসা ২৩ জন মোট ১৩৬৫
মাঝারি আয়তন	৮৪	৬০	১৪৪	
ছোট	৪১১	৩০০	৭১১	উপরোক্ত পরিসংখ্যানে এদের উল্লেখ করা হয়নি।
নিঃস্ব	১১৩	৮২	১৯৫	
সমাধিসৌধ	৬	৬	১২	

কবর বাবদ প্রাপ্ত ফি ৮৬৭৯ টাকা। হেলফ অফিসারের বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৮৯-৯০

পরিশিষ্ট : ৫

কলকাতার তিনটি চালু কবরখানা গোবরা, বাগমারি এবং যোলো আনা সম্পর্কে ১৯৯০-৯১ সালের হেলথ অফিসারের রিপোর্ট। রিপোর্টে উল্লেখ্য, যেখানে গোবরা কবরস্থানে শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের প্রমাণ সাইজ কবরের উল্লেখ আছে, সেখানে বাগমারি এবং যোলো আনা কবরস্থানে সব ধরনের কবরের উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া গোবরায় বাইরে থেকে আসা শবের উল্লেখ মোট প্রমাণ সাইজের তালিকায় দেওয়া নেই, যা অন্য দুটিতে দেওয়া আছে।

গোবরা

আয়তন	পুরুষ	মহিলা	মোট	মন্তব্য
প্রাপ্তবয়স্ক	৮১৫	৫৮০	১৩৯৫	
মাঝারি	৯৯	৭০	১৬৯	বন্ধনীভুক্ত সংখ্যার রিপোর্টের
ছোট	৪২৯	৩২১	৭৫০	মোট সংখ্যায় দেখানো হয়নি
সৌধ	১২	১০	২২	কিন্তু খুঁটিনাটির মধ্যে বলা
নিঃস্ব	৯৫	৬৩	১৫৮	আছে
	১৪৫০	১০৪৪	২৪৯৪	

যোলো আনা

আয়তন	পুরুষ	মহিলা	মোট
প্রমাণ সাইজ	৫৮৩	৪০৭	৯৯০
মাঝারি	৫৮	৫১	১০৯
ছোট	২৪০	২৪৪	৪৮৪
সৌধ	-	-	
নিঃস্ব	-	-	
	৮৮১	৭০২	১৫৮৩

পরিশিষ্ট : ৬

পুরসভার পরিচালনাধীন কবরখানাগুলিতে পুবকর্মীদের বেতনক্রম

স্থান নাম	পদাধিকারী	সংখ্যা	শ্রেণি	বেতনক্রম
বাগমারি	সাব-রেজিস্ট্রার	৪	সি	(১০৪০-১৯২০)
	মহাফিজ-এ-জানাজা	৩	সি	(৯২০-১৬১৭)
	সরকার	১	সি	(৯২০-১৬১৭)
	হেডমালি	১	ডি	(৪৭৫-১৪৬০)
	গার্ড	৬	ডি	(৪৩০-১৩৫৭)
	পিওন	১	ডি	(৪৩০-১৩৫৭)
	গ্রেডডিগার	৬	ডি	(৪৩০-১৩৫৭)
	মালি	২০	ডি	(৪৩০-১৩৫৭)
	মজদুর	২০	ডি	(৪০০-১২৬৫)
		মোট ৬২		

বাগমারি—

আয়তন	পুরুষ	মহিলা	মোট
প্রমাণ সাইজ (প্রাপ্তবয়স্ক)	২৮৫	২৪৭	৫৩২
মাঝারি	২৭	৩৩	৬০
ছোট	৮০	৭৯	১৫৯
সৌধ	৩	-	৩
নিঃস্ব	-	-	
	৩৯৫	৩৫৯	৭৫৪

স্থান নাম	পদাধিকারী	সংখ্যা	শ্রেণি	বেতনক্রম
গোবরা	হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট	১	সি	(১৩৯০-২৯৭০)
	সহকারী হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট	১	সি	(১২০০-২৩৬০)
	সাব-রেজিস্ট্রার	৩	সি	(১০৪০-১৯২০)
	অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-রেজিস্ট্রার	২	সি	(১০৪০-১৯২০)
	টাইপিস্ট	১	সি	(১০৪০-১৯২০)
	সরকার	২	সি	(৯২০-১৬১৭)
	রেকর্ড রক্ষক	১	সি	(৯২০-১৬১৭)
	মহাফিজ-এ-জানাজা	৩	ডি	(৮৭৫-১৪৬০)

স্থান নাম	পদাধিকারী	সংখ্যা	শ্রেণি	বেতনক্রম
	হেড মালি	১	ডি	(৮৭৫-১৪৬০)
	জুনিয়ার মালি	১	ডি	(৮৩০-১৩৫৭)
	পিওন	২	ডি	(৮৩০-১৩৫৭)
	গার্ড	৬	ডি	(৮৩০-১৩৫৭)
	গ্রেডডিগার	৫	ডি	(৮৩০-১৩৫৭)
	মালি	২০	ডি	(৮৩০-১৩৫৭)
	মজদুর	২০	ডি	(৮০০-১২৬৫)
	ধাঙড়	১১	ডি	(৮০০-১২৬৫)
		মোট — ৮০		
ষোলো আনা	সাব-রেজিস্ট্রার	৩	সি	(১০৪০-১৯২০)
	জুনিয়র	১	সি	(১০৪০-১৯২০)
	মহাফিজ-এ-জানাজা	২	সি	(৯২০-১৬১৭)
	পিওন	১	ডি	(৮৩০-১৩৫৭)
	গার্ড	৩	ডি	(৮৩০-১৩৫৭)
	গ্রেডডিগার	৪	ডি	(৮৩০-১৩৫৭)
	মালি	২	ডি	(৮৩০-১৩৫৭)
	ধাঙড়	১	ডি	(৮০০-১২৬৫)
		মোট — ১৭		

কলকাতা পুরসভাকে তার পরিচালনাধীন কবরস্থানগুলির কর্মচারীদেব বেতন ও ভাতা বাবদ বছরে ৭০,০০০,০০ টাকা খরচ করতে হয়।

পরিশিষ্ট : ৭

আঞ্জুমান নিঃস্ব কবরস্থান বেওয়ারিশ লাশ কবরস্থ হওয়ার তথ্য ·

মাস	১৯৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫
জানুয়ারি	৪৭	৪৬	৮৭	৩৬	৫৮	৯৬	৫৮	১৪০	৬৯	৫৪	৪১
ফেব্রুয়ারি	৪৫	৩১	৪০	২২	১৭	৩৮	২৪	৫৭	৬৩	২৭	৪২
মার্চ	৬৪	৩৯	৪৯	৬০	৪০	৪৪	১২	১০	৪৯	১৬	৩৩
এপ্রিল	১২	৪৩	৪৩	৫৫	৩৪	৪৫	৮০	৭০	১১	৩১	২৮
মে	৪০	৫০	৫৫	৪৪	৬৪	৫২	১৬	২২	৪০	১২	৪১
জুন	৪৮	৪৭	৬৩	৪৪	২৯	৩৫	৩৮	২২	৩১	২৫	১১
জুলাই	৯০	৫০	৩৫	৪৬	৪৬	৫৫	৪৪	—	—	—	—
আগস্ট	৫৪	৬৭	৬৯	৬৯	৬৬	৬০	৩৫	—	—	—	—

সেপ্টেম্বর	৩১	২৩	৩৭	৫০	৪৫	৭৪	৯৩	—	—	—	—
অক্টোবর	৬৩	৮৮	১০৩	৭২	৯১	১৩০	৭০	—	—	—	—
নভেম্বর	৭২	৬২	৬৫	৫০	৫৫	৫৭	৪৯	—	—	—	—
ডিসেম্বর	৬০	৪০	৯৮	৪৮	৪৬	৫৮	৬৪	—	—	—	—
মোট	৬২৬	৫৮৭	৭৫৪	৫৯৬	৫৯১	৭৪৪	[illegible]	৩৩১	২৬৩	১৬৫	১৯৬
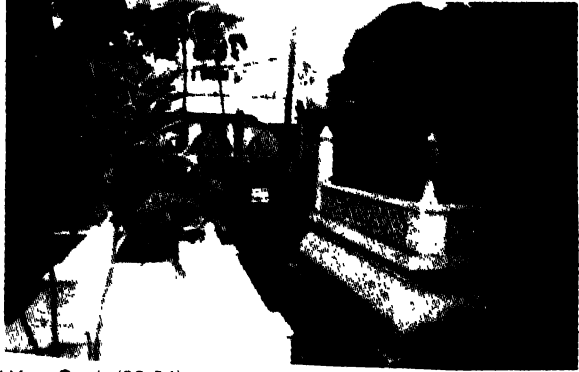
তথ্যসূত্র :

১. *Calcutta Municipal Year Book (93-94)*
২. রাধারমণ মিত্র 'কলকাতা দর্পণ'
৩. অতুলকৃষ্ণ রায় 'কলকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'
৪. শ্রীপান্থের কলকাতা
৫. থঙ্কপ্পন নায়ার *'Calcutta in the 19th century'*
৬. বিষয় কলকাতা . জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি প্রকাশিত . মহুয়া ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ
৭ ড. অমলেন্দু দে, গুরুনানক অধ্যাপক—যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয়
৮) শ্রীপান্থের 'মেটিয়াবুরুজের নবাব'

এই নিবন্ধে ব্যবহৃত সমস্ত তথ্য উল্লিখিত সমস্ত কবরস্থান ব্যক্তিগতভাবে নিবন্ধকার নিজে ঘুরে অন্তর্তদন্তমূলক একটি প্রতিবেদন পেশ করেছেন। কলকাতা পুরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মী, মুসলিম বারিয়াল বোর্ডের কর্মীবৃন্দ, বাগমারি কবরস্থানের কর্মচারী সহ প্রায় সমস্ত কবরস্থান থেকেই কর্মীদের অকুণ্ঠ সাহায্য পাওয়া গিয়েছে।

□ সৌজন্যে ঃ প্রতিক্ষণ। শারদীয় ১৪০৪
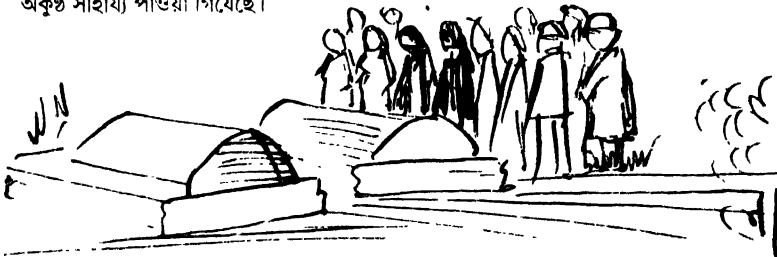
কবরখানা হলো পার্ক

আবুল কাশেম রহীম উদ্দিন

উডবার্ণ পার্ক কিন্তু পার্ক ছিল না এককালে। পার্শ্ববর্তী রাস্তা এবং তৎসংলগ্ন সুশোভন বসতিও ছিল অনুপস্থিত। আজ যা উডবার্ণ পার্ক রোড, তার একদিন ছিল প্রশস্ত নর্দমা বা খাল এবং তার আশপাশ ঘিরে ছিল বস্তিবাড়ির জটিল বিন্যাস। তাছাড়া বর্তমানে যার রূপান্তর ঘটেছে মনোহারী পার্কে, এককালে তা'ও ছিল মুসলিম সমাজের বিস্তৃত সমাধিক্ষেত্র। তৎকালীন মুসলিম সমাজপতি এবং ভূস্বামীদের বাঁধানো সমাধি ছিল এখানে। তারপর এখানেই সমাধিলাভ ঘটে ভারতের এক বিদ্রোহী সন্তানের, নাম তাঁর য়য়াজির আলি। তিনি ছিলেন অযোধ্যার শেষ নবাব। মহীশূরপতি হায়দার আলির যোগ্য বংশধর ছিলেন ওয়াজির আলি। তাই তাঁর রক্তে ছিল বিদ্রোহের অভিজ্ঞান। তিনি যখন অযোধ্যায় বসবাস করতেন, তখন ইংরেজ শক্তির অখণ্ড প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত সমস্ত ভারতে। অথচ তা সত্ত্বেও নবাবের সপক্ষে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ইংরেজ-শক্তির সঙ্গে। একাই অমিত-বিক্রমে ইংরেজ-বাহিনীকে তিনি প্রায় বিতাড়িত করেছিলেন অযোধ্যার ভূমি থেকে। কিন্তু শক্তি তাঁর পরিমিত। সুতরাং মাস-কয়েক পরে নতুন প্রস্তুতির মাধ্যমে ইংরেজের বিশাল বাহিনী অযোধ্যায় যে অবরোধ গ'ড়ে তোলে, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নির্মূল হলো ওয়াজির আলির সমস্ত মুষ্টিমেয় দলবল। ফলে তিনি বন্দী হন এবং সঙ্গে সঙ্গে অপহৃত হয় তাঁর চিরকালের স্বাধীনতা। তারপর অবশ্য দু' লক্ষ টাকার ভাতার ব্যবস্থা ক'রে ইংরেজ করকার তাঁকে মুক্তি দেন; অর্থাৎ মুক্তির নামান্তরে তাঁকে নজরবন্দী করে রাখেন বারাণসীতে। তখন লর্ড কর্ণওয়ালিশ গভর্ণর জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত। তিনি ওয়াজির আলির কাছে নির্দেশ পাঠান, বারাণসীর রেসিডেন্টের দপ্তরে তাঁর প্রাত্যহিক রিপোর্ট পেশ করার জন্য। অতএব এই উল্লেখিত রিপোর্ট পেশ করার অছিলাতেই একদিন জন-কয়েক অস্ত্রধারী অনুচর সহ ওয়াজির আলি রেসিডেন্টের সাক্ষাতে আসেন এবং রেসিডেন্টকে হাতের কাছে পেয়েই তিনি অস্ত্রধারীদের সহায়তায় তাঁকে এবং আর দু'জন উচ্চপদস্থ ইংরেজ-রাজকর্মকচারীকে সেখানেই হত্যা করেন। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে একই উদ্দেশ্যে তৎকালীন বিচারপতি লর্ড ডেভিসের বাসভবনেও তিনি হানা দেন। কিন্তু সেখানে বিশেষ কোনো সুবিধে করতে না পেরে তিনি অনুচরদের নিয়ে বারাণসী থেকে বেরয়ারে পালিয়ে আসেন। অবশ্য বেশিদিন তাঁর পক্ষে আত্মগোপন ক'রে থাকা সম্ভব হলো না। ইংরেজ সৈন্যবাহিনী কৌশলে তাঁকে বন্দী ক'রে বেরার থেকে নিয়ে আসে কলকাতায়। তারপর কলকাতারই ফোর্ট উইলিয়ামে তাঁকে আটক ক'রে রাখা হয় ইহজীবনের মতো।

তারপর থেকে ফোর্ট উইলিয়ামের কারাগারেই কাটতে থাকে তাঁর নির্যাতিত দিনগুলি। দেখতে দেখতে জরাজীর্ণ হয়ে উঠলো তাঁর বলিষ্ঠ দেহ; হতাশায় পাণ্ডুর চোখের দৃষ্টিও হয়ে এলো ক্ষীণ। তারপর একদিন, অর্থাৎ দীর্ঘ সতেরো বছর কারাবাসের পর সেখানেই তাঁর বিদ্রোহী আত্মা নশ্বর দেহে পরিত্যাগ ক'রে পরপারের চিরযাত্রায় সমর্পিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর, দেশবাসী তাঁর শবদেহ কারাগার থেকে বয়ে এনে বিশেষ মর্যাদা সহকারে সমাধিস্থ করে বর্তমান উডবার্ণ পার্কেব তৎকালীন সমাধিক্ষেত্রে। সমাধি তাঁর বাঁধান হয় মর্মর পাথরে এবং পাথরেই উৎকীর্ণ থাকে তাঁর নাম, পরিচয় এবং ফার্সী ভাষায় লিখিত চারছত্রেব একটি কবিতা।

হায়দর আলি বা টিপুসুলতানের এই তেজস্বী বংশধরের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে অযোধ্যার জন-সমাজে হঠাৎ যে-বিদ্রোহের আগুন জ্ব'লে ওঠে, তার জের নাকি ছিল অনেক বছর। শোনা যায় ঃ ১৮৬৩ খ্রীঃ এর পরে উডবার্ণ সাহেব যখন অযোধ্যার প্রথম রেভিনিউ ও চীফ সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত ছিলেন, ভূতপূর্ব ওয়াজির আলিকে স্মরণ ক'রে তখনো একবার বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটেছিল সেখানে। এই বিদ্রোহ সেদিন উডবার্ণ সাহেবই দমন করেন কঠোর হস্তে। তারপর অযোধ্যার বুকে ওয়াজির আলির যে সমস্ত স্মৃতি সম্ভার তখনো বিদ্যমান ছিল, তা'ও তিনি ধ্বংস করেন।

১৮৯২ খ্রীঃ থেকে ১৯৮৭ খ্রীঃ-এর মধ্যেই উডবার্ণ সাহেব সি এস আই এবং কে সি এস আই উপাধিতে ভূষিত হন এবং কলকাতায় এসে লেফট্ন্যান্ট গভর্নরেব পদলাভ করেন। এ-পদে অভিষিক্ত হয়েই তিনি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টেব প্রবর্তন ক'রে শহর-কলকাতার সংস্কার সাধনে ব্রতী হন। তারপর তাঁরই প্রচেষ্টার ফলে, দিনে দিনে দিনে গ'ড়ে ওঠে মনোহারী পার্ক, অভিনব রাজপথ এবং প্রতিষ্ঠা পায় কিছু উদ্যান শোভিত সরোবর। পল্লীতে পল্লীতে দূরীভূত হর মহামারী, অপসারিত হয় অলি-গলির দীর্ঘদিনের জঞ্জাল এবং দেখতে দেখতে এভাবেই এক পরিমার্জিত রুচি নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় তৎকালীন শহর-কলকাতার পরিমিত অঞ্চল।

একদিন উডবার্ণ সাহেব অশ্বপৃষ্ঠে শহর-পরিক্রমায় বেবিয়ে বর্তমান উডবার্ণ পার্কের তৎকালীন সমাধি ক্ষেত্রেব পাশে এসে দাঁড়ান এবং দূর থেকেই তাঁর দৃষ্টিগোচরে আসে ওয়াজির আলির কবর। লোকে বলে : তিনি যে কারণে অযোধ্যায় ওয়াজির আলির সমুদয় স্মৃতির বিলোপ ঘটিয়েছিলেন, ঠিক সেই একই কারণে তিনি এই কলকাতার কবরটিও ধ্বংস করবেন ব'লে সংকল্প গ্রহণ করেন। কিন্তু কবরখানার কোনো একটি বিশেষ কবর ধ্বংস করার অধিকার পাওয়া অসম্ভব। তাই তিনি কলকাতা উন্নয়ণের নামে সমগ্র কবরখানারই রূপান্তর ঘটাতে চাইলেন পার্কে। কিন্তু মুসলিম সমাজের বিরোধিতায় সংকল্প তাঁর ফলবর্তী হলো না। তারপব সম্ভবত জনমতের চাপেই উক্ত কবরখানার দখল পাবাব বাসনা তিনি ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

কিন্তু ১৯০২ খ্রীঃ এব আগষ্ট মাসে উডবার্ণ সাহেবের আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে, তাঁর অনুরাগিবৃন্দ উক্ত কবরখানা দখলে আনার চেষ্টা করতে লাগলেন আবার। তাঁদের অব্যাহত প্রচেষ্টার

ফলেই ১৯০৫ খ্রীঃএ প্রথমত কবরখানার পার্শ্ববর্তী প্রশস্ত নর্দমা ভরাট হয়ে ওঠে এবং তা অচিরেই রূপন্তর লাভ কবে একটি সুশোভিত রাস্তায়। তারপর রাস্তার নামকরণ হয় উডবার্ণ রোড। এবার রাস্তাব পাশে একটি পার্কেরও প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় তাঁরা এবার আইন বলেই অধিকার করেন সমগ্র কবরখানা। ১৯১৫ খ্রীঃ উক্ত কবরখানা পর্যবসিত হলো পার্কে। তাই চিরকালের মতোই তলিয়ে গেল অজস্র কবর, হারিয়ে গেল বিদ্রোহী ওয়াজির আলির কলকাতার সর্বশেষ স্মৃতি। রাস্তা এবং পার্কের রমণীয় রূপায়ণে মরেও বেঁচে রইলেন কেবল উডবার্ণ সাহেব। বর্তমান স্বাধীন রাষ্ট্রেও তাঁর উজ্জ্বল স্মৃতি পরিবর্তনের সীমান্ত থেকে অবস্থান করছে অনেক দূরে।

এ্যান্টনী ফিরিঙ্গী ও কলকাতার শ্মশান

জব চার্নকের বিয়ের ইতিহাস বর্তমান বাংলাদেশেও সুবিদিত; কিন্তু এ্যান্টনী ফিরিঙ্গীর বিয়ের সেই বিস্ময়কব কাহিনিটি হয়তো অবিদিতই রয়ে গেছে এ-যুগের অনেকের কাছে। কাহিনিটি সত্যিই বিস্ময়কব এবং সংবেদশীলও বটে।

জলদস্যুর জাহাজ থেকেই হোক অথবা বাণিজ্যের কোনো বজরা থেকেই হোক, কালীঘাটের নিকটবর্তী ভাগীরথীর কুলে এ্যান্টনী যেদিন প্রথম নেমে আসেন,, সেদিনই তাঁর নজরে পড়ে কোনো এক ভয়ঙ্কর শ্মশান। ওই শ্মশানে সেদিন সতীদাহের এক সাড়ম্বর আয়োজন চলছিল। তাই কৌতুহলবশতই শ্মশানের পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালেন বিদেশী এ্যান্টনী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন কিভাবে এক জীবন্ত রমণীকে হাত পা বেঁধে নিক্ষেপ করা হলো জ্বলন্ত চিতায়—যেখানে তার মৃত স্বামী আগে থেকেই জ্বলছিল। রমণীর অন্তিম আর্তনাদে ত্রিদিব বুঝি মর্ত্যে আছড়ে পড়লো, চিতার ক্ষমাহীন অগ্নিশিখাও বুঝি বার বার কেঁপে উঠলো। কিন্তু বিন্দুমাত্রও বিচলিত হলো না তারা—যাবা তাকে বিসর্জন দিল চিতায়। . . . অবাক হলেন এ্যান্টিনী, শিউরেও উঠলেন হয়তো বা। হয়তো ভাবলেন : এ কাজ মানুষের নয়, পশুরও নয়, পিশাচের। কিন্তু পিশাচ কি পৃথিবীর অধিবাসী?

সেদিন থেকে কেবল শ্মশানে শ্মশানেই শুরু হলো তাঁর নিঃশব্দ পদসঞ্চার। দিনের পর দিন কেটে গেল। নিজের কথা ভুলে গেলেন এ্যান্টনী। অনুরূপ দৃশ্য আবার দেখলেন এবং আর দেখার মর্মান্তিক কৌতূহল নিয়ে কেবল শ্মশান পরিক্রমাকেই কর্তব্য ব'লে মেনে নিলেন তিনি।

একদিন এভাবেই ঘুরতে ঘুরতে কোনো এক শ্মশানে এসে, নতুন একটি দৃশ্যের সাক্ষাৎ পেলেন এ্যান্টনী। এক পরিত্যক্ত নিভন্ত চিতার পাশে মাটিতে লুটিয়ে অবিরাম কেঁদে চলেছে পূর্ণযৌবনা এক রমণী। রমণীর পরণে সাদা থান। তার আঁচল হাওয়ার মুখে চঞ্চল, এলাকেশ ধূলোয় শায়িত, দীঘল চোখে ললিত অশ্রু এবং দেহ-লতার বর্ণদীপ্তি চিতায় চাইয়ে প্রতিফলিত। কে এই রমণী? . . .

সেকালে অসৎ-বৃত্তিধারী দালালরাও বিচরণ করতো শ্মশানে-শ্মশানে। যে সমস্ত নারী সহমরণের উদ্দেশে চিতার পাশে দাড়িয়েও শেষ পর্যন্ত সহমরণে রাজী হতো না, অথচ বহিস্কৃতা হতো সমাজ থেকে, চিরদিনের মতো রুদ্ধ হতো ঘরে ফেরার পথ, তাদেরই শ্মশান

থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ঘৃণ্য পেশা গ্রহণে বাধ্য করাতো দালালরা। এ-ধরণের দু'একজন দালাল সেদিনও সেই শ্মশানে ছিল। তাদেরই একজনের কাছ থেকে আকারে ইঙ্গিতে খবর পেলেন এ্যান্টনী : এই রমণীর স্বামী লোকান্তরিত হয়েছে পক্ষকাল আগে। স্বামীর সঙ্গে সহমরণে রাজী হয় নি বলে সমাজ থেকে সে নির্বাসিতা, ঘরেও তার ঠাঁই নেই। তাই সে রাত্রিযাপন করে শ্মশানবাসিনী কোনো এক ভৈরবীর সঙ্গে এবং দিনের আলো ফুটলেই ফিরে আসে চিতার পাশে। তারপর এভাবেই সে কাঁদে। হয়তো স্বামীকে সে ভালোবাসতো। তাই দালালরা তার কাছে ভিড়তে পারে নি।

এই নতুন অভিজ্ঞতা অপরিসীম উদ্বেলতার প্রকাশ ঘটালো এ্যান্টনীর অন্তরে। একদিন, দু'দিন, তিনদিন, পর পর কয়েকদিন একই ভাবে সেই রমণীর সাক্ষাৎ পেলেন তিনি। ভাগীরথীর বুকে জাহাজে ভাসতে ভাসতে কোনো দূর তটের সর্ষে ক্ষেতে প্রভাতের প্রথম রশ্মির যে-প্রতিফলন দেখেছিলেন এ্যান্টনী, তারই পূর্ণ বিকাশ আজ যেন লক্ষ্য করলেন রমণীর দেহের বর্ণে; রাত্রির অবকাশে ভাগীরথীর নির্জন প্রান্তে জাহাজ থামিয়ে, দূরের পাহাড়ী অরণ্যের চূড়ায় অন্ধকারের যে হিল্লোলিত বিস্তার তিনি অনুভব করেছিলেন, আজ দিনের আলোয় তারই অপরূপ আবিষ্কার ঘটলো রমণীর কেশে; এবং জাহাজে ভাসতে ভাসতেই বাংলার দিগন্তে আষাঢ়ের কোনো বর্ষণহীন মেঘের যে বিহ্বল ক্লান্তি তাঁকে উচাটন করেছিল, আজ যেন তারই গভীর প্রতিভাস ধরা পড়েছে রমণীর চোখে। তাই আজ সমস্ত অন্তর দুলে উঠলো এ্যান্টনীর, তিনি ভালোবেশে ফেলেন সেই রমণীকে।

কিন্তু তিনি তো রমণীর দেশের ভাষা জানেন না। তাঁর প্রেমের বার্তা তবে কিসের মাধ্যমে রমণীর অন্তর্লোকে গিয়ে পৌছুবে? . . . প্রেমের শক্তি বিচিত্র। সে ডিঙিয়ে এলো ভাষার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকার। উল্লিখিত দালালদের মাধ্যমেই উভয়ের মধ্যে আদান-প্রদান চললো মনের, অনুরাগের, ভালোবাসার। পরস্পরকে চিনতে অসুবিধা হলো না, বুঝতে সময় লাগলো না। একদিন নীরব স্বীকৃতিতে এ্যান্টনীর পাশে এসে দাঁড়ালো সেই রমণী। এ্যান্টনী তার হাত ধ'রে এবার শ্মশান থেকে সরে এলেন দূরে, আরও দূরে—যেখানে গানের ভবিষ্যৎ মৃত্যুর আতঙ্কে দিশেহারা নয়।

এই রমণীই জীবনের চিরসঙ্গিনী হলো এ্যান্টনীর। তাকে নিয়ে পরে তিনি ঘর বেঁধেছিলেন বৈঠকখানায় এবং এখানেই ছিলেন আজীবন। তাঁর পত্নী সেকালের মান-অনুযায়ী শিক্ষিতাই ছিল। সুতরাং তার কাছেই তিনি বাংলা ভাষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন এবং তার মুখ থেকেই রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ-কাহিনী শুনে বিশেষভাবেই আকৃষ্ট হন বাংলা সাহিত্যের প্রতি। পরে বাংলার বিভিন্ন পণ্ডিতদের সাহচর্য লাভ ক'রে বছর কয়েকের মধ্যেই তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন বাংলা ভাষায় এবং সাহিত্যেও তাঁর দখল জন্মে। কবিমন তাঁর আগে থেকেই ছিল। কেবল ছিল না ভাষা। এবার ভাষার বাহন পেয়ে তাঁর কবিমনের প্রকাশ ঘটলো বিচিত্র ছন্দে। তৎকালীন বাংলার অদ্বিতীয় কবিয়ালরূপে সহজেই প্রতিষ্ঠা পেলেন এ্যান্টনী ফিরিঙ্গী।

❑ আবুল কাশেম রহীম উদ্দিন রচিত 'হে নগর, হে মহানগর' গ্রন্থ থেকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত।

শ্মশান সমীক্ষা : মেখলিগঞ্জ

রঞ্জনা রায় বাসুনিয়া

মেখলিগঞ্জ প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার একটি মহকুমা। তিস্তা, জলঢাকা, ধরলা, সুটুঙ্গা, সতী ও সানিয়াজান এই মহকুমার উপর দিয়ে প্রবাহিত। তিস্তা নদী মেখলিগঞ্জ মহকুমার ভৌগলিক অবস্থানকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে। তিস্তা নদী এই মহকুমার ১৫৩.৮০ বর্গ কি.মি. মূল ভূখণ্ড থেকে পৃথক করে দিয়েছে। তিস্তার পশ্চিম পাড়ে এই ভূখণ্ডটি হলদিবাড়ী নামে পরিচিত। মেখলিগঞ্জ মহকুমার পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্ত প্রায় সমস্তটাই বাংলাদেশের সীমান্ত এবং উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে জলপাইগুড়ি জেলা। 'তিন বিঘা' নামক আন্তর্জাতিক করিডর এই মহকুমার অন্তর্গত। যা 'দহগ্রাম' (বাংলাদেশে) ছিটমহলের সঙ্গে বাংলাদেশের মূলভূখণ্ডের যোগসূত্র স্থাপন করে চলেছে।

এই মহকুমার প্রায় ৩ লক্ষ লোকের বসবাস। মেখলিগঞ্জের অক্ষাংশ ২৬°২১´২৭´´ উত্তর এবং ৮৮° ৫৬´ ৪২´´ পূর্বে অবস্থিত। অতীতে মেখলিগঞ্জ রহিমগঞ্জ বিভাগের অন্তর্গত ছিল। জলবায়ু, আবহাওয়া জেলা শহর কোচবিহারের থেকে পৃথক নয়। বর্ষাকালে পূর্ব বায়ু প্রবাহিত হয়। পশ্চিমের বায়ু বসন্তের সুচনা করে। মূলতঃ শীত ও গ্রীষ্ম ঋতু। বৃষ্টিপাত মাঝারি। মাটি বালি মিশ্রিত পলিমাটি।

মেখলিগঞ্জ মহকুমার বৃহত্তর লোকসমাজ রাজবংশী। অন্যান্য অধিবাসী ছাড়াও সাঁওতাল, ওঁরাও প্রভৃতি আদিবাসীদের বসবাসও লক্ষ করা যায়। সংখ্যায় নিরিখে মঙ্গোলীয় নৃ-গোষ্ঠীর প্রবাহের অর্ন্তগত রাজবংশীদের প্রাধান্য লক্ষনীয়। অতীতে এই মহকুমাটি কোচবিহার রাজন্যবর্গের অধীনে ছিল। স্থানটি 'মেখলী' শিল্পের জন্য বিশেষ পরিচিত লাভ করেছিল যা অসমের জাতীয় বস্ত্র হিসেবে চিহ্নিত। স্থানটির নামকরণ-এর উৎস এই মেখলী শিল্প। 'মেখলী' তৈরী হয় ও বিক্রি হয় যে গঞ্জে তাই-ই 'মেখলিগঞ্জ'। যে কারণে স্থানটির নামকরণ সেই শিল্পটি আজ লুপ্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না। এতক্ষণে মেখলিগঞ্জের একটি প্রাথমিক ধারণা পাওয়া গেল। এখন এই মহকুমার শ্মশান সম্পর্কীত একটি সমীক্ষার ফলাফল সংক্ষেপে অবতারণা করতে চাই।

সমীক্ষায় মূলতঃ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর রাজবংশী সম্প্রদায়ের শ্মশান স্থানের বা শ্মশান চারনার বা মৃত্যুকালীন ক্রিয়াচারের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। রাজবংশীদের মধ্যে শবদেহ কবরস্থ ও দাহ করার রীতিই প্রচলিত। অন্যান্য হিন্দুরা মৃতদেহ দাহ করে থাকেন। পাশাপাশি মুসলমান সমাজে শবদেহ কবরস্থ করা হয়।

সাধারণতঃ শ্মশান স্থান বা শ্মশানঘাট নির্দিষ্ট করা হয় জলাশয়ের ধারে ফাঁকা স্থানে। শ্মশান নামের সঙ্গে 'ঘাট' শব্দটির বিন্যাস মেখলিগঞ্জে প্রায় স্থানেই বিদ্যমান। নিম্নে কয়েকটি 'ঘাট নামের' উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন —

	স্থানের নাম	ঘাট নাম	নদী
১)	সতী পুরীর ঘাট, উত্তর হলদিবাড়ী	সতী পুরীর ঘাট	সতী-তিস্তা উৎস, সতী দাহ হয়েছিল।
২)	ধাই ধাই ঘাট বোটবাড়ী অঞ্চল মেখলিগঞ্জ	ধাই ধাই ঘাট	সানিয়াজান
৩)	সতীর পাড়, কুচলিবাড়ী, মেখলিগঞ্জ	সতীর ঘাটের পাড় শ্মশানবাড়ী	সতীনদী
৪)	আমতল্লির ঘাট, কুচলিবাড়ী	আমতল্লির শ্মশান ঘাট	সতীনদী
৫)	মেহেরীর, ১০২ ফুলকাডাবরী	মেহেরীর শ্মশান ঘাট	জলঢাকা
৬)	১২৩ সন্দরান, ঘড়ঘড়িয়া	টুক টুক কুড়ার শ্মশানঘাট	জলঢাকা
৭)	৯৬ ফুলডাবরী	গোকপহুরা শ্মশান ঘাট	ব্যক্তিগত/পারিবাবিক শ্মশান ঘাট
৮)	২২৭ভোটবাড়ী	ডাংগীরি বাড়ীর শ্মশান ঘাট	ঐ
৯)	১০১ ফুলকাডাবরী	আশ্রমের শ্মশানঘাট	ঐ
১০)	শিলঘাট, উছলপুকুরী	শিল শ্মশান ঘাট	হলমুয়া নদী
১১)	উত্তরাস্রোত শ্মশান, নিজতরফ, মেখলিগঞ্জ	উত্তরস্রোত শ্মশান ঘাট	
১২)	হেমকুমারী শ্মশান, রানীরঘাট	সীতাচণ্ডী শ্মশান ঘাট	নদী মুটুঙ্গা

এতদঅঞ্চলের শ্মশানের বা শ্মশান ঘাটের দেবতা সাধারণতঃ শ্মশানকালী। কোন কোন স্থান শ্মশান ঘাটের দেবতা মাশান রূপে চিহ্নিত। মাশান ভয়ংকর লোকদেবতা। রুষ্ট হলে লোকের উপর ভর করে। ১৮ প্রকার মাশান পূজিত হয় রাজবংশী সমাজে। এছাড়াও শ্মশান সম্পর্কীয় নানা দ্যাও পেত্তানীর কাহিনি, গল্প আজও লোক সমাজে প্রচলিত আছে।

মেখলিগঞ্জে নানা স্থান থেকে লোক মুখে প্রচলিত ভয়ে বুক কাঁপানো দ্যাও, ভুত, পেত্তানী ধরার গল্প কাহিনির কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

দ্যাও ধরা গল্প — ১

মানসি খাওয়া কুড়া

প্রথমে জানা দরকার 'কুড়া'-র অর্থ কি?

কুড়া অর্থ নদী সৃষ্ট গভীর জলাশয়। 'মানসী খাওয়া' একটি কুড়ার নাম। এটির সৃষ্টির উৎস সতী নদী। সতী নদী ভারত ও বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত। কুচলিবাড়ী অঞ্চলে

ধারপাহাটের থেকে প্রায় ২ কি.মি. পূর্বে মান্‌সি খাওয়া কুড়া। এই কুড়ার গভীর জলে একজনে মানুষ রহস্যময় মৃত্যুর কারণে এটির নাম হয়ে 'মান্‌সি খাওয়া কুড়া'। মান্‌সি অর্থ মানুষ।

অতীতে এই কুড়ায় গভীর জল ছিল। গভীরতার জন্য ঠান্ডা ও ঘন কালো রঙের জলে একা একা কেউই নামতে সাহস করতো না। লোকশ্রুতি, কুড়ার জলে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে নানা জনের নানা রকম আধিভৌতিক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কুড়ার জলে স্নান করতে নামলে জলের নীচে মাশানের পা-টেনে ধরা, কুড়ার জলের ধারে রাতে আলো দেখা, ভোর রাতে মাছ ধরতে ডেকে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা প্রায়শই হতো বলে স্থানীয় লোকের মুখে শোনা যেত। শোনা যায়, একদা গ্রামেরই এক বাসিন্দা জমিতে হাল চাষের পর গরুর গা ধোয়ানোর জন্য এই কুড়ায় নামে। গোরুকে ধোয়ানোর পর গোরুর লেজ ধরে মাঝ কুড়ার গভীর জলে গেলে হঠাৎই কুড়ার মাশান তার পা টেনে কুড়ার জলে ডুবিয়ে দেয়। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা অনেকে চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারেনি। তাদের বিশ্বাস কুড়ার মাশান / দ্যাওকে মান্যতা করে জলে নামেনি বলে তাকে জলে ডুবিয়ে মেরেছে বা খেয়েছে। তখন থেকেই এই কুড়ার নাম হয় মান্‌সি খাওয়া কুড়া। বর্তমানে কুড়াটিতে সারাবছর জল থাকলেও আগের মতো গভীরতা নেই। একসময় এই কুড়ায় মাছ ধরার জন্য 'বাহো' দেওয়া হতো। 'বাহো' অর্থ সম্মিলিত ভাবে মাছ ধরা।

দ্যাও ধরা গল্প — ২

জানের মাছ ও দ্যাও ঃ

ধাপরা হাটের ললিত রায় ও দশরথ রায়ের মাছ ধবার নেশা প্রায় সকলের জানা। রাত বেরেতে মাছ ধরা ও নানা ঘটনার সম্মুখীন হওয়াব কথা ধাপরাহাটের সকলেরেই জানা। ভাদ্রমাসের অমাবস্যার বৃষ্টির রাতে ডাঙ্গার পাড় শ্মশান ঘাটে দুজনে জানের মাছ সংগ্রহ করছিল। রাত তখন গভীর। হঠাৎ দেখে জানের দু-মোকা বরাবর একটি ঘন কালো বিরাট ছায়ামূর্তি দুই-মেকায় দুটি পা রেখে, ভয়ংকর রূপ ধারণ করে সোজা দাঁড়িয়ে। এই ভয়ংকর রূপ দেখে অত্যন্ত সাহসী ললিত ও দশরথ ভয়ে ঠক্‌ঠক করে কাঁপতে থাকে। উপায়ন্তর না দেখে ভয়ে ভয়ে হরিনাম সংকীর্তন করতে থাকে। এরপর কালো মূর্তিটি ধীরে ধীরে মিলে যায়। পরে তারা জানে মাছ ধবা ত্যাগ করে বাড়ীর দিকে রওনা হয়। মূর্তিটি যে শ্মশানের মাশান / দ্যাও সে বিষয়ে সন্দেহ নেই বলে মনে করে। তাদের হাতে লোহার বেকি (পাট কাটার জন্য ব্যবহৃত) ছিল বলে সে যাত্রায় বেঁচে যায়। শরীরে বা সঙ্গে লোহা থাকলে দ্যাও, ভূত আক্রমণ করে না বলে লোকবিশ্বাস।

দ্যাও ধরা গল্প — ৩

বিমলের বাড়ী ১১২ কুচলিবাড়ীতে। কৃষিজীবি। তামাক চাষের মরশুম। চৈত্র-বৈশাখ মাস। তামাক খেতে জল দিতে বিমল পড়ন্ত বিকেলে চুয়ার (কুয়া) টারা গাড়তে থাকে। এমন সময় বিমলের পাশের বাড়ীর ছেলে দুলালের রূপ ধরে এক দ্যাও এসে বিমলকে ডেকে বলে — "দুলাল চল্ হাড়ি ভিটা যাই।' উল্লেখ্য, যে হাড়ি ভিটা যেতে গেলে শ্মশানের পাশ দিয়ে নদী পেরিয়ে যেতে হয়।

এই কথা শুনে দুলাল প্রথমে গররাজী হলেও প্রতিবেশীর অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে টারা গর্ত খোঁড়া বাদ দিয়ে হাতে খাপলা নিয়েই দুলালরূপী দ্যাও-এর সঙ্গে হাড়ি ভিটার দিকে রওনা দেয়। কিছুদূর যাওয়ার পর যখন ট্যাংনামারীর দহলায় নামে তখন বিমলের শরীর ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে থাকে এবং অনেকটা দিশাহারা হয়ে যায়। তবু সে তার সঙ্গে চলতে থাকে। চলতে চলতে বিমল নদীর পাড়ে গিয়ে উপস্থিত হয়। ঠিক নদীর ধারেই একটি শ্যাওড়া গাছ। পাশে শ্মশানঘাট। সেখান দিয়েই লোকেরা ঘাট পাবাপার করে। শ্যাওড়া গাছের কাছে যেতেই বিমল দেখতে পায় নদীর ধারে দু'জন মানুষের মতো কালো মূর্তি। তা দেখে বিমল দ্যাও রূপী দুলালকে জিজ্ঞেস করে — "ওবা কারা? ওখানে তো কিছু ছিল না। ভয়ে আরো জড়োসড়ো হয়ে যায়। দ্যাও উত্তরে বলে —"না ও কিছু না'। এই বলে দ্যাও জলের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে থাকে এবং বিমলকে নদী পার হতে বলে। দুলালের (দ্যাও) নদী পার হওয়া দেখে অবাক হয়ে যায়। মনে মনে ভাবে কি ব্যাপার। দুপুর বেলা গরুকে স্নান করানোর সময় সেখানে গভীর জল (এক বুক) ছিল আর এখন হাঁটুর নীচে জল। এ কি কাণ্ড! দ্যাও (দুলাল) যতই তাকে জলে নামতে বলে ততই তার হাত পা অবশ হতে থাকে। এমন সময় ওব হুঁশ হয়। হাতের খাপলা আরও শক্ত করে ধরে ও প্রাণপণে চিৎকার করতে থাকে। বিমলের চিৎকাব শুনে প্রকৃত দুলাল ছুটে আসে অন্যান্যদের সঙ্গে। ততক্ষণে বিমল সংজ্ঞা হারায়। দুলালদেব আর ততক্ষণ বুঝতে অসুবিধা হয় নি, তার কেন এই অবস্থা। আর ভাগ্যিস তার হাতে লোহার খাপলা ছিল। নইলে রাক্ষুসী দ্যাও তাকে নদীতে পুঁতে দিত। দ্যাও/পেতনী যে লোহাকে হয় পায় তা সকলেই জানে। বিমল সুস্থ হয়ে ঘটনার বিবরণ দিলে সকলহে হতবাক (ঘটনাটি ঘটে প্রায় বছর পাঁচেক আগে)।

দ্যাও ধরা গল্প — ৪

একদিন রাত্রি বেলা রাত অনুমান ১১ - ১২টা। গৌতম রায় নামে একটি ছেলে হাতে ল্যাম্প (গোচা) নিয়ে বাইরে বার হয় পায়খানা করতে মাঠে যাবে বলে। তার ভাই শুয়ে ছিল বিছানায়। বাইরে বার হওয়ার সময় গৌতম তার ভাই উত্তমকে বলে বার হয় — 'যে দাদা মুঞিও হাগির যাচং চ্যাতোনে থাকিস' — এই বলে সেই গৌতম বাড়ির গেটের বাইরে আসে অমন সময় হঠাৎ এক ভূত গৌতমের কাকু বাবুনাথের রূপ ধারণ করে আসল বাবুনাথের বাড়ীর দিকে থেকে এসে গৌতমকে বলে কিরে তুই হাগির যাবু — গৌতম কয় হ্যাঁ হাগির যাইম। গৌতম কয় বাবুনাথকে তুইয় কি হাগির যাবু? ভূত রূপি বাবুনাথ কয় হ্যা মুইও যাইম — চল্‌ দুই ঝনে অত্যি বাঁশ বাড়ী যাই। গৌতম রাজি 'চল্‌ তা'। এদিকে ভূত কত চালাক। গৌতমের হাতোত যে ন্যাম্প ছিল হুটা হুস উয়ার আছে। ভূত গৌতমকে কয় দুইজন যাচি ন্যাম্প না নাগে। ন্যাম্পটা নিবি ফেলা। এই কথা শুনি গৌতম ন্যামটা না নিবিয়া একটা গাছের ডালোৎ তুলি থুইয়া ভূত রূপি (কাকু) বাবুনাথের সাথোত হাগির বাদে বাঁশ বাড়ী উদ্দেশ্যে চলি যায়।

যেলায় বাঁশ বাড়ীর অত্যি চলি গেইল ভূত সেলা গৌতমক কয়—'চল আর কনেক আগোত চল্ ভারতের বাড়ীও এলায় জল নেমো। যেলায় ভূত গৌতমকে আরো আগের কয়। গৌতম কয না, যাং আর এইটে হাগি। ভূত কয় চলকেনে আগে চল। চুয়ার পার চল। মানে, কিছুদুর আগে গেলে একটা তিনপুরানি বোকাতি চুয়া। ওইটে গেলে ভূতের আরাম। কারণ, জল ছাড়া ভুতের বল নাই।

গৌতম আগাবে না কিন্তু ভূতের বড় আকাটি বিকাটি। গৌতম যেহেতু কোন মতে আর আগাবে না—সেলা ভূত গৌতমকে কয় চলতায় পুবপাকে যাই। কারব পূব পাকেও একটা বোকাতি চুয়া একটি ডোবা।

এবার ভূতের জেদ সহ্য করির না পাবা গৌতম পূর্বপাকে রওনা দেয়। কিন্তু বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের ঘটনা। সেলা তো পাটা বাড়ী ছিল। গৌতম ভূত রূপি বাবুনাথের কথা মতন পূব পাঁকে রওনা দিয়া পাটা বাড়ীর মধ্যত যায় গৌতম হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যায়। এদিকে গৌতমের ভাই উত্তম খালি ভাবে। আরে, আধা ঘন্টারও বেশি হইল এখও গৌতমের পাত্তা নাই। এখনও কি হাগে, এ্যাং করি ভাবিতে ভাবিতে আর থাকতে না পেরে বাইরে বেরিয়ে দ্যাখে গাছের ডালোৎ ন্যাম জলির নাইগছে। নোকের পাত্তা নাই। ডেকা ডেকি, কোন আও বাও নাই। এই বার উয়ার বাপক ঔয়ার মাক ড্যাক। সোগাই উঠিয়া খুজাখুজি, কোন পাত্তা নাই — গৌতম গেইল কোটে। একে একে গোটায় টারিৎ মোর গেল নিন থাকি উঠিয়া সগায় চান্দাচান্দি। কোন পাত্তা নাই। এমন সময় দুইজন পাটা বাড়ীর মইধ্যৎ ঢুকিয়া চান্দের নাগিল।। পাটাবাড়ীৎ ঢুকিয়া দেখে যায় পাটার গছ হেলা পাটা হারমারাহুসে। গৌতম থাকি আছে, কোন হুস নাই। দেহাটা একেবারে ন্যাশপ্যাশ হশে।

গৌতমের হাতোত খালি একখান সাইকেলের চেন পাল্টৗছিল। আর এই বাদে বোধ হয় গৌতম বাঁচিসে। না হইলে আর বাঁচা বড় দায় ছিল। কোলাৎ করি গৌতমক বাড়ি আনিয়া জল খোয়া আস্তে আস্তে অস্থির করিয়া থাকবে খোওয়া হইলেক কিছুক্ষণ পাছোৎ উয়ার হুস ফিরিল সেলা গোটায় ঘটনা কান কইল। ক্যামন করি কেটে গেইল। গোটায় ঘটনা কান কইল। কিন্তু পাটা বাড়ী ঢুকিয়া কি করিয়া অজ্ঞান হইল সেটা কিন্তু করার পারে না — আর ভূত কি কি কইরলেক আর কোটে গেইল গৌতম কিছুই কবার পারে না। এইটে বুঝা যাচ্ছে হাতোত সাইকেলের চেন না থাকিলে বড় বিপদ হইলেক হয়। — গৌতম এলাও বাঁচি আছে। মাত্র দুই বছর আগের ঘটনা। বাড়ী ১২২ কুচলি বাড়ীৎ। বাপের নাম লালচাঁদ রায়, হামার বাড়ীর বগোলোত।

এই অঞ্চলের লোকসমাজে মৃত্যুকালীন নানা সংস্কার পালন করে থাকেন। শবদেহ শ্মশানে নেওয়া থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত নানা লোকাচারের একধরণের কীর্তন পরিবেশন করার প্রচলন দেখা যায়। মূলতঃ রাজবংশী সমাজে এই কীর্তনের প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। যারা কীর্তন পরিবেশন করেন তাঁরা রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোক। যে কীর্তন পরিবেশন করা হয় তাকে মড়াখোয়া কীর্তন বলে। আর যারা কীর্তন পরিবেশন করেন তাঁদেরকে সমাজে কীর্তনীয়া

আখ্যা দেওয়া হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শ্মশান সম্পর্কিত যে পরিবেশন করা হয় একই কীর্তনে বৈষ্ণব সংস্কৃতির ছাপ সুস্পস্টভাবে বিদ্যমান।

	নাম	ঠিকানা
১)	শ্রী সুরেশ অধিকারী-৫০	ধুলিরটারী, হেমকুমারী, কোচবিহার।
২)	শ্রী হরগোবিন্দ দেব অধিকারী - ৮০	পায়ামারী, হলদিবাড়ী।
৩)	শ্রী সনু রায় - ৯০	ঐ
৪)	শ্রী খোকা অধিকারী - ৪৫	ভোটবাড়ী, মেখলিগঞ্জ।
৫)	শ্রী মহেন্দ্র অধিকারী - ৭৯	নিজতরফ, মেখলিগঞ্জ।
৬)	শ্রী করমরু অধিকারী - ৭৯	উছলাপুকুরী, মেখলিগঞ্জ।
৭)	শ্রী যতিন রায় - ৪৮	ঐ
৮)	শ্রী নগেন রায় - ৭৫	ঐ
৯)	শ্রী চিতানন্দ অধিকারী	ঐ প্রমুখ।

মড়াখোয়া কীর্তন নানা পর্বে পরিবেশন হয়। কয়েকটি পর্বের কীর্তনে গানের কথার নমুনা নিচে উল্লেখ করা হল।

শ্মশান ঃ মড়াখোয়া কীর্তন

গান - ১ 'মৃতদেহ' বাড়ি থেকে বার করার সময় ঃ
আজ নবদ্বীপ অন্দার কইরে কোথায় যাও হে নব গোঁরা।
চিতান - কোথায় যাও হে নব গোঁরা কেথায় যাওহে নব গোঁবা শচীমাতার নয়ন তারা।
চিতান - শচী মাতার প্রাণ পুতলা, বিষ্ণু প্রিয়ার নয়নমণি।

গান - ২ 'মৃতদেহ' চিতায় তুলে আগুন ধরাবার সময় ঃ
শ্রী বাসরে প্রাণ যাবার কালে বালুর শয্যা করাওরে মোরে।
চিতান - শ্রী বাসরে লইয়ে চল গঙ্গা কুলে। শ্রী বাসরে ... করাওরে মোরে।
চিতান - তুইরে শ্রী বাঁশ গুণের ভাইয়ারে। শ্রী বাসরে ... করাওরে মোরে।

গান - ৩ প্রথম দিন পিন্ডদানের সময়ের কীর্তন ঃ
কোন্ বলে গেল রাম মোর, কোন বনে গেল।
মরণকালের বেলা, দেখা নাহি হইল।
চিতান - রাম গেল বনবাসে, সঙ্গে লইয়া সীতা।
রামের শোকে কেন্দে মইল দশরথা পিতা।
চিতান - শূন্য হইল খাট-পালঙ্ক রত্ন সিংহাসন,
রাম বিনে শূন্য হইল অযোধ্যা ভূবন।
কোন বনে গেল রাম মোর কোন বনে গেল।

গান - ৪ পিন্ড দিয়ে বাড়ি ফেরার কীর্তন ঃ
স্বরূপ রামানন্দ হে কৈ অপরূপ দেইখে আসিলাম বৃন্দাবনেতে।

চিতান - বৃন্দাবনের গাভী বৎস্য হম্বা হম্বা বইলাছে।
চিতান - কৃষকের মাথায় ময়ুরের পাখা,
বামে হেইলা পইড়াছে।

গান - ৫ পাঁচ দিনের ভৈরব পূজা ও কীর্তন ঃ
এনা বয়সে শ্যাম মোর কোথায় সজনী হে শ্যাম।
চিতান - মায়ে না কান্দেছো হাপুতী করিলে করে মুই নারী হারানু পারান।
চিতান - বামনে হোম পারে বিছিনায় বইসারে বোহিনী কাঁন্দে ছোট ভাই।

গান - ৬ দশ দিনের পিণ্ডের কীর্তন ঃ
(খাওয়া) বাড়ী ঘর মোর আন্দার করি তুই বাছারে মোর গেলু ছারী গেলু বাছা নিদারুন হয়া।
চিতান - ছুট্ফট্ করে হিয়া তোক্ বাছাক না দেখিয়া আমি প্রাণ ধরিয়াছি মিছা।
চিতান - কি তোরে কটর হিয়া - নিদয় নিঠুর হইয়া, গেলু বাছা মোর বুকে শেল দিয়া।
চিতান - ছায়াহীন বৃক্ষ যেমন - তুই বাছা মোক করালু তেমন, আর না তোর দেখিম চাঁদমুখ।

গান - ৭ পিন্ড দেওয়ার কীর্তন ঃ
আকাশে পাখা মেলি যা পাইচ্ছা তুই মোর মায়ের বাড়ী, কইও যাইয়া আমার দুঃখের কথা।
চিতান - যখন মাও মোর স্নান করে কথা নী কইস মায়ের আগে, মরিবে মাও মোর জলে ঝাঁপ দিয়া।
চিতান - যখন মাও মোর খাবার বইসে, কথা না কইস মায়ের কাছে, মরিবে মাও মোর গরল বিষ খাইয়া।
চিতান - যখন মাও মোর শয়ন করে কইও কথা মায়ের আগে - রবে মাও মোর কাঁন্দিয়া কাঁন্দিয়া।

গান - ৮ বৈতরণী কীর্তন ঃ
আজি - আজি - কালী - কালী, দিন বইয়া যায়, — এহেন সোনার দেহা ধুলোয়া লোটায় হরির নামে, নৌকা খানি শ্রীযুক্ত কান্ডারী দুই বাহু পাওরী ডাকে আইস পার করি।
হরির নামের নৌকা খানি চক্র দিকে ধায়, না জানি অভাগীর নৌকা কোন ঘাটে চাপায়।
সাগরেতে তৃণ ভাসে সেও লক্ষ্য পায়, না জানি অভাগীর নৌকা, কোন বা দিকে ধায়।

পাপের নৌকা জলে ডুবে, পুণ্যের নৌকা ভাসে, না জানি অভাগীর নৌকা কোন বা চরে ঠেকে।
সাধু জনা পার হইল প্রেমের বাতাসে, নচন দাম - ঠেকিয়া রইল আপন কর্ম দোষে।

(তথ্য - শ্রীকৃষ্ণ কান্তরায়, ৫৮, ফুলবাড়ী, কুচলিবাড়ী)

মেখলিগঞ্জ মহকুমার লোকসমাজে মৃতদেহ সৎকার করবার জন্য যে স্থান নির্দিষ্ট করা হয় সেগুলির মধ্যে অনেক শ্মশান পরিবার ভিত্তিক অর্থাৎ কোন একটি পরিবারের আত্মীয় জন মারা গেলে নির্দিষ্ট স্থানে সৎকার করা হয়। শ্মশান যে জলাশয় ও নদীর ধারে নির্ধারিত হয় তা আমাদের সকলেরই জানা। মেখলিগঞ্জে এরূপ নানা জলাশয়ের ধারে ও নদীর প্রান্তরে যে সমস্ত শ্মশান স্থান লক্ষ্য করা যায়, দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে —

১) নিজতরফের উত্তরাস্রোতের শ্মশান ঘাট, ৭৫ নিজতরফ, জমির মালিক-বাদল বর্মণ।
২) শ্মশান কালীবাড়ী, মেখলিগঞ্জ, পৌরসভা।
৩) ভোলার ঘাট, ৭৫ নিজতরফ, মেখলিগঞ্জ।
৪। তিস্তা নদীর শ্মশান ঘাট, বান্দের পার, ৪০ নিজতরফ, মেখলিগঞ্জ।
৫) চান্টারী শ্মশান। সানিয়াজান নদীর পাড়।
৬) ফুলকাডাবরী শ্মশানঘাট, সতী নদীর পাড়, কুচলিবাড়ী, মেখলিগঞ্জ।
৭) রথের ডাঙ্গা শ্মশান, সতী নদীর পাড়।
৮) রাম জীবনের কুড়ার পাড় শ্মশান, জমি রাজজীবনের, কুর্চবিহার, মেখলিগঞ্জ।
৯) বাগডোক্‌রা শ্মশান, জলাশয় - সুরেন্দ্র রায়ের, ১০৫ বাগডোক্‌রা।
১০) ডাকুরঘাটের শ্মশান ঘাট, ১০১ ফুলকাডাবরী, মেখলিগঞ্জ।
১১) দোমুখার শ্মশান —নদী ঃ বুড়িতিস্তা, পায়ামরী, হলদিবাড়ী।
১২) ডাঙ্গাপাড়া শ্মশান — কুড়া (নদী ঃ বুড়িতিস্তা), ডাঙ্গাপাড়া, দক্ষিণ শান্তিনগর, হলদিবাড়ী।
১৩) বটেরডাঙ্গা শ্মশান — জলাশয়, বক্‌সীগঞ্জ, হলদিবাড়ী।
১৪) আঙুলদেখা শ্মশান ঘাট — জলাশয়, আঙুলদেখা, বক্‌সিগঞ্জ, হলদিবাড়ী।
১৫) লোহারব্রীজ শ্মশান ঘাট — নদী, পার মেখলিগঞ্জ, হলদিবাড়ী।
১৬) চেংমারীর ডাঙ্গার শ্মশান — ডোবা / জোত ঃ খুশীকান্ত বসুনীয়া, রসরাজ বালা, বক্‌সীগঞ্জ, হলদিবাড়ী।
১৭) হাঁসপুকুরী শ্মশান, জলাশয়ের (পুকুর) - মালিক - নিন্দুচরণ রায়, হেমকুমারী, হলদিবাড়ী।
১৮) গিরীয়ার শ্মশান — গিরিয়া নদী, দেওয়ান গঞ্জ, হলদিবাড়ী।
১৯) বানিয়াপাড়া শ্মশান — নদী ঃ গিরীয়া (জোত ঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় সরকার), হেমকুমারী, হলদিবাড়ী।
২০) হাঁসপুকুরী শ্মশান — জলাশয় (জোত — নিন্দু চরণ)।

মেখলিগঞ্জ মহকুমার শ্মশান সম্পর্কীয় বিভিন্ন লোকাচার বিভিন্ন জন-সমাজ আজও পালিত হয়। রাজবংশী সমাজে যেমন মড়াখোয়া কীর্তনের প্রচলন আছে, তেমনি শ্মশানের দেবদেবীকে সমীহ করেন এতদ অঞ্চলের লোকসমাজ। তবে প্রতিনিয়ত জনসংখ্যার চাপে বা সামাজিক পরিবর্তনের সূত্র ধরে শ্মশান ঘাটের ধারণার স্থান নিচ্ছে আর্যীকরণ তথা পরিবর্তমান লোকাচার। কোথাও শ্মশানঘাট উঠে যাচ্ছে। আবার নদীর ঘাটে নূতন করে তৈরী হচ্ছে শ্মশান।

তথ্যসূত্র ঃ
The Rajbanshis of North Bengal, by Dr. Charuchandra Sanyal.
মিতালি, হলদিবাড়ী, বিশেষ সংখ্যা - ২০০১, পি ভি.এন.এন. লাইব্রেরী, হলদিবাড়ী।
বিনয় রায়, কুচলিবাড়ী, কোচবিহার।

সহায়তায় ঃ
অধ্যাপক দীপককুমার রায়, কোকরাঝাড় কলেজ, অসম।
দিলীপ বর্মা, জলপাইগুড়ি।

লেখক পরিচিতি ঃ শিক্ষিকা, মেখলিগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

মড়াখোয়া কীর্তন, ছবি : দিলীপ বর্মা

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের রাজবংশী লোকচারণা : শ্মশান ও মাশান

দিলীপ বর্মা

উত্তরবঙ্গের ভূ-সাংস্কৃতিক পরিবেশ বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। গদাধর, রায়ডাক, কালজানি, জলঢাকা, তিস্তা, করতোয়া প্রভৃতি নদী বিধৌত উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা অতীতে প্রাগজ্যোতিষপুর বা কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গভীর অরণ্য ছিল হিংস্র জন্তুজানোয়ার ও শ্বাপদ সংকুল। এরূপ দুর্গম, ভীতি বহুল অঞ্চলে বিভিন্ন ধারায় যে ভিন্ন ভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর পদচারণা ঘটেছে তাদের মধ্যে কোচ-মেচ-রাভা, হাজং, টোটো ও রাজবংশী উল্লেখযোগ্য। জনসংখ্যার হিসাবে রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যাধিক্য। নৃ-তাত্ত্বিক বিচারে কোচ-মেচ, রাভাদের মতো রাজবংশীরাও মঙ্গোলয়েড (mongoloid race) জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ড আশুতোষ ভট্টাচার্য-র মতে "উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কোচ ও রাজবংশী অভিন্ন রক্তধারার মানুষ, তাঁরা ইন্দোমঙ্গোলীয় ভাষা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী।"[১]

ড চারুচন্দ্র সান্যাল বলেছেন, . . That the Koches are non-Aryan in Origin Some of them adopted Hinduism and become Rajbanshis These Rajbanshi later on claimed to be kshatriyas.[২] আবার, ড. সুনীতি চ্যাটার্জীর মতে, The masses on North Bengal areas are very largely of Bodo origin on mixed-Dravidian-Mongoloid. They can now mainly be described as Koch ie. Hinduised or Semi-Hinduised Bodo who have abandoned their original Tibeto-Burman Speech and have adopted the northern dialect of Bengali. They are proud to call themselves as Rajbanshi and to claim to be called Kshatriyas.

বলাবাহুল্য, রাজবংশী জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনাচরণের লোকাচার, ক্রিয়াচার ও নৃত্যগীতে অনার্য ধারার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। এই সমাজের মৃত্যুকালীন ক্রিয়াচারের ক্ষেত্রেও এরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

রাজবংশী সমাজের কোচ-মেচ রাভা ও অন্যান্য হিন্দুদের মতো মৃতদেহ দাহ করার রীতি পালিত হয়। অবশ্য শিশু ও গর্ভবতী নারীর মৃত্যুতে পৃথক রীতি অনুসরণ করা হয়। এক্ষেত্রে মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়। মৃতের সমাধিতে সোয়া সের নুন দেওয়া হয়। এই রীতিকে 'নুন-মাটি' বলা হয়। গর্ভবতী নারীর মৃতের সমাধিতে 'কলাগাছ' রোপণ অবশ্য পালনীয় রীতি বলে মানা হয়। এই রীতি জন্মান্তরবাদের প্রতি বিশ্বাসের ইঙ্গিত বহন করে।

রাজবংশী সমাজে মৃতদেহ ঘর থেকে শ্মশান নেওয়া পর্যন্ত কতকগুলি বিধি পালন করা হয়। অবশ্য অঞ্চল ভেদে এই ক্রিয়াচারের রীতির কিছু পার্থক্যও লক্ষ করা যায়। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ এলাকায় মৃতের দেহ বাড়ির পেছনের পান্দলা (বেড়া) ভেঙে বার করার রীতি প্রচলিত। লোকবিশ্বাস সদর দরজা দিয়ে মৃতদেহ বার করলে মৃতের আত্মা পুনরায় ঘরে ফিরে এসে ক্ষতি সাধন করে।

রাজবংশী সমাজে যাঁরা ঝাড়-ফুক কবিরাজি ও ওঝালি করেন তাঁরা দেওসী, মাহান ওঝা (রোজা) বা গুণিন নামে পরিচিত। মৃতদেহ বাড়ি থেকে বার করে শ্মশানে নেওয়ার আগে মন্ত্রের

সাহায্যে গুণিন, ওঝা ও কীর্তনিয়া বাড়ি 'বন' করে নেন যাতে মৃতদেহের আত্মা বাড়িতে পুনরায় প্রবেশ করতে না পারে।

রাজবংশীদের মৃত্যুকালীন লোকাচারের অন্যতম অঙ্গ হল কীর্তন। একে 'মড়াখোয়া কীর্তন' বলে। যাঁরা এই কীর্তন পরিবেশন করেন তাঁদের কীর্তনিয়া বা কীর্তনীয়া বলা হয়। কীর্তনিয়ারা রাজবংশী সম্প্রদায়েরই লোক। এই কীর্তন পরিবেশনের ক্ষেত্রে খোল ও ঝাইল (বৃহদায়তন করতাল) নামক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হয়।

উল্লেখ্য 'ঝাইল' নামক বাদ্যযন্ত্রটির করুণ ও মর্মভেদী আওয়াজ শোকসন্তপ্ত পরিবারের হৃদয়যন্ত্রণা যেন দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়।

'মৃতদেহ' শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় মড়াখোয়া কীর্তন পরিবেশন করা হয। রাজবংশী মৃত্যুকালীন ক্রিয়াচারের বিভিন্ন পর্বে অর্থাৎ চৌধা, দশা, খেউর ও শ্রাদ্ধের দিন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে এই মড়াখোয়া কীর্তন পরিবেশন করার প্রচলন দেখা যায়। উল্লেখ্য, কীর্তনিয়াবা ক্রিযাচারের প্রতিটি পর্বেই কীর্তন পরিবেশন করেন।

রাজবংশী সমাজ ও শ্মশান

আক্ষরিক অর্থে শ্ম (শব) ও শান (শয়নক্ষেত্র); সাধারণভাবে শ্মশান বলতে যে স্থানে মৃতদেহ সৎকাব করা হয় বা সমাধিস্থ কবা হয় সেই স্থানটি শ্মশান নামে চিহ্নিত করা হয়। বাজবংশী সমাজে সাধারণত শুন্‌শান (নিধুয়া পাথার বাড়ি), জলাশয়ের ধার, গা ছম ছম করে এমন স্থান শ্মশান হিসাবে নির্ধারণ করে থাকেন। জলাশয় অর্থাৎ নদী, নালা, দিঘি, বিল্‌-এর সঙ্গে শ্মশানের নিবিড় সম্পর্ক।

শ্মশান স্থান নির্ধারণ বা মৃতদেহ দাহ করবার ক্ষেত্রে রাজবংশীদের এক অদ্ভুত দার্শনিক (Philosophy) চিন্তাধাবার প্রতিফলন দেখা যায়। এঁরা এঁদের আত্মীয়ের মৃতদেহ সৎকার বা সমাধিস্থ করার ক্ষেত্রে নিজস্ব সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত জলাশয়ের ধারে স্থানটি নির্ধাবণ করতে দেখা যায়। অতীতের জোতদাব, জমিদার, উচ্চক্ষমতা সম্পন মধ্যবিত্ত বাজবংশীদেব এরূপ পারিবারিক শ্মশান-স্থানের দৃষ্টান্ত আজও বিরল নয়। এমনকী নামী, গুণি, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন রাজবংশীদের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক শ্মশান-স্থান নির্ধারণের দৃষ্টান্তও কম নয়। লোকবিশ্বাস, পরিবারে আত্মীয়ের মৃত্যুতে একই স্থানে সৎকার করলে পবলোকে তাঁদের আত্মার মিলন মধুর ও সহজে হয। এছাড়াও, পরম-আত্মীয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানাতে ও শেষ স্মৃতিটুকু রাখতে তাঁদেব উদ্দেশ্যে শ্মশানের পার্শ্বস্থ স্থানে বৃক্ষরোপণের রীতি প্রচলিত। তুফানগঞ্জের ৭ ভাই-এর পারিবারিক শ্মশানে কুলগাছ পূর্বপুরুষের স্মৃতির দৃষ্টান্ত আজও লক্ষ কবা যায়।

রাজবংশী সমাজে মৃতের উদ্দেশে স্মৃতি ফলকেব প্রচলতি কদাচিত দেখা যায়। স্মৃতি রক্ষার্থে বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন রাজবংশীদের গারাম থানের দেবদেবীদের ঘবের মতো ছোট ছোট টিনের গম্বুজাকৃতি (মন্দিরের ন্যায়) বা ইটের ঘর স্মাবকার্থে তৈরি করতে দেখা যায়। জলপাইগুড়ি জেলার, জল্পেশের কাছে ভোটপট্টি অভিমুখের পথে জলাশয়ের (পুকুর) শ্মশান উত্তর ও দক্ষিণে পৃথক পৃথক দুটি ঘর (৪' x ৪' x ৬' পাকাঘর) বুড়া-বুড়ির (গৃহেব বয়স্ক পুরুষ ও নারী) স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত। ধূপগুড়ি থানার দুরামারি এলাকার এরূপ স্মৃতিচিহ্ন

আজও বহন করে চলেছে রাজবংশী সমাজ।

'বুড়া-বুড়ি' দেবায়িত হয়ে (পূর্বপুরুষ দেবতারূপে) বর্তমানে গারাম থানে (গ্রামের দেবদেবীর নিমিত্ত স্থান) অন্যান্য দেবদেবীর মতো একই সঙ্গে পূজিত হয়ে আসছেন। The soul of goodmen become debta and that of women become Ai-debta.[৩] উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে এরূপ অজস্র 'পূর্বপুরুষ' দেবতারূপে গারাম থানে/ধামে (কোচবিহার) পূজিত হন। লোকবিশ্বাস, মৃত্যুর পর শ্মশানেই সব শেষ হয়ে যায় না, পরলোকের বাসিন্দা হয়েও পূর্ব-পুরুষ দেবতারূপে গ্রামকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন। এরূপ পূর্বপুরুষ দেবতার নামে বহু স্থান-নাম/গ্রামনাম সৃষ্টি হয়েছে।

ক) বুড়া-বুড়ি : ময়নাগুড়ির ৪ কিমি দক্ষিণে জল্পেশ-এর কাছে। মাধবডাঙা-২ অঞ্চলের অন্তর্গত।

খ) খুকশিয়া : ময়নাগুড়ি থেকে ২১/২২ কিমি. দক্ষিণ-পূর্বে। খাগড়াবাড়ি অঞ্চলের অন্তর্গত। গারামথান আছে। খুকশিয়া-পূর্বপুরুষ। দেবায়িত। পার্শ্বস্থ জলাশয় মরা-নদী। সাদা ঘোড়ায় চেপে গ্রাম পাহারা দেন বলে লোকবিশ্বাস। পূজার উপকরণ—দই, চুড়া, কলা।

গ) গুয়াবাড়ি : পূর্বপুরুষ দেবতা। নাম - শুঁকধন রায় (জোতদার) ঝাড় মাটিয়ালী, লাটাগুড়ি। গুয়া/সুপারি বাগানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে গুয়াবাড়ি ঠাকুর নামে পূজিত হন। প্রভাবশালী জোতদার ছিলেন। পাশেই শ্মশানের স্থান, ঝোড়ার পাড়ে।

ঘ) ভাণ্ডার কুড়া : স্থান-নাম। কুড়া জলাশয়। ভাণ্ডা ব্যক্তি নাম। জোতদার ছিলেন। ভাণ্ডা জোতদার পরে দেবায়িত হন। (মধ্য খট্টিমারি) ধূপগুড়ি।

ঙ) ঝালটিয়ার হাট : ঝালটিয়া নামে জোতদার। দেবায়িত হন। আংরাভাসা নদীর ধারে শ্মশান আছে। ধূপগুড়ি। জলপাইগুড়ি। .... ইত্যাদি।

কুড়া/নদী/জলাশয় ও শ্মশান

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে শ্মশানের সঙ্গে জলাশয়ের এক নিবিড় সম্পর্ক। যেখানে জলাশয় নেই সেখানে শ্মশানের স্থান নির্ধারণ করা হয় না। কারণ—শ্মশানের ক্রিয়াচারের সঙ্গে জলের প্রয়োজন হয়। যেমন, মৃতদেহ 'চিতায়' তোলার আগে মৃত দেহকে মাটিতে শুইয়ে ভালো করে জল দিয়ে স্নান করিয়ে নেওয়ার রীতি। It is the belief that there was a touch of Mother Earth at the start of life and this should also be at the end of the (Mati hate asile, Matitie dzauk—মাটি হাতে আসিল, মাটিত যাউক)[৪]

শ্মশানে মৃতের দেহ পোড়ানো সমাপ্ত হলে জল ঢেলে চিতা নেভানোর কাজ করা হয়। অবশিষ্ট ছাইভস্ম জলাশয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। শ্মশান যাত্রীরা জলাশয়ে প্রাথমিক স্নান-শুদ্ধির কাজ সেরে নেন। তাছাড়া শ্রাদ্ধের দিন পর্যন্ত নানা পর্বের ক্রিয়াচারের ক্ষেত্রে জলাশয় ও জলের প্রয়োজন হয়। উল্লেখ্য, শ্মশানের ছাই-ভস্মের অবশিষ্টাংশ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হত বলে ধূপগুড়ি ব্লকের (মরাঘাট পরগনা) একটি নদীর নাম 'আংরাভাসা' (ছাইভস্ম) নামে পরিচিতি লাভ করে।

'আংরাভাসা' নামে বর্তমানে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। 'আংরাভাসা' শব্দটি শ্মশান সম্পর্কিত। শ্মশান-সম্পর্কিত এরূপ অজস্র জলাশয়ের মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

ক) ভূতকুড়া : সতীনদীব কুড়া। কুচলিবাড়ি, মেখলিগঞ্জ।

খ) মাশান কুড়া : ভেটাগুড়ি, দিনহাটা।

গ) খাগেনের কুড়া : ১০২ ফুলকাডারবি, মেখলিগঞ্জ।

ঘ) তিরকোর কুড়া : সতীনদীতে সৃষ্ট কুড়া। কুচলিবাড়ি। মেখলিগঞ্জ।

ঙ) মান্সি খাওয়া কুড়া : মেখলিগঞ্জ, কোচবিহাব।

চ) তালগুড়ির দিঘি : তুফানগঞ্জ।

ছ) বিলসি : তুফানগঞ্জ। কোচবিহার।

জ) বোয়ালমারির কুড়া : বোয়ালমারি। জলপাইগুড়ি।

ঝ) ঘেগী কুড়া : রানির হাট। কোচবিহার।

ঞ) জোড়া পুলেব মাশান কুড়া : আলিপুরদুয়াব। .. ইত্যাদি।

রাজবংশী নারী ও শ্মশান

সাধারণত রাজবংশী সমাজে নারীদের শ্মশানযাত্রীর হওযা বীতি বহির্ভূত। সমাজেব পুরুষেরাই মৃত সংকারের কাজ সম্পন্ন করেন। তবে এখানে উল্লেখ কবা প্রয়োজন কোনো স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে সেই স্ত্রীলোকটিকে পরপর ৩ দিন শ্মশানে গিয়ে মৃতের চিতায় জল ঢেলে নানা ক্রিয়াচার করতে হয়। এছাড়াও রাজবংশী রমণীরা মৃত্যকালীন লোকাচারে নানা বিধি বা রীতি পালন করেন। যেমন, মৃতদেহ শ্মশানের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বার করার সময একটি মাটিব হাঁড়িতে গোবরজল ছুয়াবান্নি (অর্থাৎ ক্ষয়ে যাওয়া অব্যবহৃত বারুন) দিয়ে ছেটাতে ছেটাতে শ্মশানযাত্রীব কিছুটা পথ অনুসবণ করেন এবং মাটিব হাঁড়টি পথেব মধ্যে আছাড় দিয়ে ভাঙেন এই বলে—"Dusker Doka Bhangil"(দুস্কেব ডোকা ভাঙিল)। এবং মাথায় জল ঢেলে দেহ শুদ্ধি করে পেছনে না তাকিয়ে সোজা বাড়িতে চলে আসেন। অন্যথায়...it is believed, the some of the dead becomes a ghost (bhut) and is sure to attack them."[৭] 'Dusker Doka' বলতে ইহজীবনের শেষ সম্বল বলে মনে করা হয়। 'Dusker Doka' ভাঙার সময় পাত্রটি অসংখ্য টুকরো হয়ে গেলে মৃতের অনজল বা পরমায়ু শেষ হয়েছে আর পাত্র বা 'ডোকাটি' কম সংখ্যক টুকরো হলে মৃতের 'অকাল মৃত্যু' হয়েছে বলে লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। এরূপ, শ্মশানে মৃতদেহ দাহন করার পরেও যদি কাঠখড়ি উদ্বৃত্ত হয় তাহলে মৃতের পরমায়ু শেষ হয়নি বা অকালমৃত্যু হয়েছে বলে বিশ্বাস। আবার কাঠ-খড়ি কম পড়লে মৃতের আয়ু শেষ হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়।

এছাড়া রাজবংশী বাড়ির পুরুষ বা অন্য কোনো ব্যক্তি মাবা গেলে স্ত্রীলোকরা ৩ দিন অশৌচ পালন করেন। গায়ে সাবান মাখা থেকে বিরত থাকেন। মাথায় তেল ব্যবহার করেন না। নিরামিষ

ও আতপ চালের ভাত খাওয়া হয়। পূর্বে উল্লেখ কবেছি স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে পরপর ৩ দিন মৃতের স্ত্রীকে শ্মশানে গিয়ে চিতায় জল ঢালা সহ নানা ক্রিয়াচাব করতে হয এবং শ্রাদ্ধের দিন পর্যন্ত নানা লোকাচার বিধি পালন কবেন।

শ্মশান ও দেবদেবী

রাজবংশী লোকসমাজে মৃতেব আত্মাব উদ্দেশে শ্মশানে পিণ্ডদানেব ক্রিয়াচাব সম্পাদন করা হয় এবং পিণ্ডদানের সময় আত্মীয় স্মৃতির উদ্দেশে দেবদেবীব নাম পূজা দেওযা হয়। মোট যে ১২ জন দেবদেবীর পূজা কবা হয়—শিব, গৌরী, সীঙ্কি, ডাকিনী, যোগিনী, মাশান, ভূত, তিস্তাবুড়ি, বিষহরি, কুচুনি, অপদেবতা এবং কালী। শ্মশানের পিণ্ডদানের সময এই ১২ জন দেবদেবীর পূজাকে স্থান বিশেষে "হাজরা পূজা" বলা হয়। [৮]

শ্মশান : মাশান

'মাশান', 'হাজরা পূজার' দেবদেবীদের মধ্যে অন্যতম লোকদেবতা। শ্মশানেই মাশানের স্থান। মাশান কী? ড. সুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় 'মাশান' শব্দটি 'শ্মশান' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করেন। অতীতের বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ বা প্রাগ জ্যোতিযপুর অঞ্চলে 'শ্মশান-মাশান' (মাশানের দুই-ভাই) মাশান রূপেই পূজিত হয়। স্থান-কাল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপের মাশানের সন্ধান পাওয়া যায়। কিংবদন্তি অনুযায়ী মাশান কালীর সন্তান। কোচবিহারেব সিতাই এলাকার কিংবদন্তি মাশানের মা বুড়ি ঠাকুর এবং মাশান পূজায় তাকেও পুজো দেওযাব রীতি। আবার কখনো মাশান শিবের বা সন্ন্যাসীরই ভিন্ন রূপ। ড. অশোক মিত্র তাঁর পঃবঃ মেলা ও পূজা পার্বণ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ". কাহারো কাহারো মতে শিব শ্মশানে থাকেন বলিয়া উহাব অপব নাম মাশান হইয়াছে। আবার কাহারো মতে মাশান শিবের অনুচব উপদেবতা বিশেষ।" অনেকে পৌরাণিক ব্যাখ্যার আধারে বলতে চান মাশান কুবেরেব রূপ। কিন্তু লোকসমাজের জনপ্রিয় কাহিনির আধারে বলা যায় মাশান, শিব সন্ন্যাসীর মতো ভিন্ন রূপের আঞ্চলিক দেবতা। তাঁর স্থান সর্বত্র।

শ্মশানে মাশান বিচবণ করে। রাজবংশী লোকাচার তা প্রমাণ করে। সমাজবিজ্ঞানী ড. গিরিজাশঙ্কব রায়ের মতে, "শ্মশান-মাশান একটি ব্যাপক প্রচলিত শব্দ। শ্মশানকে মাশানও বলা হইয়া থাকে। সম্ভবত, শ্মশানে যে দেবতা বিরাজ কবেন সেই দেবতাই পববর্তীকালে মাশান হইয়াছেন। অর্থাৎ শ্মশানচারী শিবই—মাশানেব মূলে বহিয়াছেন। পূর্বে হয়তো মাশানের পূজা শ্মশানে দেওয়া হইত, ক্রমে তাঁহার পূজার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইলে শ্মশান হইতে অন্যত্র থান তৈয়ারি করিয়া পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।"[৯]

উত্তরবঙ্গের লোকসমাজের বিশ্বাস মাশান বড় ভযংকব জাগ্রত দেবতা। আর সে কাবণেই মাশানকে যথেষ্ট সমীহ করে আনুষ্ঠানিক ভাবে পূজা তথা শান্তি দিয়ে থাকেন।

মাশান ১৮ প্রকার। যথা—ঘোড়া মাশান, জলুয়া মাশান, পইরি মাশান, কালী মাশান, কুহলি মাশান প্রভৃতি। মাশানের বাহন সাধারণত ঘোড়া। কোনো ব্যক্তি বা শিশু মাশানের দ্বারা আক্রান্ত হলে, আক্রান্ত ব্যক্তি আঁখা বা উনুনের মাটি, কাঠকয়লা, ভাজা-পোড়া ও নানা ধরনেব অখাদ্য-

কুখাদ্য জিনিস খেতে পছন্দ করে। মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। চোখ বড় করে তাকায়। আবোল তাবোল বকে। লম্বা জিহ্বা বার করে। শরীর রুগ্ন হয়ে যায়। কিছুদিন পর রুগির অন্তিম দশা প্রাপ্ত হয়।

শুন্‌শান নিধুয়া পাথার বাড়ি, নদী খাল বিল, দিঘি, কুড়া দহলা ও বিলের ধারে 'শ্মশান-প্রান্তরে' এক ভিন্নরূপী মাশান বিচরণ করে। একে জলুয়া মাশান বলে। জলাশয়ের এই মাশানকে মান্যতা না দিয়ে জলাশয়ের মাছ ধরা বা জলে নামলে এই মাশান ধরে। শ্মশান-প্রান্তরে জলুয়া মাশান ছাড়াও কালীমাশানও অবস্থান করে।

শ্মশানের ধারে শ্যাওড়া গাছ বা তেঁতুল গাছের ডালে কুহুলিয়া মাশান অবস্থান করে। কোকিলের মতো সুব কবে মানুষকে ডেকে বিভ্রান্ত করে। শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করার সময় মাশানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শ্মশান 'বন' করেন ওঝা বা গুণিনরা।

'শ্মশান বন'-এর মতো বাড়িবন, শুল্‌কিবন, পথত্‌বন প্রভৃতির মাধ্যমে মাশানের হাত থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন গুণিনরা। গুণিনরা মূলত রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোক। সমাজে এঁরা সমীহ আদায় করে নেন। ওঝা বা গুণিনরা 'বন' করে ভূত, প্রেত, মাশানকে তাড়িয়ে দেন ফলে গুণিনরা 'মাশানের' আক্রোশের কারণ হয়ে দাঁড়ান। মাশানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ওঝা বা গুণিনরা প্রথমেই নিজেদের শরীর 'বন' করে নেন।

লোকবিশ্বাস, শ্মশানের মাশান শব দাহ করে ফেবার সময় শ্মশান যাত্রীদেবও পিছু নেয়। সেকারণে শ্মশান থেকে বাড়ি ফিরবার সময় একটি লোহার কাঁচি দিয়ে কিছুদূব অন্তর অন্তর রাস্তায় মাটিতে 'X'(Cross) চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয। 'X' চিহ্ন মাটিতে আঁকলে মাশান 'X' অতিক্রম করে না।

লোহার যন্ত্র বা হাতিয়ার, ভূত, প্রেত, মাশানরা ভয় পায় বলে বিশ্বাস করেন রাজবংশীয়রা। সেজন্য মৃত ব্যক্তির সন্তানের 'utri' (পরিধেয় কাপড়)র সঙ্গে লোহার জালের গুটি বেঁধে দেওয়া হয়। এছাড়াও রাজবংশী রমণীরা পথে প্রান্তরে, জলবাড়িতে গেলে সঙ্গে সবসময়ই একখানা গুয়া কাটা 'কাটারি (katari) রাখেন।

দেহাবন/পথতবন—মন্ত্রের দৃষ্টান্ত

"আমি চইল্‌লাম পথে
গুরু নইল মোর সাথে
শ্রীকৃষ্ণ নইল আগে তার পাছে।।

শ্মশানবন—মন্ত্র

"ওঠ মাশান ছাড় পাট।
ছাড়ি দে শ্মশান ঘাট।।
তুই যা ভাটি ঘাট।
ভাটি ঘাট থাকি আসিবু ঘুরিয়া;
শিব শঙ্করের দোহাই নাগিবে।।"

সঙ্গীবন—মন্ত্র

"ভাটি গেনু কাশি পিন্দনু
নরে পিন্দিনু বাল।।
চন্দ্র সূর্য ঘুরিয়া আসিলে
তবে সে ছেলিবু মোর বন।।
আইল বন কাইল বন
আরো বন হীরা।।
মুই বন করেছো শিবের দোহাই দিয়া
উল্টি ফিরি চড়াবু ঘাও
জটিয়া শিবের মাথাত
মুছিবু মুই পাও।।"

শ্মশানযাত্রী ও কীর্তনিয়া সঙ্গীদের সঙ্গে শ্মশান থেকে ফিরে আসার পর বাড়ি ঢোকার আগে বাড়িবন মন্ত্র

"কুচিয়ার মাথা, কাকড়ার ডাবু
মোর কীর্তনিয়ার নগদ আসিবো
আচ্ছামতন ঠ্যালা খাবু;
দৌড়িয়া আসিয়া ফিরিয়া চাবো
চান্দিয়া বাড়া'র গুতা খাবু।।"[৮]

তথ্য : চিন্তামোহন রায় (কীর্তনিয়া) পিতা : রসিকচান নাউয়ারবাড়ি/ডাইরুক্যামারি খাগড়াবাড়ি-২ ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

শ্মশানে মাশানের থান : মূর্তি পূজা

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে মাশানের পূজা ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে অনুষ্ঠিত হয়। যেমন মাটির থানে, শোলার মূর্তিতে আবার কখনো মাটির মূর্তিতে পূজা হয়। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং প্রভৃতি অঞ্চলে মাশানের শোলার মূর্তিকে পূজা করা হয়। কিন্তু কোচবিহারের দিনহাটা, মাথাভাঙা অঞ্চলে মাশানের মাটির মূর্তিতে পূজা দেয় নির্দিষ্ট থানে। কোচবিহার জেলাতে উপরোক্ত অঞ্চলে শ্মশান মাশানের মাটির মূর্তির থানে পূজার প্রচলন আছে। মাথাভাঙা মহকুমার শীতলকুচির পথে 'খুটামারা' নদীর ব্রিজের ধারে 'শ্মশানে' মাশানের মাটির মূর্তির পূজা করা হয়। সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানকার শ্মশানের মৃতদেহ দাহ করেন এবং সঙ্গে মাশানের পূজা দেন। শ্মশানের এই মাশান মূর্তিকে পথচারীরা মান্য করে চলেন। সারা বছরেই পূজা চলে। বছরে একবার বড় আকারের পূজা হয়। তখন মেলা বসে। মাশানের বাহন—শূকর ও শোল মাছ।

শ্মশান : মাশান ও নিশান

শ্মশানে মৃতদেহ সৎকারের পর চিতার উপর চারকোণায় চারটি সরু লম্বা বাঁশের (বাঁশটির মাথার দিকের অংশে ঝিক-পাতা-সহ) পোতা হয় এবং উপরের দিকে দড়ি দিয়ে একখণ্ড সাদা কাপড়ের 'চান্দোয়া' বাঁধা হয়। সম্ভবত, মৃতের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই এই চান্দোয়ার

ব্যবহার। এছাড়াও চিতা ভস্মের মাঝে আম্রপল্লব গুয়া সহ একটি মাটির জলপূর্ণ ঘট রাখা হয়। তার উপর একটি ছাতাও মেলে দেওয়া হয় এবং চারদিকে চারটি ছোট ছোট সাদা কাপড়ের নিশান গেড়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও একটি বাঁশের মাথায় একখণ্ড কাপড় বেঁধে চিতার পাশে গেড়ে দেওয়ার প্রচলন আছে। রাজগঞ্জ এলাকায় একে চিল (Chil) বলে। অন্যত্র নিশান বা নিশ্বান বলে।

চান্দোয়া ও নিশান বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের ভেলার চান্দোয়া ও নিশানের সঙ্গে 'ভুরাভাসানি'র মিল খুঁজে পান অনেকে। উত্তরবঙ্গের তিস্তাবুড়ি ও সত্যপীরের পূজার ভুরাভাসানিতে কলার ভেলায় নিশান গেড়ে দেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গের সমস্ত গারামথান/ধামে (কোচবিহার) বাঁশ খেলায় নিশানের ব্যবহার প্রচলিত রীতি। এছাড়া মাশান পূজায় নিশান ব্যবহার হয়। উল্লেখ্য প্রায় প্রত্যেক রাজবংশী বাড়ির তুলসীতলার কাছে একটি লম্বা বাঁশের আগায় একখণ্ড কাপড় (সাদা/লাল/নীল) নিশান হিসাবে ব্যবহার হয়। লোকবিশ্বাস এতে শ্মশানের ভূত, প্রেত, মাশান প্রভৃতি দেবতার 'হাওয়া কাটে' (দোষ কাটে), বা শ্মশান ও গোরস্থান যাতে কলুষিত না হয় সে জন্য 'নিশান'-এর প্রচলন শুরু হয়েছে। এরূপ অনুমানও অপ্রাসঙ্গিক নয়।

রাজবংশী সমাজে এই নিশানের ব্যবহারের প্রচলনের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ প্রভাবের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

... The craving for protection against malignant gods and demons causes the people to pin their faith on charms and amulets, and to erect tall prayer–flags, with strings of flaglets, which flutter from house-tops, bridges, passes and other places believed to be infested by evil spirits [২]

বৌদ্ধদের (Buddhist) প্রচলিত উক্ত লোকবিশ্বাসের সঙ্গে রাজবংশীদের দেবদেবীর পূজা ও শ্মশানের ক্রিয়াচারে নিশানের প্রচলনের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। রাজবংশী সমাজে দেব-দেবী থান, শ্মশানে নিশানের ব্যবহার তাদের কৌম জীবনাচরণ অনুভাবনার প্রতিফলন।

কিংবদন্তিতে মাশান ও শ্মশান

তুফানগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত অন্দরান ফুলবাড়ির সমস্ত এলাকা ঘন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। লোকবসতি ছিল খুবই কম। অধিকাংশই রাজবংশী সম্প্রদায়ের আদি বাসিন্দা। রাজবংশী প্রয়াত জোনাকু বর্মনের ৭ পুত্রের প্রভাবে অন্দরান ফুলবাড়ির একটি গ্রাম ৭ ভাই পাড়া নামে পরিচিতি লাভ করে। ঝাড়-জঙ্গল, খাল-বিল সহ বিষয়-সম্পত্তি নেহাত কম ছিল না। তার মধ্যে একটি বৃহৎ দিঘি ছিল। দিঘিটি তালগুড়ির দিঘি নামে পরিচিত। একটি তালগাছ ছিল বলে এরূপ নাম। এই দিঘির সঙ্গে সম্পর্কিত বহু ঘটনা আজ কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। তারই একটির অবতারণা করতে চাই। ৭ ভাই-এর তালগুড়ির দিঘিটির চারদিকে ছিল ঘন বাঁশঝাড়। তারপর চাষের জমি। এরই পাশ দিয়ে সরু রাস্তা বীর চিলা রায়ের গড়-এ গিয়ে উঠেছে। দিঘিটির জল শালুক ফুল ও জংলি লতা-পাতায় ভর্তি থাকত। জলে একা একা কেউ নামতে সাহস করত না—মাশানের ভয়ে। যে কোনো সময় মাশান জলে পা টেনে ধরত। পাট পচানো ছাড়া দিঘির জল গরু-মোষের স্নান করানোর কাজে ব্যবহৃত হত। বর্ষাকালে দিঘিতে প্রচুর মাছ হত। মাছ ধরা হত ধোরকা,

বুরুং ও জালের সাহায্যে।

দিঘির মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে নানা ঘটনার, সম্মুখীন হয়েছেন অনেকেই। তালগুড়ির দিঘির পাড়ের শ্মশানের মাশান ও ভূত অনেককে ভয় দেখিয়েছে। মাশানের কবলে পড়ে ভয়ে জ্বর, পেটের ব্যথায় অনেকে মারা গেছেন। জানা যায়, ৭ ভাইয়েবা এলাকায় 'দেওয়ানী' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর মধ্যে প্রয়াত দেবেন্দ্র বর্মন ধনসম্পদের জন্য 'দেবেন ধনী' নামে পবিচিত ছিলেন।

একদা উক্ত দেবেন ধনীর স্ত্রী কোনো শীতের দুপুরে তালগুড়ির দিঘিতে গিয়েছিলেন পুকুরের এঁটেল মাটি আনতে। গিয়ে দেখেন পাড়াব এক পড়শির স্ত্রী পুকুরের মাটি খুঁড়ছেন। অথচ তার সঙ্গে কথা ছিল দিঘিতে একই সঙ্গে যাওয়ার। পরে দু'জনে মাটি সংগ্রহ ক'বে ঘরের দিকে পা বাড়ান। উল্লেখ্য, শীতকালে এই দিঘির এঁটেল মাটি সংগ্রহ করে রাখতেন এলাকার বাসিন্দারা উনুন বানানোর ও ঘর লেপার জন্য। দুজনে কথোপকথন করতে করতে বাড়ি ফিরছিলেন। এক সময় দেবেন্দ্র পত্নী হঠাৎ পেছন ফিরে তাকালে দেখেন তার সঙ্গে সঙ্গীটি নেই। তখন তিনি ভয় পেয়ে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে এসে বাড়িতে ঘটনাটিব কথা ব্যক্ত করেন। কিন্তু ততক্ষণে তার বমি শুরু হয় ও ভীষণ জ্বর আসে। ডাক্তার কবিরাজ ওঝা ডাকা হয়। ওঝা খাঁটি দেখে বলে দেয় 'মাশান ধরেছে'। ওঝাব বিধান মতো মাশান পূজার আয়োজন করা হয়। ঘটনাব সত্যতা উদ্‌ঘাটন করবার জন্য সঙ্গীটিব বাড়িতে খোঁজ খবব করা হলে জানতে পারা যায় যে তিনি সেদিন কোথাও যান নি। দুপুরে খাওয়ার পর ঘুমুচ্ছিলেন। তালগুড়ির মাশানেব হাত থেকে আব তাকে রক্ষা করা যায়নি। তালগুড়ির মাশানই তাকে খেয়েছে বলে বিশ্বাস। বর্তমানে দিঘিটি ও শ্মশান স্থান থাকলেও আগের মতো এখন আর শ্মশানের ভূত, প্রেত মাশানের উপদ্রব নেই। তাছাড়া দিঘিটি প্রায় ভবাট হয়ে যাচ্ছে।

তালগুড়ির মাশান কাউকে ধরলে শোলার মাশান মূর্তিতে পূজার প্রচলন। দুধ, দই, কলা, চুড়া ও মাছ পোড়া প্রভৃতি উপকরণে প্রয়োজন হয়।

রাজবংশী ক্রিয়াচার : টোটেম ও ট্যাবু (Totem & Tabu)

রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকসমাজে মৃত্যুকালীন ক্রিয়াচারে কতকগুলি প্রাচীন প্রথা ও নিষেধ আজও প্রচলিত আছে। সেগুলি 'Totem & Tabu' নামান্তর। এই সমাজেব কোনো ব্যক্তির মাতার মৃত্যু হলে 'পতিত'কে দুধ ও দই খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হয়। অন্যদিকে কোনো ব্যক্তির পিতার মৃত্যু হলে তার সন্তানেরা 'কলা না খাওয়া' রীতিকে মেনে চলে। 'When a mother dies her children do not drink milk or take card. When a father dies his children do not eat ripe plantain during the period of mourning.' ১০ এখানে দুধ পান ও কলা খাওয়াব ওপর বাধা নিষেধ ট্যাবুর নির্দেশক। 'কলা' পুং জননেন্দ্রিয় উর্বরাতন্ত্রের (Fertility Cult) প্রতীক। উল্লেখ্য, রাজবংশীরা গো-মাংস ভক্ষণ করেন না। গরুকে দেবতা রূপে পূজা করেন। গরু গোয়াল ঘরে বা মাঠে গলায় দড়ির ফাঁস লেগে মারা গেলে এঁরা ৩দিন প্রায়শ্চিত্ত ও নানা ক্রিয়াচার পালন করে। একে বলা হয় 'গোবোদোৎপাড়া'। গরু এখানে এঁদের Totem রূপে কল্পিত। রাজবংশী সমাজে আর্যীকরণের সূত্রে অনেক ট্যাবু প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বিরাজ করছে। যেমন—দিনাজপুরের পড়ুয়া এবং ডকই গোত্রে এরূপ ট্যাবু অনুযায়ী শ্মশান চারণার

স্বাতন্ত্র্যতা আছে। কিন্তু বিষয়টি আরও অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

পইচ বা পাঞ্চ (Ponch or Poits)

রাজবংশী সমাজে নানা লোকাচারে ৫(পাঁচ) সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। সিঁদুরের ৫টি ফোঁটা, ৫ ফল, ৫টি আনা, ৫ জন, ৫ সিকি, ৫ পোয়া বা মোয়া মেয় ইত্যাদি। সমাজে বিশেষ কাজের জন্য ৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের অনুমতি বা পরামর্শ নেওয়ার রীতিও প্রচলিত আছে। Customary Law-এর অন্তর্ভুক্ত। সমাজের এই ৫ জন মান্যব্যক্তিকে পাঞ্চ বা পইচ বলে। পইচদের মধ্যে প্রধান হলেন পরামানিক (Paramanic)

রাজবংশীদের সমাজে কেউ মারা গেলে পইচদের (Ponch) ডাকা হয়। পঞ্চ বা পাঁচরা শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াচারের ১ম দিন, চতুর্থ দিন এবং খেউরের দিন ও শ্রাদ্ধের দিন অবশ্যই উপস্থিত থাকেন এবং তার সঙ্গে যুক্ত আছে শ্মশানের লোকাচার।

১ম দিন : চিতা সাজানোর পর মুখাগ্নি করার আগে চিতার ৪টি খুটিব গোড়ায় প্রথমে পঞ্চ জল ঢালবে এবং তারপরে পতিত জল ঢালার কাজ করে মুখাগ্নি করে চিতার আগুন জ্বালাবে।

শ্রাদ্ধ সমাপ্তি পর্যন্ত নানা ক্রিয়াচারে উপস্থিত থাকেন পঞ্চ। খেউরের দিন বিশেষ ক্রিয়াচারের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। সেদিন একটি মাটির হাঁড়িতে চাল, ডাল, মাছ, তরকারি সেদ্ধ করবেন শ্মশানের স্থানেই। তারপরে পতিত জলে নেমে যখন ডুব দেবে তখন পরামানিক ভাত ডাল ও তরকারির হাঁড়িটি পতিতের ঠিক মাথার উপর লাঠি দিয়ে ভেঙে ফেলবে। একে 'ডাহন ভাঙা' বলে। এসময় পতিত তার গলায় 'Utri' ফেলে দেবে এবং মাথা মুণ্ডন কববে। এখানেই শ্মশানের কাজ শেষ হয।

তন্ত্রসাধনা ও শ্মশান চারণা

তন্ত্রসাধনা উত্তরপূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান ধারা। ঝাড়ফুক-তুকতাক ইত্যাদির মধ্যে আছে বৌদ্ধ তন্ত্রের প্রবহমানতা। শ্মশান চারণায় প্রচলিত তন্ত্রোক্ত, রীতি, লোকাচার, প্রান্ত উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জীবনধাবায় প্রচলিত আছে যেমন, বসন্ত কবিরাজ-৪৮ (পরের পদবী রায়, বাজবংশী) জমিদারপাড়া, জলপাইগুড়ি। শ্মশানে তন্ত্রসাধনা করেন। শনি বা মঙ্গলবারে কোনো লোকের মৃত্যু হলে তিনি শ্মশানে গিয়ে সাধনা করেন। জানা যায় শেষ রাত্রে শিব এসে বর দেন বা মনস্কামনা পূবণ করেন। শ্মশান স্থানে 'মানকচু'র পাতায় মাশান মূর্তি এঁকে তার উপর সাধনায় বসেন এবং বিভিন্ন লোকাচার পালন করেন। যেমন, মাশান ওঠানো বা জাগানো মন্ত্র

শ্মশান মাশান তোমরা দুই ভাই
ছুট করিয়া উঠেক মাশান
অমুকের বাড়ি যাই।
তোক মাশান মুই, এইঠে থুনু
মুই গুনিক বাড়ি গেনু,
গুনিকের মাছৎ আসিবু
শবের মাথাৎ দুই পাও মুছিব।

জন্মদান (শ্মশান-মাশান / কালী ... শান) মন্ত্র

অথা বলে অথি ভাই
মূর্তির ছবার জীবদান দিতে চাই,
কালী-শিবের বিষম মায়া
অচম্বিতে উঠিল মূর্তির কায়া।
ডাইনে বইসে ব্রহ্মা, বামে বইসে শিব
ঈশ্বরের মহামন্ত্রে মূর্তির কণ্ঠে বসিল জীব।

ছাড়ান মন্ত্র

মাশান—
উঠ কালী ছাড় গাঁও
সোনামুখী তোর মায়ের নাও
স্বর্গের কালী স্বর্গে চলি যাও।

এছাড়াও আমগুড়ি (জলপাইগুড়ি) খগেনগোঁসাই ইত্যাদি ব্যক্তি শ্মশানে এরূপ তন্ত্রসাধনায় যুক্ত আছেন।

প্রান্ত উত্তরবঙ্গের রাজবংশী লোকসমাজে অতি প্রাচীনকাল থেকে মঙ্গোলীয় নৃ-গোষ্ঠীর কৌম চেতনাতে লালন পালন করলেও প্রাগ্ জ্যোতিষপুর কামরূপের ভাস্কর বর্মার রাজত্বকালে বৃহত্তর মঙ্গোলীয় শাখার আর্যীকরণ শুরু হয়। তাই কৌম চেতনার সঙ্গে বৈদিক চেতনা, আরও পরবর্তীকালে বিশেষত, ষোড়শ শতকে বৈষ্ণবীর প্লাবন নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য এবং অসমের শঙ্করদেবের দ্বারা রাজবংশী সমাজ বহুলভাবে প্রভাবিত।

এই পরিবর্তনের স্রোতে রাজবংশী লোকচারণার শ্মশান ও মাশান ভাবনায় এর রূপ পরিবর্তন থাকলেও দেশজ বৈশিষ্ট্যগুলি পবিলক্ষিত হয়। শ্মশান সম্পর্কীয় নানা লোকাচার স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে এবং শ্মশানের দেবতা মাশান রাজবংশী জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে; এরূপ আঞ্চলিক দেবতাগুলির মধ্যে অন্যতম মাশান অর্থাৎ মাশান শ্মশান চারণায় আজও কৌম জীবনের লোক ভাবনায় কোথাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রবহমান।

তথ্যসূত্র :

১. বাংলার লোক সাহিত্য, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৭-২৫৭, ড আশুতোষ ভট্টাচার্য
২. The Rajbanshis of North Bengal, Dr. Charu Chandra Sanyal.
৩. প্রাগুক্ত ২
৪. প্রাগুক্ত ২
৫. প্রাগুক্ত ২
৬. 'স্বদেশচর্চা লোক : বাংলার শ্মশান ও গোরস্থান', ১ম সংখ্যা; প্রবন্ধ : 'রাজবংশী' লোকচারণা ও

শ্মশান', দীপক রায়।

৭. উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, ড. গিরিজাশঙ্কর রায়।

৮. সংগ্রহ, চিন্তামোহন রায় (কীর্তনিয়া) পিতা—রসিক চান, নাউয়ারবাড়ি, ডাইরক্যামরি খাগড়াবাড়ি—২, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

৯. Bengal District Gazetteers : Darjeeling, Lss O'malley, ICS (Page 49)

১০. প্রাগুক্ত ২

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক।

Sigmund Freud's, Totem and Taboo, ভাষান্তর—ধনপতি বাগ।

পতিত ও কীর্তনিয়ার দল চলেছে শ্মশানক্রিয়ার উদ্দেশ্যে, ছবি বর্মা

□ লেখক পরিচিতি ঃ গবেষক, প্রাবন্ধিক।

সরস্বতী শ্মশানঘাট ও অন্যান্য শেষকৃত্য স্থান

অলক মণ্ডল

লোকবসতির সঙ্গে শ্মশান বা গোরস্থানের প্রয়োজন হয়। সাধারণত গঙ্গা বা নদী কাছে থাকলে শ্মশান তার পাড়ে হয়। আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগের কথা। গড়ে ওঠে বজবজ শ্মশানঘাট। অর্থাৎ গ্রাম বজবজ শহরে রূপান্তরিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই বন-জঙ্গলে আবৃত হুগলি নদীর তীরে চলে আসছে আজকের এই শ্মশানঘাট। সেইসময় নিম্নমধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের পক্ষে শবদাহ করা ছিল এক দারুণ সমস্যার ব্যাপার। ২০০ বছর আগে শ্মশানঘাটটি ছিল যোগী, ভোগী, তপস্বীদের পাশাপাশি শেয়াল কুকুরের অবাধ বিচরণক্ষেত্র। আর বজবজ ছিল কোলাহলবর্জিত একটি অঞ্চল। শ্মশানের চারধারে ছিল হোগ্‌লার বন। রাস্তাঘাট কিছুই ছিল না, জমির আল ধরে হোগ্‌লার বন হাত দিয়ে সরিয়ে রাস্তা করে শ্মশানে পৌঁছাতে হত। হাওড়া জেলার অখ্যাত গণ্ডগ্রাম থেকেও আত্মীয় পরিজনরা কাঁধে অথবা নৌকায় শবদেহ নিয়ে আসতেন বজবজের এই শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য।

বাওয়ালীর জমিদার হরানন্দ মণ্ডলের উত্তরসূরি ব্রজেন্দ্রনাথ (বংশলতিকায় পাই ব্রজনাথ) মণ্ডল তিন বিঘে জমি দান করেছিলেন। কথিত আছে, ব্রজেন্দ্রনাথ মণ্ডলের প্রথমা কন্যা সরস্বতী দেবীর অকালমৃত্যু হয়। তাঁর বিদেহী আত্মার সদ্‌গতির জন্য জমিদার বংশের কুলগুরু বজবজ ঘাটটিকে মনোনীত করেন। সেই থেকে শ্মশান সংলগ্ন ফেরিঘাটের নাম হয় সরস্বতী ঘাট। আবার অন্যমতে, বজবজের সম্মুখ দিয়ে প্রবাহিত সরস্বতী নদীপথে (ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিক ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে) বাংলার আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য চলত। ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশক। আদিগঙ্গা মজতে আরম্ভ করে। সরস্বতী বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হল। আদিগঙ্গা তীরবর্তী অধিবাসীবা এক এক করে উঠে আসে সরস্বতীর পূর্বতীরে। কেউ বা গেল পশ্চিমে। কলকাতার দক্ষিণে মেটিয়াবুরুজ, আকড়া, নুঙ্গি, বজবজ প্রভৃতি স্থান ধীরে ধীরে বসতিপূর্ণ হতে লাগল। তখন এখানকার অধিকাংশ স্থান ছিল বন-জঙ্গলে পূর্ণ। বজবজে 'জঙ্গলকাটি বন' অর্থাৎ জঙ্গল কেটে বাস শুরু হয়। নবাব আলীবর্দির সময়ে (মোটামুটি ১৭৫০ খ্রিঃ) আদিগঙ্গা পরিত্যক্ত হওয়াতে বেতড়ের দক্ষিণে সরস্বতী নদীর খাতে ভাগিরথীকে সংযুক্ত কবা হয়। কিন্তু আলীবর্দী নতুন প্রবাহ পথ খনন করেননি, এ পথ আদিগঙ্গার কাল অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দী অপেক্ষাও পুরাতন এবং বোধহয় সরস্বতীর প্রাচীনতর খাদের দক্ষিণতম অংশ। পঞ্চদশ শতকের (বিপ্রদাসের) আগে ভাগিরথীর অন্তত আংশিক এইসব সরস্বতীর খাদ দিয়েই সমুদ্রে প্রবাহিত হত। বজবজ শ্মশানঘাটের পাশ দিয়ে একদা প্রবাহিত সরস্বতী নদীর নামানুসারে সরস্বতী শ্মশানঘাট নাম হওয়াই যুক্তিযুক্ত। শিল্পনগরী বজবজের একপ্রান্তে পুণ্যসলিলা হুগলি নদীর তীরে এই শ্মশানঘাট ও চিত্রগঞ্জের কালীবাড়ি। বজবজ শ্মশানও এই কালীবাড়ির পাশেই ফেরি নৌকার (হাওড়ার বাউরিয়া, উলুবেড়িয়া যাওয়া যায়) জেটি।

বিশ্ববিজয় সম্পন্ন করে স্বামী বিবেকানন্দ দক্ষিণ ভারত হয়ে জাহাজে এই বজবজেই নেমেছিলেন। এখান থেকে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি একটা স্পেশাল ট্রেনে কলকাতায় (শিয়ালদহ স্টেশনে) নেমেছিলেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হিসেবে শ্মশান সংলগ্ন মন্দিরের সামনেই গঙ্গার ধারে স্বামী বিবেকানন্দের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। প্রয়াত স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ এই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছিলেন ১৯৯৭ খ্রি. ১৯ ফেব্রুয়ারি।

বজবজ শহর হলেও নিজস্ব ঐতিহ্যের গৌরবে বাংলার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বজবজ বন্দরের শেষ সীমানায় প্রতিষ্ঠিত চিত্রগঞ্জ কালীবাড়ি ও বজবজ পোর্ট কমিশনে চাকরিসূত্রে আসেন বীরভূমের জনৈক দয়াল ঘোষ। আনুমানিক ১৩০০ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৯৩ খ্রি.) বীরভূমবাসী তান্ত্রিক ও শক্তিসাধক দয়াল ঘোষ ওরফে দয়াল ঠাকুর গঙ্গাতীরে শ্মশান-সংলগ্ন এমন একটি শক্তিসাধনার উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করে এই কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠা করেন। এবং তাঁর গুরু স্বামী পূর্ণানন্দ মহারাজ একটি অমূল্য ছোট কষ্টিপাথরের কালীমূর্তি পঞ্চমুণ্ডীর আসনে প্রতিষ্ঠা করে একটি তীর্থ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। মতান্তরে পোর্ট ট্রাস্টে কর্মরত তান্ত্রিক দয়াল ঘোষ প্রথমে বজবজ বিষ্টুপাড়ায় (বর্তমান দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন রোড) থাকতেন। বর্ধমানের কালনা থেকে আনা মায়ের এই মূর্তিকে এই পাড়াতেই এক কুঁড়েঘর রেখে পূজার্চনা করতেন। পরে তিনি স্বপ্নাদেশ পান যে 'খুকি মা' তান্ত্রিকের কাছে গৃহে পরিবেশে আবদ্ধ না থেকে 'শ্মশানকালী' হিসেবে পূজিতা হতে চান। তখন তান্ত্রিক দয়াল ঘোষ 'খুকিমা'কে নিয়ে প্রায় আধ মাইল দূরে বর্তমান বজবজ শ্মশানঘাটেই গোলপাতার এক কুঁড়ে ঘরে থাকতেন। কিন্তু শক্তিময়ী মাকে বেশিদিন লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা যায়নি। এক অমাবস্যায় তন্ত্রমতে পঞ্চমুণ্ডির আসনে ব্রহ্মময়ী খুকি-মাকে প্রতিষ্ঠা করা হল। দয়াল ঠাকুরের গুরুদেব পূর্ণানন্দ স্বামী এসেছিলেন মূর্তি প্রতিষ্ঠায়।

মূর্তিটি উচ্চতায় এক হাত পরিমাণ। তাই আদর করে একে বলা হয় 'খুকি-মা'। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এই মূর্তিটি, যার পদতলে শিব নেই, সাধক কমলাকান্তের শ্যামা মা (ব্রহ্মময়ী)। এই খুকি-মার প্রথম ও প্রধান পুরোহিত হয়ে আসেন দয়াল ঠাকুরের বন্ধু ও সহকর্মী পোর্টট্রাস্টের কর্মী রাম সিং ওরফে অযোধ্যাবাসী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ রামজী। তিনি বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্করর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের গোঁসাইবাবা। রামজী সাধু তারাশঙ্করের জীবনে গোঁসাইবাবাও অক্ষয় স্থানের অধিকারী। রামজী সাধু গোঁসাইবাবার পার্থিব দেহের সমাধি তিনি নিজে হাতে রচনা করেন। গোঁসাইবাবা একসময় ছিলেন বীরভূমের লাভপুরের মহাতীর্থ অট্টহাসের বা ফুল্লরাপীঠের পুরোহিত।

নদীতীরে যেখানে শান্তি বিরাজ করে তার নাম সরস্বতীঘাট। সেযুগে নিম্নমধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের পক্ষে শবদেহ দাহ করাও ছিল একটা সমস্যাসঙ্কুল ব্যাপার। সার্বিক অভাব মোচনের জন্যই জমিদার ব্রজেন্দ্রনাথ তিন বিঘা জমি দানপত্র করে দেন। দানপত্র করা সরস্বতীর ঘাটের এই জমিতেই মায়ের শ্রীচরণ স্পর্শ পেয়েছে। শ্মশান মানেই সবহারাদের অবাধ বিচরণ, তাপী,

পাপী, যোগী, ভোগী, তপস্বী মানুষ থেকে গাঁজা মদের অহর্নিশ প্রস্রবণ। এই শ্মশানঘাটও তার ব্যতিক্রম ছিল না। তারাপীঠ শ্মশানঘাটের মতোই আয়ত, নির্জন, কোলাহল বর্জিত স্থান।

সময় বিস্তীর্ণ মহাজঙ্গলে হোগ্‌লা বনের বুক চিরে মাথা উঁচু করে উঁকি দিত শ্মশান বট, মহুয়া আর অশ্বত্থ জোড়া। মাঠময় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন শবদেহ। গড়াগড়ি খাচ্ছে করোটি। আধপোড়া বুকের কলজে নিয়ে শিয়াল ও কুকুরের দ্বন্দ্ব। রাতের নির্জনতা স্পষ্ট হয় নদীর জলতরঙ্গে, মাঝি-মল্লারের ছই ফেলার শব্দ, 'বল হরি হরি বোল' ধ্বনি আর কোন স্বজন হারানো মানুষের বুক ফাটা কান্নায় বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। দূরে থেকে ভেসে আসে মাঝে মধ্যে গুরুগম্ভীর ধ্বনি ...ওঁম্! ওঁম কালী!! কাত্যায়নী!!!

শ্মশানের চিতায় অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকারে শবের বুকে বসে সাধনায় ধ্যানমগ্ন যোগী, পর্ণকুটীরে হোগ্‌লার ছাউনির, কখনো-সখনো টিমটিম করে আলো জ্বলে, অনুরাগী ভক্তের দল উচ্ছিষ্ট মদ বা প্রসাদ হিসাবে গাঁজার কলকে ধরে টানাটানি করে। কালীবাড়ির পাশে বয়ে যায় স্বচ্ছ সলিলা হুগলি নদী, দক্ষিণ পাশে শ্মশানে মড়া পুড়ছেই, কয়লা আর ছেঁড়া বিছানা ভেসে যায় নদীতে।

বজবজ সারেঙ্গাবাদ-এর ইতিহাস রচয়িতা শ্রীনকুড়চন্দ্র মিত্র লিখেছেন . "কালীঘাটে (মহাশ্মশানে) শব নিয়ে যাওয়ার চলনটা হ্রাস পেল যখন বজবজের (চিত্রগঞ্জের) শ্মশানক্ষেত্রটি ব্যবহারযোগ্য হল। এই শ্মশানটি খুবই প্রাচীন সন্দেহ নেই। আশি/নব্বই বছর আগে যারা ওখানে দাহ করতে গেছে, আমার শৈশবে তাদের বলতে শুনেছি, না আছে পথ, না আছে এক পা বাড়াবার উপায়, বড় বড় হোগলা বন ভেদ করে ঐ শ্মশানে পৌঁছাতে হত। একটা শিয়াল হয় কোথাও আধপোড়া মাংসপিণ্ড খুবলে খুবলে খাচ্ছে, হয়ত একটা কুকুর হাড় চিবুচ্ছে, মাথার উপর দিয়ে হয়ত ঝাপটা মেরে চিল উড়ে গেলো। পায়ে ঠেকলো মড়ার মাথা ভয়ে আত্মারাম শুকিয়ে যেতো। তারপর ওখানে হল কালীদেবীর প্রতিষ্ঠা (অনুমান ১৮৯৩ খ্রিঃ) শ্মশানের 'শ্রীহাদ' ফিরল।" মাতৃসাধক ও তন্ত্রসাধক, মাতৃসংঘ জনকল্যাণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ˇসুদীনকুমার মিত্র বজবজের এই শ্মশানে তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর লিখিত 'জন্মভূমি' গ্রন্থে বজবজ শ্মশানে তাঁর সিদ্ধিলাভের কথা লিখেছেন। ˇসুদীনকুমার মিত্রের আবির্ভাব ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ এবং তিরোভাব ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪।

গ্রামীণ বজবজ ১৯০০ খ্রি. বজবজ মিউনিসিপ্যালিটি পত্তন হবার পর ব্রজেনবাবুর দেওয়া জমি অধিগ্রহণ করে শ্মশানঘাটের জমি বেশ বড় করে নেয়। বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট অনুসারে জন্মমৃত্যুর হিসেব রাখবার ব্যবস্থা করতে হল। ডেথ রেজিস্টারও নিযুক্ত করতে হল। যে স্থানে মৃতদেহ দাহ করা হয়, সেই স্থান আনুমানিক ৭৫´ x ৭৫´ ঘিরে দেওয়া হয় লোহার ফ্রেমের উপর ছয়ফুট করোগেটের টিন দিয়ে ঘেরা, নিচটা প্রায় ১ ইঞ্চি মাটি থেকে বাদ দেওয়া হয়। ঐ ঘরের মধ্যে ৬টি চুল্লি (উনুন) করে দেওয়া হয়, চার কোণে চারটি এবং মাঝে দুটি মৃতদেহ নিয়ে যাবার জন্য ৬ ইঞ্চি লম্বা একটা টিনের গেট করা হলো, তার দুপাশে

এক চালা টিনের ছাউনি দিয়ে ঘর করা হল। একটিতে রেজিস্ট্রি অফিস ও আর একটিতে মৃতদেহ দাহ করতে যারা নিয়ে আসবেন তাদের বসবার জায়গা। শ্মশানের মধ্যে যাবার পথে ঢুকতে বাঁদিকে একটা কাঠের দোকান এবং শবদাহ করতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখার ঘর এবং তার পাশে ডোম বা চণ্ডালদের থাকবার ঘর। এটাই হলো প্রথম দিকের ব্যবস্থা। তারপর ক্রমে ক্রমে উন্নত হয়েছে এবং পাকাপাকি ভাল ব্যবস্থা মিউনিসিপ্যালিটি করেছে। রাস্তাঘাট, বৈদ্যুতিক আলো ইত্যাদি করেছে। শ্মশানের শেষে অর্থাৎ গঙ্গার ধারে যে ১০০ ফুট লম্বা বেশ চওড়া ঘাট দেখা যায়, বজবজের মিউনিসিপ্যালিটি করেছে আনুমানিক ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে। প্রথমে একজন ব্রাহ্মণ কাম ডেথ রেকর্ডার ও একজন ডোম পৌরসভা নিয়োগ করে। অনেককাল এই একজন নিয়েই শ্মশানঘাট চলেছে। ১৯৭০/৭১ সালে একজন ব্রাহ্মণ সহ চারজন মৃত্যুর হিসাব বা শ্মশান পরিচালনার জন্য পৌরসভা নিয়োগ করে। পৌরসভায় ব্রাহ্মণের পদ না থাকায় বর্তমানে চারজনই ডেথ রেকর্ডার। বর্তমানে প্রতিদিনে গড়ে সৎকার হয় ৪/৫টি মৃতদেহ। কাঠেব চুল্লির (বর্তমান দুটি) কাঠ ইত্যাদি সহ বৈদিক নিয়মের সরঞ্জাম এবং ব্রাহ্মণ সরবরাহের দায়িত্ব পৌরসভা নিজে না করে একজন ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমেই চালান। কাঠের চুল্লিতে জনসাধারণের মৃতদেহ পিছু খরচ পড়ে ৪৫০ টাকা। মৃতদেহ দাহ করার পর মৃতের নাভিকুণ্ডলী হুগলি নদীর তীরে পুঁতে দেওয়া হয়। মৃতের স্বজনের অনেকই শ্মশান সংলগ্ন মন্দিব চত্বরে মৃতের স্মরণে স্মৃতিফলক বা অনুদানশিলা রেখে যান। যেমন একটা অনুদান শিলায় লেখা দেখি—'বেদনার বেদীতলে বসে/স্মৃতির স্মরণী বেয়ে মন/ছুঁতে চায় তোমাদের চবণ'। জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর ঘটনা অমৃতসরকে যেমন রাজনৈতিক পীঠস্থানে পরিণত করেছে, বজবজে কামাগাটামারু জাহাজের বৃটিশবন্দী ভাবতীয়দের শহীদ (সরকারি হিসাবে ২০ জন) হওয়ার ঘটনা বজবজকেও পরিণত করেছে শদীহতীর্থে। ৪কথিত, এই মৃত শহীদের রাতারাতি বজবজ শ্মশানঘাটে দাহ্ কবা হয় (১৯১৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর)। বজবজ পৌরসভা পরিচালিত হুগলি নদীর পূর্বপারের এই শ্মশানে বজবজ এবং তৎসংলগ্ন প্রায় ৮টি থানার (বিষ্ণুপুর, ফলতা, মহেশতলা, নোদাখালি, ফলতা, ডায়মন্ডহারবার, উলুবেড়িয়া, বাউরিয়া প্রভৃতি) বহু লোকজন তাদের শবদাহ সৎকারের জন্য নিয়মিত এই শ্মশানটি ব্যবহার করেন এবং গঙ্গার ওপারের হাওড়া জেলা (উলুবেড়িয়া, বাউরিয়া) থেকেও বহু লোক এই শ্মশানঘাটটি ব্যবহার করেন। কিন্তু এতদিন এই শ্মশানটিতে কাঠের চুল্লিতেই শবদাহ করা হত। বর্ষার সময় কাঠের চুল্লিতে শবদাহ অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। কাঠের চুল্লিতে প্রায় প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা পাওয়া যায় না। তাই শবদাহ প্রায়শই সম্পূর্ণ হয় না। অসম্পূর্ণ বর্জ্যপদার্থ গঙ্গায় ফেলা হত, এছাড়া কাঠের চুল্লিতে শবদাহ করলে যথেষ্ট পরিবেশ দূষণ হয় এবং কাঠ ব্যবহারের জন্য অনেক গাছ কাটা হয়। ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়, অত্যধিক গাছ কাটার ফলে কম বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হয়ে থাকে। যাব ফলে নদীতে দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাই গঙ্গাদূষণ সমস্যার গভীরতা উপলব্ধি করে ও নদীর জলের

গুণগত মান পরীক্ষা করার গুরুত্ব অনুভব করে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে গঙ্গা দূষণরোধ প্রকল্পে (দ্বিতীয় পর্যায়) বজবজ পৌর শ্মশানঘাটে তৈরি হয়েছে অতি আধুনিক একটি বৈদ্যুতিক চুল্লি। এই কার্য করার জন্য তৎকালীন পৌরপ্রধান ভুলুকান্তি সরকারের বোর্ডে ১৬ই জুন ১৯৯৭ তারিখে প্রয়োজনীয় জমি কে.এম.ডি.এর নিকট হস্তান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে প্রয়াত পৌরপ্রধান শৈলেন ঘোষের দ্বারা বিগত ১২ মার্চ, ২০০১ তারিখে এই বৈদ্যুতিক চুল্লির শিলান্যাস করা হয়। এক চুল্লি বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক শবদাহ গৃহের জন্য ব্যয় হয়েছে ৭৩ লক্ষ টাকা এবং শ্মশান সংলগ্ন ঘাট ও তৎসংলগ্ন নদী তীরের বিকাশ সাধনের জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা এবং নদীর তীর উন্নয়নের জন্য প্রায় ১৩ লক্ষ টাকার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের মূল উদ্দেশ্য হুগলি তথা গঙ্গানদীর অববাহিকা শহরগুলির নোংরা, দূষিত ও বর্জ্যপদার্থ ইত্যাদি সরাসরি নদীর জলে ফেলা থেকে বিরত থাকা। এই প্রকল্পের আওতায় শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি নির্মাণ সহ সব শ্মশানযাত্রীদের বিশ্রামাগার ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য চুল্লিটি ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস থেকে কাজ করছে। যাবতীয় নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। বৈদ্যুতিক চুল্লিতে মৃতদেহ পিছু সৎকারে ধার্য ৫০০ টাকা। প্রতি মাসে গড় মৃতদেহ প্রায় ১২০/১২৫টি কাঠে। ২৫/৩০টি। পৌরসভাকে বিদ্যুতের বিল দিতে হয় ৮০,০০০ টাকা প্রতি মাসে। বর্তমানে ভরতুকিতে চলছে। গঙ্গার পূর্বতীরে দক্ষিণভাগে ২০/২৫ মাইলের মধ্যে পরপর তিনটি কালীবাড়ি উত্তরে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি, মধ্যে কালীঘাটের কালীবাড়ি, দক্ষিণে এই বজবজের শ্মশান কালীবাড়ি। উত্তরে ভবতারিণী, মধ্যে 'কালিকা' দক্ষিণে 'ব্রহ্মময়ী খুকি মা'। এই শেষ মা যিনি ছিলেন কমলাকান্তের উপাস্য, পূর্ণানন্দ স্বামীর সাধনগুণে প্রাপ্তা দেবী, দয়ালের দয়াময়ী মা। দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট ও বজবজ ঐ সীমিত পরিধির মধ্যে যেন 'মায়ের ত্রিনয়ন'।

বজবজের এই মহাশ্মশানে চিতা বহ্নিমান। গঙ্গার অসংখ্য ঢেউয়ের আছড়ে পড়া ক্রন্দন ধ্বনি ক্ষণিকের জন্য আমাদের মনকে বৈরাগী করে তোলে। শ্মশান চিতার বুক থেকে ঝলকে ঝলকে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে দেয় বাতাসে এক বিষণ্ণ গন্ধ। তারই মাঝে ভেসে আসা গন্ধরাজের সুমিষ্ট আঘ্রাণ ভরিয়ে তোলে মন্দিরের পরিমল পরিবেশ। অনতিদূরে মন্দির প্রাঙ্গণ সংলগ্ন বিটপী বিতানছায়ে সদ্য গঙ্গাধারাস্নাত মন্দিরস্থিত শিবলিঙ্গ, আর এক মন্দিরস্থিত রাধামাধব লক্ষ্মীনারায়ণ বৈষ্ণব-শাক্ত-শৈবের সাধনাসিদ্ধ পূত-পবিত্র এই শ্মশানঘাট গঙ্গার কলধ্বনির অনুরণনে গীত হয় মায়ের মঙ্গলারতি। যেখানে মহাশ্মশানে সদাজাগ্রত কালভৈরব।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার আদিগঙ্গা তীরবর্তী শ্মশান ঃ

দঃ ২৪ পরগনার হিন্দুদের কাছে পবিত্র নদী আদিগঙ্গা। তার তীরবর্তী শ্মশান মহাপুণ্যভূমি।

১. চক্রতীর্থ শ্মশান : রায়দীঘি থানা। পুরনো দিনের শ্মশান। লোকবিশ্বাস ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও শক্তির অবস্থান। পুরনো প্রথা এখানে দাহ করলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়।

২. **কৃষ্ণচন্দ্রপুর শ্মশানক্ষেত্র** : রায়দীঘি থানা। কৃষ্ণচন্দ্রপুর-আটেশ্বর যাবার পথে পড়ে।

৩. **যজ্ঞবাড়ি শ্মশান** : কলেরা, বসন্ত রোগে মৃতদের এখানে সমাধিস্থ করা হত।

৪. **দঃ বিষ্ণুপুর মহাশ্মশান** : তন্ত্রপীঠ, সর্বমঙ্গলা কালী এখানে অধিষ্ঠিতা।

৫. **মিত্রগঞ্জের শ্মশান** : জয়নগর। কালীমন্দির। তোরণদ্বারে শিবমূর্তি।

৬. **বুড়োর ঘাট শ্মশান** : মজিলপুর। দ্বারির জাঙ্গালের পাশে।

৭. **বহড়ু বিশ্ব জাঙ্গাল** : কলুর মোড় থেকে বহড়ু স্টেশন যাবার পথের পাশে।

৮. **ময়দা কালীবাড়ির শ্মশান** : ময়দা নামটি পর্তুগীজ শব্দ থেকে গৃহীত।

৯. **দ. বারাশত শ্মশান** : চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রীমন্ত সদাগর এখানে বারা পূজা করেছিলেন। অনাদি শিব, কালী মন্দির ও সমাধি (গির্জা) আছে।

১০. **গোড়েরহাট শ্মশান** : মাতলা নদীর তীর থেকে দঃ বারাশত দীর্ঘজনপদের শবদাহক্ষেত্র।

১১. **বেড়িয়া চণ্ডী ও খাকুড়দহ শবদাহ ক্ষেত্র** : এই দুটি গ্রামের শ্মশানক্ষেত্র।

১২. **মুলটা শ্মশান** : মগরাহাট থানা। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লেখ পাই।

১৩. **গড়িয়া মহাশ্মশান** : গড়িয়া বাজাবের পাশে, আদিগঙ্গার তীরে। সোনারপুর থানা।

১৪. **রাজপুর শ্মশান** : রাজা মদনরায়ের সমকালীন। রাজপুর বাজারের পাশে আদি গঙ্গার তীরে। লৌকিক দেবী নারায়ণীর অবস্থান হেতু লোকে নারায়ণীর শ্মশানঘাটও বলে।

১৫. **ছত্রভোগ শ্মশান** : মথুরাপুর থানা। রায়মঙ্গল, চৈতন্য চবিতামৃতে এই স্থানের উল্লেখ মেলে। ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির আছে।

১৬. **জগৎঘাট শ্মশান** : লৌকিক নাম-জুগদোঘাট। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লেখ আছে। পাশেই শ্মশান।

১৭. **কাকদ্বীপ শ্মশান** : কাকদ্বীপ থানা। মন্দির আছে।

১৮. **সিরিটি শ্মশান** : সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের পারিবারিক শ্মশান। পূর্ব বড়িশায় আদি-গঙ্গার তীরে। দ্বাদশ শিব মন্দিরসহ করুণাময়ী ঘাট। কালীমন্দির। এখানে বিশিষ্ট অভিনেতা শম্ভু মিত্রকে দাহ করা হয়।

কিছু উল্লেখযোগ্য সমাধিভূমি বা কবরস্থান :

১) বজবজ বেরিয়াল গ্রাউন্ড বা কবরস্থান : বজবজের আদিকাল থেকেই শ্মশানভূমি ও কবরস্থান দুইই ছিল। মিউনিসিপ্যালিটিব যখন প্রতিষ্ঠা হল তখন ঐ স্থান দুটি তার এক্তিয়ারভুক্ত হয় ও তার নিয়ন্ত্রণে আসে। হিন্দুদের সাধারণ বার্ণিংঘাট (সরস্বতী শ্মশানঘাট) তো ছিলই মুসলমানরা প্রধানত নিজ নিজ জমি বা এলাকার মধ্যে কবর দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। ইতিমধ্যে মুসলমানদের জন্য একটি জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এই জমিটি বজবজ থানার সন্নিকটে। জমি বৃহৎ থাকায় তার অল্প কিছু অংশ খ্রিস্টান ও অল্প কিছু অংশ হিন্দুদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। হিন্দুদের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে বৈষ্ণবদের মৃতদেহ কবরস্থ করার রীতি

আছে, তাছাড়া দুবছর বয়সের কম হিন্দু শিশুদের মৃতদেহ মাটিতে মাটিতে পোঁতাই সাধারণ নিয়ম। খ্রিস্টান ও হিন্দুদের অংশকে প্রাচীর দ্বারা স্বতন্ত্র করা হয়। বেশি অংশটাই মুসলমানদের কবরস্থান। তবে মুসলমানদের মধ্যে প্রাইভেট বেরিয়ালের প্রবণতা অল্প বিস্তর বজায় থাকে। এ প্রকারের কোন লাইসেন্সহীন কবরস্থানের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি অসুবিধা বোধ করত। বিশেষত: মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পর তাকে সরকারি রিপোর্টভুক্ত করার। বার্নিংঘাট ও বেরিয়াল গ্রাউণ্ডের জন্য আইন নির্দেশে [বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টের ৪৪৫ (২) ধারা] দুজন ভিন্ন ভিন্ন সাব রেজিস্ট্রারকে নিযুক্ত কবতে হয়।

প্রায় ৬ বিঘে আয়তন বিশিষ্ট এই কবরস্থানে ধর্মীয় মতে যাদের পোড়ানো যায় না, (যেমন, বৈষ্ণব, খ্রিস্টান এবং বসন্ত রোগে বা সাপে কাটা মৃতদেহ এখানে কবরস্থ করা হয়।)

২) আছুর সমাধি : বজবজের কাছে আছিপুরের চিনাম্যান তলায় আছুব সমাধি। চিনাদের ভারতে পার রাখবার প্রথম ভূমি এই আছিপুর। এদেশে আসা প্রথম চিনা আছু (Atchew) বাটংআচু (Toug Achew)। আচুব নামানুসারে আছিপুর। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে আঙ-চু বা আছু বর্ধমান রাজার কাছ থেকে ৬৫০ বিঘে জমি বন্দোবস্ত নিয়ে ভাবতে প্রথম চিনির কারখানা স্থাপন করেন আছিপুর গ্রামে। কিন্তু কয়েক বছর পর আছুর মৃত্যুর পব তা উঠে যায়।

আছুর মৃত্যুর পরে নদীতীরে এক নির্জন ও লোকালয়হীন স্থানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। সমাধির উপর লাল সিমেন্ট করা এক অশ্বখুরাকৃতি সমাধিপ্রস্তর দেখতে অদ্ভুত লাগে। ভবতল (খিলান) দেওযালে একটি মার্বেল ফলকে চিনা অক্ষরে লেখা আছুর নাম। কলকাতার বহুসংখ্যক চিনা প্রতি বৎসর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে ঐ সমাধিক্ষেত্রে আসে। আছুর সমাধি, চিনা মন্দির ঘিরে প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হয় চিনা নববর্ষের নানা অনুষ্ঠান। কলকাতার চায়না টাউনের মতো এখানে নববর্ষের এত চাকচিক্য না থাকলেও কলকাতা ও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী চিনা আছিপুরে উপস্থিত হন। নদীর পাড়ে সমাধিস্থ আছু সাহেবের সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জাপন করেন। আছিপুরের চৈনিক সম্পর্ক ক্ষীণ হলেও তবু সে চিনাভূমি হয়ে বেঁচে আছে 'আছু সাহেবের সমাধি'।

৩) মুন্নাবিবির মতান্তরে মনিবিবির কবর বা সমাধি : দ. ২৪ পরগনা জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বেশ কিছু প্রাচীন সমাধি যেমন কুলপির হুগলি নদীর কাছে বারচালা স্থাপত্যরীতির সুপরিচিত মুন্নাবিবির কবর। প্রত্নতত্ত্ববিদ কালিদাস দত্তের মতে এটি জনৈক পতুর্গীজ রমণীর সমাধি। এর প্রতিষ্ঠাকাল ও উক্ত রমণীর কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। এই কবরটি ৩০০ বছরের বেশি পুরনো বলে অনেক গবেষক মনে করেন।

৪) সাহেব মেমের কবর : ডায়মন্ড হারবার থানার নূরপুরে নদীর ধারে একটি পুরনো পাতলা ইটের সমাধি চোখে পড়ে। স্থানীয় ভাষায় এটি সাহেব-মেমের কবর। কিছুটা ব্যবধানে সাহেব মেমের দুটি আলাদা ছোট স্মৃতিসৌধ। জনশ্রুতি দুজনেই জলে ডুবে মারা গিয়েছিলেন।

৫) ইউরোপীয় সমাধি : ডায়মন্ড হারবার শহরের নুনগোলায় ডায়মণ্ড ক্লাবের কাছে নদীর

গা ঘেঁষে ইংরেজ আমলের গোরস্থান। সেকালে নদীর ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় যদি কোনো বিদেশি বণিক বা ইংরেজ কর্মচারী অসুস্থ হয়ে পড়তেন, তাহলে তাঁদেরকে রোগমুক্তির জন্য সঙ্গে সঙ্গে ডায়মণ্ডহারবারের হাসপাতালে নিয়ে আসা হত। ১৮৭৩ সাল থেকে চালু হওয়া ডায়মণ্ডহারবারের হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের যাঁরা মারা যেতেন তাঁদেরকে সংরক্ষিত গোরস্থানে কবর দেওয়া হত। ওইসব কবরের ওপরে মৃত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা দেওয়া হত। একটি স্মৃতিফলকে মৃত্যুবৎসর খোদিত আছে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে। এই কবরটি মিস এগনিয়ুস উইটলালের কন্যার। উইলিয়াম হোরাট ডায়মন্ডহারবারের পোস্ট মাস্টার ছিলেন। কর্মরত অবস্থায় ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর ৫৮ বছর বয়সে মারা যান। এঁকেও এই কবরস্থানে সমাধি দেওয়া হয়। আর একটি পুরনো স্মৃতিফলক জনৈক থমসনের, যিনি মারা যান ১৭৯৫ এর ৬ অক্টোবর। ফলকটির ইংরেজি হরফ অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। শ্বেতপাথরের ফলকটিতে উৎকীর্ণ তথ্যটি এরকম —To the memory of Thomson who departed from this life 20th October, 1795, aged 30 years. This years Post master of this Harbour. Monument is erected by his ... Mrs. Mary Thomson.

ডায়মন্ডহারবারের ২০০ বছরের বেশি পুরনো ইউরোপীয় সমাধি সম্বন্ধে, 'Bengal Past and Presnet' গ্রন্থে লেখা আছে— "The clump of lofty Casuarina trees; through whose foliage the summer wind whispers the music of the ocean, will indicate to those who pass by in ships the place where lie so many of our race whose expectations of reaching their native land where at Diamond Harbour thwarted by the call to a far larger journey." [Bengal past & Present vol III, No 1 (Janu.-March 1909, P-159]. ২০০ বছর আগে এই অঞ্চল যে সুপ্রসিদ্ধ একটি বন্দর ছিল তা জানতে পারা যায়। কফিন ও ক্রুশের আদলে এখানে আরো কয়েকটি সমাধিফলকও রয়েছে, বিয়োগান্ত ব্যথার সুরে কিছু মর্মস্পর্শী গাথা সেখানে উৎকীর্ণ, হরফগুলো দ্রুত অস্পষ্ট হয়ে আসছে। ডায়মণ্ডহারবার পুরনো পোস্ট অফিসের কাছে আরও তিনটি কবর ছিল। বর্তমান সেচ বিভাগের বাংলোর সামনে আরও দুটি সমাধি ছিল। সেগুলি ভেঙে ফেলা হয়।

সেন্ট পিটার ক্যাথলিক চার্চের কবরস্থান আজও বিদেশিদের অবস্থিতির সাক্ষ্য বহন করে। সেচ বাংলোর আশেপাশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহেব কর্মচারীরা বাস করতেন। দঃ ২৪ পরগনার সম্ভবত সবচেয়ে পুরনো কবরখানা (অষ্টাদশ শতাব্দীর) শুধুমাত্র একক প্রচেষ্টায় ফ্রান্সিস দিবাকর হালদার আঁকড়ে ধরে রেখেছেন।

বৈষ্ণব সমাধি : মন্দির বাজার থানা এলাকার গোকুল নগরে বৈষ্ণব সমাধি বর্তমান। বারুইপুরের শাসন গ্রামে স্টেশনের কাছে দুজন ইংরেজের জীর্ণ ও আগাছা পরিবৃত ইটের নাতিউচ্চ দুটি পাশাপাশি সমাধিসৌধ প্রাচীনত্বের দিক থেকে উল্লেখের দাবি রাখে। ইটের কিছু প্রাচীন মুসলিম সমাধিও এই জেলায় লক্ষ করা যায়। এমন দুটি গ্রামের নাম মন্দিরবাজার

থানার টেকপাঁজা ও ডায়মন্ডহারবার থানার মরুইবেড়িয়া (১৭ বিঘের ১৫ কাঠা মুসলিম কবরস্থান) জাহাঙ্গীর গড়ের কয়েকটি সমাধি কালগত দিক থেকে শতাব্দী প্রাচীন। মথুরাপুর থানার পাটকেলবেড়িয়া গ্রামের বৈষ্ণবদের একটি সমাধিক্ষেত্র আছে। এছাড়া জেলার প্রত্যেক খ্রিস্টান ও মুসলিম ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় গোরস্থান বা কবরস্থান গড়ে তুলেছে। যেমনি, ঠাকুরপুকুর থানার খ্রিস্টান সমাধিস্থলের নামানুসারে কবরডাঙা, ঠাকুরপুকুরের দি চার্চ অফ দি এপিফ্যানির সমাধিস্থল, সেক্রেড হার্ট চার্চের সমাধি, বিষ্ণুপুর থানার, বিষ্ণুপুর শিক্ষাসংঘের খ্রিস্টান সমাধি, পিরতলার মুসলিম গোরস্থান, বজবজ থানার বিরলাপুরের কাছে জগৎবল্লভপুরে নদীর ধারে কবরস্থান, চাড়িয়ালের কবরস্থান, ক্যানিং থানার আলমপুর পোড়ের মাঠে যোল আনা কবরস্থান, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা নিয়ন্ত্রণাধীন কবরস্থান (৩টি)।

অন্যান্য শ্মশান :

এই জেলায় যত্রতত্র নদীধারে, খালপাড়ে অনেক শ্মশানঘাট গড়ে উঠেছে। সেকালে সংকার করার জন্য শ্মশান বা কবরস্থান সাধারণত গড়ে উঠত শহর বা গ্রামের শেষপ্রান্তে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে। কারণ শবদাহের পর জলের অত্যন্ত প্রয়োজন। গ্রাম বা শহরে নদীর অবর্তমানে সাধারণত পুকুরে বা কোনও জলাশয়ের বন্দোবস্ত থাকত শ্মশানের আশেপাশে। শ্মশান বা কবরস্থান সবসময় মানুষের বসবাসের ক্ষেত্র থেকে দূরেই নির্বাচিত হত। যাই হোক, আদিগঙ্গার তীরবর্তী নয়, এমন শতাব্দী প্রাচীন শ্মশানের মধ্যে, ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার কালীনগরের মহাবীর শ্মশান।

কালকামেড়িয়া শ্মশান : ডায়মণ্ডহারবার থানার অন্তর্গত সরিষা গ্রামের বহুদিনের (একশো বছরের বেশি) শ্মশান, স্থানীয় ভাষায় যার নাম কালকামোড়। স্থানীয় গ্রামাঞ্চলের মত মানুষজনদের এবং রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের (সরিষা) মহারাজদের সাধারণত এখানে দাহ করা হয়। পাশেই আছে মুসলিমদের কবরস্থান। শ্মশানের পাশেই গড়ে উঠেছে কালীমন্দির।

শ্মশানে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : সরিষার একদা বেনী বাগদির ঠেস আজকের দিনে আশ্রম মোড় যেখানে এককালে শ্মশান ছিল। শ্মশানের সংলগ্নস্থানে আজ বিবেকানন্দের ভাব-শিষ্যদের সাধনমন্দির ও শিক্ষামন্দির। বিষ্ণুপুর থানার উদয়রামপুর পল্লীশ্রী শিক্ষায়তন, নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়, বিদ্যানগর শিক্ষাসংসদের প্রয়াত শিক্ষাবিদ ও প্রকাশক হীরেন বেরা প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় শ্মশানের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যানগরের পোস্ট অফিসের 'চড়াশ্যামদাস' নাম সেই শ্মশানভূমির অস্তিত্ব জানান দেয়। বিদ্যানগর সংসদের সীমানার মধ্যে মুসলিম কবরস্থানের অস্তিত্ব এখনো বর্তমান।

শ্মশানে ডোমদের ভূমিকা : আমাদের জীবনের বিশেষ করে হিন্দুদের অন্তিম বন্ধু হল ডোম সমাজ। একসময় বর্ণাশ্রম প্রথা অনুযায়ী ডোমরা ছিল শবদাহের কাজে নিযুক্ত। ওরা সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ। পাশাপাশি ডোম সম্প্রদায়ের অপর ভাগ হল 'বাজুনিয়া' অর্থাৎ

যারা ঢাক, ঢোল বাজায় বা বেতের কাজ করে, যাদের সৃষ্টি বিত্তবানদের গৃহের শোভা বাড়ায় বা দেব-দেবীর পূজার কাজে লাগে। তবুও এরা আজও সমাজের অন্ত্যজরূপেই চিহ্নিত। খ্রিস্টীয় দশম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের সাহিত্য 'চর্যাপদ'-এ ডোমশ্রেণীর উল্লেখ আছে। চর্যাপদ কর্তাদের কাছে ডোমরা ছিল সহজিয়া সাধারণ অবধূতিকা নৈঋত দেবী। তন্ত্রসাধনায় শ্মশানের বীরাচারী প্রক্রিয়ায় ডোমরা ছিল সঙ্গী। এখনও তাই এই ধর্মীয় রীতির অবশেষ লক্ষ্য করা যায়। বলা বাহুল্য, 'শূন্য পুরাণের' রচয়িতা ছিলেন রামাইপণ্ডিত, ডোম সম্প্রদায়ের মানুষ। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামী জাতির জনক গান্ধীজী অভিহিত হরিজনদের একাংশ হল ডোমরা। স্বামী বিবেকানন্দ যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন, ডোমরা সেই শূদ্র কুলের অংশীদার। রবীন্দ্রনাথ ডোমদের বলেছিলেন 'মন্ত্রবর্জিত'।

গো-ভাগাড় :

এই জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট অসংখ্য শ্মশান ও ভাগাড় (যেখানে গরু, ছাগল প্রভৃতি মৃত গবাদি পশু ফেলে দেওয়া হয় যাদের দাহ বা কবর দেওয়ার সঙ্গতি নেই এবং সাধারণত শিশুদের কবরস্থ করা হয়) আছে, সেগুলির একটি সাধ্যমতো তালিকা দেওয়া গেল :

মামুদপুর মনসাতলা ভাগাড়, মামুদপুর কালীতলা ভাগাড়, কৃপারামপুর শ্মশান, মৌখালীর শ্মশান, পাথরবেড়িয়া শ্মশান, বিবিরহাট ভাগাড়, গগনগোহালিয়া কালীতলা শ্মশান, নিমতলা মহাকালী শ্মশান, মৌদির ভাগাড়, দঃ কন্যানগর ভাগাড়, বিষ্ণুপুর ছোট কাছারি শ্মশান, বিষ্ণুপুর বেরাপাড়া ভাগাড, ঝিকুরবেড়িয়া বড়কাছাবি শ্মশান, ধান্যশীষা শ্মশান, কাশীবাটী বলদের ভাগাড়, চন্দনদহ ভাগাড়, দাদপুরের ভাগাড়, দেউলী কালীতলা শ্মশান, বারদেউলী ভাগাড়, কালীচরণপুর গো-পড়া শ্মশান, গোবিন্দপুব কেওড়াতলা গো-শ্মশান, বোরহানপুর শ্মশান, তৌলী শিবপুর শ্মশান, নস্করপুর গো-ভাগাড়, মোহনপুর শ্মশান, বলদাঁড়ি ভাগাড়, বাওনালা ভাগাড়, উদয়রামপুর শ্মশান, জয়রামপুর কাশীবাটী শ্মশান, শুকদেবপুর শ্মশান, দঃ বাওয়ালী কালী শ্মশান, বাওয়ালী বারোকাছারি শ্মশান, গৌরীপুর ভাগাড়, রামকৃষ্ণপুর ভাগাড়, মীরপুব ভাগাড়, দৌলতাবাদ ভাগাড়, রজক গোহালিয়া ভাগাড়, ধোবাপাড়া গো-ভাগাড়, বলাখালীর ভাগাড়, দোসতিনার ভাগাড়, নগেন নস্করের ভাগাড়, চামনী প্যারী মণ্ডলের ভাগাড়, দঃ আলীপুব ভাগাড়, মড়াপোতা প্রভৃতি (বিষ্ণুপুর থানা)। শিরাকোলের কালীতলা শ্মশান, বাগাড়িয়া কালীতলা শ্মশান, মধুবাটির ভাগাড়, মনসার হাট ভাগাড় (উস্থিথানা)। রসপুঞ্জি ভাগাড়, রসপুঞ্জি চড়কতলা শ্মশান, রসপুঞ্জতে কাঁটপোড়া ভাগাড় (ঠাকুবপুকুর থানা), আলমবিবির চড়া (ফলতা থানা), নুঙ্গি শ্মশান (বজবজ থানা), হোটরের ভাগাড় (মগরাহাট), ঘোষের হাট ভাগাড় (মথুরাপুর থানা), রাজপুর গ্রামের রাখালঠাকুর তলার পার্শ্ববর্তী খালের ধারে প্রায় ২৫০ বছরের প্রাচীন ভাগাড় অবশিষ্ট উল্লেখযোগ্য।

তথ্যসূত্র :

১ বজবজের ইতিহাস—শ্রী নকুড়চন্দ্র মিত্র

২ বজবজের ইতিবৃত্ত—শ্রী কেশব মিত্র

৩ বজবজ চিত্রগঞ্জ কালীবাড়ি—শ্রী নকুলচন্দ্র মিত্র

৪ ডায়মণ্ডহারবারের আঞ্চলিক ইতিহাস—নীলবতন মণ্ডল

৫ প্রবন্ধ। দঃ ২৪ পরগনার লৌকিক দেবদেবী, বিবিগাজী, পিরপিরানী ও লোকসমাজ—ধূর্জটি নস্কব (পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, দঃ ২৪ পরগনা জেলা সংখ্যা, মার্চ ২০০০)

৬. প্রবন্ধ। দঃ ২৪ পরগনা ও প্রত্নতত্ত্ব একটি রূপরেখা—সাগর চট্টোপাধ্যায় (পঃবঃ পত্রিকা, দঃ ২৪ পবগনা জেলা সংখ্যা মার্চ, ২০০০)

৭ বেহালা জনপদের ইতিহাস—সুধীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অস্থি স্তম্ভ

. . . .

পূর্ববঙ্গে দেখিলাম শবদাহের নির্দিষ্ট কোন স্থান নেই। এদেশে শ্মশান বলিয়া যেমন একটি স্থান আছে, পূর্ববঙ্গে তেমন নাই। যে যার নিজের বাটীতে শবদাহ করে এবং যেখানে শবদাহ হয় সেই স্থানে একটি তুলসীমঞ্চ করিয়া দেয় কেহ বা মাটির ঢিপি করে কেহবা পাকা ইটের গাঁথনি করে। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা কেহ কেহ শবদাহ স্থানে মঠবাড়ি করিয়া দেয়। চিনির মঠ যেমন দেখতে হয়, অনেকটা সেই আকৃতির, অর্থাৎ গীর্জার চূড়ার মত খুব একটা উঁচু স্তম্ভ এবং তাহার গোড়াতে একটা গর্ত থাকে সেখানে প্রদীপ দেয়।

ভুবনেশ্বরে এক দীঘির ধারে ঐরূপ ছোট ছোট অস্থি স্তম্ভ আছে, অনেকগুলি। এই তো হ'ল পবিদৃশ্যমান ব্যাপার। কিন্তু কেন এই সব হইয়াছে এ বিষয়ে প্রশ্ন হইতে পারে। তুলসী গাছ যে কবে থেকে ঠাকুর হল, এটা ঠিক বলিতে পারিতেছি না। পুরাণের গল্প এ বিষয়ে ঢের আছে, সে সকলেই জানে। সে সব অতি আধুনিক। ও-সব মেয়েদের ঠকাবার গল্প। কিন্তু তুলসী গাছের প্রতি এত শ্রদ্ধাভক্তি কেন হ'ল এবং কোন সময় হ'ল তাহা ঠিক নির্ণয় করা যায় না। তবে মঞ্চটার বিষয়ে কিছু বলিবার আছে। প্রাচীন কালে মৃতদেহ সৎকার করা হইত এবং অস্থি গঙ্গাজলে ফেলিয়া দেওয়া হইত। ইহাকে অগ্নিসংস্কার বলা হইত। কোন কোন স্থলে মৃতদেহ গঙ্গাজলে ফেলিয়া দেওয়া হইত। ইহাকে জলসমাধি বলিত। বৃন্দাবনে ও হরিদ্বারে জলসমাধির প্রথা আছে। তবে রাজপুতানা, সিন্ধু প্রভৃতি দেশ হইতে অস্থি আনিয়া পূজাদি করিয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করে।

❑ কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা — মহেন্দ্রনাথ দত্ত / ২য় সংস্করণ / ১৯৭৫

❑ লেখক পরিচিতি—গবেষক, প্রাবন্ধিক, সহ সম্পাদক, স্বদেশচর্চা লোক।

বিড়লাপুর ও কালীনগরের মহাবীর শ্মশান

অমিয় দাস

"হরি দিন যে গেল, সন্ধে হল, পার কর আমারে—।" প্রত্যেকের জীবনে এমন একটা বাসনা অবশ্যই দেখা দেয়। পার করার মালিক 'হরি'। তবে পড়ে থাকে দেহ। দেহ তো খাঁচা। প্রাণপাখি উড়ে গেলে খাঁচার একটা সুব্যবস্থা হওয়া দবকার। প্রয়োজন তখন একটা প্লাটফর্মের যার পোশাকি নাম শ্মশান। এখানেই হয় মরদেহের শেষকৃত্য।

শেষকৃত্য বা শবদাহেব জন্য প্রাচীনকাল থেকেই বেছে নেওয়া হত নদীর পাড়। নদী আমাদের মা। চিতাভস্ম নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয় অথবা জোয়ারের জল এসে সবকিছু ধুয়ে মুছে করে দেয় পরিষ্কার পবিচ্ছন্ন। এ যেন মায়ের ছেলেব মায়েব কোলে ফিরে যাওয়া। আব শেষকৃত্যের পর শ্মশানবন্ধুবাও স্নান করে ফিরতে পারে।

আমাদের আলোচ্য বিষয এক অখ্যাত শ্মশান যাব পরিচিতি রয়ে গেছে অনেকের অগোচরে। আলোচনার মশালে তাকে উজ্জ্বল করাই আমাদেব লক্ষ্য। আমরা বলতে চাইছি বিড়লাপুব শ্মশানের কথা। তবে তাব আগে প্রয়োজন একটু গৌরচন্দ্রিকা।

বাওয়ালী একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। আগের ঠিকানা —থানা বজবজ, ২৪ পরগনা। আর বর্তমান ঠিকানা—থানা নোদাখালি, দঃ ২৪ পরগনা। সে এক সময় ছিল। তখন ছিল জমিদারী প্রথা। সে সময় এক ডাকে সকলেই চিনত বাওয়ালীকে। বৈষ্ণব সংস্কৃতি আর ভাস্কর্যেব বাজধানী ছিল বাওয়ালী। কলকাতার টালিগঞ্জে এখনও আছে নবরত্ন মন্দির। এই মন্দির শকাব্দ ১৭১৮, বঙ্গাব্দ ১২০২ অর্থাৎ ইংরেজি ১৭৯৬ সালে নির্মিত হয়। বাওয়ালীর জমিদার বংশের অন্যতম কৃতী সন্তান রামনাথ মণ্ডল মহাশয় এটির প্রতিষ্ঠাতা। একসময় এঁদের জমিদারী কলকাতার খিদিরপুর থেকে দক্ষিণে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এঁবা বাওয়ালীতে অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এখন বেশিরভাগ মন্দির কালের প্রবাহ নিশ্চিহ্ন। এখনও কিছু মন্দির আছে। তবে মেরামতির অভাবে তা জীর্ণ।

বাওয়ালী জমিদার বংশের আর এক জমিদার প্যারীলাল মণ্ডল মহাশয় শকাব্দ ১৭৫৩ বঙ্গাব্দ ১২৩৮, ৩১ আষাঢ় অর্থাৎ ইংরাজি ১৮৩১, ১৪ জুলাই শিল্পী মদনমোহনের দ্বারা শ্রীশ্রী বাধাশ্যাম ঠাকুর জিউর মন্দির নির্মাণ করান। এই মন্দিরের জন্য সম্পত্তি ছিল বাওয়ালী-চণ্ডীপুর থেকে দু-মাইল দূবে হুগলি নদীর তীরে শ্যামগঞ্জে। ঠাকুরের নামেই এই এলাকার নাম ছিল শ্যামগঞ্জ। পরবর্তীকালে এই সম্পত্তি বিক্রি হয়ে যায়। সেখানেই গড়ে ওঠে বিড়লাপুর জুট মিল। আর স্থানের নাম বদল হয়ে হয় বিড়লাপুর। বিড়লাপুরের দক্ষিণে রায়পুর। বিড়লাপুর এবং রায়পুরের মধ্যবর্তী অংশ চড়া অর্থাৎ উঁচু। সেজনাই অনেকে বলে থাকেন এই অংশকে চড়া রায়পুর।

রায়পুর এবং বিড়লাপুরের মধ্যে যাতাযাতের জন্য আছে বাঁধ। নদীতে জোয়ারভাঁটার সময় জলের উচ্চতার পরিবর্তন ঘটত একুশ ফুট। ইংরেজ আমলে বাঁধটির উচ্চতা বাড়িয়ে করা হয় তেইশ ফুট। উদ্দেশ্য—পুবদিকের চাষের জমি এবং জনবসতিকে রক্ষা করা। বাঁধের পশ্চিমে

হুগলি নদী। এই নদী বরাবর উত্তরে গেলে পৌঁছে যাওয়া যায় কলকাতায়। আর দক্ষিণে ফলতা, নুরপুর, ডায়মন্ডহারবার হয়ে কাকদ্বীপ আর সাগর। নদীর পশ্চিমে হাওড়া জেলা। বিড়লাপুর এবং রায়পুর থেকে বাসযোগে কলকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

বিড়লাপুর এবং রায়পুরের মধ্যে আছে তিন ফটক যুক্ত একটা স্লুইসগেট। পুবদিকের জনবসতির অনেকেরই জীবিকা নদীতে মাছ ধরা। বেশিরভাগ লোকের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। আগে যে বাঁধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে বীতমণির বাঁধ। মাঝামাঝি অংশে আছে কালীমন্দির। কালীমন্দির সংলগ্ন এলাকা কালীতলা নামে পরিচিত।

বিড়লা জুটমিল চালু হওয়ার পর এলাকায় আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। পরবর্তীকালে ক্যালসিয়াম কারবাইড, লিনোলিয়ম প্রভৃতির কারখানা গড়ে উঠেছে কোম্পানির তত্ত্বাবধানে।

চড়া রায়পুরের উঁচু বাঁধে হয়তো একসময় মৃতদেহ দাহ করা হত। সময় এগিয়ে চলে। লোকসংখ্যা বাড়ে। শ্মশানের গুরুত্বও বাড়তে থাকে। তখন মৃতদেহ দাহ করতে গেলে বাইরে থেকে কাঠ সংগ্রহ করে আনতে হত।

গত শতাব্দীর শেষার্ধ। বিড়লা জুট মিলের ম্যানেজার ছিলেন থিরানী সাহেব। তাঁরই উদ্যম, সহযোগিতা এবং প্রচেষ্টায় বিড়লাপুর শ্মশানের উন্নয়ন ঘটে। কালীতলার কালীমন্দিরে কালীপূজা হয়। একসময় এই জায়গার পশ্চিম অংশ ধসে নদীগর্ভে চলে যায়। কাঠা দুয়েক জায়গা কোম্পানির খরচে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। নির্মাণ করা হয়েছে চুল্লি। নদীতে নেমে স্নান করা আর জলতোলার জন্য একটা ঘাটও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। মৃতদেহ দাহ করার আগে কিছু করণীয় বা কৃত্যালি অবশ্যই থাকে। সেজন্য ব্রাহ্মণও আছেন। আগে কাঠ কেনার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। বর্তমানে কাঠের দোকানও হয়েছে।

মাইল কয়েক দূরে আছে আধুনিক সুব্যবস্থায় সুসজ্জিত বজবজ শ্মশান। এখানে বর্তমানে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে মৃতদেহ দাহ করা হয়। তুলনায় বিড়লাপুর শ্মশানের পরিচিতি কম। নাইবা থাকল প্রচার বা পরিচিতি, তবুতো আছে এর অবস্থিতি। এখানে খরচ নামমাত্র। ডেথ সার্টিফিকেট এখনও এখানে আবশ্যিক হয়নি। আধুনিক নিয়মকানুন চালু হলে এই শ্মশানের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে বাড়বে।

অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির শেষকৃত্য এখানে হয়েছে সুসম্পন্ন। ভবিষ্যতে এর নাম আরও ছড়িয়ে পড়বে। ফুলের রাজত্বে অপরাজিতা ফুল পরাজিত। তবু নাম অপরাজিতা। এক সময়ের চড়া রায়পুরের শ্মশান বর্তমানে বিড়লাপুর শ্মশান। শ্মশান তো স্টেশন। "সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা"—সাধনোচিত ধামে সকলকেই যেতে হয়। যাওয়াটাই বড় কথা—কোন্ স্টেশনের যাত্রী তা আবশ্যিক নয়।

মহাবীর শ্মশান

জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম মহকুমা হল ডায়মন্ডহারবার। ডায়মন্ডহারবার থানার উত্তরে ফলতা থানা, দক্ষিণে কুলপি, পুবে মগরাহাট আর পশ্চিমে হুগলি নদী। হুগলি নদী-তীরের নুরপুর, নীলা, রামনগর, নয়নান, বিশরা প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে থানার পশ্চিমপ্রান্ত।

উত্তরপ্রান্তে আছে সাহালামপুর, বরদা, ভাদুড়া, আয়াসবেড়িয়া, আমিরা, ঝিঙ্গা, মশাট। পুবে আছে কুলেশ্বর, রাধাবল্লভপুর, সুলতানবাগ, নেতড়া, মালঞ্চ, উত্তর ও দক্ষিণ শেওড়দা আর হট্টগঞ্জ। শহর ডায়মণ্ডহারববারের আদি নাম ছিল হাজিপুর। ইংরেজি শব্দ 'Harbour' এর বাংলা 'পোতাশ্রয়'—জাহাজ নির্বিঘ্নে নোঙর করে থাকার আশ্রয়। পোতাশ্রয় হিসাবে আদর্শ বলেই হয়তো বা হাজিপুর নতুন নামের অলঙ্কার গায়ে চড়িয়ে হয়েছে ডায়মণ্ডহারবার। এই হাজিপুর এই থেকেই হুগলি নদীর একটি প্রশস্থ খাল ক্রমশ পুব ও উত্তরমুখি হয়ে মগরাহাট থানায় প্রবেশ করেছে। হুগলি নদীর জল এই খাল দিয়ে জনপদে প্রবেশ করে কৃষিজমিকে করেছে শস্যপূর্ণ। জল নিয়ন্ত্রণের জন্য আছে স্লুইস গেট। খাল ধরে পুবে এগিয়ে গেলেই খালের দক্ষিণে কালীনগর গ্রাম। তার বিপরীতে খালের অপর প্রান্তে আছে হরিণডাঙ্গা, ভগবানপুর আর বাহাদুরপুর।

কালীনগর গ্রামের পূর্বপ্রান্তে খালের পাশে আছে ঐ গ্রামের মহাবীর শ্মশান। কে এই মহাবীর? আগ্রহী পাঠক অবশ্যই তরুণ গবেষক নীলরতন মণ্ডল মহাশয়ের লিখিত ''ডায়মন্ডহারবারের আঞ্চলিক ইতিহাস'' গ্রন্থটি পাঠ করতে পারেন।

শ্মশান হল মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল। কেউ কেউ মনে করেন সাধনোচিত ধামে যাবার শেষ স্টেশন। ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষই এখানে পরমবন্ধু। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি গ্রন্থ ''চর্যাপদ' এ ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের উল্লেখ আছে। মহাবীর মল্লিক এঁদেরই একজন। ডায়মণ্ড হারবার মহকুমা শহর। থানার কাছাকাছি এলাকায় একসময় ছিল ডায়মন্ডহারবার হাসপাতাল ' কালক্রমে মানুষের সংখ্যা বাড়ে, বাড়ে রুগিব সংখ্যা। তাই নতুন পোলের কাছে এখন স্থানান্তরিত হয়েছে ডায়মন্ডহারবার হাসপাতাল। আয়তনে, আভিজাত্যে আর গুরুত্বে অনবদ্য। ডায়মন্ডহারবার পুরাতন হাসপাতালের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন মহাবীর মল্লিক। তিনি ঐ হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী ছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি দায়িত্ব পালন করতেন। হাসপাতালে মিলত এমন অনেক মৃতদেহ যার কোন দাবিদার ছিল না। সেই সমস্ত মৃতদেহ মহাবীর কালীনগরের শ্মশানের দাহ করতেন অথবা পুঁতে দিতেন শবটিতে। এই শ্মশানের অপর নাম মহাবীরের চড়া। শ্মশান অবস্থিত খাল পাড়ে। খালেব বুকে পলি জমে জমে চড়া তৈরি হয়। সেই চড়ার মধ্যে গর্ত করে মৃতদেহ পোতা হত। সেজন্যই এই শ্মশানের অপর নাম মহাবীরের চড়া।

ডায়মন্ডহারবার রেলস্টেশনের পাশ দিয়ে নেমে গেছে পিচের রাস্তা। কালীনগর গ্রাম ছুঁয়ে ঐ রাস্তা পরপর গুরুদাসনগর, বোড়িয়া, বোলসিদ্ধি, বারদ্রোন, কানপুর হয়ে পৌঁছেছে হট্টগঞ্জে। স্টেশন থেকে একটু দূরে রাখাল ঠাকুরের ঠাকুরঘর। আর একটু এগিয়ে বাঁকের মুখে কালীনগর শ্মশান। শ্মশানটি অতি সাধারণ আধুনিক ব্যবস্থাপনা নেই বললেই হয়। তবুও এর গুরুত্ব

অসীম, বিশেষ করে দাবিদার হলে মৃতদেহের কাছে।

দক্ষিণ বিষ্ণুপুরে বা কালীঘাট শ্মশান বা বজবজ এর সরস্বতীর শ্মশানের মত এব খ্যাতি নেই। না থাক। হোক এ মাটির প্রদীপ। তবু তো আছে. সূর্য ডুবলে বা হঠাৎ লোডশেডিং হলে যেমন থাকে মাটির প্রদীপ অন্ধকার দূর করতে। খরচ নামমাত্র। কালীনগর গ্রাম এখন তো ডায়মণ্ডহারবার মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে। মহাবীর এখন নেই, থাকার কথাও নয়। এই শ্মশানের দায়দায়িত্ব এখন নতুনদের হাতে। শ্মশানে আছে ছোট্ট একটা ঘর। আছে দেবী মন্দিরও। পূজাও হয়। চড়ায় গড়ে উঠেছে মাঠ। মাঠে ছেলেদের খেলাধূলা করতে দেখা যায়। পাশে আছে মুসলমানদেব কবরস্থান। আর আছে একটা বাঁধানো শানের ঘাট। পবিষ্কার জল। লোকে স্নানও করে।

১৯৩০ সাল। গান্ধিজীর লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারা ভারতে। তার ঢেউ আছড়ে পড়ে বাংলায়ও। অবিভক্ত ২৪ পরগনা অধুনা দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মণ্ডহারবার থানার নীলা গ্রামের তরুণ যুবক আশুতোষ দলুই প্রথম শহীদ হলেন লবণ সত্যাগ্রহের আন্দোলনে। সময়টা ২৪শে এপ্রিল, ১৯৩০ সাল। এই মহাবীর শ্মশানেই আশুতোষ দলুইএর শেষকৃত্য সম্পাদিত হয়।

সময় বদলাচ্ছে। উন্নয়নের হাত ধরে দেশ চলেছে এগিয়ে। আধুনিক সুযোগসুবিধা এই শ্মশানে সহজলভ্য হয়ে উঠুক—এই প্রত্যাশা।

ঋণস্বীকার · ডায়মণ্ডহারবারের আঞ্চলিক ইতিহাস--নীলরতন মণ্ডল।

☐ লেখকপরিচিতি—গবেষক, প্রাবন্ধিক।
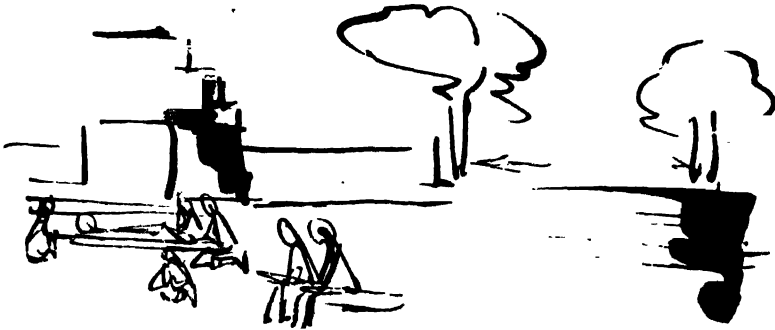
জয়নগরের বিখ্যাত শ্মশান ঃ গোড়ের হাট

প্রদীপকুমার বর্মন

'শ্মশান' শব্দটা যেন গভীর রহস্যময়। এই স্থান-নামের বিচিত্র অনুভূতি আমরা পাই মানুষের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গিতে। কেউ কেউ শ্মশান নামক শেষ ঠিকানায় পৌঁছোবার ব্যাকুল আশায় অনন্ত প্রহর গোণে। আবার কেউ কেউ ও-কথা শুনলে চমকে ওঠে। অকালে সন্তান অথবা স্বামী হারানো রমণীরা শ্মশানকে সর্বনাশী রাক্ষসী অভিধায় অভিহিত করে। আবার অনেকে যন্ত্রণাময় জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে মৃত্যু ও শ্মশানকে পরম মুক্তিদাতা হিসাবে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানায়। এক কবি মৃত্যুকে অবহেলে বললেন : "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই" অন্য কবির খেদোক্তি : "চারিদিকে অনাচার দানবীয় ত্রাস, নিরুপায় হয়ে আর বেঁচে কিবা কাজ"। আমার এক রসিক কবি-বন্ধু একদিন আমাকে কৌতুকে জিজ্ঞাসা করল। আচ্ছা বলত, পৃথিবীতে এই যে এগিয়ে চলার প্রতিযোগিতা চলছে—যেমন, রেশনের আগে লাইন, টিকিট কাউন্টারে আগে যাওয়ার প্রবণতা, সর্বোচ্চ শিক্ষা কী ভাবে সবার আগে নেওয়া যায়, অফিস থেকে সবার আগে কীভাবে বাড়ি ফেরা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা সবার আগে যেতে চাই। কিন্তু জীবনের কোন ক্ষেত্রে আমরা আগে নয় সবার পেছনে থাকতে চাই বলত? আমি বন্ধুর ইঙ্গিত বুঝে বিরোধিতা করে বলি। না, একথা ঠিক নয়, অনেকে পিছিয়ে যেতে চাইলেও কেউ কেউ আগে যাওয়াব প্রবল বাসনা প্রকাশ করে। বন্ধু হেসে বলে : যাবা পরাজিত।

সেই বিচিত্র ভাব-ভাবনা আর অদ্ভুত অনুভূতির মহাশ্মশানে বাজা মহারাজা, ফকিব ও ভিখারি, ত্যাগী-যোগী, উচ্চবর্ণ নীচুবর্ণ, ধনী-দরিদ্র, জাতপাতের সকল অহঙ্কার সকল বৈষম্য সকল ভেদাভেদ একাকার করে, যেখানে সাম্য-মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের মহিমায় ভাস্বর হওয়া যায়—সেই পুণ্যভূমির নাম 'শ্মশান'।

আমার আলোচ্য শ্মশানভূমির নাম 'গোড়ের হাট' অপভ্রংশে গোঁড়ের হাট। গবেষকদেব মতে এই স্থান দূর্বাঘাসের দাম ও গোড়ের জন্য বিখ্যাত। আজও সেই দাম ও গোড়ের পুকুর বর্তমান আছে। যার ওপর থেকে অনায়াসে হেঁটে যাওয়া যায় অথচ পা ডোবে না। তাই স্থানটির নাম 'গোড়ে' এবং পরবর্তী সময় 'গোড়েব হাট' ও তারপরে লোকমুখে শিয়ালদহের শিয়ালদা'ব মতো গোঁড়ের হাট প্রচারিত হয়।

কালীঘাট থেকে আদিগঙ্গার যে অববাহিকা নিম্নবঙ্গের বারুইপুর আটিসারা হয়ে দক্ষিণ বারাশত ছুঁয়ে গোড়ের হাট ময়দা হয়ে বয়ে গিয়েছে চক্রতীর্থের দিকে। তখনকার দিনে আদিগঙ্গার তীরভূমিতে যেখানে সেখানে শবদাহ কবা হত। কাঁটা গাছ-গাছালি বন জঙ্গলে ভরা তীবভূমিতে মানুষের বসবাস না থাকায় শ্বাপদ-শকুনের নিরাপদ বিচরণভূমি ছিল এইসব অঞ্চল। পববর্তী সময় এইসব জায়গায় বন জঙ্গল কেটে জনবসতি গড়ে উঠতে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে পরিত্যক্ত জায়গা দখলের প্রবণতা বাড়ে মানুষের। তার অনেক পরে ব্রিটিশ সরকারের

মাঠ জরিপে ওইসব জায়গা দখলদারদের নামে পাট্টা ও রেকর্ড হয়ে যায়। মানুষের বসবাস গড়ে ওঠায় যেখানে সেখানে শবদাহ করতে অসুবিধা হতে থাকে। পরিবেশ দূষণের প্রশ্ন এসে যায়। তৎকালীন সময়ের চিন্তাশীল মানুষেরা পরামর্শ করে যেখানে সেখানে শবদাহ বন্ধ করে লোকালয় হতে দূরে চিহ্নিত জায়গায় শ্মশান নির্দিষ্ট করে দেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত উত্তরপাড়া (আবাদ) মৌজার। শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে গড়ে ওঠে এই গোড়ের হাট মহাশ্মশান।

তৎকালীন সময়ে ঘন বন-জঙ্গলে পরিত্যক্ত এই জায়গার মালিক ছিলেন রায়নগর গ্রাম নিবাসী মৃত পঞ্চানন নস্করের প্রপিতামহ ধনঞ্জয় নস্কর। কিন্তু এই নির্জন জঙ্গলে তখন শিয়াল-খটাশ-বাঘরোল ও হিংস্র বিষধর সাপের অত্যাচারে মানুষ শবদাহ করতে পারত না। বাধ্য হয়ে কোনোমতে মাটি চাপা দিয়ে পালিয়ে আসত। পরে শিয়াল কুকুর মাটি খুঁড়ে মৃতদেহ বাইরে তুলে আনত। শবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে থেকে জায়গাটিকে আরো থমথমে ও ভয়ঙ্কর করে তুলত। মানুষ ওপথে যাতায়াত করতে সাহস পেত না। পরবর্তী সময়ে এই অবস্থার হাত থেকে মুক্তি পেতে পঞ্চানন নস্কর তাঁর কুলগুরু করাবেগ গ্রাম নিবাসী মৃত যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর পিতাকে জায়গাটি দান করেন। ব্রাহ্মণ সন্তানের হাতে জায়গাটিকে তুলে দিলেও শিয়াল কুকুর ও শ্বাপদের অত্যাচার লাঘব হল না। ওইভাবে মৃতের ছিন্নভিন্ন দেহ যেখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকায় তার আত্মীয় পরিজনেরা গভীর শোকাহত ও মর্মাহত হতে থাকল।

অবশেষে মানুষেরা আসল রহস্য উদঘাটন করল। জায়গা হস্তান্তরে অবস্থার পরিবর্তন হবে না বুঝে, দল বেঁধে জঙ্গল হাসিল করতে শুরু করল। অবস্থার উন্নতি হল। ফাঁকা জায়গায় দিনেরবেলা শিয়াল খটাশ বাঘরোল আসা বন্ধ হল। তারা গভীর জঙ্গলে সরে গেলে শবযাত্রীরা শব পোঁতা বন্ধ করে দাহ কার্য শুরু করল। কিন্তু শ্মশানে কোনো আস্তানা না থাকায় বহু যুগ ধরে শবযাত্রীরা রোদে জলে ঝড়ে দুর্ভোগ পোয়াচ্ছিল। অনেক পরে এই দুরবস্থায় আহত হয়ে ১৯৭৩ সালে নয়পুকুরিয়া গ্রাম নিবাসী মহাপ্রাণ প্রিয়নাথ সরদার মহাশয় ইটের পাকা একটি যাত্রী নিবাস নির্মাণ করে দেন এবং শ্মশান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১০ কাঠা জমি দান করেন। ১৯৭৫ সালে করাবেগ গ্রাম নিবাসী জয়দেব সরদার শবযাত্রীদের জন্য আর একটি চাঁদনি নির্মাণ করে দেন।

বিস্তৃত এলাকার মানুষ এই গোড়ের হাট মহাশ্মশানে শবদাহ করতে আসে। পূর্বে নয়পুকুরিয়া, ময়দা, বাঁশতলা, হলদিয়া, বাঁটরা, রাজাপুর-করাবেগ, বটতলা, মায়াহাউড়ি, বেলেদুর্গানগর, দাড়া, ঘোষালেরচক, বাপুলিরচক, ভবানীমারি, তারানগর, গরাণকাটি, মহিষমারি, পাঁচুয়াখালি, আল্টেমারি, ডোঙাজোড়া ও মাতলা নদীর এপার ওপারের সকল গ্রামের মানুষ। পশ্চিমে রায়নগর, কালিকাপুর, উত্তরপাড়া, পায়রানয়ি, চালতাবেড়ে সহ মগরাহাট পর্যন্ত বিস্তৃত গ্রাম। উত্তরে হরিনারায়ণপুর, কালিকাপুর, সরিষাদহ, বিশ্বাসেরচক, মরিশ্বর, বামনগাছি, কাশীপুর হতে ঢোষারহাট। দক্ষিণে উত্তরপাড়া নিজ, বহড়ু ও অন্যান্য গ্রামসমূহের মানুষেরা।

কালে কালে শ্মশান উন্নয়নের কথা মানুষের মাথায় আসে। উল্লিখিত গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এক সভা আহ্বান করা হয়। ইং-১৯৮৭ সালে শতাধিক ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি ও সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রথম গোড়ের হাট শ্মশান কমিটি গঠিত হয়। সরকারি রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৩১৫৬০৮৭। ওই

কমিটির সভাপতি হন কানাইলাল দাস ও সম্পাদক হন অভিমন্যু মিস্ত্রী। কমিটি গঠনের পর শ্মশান কমিটির উদ্যোগে সে বছর থেকে প্রথম আড়ম্বরপূর্ণ শ্মশানকালী পূজার আয়োজন করা হয়। কমিটির ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হতে থাকেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষেরা। সহযোগিতার হাত এগিয়ে দেন অনেকেই। কাঁটা গাছের ঝোপ ঝাড় পরিচ্ছন্ন করে অর্থকরী গাছ লাগানো হয়। যেমন—ঝাউ, ইউক্যালিপটাস, খিরিশ, শিরিষ, সু-বাবুল, শাল, সেগুন, নিম প্রভৃতি গাছ। ইটভাঁটার মালিকেরা ইট সাহায্য করে শ্মশানের চারিদিকে বিশাল প্রাচীর নির্মাণ করে দেন। কালিকাপুর গ্রাম নিবাসী রামচন্দ্র মণ্ডল মাটিতে গর্ত খুঁড়ে চিতা সাজিয়ে শবদাহের অসুবিধা বুঝে তিনি উন্নত পাকা চিতা বানিয়ে দেন। মায়াহাউড়ি গ্রাম নিবাসী সুধন্য প্রামাণিক শ্মশানে বিদ্যুৎ সংযোগের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে শ্মশানকে আলোকিত করে দিয়েছেন। একটা চিতায় শবদাহ চলাকালীন অন্য শবযাত্রীদের দীর্ঘক্ষণ প্রতীক্ষা করে থাকতে হয় বলে হলিদিয়া গ্রাম নিবাসী বিরাজবালা হালদার ও করুণাময়ী মণ্ডল আরো একটি পাকা চিতা তৈরি করে দিয়েছেন। ধীরে ধীরে গোড়ের হাট শ্মশান ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে চলে। একসময় শবস্নানের অভাব বোধহয়। এগিয়ে আসেন রায়নগর গ্রাম নিবাসী অভিমন্যু মিস্ত্রী। তিনি পুরুষ শবস্নানাগার বানিয়ে দেন। মহিলা শবস্নানাগার নির্মাণ করে দেন উত্তরপাড়ার সুভাষিণী দাস।

দীর্ঘ পনেরো বছর পর কমিটির পরিবর্তন করা হয়। সেই কমিটির সভাপতি পূর্বের কানাইলাল দাস ও সম্পাদক হন শিক্ষক অনাথবন্ধু সরদার। নতুন কমিটির অনুরোধে উত্তরপাড়ার নলিনীরঞ্জন নস্কর ও মনোরঞ্জন নস্কর, পুনপোয়ার সুনীতি সরদার ও সাবিত্রী গায়েন সমবেতভাবে শ্মশানের পূর্বপারে ১০ কাঠা জমি শ্মশানের নামে দান করেন। রায়নগর গ্রাম নিবাসী পুলিনচন্দ্র নস্কর শ্মশানের দক্ষিণ পারে ১০ কাঠা জমি দান করে শ্মশানের আয়তন ও কলেবর বৃদ্ধি করেন। কমিটির আন্তরিকতায় ও পরিচর্যায় শ্মশানে পরিচ্ছন্ন ও শুচিতার পরিবেশ গড়ে ওঠে। অভাব হয় পানীয় জলের। কমিটির চেষ্টায় দাড়া ঐকতান সংঘ হাজার ফুট গভীর নলকূল বসিয়ে দেন।

বাং ১৪০৫ সালে মণিপুর গ্রামের নকুলচন্দ্র মণ্ডল ও জানকী হাজরা আরো একটি বিশ্রামাগার নির্মাণ করে দেন। ১৪০৬ সালে নতুন কমিটি আসে। সভাপতি নকুলচন্দ্র মণ্ডল ও সম্পাদক তপন চক্রবর্তীর নাম গৃহীত হয়। ১৪০৭ সালে হলিদিয়ার ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল সৌন্দর্য মণ্ডিত বিশ্রামাগার ও মরিশ্বরের প্রফুল্লকুমার হালদার একটি বিশাল মনোরম মন্দির নির্মাণ করে দেন। সেই মন্দিরে নিত্য পূজিত হচ্ছেন কংক্রিটের মহাদেব। গঙ্গাদেবী ও দেবী কালিকা। ১৪০৯ সালে বহু মানুষের মিলিত সাহায্যে ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল বিশ্রামাগারের ছাদে শ্মশান সমিতির সুদৃশ্য ঝকমকে অহিংসধ্বজ নির্মাণ করে দেন। বেলিয়াডাঙার মনমোহন নস্কর, মনোতোষ নস্কর ও রায়নগরের রমেন্দ্রনাথ নস্কর শ্মশানের নিরাপত্তার জন্য প্রধান ফটকে বিশাল গেট নির্মাণ করে দেন এবং গেটের ছাদে নির্মিত হয় কংক্রিটের মহাকাল শিব। হরিশ্চন্দ্র শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের অপূর্ব পৌরাণিক দৃশ্যাবলিতে শ্মশান চত্বর প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

১৪১০ সালে সভাপতি হন বিজয়কৃষ্ণ মণ্ডল ও সম্পাদক নলিনীরঞ্জন মণ্ডল। এই সময় রায়নগর গ্রাম নিবাসী শৈলেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ষাকালীন শবদাহের সুবিধার্থে বহু অর্থ ব্যয়ে শেডযুক্ত উন্নত চিতা করে দেন। বেলিয়াডাঙার স্বপন মান্না শ্মশানের দ্বিতীয় গেটটি প্রথম গেটের অনুকরণে

তৈরি করছেন।

গোড়েরহাট শ্মশান কথা আলোচনায় প্রসঙ্গত গোড়েরহাট শ্মশান গঙ্গা চাঁদনির কথা এসে যায়। শ্মশানে শব দাহের পর শবযাত্রীরা শক্তি সরকার রূপায়িত মগরাহাট-ঢোষা কাটা খালের ওপর ইরিগেশনের পাকা ব্রিজ পেরিয়ে উত্তরপাড়ে চলে আসে। ওখান থেকে একটু দূরে উত্তর-পূর্ব সীমায় বিশাল দিঘির আকারে গঙ্গা আছে। গোড়েরহাটের বিশাল এলাকার তৎকালীন মালিক ছিলেন জয়নগরের দত্ত পরিবার। দত্ত পরিবারের কাছ হতে দাড়া গ্রাম নিবাসী বনমালী দাস অনুমতি সূত্রে সম্পত্তির মালিকানা পান। তখন বনমালী দাস দিঘির দক্ষিণ পাড়ে বিশাল শানের ঘাট, প্রশস্ত চাঁদনি ও শিবের মন্দির নির্মাণ করে দেন। নয়পুকুরিয়ার অরুণ মুখার্জীকে ৯ বিঘা জমি দিয়ে পূজা পাঠের জন্য পুরোহিত নিযুক্ত করেছিলেন। পরে অরুণ মুখার্জী গত হলে তাঁর তিন উত্তরাধিকারী হরিপদ মুখার্জী, পূর্ণচন্দ্র মুখার্জী ও নীরদাপ্রসাদ মুখার্জী সব সম্পত্তি ভাগাভাগি করে নেন। অতি বেদনার কথা পরবর্তী সময়ে বনমালীবাবুর দেওয়া সমস্ত সম্পত্তি তাঁরা বিক্রি করে দিয়ে ক্ষান্ত হননি, বনমালীবাবুর অতি সাধের শানের ঘাট চাঁদনি ও শিবমন্দিরের ইট কাঠ পর্যন্ত ভেঙে ভাগাভাগি করে বিক্রি করে দিয়ে ঐতিহাসিক গঙ্গার স্মৃতি বিলুপ্ত করা হয়।

স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস ওই গঙ্গা অতি পবিত্র। তাই শবদাহ করার পর যাত্রীরা সবাই ওই গঙ্গায় স্নান করে শুচি ও পবিত্র হয়। মৃতের সন্তানেরা ওই গঙ্গায় স্নান করে উত্তরীয় গ্রহণ করে। সংস্কারহীন বনবাদাড়ে ভরা ওই গঙ্গায় শবযাত্রীরা বিপদকে তুচ্ছ করে স্নান আহ্নিক তর্পণ করত। পাশেই বিখ্যাত দূর্বাঘাসের গোড়পুকুর। দীর্ঘবছর অব্যবস্থায় চলার পরে ১৪০১ সালে গোড়েরহাট শ্মশান কমিটির তত্ত্বাবধানে জনসাধারণের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করে চাঁদনি ও শিব মন্দির পুনরায় নির্মাণ করা হয়। দিঘিতে বিশাল শানের ঘাটটি আবার নির্মাণ করে দেন হরিনারায়ণপুরের নিরঞ্জন মণ্ডল মহাশয়। যাঁদের দানে চাঁদনি ও মন্দির নির্মিত হয় তাঁদের নাম ও ঠিকানা মন্দিরের গায়ে পাথরে খোদাই করা আছে। বর্তমানে গঙ্গার চাঁদনি মন্দিরে শিবচতুর্দশী পূজা ও বর্ষশেষে সন্ন্যাস পূজা অতি সমারোহে পালিত হয়ে আসছে। আগামী দিনে গোড়েরহাট মহাশ্মশান আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমার এই গোড়ের হাট শ্মশান প্রসঙ্গ শেষ করব একটি কবিতা দিয়ে। এই লেখায় যিনি আমাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সকল তথ্য ও সব রকম সহযোগিতা করে লেখাকে সমৃদ্ধ হতে সহায়তা করেছেন, সেই সমাজসেবী মানবদরদী শিক্ষক মাননীয় অনাথবন্ধু সরদারের রচিত কবিতার চারটি পঙক্তি—

শ্মশান

হে তাপস! যোগী শ্রেষ্ঠ নিষ্কলুষ প্রাণ
বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি সদা দীপ্তিমান।
উজ্জ্বল ভাস্কর সম তোমার পৌরুষ
জীবের কল্যাণে সদা নিবেদিত প্রাণ।

❑ লেখক পরিচিতি—গবেষক, প্রাবন্ধিক।

দক্ষিণ বারাশত মহাশ্মশান

প্রদ্যুৎকুমার সরকার

মহাশূন্যে ভাসমান দুরন্ত গতিময় পৃথিবীটা অনবরত শুধু ছুটেই চলেছে। দুরন্ত গতিময়তা হতে অব্যাহতি পাবার কোনো অবকাশ নেই তার। তবু তার আশ্রয়ে জীবকুলকে একসময় থামতে হয়। মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে কারুর নিষ্কৃতি নেই। রক্ত মাংসে গড়া শরীরগুলো দাউ দাউ করে জ্বলে শ্মশানের চিতায়। অথবা মাটির নীচে পচে গলে একাকার হয়ে যায়। প্রকৃতির কী বিচিত্র নিয়ম, রহস্যময় খেয়াল। সেই নিয়মের শৃঙ্খলে আমাদের সকলের জীবন সীমাবদ্ধ। তবুও বাঁচার চেষ্টা আমাদের নিরন্তর; আর বাঁচার জন্য জোর-জুলুম, শোষণ-পীড়ন, অত্যাচার, সন্ত্রাস, সংঘর্ষ, রাহাজানি, রক্তপাত প্রভৃতির সমন্বয়ে সমাজে ঘটে চলে অবিরাম অবক্ষয়ের অশনি সঙ্কেত। কিন্তু জীবনের প্রবাহের মাঝে মৃত্যুতেই যে সবকিছুর শেষ একথা নিয়ে আমরা খুব বেশি ভাবিত নই। তাই শ্মশানের প্রসঙ্গটি আলোচনা করা তাৎপর্যপূর্ণ। এখন নিম্নবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের একটি শ্মশানক্ষেত্র দক্ষিণ বারাশত মহাশ্মশান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরছি সাধ্যমতো।

জয়নগর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ বারাশত জনপদের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই শ্মশানের বয়স প্রায় দুই শতাধিক বছর। শ্মশানটির ভূমিদাতা ও পত্তনকারী হলেন দক্ষিণ বারাশতের শ্রদ্ধেয় দুর্গাদাস বসু। শ্মশান প্রতিষ্ঠাকালে দুর্গাদাসবাবু দক্ষিণ বারাশতে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও প্রবর্তিত করেছিলেন যা এখনও জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। এঁরা অবিভক্ত বঙ্গদেশের যশোহর জেলা থেকে এখানে এসেছিলেন। এঁদের আদিপুরুষ কৃষ্ণচন্দ্র বসু প্রথমে এই জনপদে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। বসু পরিবারের আদিপুরুষ কৃষ্ণচন্দ্র বসু সম্পর্কে জানা যায় যে তিনি ব্রিটিশ সরকারের দেওয়ান ছিলেন। ইংরেজদের দেওয়ান হওয়ার সুবাদে প্রত্যন্ত নিম্নবঙ্গ সুন্দরবনের বহু আবাদি লাট বা অঞ্চল তাঁর অধীনে ছিল। এখনও বহু এলাকা থেকে প্রজারা বসুদের বাড়িতে আসেন।

শ্মশানটির প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেছে, বড়বসুদের ঐতিহ্যপূর্ণ দোলের মন্দিরগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলা ১২০৭ সনে। বসু পরিবারের মন্দিরগুলোর জন্মলগ্নের আরও বিশ-তিরিশ বছর আগে শ্মশানটি স্থাপিত হয়েছিল বলে জানা যায়। দক্ষিণ বারাশত শিবদাস আচার্য উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার তাগিদে শ্মশানটি ট্যাপার গঙ্গার পূর্বপাশের আগের অবস্থান থেকে সরিয়ে আরও কিছুটা দূরে পূর্বদিকে স্থানান্তরিত করা হয়। স্থানান্তরের কাল আনুমানিক ১৯১৬ সাল। আগে শ্মশানের ভূমির পরিমাণ ছিল প্রায় সাত-আট বিঘা। ভোগ দখলের পর বর্তমানে জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে পাঁচ বিঘাতে।

দক্ষিণ বারাশত মহাশ্মশান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে জনপদটির স্থাননাম 'দক্ষিণ বারাশত' হল কেন তার বিবরণ তুলে ধরছি। 'বারাশত' শব্দটির সঙ্গে নিম্নবঙ্গের লৌকিক দেবতা বারাঠাকুরের নাম ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এই বারাঠাকুরের পূজা বা বারামূর্তি পূজা দক্ষিণ রায়ের প্রতীকী পূজারই নামান্তর। দক্ষিণ রায় যে কীভাবে বারাপূজার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন, সে

বিষয়ে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। মানব মুণ্ডরূপী এই দেবতার পূজা চলে আসছে সারা পৃথিবীজুড়ে সুপ্রাচীনকাল থেকে। বিখ্যাত মনীষী প্লেটো বলেছেন, "The human head is the image of the world." অর্থাৎ বিশ্বমূর্তির প্রতীক হল এই মানব মুণ্ডমূর্তি। মধ্যযুগে একশত বারো বা মুণ্ডমূর্তি পূজার খুবই প্রচলন ছিল। পঞ্চাশ জোড়া বারোকে বলা হয় শতবারো বা বারোশত। মা নারায়ণী ও দক্ষিণ রায়ের পৃথক বারোকে জোড়া-বারো বলা হয়। শতবারো পূজার খ্যাতির স্মারক হিসাবে গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব অববাহিকার অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার দুটি জনপদ মধ্যযুগ থেকে বারাশত নামে চিহ্নিত হতে দেখা যাচ্ছে। এর একটি হল বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগনার সদর শহর। অপরটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগর থানার প্রাচীন জনপদ দক্ষিণ বারাশত। দক্ষিণ অঞ্চলের বলেই 'বারাশত' জনপদের আগে 'দক্ষিণ' শব্দটি বসেছে। ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' গ্রন্থে ধনপতি (সদাগর) ও শ্রীমন্ত সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা বর্ণনায় কলকাতার কালীঘাটের দক্ষিণের এই দক্ষিণ বারাশত জনপদের উল্লেখ রয়েছে। দক্ষিণ বারাশত জনপদটি অতীতে বরিদহাটি পরগনার অন্তর্ভুক্ত ছিল যা পুরানো দলিলপত্র থেকে জানা যায়। বর্তমানে দক্ষিণ বারাশতের জে.এল ও তৌজি নম্বর হল যথাক্রমে ৪৭ ও ৩৭৮।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বিশেষ ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান ও পবিত্র ভূমি হিসেবে পরিগণিত। এই জেলার মধ্য দিয়ে একদা পুণ্যতোয়া গঙ্গা ভাগীরথী প্রবাহিত হত। পৌরাণিক কাহিনি বিজড়িত ভগীরথ কর্তৃক যে নদীপথের সংস্কার সাধিত হয়েছিল সেই ভাগীরথীর আদি ধারার নাম আদিগঙ্গা-ভাগীরথী। বর্তমানে ভাগীরথীর এই লুপ্তপ্রবাহ সাধারণভাবে 'আদিগঙ্গা' নামে পরিচিত। স্মরণাতীত কাল থেকে এই আদিগঙ্গার জলই পবিত্র গঙ্গাজল হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং কেবলমাত্র এই আদিগঙ্গাকে গঙ্গাদেবী জ্ঞানে পূজা করার প্রথা এখনও প্রচলিত রয়েছে। বহু পুরানো পবিত্র আদিগঙ্গার তীরের লুপ্ত মজাখাতে এই শ্মশানটি স্থাপিত হয়েছিল। শ্মশানটির জন্মলগ্নের পূর্বে লুপ্ত মজা আদিগঙ্গার বুকে এই বিস্তীর্ণ জায়গাটি জুড়ে গভীর ঘন বনজঙ্গল গড়ে উঠেছিল। সৃষ্ট ঘন বনে আদিকাল হতে এখনও বারাঠাকুরের পূজা হয়ে আসছে। পরে সেখানে বাগান হলে 'শতবারো' বাগান নামেও পরিচিত হয়। তখনকার দিনে নিকটবর্তী দক্ষিণ বারাশত শিবদাস আচার্য উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছে একটি বিশাল বটবৃক্ষ ছিল। বটবৃক্ষটি অনেকে দেখেছেন। বৃক্ষটির গায়ে আগেকার দিনে নৌকো নোঙর করা হত বলে শোনা যায়।

প্রাচীন আদিগঙ্গার তীরে সৃষ্ট শ্মশানটির নিকট পুরানো দিনের পাঁচগঙ্গা এখনও বর্তমান। গঙ্গাগুলো হল যথাক্রমে—(১) দুর্গাদাস বসুর গঙ্গা, (২) ট্যাপার গঙ্গা, (৩) ছাতির গঙ্গা, (৪) চাঁদনি (চাঁতনি) গঙ্গা ও (৫) ঘোড়াডুবি গঙ্গা। প্রথম গঙ্গাটি শ্মশান চত্বরে অবস্থিত যা ভূমিদানকারী ও শ্মশানের প্রতিষ্ঠাতা দুর্গাদাস বসুর নামানুসারে পরিচিত। আর শেষের চারটি গঙ্গাকে কেন্দ্র করে নানারকম কিংবদন্তি কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। ট্যাপার গঙ্গাটি শিবদাস আচার্য উচ্চ বিদ্যালয়ের পূর্বদিকে অবস্থিত। *ট্যাপার গঙ্গা* : ট্যাপার গঙ্গা সম্বন্ধে জানা যায় যে গঙ্গার মাঝখানে জলের ভিতর থেকে গরুর গাড়ির চাকার মতো কী একটা যেন ভেসে উঠেছিল, ট্যাপের মতো গরুর গাড়ির চাকা ভেসে উঠেছিল বলে নাকি ট্যাপার গঙ্গা হয়েছে। *ছাতির গঙ্গা*

: মা গঙ্গাদেবী জলের মাঝখান থেকে বুকের ছাতি পর্যন্ত দেখিয়েছিলেন তাই গঙ্গাটির নাম ছাতির গঙ্গা হয়েছে। ছাতির গঙ্গার কাছে আগে একজন সাধু থাকতেন। তিনি ছিলেন একজন সিদ্ধ যোগী পুরুষ। ইনি গঙ্গার জলের উপর দিয়ে নাকি অনায়াসে খড়ম পায়ে হেঁটে বেড়াতেন। তাঁর প্রস্রাবে নাকি প্রদীপ জ্বলত বলেও শোনা যায়। ছাতির গঙ্গা সম্পর্কে আরও জানা যায় যে, আগেকার দিনে চৈত্রমাসে চড়কের সময় জ্যান্ত চড়ক কাঠ এই ছাতির গঙ্গার শানের ঘাটের কাছে গিয়ে ভেসে থাকত। তারপর চড়কের আগেব দিন গ্রামেব লোকেরা শাঁক-ঘণ্টা-কাঁসর বাজিয়ে চড়ক কাঠটি তুলে নিয়ে যেত মূল সন্ন্যাসীর মাধ্যমে। চড়ক কাঠ সম্পর্কে শোনা যায় যে, ছাতির গঙ্গার শানের ঘাটে পা ধুতে এসে যদি কেউ ভুলবশত চড়ককাঠে বা রাখত তখন সঙ্গে সঙ্গে কাঠটি হড়হড় করে গঙ্গার মাঝখানের দিকে চলে যেত। *ঘোড়াডুবি গঙ্গা* : স্নান করাতে গিয়ে একটি ঘোড়া এই গঙ্গায় ডুবে গিয়েছিল, তাই ঘোড়াডুবি গঙ্গা নামকরণ হয়েছে। *চাঁদনি গঙ্গা* : কোনো এক দুপুরে এই গঙ্গায় সোনার নৌকো ভেসে উঠেছিল। সেই সোনার নৌকোয় অপরূপ সুন্দর ধবধবে সাদা রুপোব মতো অর্ধ-চন্দ্রের উপর নাকি রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। সোনালি নৌকোয় রুপোলি অর্ধ-চন্দ্রের উপর রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি অনেকের দৃষ্টিগোচর হওয়ায় চাঁদনি গঙ্গা নামকরণ হয়েছে বলে প্রবীণেরা মনে করেন।

শ্মশানটি শহর সংলগ্ন হলেও পল্লিবাংলার নৈসর্গিক চিত্রে চিরভাস্বর হয়ে রয়েছে সমগ্র চত্বরটি। নিস্তব্ধতার মধ্যে আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন একটি শিরীষ গাছ; যার প্রসারিত শাখা-প্রশাখার শীতল ছায়ায় বসে একান্ত নির্জনে প্রেম অভিসারে আসে প্রেমিক-প্রেমিকারা। তারা মৃদুমন্দ বাতাসে বসে নিভৃতে শাশ্বত ভালোবাসার গল্পে বিভোর হয়। শ্মশান যাত্রীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জীবন দিগন্তের অন্তিম শান্তিব নীড়ে বসে। শ্মশানে আগত বয়সের ভারে নত বিত্তবান মানুষেরাও এখানে বসে মৃত্যুর বহস্যময়তা খোঁজে বিশুদ্ধ চেতন সত্তার গভীরে একাত্ম হয়ে।

বহু পুরানো শিরীষ গাছের সন্নিকটে এক নবীন বটবৃক্ষ ধীরে ধীরে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করছে। এছাড়া গাছগাছালিতে পরিপূর্ণ শ্মশানেব চতুর্দিকে এক অতি মনোরম পরিবেশ বজায় রয়েছে। গোধূলিতে গাছের ডালে ডালে পাখ-পাখালির সম্মিলিত কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে ওঠে চারিদিক। এছাড়া আম, জাম, জামরুল, লিচু, খেঁজুর, কলা প্রভৃতি গাছেরা ফুলে ফলে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে বাংলার ঋতুবৈচিত্র্যের উপযুক্ত পরিসরে।

বহু বছর পূর্বে আদিগঙ্গার তীরে গড়ে ওঠা এই মহাশ্মশানে ভরদুপুরে একাকী কিংবা কয়েকজন মিলে বিচরণ দুঃস্বপ্নময় ছিল। সামাজিক বিবর্তনে এলোমেলো প্রাচীন শ্মশানকে মানুষ নতুনরূপে রূপ দিয়েছে। শ্মশানের চারদিকের সীমানা ইটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। শ্মশানের মধ্যে তিনটি পাকা চিতা, দুটি বেদি, একটি লালরঙের সুউচ্চ কালীমন্দির ও সুদৃশ্য পাথরের একটি তুলসী মণ্ডপ বর্তমান। চিতা, বেদি ও শ্মশানের উঁচু পাঁচিল বসুদের দ্বারা নির্মিত হয়েছে।

আগেকার দিনের পুরানো জরাজীর্ণ মন্দিরটি ভেঙে নতুনভাবে সংস্কার করা হয়। এটি সংস্কার করেন মগরাহাট থানার হরিনারায়ণপুর গ্রামের শ্রীমতি বীণাপানি হালদার ও তাঁর পুত্রগণ

যথাক্রমে—বিশ্বনাথ, জগন্নাথ, শঙ্কর, অমরনাথ ও সোমনাথ হালদার। মন্দির নির্মাণে সহায়তা করেন রাজু মিস্ত্রী। এঁরা মন্দিরটি সংস্কার করে তাঁদের পিতা স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র হালদারের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। শ্মশানের ভিতর সুদৃশ্য তুলসী মণ্ডপটি প্রতিষ্ঠা করে সুধীর ও অনিল হাইত তাঁদের পিতা ও মাতা রাখালচন্দ্র হাইত ও দুর্গামণি হাইতের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন।

বহু পুরানো এই শ্মশানটিতে সর্বপ্রথম কে বা কারা ডোমের কাজ করতেন তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। তবে শ্মশান স্থানান্তরের পরে গোড়ের হাটের সুকুমার দাস এবং তারও পরে বিল্লহাড়ি মহাশয় শ্মশানে ডোমের কাজ করতেন। বিল্লবাবু প্রকৃতপক্ষে ডোম ছিলেন না। তিনি দক্ষিণ বারাশত বাজারে হাড়ির কাজ করতেন, বাজার পরিষ্কার পবিচ্ছন্নতার পাশাপাশি শ্মশানের যাবতীয় দায়িত্বও তিনি পালন করতেন। বিল্লবাবুর পুত্র নারায়ণ সরদার বর্তমানে এই শ্মশানে ডোমের কাজে নিয়োজিত।

শ্মশানটিতে দূরদূরান্ত যথা—উস্তি, মগরাহাট ও জয়নগব প্রভৃতি থানার বিভিন্ন স্থান থেকে মৃতদেহ আনা হয় সৎকার্য সম্পন্ন করার জন্য। মৃতদের আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে কমবেশি অনুদান নেওয়া হয়। সর্বনিম্ন অনুদান ৩১ টাকা; আর যাঁরা তুলনামূলকভাবে একটু অবস্থাপন্ন তাঁদের নিকট থেকে ৫১ টাকা কিংবা তারও বেশি অর্থমূল্য ধার্য করা হয়। ২০০২ সালে ৩১৮ জন এবং ২০০৩ সালে ২৫৮ জন মৃত মানুষের দেহ এখানে পঞ্চভূতে বিলীন হয়েছে। এখানকাব উল্লেখযোগ্য সৎকারের মধ্যে শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ বক্সির নাম করা যেতে পারে। ইনি ১৯২০ সালে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিম বাংলায় আসেন এবং দক্ষিণ বাবাশত এম. ই. স্কুলে (মিডিল ইংলিশ) শিক্ষকতা করতেন।

শ্মশানকে কেন্দ্র করে কিছু কিংবদন্তি শুনতে পাওয়া যায়। শ্মশানে ডোমের কাজ করাব সুবাদে বিল্লবাবু অবাধে শ্মশানের চৌহদ্দির মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন। তাছাড়া বিল্লবাবু ছিলেন খুবই সাহসী ব্যক্তি। কখনও কোনরকম ভয় তাঁকে বিন্দুমাত্র কাবু করতে পারত না। বিশ-পঁচিশ বছর আগেকার কথা। কোন এক গভীর রাত্রে তিনি শ্মশানের মন্দিরের চাতালে শুয়েছিলেন। ওই রাতে তিনি এক অলৌকিক জিনিস প্রত্যক্ষ করেন। শ্মশান চত্বরের বিশাল শিরীষ গাছের ডালে বসে একজন অতি মানবকে পা দোলাতে দেখেন তিনি। অতিমানবটি ছিল একেবারে উলঙ্গ; তার হাত-পা, দেহ প্রভৃতি ছিল অস্বাভাবিক রকমের বড়। বড় বড় চোখে সে তাকিয়ে ছিল বিল্লবাবুর দিকে। ভয়ে তিনি বাক্‌শূন্য হয়ে পড়েন এবং এতটাই ভয় পেয়ে যান যে শ্মশান থেকে বেরিয়ে বাড়িতে চলে আসার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেলেছিলেন। এমন ঘটনা দেখার পর থেকে রাতের বেলা তিনি আর শ্মশানের দিকে যেতেন না। তাঁর ছেলেদেরও বারবার নিষেধ করতেন ওই দিকে যেতে। রহস্যময় ঘটনাটি চাক্ষুষের পর তিনি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং দেহত্যাগ করেন। তাঁর দেহ এইখানেই বিলীন হয়ে যায়।

বিল্লবাবুর ছেলে নারায়ণবাবুও একসময় এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখেন। শ্মশানে একদা একটা শবদেহকে দাহ করাতে সাহায্য করেছিলেন তিনি। শবদেহটিকে যেদিন দাহ করা হয় সেইরাত্রে নারায়ণবাবু স্বপ্ন দেখেন শবদেহধারী লোকটি শ্মশানের বেদির উপর দাঁড়িয়েছিল এবং হাত

নেড়ে নেড়ে জোর গলায় বড় বড় চোখ বের করে তাঁকে ডাকছে আর বলছে, 'আয়, চলে আয় এখানে'। এমন স্বপ্ন দেখার পর তিনি আতঙ্কে সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠেন। ওই রাতে নারায়ণবাবু আর ঘুমাতে পারেননি। শুধু তাই নয়, আজও সেই স্বপ্নের কথা তিনি ভুলতে পারেন নি।

আমাদের শ্রদ্ধেয় দাদু অধ্যক্ষ ড. সত্যেন্দ্রনাথ নস্কর মহাশয়ের নিকট শুনেছি শ্মশান সম্পর্কে আরও একটি কিংবদন্তির কথা। শ্মশানক্ষেত্র থেকে দাদুর বাড়ি পর্যন্ত তখনকার দিনে ছিল গুটিকয়েক ঘর-বাড়ি। তাই তাঁর বাড়ি থেকে শ্মশান এবং বহড়ু ও দক্ষিণ বারাশত রেললাইনের মধ্যে অবস্থিত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত খালের উপর লালপুল নামক রেল ব্রিজটি অতি সহজেই দেখা যেত। তখনকার দিনে যত্রতত্র ছিল গো-ভাগাড়, বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মৃতদেহ পুঁতে রাখার জায়গা। আর লালপুল নামক জায়গাটি ছিল বেলে কাটা, বিষ খেয়ে মরা প্রভৃতি অপঘাতে মৃত ভূত-প্রেতদের আড্ডাখানা। সেই সময়ে দাদুর ঘরের পিছনেও ছিল একটা গো-ভাগাড়। গভীর রাতে তাঁর বাড়ির পিছনের ভাগাড় থেকে তীব্র আলো হাতে একটা মূর্তি নাকি জনশূন্য রাস্তা দিয়ে নাচতে নাচতে গিয়ে উঠত রেললাইনে। আলো হাতে রেললাইনে উঠে সেটি সোজা চলে যেত বহড়ু যাবার লালপুলের দিকে। তারপর শ্মশানের ভিতর থেকে আর একটি আলোও চলে যেত লালপুলের দিকে। কিছুক্ষণ পরে দেখা যেত পাঁচ-ছয়টি আলো নানাদিক থেকে এসে একসঙ্গে মিলিত হত এবং লালপুলের উপর দাঁড়িয়ে নৃত্য করত। সেইসব নৃত্য দেখে দাদুর মন পুলকে ভরে উঠত। আবেগ থরথর কণ্ঠে তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'কী অনুপম সেই নৃত্য, কী অপূর্ব সেই দৃশ্য; চোখে না দেখলে তুমি সেই সম্বন্ধে ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারবে না'। কেবল একবার নয়, লালপুলের উপর এমন আশ্চর্যজনক ঘটনা তিনি একাধিকবার ঘটতে দেখেছেন। তাঁর মুখে এও শুনেছি আলো হাতে সবাই যে নাচছে তা স্পষ্ট বোঝা যেত।

এইজন্যে বোধ হয় শ্মশান শব্দটির অর্থ প্রেতভূমি; শবদেহ স্থান। শ্মশান শব্দটি সংস্কৃত শব্দ থেকে জাত। যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল শ্মাব ('শ্মন্' শব্দ বা মড়া বা শবের) শান (স্থান)। এটি বিশেষ্যপদ এবং ক্লীব লিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত।

গতবছর শ্মশান-গঙ্গাটি সংস্কারের জন্য শ্মশানে দুটি স্যালো মেশিন বসানো হয়েছিল। জলসেচ প্রায় পনেরো-কুড়ি দিন ধরে চলেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পুকুরের চারদিকের জল কমে গেলেও কোনোভাবেই মাঝখানের জল কমানো যাচ্ছিল না। পুকুরের একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে ভোলাক ভোলাক শব্দে প্রচণ্ড বেগে অনবরত বালি আর জল উঠছিল। জলের বেগ বন্ধ করার জন্যে খড়ের আঁটি আর তড়পা দিয়ে গর্তটি আটকে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল। কিন্তু সবকিছু ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। কিছুই পাওয়া যাচ্ছিল না। জলের বেগ আটকাতে গিয়ে একজন লোকও ভিতরে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অনেকের বিশ্বাস, শ্মশান পুকুরটির নীচে থেকে নদীর যোগসূত্র এখনও রয়েছে।

আট-নয় বছর আগে শ্মশানটি দুষ্কৃতকারীদের হাতে চলে গিয়েছিল। তারপর কিছুকাল পরে এটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে চলে যায়। এরপর পঞ্চায়েত প্রধান উত্তমকুমার সাহার আমলে একটি সর্বদলীয় কমিটি তৈরি করা হয়। দক্ষিণ বারাশতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই কমিটিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম হলেন জয়নগর থানার প্রাক্তন বিধায়ক নীরদবরণ

সাহা, গৌরচন্দ্র সরকার ও দেবতোষ আচার্য প্রমুখ।

শ্মশানের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো কাঠ ও কাঠকয়লা বিক্রয়ের উপর নির্ভরশীল। মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর চিতা থেকে যে কাঠকয়লা বেরোয় এবং সাবাবছর ধরে শ্মশানে স্তূপীকৃত হয়ে থাকে; প্রতি বছর কালীপূজার আগে সেগুলি বিক্রি হয়ে যায়। কাঠকয়লা কেনার জন্য ক্রেতাদের মধ্যে শোরগোল শুরু হয়ে যায়। এখান থেকে ট্রাক ভর্তি হয়ে কাঠকয়লা চলে যায় বারুইপুর থানার ফুলতলায়। ফুলতলাতে নিয়ে গিয়ে ওইসব কয়লা মেশিনে গুঁড়ো করা হয় এবং কয়লার গুঁড়োয় ধূপকাঠির কালি তৈরি হয়। গত বছর কয়লা বিক্রি হয়েছিল ২১ হাজার ১ শো ৫১ টাকা। এ বছর যা কয়লা জমা রয়েছে তা প্রায় ১৪-১৫ হাজাব টাকায় বিক্রি হবে বলে কর্তৃপক্ষের অনুমান।

শ্মশানক্ষেত্রটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ হওয়ায় শ্মশানের নানারকম সমস্যার ব্যাপাবে পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হলেও কর্তৃপক্ষ ঠিকমতো সহযোগিতা করেন না বলে অনুযোগ করেন নারায়ণবাবু। মন্দির সংস্কারের সময় বর্ষাকালে ঘন ঘন বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। মন্দিরের কালীমূর্তিটি বক্ষার জন্য পঞ্চায়েতে একটি ত্রিপল চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ত্রিপলের আশায় বারবার হন্যে হয়ে ঘুরেও কোনো সুরাহা হয়নি। শেষে তাঁরা খোলা আকাশের নীচে বৃষ্টির মধ্যে কালীঠাকুরের মূর্তিটি নামিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শ্মশানের পূজা কমিটির বর্তমান সভাপতি ও সম্পাদক হলেন যথাক্রমে প্রবোধচন্দ্র মণ্ডল ও অসীমানন্দ সরকার। কালীপূজা উপলক্ষ্যে শ্মশানে দু-তিনদিন ব্যাপী হবিনাম যজ্ঞ, বাল্যভোজন, দরিদ্রনারায়ণ সেবা, প্রসাদ বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার · নারায়ণ সরদার, শ্রীমতি বিজলী সরদার, প্রবোধচন্দ্র মণ্ডল, প্রদীপ নাইয়া, অসীমানন্দ সরকার, পালু চক্রবর্তী ও পিন্টু বসু প্রমুখ।

◻ লেখক পরিচিতি—গবেষক, প্রাবন্ধিক।

বারুইপুর থানার শ্মশান, গোরস্থান ও বিবিধ প্রসঙ্গ

কালিচরণ কর্মকার

মৃত্যু জীবনের অনিবার্য পরিণতি। এ সত্য আমরা সকলে অবহিত। কিন্তু বড় মায়াময় এই পৃথিবী ছেড়ে জীবনের বিদায় গ্রহণ আমরা সহজে মেনে নিতে পারি না। তাই কবির ভাষায়—

"এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গ মর্ত্য ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন, 'যেতে নাহি দিব।'"

তথাপি, মৃত্যুর অমোঘ বিধানকে আমাদের মেনে নিতে হয়। তাই পরক্ষণে কবি বলেন—

"হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।"

নশ্বর দেহের পঞ্চভূতে বিলীন হবার অন্তিম মুহূর্তে প্রিয়জনেরা কেউ সজল নয়নে কেউ বা বুকফাটা ক্রন্দনে ধর্মভেদে হয় শ্মশানভূমিতে, নয় গোরস্থানে কিংবা পশুপক্ষীর ক্ষেত্রে গো-ভাগাড়ে (উপশলে) ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াচারের মাধ্যমে পালন করে থাকেন।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ শাস্ত্রীয় সংস্কার অনুযায়ী সাধারণত পবিত্র গঙ্গা নদীর তীরে শ্মশানভূমিতে মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন শবদাহের মাধ্যমে। অবশ্য শিশুদের ক্ষেত্রে কিংবা শাক্ত বা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বিশেষ ঐতিহ্য অনুসারে অথবা স্বেচ্ছানুসারে শ্মশানভূমিতে কিংবা অন্য কোনো বিশেষ স্থানে সমাধিস্থ করা হয়।

জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গুরুত্বপূর্ণ থানা বারুইপুরের মাঝখান দিয়ে একদা প্রবাহিত ছিল প্রবল আদিগঙ্গা। বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁ খিদিরপুরের সন্নিকটে নিমকির খাল কেটে গঙ্গার জলস্রোতকে পশ্চিমে প্রবাহিত প্রবল সরস্বতীর স্রোতের সঙ্গে মিলিত করে দিলে আদিগঙ্গার স্রোতবেগ কমে যায় এবং তারও পরে ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে কর্নেল উইলিয়াম টালি আদিগঙ্গার খাত ধরে একটি খাল কেটে গড়িয়া থেকে পনেরো কিলোমিটার পূর্বে শামুকপোতার কাছে বিদ্যাধরী নদীর সঙ্গে যুক্ত করে দেন। ফলে আদিগঙ্গার খাতে যে সামান্য স্রোত ছিল তা-ও মন্থর হয়ে গড়িয়ার পর থেকে প্রায় মজে যায়। তাই ১৭৬৪-৭৬ খ্রিস্টাব্দে রেনেলের ম্যাপে নালুয়া পর্যন্ত আদিগঙ্গার স্রোতকে সরু খাল রূপে দেখানো হয়েছে। যাই হোক বারুইপুর থানার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত আদিগঙ্গা আজ মজে গেলেও বহু প্রাচীন শ্মশানভূমিগুলির শবদাহ কর্ম আজও সমানে সক্রিয়। এক সময় এই আদিগঙ্গার যত্রতত্র শ্মশানরূপে ব্যবহৃত হত, এখন অবশ্য মুখ্য শ্মশানগুলি তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। অবশ্য সেগুলির সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। কিছু কিছু শ্মশানভূমির পরিবেশ এখনও গা ছমছম করা আধিভৌতিক ভয়ঙ্কর ভয়ানক।

এবার বারুইপুর থানার শ্মশানভূমিগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক।

হিন্দুসম্প্রদায়ের শ্মশানভূমি

হালদার চাঁদনি শ্মশান :

অধুনা বারুইপুর শহরের পশ্চিমে দু-কিলোমিটারের মধ্যে পুরন্দরপুর গ্রামে মজে যাওয়া আদিগঙ্গার ধারে হালদার চাঁদনি মহাশ্মশানটি অবস্থিত। শ্মশানটি কল্যাণপুর অঞ্চল পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত। বারুইপুর থানার মধ্যে হালদার চাঁদনি শ্মশানটিই সদা সক্রিয় রূপে সর্ব-অর্থেই উৎকৃষ্ট। যদিও এখানে বৈদ্যুতিক চুল্লির ব্যবস্থা নেই তথাপি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে সরকারি রেজিস্ট্রিকৃত এই শ্মশানটিতে ব্রাহ্মণ ও ডোমসহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াচারের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ এবং শবদাহের কাঠ শ্মশান কমিটি নির্ধারিত মূল্যে পাওয়া যায়। উপরে ছাউনিযুক্ত পাকা চিতার ব্যবস্থা এখানে আছে। ফলে রোদ-বৃষ্টিতে শবদাহের অসুবিধা হয় না। একসঙ্গে ছ'টি শবদাহ কর্ম এখানে সুসম্পন্ন করা যায়। এছাড়া যাত্রীদের বসে বিশ্রাম নেবার উপযুক্ত পাকা মেঝে যুক্ত দুটি চওড়া শেডের ব্যবস্থা আছে। শ্মশানের মধ্যে দণ্ডায়মান একটি প্রাচীন ধ্যানগম্ভীর বহু শোকের সাক্ষীরূপী কদম্ববৃক্ষ, যার পত্র মর্মরে যেন অহরহ ধ্বনিত হয় মানুষের জীবন-মৃত্যুর লীলা রহস্য।

কবে থেকে মানুষ এখানে শবদাহ করছে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা এখন আর সম্ভব নয়। বলা যায় এই অঞ্চলে যেদিন থেকে মানুষ বসবাস শুরু করেছে সেদিন থেকেই এখানে শবদাহের শুরু। তবে এই শ্মশান সংলগ্ন জোড়া শিবমন্দির চূড়ায় উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে কালীচরণ শর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ মন্দির দুটি নির্মাণ করেছিলেন। দক্ষিণের মন্দিরটি নারায়ণীশ্বর শিবমন্দির এবং উত্তরের মন্দিরটি রামনাথেশ্বর শিবমন্দির। ওই কালীচরণ শর্মা পাশের ধোপাগাছি গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার হালদার বংশের ব্যক্তি বলেই অনুমিত হয়। কারণ ওই সময় ওই অঞ্চলে শর্মা ব্রাহ্মণ বলতে সঙ্গতি সম্পন্ন হালদার বংশেরই অস্তিত্ব ছিল। পরবর্তীকালে পাইকপাড়ার জমিদার হর্ষমুখীর তালুকের অধিকারভুক্ত এই অঞ্চলের কিছু অংশের মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার রূপে ধোপাগাছির হালদার বংশ এখানে তীর্থযাত্রী ও শ্মশানযাত্রীদের জন্য চালা বা মণ্ডপ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী স্থানটি 'হালদার চাঁদনি' নামে অভিহিত হয়ে আসছে। এঁদের তৈরি মন্দিরের কাছে আদিগঙ্গ য নামার সানের ঘাট ও তার পাশে এই বংশের জমিদার দেবেন্দ্রনাথ হালদারের ভগ্ন স্মৃতি সৌধটির অস্তিত্ব আজও দেখা যায়। হালদার চাঁদনি শ্মশানের প্রাথমিক সংস্কারে যে এই হালদার বংশের অবদান ছিল তা বলাই বাহুল্য। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেও শ্মশান সংলগ্ন অঞ্চলটি নির্জন ঝোপজঙ্গল বাগান, সাপখোপ, শিয়াল, বাঘরোল, গন্ধনকুল, নকুল প্রভৃতি জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ ছিল। এখান দিয়ে মানুষ চলাচল করতে ভয় পেত। কিন্তু পরশপাথরের

স্পর্শের মতো যেদিন থেকে স্থানীয় শ্রীশচন্দ্র ব্যানার্জী প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীশ স্মৃতি শ্মশান কালী মন্দির'-এর দায়িত্ব নিয়ে কলকাতার যাদবপুর নিবাসী মহারাজ কালিকা চৈতন্য ব্রহ্মচারী (আসল নাম বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়) এই শ্মশানে বসবাস শুরু করেন সেদিন থেকে এই শ্মশান সংলগ্ন স্থানের সমস্ত ভয়ভীতি কেটে যায় এবং ধীরে ধীরে এখানে জনসমাগম ঘটতে শুরু করে। মহারাজ কালিকা চৈতন্য ব্রহ্মচারী আবাল বৃদ্ধবনিতার কাছে পণ্ডিতমশাই নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁরই আপ্রাণ প্রচেষ্টায়, আর্থিক সাহায্যে ও এলাকার মানুষের সহযোগিতায় এই হালদার চাঁদনি শ্মশান সংলগ্ন স্থানে একে একে পোস্টআফিস, পুরন্দরপুর মঠ, মিলনসংঘ ও পাঠাগার, হোমিওপ্যাথি ডাক্তারখানা, যোগব্যায়াম কেন্দ্র, বেবি ক্রেজ বালোয়াদী, প্রাথমিক বিদ্যালয়, পুরন্দরপুর মঠ, সাধন সমর নারী শিক্ষায়তন, পুরন্দবপুব মঠ বয়েজ হাইস্কুল, মহিলাদের জন্য স্নানাগার, শ্মশান পরিচালন অফিস এবং সর্বোপরি বারুইপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য বারুইপুর কলেজ স্থাপনে বারুইপুরের প্রাক্তন বিধায়ক হেমেন মজুমদার মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিতমশাইয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শ্মশানটির আমূল সংস্কারও সাধিত হয়। এছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে এখানে কয়েকটি দোকান, সেলুন, শল্যচিকিৎসার যন্ত্রপাতি নির্মাণের ছোট কারখানা গড়ে উঠেছে। শ্মশানের পাশেই জীবনের প্রবাহ—জীবন আর মৃত্যু এখানে যেন পাশাপাশি লীলায়িত।

এই শ্মশানেই পণ্ডিতমশাই কর্তৃক দৃষ্ট একটি অলৌকিক ঘটনার বিবরণ আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক স্বয়ং পণ্ডিতমশাইয়ের মুখেই তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে শুনেছিল। ঘটনাটি এইরূপ— একদিন পণ্ডিতমশাই যথারীতি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে শ্মশান সম্পৃক্ত কালীমন্দিরের ঘাটে আলতাপেড়ে শাড়িপরা একপিঠ বিন্যস্ত কালো এলোচুলে এক রমণীকে কিছু ধুইতে দেখেন। এই ঘটনায় তিনি যখন বিস্মিত ঠিক সেই সময় তাঁকে রোমাঞ্চিত করে সহসা রমণীটি অদৃশ্য হয়ে যান। পণ্ডিতমশাইয়ের বুঝতে বাকি থাকে না যে, এ ভবতারিণী মা কালীর লীলা। শ্রীশ স্মৃতি শ্মশানকালী মন্দির গত্রে একটি শ্বেতপাথরে ঘটনাটি অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ আছে। ''কালীঘাট' কালীগঙ্গার এই ঘাটে 'মাকে কিছু ধুইতে দেখা গিয়াছিল। প্রতিবছর শ্যামাকালী পূজার পূর্বদিন এই শ্মশানকালী পূজিতা হন।

হালদার চাঁদনি শ্মশানটি সংস্কৃত হয়ে বর্তমানে পুরন্দরপুর মঠ শ্মশান নামে পরিচিত। এই সংস্কার কর্মে যাঁবা অর্থ দান করে সাহায্য করেছেন স্থানাভাবে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হল—ড. সুজন চক্রবর্তী (বিধায়ক), বস্‌কো লিমিটেড, উৎকল এ্যাসবেস্‌টস, সুনীল দত্ত (সুবুদ্ধিপুর, বারুইপুব), ইলা ঘোষ (পদ্মপকুর, বারুইপুর), কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ও মীরা চক্রবর্তী (সালোপুর, বারুইপুর), কৃষ্ণপদ মণ্ডল (পুরন্দরপুর, বারুইপুর), অরবিন্দ ঘোষ ও কবিতা ঘোষ (সুবুদ্ধিপুর, বারুইপুর), পুরন্দরপুর

মঠ শ্মশান উন্নয়ন সমিতি ইত্যাদি।

আলোচ্য শ্মশানভূমির আশেপাশের বিষ্ণুপুর, সোনারপুর ও বারুইপুর থানার একাংশের মানুষজন শবদাহের জন্য এখানে আসেন। এই শ্মশান থেকে শবদাহের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। শুধু তাই নয়, মৃতদেহের নাম, পরিচয় ও ঠিকানা লেখা ডেথসার্টিফিকেট দেখে তবেই সরকারিভাবে খাতায় রেজিস্ট্রিকৃত করা হয় এবং তারপর এখানে দাহ করার অনুমতি মেলে। ভবিষ্যতে এই শ্মশানে একটি বৈদ্যুতিক চুল্লি স্থাপন করার পরিকল্পনা শ্মশান উন্নয়ন সমিতির রয়েছে।

কীর্তনখোলা শ্মশান :

মহাপ্রভু শ্রীশ্রী চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর নদীয়ার শান্তিপুর থেকে গঙ্গার তীরে তীরে দ্বারির জাঙ্গাল নামক এক প্রাচীন পথ ধরে সপার্ষদ হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে অধুনা বারুইপুর থানার অন্তর্গত প্রাচীন আটিসারা গ্রামে আচার্যের কুটিরে পদার্পণ করেন এবং একরাত্রি অতিবাহিত করে কুটিরের দক্ষিণে অদূরে আদিগঙ্গার ধারে একটি খোলামেলা স্থানে হরিনাম সংকীর্তন করেন। সেই থেকে স্থানটির নাম হয় কীর্তনখোলা। অন্য মতে এই স্থানে কীর্তন করার সময় খোলটি (মৃদঙ্গ) ভেঙে গিয়েছিল বলে স্থানটি কীর্তনখোলা নামে খ্যাত। আটিসারা গ্রামে মহাপ্রভুর আগমন ও কীর্তন প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত চৈতন্য জীবনীকাব্যের অন্যতম রচয়িতা বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' কাব্যে—

'হেন মতে প্রভু তত্ত্ব কহিতে কহিতে,
উত্তরিলা আসি আটিসারা নগরেতে।।
সেই আটিসারা গ্রামে মহা ভাগ্যবান।
আছেন পরমসাধু শ্রী অনন্ত নাম।।

যাই হোক পরবর্তীকালে এই 'কীর্তন খোলা' শ্মশানে রূপান্তরিত হয়। কীর্তনখোলা শ্মশানটি বারুইপুর পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডভুক্ত। টেন্ডার ডেকে শ্মশান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। শবদাহের জন্য এখানে কাঠ ও পাতার ব্যবস্থা আছে কিন্তু অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যটি যাত্রীদের অন্য কোথাও থেকে সংগ্রহ করতে হয়। ব্রাহ্মণও বাইরে থেকে ব্যবস্থা করতে হয়। বর্তমানে অনিল মিত্র নামে যে ব্যক্তি এই শ্মশানের টেন্ডার ডেকেছেন তিনিই শবের চিতা সাজিয়ে দেন। এখানে চিতা প্রজ্বলন স্থানের উপরে শেড আছে, পাশাপাশি দুটি শবদাহ করা যায়। আর আছে শেডযুক্ত যাত্রীদের বসার পাকা স্থান, পাকা প্রস্রাব পায়খানা, শবযাত্রীদের স্নানের জন্য শান বাঁধানো পুকুর, উত্তরে শ্মশানকালী মন্দির, টিউবওয়েল। এছাড়া এখানে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ ও একটি কদম্ব বৃক্ষ রয়েছে। প্রতি অমাবস্যার রাতে শ্মশানকালী

পূজা হয়। বিশেষ করে মহালয়ায় অমাবস্যা তিথিতে নতুন প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হয়।

কীর্তনখোলা শ্মশানের পাশের জমিতে শিশুর শব পুঁতে দেবার ব্যবস্থা আছে। সম্পূর্ণ শ্মশান চাতালটি ইট বাঁধানো এবং বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা যুক্ত। তবে বৈদ্যুতিক চুল্লি নেই। শ্মশানের বাইরের কুলপি রোডের ধারে ২/৩টি চায়ের দোকান আছে। শ্মশানের নিজস্ব অফিস নেই। এখানে দাহ করা শবের নাম বারুইপুর পৌরসভার খাতায় নথিভুক্ত হয়। এবং পৌরসভা থেকেই বার্নিং সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। মগরাহাট, বিষ্ণুপুর, ক্যানিং, বাসন্তী, গোসবা, সন্দেশখালি ও বারুইপুর থানার থেকে এখানে শবদাহ করা হয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের পদস্পর্শে ধন্য এই শ্মশানে বাংলার প্রখ্যাত পালাকার সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের দেহ অগ্নিস্পর্শে পঞ্চভূতে বিলীন হয়। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হয়েছে। এই স্মৃতিস্তম্ভের গাত্রে লেখা আছে—" সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও নাট্যকার, জন্ম ২১শে কার্তিক, ১৩০৭ (ইং ৬ই নভেম্বর, ১৯০০), মৃত্যু ১৪ই আশ্বিন, ১৪০৫ (ইং ১০ই অক্টোবর, ১৯৯৮), একাধারে বিপ্লবী, অসামান্য শিক্ষাবিদ, নট, নাট্যকার ও গীতিকার ছিলেন সৌরীন্দ্রমোহন। দেশবরেণ্য এই মহাপুরুষের মরদেহ ভস্মীভূত হয়েছিল এই মহাশ্মশানে। এখানে শায়িত তাঁর চিতাভস্ম। তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার।

বারুইপুরবাসীর পক্ষে
বারুইপুর পৌরসভা।"

শ্মশান আর অলৌকিকত্ব যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। এই অঞ্চলের গাঁ বুড়োদের অনেকেই আজও বলে থাকেন তাঁরা নাকি এক সময় গভীর রাতের নির্জন পরিবেশে এই স্থানে মহাপ্রভুর খোল কত্তালের ধ্বনি শুনতে পেতেন। হায় মহাপ্রভু, সভ্যতার অগ্রগতি আর মনুষ্য বসতির ভিড়ে তোমার স্মৃতিও আজ যেন ক্রমশ ম্লান হয়ে যাচ্ছে! জানি না পাশের বুড়ো অশ্বত্থের বয়স কত। যদি ১৫১০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে সে জন্মগ্রহণ করে থাকে তবে একমাত্র সেইসব ঘটনার সাক্ষী, কিন্তু সেও বা বলবে কি করে সেও তো বাক্যহীন। ভাবুক কোনো অক্লান্ত গবেষক হয়তো তার কথা শুনতে পাবেন কোনোদিন—হয়তো বা।

চিন্তামণি শ্মশান :

বারুইপুর থানার হরিহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে আদিগঙ্গার তীরে শ্মশানটি অবস্থিত। শ্মশানটির আয়তন প্রায় ১০ কাঠার মতো। দক্ষিণ-গোবিন্দপুরের বিশ্বাস পরিবারের পূর্ব-পুরুষগণ কর্তৃক এই শ্মশানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আনুমানিক ১৩০০ বঙ্গাব্দেরও পূর্বে কারণ বিশ্বাস পরিবারের চিন্তামণি বিশ্বাসের নাম খোদিত এখানে যে ভগ্ন যাত্রী নিবাসটির অস্তিত্ব আজও বর্তমান তাতে আরও লেখা আছে চিন্তামণি শ্মশানঘাট (১৩০০)। শ্মশানটির জমির পরিমাণ প্রায় ১২ কাঠার মতো। শ্মশানটির পাশেই আছে

গঙ্গায় নামার শান বাঁধানো ঘাট। এই ঘাটের একটু উত্তরে রয়েছে আর একটি প্রশস্ত শানের ঘাট। এটি ছিটেঘাট নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে শ্রীচৈতন্যদেব দ্বারীরজাঙ্গাল নামক একটি প্রাচীন পথ ধরে পুরী যাবার পথে সপার্ষদ হরিনাম করতে করতে এই স্থানে এসে আদিগঙ্গায় স্নান করে বিশ্রাম নিয়েছিলেন, সেই থেকে এখানে প্রতি বছর চৈত্র কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে বারুণী মেলা উদ্‌যাপিত হয়।

চিন্তামণি শ্মশানে গোবিন্দপুর, বৈকুণ্ঠপুর, লাঙলবেড়িয়া, শ্রীরামপুর প্রভৃতি গ্রামের মানুষ শবদাহ করে থাকেন। শ্মশানের মধ্যে শ্রীশ্রীসর্বেশ্বরী তারা মায়ের মন্দির আছে। মন্দিরটি ১৪০৪ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরের সেবায়েত তন্ত্রসাধক ভৈরবানন্দনাথ যিনি ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার হরিপাল থেকে এখানে এসে বসবাস করছেন। প্রতিবছর জগদ্ধাত্রী পূজার পূর্ব দিন অষ্টমী তিথিতে সর্বেশ্বরী তারা মায়ের পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

সর্বেশ্বরী তারা মায়ের মন্দিরের পাশেই দক্ষিণ গোবিন্দপুরের চট্টোপাধ্যায় পাড়ার বাসিন্দা গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি সমাধি গৃহ আছে। শোনা যায় তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর মৃত্যুর পরে সমাধি দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে গিয়েছিলেন।

এই শ্মশানেরও কোনো কমিটি ও অফিস নেই। বর্তমানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় ভৈরবানন্দনাথ ব্রাহ্মণের কাজ করে দেন। অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং চিতা প্রজ্জ্বলনের কাঠ, পাতা সবই শবযাত্রীদের নিয়ে আসতে হয়। এই শ্মশানে কোনো শেড দেওয়া চিতা নেই।

পরিশেষে ক্ষেত্রানুসন্ধানে এখানকার সর্বেশ্বরী তারা মায়ের সেবায়েত ভৈরবানন্দনাথের সাক্ষাৎকালে তাঁর মুখে যে একটি অলৌকিক কাহিনি শোনা গিয়েছিল তা উল্লেখ করছি। আজ থেকে প্রায় ১৩ বছর আগে রাত ১২টা নাগাদ পাশের দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামের এক রেলে কাটা যুবকের মৃতদেহ এখানে দাহ করে যাত্রীরা চলে যাবার পর হঠাৎ ভৈরবানন্দ বাবাজী চিতার দিক থেকে তীব্র আর্তনাদ শুনতে পান। এই আর্তনাদে তাঁর সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে কিন্তু তিনি কোনো মানুষ বা জন্তুকে দেখতে পান না। তখন তিনি তিনবার উচ্চস্বরে তারা-তারা-তারা বলে ওঠেন। ওই একটি ঘটনা ছাড়া আজও তিনি কোনো অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হননি বলে জানান।

সদাব্রত ঘাট :

বারুইপুরে পৌরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভূক্ত আদিগঙ্গার একটি ঘাটের নাম হল সদাব্রত ঘাট। বর্তমানে আদিগঙ্গার স্রোত হেজেমজে গিয়ে কোথাও কোথাও পুকুররূপে কিংবা একেবারে সংকীর্ণ নালারূপে দেখা যায়। সদাব্রত ঘাটের কাছে আদিগঙ্গা একটি অগভীর লম্বা পুকুররূপে বিদ্যমান। এখানে একটি প্রাচীন চওড়া ভগ্ন সান রয়েছে। বারুইপুরের জমিদার রায়চৌধুরীদের নির্মিত এই সানটি। এটি হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বসাধারণের ব্যবহৃত শ্মশান নয়।

কেবলমাত্র বারুইপুরের জমিদার রায়চৌধুরী পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর পর এখানে দাহ করা হয়। আঞ্চলিক কবি রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হরপার্বতী মঙ্গল' ও 'দুর্গামঙ্গল' কাব্যের আখ্যান অনুযায়ী দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার অধুনা সোনারপুর থানার অন্তর্গত রাজপুর থেকে রায়চৌধুরী পরিবারের দুর্গাচরণ রায়চৌধুরী সর্বপ্রথম বারুইপুরে আসেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের পদস্পর্শে ধন্য সাধু অনন্ত আচার্যের আশ্রমের সামান্য দক্ষিণে আদিগঙ্গার ঘাটে এক লক্ষ বিঘা জমি দান করে সদাব্রত উদ্‌যাপন করেন। সেই থেকে উক্ত ঘাটটির নাম হয় সদাব্রত ঘাট। প্রতিবছর মাঘমাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে ভৈমী-একাদশী ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে এখানে জমজমাট মেলা বসে এবং হাজার হাজার পুণ্যার্থীদের সমাগম হয়। সান বাঁধানো সদাব্রত ঘাটের পূর্বদিকে ঝুরি নামানো একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ বহু ঘটনার উত্থানপতনের নীরব সাক্ষী হয়ে দণ্ডায়মান। এরই পাশে আদ্যাশক্তি আনন্দময়ী আশ্রম ও নবগ্রহ মন্দির আর টালির চাল বিশিষ্ট কালীমন্দির। এখানেও একটি প্রাচীন যুগ্ম অশ্বত্থ বটবৃক্ষ দণ্ডায়মান।

প্রতিমা বিসর্জনের স্থান হিসেবে সদাব্রত ঘাটটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় কিন্তু বর্তমানে দিনেব পর দিন সদাব্রত ঘাট সংলগ্ন অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় রায়চৌধুরী পরিবারের শবদাহের বিরুদ্ধে এই অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণ তাদের অসুবিধার কথা বারুইপুর পুরসভাকে জানানোর কথা ভেবেছেন বলে জানা যায়।

বলা বাহুল্য যে, বারুইপুরের জমিদাব রায়চৌধুবী পরিবারের বিখ্যাত ব্যক্তিগণের মধ্যে রাজপুর থেকে বারুইপুরে সর্বপ্রথম আগত নীলকর সাহেবদের যম ও স্থানীয় প্রজাদের ত্রাতা দুর্গাচরণ রায়চৌধুরী, বারুইপুরের বায়চৌধুরীদের বিখ্যাত রাজবল্লভ ভবনের প্রতিষ্ঠাতা বাজবল্লভ রায়চৌধুরী, বারুইপুর রাসমাঠে পরপর তিনবার অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক স্বদেশি মেলার প্রধান উদ্যোক্তা রাজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, বারুইপুরে ইংরেজ নীলকর সাহেবদের তৈরি ঐতিহাসিক বড়কুঠির ক্রেতা রাজকুমার রায়চৌধুরী (সম্ভবত বারুইপুর পৌরসভার প্রথম পৌরপ্রধান) এবং বারুইপুর পৌরসভাব বিভিন্ন সময়ের পৌরপ্রধান যথাক্রমে ক্ষেত্রমোহন রায়চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, দুর্গাদাস রায়চৌধুরী, শিবদাস রায়চৌধুরী, শশীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, শৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী প্রমুখ অধিকাংশেরই নশ্বর দেহ যে এই সদাব্রত শ্মশানঘাটে পঞ্চভূতে বিলীন হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

নাচনগাছা শ্মশান :

শ্মশানটি বারুইপুর থানার ধপধপি ২নং পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত নাচনগাছা গ্রামে অবস্থিত। এই শ্মশান সংলগ্ন আদিগঙ্গার ঘাটটি পশ্চিমবাহিনীর ঘাট নামে পরিচিত। কারণ এখান থেকে আদিগঙ্গা পশ্চিমদিকে বাঁক নিয়ে প্রবাহিত। আজও এর অস্তিত্ব কিছুটা চিহ্ন রেখে গেছে। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রণীত অভয়ামঙ্গল (চণ্ডীমঙ্গল)

কাব্যে ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগরের আদিগঙ্গা ধরে সিংহলে বাণিজ্য যাত্রা প্রসঙ্গে গঙ্গার তীরে যে সব গ্রাম নাম ও স্থান নামের উল্লেখ আছে সেগুলির মধ্যে 'নাচনগাছা'র উল্লেখ রয়েছে।

বালুর ঘাট এড়াইল বেনিয়ার বালা।
কোলীঘাটে এলা ডিঙ্গা অবসান বেলা।।
মহাকালীর চরণ পূজেন সদাগর।
তাহার মেলান বয়ে যায় মাইনগর।।
নাচনগাছা, বৈষ্ণবঘাটা বাম দিকে থুইয়া।
দক্ষিণেতে বারাসাত গ্রাম এড়াইয়া।।
ডাইনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবালা।
ছত্রভোগে উত্তরিল অবসান বেলা।।

পশ্চিমবাহিনী ঘাটের এই নাচনগাছা শ্মশানে আশেপাশের গ্রামের মানুষ, জয়নগর থানার এক অংশের মানুষ এমনকী ক্যানিং থানার মানুষজনও শবদাহ করেন। এখানে আজও শেড দেওয়া কোনো পাকা চিতা নেই। এগারো জনের শ্মশান কমিটি থাকলেও এখানে এখনও কাঠ, পাতা-সহ শবদাহ কর্মের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায় না। নির্দিষ্ট কোনো ব্রাহ্মণও নেই। এসব শবযাত্রীদের নিয়ে আসতে হয়। তবে এখানে বর্তমানে অমলা নামে এক ডোমী আছে যিনি চিতা সাজানো ও আগুন ধরানোর প্রয়োজনে সাহায্য করে থাকেন, বিনিময়ে কিছু অর্থ পান।

নাচনগাছা শ্মশানে বুড়ো বটবৃক্ষের ছায়াচ্ছন্ন তলদেশে শেড যুক্ত যাত্রী বিশ্রামাগার, যাত্রীদের জন্য ছোট ছোট বসার স্থান, পরিস্কার পুকুর ইত্যাদি আছে। আর আছে স্থানীয় ঘরামি পরিবারের সমাধিস্থান এবং শ্মশানকালী মন্দির। একদা স্থানীয় দ্বিজপদ মণ্ডল মহাশয় শ্মশান সংলগ্ন নাচনগাছা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে রথোৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন। শ্মশানকালী মন্দিরের পাশে রথের কাঠামোটা আজও আছে। সম্প্রতি গ্রামের সংহতি সংঘের উদ্যোগে এখানে দুর্গাপুজো হয়। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারে জানা যায় যে, পূর্বে এই শ্মশান হরকোনা, গেঁওয়া, ঝাউ, বানী, হেঁতাল এবং সোঁদালী গাছের ঝোপে জঙ্গলাচ্ছাদিত ছিল। ভবিষ্যতে নাচনগাছা শ্মশানে একটি শেডযুক্ত পাকা চিতা তৈরি পরিকল্পনা আছে বলে শ্মশান কমিটির কাছ থেকে জানা গেল। বর্তমানে শ্মশানটির আয়তন প্রায় ১০/১২ কাঠার মত। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস দেবতাদের নির্দেশ পেয়ে দেবী মনসা এই স্থানেই গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়ে দেওয়া চাঁদের বাণিজ্য ডিঙাগুলিকে হনুমান ও নাগগণের সাহায্যে তুলে বেহুলাকে প্রদান করলে বেহুলা সুন্দরী এই পশ্চিমবাহিনী ঘাটে গাছের তলায় নেচে ছিল। সেই থেকে

এই ঘাট সংলগ্ন স্থানের নাম হয় নাচনগাছা। এ প্রসঙ্গে বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গল কাব্যে আছে।

'একে একে উঠিল চান্দর ডিঙ্গা চৌদ্দ গোটা।
বিদায় লইয়া চলে পবনের বেটা।।
দেখিয়া কৌতুক অতি বেহুলা সুন্দরী।
আরবার নাচে বেহুলা সাহের কুমারী।।'[১]

সূর্যপুর নীলকুঠি বাঁধ শ্মশান :

এই শ্মশানটির অবস্থান ধপধপি-১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সূর্যপুর গ্রামে। ইংরাজ শাসনে এখানে আদি গঙ্গার পাড় বেঁধে নীলকর সাহেবরা নীলকুঠি নির্মাণ করে এই অঞ্চলে নীল চাষের প্রবর্তন করেছিলেন। পরে এখানেই যে শ্মশান গড়ে ওঠে তার নাম হয় তাই নীলকুঠি বাঁধ শ্মশান। সুতরাং বলা যায় যে শ্মশানটি আনুমানিক ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিশেষরূপ পরিগ্রহ করে। এখানে বিশেষভাবে কোনো শেড দেওয়া পাকা চিতা নেই। নেই কোনো ব্রাহ্মণ, কাঠ, পাতা ও দাহকর্মের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়ার ব্যবস্থা। শ্মশান কমিটিও নেই। শুধু আছে একটি কালীমন্দির, একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ এবং দুটি সাধুর দুটি সমাধিস্থল—একটি মশানি বাবার ও একটি প্রেমানন্দ গিরির। মশানি বাবার মৃত্যু তারিখ ১৭ চৈত্রে প্রতি বছর এখানে বিশাল মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় বিভিন্ন রাজ্যের বিশেষ করে অসমের কামরূপ থেকে আগত বহু সাধুর ভিড় হয়। এই শ্মশানে আশেপাশের গ্রামের মানুষ তথা ওলবেড়ে, আলিপুর আর সূর্যপুরের কিছু অংশের মানুষ শবদাহ করতে আসেন।

বংশী বটতলা শ্মশান :

শিখরবালি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দক্ষিণ কল্যাণপুর গ্রামে বংশী বটতলা নামে প্রাচীন শ্মশানটির অবস্থান। জনশ্রুতি এই যে একদা এখানে এক সাধু বসবাস করতেন। তিনি এখানে একটি বটবৃক্ষ রোপণ করেন এবং কিছুদিন পর ওই বটবৃক্ষের নীচে একটি রাধাকৃষ্ণ মূর্তি স্থাপন করে আরাধনা করতে থাকেন। সেই থেকে বটগাছের নীচে বংশীধারী কৃষ্ণের নামে স্থানটির নাম হয় বংশী বটতলা। এই ঘটনা সত্য হলে বুঝতে হবে সাধুটি বৈষ্ণব ছিলেন। আবার অন্য মতে সাধুটির নাম ছিল বংশী তাই তাঁর নামানুসারে শ্মশানটির নাম বংশী বটতলা শ্মশান। এখানে এখন যে কালী মন্দিরটি আছে তার মধ্যে লক্ষণীয় হল শ্মশানকালী বিগ্রহের পাশে কৃষ্ণকালীর অবস্থান। এইকালী চতুর্ভুজা দুহাতে ধরে আছেন একটি বংশী। অর্থাৎ এই অঞ্চলে শ্রী চৈতন্যদেবের আগমনে যে বৈষ্ণব ধর্মের গভীর প্রভাব পড়েছিল শাক্ত ধর্মের উপর তারই একটি সমন্বিত রূপ ও ভাবের ব্যঞ্জনা এতে ধরা পড়েছে। স্থানীয় মানুষজন তাঁদের বংশ পরম্পরায় শুনে আসছে যে এখানে আদিগঙ্গার ঝোপ জঙ্গলের

মধ্যে দূর দুরান্তের মানুষজন মৃতদেহ ফেলে দিয়ে চলে যেত। পরে এখানে প্রয়োজনে একটি শ্মশান গড়ে ওঠে। শ্মশানের বয়স আনুমানিক প্রায় ৫০০ বছরেরও অধিক। এত পুরাতন শ্মশান বারুইপুর থানায় আর নেই বললে চলে।

বর্তমানে এই শ্মশানে ঢুকতেই একটি পুরাতন ছাদ দেওয়া ঘর বিশিষ্ট যাত্রী বিশ্রামালয় ডানদিকে পরিলক্ষিত হয়। এখানে মোট তিনটি পাকা চিতা আছে। দুটির মাথায় কোনো শেড নেই। একটি টিনের শেড যুক্ত পাকা চিতা যা সম্প্রতি ২০০১ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপার্ট নামে একটি সংস্থার দরাজ আর্থিক সাহায্যে ভাঁড়ু মহেশপুরের বিবেকানন্দ জনকল্যাণ সংঘ কর্তৃক স্থাপিত হয়। এই আর্থিক সাহায্যে এখানে আরও একটি টিনের শেড দেওয়া যাত্রী বিশ্রামালয় স্থাপিত হয়েছে। শ্মশানের উত্তরদিকে একটি বুড়ো অশ্বত্থ বৃক্ষ এবং দক্ষিণদিকে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ অনেক ঘটনার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই সুপ্রাচীন শ্মশানটিতে আজও কমিটি নেই। নেই কাঠ, পাতা, ব্রাহ্মণ ও দাহকর্মের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাবার ব্যবস্থা। ইদানীং শ্মশানের কাছেই একটি পরিবার বিশেষ সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে কাঠ রাখেন, তাই সব সময় কাঠ মেলেও না।

স্বর্গত বরেন্দ্রনাথ পাত্রের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁর পুত্রদ্বয় যথা শম্ভুনাথ পাত্র ও হরিদাস পাত্র ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দে যে কালী মন্দিরটি স্থাপন করেছিলেন ঐ কালীমন্দিরে শ্মশানকালীর পূজা প্রতি অমাবস্যা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় আর বৈশাখ মাসে ফলগছানো ব্রত উপলক্ষে বার্ষিক কৃষ্ণকালী পূজা সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয় বলে স্থানীয় লোকজন জানান।

এই শ্মশানে শুধু দক্ষিণ কল্যাণপুর নয়, দুর্গাপুর, বাগদহ, ধনবেড়িয়া, দেবীপুর, কালিকাপুর, চন্দনপুকুর, রামগোপালপুর, শিখরবালি, সোনাগাছি, ভাঁড়ু, দরমহলা, রামকৃষ্ণপুর এমনকী ক্যানিং থেকেও মানুষজন এসে তাঁদের শবদাহ কর্ম সুসম্পন্ন করেন। এখানে শান বাধানো ঘাটটিও প্রাচীন।

অদূর ভবিষ্যতে এই শ্মশানের পুরনো যাত্রী বিশ্রামাগারটি এবং শানের ঘাটটি নতুনভাবে তৈরি হয়ে আসা প্রশাস্ত বাইপাসের গ্রাসে ভাঙা পড়বে বলেই মনে হয় এবং তখন শ্মশানের আয়তনও যাবে কমে। বর্তমানে শ্মশানটি আয়তন প্রায় ৮ কাঠার কম নয়। এখানে কয়েকটি সমাধিও আছে। বিশেষ করে স্থানীয় যোগেন সর্দারের চিতাভস্ম এখানে পুঁতে তার উপর যে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হয় তা আজও কালীমন্দিরের সম্মুখে বিদ্যমান।

বারিকপাড়া অশ্বত্থতলা শ্মশান :

কল্যাণপুর অঞ্চলের দক্ষিণ-কল্যাণপুর গ্রামের পূর্বপ্রান্তে আদিগঙ্গার ধারে এই শ্মশানের অবস্থান। এই স্থানটি একসময় বুড়ো নদী নামে পরিচিত ছিল। এখানে গঙ্গায় নামার পাকা শানটি দক্ষিণ কল্যাণপুর নিবাসী গয়ারাম নস্কর নির্মাণ করে দেন আর পাকা চিতাটি তৈরি

করে দেন ওই গ্রামেরই সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডলের সহধর্মিণী পচিমনী দাসী। শানটি নির্মিত হয় ১৩১৩ বঙ্গাব্দে আর চিতাটির নির্মাণকাল ১৩৭১ বঙ্গাব্দ। এই শ্মশানে যাত্রী বিশ্রামালয়টি ছাদওয়ালা পাকা। এখানে পূর্বে যে অশ্বত্থ বৃক্ষটি ছিল তার নীচে একসময় মৃত বাচ্চা ফেলে দিয়ে যেত গরিব মানুষজন। পরে তাদের সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। এই শ্মশানটিতে আশেপাশের নিহাটা, মধ্য কল্যাণপুর, উত্তর কল্যাণপুর এবং পুরন্দর গ্রামের দক্ষিণাংশের মানুষজন শবদাহ করে থাকেন। কিন্তু আজও এখানে কোনো শ্মশান কমিটি নেই। পাওয়া যায় না কাঠ, পাতা, ব্রাহ্মণ এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। সবই যাত্রীদের নিয়ে আসতে হয়।

এই শ্মশানের কাছেই অবস্থিত একটি কালীমন্দির এবং সুপ্রাচীন পঞ্চানন্দের মন্দির আর অনতিদূরেই বিখ্যাত কল্যাণ মাধব শিবমন্দির যার কথা উল্লেখ আছে কৃষ্ণরামদাসের ও রুদ্রদেবের রায়মঙ্গল কাব্যে।

'মালঞ্চ রহিল দূব বাহিয়া কল্যাণপুর
কল্যাণ মাধব প্রণমিল।।''—কৃষ্ণরাম দাস

'কল্যাণপুরে পূজিয়া করি মকর চান,
সিঙ্গা কাড়া না বাদ্ধ শাবদ অপার।' —রুদ্রদেব

সম্প্রতি এই শ্মশানের পাশ দিয়ে বাইপাশ তৈরির সময় এই শ্মশানের যাত্রী বিশ্রামালয়, শানের ঘাট, তুলসীমঞ্চ সব ভাঙা পড়েছে। কালীমন্দিরটা ভাঙা পড়েনি তবে ভবিষ্যতে কী হবে এখনই বলা যাচ্ছে না।

ভাদ্দুরীঘাট শ্মশান :

ভাদ্দুরীঘাট শ্মশানটি এই থানার শিখরবালি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন শিখরবালি গ্রামের শেষসীমায় অবস্থিত। পূর্বে এখানে বসবাসকারী ভাদ্দুরী নামে এক ডোম্বীর নামে শ্মশানটির নাম ভাদ্দুরী শ্মশান হয়েছে বলে জনশ্রুতি আছে। প্রায় দেড়শো থেকে দুশো বছর পূর্বে শ্মশানটি প্রতিষ্ঠিত বলে স্থানীয় মানুষজন জানান। বারুইপুর পুরাতন বাজার সন্নিকটে বসবাসকারী বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডা. বিপিন ঘোষ কর্তৃক এই শ্মশানে একটি ছাদযুক্ত যাত্রী বিশ্রামালয় স্থাপিত হয়। এছাড়া এখানে একটি শেড বিহীন পাকা চিতা, কালীমন্দির, তুলসী মঞ্চ, প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। প্রতিবছব জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্মশান-কালী পূজা হয়।

এখানে একটি শ্মশান কমিটি থাকলেও শব যাত্রীদের কাঠ, পাতা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দ্রব্যাদি, ব্রাহ্মণ কিছুই পাবার ব্যবস্থা এখানে নেই, সবই তাঁদের বাইরে থেকে আনতে হয়। অবশ্য শ্মশান কমিটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা না থাক এখানে পুকুরে নামার জন্য একটি শানের ঘাট, একটি টিউবওয়েল এবং গঙ্গার খাত ও চিতার মাঝখানে একটা গার্ডওয়াল ইত্যাদি নির্মাণ করা।

ভাদ্দুরীঘাট শ্মশানে শিখরবালি, বিদ্যাধরপুর, ইন্দ্রপালা, হোটর, মাকালতলা প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষ শবদাহ করতে আসেন।

এছাড়া বারুইপুর থানার কয়েকটি ছোটখাট শ্মশান আদিগঙ্গার মজাখাত ধরে অবস্থিত দেখা যায়। এগুলির কোনো বিস্তারিত বা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস নেই। তাই এগুলির একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল।

শ্মশানের নাম	পঞ্চায়েতের নাম	গ্রামের নাম	কোন কোন গ্রামের মানুষ এখানে শবদাহ করে	বিশেষত্ব
ভট্চায শ্মশান	হরিহরপুর পঞ্চায়েত	খাসমল্লিক	হরিহরপুর, খাসমল্লিক, বেনেডাঙ্গা, ডিহি মেদনমল্ল	শ্মশান কমিটি আছে, কালীমন্দির, যাত্রীবসার স্থান গঙ্গায় নামার শান আছে। প্রতিবছর চৈত্র মাসে শ্মশানকালী পূজা উপলক্ষে মেলা বসে।
পাতালির শ্মশান	হরিহরপুর পঞ্চায়েত	বৈকুণ্ঠপুর	বৈকুণ্ঠপুর, খাসমল্লিক, দক্ষিণ গোবিন্দপুর	শ্মশান কমিটি আছে, কালীমন্দির আছে ও একটা বড় বটবৃক্ষ আছে।
বদিদের শ্মশান	হরিহরপুর পঞ্চায়েত	বৈকুণ্ঠপুর	বিডাল, বৈকুণ্ঠপুর	শ্মশান কমিটি নেই, দুটি শান বাঁধানো পুকুর, বৈকুণ্ঠপুরের বদ্যিদের প্রতিষ্ঠিত, যাত্রীদের বসার ঘর আছে।
জংলে শ্মশান	শিখরবালি ১নং পঞ্চায়েত	শিখরবালি	এই গ্রামের চক্রবর্তী ও বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার	চক্রবর্তী জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত শ্মশান কমিটি নেই।
কুমারহাট শ্মশান	ধপধপি ১নং পঞ্চায়েত	কুমারহাট	চাঁদোখালি ও কুমারহাট	শ্মশান কমিটি নেই, একটা পাকা চিতা আছে, আনুমানিক বয়স আড়াইশো বছর।
নস্করঘাট শ্মশান	কল্যাণপুর পঞ্চায়েত	দক্ষিণ কল্যাণপুর	চণ্ডীপুর, মলয়াপুর, নিহাটা, কল্যাণপুর	কল্যাণপুর শ্মশান কমিটি নেই, পাকা ছাদওয়ালা যাত্রী বিশ্রামালয় আছে যা সম্প্রতি সম্প্রসারিত হয়েছে। শানের ঘাট আছে।
নস্করদের শ্মশান	কল্যাণপুর পঞ্চায়েত	পুরন্দরপুর	পুরন্দরপুর নস্কর পরিবার	শ্মশান কমিটি নেই। পাশের শিমূলতলায় বাচ্চাদের পোঁতা হয়।

ব্যানার্জীদের শ্মশান	কল্যাণপুর পঞ্চায়েত	পুরন্দরপুর	উত্তর কল্যাণপুরের জমিদার ব্যানার্জী পরিবার	শ্মশান কমিটি নেই, যাত্রীদের বসার ঘর যা অন্তর্জলি ঘর রূপে একদা ব্যবহৃত হত।
আলমপুর শ্মশান	শংকরপুর ১নং পঞ্চায়েত	আলমপুর	মীরপুর, আলমপুর।	শ্মশান কমিটি নেই। শেডহীন একটি পাকা চিতা আছে। দেবমন্দির, যাত্রী বিশ্রামালায়, এমনকী কোনো গাছ নেই। শ্মশানের বয়স প্রায় দুশো বছর।
মীরপুর হাটখোলা শ্মশান	শংকরপুর ১নং পঞ্চায়েত	মীরপুব	মীরপুর, শিবরামপুর, খানপুর, দৌলতপুর	শ্মশান কমিটি আছে। পাকা চিতা, শানেব ঘাট, যাত্রীবসার ঘর, কালী ও পঞ্চানন্দের মন্দির, একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে। শ্মশানের বয়স আনুমানিক দুশো বছর।
কেশবপুর শ্মশান	শংকরপুর ২নং পঞ্চায়েত	কেশবপুর	কেশবপুর	খোলা আকাশের তলায় শবদাহ হয়। ব্রাহ্মণবাড়িতে বসে শ্মশান যাত্রীদের কাছে অশ্বত্থ ও বটপত্রের উপব মন্ত্র লিখে দেন। যেটি শবের উপর স্থাপন করে মডা পোড়ানো হয়।
শংকরপুর শ্মশান	শংকরপুর ১নং পঞ্চায়েত	শংকবপুর	দৌলতপুর, খানপুর, গাজিরহাট, শংকরপুব।	শ্মশান কমিটি নেই। শ্মশানেও বর্ণবৈষম্য। পূর্বদিকের চিতা ব্রাহ্মণদের দাহ করা হয় আর পশ্চিম দিকের চিতায় অব্রাহ্মণদের দাহ কবা হয়। পাকা চিতা নেই।
শাসন শবদাহ মন্দির	বারুইপুর ৯নং ওয়ার্ড	শাসন	শাসন, রোমগোপালপুর, কুন্দরালী, বারুইপুর ৯নং ওয়ার্ড।	শ্মশান কমিটি নেই। দোল উৎসব ও হরিনাম সংকীর্তন হয়। পাকা চিতা নেই।

"এই কাঁথাখানি বিছাইয়া দিও আমার কবর পরে।"

জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গুরুত্বপূর্ণ থানা হল বারুইপুর। বিশেষ করে ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং প্রশাসনিক দিক দিয়ে বারুইপুর থানরা গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বর্তমানে থানাটির আয়তন প্রায় ২০৫.৪ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ ২০ হাজার। এর মধ্যে

একটা বড় অংশই হল মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের মৃতদেহ সৎকারের জন্য গোরস্থানগুলি পূর্বে যৌথভাবে দান করা বা কেনা ভূমির উপর গড়ে উঠেছিল। অনেক স্থানে রাজাবাদশা বা জমিদারদেরও বরাদ্দ নিষ্কর জমিতে গোরস্থান আছে। কিন্তু বর্তমান মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং জনবসতির ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ায় অন্যান্যস্থানের মত বাইরুপুর থানায়ও পরিবারভিত্তিক ব্যক্তিগত গোরস্থান অসংখ্য সৃষ্টি হয়েছে। এতে মুসলমান জনসাধারণ যেমন সুবিধা পান তেমনি মানসিক পরিতৃপ্তিও উপলব্ধি করেন।

বর্তমানে বারুইপুর থানায় তাই অসংখ্য গোরস্থান আছে। সেগুলির মধ্যে বড় বড় গোরস্থানগুলির কথাই উল্লেখিত হল। বারুইপুর থানার একটি অন্যতম মুসলমান সম্প্রদায় অধ্যুষিত অঞ্চল হল রামনগর ১নং অঞ্চলস্থ সীতাকুণ্ডু, চিত্রশালী, পুঁড়ি, চটারপাড়, কেবায়েতপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি। এখানে বড় বড় গোরস্থানগুলির মধ্যে অন্যতম হল সীতাকুণ্ডু গ্রামের গাজীডাঙ্গা গোরস্থান, গায়েনপাড়া গোরস্থান, মণ্ডলপাড়া গোরস্থান এবং সাঁফুইপাড়া গোরস্থান।

গাজিডাঙা গোরস্থানটি বারুইপুরের জমিদার রায়চৌধুরীদের দান করা পিরোত্তর সম্পত্তি বলে জানা যায়। কবি রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'হরপার্বতী মঙ্গল' ও 'দুর্গামঙ্গল' কাব্য দ্বয়ে উল্লেখিত ঘটনা থেকে জানা যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জমিদার রায়চৌধুরী বংশের পূর্বপুরুষ দুর্গাচরণ রায়চৌধুরী সোনারপুর থানার রাজপুর গ্রাম থেকে প্রথম বারুইপুরে এসে আদিগঙ্গার সদাব্রত ঘাটে—সদাব্রত উদ্‌যাপন করেন এবং এক লক্ষ বিঘা জমি দান করেন। গাজিডাঙার গোরস্থান অধ্যুষিত ভূমি সেইভাবেই প্রাপ্ত হয়ে দেওয়ানি স্বত্ত লাভ করে। এই গোরস্থানের মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে যাওয়ায় গোরস্থানটি দুভাগে বিভক্ত—এক দিকে (দক্ষিণ) দেওয়ানগাজির মাজার সংলগ্ন গোরস্থান এবং অন্যদিকে (উত্তর) ফাঁসিডাঙা গোরস্থান। গাজিডাঙা গোরস্থানে মীর পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের এবং ফাঁসিডাঙা গোরস্থানে সর্দ্দার পরিবারভুক্ত মৃত ব্যক্তিগণের দেহ কবর দেওয়া হয়। গাজির ডাঙার আয়তন আনুমানিক প্রায় ২ বিঘা এবং ফাঁসিডাঙারও আয়তন আনুমানিক ২ বিঘার মতই হবে।

গাজিডাঙা ও ফাঁসিডাঙা সম্পর্কে একটি লোককথা এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে। প্রাচীনকালে এই অঞ্চলে এক রাজা ছিলেন, তাঁর রাজপ্রাসাদও এই অঞ্চলে ছিল। একদা মুসলমান শক্তির সঙ্গে এই রাজার যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে রাজা পরাজিত হলে রাজকন্যা সীতা মনের দুঃখে অধুনা সীতা মায়ের মন্দিরের পিছনে বৃহৎ একটি কুণ্ডের জলে ডুবে আত্মহত্যা করেন। সেই কারণে কুণ্ডটির নাম হয় সীতাকুণ্ড। এবং ওই সীতাকুণ্ডের নামে গ্রামটিরও নাম হয় সীতাকুণ্ড -সীতাকুণ্ডু। পরে ওখানেই স্থাপিত হয় সীতার স্মরণে সীতা মন্দির। এই সীতা কিন্তু রাম ঘরণী সীতা নয়। অনেক পরে রামনগর নিবাসী শিশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্দিরে রামসীতার

যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা আজ থেকে দেড়শো বা দুশো বছরের পূর্বে নয়। মুসলমান অধিকারের পর পূর্বোক্ত সীতাকুণ্ডের দক্ষিণ দিকে দেওয়ান গাজির মাজার নির্মিত হয় যা বর্তমানে গাজিডাঙা নামে কথিত। এখন সীতাকুণ্ডটির আর কোনো অস্তিত্বও নেই।

সীতাকুণ্ডু মণ্ডলপাড়া গোরস্থান এবং সীতাকুণ্ডু সাঁফুইপাড়া গোরস্থানের পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় ১৫ বিঘা করে। মণ্ডলপাড়া গোরস্থানে মণ্ডল গোষ্ঠী এবং সাঁফুই পাড়া গোরস্থানে সাঁফুই গোষ্ঠীর মৃতদেহগুলিকে কবরস্থ করা হয়।

সীতাকুণ্ডু গায়েনপাড়ার গোরস্থানটির আয়তন আনুমানিক ২ বিঘা। এই গোরস্থানে গায়েন ও সর্দার পরিবারভুক্ত ব্যক্তিরা মারা গেলে তাদের কবর দেওয়া হয়।

রামনগর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ বিত্তশালী পূর্বপাড়ার ধর্মতলা গোরস্থানটির আয়তন প্রায় ৩০ বিঘার মতো। এটি জমিদার রায়চৌধুরীদের দান করা ভূমি বলে জানা যায়। রায়চৌধুরীদেব আর একটি দান করা ভূমিতে অবস্থিত গোরস্থান হল রামনগর ১নং এবং সাউথ গড়িয়া ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যস্থ পাঁতারমাঠ গোরস্থান। এটি ফুলডুবি গ্রাম সংলগ্ন। সংলগ্ন গ্রামগুলির মুসলমান সম্প্রদায় তাদের মৃতদেহকে এই দুটি গোরস্থানে কবর দিয়ে থাকেন।

বারুইপুর পৌর এলাকার ৩নং ওয়ার্ডে অবস্থিত একটি বিশাল বিখ্যাত গোরস্থান হল সাজাহান রোডের পাশে অবস্থিত গোরস্থানটি। সন্নিহিত অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায় তাদের মৃতদেহকে এই পবিত্র গোরস্থানে সমাধি দেন। এই স্থানটি পোয়ালেডাঙা নামে পরিচিত বলে জানা যায়।

বারুইপুর থানার একটি মুসলমান অধ্যুষিত গ্রাম হল খোদারবাজার। এটি বারুইপুর কাছারি বাজারের পশ্চিমে এবং আদিগঙ্গাব পূর্বে অবস্থিত। এই গ্রামের লকেট ফল পশ্চিমবঙ্গে তথা সারা ভারতেও দুষ্প্রাপ্য। এই গ্রামে কসাইপাড়ার রাস্তার দুপাশে প্রায় দেড় বিঘা আয়তন বিশিষ্ট গোরস্থান আছে। এখানে প্রধানত খোদারবাজার গ্রামের বাসিন্দাগণের মৃতদেহগুলিকে কবরস্থ করা হয়। এই খোদারবাজার গ্রামের দক্ষিণে এবং পাশের নিশ্চিন্তপুর গ্রামের পশ্চিমে আর একটি ১ বিঘার মতো গোরস্থান রয়েছে। এখানেই কবরস্থ করা হয় একদা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মহঃ আবদুল্লাহ সাহেবকে। খোদারবাজারের সুতিপাড়ায় ১৫ কাঠার মতো আর একটি গোরস্থান আছে।

এছাড়া এই থানার পদ্মপুকুর, বারুইপুরের নিকটস্থ কাজিপাড়া (প্রায় ১৫ কাঠা), মদারাট অঞ্চল পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মসজিদ পাড়া (প্রায় আড়াই বিঘা), কল্যাণপুর অঞ্চল পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চাকারবেড়িয়া (প্রায় ১ বিঘা), ধপধপি ২নং অঞ্চল পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মজলিসপুকুর ২টি (প্রতিটি প্রায দেড় বিঘা), শংকরপুর অঞ্চল পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বলবলিয়া কারবালা

মাঠ (প্রায় ২০ বিঘা বর্তমানে অনেকাংশে চাষ হয়), ধপধপি ১নং অঞ্চল পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পদ্মজলা মণ্ডলপাড়া (প্রায় ৪বিঘা), মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কাজিপাড়া গোরস্থান (প্রায় ৪ বিঘা) গনিমা গোরস্থান (প্রায় ২ বিঘা), শ্রীরামপুর (প্রায় ৪ বিঘা), পাঁচঘরা (প্রায় ৮ বিঘা) লোকনাথপুর (প্রায় ৬ বিঘা), পেটুয়া (প্রায় ৫ বিঘা)। রমজান মাস শুরুর ৭ দিন পূর্বে সবেবরাতের দিন এবং রমজান মাসের শেষ সপ্তাহের বিজোড় সংখ্যার ৩ দিনের ১ দিন সবেকদরের (লাইল তুল) দিন এখানকার মুসলমানগণও যথারীতি নিকটবর্তী কবরে উপস্থিত হয়ে কোরাণ পাঠ-সহ মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং কোথাও কোথাও কবরস্থানে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেন।

খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের গোরস্থান

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই কলকাতার সন্নিকটস্থ বারুইপুব থানায় নানা কারণে ইংবেজদেব আগমন ও বসতি বাড়তে থাকে। বিশেষ করে এখানে নীলচাষ, নীল প্রস্তুত এবং লবণ প্রস্তুত করে ব্যবসা চালাতে তাঁরা অনেকেরই বসবাস করতে শুরু করেন। এইসময় অধুনা বারুইপুব রবীন্দ্রভবনের সম্মুখে নিউ ইন্ডিয়ান মাঠের পাশে গড়ে ওঠে নীলের সদর দপ্তব ও নুনের সদর দপ্তর রূপে বড় কুঠি। ইংরেজ কর্মচারী প্লাউডেন সাহেব এখানেই একটি ইংরাজি স্কুল গড়ে তোলেন যেটি ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টবাণী প্রচার সমিতির অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রোটেস্ট্যান্টপন্থী এই খ্রিস্টবাণী প্রচার সমিতির অন্যতম নেতা রেভারেণ্ড ডব্লু. ড্রিউ-এর স্ত্রী মিসেস ড্রিউ একটি উত্তম মহিলা অনাথাশ্রম ও শিক্ষাশ্রম গড়ে তোলেন। "At Baruipur is an excellent female orphange, under the care of Mrs. Drew, wife of the Rev. W. Drew, of the society for the propagation of the Gospel."

এই সময় বারুইপুরে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্য একটি উপযুক্ত গির্জা ও গোরস্থানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ নির্দিষ্ট কোনো গোরস্থান না থাকায় খ্রিস্টানদের মৃতদেহ এখানে ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে সমাধির ব্যবস্থা করা হত। বারুইপুরে শাঁখারি পুকুর গ্রামে কয়ালপাড়ার কাছে ঝোপজঙ্গলের মধ্যে এবং বারুইপুর পুরাতন বাজার ফেলে শাসন স্টেশনের দিকে যেতে পথের ধারে একস্থানে নীলকর সাহেবদের গোটা কয়েক পাকা কবরের কিছু চিহ্ন আজও দেখা যায়। অবশেষে খ্রিস্টবাণী প্রচার সমিতি এই অঞ্চলের জমিদার রায়চৌধুরী কাছ থেকে প্রায় ৪৫ বিঘা জমি ক্রয় করে। অতঃপর ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ প্রোটেস্ট্যান্টপন্থী চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া পরিচালিত একটি গির্জা অধুনা বারুইপুর হাসপাতালের পাশে প্রতিষ্ঠা করেন এবং বর্তমানে 'ভাই ভাই সংঘ' ক্লাবের কাছে ২ বিঘা জমি নিয়ে গোরস্থান গড়ে তোলেন। সেন্ট পিটার্স চার্চ নামে এই চার্চটি ও এই গোরস্থানটি বারুইপুরের সবচেয়ে পুরাতন চার্চ ও গোরস্থান। বারুইপুরে এই চার্চ এর সদস্যরূপে যাঁরা চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত তাঁদের মৃতদেহ এই গোরস্থানে সমাধি দেওয়া হয়। দুঃখের কথা এই যে, এই ২বিঘা গোরস্থানের মধ্যে

মাত্র ২১ শতকের মধ্যে কবর দেওয়া হয় বাকি অংশ 'ভাই ভাই' সংঘের অধিকারভুক্ত হয়ে পড়েছে। চার্চ কর্তৃপক্ষ তাঁদের সম্পূর্ণ গোরস্থানটি একদা প্রাচীর দিয়ে ঘিরতে চেয়েছিলেন কিন্তু 'ভাই ভাই সংঘ' মোট অংশটা প্রাচীর দিতে দেয়নি। অদূর ভবিষ্যতে গোরস্থানটির সমস্যা আরও বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া পরিচালিত বারুইপুব থানার হোটরে যে চার্চটি আছে ওই চার্চের সদস্যবৃন্দের মৃতদেহ চার্চের পাশেই একটি ১৪ কাঠার গোরস্থান সমাধিস্থ করা হয়। এই গোরস্থানটির অধিকাংশ বারুইপুর থানার অন্তর্গত এবং বাকি অধিকাংশ মগরাহাট থানার অন্তর্ভুক্ত। এঁদের আর একটি চার্চ ও গোরস্থান আছে চম্পাহাটিতে।

থানা বারুইপুরের চণ্ডীপুর এবং কুন্দরালী গ্রাম পঞ্চায়েতেব অধীন কল্যাণপুর গ্রামে প্রোটেস্ট্যান্টপন্থী খ্রিস্টানদের মোট তিনটি চার্চ আছে—চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া, অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চ এবং ম্যাথোর ডিস্ট চার্চ। এদের প্রত্যেকের সদস্যদের জন্য চার্চের কাছাকাছি গোরস্থান রয়েছে। সবচেয়ে পুবনো চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়ার এক্তিয়ারভুক্ত গোরস্থানের আয়তন প্রায় ১২ কাঠা, অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চের যে গোরস্থান আছে তার আয়তন প্রায় ৪ কাঠা এবং ম্যাথোর ডিস্ট এর অন্তর্গত গোরস্থানটি প্রায় আয়তনে ৮ কাঠার মতো। অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চ, ম্যাথোর ডিস্ট এবং ক্যাথলিকপন্থী পরিচালিত এখানকার সেন্ট স্টিফেনস চার্চ-এর গোরস্থান একই সঙ্গে অবস্থিত, তবে ভিতরে পৃথক এলাকা চিহ্নিত করা আছে। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে সূচিত সেন্ট স্টিফেনস চার্চেব গোরস্থানের পরিমাণ প্রায় ১ বিঘা। এই গোরস্থানগুলি চণ্ডীপুর মৌজায় অবস্থিত। জানা যায় যে এখানকার গোরস্থানগুলি সবই কেনা সম্পত্তি।

ক্যাথলিক পরিচালিত বারুইপুব থানার মধ্যে অবস্থিত আরও কয়েকটি চার্চ হল ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে তৈরি তেউরহাট মৌজাব মনমগরার। চার্চ সংলগ্ন গোরস্থানটি প্রায় ১০ কাঠা পরিমাণ; সূর্যপুর চার্চ, সংলগ্ন গোরস্থান মাত্র ২ কাঠা, এটা দান করা সম্পত্তি। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ঋষি বঙ্কিম নগরের (ওয়ার্ড নং ১০) নির্মাক হৃদয় মারিয়া চার্চ এবং ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ক্যাথলিক ডায়োসেস অফ বারুইপুব-এর সঙ্গে জড়িত এই অঞ্চলের খ্রিস্টানদের প্রথমে কবর দেওয়া হত সোনারপুর থানার কোষপুকুর এলাকার ১ বিঘা ৭ কাঠার মতো গোরস্থানে। কিন্তু এই গোরস্থানটি দূরবর্তী হওয়ায় সম্প্রতি বারুইপুর পূর্ব পৌর এলাকায় ৮নং ওয়ার্ডে কীর্তনখোলা শ্মশানের কাছে স্থানীয় অনিল মিত্রের কাছ থেকে এঁরা প্রায় ১৯ কাঠার মতো জায়গা কিনেছেন। এখানে একটি নতুন গোরস্থান তৈরি হয়েছে তবে এখনও এটা চালু হয়নি। শীঘ্র চালু হবে বলে জানা গেছে। তখন এঁদের মৃতদেহ সমাধিস্থ করার সুবিধা হবে। তখন শুধু এখানকার ক্যাথলিক চার্চেব সদস্যদেরই নয় এর অধীন মিশনারির অফ চ্যারিটি (কাছারীবাজার), হলিক্রশ কনভেন্ট (বারুইপুর), মিশনারি অফ

চ্যারিটি (কীর্তনখোলা), ডটারস অফ সেন্ট অ্যানি (কালীকানন) প্রভৃতির সদস্যদেরও এখানে কবর দেওয়ার সহজ ব্যবস্থা হবে। চম্পাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েত সি.এন.আই পরিচালিত চার্চের সদস্যদের একটি আড়াই কাঠা আয়তনেব গোরস্থান আছে।

যথারীতি প্রতিবছর ২রা নভেম্বর সমস্ত খ্রিস্টান (গোরস্থানের মতো বারুইপুর থানার খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ তথা বিশপ, ফাদার, পাদ্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ নিকটবর্তী গোরস্থানগুলিতে সমবেত হয়ে গোরস্থানে শায়িত মৃত ব্যক্তিদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা কবেন এবং ফুল, মোমবাতি, ধূপ ইত্যাদি দিয়ে গোরস্থান সজ্জিত করেন। সন্ধেবেলা থেকে এই প্রার্থনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রধানত ফাদার কিংবা পাদ্রীগণ এই বিশেষ অনুষ্ঠান পরিচালনা কবেন। এই অনুষ্ঠান মৃতযজ্ঞ বা মৃতযোগ বা বিশেষ মিশা অনুষ্ঠান নামে পরিচিত।

হিন্দু-গোরস্থান

হিন্দু গোরস্থান কথাটা শুনলে একটু খটকা লাগে বটে। কারণ আমরা জানি হিন্দুদের শিশু মারা গেলে সাধারণত শ্মশানভূমির আশেপাশেই পুঁতে দেওয়া হয়। কিন্তু অনেক শ্মশানে বয়স্ক ব্যক্তিদেরও সমাধিস্থল দেখা যায়। শুধু তাই নয়—এই থানাব শংকরপুব গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নাচনগাছা গ্রামে পশ্চিমবাহিনী শ্মশানঘাটের সামান্য উত্তরে পৌতাঘাটায় শুধুমাত্র হিন্দুদের গোরস্থান আছে। স্থানীয় লোকজন বলেন যে এঁদের অধিকাংশই শাক্ত বা বৈষ্ণব। কিন্তু ক্ষেত্রানুসন্ধানে দেখা গেছে অনেকে স্বেচ্ছায় গোর দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন, সেইমত তাঁদের পরিবারের মানুষজন মৃতদেহকে সমাধি দেন। অনেক ক্ষেত্রে দরিদ্র মানুষ শ্মশানে সৎকারের ব্যয় বহন করার অক্ষমতায় তাদের পরিবারের মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করেন। পৌতাঘাটায় হিন্দুদের গোরস্থানে রাম হালদার, দ্বিজপদ হালদার, তারাপদ হালদার, সুধীর নস্কর, বটকৃষ্ণ পুরকাইত প্রমুখের সমাধিস্থল ও তার উপরে স্মৃতি স্তম্ভ আছে।

গোভাগাড় :

বারুইপুর থানার মূলত গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিভিত্তিক জীবিকারূপে কৃষিকার্য ও পশুপালনের সঙ্গে গরু, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া ইত্যাদির অনিবার্য সম্পর্ক। তাই এক সময় এমন কোন গৃহস্থ পরিবার ছিল না যাদেব গরু, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া ইত্যাদি না ছিল। এইসব পশুদের মৃতদেহ ফেলবার স্থানই হল গোভাগাড় বা উপশল্য। মাত্র ৫০/৬০ বছর পূর্বেও খোদ বারুইপুর পৌর এলাকার অনেকাংশই তখন নিবিড় গাছ-গাছালি সঙ্কুল দুর্গম ছিল। বলা বাহুল্য তখন এইসব অংশে মানুষ মৃত গরু-বাছুর, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া ফেলত। বারুইপুর পৌর এলাকার এই অঞ্চল তখন ময়লাপোতা নামে পরিচিত ছিল।

বারুইপুর পৌর এলাকার ১৬নং ওয়ার্ডে একটি প্রাচীন গোভাগাড় ছিল। বারুইপুর পুরনো

বাজার পেরিয়ে ক্যানিং রোড ত্যাগ করে যে চওড়া রাস্তাটি ধপধপি দক্ষিণ রায়ের মন্দিরের দিকে চলে গিয়েছে ওই রাস্তায় কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বিশালাক্ষ্মী স্পোর্টিং এণ্ড কালচারাল ক্লাবের মাঠের পরেই রাস্তার পূর্বদিকে পাশেই প্রথমে ঘোড়া ফেলা ডাঙা ও তারপর গোভাগাড় ছিল। বর্তমানে তাদের আর কোনো অস্তিত্ব নেই।

বারুইপুর পৌর এলাকার দক্ষিণপ্রান্তে কুলপি রোডের পশ্চিম পাশে বর্তমান ময়লাপোঁতা নামক স্থানটি সুদীর্ঘ দিন ধরে গোভাগাড় রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই গোভাগাড়টিতে দূর দূরান্তের মানুষ বিশেষ করে রাঙাবেলিয়া, শাসন, শিখরবালি, কুমারহাট, শিবসুঁতি প্রভৃতি গ্রামের মানুষজন তাঁদের মৃত গবাদি পশু পরিত্যাগ করেন। কুলপি রোড ধরে আরও এগিয়ে গেলে সূর্যপুর পড়ে। এই সূর্যপুরের খাল পাড়ে জনহীন জায়গাগুলি মানুষ গোভাগাড় রূপে ব্যবহার করে থাকেন। বারুইপুর থানার দক্ষিণ প্রান্তে কুলপি রোডের পশ্চিম পাশে পাঁচগাছিয়া গ্রামসীমায় প্রবেশ করার মুখেই একটি বড় গোভাগাড় দেখা যায়। এখানে সূর্যপুর, কেয়াতলা, পাঁচগাছিয়া, গঙ্গাদুয়ারা, নোড় প্রভৃতি গ্রামের বাসিন্দাগণ মৃত জীবজন্তু পরিত্যাগ করেন। স্থানটি শঙ্করপুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত।

বারুইপুরের পদ্মপুকুর মোড় থেকে পশ্চিম দিকে আমতলা বাসরুটে ধামনগর স্টপ পড়ে। এই স্থানটি লক্ষ্মণসেনের তাম্রপট্টে ধর্মনগর বলে উল্লেখিত হয়েছিল। এই ধামনগব বা ধর্মনগর থেকে অল্প পশ্চিমে ধোপাগাছি গ্রামে প্রবেশের মুখে পূর্বদিকে পড়ে একটি অনেক প্রাচীন গোভাগাড়। এটি ধামনগর, ধোপাগাছি, আন্ধারিয়া, রাধাবল্লভপুর প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ মৃত জীবজন্তু ফেলতে ব্যবহার করত। কল্যাণপুর অঞ্চল পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ওই গোভাগাড়টি বর্তমানে নানাভাবে দখলীকৃত হয়ে তার অস্তিত্ব প্রায় হারিয়ে ফেলেছে।

কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত ধামনগর ও ধোপাগাছি এই দুটি গ্রামের মাঝখান দিয়ে ব্রিটিশ আমলে নির্মিত যে চওড়া কাঁচা রাস্তাটি সোজা পূর্বাভিমুখী হয়ে আদিগঙ্গার দিকে চলে গিয়েছে ওই রাস্তার দক্ষিণ পাশে উভয় গ্রামের যে বড় পগার আছে তার পাশেপাশে বেশ কিছুটা স্থান গোভাগাড় হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। স্থানটি জনহীন ও বসতিহীন বলে কোনো অসুবিধা হয় না। এখানে উত্তর কল্যাণপুর, ধামনগর এবং ধোপাগাছি গ্রামের বাসিন্দাগণ মৃত গবাদি পশু ফেলে। এখানে একটি উঁচু ঢিবির উপর একটি ঝুরি নামানো প্রাচীন বটবৃক্ষতলে ডাকাতরা গভীর রাত্রে কালীপূজা করত বলে জনশ্রুতি আছে। বর্তমানে সেই উঁচু ঢিবি এবং বটগাছ কিছুর অস্তিত্ব নেই।

এই কল্যাণপুর অঞ্চলেরই অধীন গ্রাম ধোপাগাছির পূর্বপ্রান্তে ঝোপজঙ্গল ও অশ্বত্থগাছ কবলিত একটি মাটির উঁচু স্থান ঠাকরুণতলার পোঁতা নামে পরিচিত। এখানে দীর্ঘদিন ধরে ধোপাগাছি, মধ্য কল্যাণপুর, উত্তর কল্যাণপুর প্রভৃতি গ্রামের মানুষ মৃত জীবজন্তু পরিত্যাগ

করতেন। স্থানটি সম্ভবত কোনো প্রাচীন কালীমন্দিরের ভগ্নস্তূপ। পরবর্তীকালে পরিত্যাক্ত অবস্থায় গোভাগাড়ে পরিণত হয়। স্থানটির দক্ষিণ পাশে একটি রাস্তার পরেই ছিল একটা গাছগাছালি ঝোপজঙ্গল পরিবৃত বড় বাগান। লোকে বাগানটিকে মাদার বাগান বলত। মনে হয় এখানে অতীতে মাদার পিরের আস্তানা (দরগা) ছিল। এই স্থানের গোভাগাড় নিয়ে ভৌতিক গল্প গ্রামে প্রচলিত আছে। শোনা যায় বেশি রাতে এখান থেকে কোনো মানুষ গেলে গরুর আকারে গোভূত তার পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেত আর তার বাতাস শরীরে লাগলে মৃত্যু অনিবার্য। এই স্থানে গোভাগাড় থাকবে কি না তা নিয়ে স্থানীয় হালদার পরিবার ও মাল পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধে। গ্রামের লোকও দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। সম্প্রতি এখানে মৃত জীবজন্তু ফেলার হার কমে গিয়ে প্রায় শূন্যে দাঁড়িয়েছে। স্থানটি পরিচ্ছন্ন করে স্থানীয় ছেলেরা খেলাধূলা করত। ধীরে ধীবে এই খাস জমিটি ব্যক্তিগতভাবে সুকৌশলে অনেকাংশে দখল হয়ে যাচ্ছে।

রামনগর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত সীতাকুণ্ড গ্রামে মণ্ডলপাড়ার কাঁচা রাস্তার পাশে বাঁশবাগানের কাছে একটি গোভাগাড়ে আজও স্থানীয় মানুষজন মৃত জীবজন্তুর দেহ পবিত্যাগ করে। এই গোভাগাড়ের অন্য দিকে একটি স্থান মড়াডাঙা নামে পরিচিত। শোনা যায় এক সময় এখানে বাচ্চাদের মৃতদেহ পুঁতে দেওয়া হত।

বারুইপুর পিয়ালি টাউন থেকে চম্পাহাটিগামী বাসরুটের পাশে দুধনই গ্রামের পূর্ব প্রান্তে শিমূল গাছের তলদেশটি স্থানীয় মানুষজন গোভাগাড় হিসেবে ব্যবহার করেন। কাছেই একটি বনবিবির মন্দির আছে। প্রতিবছর ১লা মাঘ পূজা হাজোত ও বনবিবির গানের আসর বসে।

এখান থেকে চম্পাহাটির বাসরুটধরে আরও কিছুটা এগিয়ে গেলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি ফার্ম পড়ে। এখানকার কৃষিখামার আর বাসরুটের মধ্যস্থলটি বেশ কিছুটা স্থান গোভাগাড় রূপে ব্যবহৃত হয়। সীতাকুণ্ডু, দুধনই, সোলগোয়ালিয়া, কেবায়েতপুর প্রভৃতি গ্রামের গ্রামবাসীগণ এই গোভাগাড় ব্যবহার করে থাকেন।

এই থানার বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বেগমপুর গ্রামে বেশ কয়েকটি গোভাগাড়ের অস্তিত্ব আজও রয়ে গেছে। বেগমপুর মোড় থেকে হাঁদোলপুকুরগামী রাস্তার পাশে একটি গোভাগাড় আছে। বর্তমানে এই স্থান থেকে মাটি তুলে নেওয়ায় একটি ডোবার সৃষ্টি হয়েছে। ওই ডোবার ধারে যতটুকু স্থান আছে সেখানে বেগমপুর গ্রামের সর্দারপাড়া, খাঁপাড়া, কয়াল পাড়া, ভট্টাচার্যপাড়া প্রভৃতি পাড়ার লোকজন আজও মৃত গবাদি পশুর দেহ ফেলে যায়। বেগমপুর প্রাইমারি স্কুল এবং বেগমপুর সমাজ শিক্ষণ পাঠাগারের উত্তর দিকে প্রায় ৪/৫ কাঠা জায়গা জুড়ে একটি প্রাচীন গোভাগাড় আছে। এখানে যাবার রাস্তাটিও গোভাগাড়ের রাস্তা নামে পরিচিত। এখানে গ্রামের মালপাড়া, হালদারপাড়া, হাজরাপাড়া, নস্করপাড়া,

তাঁতিপাড়া, কয়ালপাড়া, বামুনপাড়ার জনসাধারণ মৃত জীবজন্তু ফেলে। এই গ্রামের আরেকটি গোভাগাড় বেগমপুর উলুঝাড়ার দক্ষিণদিকে বাণী বাগানের গায়ে উত্তরদিকে অবস্থিত। গোভাগাড়টির আয়তন আনুমানিক ৫/৬ কাঠা। এর একদিকে মৃত শিশুদের পোঁতা হয় আর অন্যদিকে মালপাড়া, মোড়ল পাড়া, নস্কর পাড়া ইত্যাদির লোকজন মৃত গবাদি পশু পরিত্যাগ করে। বেগমপুর গ্রামে ডেডাংগি নামক একটি স্থানে একই সঙ্গে ওই অঞ্চলের মানুষজন মৃত শিশু সন্তানদের পুঁতে দেয় এবং মরা জীবজন্তুও ফেলে দেয। স্থানটির পরিমাণ আনুমানিক প্রায় ১ বিঘা।

বারুইপুর রঘুনন্দনপুর এবং দুটোই সাউথ গড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন। রঘুনন্দনপুর গ্রামের উত্তরদিকে এবং নড়িদানা গ্রামের পূর্বদিকে হাজারী মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে একটি বহুদিনের গোভাগাড় আছে। এখানে উভয় গ্রামের মৃত জীবজন্তু ফেলা হয়। আর উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের কামরা গ্রামের উত্তর দিকে এবং রঘুনন্দনপুরের পূর্বদিকে শংকর কুঁড়ে নামক যে ধানবাদা আছে, সেখানেও একটি গোভাগাড় রয়েছে।

সাউথ গড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মলঙ্গা গ্রামের পশ্চিম দিকে কাটাখাল বরাবর বিশালক্ষ্মী মন্দিরের আশেপাশের স্থান এই গ্রামের জনসাধারণ ভাগাড় রূপে ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া কাটাখালের উত্তরে বড় পোল এবং সাউথ গড়িয়া সুশীল কর কলেজের দক্ষিণে যে বিস্তৃত ধানবাদা আছে তার মধ্যেও এই অঞ্চলের যাবতীয় মৃত জীবজন্তুর মৃতদেহ ফেলা হয়। নিকটবর্তী বাওড়া গ্রামের মুচি সম্প্রদায় এখান থেকে সহজেই মৃত জীবজন্তুর চামড়া ছাড়িয়ে নেয়। এছাড়া এই গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন কুলবেড়িয়া, কমলপুর, খাড়ু পাতালিয়া এবং মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচঘরা প্রভৃতি গ্রামেও বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গোভাগাড় আছে।

বারুইপুর থানা এলাকার অসংখ্য গোভাগারের উল্লেখযোগ্য কিছু গোভাগাড়ের পরিচয় প্রদান করা হল। বলা বাহুল্য যে এইসব গোভাগাড় অধ্যুষিত স্থানগুলি অধিকাংশই সরকারি খাস জমি কিংবা দেবোত্তর বা পিরোত্তর সম্পত্তির অংশ বিশেষ অথবা কোনো কারণে দীর্ঘদিনের পতিত জমি।

শহরের ক্রমবিস্তার, কৃষি জমির পরিমান কমে যাওয়া, পশুচাবণ ক্ষেত্রের অবলুপ্তি, চাকুরির দিকে অধিক ঝোঁক এবং সর্বোপরি ভূমি কর্ষণ কর্মে ট্রাকটরের ব্যবহার ও গরুর গাড়ি ও ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন না থাকায় বারুইপুর থানায় গোভাগাড়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। বিশেষত ধনবান ও প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক দলগুলি গোভাগাড়ের স্থানগুলি ধীরে ধীরে দখল করে নেওয়ায় আব এই অঞ্চলে তেমনভাবে গোভাগাড়ের স্থায়ী অস্তিত্ব খুব বেশি চোখে পড়ে না।

এমনিভাবে মানুষের সৎকারের স্থান শ্মশান, গোরস্থান এবং পশুপক্ষীদের গোভাগাড়ে একাকী দাঁড়িয়ে তন্ময়চিত্ত হলে বেদনাঘন করুণস্মৃতি মনে জাগ্রত হয়—একটা দার্শনিক প্রশ্ন মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে—মৃত্যু শেষ নাকি জীবনান্তরে যাত্রা শুরু। তবুও এক বিপন্ন বিস্ময় জেগে ওঠে যখন দেখি লোভ আর স্বার্থের তাগিদে মানুষ মূঢ়ের মতো শ্মশানভূমি, গোরস্থান আর গোভাগাড়ের পবিত্রভূমি একটু একটু করে গ্রাস করে আইনি রেকর্ডে নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করে নিজেদের অসহায়ত্ব ও অসুবিধা নিজেরাই ডেকে আনছে। পঞ্চায়েত ও পৌর ব্যবস্থার প্রতিনিধিগণ একটু সতর্ক হলেই কিন্তু এর সমাধান সহজে করতে পারে। ভোটের রাজনীতির উর্ধ্বে একটু ভেবে দেখবেন কী!

তথ্যসূত্র ঃ

১. রেখো মা দাসেরে মনে (কবিতা) -মধুসূদন দত্ত
২. যেতে নাহি দিব (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩. বিনয় সরদার—(পুরন্দরপুর)
৪. করিম বক্স মোল্লা (সীতাকুণ্ডু)
৫ মৌলনা আবুল বাসার (সীতাকুণ্ডু)
৬. মহঃ কাদের সাহেব (ধপ্‌ধপি)
৭. নক্‌সী কাঁথার মাঠ—জসীমউদ্দীন
৮. Caltholic Diocese of Baruipur
৯. কল্যাণ সাউ (ঋষি অরবিন্দনগর/বারুইপুর,
১০ নবকুমার মণ্ডল (উকিলপাড়া/বারুইপুর)
১১. শ্রীকান্ত(১ম পর্ব)—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

□ লেখক পরিচিতি—শিক্ষক, গবেষক, প্রাবন্ধিক।

বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের শ্মশান : নাম তার চণ্ডাল

অশেষকুমার দাস

দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা বা তরাই অঞ্চলের আর একটি নাম হয়তো হওয়া উচিত কিরাতভূমি। তার একটা বড় কারণ হল পৌরাণিক যুগ থেকেই মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর মানুষেরাই শুধুমাত্র এখানে বাস করত। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এখানকার মানুষের আচার ব্যবহারেও এই জনগোষ্ঠীর ছাপ ছিল স্পষ্ট। এখানকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাঙালি রাজবংশীরাই ছিল সংখ্যাগুরু। তাদের জীবন চর্চা বা সংস্কৃতিতে হিন্দুয়ানার চাইতে বাঙালিয়ানাই ছিল প্রবল। তারই একটা বড় উদাহরণ হল এই জনগোষ্ঠীর শেষকৃত্য সমাপন বা শ্মশান ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় রক্তচক্ষু নিয়মের চাইতে কোনো রকমে শেষকৃত্য সমাপন করাটাই ছিল বড় কথা। যার ফলে দেখা যায় যে এখানকার শ্মশানভূমিতে স্বামীর সাথে সহমরণে গিয়ে যেমন কেউ সতী হয় নি, তেমনই এখানে সাধনা করে কোনো ক্ষ্যাপা সিদ্ধি লাভ করেননি। এখানকার নিয়মতন্ত্র এতটাই সাদামাটা ছিল যে তা সম্ভবও ছিল না। এর জন্য অবশ্যই দায়ী ছিল অসম্পূর্ণ আর্য সংস্কৃত্যায়ন বা অসংস্কৃত্যায়ন এবং খুব সামান্য হলেও এখানকার ভৌগোলিক অবস্থান।

এখানে যখন প্রথম মানব বসতি শুরু হয়েছিল সেই সময় থেকেই শিলিগুড়ি মহকুমা বা তরাই অঞ্চলে ছিল বনভূমির প্রাধান্য। এই গভীর বনভূমির কারণেই হয়তো বা বিভিন্ন সময়ে প্রাগজ্যোতিষপুর বা পুণ্ড্রবর্ধন, কামরূপ বা কোচবিহার, অথবা গৌড় রাজ্যের রাজারা এই অঞ্চল অধিগ্রহণে তেমন কোনো উৎসাহ দেখায় নি। তবে বর্তমানে শিলিগুড়ি শহরের মহানন্দা নদী তীর পর্যন্ত কোচবিহার রাজ্যের অধীন ছিল। ধারণা করা যায় যে এই শিলিগুড়ি মহকুমাতে প্রথম জনবসতি শুরু হয়েছিল প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ২৩০০ থেকে। প্রাগজ্যোতিষপুর রাজ্যে কিরাত শাসন অবসানের পর এই রাজ্যের জনবিন্যাসে এসেছিল ব্যাপক পরিবর্তন। সে সময়ে অস্ট্রিক নরগোষ্ঠীর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে কিরাত জনগোষ্ঠীর মানুষেরা পাণ্ডববর্জিত শিলিগুড়ি মহকুমাতে প্রথম বসতি স্থাপন করে। এখানে বসতি স্থাপনের আর একটা বড় কারণ ছিল যে জনগোষ্ঠীগুলো নিজ নিজ সংস্কৃতি স্বাধীনভাবে অনুশীলন করতে পারত এবং রাজনৈতিকভাবে নিরপক্ষে অঞ্চল হওয়াতে রাজস্ব প্রদানের ব্যাপার ছিল না। পৌরাণিক যুগেই বর্তমান শিলিগুড়ি মহকুমায় ছিল কিরাত প্রাধান্য। উত্তরের ধ্যান-মৌন হিমালয় আজো যার নীরব সাক্ষী।

তরাইয়ে বসবাসরত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে রাজবংশী বাঙালিরাই ছিল সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। কিরাত জনগোষ্ঠীর একটি অংশ হিন্দু ধর্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাঙালি রাজবংশীতে পরিণত হয়। এই জনগোষ্ঠীর জীবন-সংস্কৃতিতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি অধ্যায়ে বাঙালি কৃষ্টির ছাপ সুস্পষ্টভাবেই পাওয়া যায়। শেষকৃত্য সমাপনের ক্ষেত্রেও তাই অন্যান্য বাঙালিদের সাথে সাদৃশ্য লক্ষ করা গেলেও, তা হিন্দু ধর্মীয় গোঁড়ামি মুক্ত ছিল। আর একটা কথাও এক্ষেত্রে বলা দরকার যে ভৌগোলিক কারণেই এখানে বহু শ্মশান গড়ে উঠেছিল। প্রতিটি জনপদেই একটা করে শ্মশানভূমি ছিল। কারণ অরণ্যবহুল অঞ্চল হওয়াতে মৃতদেহ সৎকারের জন্য বাসস্থানের নিকটবর্তী স্থানেই দাহ করা হত। এই সমস্ত শ্মশানগুলোর স্বাভাবিক চিহ্ন হিসাবে ছিল অন্তত তিনটি আমগাছ এবং

খুব সামান্য হলেও জলাভূমি। জলে স্নান করিয়ে মৃতদেহ চিতায় তোলাই হল হিন্দু শাস্ত্রসম্মত কাজ। এর সাথে চিতার আগুনে আম্রপল্লব সহ কাঠ দিতে হত শ্মশানযাত্রীদের। এই ধরনের শ্মশান সংখ্যা কত ছিল তা আজ বলা সম্ভব নয়। নাগরিক জীবন বিকাশের সাথে সাথে এই ধরনের শ্মশান লুপ্ত হতে থাকে। তবে একটা কথা অবশ্যই বলা দরকার যে উত্তর বাংলার উপহিমালয় অঞ্চলে বাঙালি রাজবংশীরা এই ভাবেই মৃতদেহ সংকার করত। এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র তরাই নয়, ডুয়ার্স এলাকার রাজবংশী বাঙালি-প্রধান গ্রামগুলোতেও দেখা যেত।

ভারতবর্ষে কোম্পানি শাসন বা ইংরেজ শাসন শুরু হবার পর থেকেই তরাই অঞ্চল বা পূর্ব মোরাং-এ বসবাস শুরু করেছিল বিদ্রোহী সন্ন্যাসী নামধারী এক বিশেষ জনগোষ্ঠী। অধ্যাপক বাণীপ্রসন্ন মিশ্রর মতে এই গোষ্ঠী নবম শতাব্দীর শঙ্করাচার্যের ভাবাদর্শে বিশ্বাস করত। এরা ছিল জটাধারী ও গায়ে ছাই মাখত এবং মাথায় কালো পাগড়ি ব্যবহার করত। ঘরের মধ্যে আগুনের পাশে উলঙ্গ অবস্থায় বসে থাকত এবং ওই অবস্থায় প্রকাশ্যে আসতে দ্বিধাবোধ করত না। পেশা হিসাবে এরা যেমন কোম্পানি এলাকায় লুঠতরাজ ডাকাতি করত, তেমনই ব্যবসা বাণিজ্যও করত। ড. মিশ্রর মতে এই সন্ন্যাসীরা ছিল আদতে বানিয়া গোষ্ঠী। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ভেকধারী সন্ন্যাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় জানা যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই সন্ন্যাসীদের হাত ধরেই কিরাতভূমি অথবা অনার্যভূমি তরাইতে আর্যসংস্কৃতির সূচনা হয়েছিল। যার ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই আর্য বিধান অনুযায়ী একদল মানুষ কীভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে অপর একদল মানুষের হাতে। এই ধর্মীয় ভাবাদর্শই তরাইয়ের শান্তিপ্রিয় মানুষের জীবনে বয়ে এনেছিল বিভেদের রেখা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত স্থানীয় মানুষ তা তিলে তিলে প্রত্যক্ষ করেছে। সন্ন্যাসীদের ধর্মীয় আবেগ আর সন্ত্রাসের ভয়ে মানুষ তখন চুপ থাকতে বাধ্য ছিল।

প্রশ্ন আসে যে তরাইতে আর্য সংস্কৃতির এই ডামাডোল কবে প্রথম শুরু হয়েছিল। অধ্যাপক মিশ্রর মতে পৃথ্বীনারায়ণ শা নেপাল সিংহাসনে আসীন হবার আগে পর্যন্ত নেপালের আঞ্চলিক রাজাদের সাথে নেপালিদের সম্পর্ক ভালো ছিল। কিন্তু এই নেপালি রাজার সর্বগ্রাসী নীতির কারণেই সন্ন্যাসীরা নেপাল থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। ধারণা করা যেতে পারে যে ১৭৭০ সাল থেকে সন্ন্যাসীরা তরাইতে তাদের আখড়া গড়ে তোলে। এই তরাইতে দাঁড়িয়েই সন্ন্যাসীরা ভুটান রাজের সাথে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং কোচবিহার রাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সেই ঘটনা ইতিহাসের অন্য আর এক অধ্যায়। খুব স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা যেতে পারে যে এমত অবস্থায় তরাইয়ের প্রশাসনহীন নিরপেক্ষ ভূমি সন্ন্যাসীদের কাজ চালাবার পক্ষে আদর্শ বলে মনে হয়। তাই তারা এখানে এসে খুব সুপরিকল্পিতভাবে তাদের আখড়া গড়ে তোলে। গৈরিক সন্ন্যাসীদের আগমনে তরাইয়ের গগনে গর্জে ওঠে বিভাজনী মন্ত্র, আর ভূমিপুত্রের দল হয় নিজভূমে পরবাসী।

তরাইতে সন্ন্যাসীদের বাসস্থান, নাম তার সন্ন্যাসী স্থান। এই সন্ন্যাসীদেরই অপর একটি শাখা পরিচিত ছিল গোঁসাই নামে। পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত একই সরল রেখায় অবস্থিত ছিল এই সন্ন্যাসী আর গোঁসাইদের বাসভূমি। যদিও আশ্চর্যের কথা যে ১৯২১-২৪ সালের জরিপ অনুযায়ী বাংলা সরকার যে Jurisdiction list প্রকাশ করেছে তাতে ওই দুটি নাম, সন্ন্যাসী স্থান ও

গোঁসাইপুর অনুপস্থিত রয়েছে। তবে এই সন্ন্যাসী গোঁসাইদের শেষকৃত্য সমাপনের জন্য শ্মশানভূমি 'চণ্ডাল'-এর নাম ওই সরকারি তালিকাতে রয়েছে। রাজা ঝাড় মৌজার অন্তর্গত এই চণ্ডালজোত। মৌজা নম্বর ৮৯, মোট আয়তন ৫৯৫.৯০ একর। ১৯৯০ সালের ৩রা জুন তারিখে প্রকাশিত Bengal Tenancy Act অনুযায়ী জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তি নং ১০১২। থেকে এই তথ্য জানতে পারা যায়। ১৯৫৪-৫৬ সালে জরিপের ভিত্তিতে গঠিত এই মৌজা তালিকাতে এই রাজা ঝাড় মৌজা নম্বর হয় ১০১, তখন এটি নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত ছিল। এই তালিকাতে কোনো জোতের উল্লেখ হয়নি। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই চণ্ডাল জোতও অনুল্লেখ রয়েছে। আরো আশ্চর্যের কথা যে সন্ন্যাসী ও গোঁসাইদের বাসস্থান সন্ন্যাসীস্থান এবং গোসাইপুর নাম দুটি কোনো তালিকাতে জোত হিসাবেও ঠাঁই পায়নি।

জোতের নাম চণ্ডাল। ১৮৭২ সালের প্রথম আদমশুমারিতে চণ্ডাল সংখ্যা ছিল ২৯২ এই দার্জিলিং জেলাতে। আদতে এটি ছিল আর্যসংস্কৃতি অনুযায়ী সন্ন্যাসী গোঁসাইদের শ্মশানভূমি। তবে আজো মানুষ কিন্তু এই নামেই জোতটিকে চিহ্নিত করে থাকে। ক্ষেত্র সমীক্ষা কালে জানতে পাবা যায় যে এখানে বর্তমানে প্রায় ২৪৩টি বাসগৃহ রয়েছে। এই মোট বাসগৃহের তিনটি বাদে বাকি সব বাড়ির মালিক হল বাজবংশী বাঙালিরা। অন্য তিনটি বাড়ির মালিক দ্রাবিড় নরগোষ্ঠীর মানুষ বলেই ধাবণা করা হয়। এই রাজবংশী বাঙালিরা প্রায় সকলেই ওই দ্রাবিড়দেব তুলনায় এখানে নবাগত। তবে এই অরাজবংশী এবং অনার্য জনগোষ্ঠী কবে কোথা থেকে এসেছিল সে সম্পর্কে সঠিক তথ্যের যথেষ্ট অভাব আছে। তবে একজন মাত্র গ্রামবাসী এই প্রতিবেদককে জানিয়েছিল যে তাদেব পিতৃ পুরুষের পূর্ব নিবাস ছিল মালদহ। এই জোতটিতে আরো যা রয়েছে, তা হল বুড়ি বালাসন নামে একটি খাল। বালাসন নদী থেকে এই খালটি কাটা হয়েছিল। ইংরেজ ভাষ্যকার এব কথায় মেচ জনগোষ্ঠী এই খালটি কেটেছিল মাছ ধববার জন্য। এছাড়াও রয়েছে আমগাছ এবং কালীবাড়ি। এর সাথে লক্ষণীয় হল যে রাজা ঝাড় মৌজার পার্শ্ববর্তী মৌজার নাম হল শিয়াভিটা। ১৯২১ সালের তালিকা অনুযায়ী এই মৌজার নম্বর ৮৯ এবং ১৯৫৪-৬৬র তালিকা অনুযায়ী নম্বর ১০৪। এই চণ্ডাল জোতটি গোঁসাইপুরের দক্ষিণে অবস্থিত আর একটি মৌজা অতিক্রম করে এই জোতে পৌঁছোতে হয়। অর্থাৎ আর্য বিধান অনুযায়ী চণ্ডালদের বাসভূমি শ্মশান আবাসস্থল থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থানরত। হয়তো ধর্মীয় পবিত্রতা রক্ষার জনাই যাতে চণ্ডাল জোতের বাতাস যাতে না ধুইয়ে দিতে পারে গোঁসাইদের বাসস্থান— একথা মনে রেখেই হয়তো এমনটা করা হয়েছিল।

কিরাতভূমিতে হিন্দুধর্মের অনুশীলন চালাতে গিয়ে সন্ন্যাসী গোঁসাইদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হয় শেষকৃত্য সমাপনে। এই ব্যাপারে যেমন ছিল তাদেব কাছে শাস্ত্রীয় বিধান, তেমনই তারা নির্ভরশীল ছিল অন্য নরগোষ্ঠীর মানুষদের ওপর। ঘরে বসে হিন্দু আচার মেনে জপতপ করা বা যজ্ঞের আগুন প্রজ্বলন করা আর শেষকৃত্যের জন্য চিতার আগুন জ্বালানো যে এক করা, কিরাতভূমিতে সন্ন্যাসীরা তা হাড়ে হাড়ে টের পায়। আবার স্থানীয় মানুষদের থেকেও এই কাজের জন্য মানুষ পাওয়া সম্ভব ছিল না। আবার শাস্ত্রীয় বিধান মেনে প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত মানুষেব। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে মেচ ও ধীমলরা মৃতদেহ কবর দিত। বাঙালি রাজবংশীরা

চিতা জ্বালিয়ে শেষকৃত্য সমাপনের কাজ জানলেও তারা এই ব্যাপারে আর্য উন্নাসিকতার জন্য শ্রমবিভাজন ভিত্তিক গড়ে ওঠা হিন্দু বাঙালি সমাজের সাথে কখনোই একাত্ম হতে পারে নি। যার দরুন সন্ন্যাসীদের আমদানি করতে হয়েছিল মানুষ। জীবিকা হিসাবে হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী যারা বাধ্য হয়েছিল মৃতদেহ সৎকার-এব মতন কাজকে বেছে নিতে। হিন্দু বিধান অনুযায়ী যাদের হাতে জলপান ছিল পাপ, যাদের সংস্পর্শে আসলে পরে স্নান করা ছিল বাধ্যতামূলক। ধর্মীয় অনুশাসনে যাদের পবিচয় ছিল চণ্ডাল নামে। The Tribes and Castes of Bengal-এ H.H. Risley লিখেছেন, Unlike the sudras, however. the Chandals were Debarred from entering even the outer circles of the Aryan system. জীবিত অবস্থায় আর্যরা এই অনার্যদের সংস্পর্শে না আসলেও মৃত্যুর পরে এই জনগোষ্ঠীর হাতে তাদের শেষ সৎকারের জন্য নির্ভর করতে হত। এভাবেই হয়তো হিন্দু পরমাত্মা স্বর্গলোকের পথে যাত্রা শুরু করত। প্রতিবেশী কোনো অঞ্চল থেকে সন্ন্যাসীরা চণ্ডাল আমদানি করেছিল তরাই শবদাহের জন্য।

তরাই বা পূর্ব মোরাং-এ সন্ন্যাসীরা কোথায় কোথায় তাদের আখড়া গড়ে তুলেছিল, এই সম্পর্কে আমাদেব ভরসা করতে হয় একমাত্র গ্রাম নাম- এব বিশ্লেষণে। যার দরুন আমরা খুব সহজেই সিদ্ধান্ত করতে পাবি যে সন্ন্যাসী স্থান-এর অর্থ হল যেখানে সন্ন্যাসীরা বাস করত। আবাব তেমনই গোঁসাইপুরে বসবাস করত এই সন্ন্যাসীদের একটি গোষ্ঠী গোঁসাই সম্প্রদায়। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হল এই গ্রামদুটির অবস্থান। পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত তিন-চার কিলোমিটার দীর্ঘ এক সবলরেখার পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থান করছে সন্ন্যাসীস্থান এবং পূর্ব প্রান্তে গোঁসাইপুর। এর মধ্যবর্তী স্থানটির বেশিরভাগ অংশের পরিচয় হল বাগডোগরা—যা আদতে ছিল গভীর বনভূমি। স্বাভাবিক ভাবেই যেখানে বাঘের বসবাস ছিল। বাগডোগরা শব্দটি এসেছে বাঘ এবং ডেগর থেকে। কামরূপী বাংলায় ডেগর শব্দের অর্থ হল পথ বা রাস্তা। অর্থাৎ বাগডোগরার অর্থ দাঁড়ায় বাঘ চলাচলের রাস্তা বা পথ। সুতবাং এই ছবি থেকে আমরা সহজ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সন্ন্যাসীদেব ডেরা দুটি ছিল বনের দুই প্রান্তে। আজকে তরাইতে সন্ন্যাসীস্থান হল একটি বিখ্যাত চা-বাগান এবং গোঁসাইপুর গ্রামটি হল বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বাসস্থান। বাগডোগরা নামক অরণ্যটি হল উত্তর বাংলার একমাত্র বিমানবন্দর।

আগেই বলেছি চণ্ডাল নামক জোতটি ছিল গোঁসাইপুরেব দক্ষিণে, প্রায় তিন-চার কিলোমিটার দূরে। রাজাঝাড় মৌজার অন্তর্গত এই মৌজাতে যে তিনটি জোত রয়েছে তার নাম হল রাজাঝাড়, আলোঝাড় এবং চণ্ডাল। এই নামের মধ্য দিয়ে খুব সহজেই বোঝা যায় যে রাজাঝাড় নামের অর্থ হল কোনো জমিদার বা জোতদার-এর অধীনস্থ অরণ্য অথবা অরণ্যের গভীরতার কথা মেনে রেখে ঝাড়ের সাথে রাজকীয় মেজাজের কথা মুক্ত করতে রাজা ঝাড় নামকরণ হয়েছে। এমন অবস্থায় সন্ন্যাসী ও গোঁসাইরা যখন এখানে চণ্ডালদের বসতি স্থাপনের মধ্য দিয়ে শ্মশানভূমি গড়ে তোলে, তখন প্রচুর পরিমাণে গাছ কাটতে হয়। যার ফলে মৌজার একটি অংশে গাছের সংখ্যা কমে অরণ্য অনেক অগভীর হয়ে যায়। যেখানে সহজেই দিনের আলো প্রবেশ করে। তাই নামকরণ হয় আলো ঝাড় অর্থাৎ অগভীর অরণ্য। আর চণ্ডাল অর্থ তো আগেই বলেছি শ্মশানভূমি। এই রাজাঝাড় মৌজার পার্শ্ববর্তী মৌজার নাম হল শিয়াভিটা। অর্থাৎ যেখানে শিয়াল নামক

প্রাণীর বসবাস। সামগ্রিক ছবি বিচার করে আমরা যেটা বুঝতে পারি, তা হল সন্ন্যাসী গোঁসাইরা তরাইতে বসবাসের পর রাজা ঝাড় নামক মৌজাতে শ্মশান স্থাপন করেছিল। সেই শ্মশানে চণ্ডাল গোষ্ঠীর মানুষ থাকত শেষকৃত্য সমাপনের জন্য। সেই শ্মশানে আমগাছ ও বুড়িবালাসন নামে এখনো একটি খাল রয়েছে। যা হিন্দু আচার পালনের সহায়ক। এছাড়া কালীবাড়িও ছিল এবং এখনো আছে। আর ছিল শ্মশানের প্রাণী শিয়াল। এই চণ্ডাল জোতই হল তরাই অঞ্চল বা শিলিগুড়ি মহকুমার আর্য সংস্কৃতির অধীনে প্রথম শ্মশানভূমি। এই জোতটিতে আজো শ্মশানের কিছু কিছু চিহ্ন রয়েছে। হিন্দু ধর্মে বলা হয় আত্মা অবিনশ্বর। সেই সাথে এই সাধারণ প্রতিবেদক যুক্ত করতে চায় আত্মা হয়তো অবিনশ্বর, সেই জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক বক্তৃতায় ক্ষুধার্ত মানুষের কিছু যায় আসেনা। তবে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে তরাইয়ের সমৃদ্ধশালী কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের পাশে কীভাবে এমন চণ্ডাল নামী সাংস্কৃতিক দৈন্যতা আজো অবিনশ্বর হয়ে টিকে আছে। একি দৈন্যের দর্শন, না দর্শনের দৈন্যতা। হায় চণ্ডাল!

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এই বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের নিয়ে দুটি অমূল্য উপন্যাস রচনা করেছিলেন, যার নাম আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরানি। ফলে বাঙালি পাঠক সমাজে ধারণা করা হয় যে সন্ন্যাসীরা ছিল স্বাধীনতাকামী এবং মানবদরদী। এরকম একটা ভ্রান্ত ধারণা নিয়েই বাঙালি সমাজ আজ অগ্রসর হচ্ছে এক সামঞ্জস্য ও এক সংহতির দিকে। আর তরাইয়ের চণ্ডাল জোতে যেন ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠছে দলিত বাঙালি সমাজ। একমাত্র জোনাকির আলো ছাড়া সভ্যতার কোনো আলো আজো সেখানে জ্বলেনা। এই আত্মঘাতী সন্ন্যাসী সংস্কৃতির চণ্ডাল জোত প্রমাণ করে আমাদের স্বাধীনতা মিথ্যা, মিথ্যা আমাদের সংস্কৃতির দীর্ঘ পরম্পরা। এমত অবস্থায় ঘুরে ফিরে মনে আসে বিশ্বকবির কথা—যিনি আমাদের আঘাতে অপমানে ভরসা দেন। ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্রাঘাত করে সেই মানুষটি আমাদের জ্ঞানের আলো জ্বালাবার কথা বলেছিলেন। তিনি ছিলেন বলেই আমরা জানতে পেরেছি সেই বিখ্যাত জার্মান দার্শনিকের মন্তব্য 'ধর্ম হল আফিং-এর গোলা'। যার ফলিত উদাহরণ হল তরাইয়ে সন্ন্যাসীদের শ্মশান, তার নাম চণ্ডাল।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

১. The Sannyasi Rebellion : The Sociology and Economies of a Conflict in Sub Himalayan Bengal–B. P. Misra.

২. The Tribes and Castes of Bengal–H. H. Risley

৩. নমশূদ্র আন্দোলন—শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত, সম্পাদক—ড. চিত্ত মণ্ডল ও ড. প্রথমা রায় মণ্ডল।

৪. A Statistical Account of Bengal–W.W. Hunter, Volume-X

এছাড়াও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন অধ্যাপক ও একজন কর্মী, চণ্ডাল জোতের দুজন বাসিন্দা ও বুকস ক্লাবের কয়েকজন বন্ধু আমার এই রচনায় সাহায্য করেছেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

□ লেখক পরিচিতি—গবেষক, প্রাবন্ধিক, যুগ্ম সম্পাদক, স্বদেশচর্চা লোক।

দার্জিলিং জেলার রাজবংশী সমাজে শ্মশান ও লোকচারণা

নগেন্দ্রনাথ রায়

"মরণে রে,
তুঁহু মম শ্যাম সমান।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট,
রক্ত কমল কর, রক্ত অধর পুট,
তাপ বিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু-অমৃত করে দান।
তুঁহু মম শ্যাম সমান।"[১]

কবিগুরুর এই মর্মবাণীটি অভ্রান্তভাবে সত্য। চাই বা না চাই সবার জীবনে আসে মৃত্যু। মৃত্যু অমৃতের দ্বার। শ্রীগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরানি।
তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যানি সংযতি নবানি দেহি।" ২/২২

'সংসারে যে মরণ দেখতে পাওয়া যায় তা কেবল পুরনো কাপড় ছেড়ে অন্য নতুন কাপড় পরার মতো আবরণ পরিবর্তন মাত্র। পুরনো অপটু দেহ ছেড়ে জীব অপর একটি নবীন দেহ ধারণ করে মাত্র।'[২] শাস্ত্রবাক্য যাই হোক নিজের আত্ম পরিজন দেহত্যাগ করলে ঘটনাটি যে শোকাবহ সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আত্মার শান্তি কামনায় আপন আপন সংস্কার অনুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শব-সংস্কারের প্রথা বিভিন্ন ধরনের। 'মৃত দেহকে অগ্নিতে দাহ করা বা মৃত্তিকাতে প্রোথিত করার বিধানই আমাদের দেশে প্রচলিত।'[৩] অথর্ববেদ সংহিতার অষ্টাদশ কাণ্ডটি তো শবদেহ সংস্কার-এর মন্ত্রাদিতে ভরপুর। রাজবংশী সমাজেও কিছু শাস্ত্রাচার কিছু লোকাচার মিলেমিশে কিছু সংস্কার পালন করে। দার্জিলিং জেলার সমতল অংশে রাজবংশীদের বাসভূমি। এই রাজবংশী কারা? উত্তরে বলা যায় বিদগ্ধ গুণিজনদের মতে—'তাঁহারা ইন্দোমঙ্গোলীয় জাতির শাখাবিশেষ।'[৪] আবার 'ভ্রামরীতন্ত্রে বলা হয়েছে যে, নন্দীসূতের ভয়ে ভীত বর্ধনের পঞ্চপুত্র জ্ঞাতি ও বন্ধুদের সঙ্গে পৌণ্ড্রবর্ধন থেকে রত্নপীঠে এসে বসবাস শুরু করে। সেখানে ব্রাহ্মণ সঙ্গ অভাবে তারা ক্রমশ ক্ষাত্রধর্ম চ্যুত হয়। এই স্বধর্মচ্যুত ক্ষত্রিয়রাই পৃথিবীতে রাজবংশী নামে খ্যাত।[৫]

হিন্দু দশবিদ কর্মসংস্কারের অন্তিম সংস্কারটি হল 'অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াকর্ম'। দার্জিলিং জেলার রাজবংশী সমাজে শব-সংস্কার ও ক্রিয়াকর্মে গৌড়ীয় প্রভাব বিদ্যমান। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় শ্রদ্ধেয় সুরঞ্জন দত্ত রায় বলেছেন—'কোচবিহার রাজ্যে কোচ রাজাদের মধ্যে ছিল শৈব ধর্মের প্রভাব, পরে রাজগণ বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার দেখা যায়।'[৬] আবার অনেক বিদগ্ধ গবেষক মনে করেন, রাজবংশী সমাজে গৌড়ীয় প্রভাব থাকলেও অনুষ্ঠানগুলির কর্মকাণ্ড 'একশরনিয়া' ধর্মের প্রচারক ভগবান শঙ্করদেবের প্রভাবে পরিপুষ্ট থাকাই স্বাভাবিক কারণে

আগেকার দিনে প্রতি গ্রামে একজন করে রামরূপী ব্রাহ্মণ বাস করতেন এবং তারাই রাজবংশী সমাজে বিবাহ বা শ্রাদ্ধাদি করাতেন। এই জেলার রাজবংশী সমাজে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াকর্মের লোকাচারগুলি এই :

শব-সংস্কার : পরিবাবের কেউ মারা গেলে তার কিছুক্ষণ পর শবের শিয়রের দিকে একটি মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আত্মীয় পরিজন (ভাগীসাগি) এলে পর মৃতদেহ ভাল করে স্নান করানো হয়। উঠোনে বা তুলসীতলায় কলার পাতাব উপর শোয়ানো হয়। সমস্ত পোশাক খুলে নিয়ে পরানো হয় ডোর কৌপীন, সঙ্গে দেওয়া হয় ঝলা। মাথায বা বুকে লিখে দেওয়া হয় 'হরে কৃষ্ণ....'' মন্ত্র। এ যেন সন্ন্যাসীর রূপ। আপন আপন বংশের নির্দিষ্ট রাজবংশী কীর্তনিয়া— কীর্তনিয়া বড় করতাল, খোল সহযোগে করেন কীর্তন—যা ধামালি/ধুমালি বা মরা খাওয়া কীর্তন নামে পরিচিত। শব যেমন শুধুমাত্র শব নয় যেন সন্ন্যাস যাত্রা, গানগুলির মধ্যেও তারই প্রকাশ। শবযাত্রার প্রাক্কালে যে গানখানি গাওযা হয় তা হচ্ছে এই :

'নগর হইতে বাহির হইল শচীর দুলাল গড়া
কোথায় রইল শচীমাতা কোথায় রইল বিষ্ণুপ্রিয়া
কোথায় গেল প্রেম পুতুলা নয়ন তারা
নগর হইতে বাহির হইল শচীর দুলাল গড়া।'

যাত্রাপথে : গানখানি মনোশিক্ষামূলক। গুরুই যে ইহ-পরকালের সাথী সেই ভাবটি গানের মধ্যে পরিস্ফুট। গানখানি এই :

'হরিবোল হরিবোল হরিবোল
সঙ্গে কে তোর যাবে রে সঙ্গে কে তোর যাবে
হাট ভাঙিলে বেলারে যায় পার হবো মন তুই কার নায়
পার হয়া যাবো কার না বাড়িরে
অবোধ মন কেন না গুরু ভজ মন
নরে গুরু নবে শিষ নরে দেখায় পন্থের উদ্দিশ
নর ছাড়া হল রে কেন গুরু না ভজ মন।'

শব যাত্রা বের হবার পর মৃতের কোন ঘনিষ্ঠ নিকট আত্মীয়া যে অনুষ্ঠানটি করেন তার নাম 'দুখের হাঁড়ি ভাঙা'।

অনুষ্ঠানটি এইরূপ, তিনি একটি মাটির হাঁড়ি নিয়ে গোবর জল বারুন দিয়ে ঝাঁট দিতে দিতে রাস্তায় এসে কাস্তে দিযে হাঁড়িটি ভেঙে ফেলেন। রাজবংশীদের বিশ্বাস দুঃখের হাঁড়িভাঙার ফলে মৃতের সমস্ত রকম দুঃখ দূর হয়ে যায়। দূব হয় ত্রিতাপ জ্বালা, আত্মা পায় চিরশান্তি।

শ্মশানে : যে স্থানে শব দাহ বা কবরস্থ করা হবে সেই স্থান কিনে নেওয়ার প্রথা। এই কারণে সেই উদ্দেশ্য যৎসামান্য কড়ি বা পয়সা দিতে হয়। রোপণ করতে হয় একটি তুলসী বৃক্ষ। চিতা সাজানো হয় উত্তর দক্ষিণে। চিতার মাপ—প্রস্থ দেড় হাত, দৈর্ঘ্য চার হাত। শবদেহ নিকট আত্মীয় কেউ ছুঁয়ে থাকবেন। রাজবংশী মত অনুসারে বাবা হলে প্রথম মুখাগ্নি করবেন বড় ছেলে। মা হলে সবচেয়ে ছোট ছেলে। নতুবা সমাজের রীতি অনুসারে পইচ বা পঞ্চ যা নির্দেশ দেবেন। সকল শ্মশান যাত্রীর চিতায় 'খড়ি' দেবার নিয়ম। সবার শেষে অবশ্যই সকলেই স্নান করেন।

দাহকার্য শেষ হলে মৃতের উত্তরাধিকারীদের দেওয়া হয় সাদা কাপড় মালার মতো করে যার নাম 'মালা।' রাজবংশীদের বিশ্বাস এই মালা অর্থাৎ 'প্রেতাত্মা'। শ্মশানে একটি সাদা কাপড়ের ধ্বজা বড় লম্বা বাঁশ দিয়ে ঝাণ্ডার মতো পুঁতে দেওয়া হয়, এর নাম 'চিল'। অনেকে এই চিলকে মাশানের 'চিল'ও বলেন। একটি মাটির হাঁড়ি জলপূর্ণ করে চিতার পাশে রাখা হয় তার উপর থাকে সাদা কাপড়ের আচ্ছাদন। ফেরার পথে যিনি মুখাগ্নি করেছেন তার কাঁধে থাকে কোদাল। পথের তিন জায়গায় তিনটি চোট দিতে হয়। শেষে মৃত আত্মার উদ্দেশে বলা হয়—

'ওদিয়ায় ওদিয়ায় রহিস, ওদিয়ায় ওদিয়ায় খাইস আর কাছের কোনো হাটের নাম করে হাট করিস'। মৃত আত্মা আর বাড়িতে আসবে না এমত বিশ্বাস। দাহকার্য চলাকালীন কীর্তনিয়াগণ যে গানগুলি করেন তা খুবই ভাবব্যঞ্জনামূলক।

শ্মশানের গান

(ক) "আকুল কালেরে বেলা শিহরে পখরি
দেহ ছাড়া হইলে জীবন করিবে ছাড়খার
ভাই ভাজিতা ভিরিয়া বান্ধিবে পায়া সিংগের চো
কাঞ্চা বাঁশের খাট পালঙ্কি শুকান পাটের ডোর।"

(খ) 'কাঞ্চা বাঁশে কান্ধে করে যত সখীগণ
কালিন্দীরে তীরে যায়া বান্ধিয়া দিলে ফটিকের ধনি
হরিবোল বলিয়া জ্বালায় দিলে জ্বলন্ত অঘুনি
ব্রহ্মা হইল ধামগড়ি বিষ্ণু চিতাখানি
হরিবোল বলিয়া জ্বালায় দিলে জ্বলন্ত অঘুনি
জ্বলে যাচ্ছে চিতাখানি স্বর্গে উঠে ধয়া
আজি হাতে ফেন্নার জীবন যা বৈকুণ্ঠে লাগিয়া।'

শিহরে—মাথা, পখরি—পুকুর, সিংগের—মাটি খুঁড়ে যে চোর ঘরে ঢুকে সেই স্থানকে বলা হয় সিং দেওয়া, কাঞ্চা—কাঁচা, ফটিক—চিতা, ধনি—চিতাগ্নি, ধামগড়ি—চিতা সাজাতে মূল হিসাবে যে কাষ্ঠখণ্ড দেওয়া হয়।

প্রথম গানটি মনোশিক্ষামূলক, দ্বিতীয়খানি ভাবনামূলক। 'ধামগড়ি' হচ্ছে ব্রহ্মাস্বরূপ, চিতা—বিষ্ণু, চিতা জ্বলছে তার ধুয়া স্বর্গে উঠে যাচ্ছে, মৃত আত্মা যেন বৈকুণ্ঠে যায়।

ডুকি পুতা : যারা 'মালা' নিয়েছেন তাঁরা দিনেরবেলায় শুধুমাত্র ফল-মূল, দুধ, দই, আতপ চিঁড়া, রুটি খাবেন। নিয়ম হল যদি বাবা মারা যান তাহলে সন্তানরা কলা খাবেন না, মা মারা গেলে দুধ। এই নিয়ম কমপক্ষে ছয়মাস—ছ'মাসি না হওয়া পর্যন্ত। কেউ বাৎসরিকও এই নিয়ম পালন করিয়া থাকেন। সন্ধ্যায় পাতিলে করে যে রান্না হবে তাকে বলা হয় ডুকি পুতা। ডুকিপুতার সময় কীর্তনিয়াগণ যে গানগুলি করেন সেগুলি 'খেদ'মূলক ভীষণভাবে মনকে নাড়া দেয়—

(ক) 'কি বলিবো আরে সখি গৌরাঙ্গের মহিমা
শিব শঙ্কর নারদমুনিরে দিতে নারে সীমা
ছিরিমতি রাধে কহে রে হ দেখ সখি মনতে জানিয়া

জন্মে জন্মে রাখ প্রভুরে মোক পদ ছায়া রে।'

(খ) 'ও মোর সখিরে আর কি ওই মতন দিন আর হবে
আকাশতে চন্দ্র নাইরে ভাই কি করিবে তারা
যে নারীর পুরুষ নাইরে দিনে অস্তিহারা
পখরিতে জল নাইরে কি করিবে মাছে
যে নারীর পুরুষ নাই কি করিবে রূপে।'

তিনকাম : তিনকাম বা ত্রিশ্রাদ্ধ, ও বার/তের ডুকির হিসাব অনুসারে হয়। শবের সৎকারের চতুর্থদিনে হয় তিন কাম। সেই দিন ঘাটে নিজস্ব জ্ঞাতিবর্গ ছাড়া আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ক্ষৌরকর্ম করেন। যারা শবদেহ কাঁধে নিয়েছেন তারা 'কাংনামান'।

কাংনামানি—এইরূপ একটি খুঁটিতে আতপ চাল সাদা সুতা সকলে কাঁধে নিয়ে হরিবোল বলে এক ডুব দেন। লোকবিশ্বাস এই এ না করলে মৃতের আত্মা কাঁধেই থাকবে। এদিন আত্মীয় স্বজনেরা মেয়ে জামাই সকলেই ঘাটে বালুপিণ্ডি দেন। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে এই অনুষ্ঠানের খরচ বিবাহিত মেয়ে জামাইরা করে থাকেন। আগেকার দিনে এই অনুষ্ঠানে দই চিঁড়া খাওয়ানোর নিয়ম ছিল।

দশহরা : দশ দিনে হয় দশহরা তথা শ্মশান বা মাশান ভৈরবের পূজা। পূজা অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণ দিয়ে সম্পন্ন করা হয়। এগারো দিনকে বলা হয় শূন।

খাউর : বারো দিনের দিন হয় ক্ষৌরকর্ম বা খাউর।

আদ্যশ্রাদ্ধ : তেরো দিনের দিন পূর্বাহ্নে ব্রাহ্মণ কর্তৃক হয় আদ্যশ্রাদ্ধ—শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে।

ডুকিডাহন বা দহন : খাউরের দিন ঘাটে/শ্মশানে ডুকিতে রসুন, পিয়াজ, একটি পুঠি বা পুঁটি মাছ দিয়ে (অভাবে যে কোনো ছোট মাছ) পাটশলা দিয়ে অল্প জ্বাল দিতে হয় এবং 'মালা' নেওয়াগণ তাদের সব কিছু যখন ফেলে দেবেন, জলে ডুব দেওয়ার সময় ডুকি ভেঙে ফেলতে হয়। এর নাম ডুকিডাহন।

জীবচালান : এই অনুষ্ঠানটি একমাত্র পরিবারের কুলগুরু বা গোঁসাই ছাড়া হয় না। এখনও দার্জিলিং জেলার রাজবংশী সমাজে এই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া অতি শ্রদ্ধা ও নিয়ম-নিষ্ঠা সহকারে পালন করিয়া আসিতেছে। সন্ধ্যায় গোঁসাইঠাকুর একটি চাইলন বাতি নিয়ে ভিতর মহলের উঠান হতে বহির্উঠানে যেখানে সাদা কাপড়ে আচ্ছাদিত মণ্ডপ থাকে যার নাম ছরি বা 'ছহরি'। সেখানে সরিষা (তুরি) ছিটাতে ছিটাতে আসেন। এই সময় ঘরে বাহিরে গুরুকর্তৃক মন্ত্রপূত সরিষা ছিটিবার নিয়ম—সেখানে অনুষ্ঠিত হয় জীবচালান অনুষ্ঠান।

জীব চালানের একটি মন্ত্র এইরূপ—

'শিলাংঙ্গ হারাংঙ্গ আশা তিষিনার ছাড়িয়া
যা তুই বৈকুণ্ঠ লাগিয়া
মায়ের নাম ইন্দু বাপের নাম বিন্দু
ফেন্নার জীবটি লইয়া যা বৈকুণ্ঠ লাগিয়া
মায়ের চার বাপের দশ আঠার মকাম এর

জীবটি লইয়া যা বৈকুণ্ঠ লাগিয়া।'

অন্যভাবে,

বৈষ্ণবের পদধূলি রজ নাম বিন্দু
দয়া বাপের নাম মায়ের নাম ভব সিন্ধু
পার করিবে শ্রীগুরু খির নদীর হিরের ধার
এই দিয়া হয়। যাবো ভব পার
বৈষ্ণবের পদধূলি মাথায় লইয়া
হরি হরি বলিযা যা তুই বৈকুণ্ঠ লাগিয়া।

মন্ত্র সব খুলে বলা যায় না বলে এই পর্যন্ত ক্ষান্ত থাকিলাম। এরপর মৃতের ভাগীসাগিগণ গড়ি অর্থাৎ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন, মৃত আত্মার উদ্দেশে এর নাম ধুমালি।

ধুমালির গান

ক) 'নদীয়ায় বন্দিবো আমি শচী ঠাকুরানি
যার গর্ভে জন্ম নিলো প্রভু আপনি
কোথায় জন্মিলোরে ভাসিয়া আইলো জলে
দুটি আংখি ছল ছল পদ নাইরে চলে
নিতাইনন্দ আসিয়া উদইত হইল তরী
যতেক মহন্ত সবে বল হরি হরি
শাম চান্দে নিতাই চান্দে হয়া গেল মিলন
নিতাই ধরিয়া কান্দে প্রভুর চরণ।'

খ) 'ভব নদীর পারে আছে মন একখানি তরু
সেইঠে হাতে ছাড়া হোল দীক্ষা শিক্ষার গুরু
বৈষ্ণব গোঁসাই আমার করুণার সিন্ধু
এই কাল পরকাল তিন কালের বন্ধু।
দয়া কর বৈষ্ণব গোঁসাই কলির ভোগ তরাইতে
আইল তিন ভাই, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত গোঁসাই
বৈষ্ণবের পদধূলি লাগুক আমার অঙ্গে।
জলসে জলসে রাখ শ্রীগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে।'

শ্রাদ্ধের এক/দুই দিন পর হয় 'শিতিলি' সেবা এই সেবা গোঁসাই দিয়ে করলে ভাল নতুবা অন্য কোনো অধিকারী দিয়ে করালেও চলে।

প্রাসঙ্গিকভাবে, রাজবংশীরা শুভবিবাহ বা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে আর একটি নিয়ম পালন করে তার নাম 'রাখাল ভোজন'। কিছু সংখ্যক বালককে দিনের পূর্বাহ্ণে বসিয়ে আলু পোড়া মেখে— যাকে বলে আলুর সানা, মুরি চিঁড়া শ্রদ্ধা সহকারে খাওয়ানো। অর্থাৎ ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ, সুদাম-শ্রীদাম সখাগণ ভেবে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করার নিয়ম। রাখাল ভোজনের সময় কীর্তনিয়াগণ যে গানটি করেন তা এই :

—'চৈতন্য স্বরূপ হে অবতার। দেখ ভাই চৈতন্য স্বরূপ অবতার।।
শিশু জন্ম আর জন্ম আইল গৌরবেশে মোর মন।।
সে হরি শচিরে দুলাল।। কেবল সাক্ষাত মন ভাই
কেহই না জানি মোর মন উদ্ধারিল এ ভব সংসার।।

অন্যভাবে,

ঠাকুর কানাই খিদায় নন্দের বালা বসিয়া বটের তলা
অন্নালয়া আইল ব্রেজনারি।।
ঠাকুর কানাই আনছে বটের পাত অন্নব্যঞ্জন রাখ তাত
আজারিয়া দাও থালাখরা।। আনহে ময়লানির ভারি
চুমকিয়া তুল পানি পাখলিয়া দেও থালা খরা।।
চৌদিকে মণ্ডপ করি মইধ্যে বসিল হরি রাখাল বসিল সারি সারি।।
কেহ লইল হস্তে হস্তে কেহ লইল বৃক্ষের পাতে
কানাই লইল সবর্নের থালাতে।
রাখালে রাখালে কয় কানাই মনুষ্য নয়
আগে দেও কানাইর বদনে। কানাই করিলে
সাধ খাইতে হবে পরসাদ পাছে পাবে যত
রাখালগণ।।
সকল শিশু অন খায় শ্রীদাম রইল চায়া।
ভায়ার মুখে ভায়া দিল লবনি মাখিয়া
ভোজন করিয়া কৃষ্ণ করে আচয়ান।
সবর্নের খরিকা লইলে দাতের মাইজন।
ভোজন করিয়া কৃষ্ণ মুহে দিলে পান।
মুখ সুদ্ধ বলিয়া খালে মুহুরি মিঠা পান।।
ইহ দেখি কৃষ্ণের মনত বড় সুখ
মুহে মুহে অং দিয়া হাসে চান্দ মুখ।।
যমুনার কুলিন্দে বঠাইয়া সর্ব গাই।
কোলাকুলি করেরে সঙ্গের সঙ্গ ভাই।
কোলাকুলি করিয়া বানকে পুরে বেনু
তরুতলে বিছানা করিলে রাম কানু।।

কীর্তনিয়াগণের রয়েছে অজস্র পদ—ডাক নাম, অধিবাস, জলসম্পদ, বাঁশি সম্পদ, রূপ সম্পদ, দূতি সম্পদ, গোষ্ঠ, ফিরা গোষ্ঠ, জলডুবি পদ, বড় ধুমালি প্রভৃতি। রাজবংশীদের গর্ভবতী কেউ মারা গেলে তাকে কবরস্থ করার নিয়ম। পাশে একটি কলাগাছ লাগাতে হবে। কলাগাছটির যখন কাদি (খান্দি) বের হবে সেই মা ও সন্তানের মঙ্গল বলে বিশ্বাস। জলে ডুবে মারা গেলে কীর্তিনিয়াগণ 'জলডুবি পদ' গেয়ে থাকেন। 'জলডুবি পদ'গুলি সাহিত্য রসেও ভরপুর। তথা—

রসমতি রাই গেল জল ভরিবারে
দেখে সব শিশু আছে শয়ন করিয়ে।
রসমতি রাই লইল মুরলি হরিয়া
নিকুঞ্জ গহন বনে রাখিল লুকাইয়া।।
বাঁশিটি লুকাইয়া থুল নিকুঞ্জের বনে
জল ভরিবার গেল কালন্দির জলে।।
ধবলির হাম্বা রব গগনে ভেটিল
শুনিয়ে সকল শিশু চেতনা পাইল।।
চেতন পাইয়া সবে দেখে চারি ভিতে
বংশী না দেখিয়া কৃষ্ণ লাগিল ভাবিতে।।
মুরলি হারাইয়া কৃষ্ণ গুণে মনে মনে
মুরলি হরিল রাই জানিল অন্তরে।।
কানাই বলেন রাই তুমি বড় চোর
লুকাইয়া রাখিলে কোথা মুরলিরে মোর।।
রাই বলে আসিয়াছি জল ভরিবারে
মুরলি হরিল কেবা চোর বল মোরে।।
কানাই বলে সত্য বল নাকর চতুরালি
হরিয়া লইলে রাই আমার মুরলি।
মুরগি হরিয়া রাই যাইতে নাহি দিব
যমুনার জলে যাইয়া সত্য করাইব।।
মুরলি আনিয়া দেহ শুন প্রিয়-বানি
কিম্বা সত্য কর জলে রাধা সোহাগিনী।।

দে প্যারো বংশী-মেরো এসা সোহাগিনী।
রাধা প্যারী ক্যালেকে গাব ক্যালেকে বাজাব
ক্যালেকে গৌকে ঘুমাব।। হামেভি বাজাব
মুখেভি গাব লকড়ি সে গৌকে ঘুমাব।
কানাই বলে রাই প্রত্যয় করি তবে
একবার সত্য কর জমুনার জলে।
জলতে ডুবিয়া রহ তবে সত্য জানি
ভাসিয়া উঠিলে মিথ্যা হবে তব বানি।
(শ্রীরাধিকার হস্ত ধরি জলতে ডুবিল হরি)
ভাসিয়া উঠিল রাই যমুনার জলে
সর্গে থাকি দেবগণ দেখে কৌতূহলে
সর্গে থাকি দেবগণ দেয় জয়ধ্বনি

লজ্জা পায়া শ্রীমতি রাই বংশী দিল আনি।

সম্পন্ন গৃহস্থ রাজবংশী পরিবার 'কাণ্ডাহার' (অগ্রদানী ব্রাহ্মণ) দিয়েও শ্রাদ্ধ করান। এঁদের কাজ ঘাটে, বাড়িতে নয়। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ছয় গোঁসাই থাকলেও, রাজবংশী সমাজে পঞ্চ ঠাকুর বা গোঁসাই হলেন (ক) কুলগোঁসাই (গুরু), (খ) ভেকধারি ছোপরিয়া গোঁসাই (যে গোঁসাইদের লম্বা ঝলা), (গ) বাভন বা ব্রাহ্মণ (ঘ) নাউয়া ঠাকুর (নাপিত) (ঙ) পইচ (পঞ্চ) ঠাকুর। এছাড়া কোনো কোনো শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে বৈষ্ণব সেবা করাবার নিয়ম বৈষ্ণব সেবার 'ডাক'টি এইরকম :

কহ কহ কৃষ্ণ কথা
হরি গুরু যথা তথা
দিয়া পরসাদ লাগাইয়া ভোগ
ফেন্নার মনের বাঞ্ছা হাসিল হোক।

দাতা ভক্তা কি জই
জয় জগন্নাথ কি জই
সাধু বৈষ্টম কি জই
শান্তি মধুর বাণী হয় রে হয়।

তথ্যসূত্র :

১. সঞ্চয়িতা—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ১৭

২. শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা—শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ গিরি পরমহংস, পৃ. ৮২

৩. পরলোক প্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী অমলানন্দ সরস্বতী, পৃ. ১৪০

৪. উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা পার্বণ—ড. গিরিজাশংকর রায়, পৃ. XIX

৫ প্রবন্ধ—'রাজবংশী সমাজের আত্মপরিচয়'—সুখবিলাস বর্মা, সূত্র . ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, সম্পাদক : ইচ্ছামুদ্দিন সরকার, পৃ. ১৬২

৬. প্রবন্ধ— 'উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি একটি পর্যালোচনা—সুরঞ্জন দস্তরায়, সূত্র : ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, পৃ. ৮৩

৭. গান/মন্ত্র—শ্রদ্ধেয় যতীশ্বর সিংহ (জগদানন্দ ব্রজবাসী) নেংটিছাড়া, নিউবঙ্গিয়া, দার্জিলিং

৮. গান—শ্রদ্ধেয় অনিল সিংহ, ঐ

৯. মন্ত্র—শ্রদ্ধেয় চৈতু সিংহ, কুলগোঁসাই, ছোট ধুকুরিয়া, পাথরঘাটা, দার্জিলিং।

□ লেখক পরিচিতি—পেশায় শিক্ষকতা। নেশায় সাহিত্যচর্চা। প্রকাশিত গ্রন্থ : নিগমাঞ্জলি, নিগমকাথা, হোকোলখোলী, (কাব্য) শ্রীশ্রীগীতা আয়ী (শ্রীমদ্ভাগবদগীতার রাজবংশী অনুবাদ)। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা' রাজবংশী অনুবাদ।

উত্তর দিনাজপুর জেলার মুসলিম সমাজ : কবরস্থান এবং প্রাসঙ্গিক কথা

পার্থ সেন

বর্তমান উত্তর দিনাজপুর জেলা ইসলামপুর মহকুমাকে বাদ দিয়ে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় সাবেক দিনাজপুর জেলাকে বিভাজন করা হয় এবং বালুরঘাট কুমারগঞ্জ, গংগারামপুর, তপন, রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, বংশীহারী, কুশমণ্ডি, ইটাহার এবং হিলি থানাকে নিয়ে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গঠন করা হয়। দিনাজপুর জেলার বাকি অংশকে তৎকালীন পূর্ব বাংলার সাথে যুক্ত করা হয়। ১৯৫৬ সালে পূর্ণিয়া জেলা থেকে বর্তমান ইসলামপুব অঞ্চলকে নিয়ে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সাথে সংযুক্ত করা হয়। পুনরায় ১৯৯২ সালে পশ্চিম দিনাজপুর জেলাকে বিভাজন করে রায়গঞ্জ এবং ইসলামপুর মহকুমাকে নিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলা গঠন করা হয়। বর্তমান উত্তর দিনাজপুরের আয়তন হল ৩১০০৬০ বর্গ কিলোমিটার। জেলার মোট মৌজার সংখ্যা ১৫১৬টি।[১] ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুসারে উত্তর দিনাজপুর জেলাব মোট জনসংখ্যা ছিল ১৯,২৬,৭২৯।[২] নবগঠিত উত্তর দিনাজপুর মোট সাতটি থানার মধ্যে ইসলামপুর, চোপড়া এবং ১নং ও ২নং গোয়ালপোখর ব্লকে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেশি। ১৯৮১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী পশ্চিম দিনাজপুর জেলার মুসলিম জনগোষ্ঠীর হার ছিল ৩৫.৭৯ শতাংশ।[৩]

জেলার মুসলিম সমাজের কবরস্থানগুলি আলোচনা করার পূর্বে এ জেলার ইসলামধর্ম বিস্তারের ইতিহাস আলোচনা করা যাক। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে নবগঠিত উত্তর দিনাজপুর জেলার ইতিহাস সাবেক দিনাজপুর জেলার ইতিহাসের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ১২০১ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজী নদীয়ার সেন রাজা লক্ষণসেনকে পরাস্ত করেন। পরাজিত লক্ষণসেন পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন লক্ষণসেন পরাজিত হবার পর বখতিয়ার খলজী গৌড়ে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। এবং অল্প সময়ের মধ্যে বরেন্দ্রী বিজয় করেন। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার দেবকোট (পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বানগড়) থেকে তিব্বত অভিযানে যাত্রা করেন।[৪] বখতিয়ার খলজীর নদিয়া বিজয়ের পর থেকেই উত্তর এবং পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫] রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সাথে সাথে মুসলিম পির ফকির সুফি সন্তরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এমনকী প্রত্যন্ত গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরাই ইসলামের সাম্যের বাণী ছড়িয়ে দেন সাধারণ মানুষের মধ্যে। রাষ্ট্র ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতা, অলৌকিক ক্ষমতা এবং উন্নত কৃষিবিদ্যার সাহায্যে এই সমস্ত পির ফকির এবং দরবেশগণ দিনাজপুর জেলা সহ বাংলার শহর এবং প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলে ইসলামধর্ম বিস্তার করেন। কোথাও প্রাথমিকভাবে সুফি সন্তরা

অস্ত্রের সাহায্যে এলাকা দখল করতেন এবং পরবর্তীকালে তাদের সহজ সরল জীবনযাত্রা পদ্ধতি এলাকার মানুষদের আকর্ষণ করত।[৫] ব্রাহ্মণ্যধর্মের কঠোরতা এবং জাতিভেদের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পাবার জন্য নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও সহজেই ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। সাথে রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা পাবার লোভ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ধর্মান্তরিত হতে খানিকটা উৎসাহিত করেছিল।[৬] বাংলাদেশের যে সমস্ত জেলায় ইসলামধর্ম ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল তার মধ্যে দিনাজপুর জেলা ছিল অন্যতম।[৭] এ জেলাতেও যে পির ফকির সুফি ও সন্তরা ইসলামধর্ম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় সমগ্র উত্তর দিনাজপুর জেলায় ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য পিরস্থান এবং মাজার থেকে। এই সমস্ত পিরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বুড়াপির, কাটাপির, জঙ্গল পির, খোড়াপির, হাজীগাজী পির, মুস্কিল আসান পির, একিন পির, ঢেলপির, ঢাকপির, ঠাকুরপির, কান্দনীয়াপির, মানিকপির, সত্যপির, মাজারপির, তেতুরপির, বিন্দোলের বুড়াপির, দ্বীপনগর মাজার, জিয়াগাছি মাজার ইতাদি।[৮] প্রত্যেক পিরের মাজারে বছরে একবার উরস মেলা হয় এবং তাতে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ নেয়। পিরের মাজারে সিন্নি ও চাদব দিয়ে থাকে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ।

অবিভক্ত বাংলাদেশের অপরাপর জেলার মতো দিনাজপুর জেলাব মুসলিম সমাজের বড় অংশই ছিল ধর্মান্তরিত মুসলমান। হান্টার লিখেছেন *"A few among the Muhammedan population are the descendants of the original Musalman Conquerors of the country, but the great bulk of them are descended from the lord caste Hindus, who were converted by force or otherwise to the faith of Islam and are known as 'Nasya'."*[৮] উল্লেখ্য শুধু উত্তর দিনাজপুর জেলাতেই নয় সমগ্র উত্তরবঙ্গেই ধর্মান্তরিত মুসলিম সম্প্রদায়কে 'নস্য' বলে অভিহিত করা হত। দিনাজপুর জেলার জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলিম সম্প্রদায় হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে মুসলিম সম্প্রদায় ছিল দুর্বল। অর্থনৈতিক দিক থেকে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুরাই ছিল সম্পন্ন এবং প্রভাবশালী।[৯] জেলার মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শেখ, সৈয়দ, মীর, পাঠান, ভাটিয়া, ভাট, দাই, হাজ্জাম, গাইন, ফুলিয়া ইত্যাদি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়।[১০] উল্লেখ্য একমাত্র ইসলামপুর মহকুমাতে কুলিয়া সম্প্রদায়ের মুসলিমদের বসবাস দেখতে পাওয়া যায়। কারণ একমাত্র পূর্ণিয়া জেলাতেই এই কুলিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলিমদের দেখতে পাওয়া যায়। এরাও ধর্মান্তরিত মুসলিম। এদের পূর্ব-পুরুষরা খাগড়ার নবাবের জালালগড় দুর্গ নির্মাণের কাজে নিয়োজিত ছিল। পূর্ণিয়া জেলায় 'কুলিয়া' সম্প্রদায়কে শেখ মুসলিম সম্প্রদায়ের উপগোষ্ঠী বলা হয়।[১১] ইসলামধর্মের প্রসারের সাথে সাথে দিনাজপুর জেলায় প্রচুর মসজিদ স্থাপিত হয়। মসজিদগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুসলিমদেব মধ্যে সামাজিক এবং ধর্মীয় ঐক্য স্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। মসজিদগুলি সম্বন্ধে Karnoketan Sen লিখেছেন *"In many villages there were huts which were*

places of worship and were called the 'Jumma Ghars' where there more than one in a village, the local Muhamnedan population was very offen divided into factions, each attached to one of the Jummaghars."[১১] মসজিদের মতো এ জেলার মুসলিম অধ্যুষিত শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলে বহু কবরস্থান দেখতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো গ্রামে একাধিক কবরস্থানের অস্তিত্ব আছে। সমষ্টিগত কবরস্থান ছাড়াও বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের আলাদা আলাদা কবরস্থান আছে। তবে ভাটিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের সুনির্দিষ্ট কোনো আলাদা কবরস্থান নেই। তাঁরা মৃত ব্যক্তিদের নিজস্ব জমিতে বা বাড়ির আশেপাশে কবর দিয়ে থাকেন। উত্তর দিনাজপুর জেলায় শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলিম সম্প্রদায়ে সংখ্যা অল্প হওয়ায় জেলায় অধিকাংশ কবরস্থানগুলিই সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের। সুন্নিরা আবার বেরিলি এবং দেহবন্দী এই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এ জেলার কবরস্থানগুলি একদিকে যেমন মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে পিতৃপুরুষের স্মৃতি বহনকারী এবং শ্রদ্ধাব স্থান তেমনি কবরস্থানেব জমি নিয়ে মুসলিম সম্প্রদাযের বিভিন্ন গোষ্ঠীব মধ্যে বিরোধ প্রায়শই দেখা যায়। কখনও কখনও আবার কবরস্থানের এলাকা নিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের সাথে বিবোধ সংঘর্ষ হতে দেখা যায়। ফলে কবরস্থানের শান্তি রক্ষায়, বিবোধ মেটাতে প্রশাসন এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রাযশ হস্তক্ষেপ করতে হয়।

লক্ষ্মীপুর কবরস্থান . ইসলামপুর মহকুমার চোপড়া ব্লকের অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর কবরস্থান। উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্যতম প্রাচীন এবং আয়তনে বড় এই কবরস্থান। কবরস্থানে প্রায় একশো বিঘা জমি আছে। স্থানীয় জনসাধারণের কাছে জানা যায় যে প্রায় তিন শতাধিক বছরের পুরনো এই কবরস্থান। ১৪৯৩-৯৪ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহ যখন কামরূপ অভিযানে যান তখন দাসপাড়া লক্ষ্মীপুব অঞ্চলে। করতোয়া নদীর তীবে গলাণ্ডিগড়ে প্রায় চল্লিশ হাজার সৈন্য কিছুদিন অবস্থান করেন। তখন সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনে তিনি গলাণ্ডিগড়ে দশ একর জমিব উপর বিশাল পুকুর খনন করেন। এই পুকুর হুসেন দিঘি নামে পরিচিত।[১২] অনুমান করা যায় দ্বাদশ শতকেই এই অঞ্চলে ইসলামধর্ম প্রবেশ করেছিল। লক্ষ্মীপুর কবরস্থানে লক্ষ্মীপুর, জড়যা গাছ, ডাঙাপাড়া ইত্যাদি ১৫/১৬টি গ্রামের লোক তাঁদের পরিবারের মৃতদেহ কবর দিয়ে থাকেন। সাম্প্রতিককালে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে তারকাঁটাব বেড়া দেওয়ায় এই কববস্থানের বেশ কিছু অংশ কাঁটাতারের ওপারে পড়ে যাওয়ায় স্থানীয মানুষ যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। নাগর নদীর উপর বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় কবরস্থানের বেশ কিছু অংশ ইতিমধ্যে নাগর মাটিতে তলিয়ে গেছে। ফলে কবরস্থানের আয়তন কমছে। কবরস্থানের আশাপাশ দিয়ে সাম্প্রতিককালে চা বাগান হওয়ায় বর্তমান ওই এলাকার মানুষদের একমাত্র লক্ষ্মীপুর ফুলবাড়ি রাস্তা দিয়েই প্রবেশ করতে হয়। লক্ষ্মীপুর কবরস্থানের পাশেই একটি পিরের মাজার আছে। পিরের মাজার গড়ে ওঠার ইতিহাসটাও মজার। সত্তর দশকের গোড়ায় কোনো সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ান রাত্রিতে পাহারা দেওয়ার সময় কবরস্থানে বসেন। একা কবরস্থানে বসে তিনি আচমকাই ভয়

পেয়ে যান। তারপরই তিনি ওখানে পিরের মাজার স্থাপন করান এবং সিন্নি দেন।[১৪] লক্ষ্মীপুর এলাকার এই কবরস্থানকে স্থানীয় মানুষ ফুলবাড়ি কবরস্থান বলে। করতোয়া নদীকে স্থানীয় মানুষ 'কুর্তুয়া' নদী বলে।

আমতলা ধনিরহাট কবরস্থান : লক্ষ্মীপুরের পাশেই দাসপাড়া পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আমতলা ধনিরহাট কবরস্থান। অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্থাপিত এই কবরস্থানের অধীনে প্রায় ২০/২৫ একর জমি আছে। স্থানীয় জোতদার পতি সিংহ এবং সতী সিংহ ইসলামধর্ম গ্রহণ করার পর তাঁরাই এই কবরস্থানের জন্য জমি দেন। পরে এঁরা শাহ উপাধি ধারণ করেন। এঁদের কবর আমতলা ধনিরহাট কবরস্থানেই আছে।[১৫] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায় ইসলামধর্ম গ্রহণ করলেও তাঁরা দীর্ঘদিন ধরেই পুরানো নাম এবং উপাধি ব্যবহার করতেন। ১৯১১ সালে প্রকাশিত নোয়াখালি জেলা গেজেটিয়ারে দেখা যায় যে ওই অঞ্চলের ধর্মান্তরিত হিন্দুরা চন্দ, পাল, দত্ত প্রভৃতি হিন্দু উপাধি ব্যবহার করছেন।[১৬] অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওয়াহাবি আন্দোলন এবং বিংশ শতাব্দীতে হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাবই বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায় আরবীয় উপাধি গ্রহণ করতে থাকেন। চোপড়া থানার অন্ত • সোনাপুর কবরস্থান একটি পুরনো কবরস্থান। বিহারের সীমান্ত লাগোয়া এই কবরস্থান লম্বায় এক কিলোমিটার এবং চওড়ায় ৬০ মিটার। তৎকালীন জমিদার মহঃ খেলেন চৌধুরী এই কবরস্থানে জমি দান করেছিলেন। কবরস্থান পরিচালনার জন্য একটি কমিটি আছে। বেরিলি সম্প্রদায়ের এই কবরস্থান। এখানে ফতেয়াদহ পালন করা হয়।

হাজীগাজী কবরস্থান : ইসলামপুর ব্লকের অন্তর্গত পাঠাগোরার ভূজাগাঁও-এ অবস্থিত এ জেলার অন্যতম প্রাচীন কবরস্থান। কথিত আছে এই অঞ্চলে একদা তান্ত্রিক বৌদ্ধদের কেন্দ্র ছিল। আবার দেশ থেকে পির হাজীগাজী এখানে এসে ইসলামধর্ম প্রচার করেন পিরের মাজারও আছে। মাজারের পাশেই হাজীগাজী কবরস্থান। তাছাড়াও এ অঞ্চলে ডাঙাপাড়া, আঙ্গগাছিয়া, ডিমটা ইত্যাদি বহু ছোট ছোট কবরস্থান আছে। এগুলি সবই সুন্নি বেরেলি মুসলিম সম্প্রদায়ের কবরস্থান। ইসলামপুর থানার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত মরাগতি কবরস্থান। ওই কবরস্থানের উপর নির্ভর ১নং, ২নং নন্দনগ্রাম এবং সিংনাথ গ্রামের মানুষজন। সম্প্রতি সীমান্ত অঞ্চলে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার ফলে কবরস্থান কাঁটাতারের ওপারে বাংলাদেশে পড়েছে। বি.এস.এফের পাহারার ফলে তিন গ্রামের মানুষদের মরাগতি কবরস্থান ব্যবহার করা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। এ নিয়ে এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন ক্ষুব্ধ।[১৭]

চৌধুরী পরিবারের কবরস্থান : ইসলামপুর শহরের মেলা মাঠে ফকির ফজল রব্বির মাজার শরিফ আছে। দুই কাঠা জমির উপর স্থাপিত এই মাজার শরিফকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর বিশাল উরস মেলা বসে। মাজার শরিফের পাশেই দশ কাঠা জমির উপর স্থানীয় জমিদার ইউসুফ

চৌধুরী পরিবারের পারিবারিক কবরস্থান আছে। এই কবরস্থানে প্রাক্তন জমিদার মৌলভী আবদুল আজিজ মহঃ ইউসুফ চৌধুরীও প্রাক্তন বিধায়ক মহঃ আফাক চৌধুরীর কবর আছে। ইসলামপুর বর্তমান বিধায়ক করিম চৌধুরী এই পরিবারের সন্তান। ইসলামপুর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরেই শ্রীকৃষ্ণপুর। শ্রীকৃষ্ণপুরে আছে ১২ বিঘা জমিতে স্থাপিত প্রায় পঞ্চাশ বছরের পুরনো শ্রীকৃষ্ণপুর কববস্থান। শ্রীকৃষ্ণপুর এবং ভাতকুণ্ডা অঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায় মূলত এই কবরস্থানে কবর দিত। কিন্তু বর্তমানে এখানে আর কবর দেওয়া হয় না। কবরস্থানের চারপাশ দিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ ঘরবাড়ি করায় মুসলিমরা তাদের কবরস্থান অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছে। বি.এল.আর.ও অফিসের দলিলে এই জায়গা কবরস্থান হিসেবে লেখা থাকলেও বর্তমান এ অঞ্চল মিলনপল্লি নামে পরিচিত।[১৮] দেশবিভাগজনিত কারণেই বহু কবরস্থান এখন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বর্তমান ইসলামপুর শহরের ঝলঝলিয়া পুকুরপাড়ে একদা মুসলিমদের মৃত শিশুদের সমাধি দেওয়া হত। বর্তমানে ওইখানে ক্ষুদিরাম কলোনি নামে বর্তমানে বিশাল বসতি এলাকা গড়ে উঠেছে।[১৯] ইসলামপুর থানার অন্তর্গত রামগঞ্জ দেড় শতাধিক বছরের প্রাচীন সুথানী কবরস্থান আছে। এই কবরস্থানে এলাকা বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী চাঁদ মহম্মদের কবর আছে। তিনি একসময় রামগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। কবরস্থানের জমির পরিমাণ প্রায় চারবিঘা। নিয়মিত যাওয়া হয়। মাটিকুণ্ডার বাধাগছে বহু পুরনো একটি কববস্থান আছে। এই কবরস্থান রেস্ট জমির উপর। খবরগাঁওতে তিন একর জমির উপর যওরাডাঙ্গি কবরস্থান। কবরস্থানের পাশেই পির সুফি আবদুল সালামের মাজার আছে। প্রতি অগ্রহায়ণ মাসের সাত তারিখে এখানে জলসা হয়। রাজস্থান, মহারাষ্ট্র বিহার থেকে বহু মৌলভী এই জলসায় যোগ দেন। ২নং গাইশাল পঞ্চায়েতের অধীনে ওই অঞ্চলের পূর্বেকার জমিদার হাজী ফিদ্দী হোসেনের দেওয়া ১৫ বিঘা জমিতে একটি প্রাচীন কবরস্থান আছে।

১নং এবং ২নং গোয়ালপোখরের কবরস্থান : ১নং গোয়ালপোখর ব্লকের ১নং সাহাপুর এবং গতি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যবর্তীস্থানে ৭/৮ একর জমির উপব দীর্ঘদিনের পুরনো ইস্তিরা নামে একটি কবরস্থান আছে। ইস্তিরা, কাজীপাড়া, আস্তল, পাঁচড়া, সাহাপুর প্রভৃতি গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায় ইস্তিরা গোরস্থানে মৃতদের কবর দিয়ে থাকে। ২নং গোয়ালপোখর ব্লকের অন্তর্গত সাহাপুর অঞ্চলে বহু পুরনো কবরস্থান লোহাগাছি। কবরস্থানের জমি দেন তৎকালীন স্থানীয় জমিদার জৈনুদ্দিন মির্জা। এখানে বোরান এবং দেবেন্দী উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের মৃতদের কবর দিয়ে থাকেন।[২০] গোয়ালপোখরের গোচীনগর কবরস্থান বহু পুরনো। প্রায় ৩০ একর জমির উপর এই কবরস্থান। জমি ভেস্ট হবার পূর্বে এই কবরস্থানের জমি দিন পূর্ণিয়ার জমিদার রাজা পি.সি. লালের। বর্তমানে এই কবরস্থানের জমি ভোট। দেবীগাও, চুনিহার, গোদীটল, বাড়াবাড়ি, ঝাড়বাড়ি, কাচনিসিড়ি প্রভৃতি গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায় গোচীনগর কবরস্থানে মৃতদের কবর

দিয়ে থাকে। ১নং সাহাপুর পঞ্চায়েত বড় পুকুর ডুবকুল কবরস্থান প্রায় ২৫ একর জমির উপর স্থাপিত। ডুবকুল, তাজপুর, ভেলডাবাড়ি, বনবাড়ি প্রভৃতি গ্রামে মুসলিম সম্প্রদায় এই গোরস্থানের মৃতদের কবর দিয়ে থাকে। বর্তমানে ১নং সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এই কবরস্থান প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। দেহবন্দী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলিম সম্প্রদায় এই কবরস্থান ব্যবহার করেন। পাঞ্জীপাড়ার ইব্রাহিমপুর কবরস্থান একটি অতি পুরনো কবরস্থান। কানকীর শিমুলিয়া মৌজায় ১০ বিঘা জমির উপর শিমুরিয়া বসৎপুর কবরস্থান। খাগড়ার নবাব সৈয়দ জৈনুদ্দিন হোসেন মির্জা এই কবরস্থানের জমি দান করেছিলেন। কালকী, মাটিয়ারী, কাঁকী, নয়ানগর প্রভৃতি গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায় এই গোরস্থানে মৃতদের কবর দিয়ে থাকে। নির্দিষ্ট দিনে প্রতি বছর এখানে সবেবরাত অনুষ্ঠান হয়।

করনদিঘি ব্লকের কবরস্থান : ১নং আলতাপুর পঞ্চায়েতেব খোয়ামপুর মৌজায খোয়ামপুর গোরস্থান। প্রায় দশ একর জমিব উপর এই কবরস্থান। হানাফী এবং সাফাবী এই দুই সম্প্রদায়ের মুসলিমরা এই গোরস্থানে তাদের মৃতদের কবর দিয়ে থাকে। বছর দুই তিনেক পূর্বে এই কবরস্থান নিয়ে হানাফি এবং আহালে হাদিম গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। প্রশাসনিক উদ্যোগে বর্তমানে এই বিরোধ মেটানো সম্ভব হয়েছে। এই অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নফর আলী হাজী প্রধানের কবর আছে খোয়ামপুর কবরস্থানে।[১১]

জুঝারপুর আনসারী কবরস্থান : টুঙ্গিদিঘির জুঝারপুব মৌজায় আনসারী মুসলিম সম্প্রদায়েব জুঝারপুর আনসারী কবরস্থান। প্রায় ১৩০ বছরের পুরনো এই কবরস্থানের একসময জমির পরিমাণ ছিল দশ একর। বর্তমানে কবরস্থানের জমি খানিকটা অংশ জবরদখল হয়ে গিয়েছে। সাঁওতাল পরগনা থেকে আনসারী সম্প্রদায়ভুক্ত এই মুসলিমগণ এখানে আসেন একসময় এরা সাঁওতালি ভাষায় কথা বলতেন কিন্তু বর্তমানে নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা ধরে রাখার জন্য স্থানীয় ভাষা সূর্যাপুরী ভাষাতে কথা বলেন। আনসারী মুসলিমদের এই কবরস্থানে এই অঞ্চলের গোস্বামী এবং দাস উপাধিধারী বৈরাগী সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের মৃতদের সমাধি দিতেন। বর্তমানে এই সম্প্রদায় পান এবং ফলের ব্যবসা করেন। কবরস্থানের পাশেই আবুল কাদেল জিনালী পিরের মাজার আছে। হজরত মহম্মদ এবং এই পিরের জন্মদিন একই দিনে বলে হজরত মহম্মদের জন্মদিনে এখানে উরস মেলা হয়। এই পির ইরাক থেকে এসেছিলেন।[১২] ডালখোলা মৌজায় বেরিলি মুসলিম সম্প্রদায়ের কবরস্থানের নাম ফরসরা কবরস্থান। ডালখোলা পঞ্চায়েত থেকে চার লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই কবরস্থান প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ডালখোলাব শিলংগা মৌজায় ৬.৩ একর জমির উপর একটি বহু পুরাতন কবরস্থান আছে।[১৩] রসাখাওয়ার প্রাণনগর কবরস্থান প্রায় সাত একর জমির উপর স্থাপিত। এই কবরস্থান সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের পূর্বতন জমিদার জৈনুদ্দিন কবরস্থানের জমি দান করেছিলেন। প্রাণনগর খোস্তা, রসাখাওয়া, নাজিরপুর

প্রভৃতি গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায় এই কবরস্থানে মৃতদেহ কবর দিয়ে থাকেন।[২৪] ২৪ করণদিঘির বাজিতপুর কবরস্থান একটি অত্যন্ত পুরনো কবরস্থান। প্রয়াত জমিদার গিয়াসউদ্দিন সরকার এই কবরস্থানের জন্য তিন একর জমি দিয়েছিলেন।

ভাগদুয়ারিন দুয়ারিন, গরুলভাষা মৌজার কবরস্থান : করণদিঘির এই তিন মৌজা মিলিয়ে ৫.৬ শতক জমিতে কবরস্থান। ১.৭৭ শতক জমিতে খেলার মাঠ এবং ৯.৯৩ শতক জমিতে কারবালা মাঠ। প্রয়াত জমিদার রাজা পি.সি লালচৌধুরী এবং ভুটুকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর ওই জমি ছিল। পববর্তীকালে ওই জমি ভেট হয় এবং আর. এম. খতিয়ানের সময় ৫.৬ শতক জমিকে কবরস্থান ১.৭৭ শতক জমিকে খেলার মাঠ হিসেবে দেখানো হয় এবং বাকি জমি ভেট হয় এবং ভূমিহীনদের মধ্যে পাট্টা বিলি করা হয়। পরবর্তীকালে করণদিঘির বি. এল. আর.ও অফিস পাট্টা বাতিল করা ওই ৯.৯৩ শতক জমিকে কারবালা মাঠ হিসেবে দেখায়। ভূমি সংস্কার দপ্তরেব এই ভুল সিদ্ধান্তের ফলে ওই কবরস্থান নিয়ে নব্বই-এর দশক থেকেই করণদিঘিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দেখা দিতে থাকে। ২৬/৯/২০০০ সালে জেলা প্রশাসন ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কবরস্থান ঘিরে দেয় এবং কারবালা মাঠ থেকে৭০ ফুট জমি নিয়ে ওই এলাকায় চলাচলের জন্য রাস্তা নির্মাণ করে দিলে বিরোধের অবসান হয়।[২৫] করণদিঘি বি.এল.আর.ও-ব এবকম জাতের ভুল সিদ্ধান্তের বহু উদাহরণ আছে। আশির দশকে করণদিঘি শ্মশানের জমিতে পাট্টা বিলি করা এলাকায় উত্তেজনায় সবার কবর ছিল।

রায়গঞ্জ ব্লকের কবরস্থান : রায়গঞ্জ শহর থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে সাড়ে সাত বিঘার উপর জমিতে বামনগ্রাম কবরস্থান। কবরস্থানের জমি দান করেছিলে নহরিপুরের জমিদার পরেশচন্দ্র মল্লিক। স্থানীয় লোকের কাছে জানা যায় যে জমিদারের হয়ে এই এলাকা থেকে রাজস্ব আদায় করতেন নবাব খাঁ। কবরস্থানটি সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের। এই কবরস্থানে হাজী আফতাবউদ্দিন সরকার, মৌলানা আসরফ আলী, হাজী সারাফউদ্দিন, ময়নউদ্দিন সরকার প্রমুখ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কবর আছে। রায়গঞ্জে ব্লকের বাঙাল বাড়িতে শতাধিক বছরের পুরানো ইসলামপুর ডাল্টিন কবরস্থান। কবরস্থানটি ভেস্ট জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই কবরস্থানে ৩৫বিঘা জমি আছে। সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত এই কবরস্থানে বিশিষ্ট নামী ব্যক্তি প্রযাত ছৈয়ত হাজী সরকারের কবর আছে। রায়গঞ্জ শহর থেকে পূর্বমুখে সাত কিলোমিটার গেলেই বালিয়াদিঘি কবরস্থান। কবরস্থানটি নুরপুর মৌজায়। বালিয়াদিঘি কবর পাঁচ বিঘা ভেস্ট জমির স্থাপিত এবং সুন্নি সম্প্রদায়ের মুসলিমরা এই কবরস্থান ব্যবহার করে থাকেন। এই কবরস্থানে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রয়াত হাজী জনিল মহম্মদের কবর আছে।[২৬]

ইটাহার ও কালিয়াগঞ্জ ব্লকের কবরস্থান : উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটহার ব্লকেও মুসলিম সমাজের বহু পুবনো কবরস্থান আছে। এই সমস্ত কবরস্থানগুলির মধ্যে গোরাহার কবরস্থানটিকে

ইটাহারার মুসলিম সমাজ অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে। এই কবরস্থানটি তিরিশ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এই কবরস্থানটি নাগরকুনিক ১নং মহানন্দা নদীর মিলন স্থলের কাছে অবস্থিত হওয়ায় গোরাহার কবরস্থানের বহু জমি নদীতে চলে যাচ্ছে। অবিলম্বে বাঁধ দিয়ে কবরস্থানটিকে সংরক্ষণ করা দরকার। হেমতীবাদ ব্লকের বিষ্ণুপুর বাসস্ট্যান্ডের নিকট পঞ্চাশ বিঘা জমির উপর বুড়া পিরের মাজার এবং তার পাশেই মুসলিম সমাজের বহু প্রাচীন কবরস্থান আছে। এই জমি ওয়াকফ স্টেটের অধীন। মহরমের তৃতীয় দিনে এখানে বিশাল মেলা বসে। বিষ্ণুপুরেই মালনে পঞ্চাশ একর ভেস্ট জমির উপর বিশাল কবরস্থান আছে। এই কবরস্থানে ওই অঞ্চলের জমিদার মোতন মহম্মদ চৌধুরী এবং বিলাই মহম্মদ চৌধুরীর কবর আছে। গোরস্থানের পাশেই পাঁচ পিরের মাজার আছে, সমাজপুরের সুরঙ্গপুর মৌজায় নারাদিঘির দক্ষিণ পাড়ে মামাভাগ্নে পিরের মাজার আছে। দিঘির পশ্চিম এবং উত্তর পাড়ে কবরস্থান। এই কবরস্থান আল হাদিম মুসলিম সম্প্রদায়ের। নারাদিঘির পূর্ব পাড়েই আছে হিন্দুদের শ্মশান।[২৭] কালিয়াগঞ্জ ব্লকেরও মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রচুর গোরস্থান আছে। কালিয়াগঞ্জ শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে পিরপুকুরের পাড়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধার কবর আছে। এই কবরগুলি সংরক্ষণ এবং শহীদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের জন্য সি.পি.এম পার্টি সূত্রে জানা যায় যে বাংলাদেশ সরকারের সাথে বহুবার যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি।[২৮]

উপসংহারের বদলে : উপরে আলোচিত গোরস্থানগুলি ছাড়াও ১নং গোয়ালপোখর ব্লকের বাগড়ার নবাব প্রদত্ত জমিতে লোহাগাছি কবরস্থান এবং হপ্তিয়াগছে পীর সৈয়দ শা সাবুদ আহমদের মাজার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও জেলা জুড়ে ছড়িয়ে অসংখ্য ছোট বড় কবরস্থান নরাবাড়ি, ঝাড়বাড়ি, মালকাডাঙ্গা, হপ্তিয়াগাছা, কাঠগাঁ. মোড়ামারা, পোখরিয়া হাড়িভাঙা, সিংনাব, উত্তর মাইকুণ্ডা কবরস্থান— এরকম অসংখ্য কবরস্থান সমগ্র জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কবরস্থানগুলি জেলার মুসলিম সমাজের কাছে একদিকে যেমন গোরস্থান তেমনি অপরদিকে তাদের ধর্মীয় স্থানও বটে। কারণ কবরস্থানেই তারা সবেবরাত, ফতোয়দহ প্রমুখ ধর্মীয় উৎসব পালন করে থাকে। তাহলেও কবরস্থানের জমি জায়গা নিয়ে কখনও কখনও মুসলিম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। আবার কখনও অমুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এ ব্যাপারে কবরস্থানগুলির সীমানা, আয়তন সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। জেলার অধিকাংশ কবরস্থানগুলি ভেস্ট জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বহু কবরস্থানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমিও আছে। ফলে জেলার উন্নয়নমূলক কাজে যেমন রাস্তা নির্মাণ, তিস্তার ক্যানেল নির্মাণ প্রভৃতি কাজে প্রায়শ মুসলিম সমাজের সাথে প্রশাসনের বিরোধ দেখা দেয়। যেমন গুঞ্জরিয়া কববস্থানের জন্য দীর্ঘদিন ধরে ওই অঞ্চলে তিস্তা ক্যানেলের

কাজ বন্ধ ছিল। পরে প্রশাসন অন্যত্র জমি দিয়ে নতুন করে কবরস্থান নির্মাণ করে সমস্যার সমাধান করে। কবরস্থানের অতিরিক্ত জমিতে ভূমিহীনদের পাট্টা দেওয়া নিয়েও প্রায়শই বিরোধ দেখা দেয়। এ ব্যাপারে প্রশাসন এবং মুসলিম সমাজ উভয়কেই পরিচ্ছন্ন এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু বাবরি মসজিদ ভাঙা রামমন্দির নির্মাণের দাবি গুজরাতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং রাষ্ট্রশক্তি কর্তৃক কাশ্মীরে সাধারণ মুসলিমদের উপর অত্যাচার সার্বিকভাবে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের প্রতি মুসলিম সমাজের সঙ্গে হেয় উদ্রেক করাচ্ছে। সমস্যাটা এখানেই জটিলতা ধারণ করেছে। তবে রাজনীতির কারবারিরা ভোটের স্বার্থে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে ব্যবহার করলেও এ জেলার গ্রামীণ অঞ্চলে হিন্দু মুসলমান সুসম্পর্ক যে বিদ্যমান তার প্রমাণ জেলার বহু কবরস্থানের পাশেই হিন্দুদের শ্মশানের অস্তিত্ব।

তথ্যসূত্র :

১. উত্তর দিনাজপুর জেলার ইতিহাস, জীবেশ দাস, কলিকাতা, পৃ.-১১১
২. Key Statistics, West Dinajpur, 1987
৩. West Dinajpur District Gazetteers, জে. সেন পৃ.- ৩২
৪. ঐ পৃ.-৪
৫. The Rise of Islam and the Bengal Frontiers (1204 - 1760), Richard M. Eaton, কলি, ১৯৯৭, পৃ.-২৭৩
৬. ঐ পৃ.-১২৩
৭. Census of India 1901, vol VI, p. 156
৮. জীবেশ দাস, পূর্বোক্ত, পৃ.-১২৪
৮. ক। Statistical Account of Bengal, vol- VII W.W. Hunter, London, 1876, পৃ.-৩৭৩
৯. ঐ পৃ.-৩৭৩
১০. মধুপর্নী, পশ্চিম দিনাজপুব জেলা সংখ্যা, ১৩৯৯। বালুরঘাট, সম্পাদনা অজিতেশ ভট্টাচার্য, পৃ. ৮৮-৯৩।
১১. Purnea District Gazetheers, P.C. Roy Choudhury, Patra, P.-149
১২. Karnoketan Sen, 'Notes on Rural Customs of Dinajpur district, journal of Asiatic Society of Bengal (1937) No 38.
১৩. সম্প্রীতির নিদর্শন হুসেন দিঘি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ২৫.৪.২০০২।
১৪. লক্ষ্মীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক পাশারুল আলমের নিকট সংগৃহীত তথ্য।
১৫. লক্ষ্মীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক পাশারুল আলমের নিকট সংগৃহীত তথ্য।
১৬. Richard M. Eaton, পূর্বোক্ত, পৃ - ২৮৩।

১৭. সূর্যপুর বার্তা ১ম সংখ্যা, ২০০২, পার্থ সেন, উতথ্য বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর।
১৮. শ্রীকৃষ্ণপুরের বাসিন্দা ইসলামপুর মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র মিঠুন দত্তের নিকট সংগৃহীত তথ্য।
১৯. স্মারকগ্রন্থ, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালিমন্দির, ইসলামপুর।
২০. ১নং গোয়ালপোখর ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি নিজামুদ্দিন এর কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য।
২১. উত্তর দিনাজপুর জেলার সি.পি.আই দলের জেলা সম্পাদক সমর ভৌমিকের সহায়তায় সংগৃহীত তথ্য।
২২. উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহঃ জালালউদ্দিনের নিকট সংগৃহীত তথ্য।
২৩. উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সদস্য নাদিরা বেগমের নিকট সংগৃহীত তথ্য।
২৪. করণদিঘি পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক ক্ষিতু মুর্মুর নিকট সংগৃহীত তথ্য।
২৫. 'প্রশাসনিক ভুল সিদ্ধান্তই করনদিঘীর সাম্প্রতিক উত্তেজনার কারণ' পার্থ সেন, সূর্যপুর বার্তা, ১ ডিসেম্বর, ২০০০।
২৬. রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সুজিত ঘোষের নিকট সংগৃহীত তথ্য।
২৭. ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত তথ্য।
২৮. উত্তর দিনাজপুর জেলা সি.পি.এম দলের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দিলীপ দাসের নিকট সংগৃহীত তথ্য।

মৃত্যু প্রসঙ্গে

এপ্রিল ১৯৪০ দুপুর

কত রকম মৃত্যুই আছে সংসারে; আমি এক এক সময় বসে বসে ভাবি। এই একটা বিলাতি কাগজে খানিক আগে পড়ছিলুম অতি সহজ মৃত্যু হচ্ছে গরম জলের টবে বসে হাতের নাড়ীটা কেটে দাও—-আসতে আস্তে সব রক্ত বেরিয়ে গিয়ে শরীরটা ক্রমশ ঝিমিয়ে আসবে- ব্যাস। দেখ্ দেখিনি কত সহজ মৃত্যু। অথচ মানুষ মৃত্যুকে কত বীভৎস করে তোলে। জলে ডোবা মৃত্যুও সহজ, কেন যে লোকে ভয় পায় ভীষণ ভেবে। কথা হচ্ছে সেই যে একটা অতল অন্ধকার সেইটাকেই ভীষণ ভেবে ভয় পায়। নয়তো দম আটকে আর কয় মিনিট ছট্‌ফট্ করতে হয়, সে কিছুই নয়। ওটুকু মৃত্যু যন্ত্রণা যে রকম করেই মরোনা কেন, সইতে হবেই।

—— আলাপচারি, রবীন্দ্রনাথ / শ্রী রানী চন্দ

❑ লেখক পরিচিতি—-রীডার, ইতিহাস বিভাগ, প্রাবন্ধিক, গবেষক।

শান্তিপুরের শ্মশান ও গোরস্থান পরিক্রমা

অশোককুমার দত্ত

শ্রাবণ মাসের বিকেল। রোজকার বৈকালিক ভ্রমণের তাগিদে আমরা ক'জন সতীর্থ হাজির শ্মশানঘাটে—যার প্রকৃত নাম শান্তিপুর পৌর মহাশ্মশান। অন্তত সাইনবোর্ডে ওই নামটি পড়ন্ত সূর্যের আলোক জ্বলজ্বল করছিল। কথার মালা গেঁথে গেঁথে সময় অতিবাহিত করাই ছিল এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য। কথা একসময় ফুরিয়ে যায়—সত্যি কথা কিন্তু শেষ হয়েও শেষ হয় না, অথচ শেষ করতেই হয়। সব কিছুর তো শেষ আছে। উঠব উঠব করছি। এমন সময় 'বল হরি, হরিবোল' ধ্বনিতে সচকিত হয়ে উঠলাম। পুনরায় স্বস্থানে উপবেশন। শ্মশানে এলাম অথচ শবদাহ দেখলাম না। কেমন যেন বেসুরো লাগছিল। সেইখানে বসেই উদগ্রীব হয়ে শবযাত্রীদের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলাম। শবদেহ বাঁশের মাচা থেকে নামানো হল। পুরনো কাপড় ফেলে নতুন একটা কাপড়ের ফালি পরানো হল। মনে পড়ল গীতার বাণী : বাসাংসি জীর্ণানি যথাবিহায় ... বস্ত্র পরিবর্তনের পর ঘি মাখিয়ে মরদেহ গঙ্গা জলে স্নান করানো হল। ততক্ষণে চিতা সম্পূর্ণ। মরদেহ চিতায় শোয়ানো হল। সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি উঠল : বল হরি, হরিবোল। একটি অল্পবয়সি ছেলে। বোধহয় মৃতের সন্তান, একগুচ্ছ পাটকাঠি আগুন লাগিয়ে মৃতের মুখ স্পর্শ করাল। একেই বলে মুখাগ্নি করা। এইটুকুর জন্যই নাকি পুত্রসন্তানের প্রয়োজন—যা না হলে মৃত ব্যক্তির স্থান হয় 'পুত' নামক নরকে। শাস্ত্রে এরকম কথাই বলা হয়েছে। সন্তান তাই পুত্র। এমন সময় শুরু শ্রাবণের বর্ষণ। অনাচ্ছাদিত শ্মশানভূমির সবাই তখন বিশ্রামাগারে আশ্রয় নিতে ব্যস্ত। আমিও বন্ধু সমভিব্যাহারে সেখানেই আশ্রয় নিলাম। বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস বইতে লাগল। মোটামুটি একটা ছোটখাট ঝড়ের চেহারা। ঘরেব মধ্যে জন-তিরিশেক লোক। খোসগল্পে মেতে উঠল তারা। মড়া পোড়াতে এসে এইরকম পরিস্থিতিতে ভূতের গল্প হবে না তা কি কখনও হয়? গল্পের ফাঁকে কখন যে 'তেনারা' ঢুকে পড়েছেন—বোঝাই যায়নি। 'তেনাদের' কথা শুরু হতেই সকলে ঘন হয়ে জমাট বেঁধে বসল। বাইরে ছিপ-ছিপ বৃষ্টি। ভেতরে জমাট অন্ধকার।

কী রে ভয় পাচ্ছিস? কথকের প্রশ্ন।

ভয়, কীসের ভয়? কাঁপা গলায় সাহস এনে জনৈক শ্রোতার জবাব শোনা গেল— জানিস, ভূত আমার পুত পেত্নী আমার ঝি/ রামলক্ষ্মণ বুকে আছে ভূতে করবে কী-বলেই আরও একটু ঘন হবার চেষ্টা। ততোধিক সাহস দেখিয়ে আরও একজন শ্রোতার মন্তব্য ভূতে পশ্যন্তি বর্বরাঃ।

ঠিক সেই সময় ঘটনাটা ঘটল। শ্লোকটি শেষ হতে না হতেই বিশ্রামাগারের টিনের দরজা সশব্দে খুলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে একঝলক বাতাসের সঙ্গে হুড়মুড় করে কারা যেন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আচমকা আক্রমণে সবাই তখন দিশেহারা। ঘরের মধ্যে তখন হুলস্থূল কাণ্ড, যেন দক্ষযজ্ঞ। এ ওর গায়ে পড়ে জড়াজড়ি, হুটোপুটি। তারই মধ্যে শোনা গেল কে একজন

বলছে —

তেনাদের প্রতি অবিশ্বাস দেখানোর জন্যই এই অবস্থা। ধাক্কাধাক্কিতে ২/৪ জন বাইরে ছিটকে বেরিয়ে এল। আমিও এলাম। বাইরে তখনও বৃষ্টি পড়ছে। চিতা আর বহ্নিমান নয়। হ্যাজাকটিও কখন নিভে গেছে। শ্মশানের অন্ধকার তখন ভয়াবহ বলে মনে হল। এমন সময় একটি লোককে চিতাঘর থেকে ছুটে আসতে দেখে তার কাছে ব্যাপারটা কী জানতে চাইলাম। ভয়মিশ্রিত কণ্ঠে তার জবাব :

এখানে আর নয়। চল, ফিরে চল। তেনারা সব জেগে উঠেছেন। রেগে গেছেন।

ব্যাপার কিছুই হৃদয়ঙ্গম হল না। তাকে ধরে বারান্দায় নিয়ে এলাম। ঘরের মধ্যে তখন শান্তি বিরাজ করছে। পরস্পরের গলার স্বর শুনে সবাই বুঝতে পারল—তেনারা নয়, ঘরে ঢুকেছে তাদের সঙ্গে আসা শ্মশানযাত্রী। অন্ধকারের মধ্যে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, কিছু বোঝেনি তারা। এতক্ষণে পাকড়াও করা মানুষটি মুখ খুলল। সে যা বলল তার সারকথা এই রকম : শবটি কাছাকাছি কোনো গ্রাম থেকে আনা হয়েছে। যথা রীতি কার্য সম্পাদনের পর সেটিকে চিতায় তোলা হলে শবের বড় ছেলে মুখাগ্নি করে স্থান ত্যাগ করে। চিতা ঠিকঠাক জ্বলতে থাকে। চিতা ভালোভাবে জ্বলছে বলে সবাই ভাবল ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে শবদাহ সম্পন্ন হবে। তারা মাঝে মাঝে চিতার চেলাকাঠ ঠিক করে দিচ্ছিল। এমনসময় আবার বৃষ্টি আরম্ভ হয়—বাতাসও বইতে থাকে। হ্যাজাকটিও এসময় নিভে যায়। যে ব্যক্তি চিতায় চেলাকাঠ উসকে দিচ্ছিল সে হঠাৎ চিতার অস্পষ্ট আলোকে দেখতে পায় চিতার মড়াটি যেন নড়ছে। মোড়ানো পা দু'টি যেন সোজা করে উঠে আসতে চেষ্টা করছে। সেই না দেখে ভয়ে চিতাস্থল ফেলে দৌড়তে থাকে সে। তাকে ছুটতে দেখে সঙ্গীরা সবাই একযোগে দৌড়ে বিশ্রামঘরে ঢুকে পড়ে।

এই ঘটনার ক'দিন পরেই সেই চিঠিটা পাওয়া গেল। তাতে সোনারপুর থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় স্বদেশচর্চার মুখপত্র 'লোক'-এর সম্পাদক প্রণব সরকার বার্ষিক বিশেষ সংখ্যা 'বাংলার শ্মশান ও গোরস্থান'-এর জন্য লেখা চেয়েছেন। এই বিষয় নিয়ে লিখতে গেলে মৃত্যুর কথা প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে পড়ে। মনে পড়ে ছেলেবেলায় পড়া একটি কবিতা : "জন্মিলে মরিতে হবে/অমর কে কোথা কবে।" চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে?"—জন্ম ও মৃত্যু জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। প্রকৃতির নিয়মে মানুষকে 'বরণ করতে হয় চিরসুন্দর মরণের মহালগ্ন'। মৃত্যু আমাদের কাছে যতই বেদনার হোক, শোকের হোক, বিচ্ছেদের হোক—তার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করতে হয়। কবিগুরুর ভাষায় : "যদি মৃত্যু না থাকিত জগতের যেখানকার যাহা তাহা যদি চিরকাল অবিকৃতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, তবে জগৎ একটা চিরন্তন সমাধি মন্দিরের মত অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত বদ্ধ হইয়া থাকিত।" সুতবাং মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

শবের কথা যখন উঠল তখন শবদেহ সংকারের প্রসঙ্গও এসে যায়। এই রকম একটি

চাক্ষুষ ঘটনার বিবরণ দিয়েই এ লেখার সূচনা। অবশ্য শেষটা বলা হয়নি। কারণটা সবার জানা। মৃতদেহ পোড়ানোর সময় আগুনের সংস্পর্শে মেদ-মজ্জা-মাংস গলে গিয়ে স্নায়ুগ্রন্থিগুলো শিথিল হয়ে পড়ে। তখনই শেষ হাত-পা ছুঁড়তে থাকে। ঠিক তখনই অভিজ্ঞ শবযাত্রী বাঁশের দণ্ড দিয়ে আঘাত করে থাকে। অজ্ঞতাবশত এই শবযাত্রীরা তা করেনি বলেই এই বিভ্রাট।

মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে নৃতত্ত্ববিদদের শরণাপন্ন হলাম। সেখান থেকে জানা যায়, মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা প্রচলিত হয় দেড় থেকে দু-লক্ষ বছর আগে মধ্য পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতি যুগে, যখন নিয়ানডারথাল মানবগোষ্ঠী পৃথিবীতে বিচরণ করত। এই গোষ্ঠীর মানুষের প্রথম কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে। প্রাপ্ত জীবাশ্ম থেকে অনুমিত হয় যে, মৃতদেহগুলি একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় কবর দেওয়া হয়েছিল। এর আগে এ ধরনের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। নৃতত্ত্ববিদদের ধারণা তাই। নিয়ানডারথাল গোষ্ঠীর মানুষদের এই আচরণ থেকে অনুমান করা হয় যে সে যুগের মানুষেরা দেহাতীত অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছু না কিছু ধারণা পোষণ করত। তাদের জীবনে যে ইন্দ্রজাল বা ধর্মীয় চেতনা সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হচ্ছিল, তা বোঝা যায়।

উপযুক্ত আলোচনার সমর্থনে নৃতত্ত্ববিদদের আরও কিছু মতামত উপস্থাপন করা যায়। তাঁদের অভিমত, পরবর্তীকালে অন্ত-পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতি যুগেও যে-সব মানব জীবাশ্ম পাওয়া গেছে তার সবগুলি কবর থেকে সংগৃহীত। এ থেকে একথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, সে যুগেও কবরের মাধ্যমে মৃতদেহেব সৎকার প্রচলিত রীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, মৃতদেহের সঙ্গে ব্যবহারোপযোগী নানা দ্রব্য তারা কবরে সাজিয়ে দিত এবং মেটে সিঁদুর রঙে মৃতদেহ রাঙিয়ে দিত। এই প্রবণতা থেকে এই ধারণা হয় যে, মরণোত্তর কোনো জীবন বা অতিপ্রাকৃত সম্বন্ধে কোনো-না কোনো প্রতীতি তাদের ছিল।

আজ থেকে ৩০/৪০ হাজার আগে ক্রোম্যাগনন গোষ্ঠীর মানুষেরাও মৃতদেহ কবর দিত। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে পেরিগুয়ে থেকে অ্যাজেন পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের সময় শ্রমিকেরা যে ৫টি নরকঙ্কাল উদ্ধার করে সেগুলিকেও কবর দেওয়া হয়েছিল বলে পণ্ডিতদের অনুমান। পরবর্তীকালে সমাজ-চেতনা বৃদ্ধির সাথে সাথে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বোধবুদ্ধির পরিবর্তনের ফলে শবদেহ সৎকারের নানা পন্থা গৃহীত হয়।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শান্তিপুরের শ্মশান ও গোরস্থানগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যায়।

নদিয়ার শান্তিপুর বাংলার অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত জনপদ। "অতি প্রাচীনকাল থেকে শান্তিপুরের গঙ্গাতীরবর্তী স্থানগুলিতে সতীদাহের চিতা জ্বলত। Judicial Department Proceedings, criminal-এর 1824-1829 পর্যন্ত সংখ্যাগুলিতে শান্তিপুরের অসংখ্য সতীদাহের

ঘটনার উল্লেখ আছে। (দ্রষ্টব্য : শান্তিপুর পরিচয়—কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য) উক্ত গ্রন্থে উল্লেখিত সতীদাহের তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শুধু ব্রাহ্মণ নয়, অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায় যথা, কায়স্থ, বণিক, তাঁতি, তেলি, তিলি, নাপিত, শুঁড়ি এমনকী বাউড়ি সম্প্রদায়ের সতীরাও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। সতীদের বয়স ১৮-৮০ বছর। একজন ব্যক্তির ৩/৪জন স্ত্রীর সহমরণের কথা জানা যায়। এমনকী শান্তিপুরের নিকটবর্তী উলাগ্রামের (বীরনগর) মুক্তারামবাবু নামক জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণের ১৩ জন পত্নী শান্তিপুরের গঙ্গার ঘাটে স্বামীর চিতানলে সহমৃতা হন। (শান্তিপুর পরিচয়—কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য) তখন দু'ভাবে সহমরণ প্রথা কার্যকর ছিল। উচ্চবর্ণের ক্ষেত্রে স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে একসঙ্গে দাহ করা হত। নিম্নবর্ণের ক্ষেত্রে মৃত স্বামীর সঙ্গে জীবিত স্ত্রীকেও মাটির নীচে প্রোথিত করা হত। আর অন্যটি বিদেশে স্বামীর মৃত্যু হলে তাব স্মৃতিচিহ্ন-সহ পত্নীকে চিতার আগুনে পুড়িয়ে মারা হত। এরই নাম সতীদাহ!

সেদিন সকালে আমাব নব পরিণীতা পুত্রবধূ শুক্লা, এবার উচ্চমাধ্যমিকে বসবে, গুনগুন করে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তেব 'সহমরণ' কবিতাটি পড়ছিল। হঠাৎ সচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে সেটি শুনলাম। আমি বলায় সে আবার কবিতাটি আবৃত্তি করল। আমি কয়েকটি ছত্র টুকে নিলাম : খয়ের রাশি ছড়িয়ে পথে/ চলল নিয়ে শবের সাথে/ যেথায় শ্মশান ঘাট,/ গুঁড়িয়ে শাঁখা সবাই মিলে/চিতায় মোরে বসিয়ে দিলে/বাজল শতেক শাঁখ।

লোকের ভিড়ে ভরেছে ঘাট/ধোঁয়ায় চিতাব আধভিজে কাঠ,/উঠল গর্জে ঢাক।

মৃত স্বামীর চিতায় সহমরণেব জন্য তার অনিচ্ছুক স্ত্রীকে জোর করে সতী বানানোর এক মর্মান্তিক করুণ চিত্র! বাজা বামমোহন রায় এই সব করুণ হৃদয়বিদারক পৈশাচিক দৃশ্য নিজচোখে দেখার পর সতীদাহ নামক কুপ্রথার আশু নিবারণেব জন্য তৎপব হয়ে ওঠেন। অনেক বাধা বিপত্তি, সমাজপতিদের রক্তচক্ষু সব কিছু অগ্রাহ্য করে সতীদাহ প্রথা বিলোপ আন্দোলন সংহত করেন। অবশেষে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে সতীদাহ প্রথা বিলোপ আইন পাশ হয়। আইন পাশ হয়েছে বলে সতীদাহ হঠাৎ করে একদিনে বন্ধ হয়েছে তা ভাবনার কোনো কারণ নেই। কিছুদিন আগেও রাজস্থানে, গুজরাটে নতুন করে 'সতী' হওয়ার ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ৭০/৮০ বছর আগেও শান্তিপুরের গঙ্গার ঘাটে সতীদাহেব ঘটনা লুকিয়ে-চুরিয়ে ঘটেছিল বলে শোনা যায়। পুলিশের ভয়ে কেউ মুখ খুলতে চায়নি বলে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না।

এ-পর্যন্ত যা লেখা হয়েছে তার সবই হয় কোনো পুবনো বই-এর পাতা থেকে টুকে নেওয়া, নতুবা কোনো প্রবীণ মানুষের মুখ থেকে ধার করা কথার ফুলঝুরি। অবশ্য পুরনো তত্ত্ব বা তথ্য জানতে "নান্যপন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।" এবার হাল আমলের প্রতিবেদন তুলে ধরার জন্য প্রথমে যাঁব দিকে নজর পড়ল—তিনি হলেন শ্রীঅজয় দে শান্তিপুর পুরসভার চেয়ারম্যান এবং বিধায়ক—একের মধ্যে দুই—Two in one আর কী! যাক, আমার প্রস্তাব শুনে সঙ্গে সঙ্গে

সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিককে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। একদিন পর পুরসভার মুখ্য বাস্তুকার শ্রীসোমনাথ কুণ্ডুর সাথে দেখা করলে তিনি হাসিমুখে সব তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ফাইলপত্র ঘেঁটে তিনি বললেন——১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে শান্তিপুর শ্মশানে পাকাঘর, আচ্ছাদিত চুল্লিঘর। কালীমন্দির স্থাপন করেন তখনকার পুরপতি অসমঞ্জ দে। তিনিও বিধায়ক ছিলেন। বর্তমান পুরপতি ও বিধায়ক অজয় চন্দ্র তাঁরই সুযোগ্য ভাই। অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে, অনেক মাইক বাজিয়ে, অনেক লোক জড়ো করে অনেক জাঁকজমকের সাথে এই শ্মশান তথা শান্তিপুর পৌর মহাশ্মশানের দ্বাব উদঘাটন করা হল। শুরু হল নির্দিষ্ট স্থানে আচ্ছাদনের তলায় মৃতব্যক্তির দাহকার্য। এটি প্রথম মহাশ্মশান হলেও শুরুরও শুরু আছে। এর আগে মৃতদেহগুলিব কী গতি হত জানতে ইচ্ছে করে। একজন প্রবীণ ব্যক্তির সান্নিধ্য পেয়ে গেলাম—তিনি সুবলচন্দ্র মৈত্র। শান্তিপুরের জ্ঞানী-গুণী এবং বিশেষজ্ঞ হিসাবে সর্বজন মান্য। শান্তিপুর তথা নদীয়ার উৎসাহী সারস্বত সাধকেবা নানা তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁর শরণাপন্ন হতেন। আমিও যে তাঁর শরণ নেব সেটাই তো স্বাভাবিক। দুঃখের কথা তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু সেদিন তাঁর সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল আজ তাই স্মরণ করতে গিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য প্রণাম নিবেদন করি। তিনি জানিয়েছিলেন মহাশ্মশান তো এদিনের; শান্তিপুর হাজার বছরের। তবে এতকাল ধরে মড়াগুলোর কী হত? —এই প্রশ্নটা তো আমাবও।

১৯৭৪ সালে অসমঞ্জ দে যে মহাশ্মশান তৈরি করেছিলেন ১৯৮৪ সালে আকস্মিক অকালপ্রয়াণের পর তাঁর মৃতদেহ সৎকারের জন্য এখানে আনা হয়েছিল। নিজের চিতা নিজেই সাজিয়ে রেখেছিলেন আর কী! এমনটা কিন্তু হয়নি নবীন সেনের ক্ষেত্রে। আমি রৈবতক-পলাশীযুদ্ধের কবি নবীনচন্দ্র সেনের কথা বলছি। তিনি তখন রাণাঘাট মহকুমা শাসক এবং সেই সুবাদে শান্তিপুর পুরসভা চেয়ারম্যান। তিনিও শান্তিপুরের গঙ্গার ঘাটে শবদাহের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এবং প্রয়োজনীয় রাস্তাটি ও খাল সংস্কার করে দিয়েছেন—যা আজ নবীন জাঙ্গাল নামে পরিচিত। তাঁর মৃত্যু অবশ্য এখানে হয়নি। তার আগেই তিনি এখান থেকে বদলি হন। তখন শান্তিপুরের লোককবিরা একটা ছড়া বেঁধেছিলেন। সেটি উল্লেখের লোভ সামলাতে পারলাম না। তার অংশ বিশেষ :

কোথা যাও হে চাটগেঁয়ে বাঙাল
এত সাধের বার্নিংঘাট রচিলে হেথায়
খেদের বিষয় মৃত্যু তব হল নাকো তায়—

. সম্ভবত নবীন সেনের কাজকর্মে শান্তিপুরের কিছু মানুষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তারই প্রতিফলন ঘটেছে এখানে। সত্যি কথা বলতে কী শান্তিপুরে তখন স্থায়ীভাবে নির্মিত শ্মশানঘাট ছিল না।

গঙ্গার তীর বরাবর জন-মানবহীন স্থান শ্মশানের যোগ্য বলে বিবেচিত হত। এইভাবেই তখন চেলাপাড়া ঘাট, বয়ড়া ঘাট, স্টীমার ঘাট, রামনগর চর, সুতরাগড় চর, বালির চর, চর নৃসিংপুর, চর সাড়াগড়, বাগআঁচড়া, হরনদী, চাঁদকুরী—ইত্যাদি গঙ্গা-তীরবর্তী স্থানগুলি শ্মশান হিসাবে ব্যবহৃত হত। এগুলির মধ্যে কয়েকটি স্থানে এখনও শবদাহ করা হয়ে থাকে।

"এসেছে সাম্রাজ্য লোভী পাঠানের দল/এসেছে মোগল/বিজয় রথের চাকা—
উড়ায়েছে ধুলিজাল, উড়িয়াছে বিজয় পতাকা।
শূন্যপথে চাই/আজ আর কোন চিহ্ন নাই।"

সেই শান্তিপুর পৌর মহাশ্মশানেরও আজ আর কোনো চিহ্ন নেই। ২০০০ সালের বিধ্বংসী বন্যার তাণ্ডবে গঙ্গার করালগ্রাসে পতিত হয় কালীমন্দির, বিশ্রামগৃহ, গুদাম ঘর-সহ আচ্ছাদিত চিতাঘর—সব কিছু। সেবার প্রাকৃতিক বন্যায় 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়'। পুরসভার অভ্যন্তরে সেবার ৪ ফুট জল দাঁড়িয়ে যায়। শবদাহের সুব্যবস্থার জন্য আবার নতুন করে প্রস্তুতি পরিকল্পনা গ্রহণ করল পৌর-কর্তৃপক্ষ। ওই বছরের শেষদিকে নির্মিত হল নবকলেবরে শান্তিপুর পৌর মহাশ্মশান। এইসব তথ্য দিয়ে পৌরপতি অজয় চন্দ সংযোজন করলেন, বৈদ্যুতিক চুল্লি স্থাপনের জন্য পৌরসভা থেকে পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। এত হতাশার মধ্যেও একটু আশার আলো ঝলসে উঠল। জীবনে যত কষ্টই পাই, মরলে বিনাকষ্টে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে শুয়ে পরপারে যেতে পারব। এ কি কম আনন্দের! এ কি কম সোয়াস্তির!

এবার কবরস্থান সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের পালা। আবার সেই পৌরভবন। সেখানে আব্দুল সালাম কারিকরের দ্বারস্থ। তিনি আবার শান্তিপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান। এখন সোনায় সোহাগা। একে মুসলিম তায় আবার পুরকর্তৃপক্ষ। কবরস্থান সম্পর্কিত বিশদ বিবরণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। এতে আর সন্দেহ কি! শান্তিপুর পুরসভার কর্তৃত্বাধীনে মোট ৬টি কবরখানা রয়েছে। এগুলি হল :

ক) মালঞ্চ—সমগ্র সুতরাগড়-সহ আশপাশ এলাকার মুসলমান অধিবাসীদের ব্যবহারযোগ্য কবরস্থান।

খ) মেলের মাঠ—শান্তিপুরের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত এই কবরখানায় গোপালপুর, বেড়পাড়া, বাইগাছিপাড়া, মেলের মাঠ, তোপখানা পাড়া, ডাকঘর পাড়া, রামনগর পাড়া ইত্যাদি এলাকার মুসলমান অধিবাসীরা এটি ব্যবহার করে থাকেন।

গ) লক্ষ্মীতলা-মুচিপাড়া—এখানে পাশাপাশি দুটি কববস্থান থাকলেও বর্তমানে একটিতে কবর দেওয়া হয় না। সারাগড়, আস্তাবলপাড়া বনবিবি তলা, রাজাপুর ইত্যাদি অঞ্চল থেকে আসা মৃতদেহ এখানে কবর দেওয়া হয়।

ঘ) বাবলারোড—এখানেও দুটি কবরস্থান রয়েছে। তবে একটিতে কবর দেওয়া হয় না। ভাইসচেয়ার ম্যানের কাছ থেকে জানা গেল, কবর স্থানগুলি চিহ্নিত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলি সুরক্ষিত নয়। বর্তমানে নানা কারণে শান্তিপুরে লোকসংখ্যার আধিক্যহেতু কবরস্থানের চারপাশে নতুন নতুন বসতি গড়ে উঠছে। ফলে নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এ ব্যাপারে পৌর কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সচেতন বলে তিনি দাবি করেন। কবরস্থানগুলি পবিত্রতা এবং কবর দেওয়ার অধিকার সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজনে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কথা বিবেচিত হচ্ছে। এবং জমি খরিদ করে কবরস্থান হিসাবে নির্দিষ্ট করার কথাও ভাবা হচ্ছে।

শান্তিপুরের বর্ষীয়ান মুসলমান ভদ্রজনের সঙ্গে আলাপচারিতায় জানা গেল, পূর্বে শান্তিপুরে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের নিজস্ব গোরস্থান ছিল। পরিবারের মৃতজনকে সেখানেই কবরস্থ করা হত। শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের কবর তাঁর নিজস্ব জমিতেই আছে। এইরকম শৈশবতলায় জনৈক পিরসাধকেব কবর ডাকঘরপাড়ায় লাল মহম্মদের কবর, নতুনহাটে শরীবৎ মিঞার কবর তোপখানা পাড়ার আলেরসুল খন্দকারের কবর (চিত্র দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি উল্লেখ করা যায়। এছাড়া মতিগঞ্জের সন্নিকটে রামনগর পাড়া মাঠের পাশে রামনগরপাড়া মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে একখণ্ড জমি খরিদ করে কবরস্থান হিসাবে ব্যবহার করা হয়। উল্লেখযোগ্য এখানে উক্ত সমাজের অন্তর্ভুক্ত পরিবারের লোকেরাই শুধু এটি ব্যবহাব কবতে পারেন। সাধারণ মুসলমানদের জন্য এটি ব্যবহারযোগ্য নয়।

শান্তিপুরে বর্তমানে অল্পসংখ্যক খ্রিস্টান পরিবার বসবাস করেন। আড়বান্দী অঞ্চলের চাঁদরা গ্রামেই তাদের বসবাস। সেখানেই আছে তাদের উপাসনা গৃহ চাঁদরার গির্জা। দৃষ্টিনন্দন। অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত। তাদের মৃতদেহ সৎকারের জন্য কৃষ্ণনগর ও হবিবপুর কবরখানায যেতে হয়। নিজেদের গ্রামেও কবর দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

বৈষ্ণব সমাজে মৃতের সৎকার ব্যবস্থা ভিন্নতর। মৃতদেহকে তাঁরাও কবর দেন—বলেন সমাধি। এক্ষেত্রে মৃতদেহটিকে সোজা করে বসানো হয়। ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের পর আশ্রমের কোনো একস্থানে পূর্বে খনন করা মাটির গর্তে লবণ দিয়ে ভরাট করার পর মৃতদেহ ফুল-মালাতে সাজিয়ে তার মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হয়। এরই নাম সমাধি। এই পর্যন্ত লিখতে লিখতে হঠাৎই নজর পড়ল টেবিলে রাখা বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত 'অরবিন্দ স্মৃতি' গ্রন্থটির ওপর। বইটি হাতে নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় এসে দৃষ্টি থমকে গেল 'মহাপ্রয়াণ'—নলিনীকান্ত সরকার। শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বস্ত অনুচর এবং ঘটনার প্রতক্ষ্যদর্শী। তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃত করি :

"১১২ ঘণ্টা পরে (তিরোধান ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫০ রাত ১টা ২৬ মি.। সমাধি - ৯ই ডিসেম্বর ১৯৫০ বেলা ১২টা) দেহ সমাধিস্থ করার আয়োজন হতে লাগল আশ্রমের অঙ্গনে।

দেহের অনুপাতে অধিকতর লম্বা-চওড়া এবং উঁচু একটু বৃহদায়তন কক্ষাধারের ভিতরের দিকটা রূপার পাত দিয়ে মোড়া। সেই আধার সংরক্ষিত রয়েছে শ্রীঅরবিন্দের দেহ। ভূনিম্নে একটি সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠ খনন করে সেই দেহাধার সেখানে সযত্নে স্থাপন করা হল।"

সেদিনও পুরনো অভ্যাসবশে আমরা ক'জন শ্মশানভূমিতে উপস্থিত। কথা প্রসঙ্গে জনৈক সতীর্থ দার্শনিকের মনোভাব নিয়ে শ্মশানের গুরুত্ব প্রসঙ্গে কিছু বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন — "জানেন তো, শ্মশানে অতি পবিত্র স্থান। চির শান্তির আশ্রয়। জাগতিক সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-হানাহানি এখানে এলে সব কিছু ভুলে থাকা যায়।"

একেবারে খাঁটি কথা। এই সময় আমার মনে পড়ল—একদিন এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গিয়ে দেওয়ালে টাঙানো ফ্রেমে বাঁধানো সূচিশিল্প কর্মের নমুনা দেখেছিলাম। তাতে লেখা ছিল: "সুখ স্বপনে, শান্তি শ্মশান।" আমার সতীর্থ ঠিক কথাই বলেছেন। তিনি বলেই চলেছেন, জাতি - ধর্ম-বর্ণ-মান-সম্মান-যশ -প্রতিষ্ঠা এখানে এলে সব কিছুই মিলে মিশে একাকার। All paths of glory lead but to the grave. কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি শেষ করলেন এইভাবে — জীবনে চরম প্রাপ্তির স্থান - এই মহাশ্মশান। বুঝলেন।

সবটা যে বুঝলাম, তা বলতেও পারব না। সে কথা থাক। বরং চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্ভ্রান্ত প্রেম' থেকে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃতি দিয়ে এ আলোচনা শেষ করি। তিনি লিখেছেন : "এইখানে আসিলে সকলেই সমান হয়। পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, সুন্দর, কুৎসিৎ, মহৎ, ক্ষুদ্র, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ইংরেজ, বাঙালি এইখানে সকলেই সমান।"

অতএব, প্রেমানন্দে বলুন সবে- বল হরি, হরিবোল।

□ লেখক পরিচিতি—গ্রন্থকার, গবেষক, প্রাবন্ধিক।

নবদ্বীপের শ্মশান ও গোরস্থান

মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

'জীবনের যত আশা যত ভালোবাসা
তিলে তিলে গড়ে তোলা এই খেলাঘর
সব পড়ে রবে এইখানে
শ্মশানে চিতার মাঝে
জ্বলে পুড়ে শেষ হবে জীবনের সব অহংকার।'

মৃত্যু অমোঘ। মৃত্যুকে অতিক্রম করার ক্ষমতা জীব-জগতের অনায়ত্ব। কবির ভাষায়, 'জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে।'— এ কথার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। মৃত্যুর পরেও থাকে সমাজ, আর থাকে জীবনের নিরবচ্ছিন্ন চলমানতা। কৌমজীবনকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখার জন্য, দূষণমুক্ত রাখার জন্য, শবদেহ সৎকারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল সভ্যতার ঊষালগ্নে, সৃষ্টির আদিকালে। দেশভেদে এবং কালভেদে সামাজিক রীতিনীতির পার্থক্যানুসারে শবদেহ সৎকারের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় কৌম-জীবনাচরণে। হিন্দুরা শবদেহ দাহ করে শ্মশানে, মুসলিম ও খ্রিস্টান সমাজ গোর দেয় মৃত্তিকাভ্যন্তরে, পার্সিরা পাখি দিয়ে খাওয়ায়, তুলে রাখে 'টাওয়ার অফ সাইলেন্সে', বৈষ্ণবরা সমাধি দেয় নিজস্ব রীতি অনুসারে।

শ্মশান পবিত্রভূমি। স্মরণে শ্মশান এলে ভোগবিলাসী মানুষের হৃদয়ে শুরু হয় কম্পন। জীবনের পাতায় পাতায় ছড়ানো যে দর্পিত অহংকার, আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রচলনির্ভর দাম্ভিকতা এবং বর্ণভেদের কাঠিন্য—তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায় শ্মশানে। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, আমির-ফকির মৃত্যুর পর সকলকেই আসতে হয় এখানে। শ্মশানে কোনো ভেদ নেই, বিভেদ নেই, নেই কোনো বৈষম্যের বিড়ম্বনা। এখানে সবাই সমান। সাম্যবাদের মহা-তীর্থক্ষেত্র এই শ্মশানভূমি।

প্রিয়জনের মৃত্যু নিঃসন্দেহে তার আত্মীয় পরিজনের কাছে গভীর বেদনার। তবু মৃত্যুর পর শবদেহ সৎকার করতে হয়, হিন্দু সমাজের সংস্কার অনুযায়ী দাহ করতে হয় শ্মশানে। মৃত ব্যক্তিকে সদ্যতৈরি কাঁচা বাঁশের খাটিয়ায় শোয়ানো হয়, শবদেহ ঢেকে দেওয়া হয় থান কাপড়ে। মাথার সন্নিকটে জ্বালানো হয় সুগন্ধি ধূপ আর ফুল দিয়ে সজ্জিত করা হয় শবাধারটি। চারজন শববাহক গভীর বেদনার সঙ্গে 'বল হরি, হরি বোল' ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে এগিয়ে যায় শ্মশান অভিমুখে। সঙ্গে থাকে শ্মশানযাত্রীরা, আর সংকীর্তনের দল। শবযাত্রার পথটুকু খই ও খুচরো পয়সা ছেটানোর প্রথা আছে। ঘাটে পৌঁছে শবদেহটি নদীর জলে স্নান করিয়ে গব্য-ঘৃত মাখানো হয়, এরপর কাঠের সজ্জিত চিতায় শুইয়ে দেওয়া হয়। মৃত ব্যক্তির জ্যেষ্ঠপুত্র বা অধিকারী ব্যক্তি হাতে অগ্নি-শলাকা নিয়ে তিনবার চিতা প্রদক্ষিণের পর শবদেহের

মুখে অগ্নিসংযোগ করে। দাহ সমাপ্ত হলে নাভিকুণ্ডটি পুঁতে দেওয়া হয় নদীতে। এরপর উপস্থিত শবযাত্রীরা সকলে একটি মাটির কলসির সাহায্যে জল ঢালে চিতায়, মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনায়। অবশেষে সকলে স্নান করে শুদ্ধ হন। প্রথা অনুযায়ী মুখাগ্নিকারী স্নানের পর নতুন শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে, যাকে বলা হয় 'কাছা'। ওই ব্যক্তির গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয় লোহার চাবি, অশরীরী আত্মার উপদ্রব থেকে রক্ষার অভিপ্রায়ে। বৈতরণী পারের জন্য শবদেহের সঙ্গে দিতে হয় কড়ি, তামার পয়সা এবং স্বর্ণখণ্ড। কাছা পরিধানকারী ও ঘনিষ্ঠ স্বজনেরা পারলৌকিক ক্রিয়া না হওয়া পর্যন্ত নিরামিষ আহার গ্রহণ করে এবং সদাচারী জীবনযাপন করে। এই সময়কালে পাদুকার ব্যবহার, তেল-সাবান ইত্যাদি বিলাসদ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ রেখে প্রিয়জনের প্রতি শোকজ্ঞাপন করতে হয়। শ্রাদ্ধের দিন স্বজন পুরুষেরা মস্তক মুণ্ডন করে, নববস্ত্র পরিধান করে, মৃতের আত্মার শান্তিকামনায় পিণ্ড প্রদান করে। সবশেষে আত্মীয়-স্বজন ও শ্মশান বন্ধুদের মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করার প্রথা আজও প্রচলিত। তবে আজকে এই ইন্টারনেটের যুগে প্রাচীন কৃত্যসমূহের অধিকাংশই বিলীয়মান।

নবদ্বীপের শ্মশান অতি প্রাচীন। সেকালেও শ্মশান ছিল, তবে তার ইতিহাস লিখে রাখার প্রয়োজন অনুভব করেননি কেউ। বর্তমানে যেখানে বড়বাজার, এককালে সেখানে ছিল আদি শ্মশান, এরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। আজও মাছবাজারে অবস্থিত অশ্বত্থবৃক্ষে লটকানো একটি সাইনবোর্ড প্রাচীন শ্মশানের নীরব সাক্ষীরূপে বিরাজমান। সম্ভবত ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে ভাগীরথী তার গতিপথ পরিবর্তন করে নবদ্বীপের পশ্চিমধারা পরিত্যাগপূর্বক পূর্বধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করলে, শতাব্দীর শেষার্ধে এখানে শ্মশান স্থাপিত হয়।

নবদ্বীপে পৌরসভা স্থাপিত হয় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল। পৌর নথি থেকে জানা যায় যে, ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে চরাঘাটের আধমাইল উজানে একটি এবং বড়বাজারের আধ মাইল দক্ষিণে একটি ঘাট শবদাহের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ এই সময়ে বড়বাজার স্থাপিত হয়ে গেছে, স্বাভাবিক কারণেই শ্মশান স্থানান্তরের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তাই পৌর কর্তৃপক্ষ বাজার থেকে আধ মাইল দূরে শ্মশানের স্থান নির্বাচন করেছেন। এছাড়াও শবদাহের জন্য প্রয়োজনীয় কাছা-র কাপড়, লজ্জাবস্ত্র, সরা-কলসি ইত্যাদি দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য পৌর-নিয়ন্ত্রণে একটি দোকান স্থাপন করা হয় বুইচরা ঘাটের উত্তরে পুরশ্চরণ মাঠে। এ কাল পর্যন্ত শ্মশানে মৃতদেহ দাহের কোনো রেকর্ড রাখার নিয়ম ছিল না, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে পৌর-নিয়ন্ত্রাণাধীন শ্মশানে শবদাহের রেকর্ড রাখার সূচনা ঘটে।

দিয়ারাপাড়া ঘাটের দক্ষিণে মরিঘাটের স্থান নির্দিষ্ট হয় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ মে। ভাগীরথীর গতিপথ পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শ্মশান ক্রমশ সরে যাচ্ছে পূর্বদিকে। বর্তমানে শ্মশানের মোট জমির পরিমাণ ২.৮১ শতক। ১৬৮১২ দাগে ০.৬৬ শতক, ১৬৮৫২ দাগে

০.৫২ শতক, ১৬৮৫৩ দাগে ০.৮৫ শতক এবং ১৬৮৭৬ দাগে ০.৭৮ শতক। ভাগীরথীর খামখেয়ালিপনায় নবদ্বীপ ভেঙেছে বারংবার, বাদ যায়নি শ্মশানঘাটও। ভাঙনের হাত থেকে রক্ষার জন্য ইটের পাকা গাঁথনি দিয়ে মরিঘাট ঘেরা হয় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে। আজ সে প্রাচীরের চিহ্ন পর্যন্ত নেই, কালের গ্রাসে তা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে। রোদ-জল-ঝড়ে শবযাত্রীদের মাথা গোঁজবার স্থান ছিল না শ্মশানে। পৌর-কর্তৃপক্ষ এখানে একটি পাকা ঘর নির্মাণ করে দেন ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে। এ ঘরটি এখনও বর্তমান আছে। এরপর ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে নবদ্বীপ শ্মশানেও, নির্মিত হয় বহু আকাঙ্ক্ষিত বৈদ্যুতিক চুল্লি।

এখানকার বৈদ্যুতিক চুল্লিতে ফার্নেস (Furnace) দুটি, সর্বক্ষণ চালু থাকে একটি, অপরটি থাকে স্টেপ্‌নি (Stepney) হিসাবে। বৈদ্যুতিক চুল্লির পাশাপাশি কাঠে দাহ করার ব্যবস্থাও চালু রাখতে হয়েছে রক্ষণশীলদের জন্য। কাঠ-বৈদ্যুতিক চুল্লি ও বৈষ্ণবদের সমাধি মিলিয়ে প্রতিদিন প্রায় ২৫-৩০টি শব সৎকার হয় নবদ্বীপ পৌর এলাকায়। বৈদ্যুতিক চুল্লিতে একটি শবদাহ করতে সময় লাগে ৪০ থেকে ৪৫ মিনিট। রসিদের বিনিময়ে পৌরসভাকে আদায় দিতে হয় ৩০০ টাকা। কাঠে দাহ করলে আদায় দিতে হয় ২০০ টাকা। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঠ সংশ্লিষ্ঠ ব্যক্তিকে সংগ্রহ করতে হয়। কলসি, সরা, ঘি, মধু, হরিতকি, লজ্জাবস্ত্র ইত্যাদি আনুষঙ্গিক দ্রব্য পৌরসভা সরবরাহ করে, এসবের জন্য আলাদা মূল্য দিতে হয় না। চুল্লি স্থাপিত হওয়ার পর থেকেই এটি ঠিকাদারের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছিল, পৌর আয় হচ্ছিল সামান্য। গত বছর থেকে চুল্লি পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব পৌরসভার নিয়ন্ত্রণে আনায়, আয় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় ষোলো লক্ষ টাকা।

বর্তমানে নবদ্বীপ শ্মশানের প্রাকৃতিক পরিবেশ অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এখানে আছে সুদৃশ্য ফুলের বাগান, ঝাউবন, পাকারাস্তা এবং পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক আলো। পাশেই বয়ে চলেছে পাপা-তাপ-হারিণী, ত্রিতাপ-নাশিনী, কলকল্লোলিনী ভাগীরথী। শবযাত্রীদের জন্য আছে বিশ্রামের স্থান, শৌচাগার, মহিলাদের কাপড় ছাড়ার ব্যবস্থা এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের জোগান। শ্মশান সংলগ্ন কর্মমন্দির ক্লাবের মাঠে ছেলেরা খেলাধূলা করে, প্রতিদিন প্রচুর মানুষ বেড়াতে আসেন এখানে। নবদ্বীপ শ্মশানও এখন দর্শনীয় স্থান।

নবদ্বীপ তীর্থভূমি, গৌরগঙ্গার দেশ। এখানকার শ্মশানে দাহ করলে স্বর্গলাভের পথ প্রশস্ত হয়, এ বিশ্বাস আজও আছে ধর্মপ্রাণ মানুষের অন্তরে। তাই নবদ্বীপ শ্মশানে শবদেহ আসে সমগ্র নদিয়া-মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলার একাংশ থেকে।

নবদ্বীপ মন্দির নগরী এবং পূর্বভারতে বৈষ্ণবধর্মের প্রবক্তা চৈতন্যদেবের জন্মস্থান। সংখ্যাতীত বৈষ্ণব-সাধকের বাস এখানে। বৈষ্ণবদের সমাধির জন্য শ্মশান-সংলগ্ন এলাকায় পৌরসভা জমি ক্রয় করেছে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে। এখন গড়ে প্রতি মাসে ২৫ থেকে ৩০টি

শবদেহ বৈষ্ণব মতে সমাধি দেওয়া হয়। প্রতিটি সমাধির জন্য পৌরসভাকে আদায় দিতে হয় মোট ২০০ টাকা।

প্রাচীনত্বে খ্যাত নবদ্বীপের ঘাটে সতীদাহ হত এককালে। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে নবদ্বীপের খ্যাতিমান স্মার্ত পণ্ডিত রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার শতবর্ষ বয়সে প্রয়াত হলে, নবদ্বীপে ভাগীরথী তীরে শ্মশানে তাঁর স্ত্রী মহামায়াদেবী স্বামীর চিতায় আরোহণ করে সতী হয়েছিলেন। উলার জমিদার মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে তাঁর ১৩ জন সহধর্মিণীকে নবদ্বীপ শ্মশানে দাহ করা হয়। একালের মনু নবদ্বীপের বিশিষ্ট পণ্ডিত স্মার্ত রঘুনন্দন স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন দেওয়াকে স্ত্রী জাতির শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে মনে করতেন। হয়তো সে কারণেই নদিয়া জেলায় সতীদাহের প্রবণতা ছিল প্রবল। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে যে, ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ৫৯ জন, ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে ৭৩ জন এবং ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে ৬০ জন সতী হয়েছিলেন নদিয়ায়।

নবদ্বীপ পৌর এলাকায় মুসলমান বসতি চিরদিনই কম। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে এখানে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৩৩৫ জন আর খ্রিস্টান ছিল মাত্র ৮ জন। ফলে পৌরসভা নিয়ন্ত্রিত কোনো গোরস্থান নেই নবদ্বীপ শহরে। অবশ্য পঞ্চায়েত এলাকায় আজও মুসলিম সমাজের ঘনবসতি লক্ষ কবা যায়। এখানকার গোরস্থানগুলি সবই ব্যক্তি মালিকানাধীন। মুসলিম-সমাজে কোনো ব্যক্তিব মৃত্যু ঘটলে তাকে পাটা বা খড়ের ওপর শোয়ানো হয়। নখ কাটা, পায়খানার দ্বাব পবিষ্কার করা, লজ্জাস্থানের লোম পরিস্কার করার পর সাবান মাখানো হয়। পরানো হয় নতুন কাপড়। মহিলাদের বেলায় কাপড় দিয়ে চুলবাঁধা হয়, কানে দেওয়া হয় কর্পূর, চোখে সুরমা, বুকে নতুন কাপড় ঢাকা দেওয়া হয়। এরপর দেওয়া হয় 'গোলাপ পানি'। জানাৎ পড়াব সময় শবদেহ খাটিয়ায় শোয়ানো হয়। এই সময় মৃতের মাথা উত্তরে এবং মুখ পশ্চিমে রাখা হয়। তিনবার মুখটা খোলা হয়। কবরস্থানের মাটিতে সাড়ে তিন হাত লম্বা, দেড় হাত চওড়া এবং সাড়ে তিন হাত গভীর গর্ত খুঁড়তে হয়। গর্তে শবদেহ শোয়ানোর পর বাঁশের কাবারি, দরমার বেড়া, চট প্রভৃতি দেওয়ার পর মাটি চাপা দেওয়া হয়। কবর দেওয়ার পর চারটি খেজুর ডাঁটা পুঁতে দেওয়া হয় চারকোণে। পরিশেষে সকলে ভিজে চিঁড়ে আর ছোলা ভোজন করে গৃহে ফিরে আসে।

নবদ্বীপ শহরের উত্তরে পাগলা পিরের দরগাকে বলা হয় পিরতলা। পঞ্চায়েত এলাকায় মহেশগঞ্জ মৌজায় আলি শা ও অঞ্জু শা ফকিরের মাজার ফকিরতলা নামে খ্যাত। পৌর এলাকার গোরস্থান আছে দুটি, একটি উত্তরে পিরতলার পশ্চিমে আর একটি দক্ষিণে রেলওয়ে রিক্রিয়েশান ক্লাবের মাঠের পশ্চিমে পোলতার ধাবে। এই দুটি গোরস্থান মিলিয়ে মোট জমির পরিমান ৪.৭৬ শতক। এর মধ্যে তেঘরি মৌজায় অবস্থিত গোরস্থানটির বিস্তারিত বিবরণ

পাওয়া গেছে। ১২৯ দাগে ০.০৮ শতক, ১৬০ দাগে ১.১৫ শতক, ১৬১ দাগে ০.১৬ শতক, ১৯০ দাগে ০.০১ শতক, ৮৩৬ দাগে ০.০৬ শতক, ৯২৪৩ দাগে ০.৬৩ শতক, ৯২৪৫ দাগে ০.০৬ শতক এবং ১৬৬৬৬ দাগে ০.৩৪ শতক। এতদ্‌ব্যতীত নবদ্বীপ পঞ্চায়েত এলাকায় মুসলিম-অধ্যুষিত যে সকল গ্রামে কবরস্থান আছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা হল :

মৌজা ও জে.এল. নং	কবরস্থানের জমির পরিমান	শ্মশান
নবদ্বীপ-২০ (পৌরএলাকা)	২.৪৮	২.৮১
তেঘরি - ২৯ (ঐ)	২.২৮	
বল্লালদীঘি-১৪	১.৪৫	
তিয়রখালি -১৫	৫.৪৮	
বামুনপুকুর-৯	৩.২৫	
মোল্লাপাড়া - ১৩	০.৩৩	
মহীশূরা-৩০	৯.৩৬	
চর-কাঠশালি-৮	০.২১	
রাজাপুর-১০	১.৭৯	
সরডাঙ্গা-১১	১.০৯	
গাদিগাছা-১৭	১.৫৯	
পানশিলা	০.৮২	
মোট	৩০.১৩ শতক	২.৮১ শতক

তথ্যসূত্র :

১. নবদ্বীপ পৌরসভার রেজলিউশন, তারিখ ৩.৯.১৮৭২, ৩.১.১৮৮২, ৪.৭.১৮৮২, ১২.১২.১৮৮৬, ২.১২.১৯০২

২. নদীয়া উনিশ শতক—মোহিত রায়।

৩. সতীদাহ—কুমুদনাথ মল্লিক, মোহিত রায় সম্পাদিত।

৪. নবদ্বীপের ইতিবৃত্ত (প্রথম খণ্ড)— মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল।

৫. তাজমহলের পিলার—মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল।

৬. লোকশ্রুতি, আগস্ট ১৯৯৮।

৭. কৃতজ্ঞতা স্বীকার—দীন মহম্মদ সেখ ও গোপেশ্বর দে।

□ লেখক পরিচিতি— গ্রন্থকার, গবেষক, প্রাবন্ধিক।

হরিণঘাটা : মহাদেবপুর শ্মশান ও লোকাচার

শ্যামপদ মণ্ডল

নদিয়া জেলার একেবারে দক্ষিণপ্রান্তস্থিত থানার নাম হরিণঘাটা। থানাটির অবস্থান ২২°৩০/ উত্তর এবং ৮৮°৩৪/ পূর্ব অক্ষাংশে। ভূখণ্ডটির মোট পরিমাপ ১৬৮.৪ বর্গকিমি.। ১৯৯১-এর হিসাব অনুযায়ী হরিণঘাটার মোট জনসংখ্যা ১,৭৭,৭৮১ জন। হুগলির ত্রিবেণীতে গঙ্গা থেকে যমুনা বেরিয়ে এসে হরিণঘাটাকে প্রায় দ্বিখণ্ডিত করে প্রায় কুড়ি মাইল বেয়ে উত্তর ২৪ পরগনায় পৌঁছে ইছামতীতে পড়েছে। শুধু কি যমুনা? একদা এই এলাকা জুড়ে সুটি, পদ্মা, গোমতী, গড়ুই, শিবসা ইত্যাদি নদী প্রবাহিত ছিল জানা যায়। এক সময় এইসব নদীর দুপারে কিছুদূর অন্তর অন্তর শবদেহ পোঁতা বা পোড়ানোর ব্যবস্থা লোকসমাজের প্রয়োজনে স্বাভাবিক ভাবেই ছিল। পথঘাটও আজকের মত এত ভাল ছিল না। জঙ্গলাকীর্ণ এইসব এলাকায় হিংস্র জন্তু জানোয়ারের অভাব ছিল না। অধিকাংশ জায়গা দিয়েই ছিল পায়ে চলা শুঁড়িপথ। পাড়ায় কেউ মরলে, বাঁশে জড়িয়ে-পেঁচিয়ে বেঁধে নিয়ে সেই শবসহ বাঁশটি দুজন বা চারজন কাঁধে নিয়ে পায়ে চলা পথে হেঁটে কোনো নদীর ধার কাছে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসত। পশুপাখিরা খেয়ে নিত। কখনো বা সেই শবদেহের বাঁশ কোনো ডালে বা বাঁশঝাড়ে আটকে গেলে ভূত ভেবে সব পালাতো। আবার এমনও হত যে, নির্দিষ্ট নদী কিনারায় পৌঁছে শবদেহ পুঁতে বা পুড়িয়ে দেওয়া হত। দিনেরবেলাতেই দেখা যেত, মাটি পা দিয়ে খুঁড়ে সেই শবদেহ বার করে শিয়াল কুকুরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আগেকার মাটির দাওয়া হত চার-পাঁচ হাত উঁচু। সেখান থেকেও বাচ্চাকে টেনে নিযে যেত জঙ্গলের শিয়াল। এমন ঘটনা প্রবীণ অনেকের মুখেই শোনা যায়। যাদের অবস্থা ভাল ছিল, সেসব বাড়ির শবদেহ বাঁশের চালিতে করে নিয়ে যাওয়া হত চাকদহের কালীগঞ্জে গঙ্গায়। সেখানে শ্মশানে পোড়ানো হত। গঙ্গা মজে গেলে পরবর্তীকালে হালিশহর শ্মশানে হরিণঘাটাবাসীর শবদাহ করার প্রবণতা বাড়ে, সেটা পঞ্চাশের দশক থেকে। ১৪৯৫-তে রচিত 'মনসাবিজয়' কাব্যে কবি বিপ্রদাস পিপ্পিলাই, লিখছেন, 'যমুনা বিশাল অতি'। এই বিশাল সুবিস্তৃত যমুনার দুই তীরে লোকসমাজের স্বাভাবিক প্রয়োজনে হরিণঘাটাতেও একসময় বেশ ক'টা শ্মশান তৈরি হয়ে যায়। অর্থাৎ অনির্দিষ্ট যত্রতত্র শবের অবস্থানটি ক্রমে স্থায়ী ও নির্দিষ্ট হয়ে উঠল। হরিণঘাটায় অবস্থিত শ্মশানগুলির মধ্যে মহাদেবপুরের শ্মশানটি উল্লেখযোগ্য ও অন্যতম। হরিণঘাটা থানা বা বাজার থেকে পাকাপথে প্রায় নয় কিলোমিটার পুবে যমুনার উত্তরে এর অবস্থান। প্রাচীনত্বের বিচারে বলা যায় শ্মশানটির বয়স অন্তত দেড়শো বছর। যমুনায় সারাবছর থাকত বড় বড় কচুরিপানা, ওপর দিয়ে তখনকার মানুষ হেঁটে পারাপার করত। সেই কচুরিপানার তলায় তখন শবদেহ ঢুকিয়ে দেওয়া হত, মাছ বা পাখিতে খেয়ে নিত। কখনো বা উক্ত শ্মশানের

পাঁক-মাটিতে পুঁতে দেওয়া হত। এখনো আশপাশ গ্রামাঞ্চলে কাউকে কাউকে উদ্দেশ্য করে কোনো কোনো প্রবীণ-প্রবীণাকে বলতে শোনা যায়, 'তোকে যোগনোর কাঁধায় পুঁতে রেখে আসব 'বা' তোকে যোগনোর কোতোর তলায় দিয়ে আসব'। এখানে যোগানো বলতে যমুনা আর কোতো হল কচুরিপানা। শবদেহের ক্ষেত্রে এই প্রবাদ বাক্যগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্বকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। একদা যমুনাপথে চলত শোনা যায় বড় বড় নৌকা, সদাগরী ডিঙা, বজরা এমনকী পরবর্তীকালে লঞ্চ-স্টিমার ইত্যাদি। নদীর অনেক জায়গা থেকে এপার-ওপার দেখা যেত না। সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনার ইতিহাস অনুযায়ী চাঁদ সওদাগর ও ধনপতি সওদাগরের ডিঙাও এপথে যাতায়াত করেছে। প্রবাদ আছে, সতী বেহুলার ভেলাও একদিন লখিন্দরে শব নিয়ে এই যমুনাপথে গেছে। নদীর দুপারে মহাদেবপুর এলাকায় ছিল কাশ-খড়ের জঙ্গল। হামেশাই বেরিয়ে আসত বাঘ, শিয়াল, হায়না, খেঁকশিয়াল, সজারু, বুনোশোর ইত্যাদি ও সাপ। সন্ধ্যা হলেই কাছে-দূরে শোনা যেত শিয়ালের ডাক। শবদেহ ঘিরে মহাদেবপুর শ্মশানে শুরু হত বন্যপ্রাণীর তাণ্ডব। গাছের ডালে কখনো বা শোনা যেত শকুনের বাচ্চার কান্না-চিৎকার। রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে ভয়ও বাড়ত।

মহাদেবপুর গ্রামটির মৌজা নাম সেকেন্দারপুর, জে এল নং ৩৫। মহাদেবপুর ও রায়খাস এই দুটি গ্রাম নিয়ে সেকেন্দারপুর মৌজা। বলাবাহুল্য, সেকেন্দাবপুর নামে এই মৌজায় লোকায়ত কোনো গ্রামনাম নেই এখন আর। উক্ত নামটি এখন শুধু মৌজানাম হিসাবেই আছে। একেই বলে কালের প্রহসন। ১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী এই মৌজার মোট জনসংখ্যা ৬,৬১৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৩,৪৬৩ জন এবং মহিলা ৩,১৫১ জন। মোট এলাকা ৪৮৬.৩৬ হেক্টর। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, সেকেন্দারপুর নামটি এসেছে সেকেন্দার শাহ্ গাজীর নাম থেকে। মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা, গোটা হরিণঘাটাটাই মুসলমান অধ্যুষিত ছিল একদা। এখন পাশাপাশি হিন্দুদের অবস্থান। সেকেন্দারপুরে পরে শিবঠাকুরের অধিষ্ঠান থেকে হয়েছে মহাদেবপুর এবং জানা যায় চৌবেড়িয়া রায় জমিদারদের খাসতালুক হয়েছে রায়খাস। ইতিহাস অনুসন্ধানে পাই, সেকেন্দার শাহ্ গাজীর জন্মস্থান আদমপুর, ভিন্নমতে বৈরাটনগর। সেকেন্দারপুর একদা ছিল উখরা পরগনার অন্তর্ভুক্ত। হান্টারের সার্ভে সূত্রে জানা যায়, উখরা পরগণার মোট ভূখণ্ডের পরিমাণ ছিল ৩৪০০০ একর বা ৫৩.১২ বর্গমাইল। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭২৮-'৮২) ছিলেন এর মালিক। তাঁর বংশধর রাজা গিরীশচন্দ্র রায়ের রাজত্বকালে (১৮০২-'৪১) ১৮০২তে খাজনার দায়ে পরগণাটি নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। কিনে নেন রাজশাহীর দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায়বাহাদুর ও সাতক্ষীরার জমিদারবাবু। ১৯৫৩-তে জমিদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটে। ফলে তখন দিঘাপতিয়ার রাজবংশধরগণ মহাদেবপুর শ্মশানের জায়গাটি লিখে দেন। এর আগে জায়গাটি, শ্মশান নামে

কোনো লেখাপড়া ছিল না। কিন্তু শ্মশান হিসাবে জায়গাটির ব্যবহার ছিল। রেকর্ডভুক্ত হয়েছে জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদের ফলে। পুরনো কাগজপত্র থেকে জানা যায়, শ্মশানটির আর এস দাগ নং ৩০৬৯ এবং পরিমাণ ৬৯ শতক। স্থানটি বেশ কয়েকবার মাপামাপিও হয়েছে। বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়, শ্মশানের জায়গাটি রেকর্ড হওয়ার পেছনে মহাদেবপুরবাসী কৈলাশ দেবনাথ ও মানিক মণ্ডলের বিশেষ প্রচেষ্টা বা অবদান ছিল। উল্লেখ্য, প্রথম দিকে সাতক্ষীরার জমিদারদের ছিল এই এলাকায় পাঁচ আনার মালিকানা। পরবর্তীতে এই পাঁচ আনা অংশ দিখাপাতয়ার রাজবংশধরেরা কিনে নিয়েছিলেন। বর্তমানে শ্মশানের জমির পরিমাণ ৬৯ শতক থেকে কয়েক শতক বেড়েছে বলে জানানো হয়।

উত্তরে মহাদেবপুর আর দক্ষিণে নগরউখড়া, মাঝখান দিয়ে দুই গ্রামের সীমানা নির্দেশ করে পশ্চিম থেকে পুবে বয়ে চলেছে যমুনা। মহাদেবপুরের শ্মশানটির নাম দেওয়া হয়েছে 'শান্তিধাম'। হয়েছে 'মহাদেবপুর শ্মশান উন্নয়ন কমিটি'। রেজি নং S/IL/11215/2002-03 এই কমিটরি প্রচারপত্রে ঘোষিত পরিকল্পিত কর্মসূচি এমন—১ ঢালাই পিলারযোগে ছাদসহ ২টি চিতাবেদি (চুল্লি) নির্মাণ। ২ মাটি ফেলে শ্মশান-প্রাঙ্গণ উঁচু ও সমতল করা। ৩. শ্মশানের চতুঃসীমা পিলারসহ কাঁটাতাবের বেড়া দেওয়া। ৪. পাকারাস্তা থেকে শ্মশান-প্রাঙ্গণ পর্যন্ত প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ। ৫. শ্মশানের প্রবেশপথে একটি সুদৃশ্য গেট নির্মাণ। শ্মশানটিকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে উত্তর ২৪ পরগনা গাইঘাটার শ্মশানটিকে মডেল হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এই শ্মশান উন্নয়ন কমিটির তৎপবতায় শ্মশান উন্নয়নেব বহুমুখী কর্মকাণ্ড তুমুল গতিতে আছে। পুরনো যে চুল্লি খোলা আকাশের নিচে আছে, তা রাস্তার খুব কাছে ও উত্তর-দক্ষিণমুখো—সাধারণত যেমন হয়। সাক্ষাৎকারে জানা গেল, এই চুল্লিটি করে দিয়েছিলেন মহাদেবপুরের যোগেশ ধর মহাশয়। একটি টিউবওয়েল করে দিয়েছেন উক্ত গ্রামের রাইহরণ দেবনাথ (প্রয়াত)। এক সময় মহাদেবপুরবাসী রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল (রবিন সাধু), রমেশ দেবনাথ প্রমুখ শ্মশানে বেশ কিছু গাছ লাগিয়েছেন। অনেক গাছ এখন ছায়া দান করছে। শ্মশানের ধার কাছে জনৈক গোয়ালডোব বাসীর লাগানো নানা গাছপালার বেশ কয়েকটি এখন মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। শবদাহকালে বহু মানুষ পাকা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ভিড় করে দেখে, যাতায়াতের পথে বহু মানুস হাত কপালে ছোঁওয়ায়, শ্মশানকে প্রণাম জানায়। সংস্কার আছে, শবদাহ দেখলে পোড়ানো শেষ না হওয়া অবধি স্থানত্যাগ করতে নেই। সেই হেতু ভিড়ও বাড়ে বলে অনেকের ধারণা। কথায় বলে, উত্তর দিকে মাথা দিয়ে শুতে নেই। কেন নেই? শ্মশানে মরার মাথা উত্তর দিকে তাকে। শুধু কি তাই, বোধ করি অন্য কারণ আছে। পৃথিবী উত্তর ও দক্ষিণে আছে দুই চুম্বকমেরু। উত্তর দিক বিকর্ষণমূলক দিক। মাথা উত্তরে দিলে বিকর্ষণজনিত কারণে রক্ত-সঞ্চালনে মন্দাভাব দেখা দেয়। আর শবদাহ একটুখানি দেখলে

মাথার মধ্যে তা ঢুকে সুপ্ত থাকে, দেখার অসম্পূর্ণতা রাতে স্বপ্নদোষ আনে। যাই হোক, মহাদেবপুর শ্মশানে কি কি গাছ লাগানো হয়েছে বা আছে দেখা যাক। আম, জাম, নারকেল, কাঁঠাল, বট, পাঁকুড়, যজ্ঞডুমুর, বেল, দেবদারু, খেজুর, অশ্বত্থ, জিবলী ইত্যাদি। তবে পুরনো জিবলীগাছটি বছর দশেক হল মারা গেছে। জানা যায়, নগরওখড়ার মানিক কর্মকার, সন্ন্যেস নেওয়া অবস্থায় চৈত্রমাসে আনুমানিক পঞ্চাশের দশকে মারা গেলেন। এমতাবস্থায় শবদাহ না করে মাটিতে সমাধি দেওয়াই রীতি। সেইহেতু মহাদেবপুর শ্মশানে তাঁকে মাটি দিয়ে চিহ্নস্বরূপ মাথার কাছে জিবলীর একটি ডাল পুঁতে দেওয়া হয়। সেই ডালটিই গজিয়ে বড় হয়ে মোটা হয় পরে। একদিন গোড়াটি চারপাশে ইট দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়। আশির দশকের শেষ দিকে ঐ জিবলীগাছের গোড়া বাঁধানো ইট নিয়ে রবিন সাধু, রমেশ সাধু, গোপাল সরকার, গোবর্ধন সরকার, চিত্ত সধু, গৌর সাহা, অরুণ সরকার প্রমুখ শ্মশানেই উত্তরপ্রান্তে কালীমন্দির নির্মাণ কার্যে লাগান। সেই থেকে প্রতিবারেই জাঁকজমকের সঙ্গে শ্মশানকালীর পুজো ও আরাধনা মন্দিরে পালিত হচ্ছে। বালকভোজন হয়। অসংখ্য ভক্তপ্রাণ মানুষ আসেন। আশপাশ অঞ্চল থেকে চাল, ডাল, সবজি ও অর্থাদি দানস্বরূপ গ্রহণ করা হয়। গত কালীপুজোয় জানা গেল, তিনদিনে একশ কড়াইয়ের মত খিচুড়ি নেমেছে।

ক'বছর পূর্বে এই শ্মশানে ক'বার দুর্গাপুজোও হয়েছে। হয়েছে নামযজ্ঞের অনুষ্ঠানও। শ্মশানে সাধুদের আখড়ায় বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সাধু সন্ন্যাসীরাও আগমন ঘটতে দেখা যায়। গঙ্গাসাগর থেকে এসেছেন গিরি মহারাজ। এখানকার ভক্ত সাধুবাবাদের আহ্বানে কামরূপ-কামাখ্যা থেকেও এসেছেন সাধু-সন্ন্যাসী। শ্মশানটির সর্বমুখি উন্নয়নের স্বার্থে কর্মতৎপরতা লক্ষ করার মত। কমিটির বক্তব্য অনুযায়ী, সরকারি আর্থিক সহযোগিতায় শ্মশান উন্নয়ন পূর্ণতার পথে। যমুনার মাটি কেটে ওপরে তোলা হবে। নদীতে জল খেলবে। শান-বাঁধানো সিঁড়ি হবে নদীতে নামবার। চিরবসন্ত বইবে। সামনে কাছেই হবে ছাদযুক্ত পাকা একাধিক চুল্লি। পাকার ধার ঘেঁষে দাঁড়ানো পাঁচটি কাঠ বিক্রয় কেন্দ্রে আছেন উপেন দেবনাথ, অবিনাশ দেবনাথ, সুবল দেবনাথ, স্বরাজ দাস ও ভবেন্দ্রনাথ সরকার। বিক্রি হয় সাধারণতঃ আম, জাম, সুবাবুল, কড়ুই চট্‌কা, কৃষ্ণচূড়া, ডুমুর, কদম, গাব ইত্যাদির কাঠ—শবদাহের জন্য। দাম হিসাবে মনপ্রতি ৫০ টাকা থেকে শুরু। উপেন দেবনাথ জানালেন, খেজুর, তাল, নারকেল কাঠ শবদাহের কাজে চলে না। নারকেল গাছ নাকি ব্রহ্মাগাছ। এই গাছের আঁশ নাকি ব্রহ্মা না বিশ্বামিত্রের পৈতে হয়েছিল। শ্মশানের কাছেই আষাঢ় মাসে হয় মহাদেবপুরেই রথ। মেলার দিন অসংখ্য ভক্তপ্রাণ মানুষ শ্মশানে আসেন, সাধুবাবাদের প্রণাম গ্রহণ করে কৃপাধন্য হন। এক সময় এই শ্মশানভূমিতে কাশের জঙ্গল ও উই ঢিপিও ছিল। আজও আশেপাশে সন্ধ্যারাতে শিয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে। এখন সেদিন গেছে। উপেনবাবুর কাছে এসব জানা

গেল। আরো জানা গেল, শবদাহের কাজে আমকাঠের চাহিদাই বেশি। কাঁচা আমকাঠ ভাল জ্বলে, কিন্তু আমকাঠ ভিজে গেলে জ্বলতে চায় না। মাসে গড়ে দশটি শবদাহ এই শ্মশানে হচ্ছে। আশপাশ বিশ-পঁচিশ গ্রামের শবদেহ এখানে আসছে।—কম কথা নয়। অতএব সরকারি সাহায্যের অবশ্যই প্রয়োজন অনুভূত হয়। তবে আশার কথা, এর মধ্যেই শ্মশানের পুবেই যে পাকা রাস্তা নগরওখড়া থেকে বেরিয়ে নিমতলার দিকে গেছে, সেই পাকার গা ঘেঁষে বাসস্ট্যাণ্ড তৈরি হতে চলেছে। জানা গেল, দু'লক্ষ টাকা সাহায্য পাওয়া গেছে, জানুয়ারি চারে কাজ শুরু হবার তোড়জোড় চলছে। সুতরাং শ্মশানও পিছিয়ে থাকবে না—সকলের আশা। কাছেই সঙ্গে রয়েছে যমুনার ওপরে ব্রিজ; ১৯৯৫ থেকে প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় বসছে ভাসমান বাজার। শ্মশানের পাশেই বটতলায় কুঁড়ে বেঁধে আছেন নন্দ মহারাজ (নন্দলাল দাস), আজ ২৬ বছর, বয়স ১০০ ছাড়িয়ে গেছে। বহু সেবক আজ তার ভক্ত। বললেন, শ্মশান উন্নয়নে তাঁরও পরোক্ষ অবদান কম নয়, আঞ্চলিক জনগণের সাহায্য-সহযোগিতায় দিন চ'লে যায়। উল্লেখ্য, এই শ্মশানের উত্তরেই গড়ে উঠেছে শিশু উদ্যান, বছরে মেলা ও প্রদর্শনী হয়।

ধাঁধায় শুনেছিলাম প্রশ্ন, সবপথের শেষ কোথায়? উত্তর—শ্মশানে। শুনে খুব ভাল লেগেছিল। এই শ্মশান নিয়ে কত গল্প, উপন্যাস, নাটক, উপকথা, লোককথা, ধাঁধা, ছড়া, কবিতা ইত্যাদি যে আছে তার শেষ নেই। শবের শোওয়ার স্থান বা শবের শয়নস্থান, তাই হল শ্মশান। এই শ্মশানই কোথাও বা মুক্তিধাম, কোথাও স্বর্গধাম, কোথাও শান্তিধাম ইত্যাদি। প্রবাদে বলে, সুখ স্বপনে শান্তি শ্মশানে। কথাটি বুঝি সত্যি। শ্মশান হল সুখ-শান্ত-মুক্তির বড় পবিত্র জায়গা। গানে পাই—কেউ কাটবে ঝাড়ের বাঁশ কেউ পাকাবে দড়ি, চারজনেতে কাঁধে নিয়ে বলবে হরি হরি। কথায় বলে, চারজন ড্রাইভার, একজন প্যাসেঞ্জার। উত্তরে তো সেই শবদেহ আর বাহকবৃন্দ। বাঁশ সত্যিই কত কাজেই না লাগে। ধাঁধাতে এও বলে, যে বানায় সে ব্যবহার করে না, যে ব্যবহার করে সে বানায় না। জিনিসটা তো সেই শবেরই চালি বা খাট। সুতরাং মরণযাত্রার অন্তিমস্থল শ্মশানটিকে গুছিয়ে সুন্দর করে গড়া একান্তই জরুরি। সকলের সহযোগিতার বড় প্রয়োজন। শবদেহ বয়ে নিতে শ্মশানবন্ধুরা হরিধ্বনি দেয়, এতে দেবতাকে স্মরণ করার একটি ব্যাপার থাকে, আবার দুর্বলতাও কাটে, ভয় বা হতাশভাব অনেকাংশে দূরীভূত হয়। পথে যেতে খই-পয়সা কেন ছড়ানো হয়? এক মত বলে, অপদেবতারা মরাদেহের লোভ ছেড়ে ঐ খইতে মজে যায়, ততক্ষণে শ্মশানে পৌঁছাতে সুবিধা নাকি হয়। অন্যমত বলছে, মৃত্যুর আধঘণ্টার মধ্যে শবদেহে পচনকার্য শুরু হয়ে যায়। খই হচ্ছে শাদা অর্থাৎ পবিত্রতার শুদ্ধতার প্রতীক। পবিত্রতাকে ছড়াতে ছড়াতে যাওয়া হয়। অনেকটাই মানসিক ব্যাপার। পয়সা হচ্ছে পারের কড়ি। শ্মশানে যাচ্ছি, কিছু দিয়ে যাচ্ছি। কেউ কেউ পয়সা দেখবে বা কুড়াবে। ফলে কুনজর, ঐ পয়সায় প্রতিহত করবে, শবের ওপর অত

জোরালো পড়বে না, ঘুরে যাবে পয়সায় বা খইতে। অনেকেই ঐ পয়সা কুড়িয়ে নিয়ে বাড়িতে বাচ্চার কোমরে দেয়; তাতে নাকি সন্তানের ওপর কারো কুনজর পড়ে না। বিশেষ জ্ঞান বলে, শরীরে তামা ধারণে সুফল আছে। তন্ত্রশাস্ত্রে মেলে যে, শ্মশানের মাটি, নদীর দুই কূলের মাটি ও কবরের মাটি একত্রে মেখে শত্রুবাড়িতে ফেললে নাকি ঝগড়া থামে না, চলতেই থাকে। এরই বা তাৎপর্য কি? আগেরদিনে নদীর কূলে শব পোঁতা হত (অভাগীর স্বর্গ দ্রষ্টব্য)। ফলে মাটি দুর্গন্ধ সেখানে। শ্মশান, কবর ও নদীকূলের মাটি স্বাভাবিক কারণে রোগ-জীবাণুযুক্ত ও দূষিত হবে। মরা জীবজন্তু নদীকূলে ফেলাও হয়। এই মাটি কারো বাড়ি দিলে রোগ-জীবাণু ছড়িয়ে সে বাড়ির লোককে আক্রান্ত করতে পারে। ফলে অশান্তি, তা থেকে ঝগড়া। সুতরাং প্রবীণরা পুরনো যা কিছু বলেন, তার সবই যে কুসংস্কার নয়, একটু ভাবলেই তা পরিষ্কার হয়। পাশেই বারাসাত গ্রামবাসী এক মা তার ছেলেকে মৃত্যুর আগে বলেছিল, দ্যাখ আমি তো খুব কালো। তা আমি মরলে পুড়িয়ে চিতাটা খুব ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিস, পরের জন্মে যদি পরিষ্কার ফর্সা হয়ে জন্মাই। সব কাজই যে পরিষ্কার ক'রে সম্পন্ন করতে হয়, এই বৃদ্ধা পরোক্ষে সেই শিক্ষাই দিলেন। পরিষ্কার করলে তো পরিবেশটাই পরিষ্কার হবে। তাতে শরীর-মনের উজ্জ্বলতা বাড়েই।—সবারই। একদা শ্মশানে শবকে চান করিয়ে চিতায় তুলে মুখের মধ্যে সোনার কুচি ও হাতে রুপো বা তামার পয়সা দেওয়া হত, হয়তো এ নিয়ম এখনো ক্ষেত্র বিশেষে চলে। ডান হাতে সোনার আংটি থাকলে হতাশাজনিত আত্মহত্যার প্রবণতা কমে, খাদ্যের সঙ্গে সোনার গুণ শরীরে নেয়। সোনায় জং পড়ে না, সব সময় চকচকে। শবের মুখবিবরের দুর্গন্ধ কাটাতে তা সাহায্যও করে। শবের পোষাক খুলে দেওয়া হয়, তাতে পয়সায় নজর পড়লে কুচিন্তা সহজে আসছে না, নজর ঘুরে যায়। শবদেহ বাড়ি থেকে বার হলে গোবরজল ছড়ানো হয়। গোবর বহু রোগ-জীবাণুর প্রতিষেধক। তাই, গায় ঘা-পাঁচড়া-চর্মরোগ হলে বৈদ্যরা বলতেন গোয়ালঘরে গড়াগড়ি দিয়ে আসতে। কারণ, সেখানে গোচোনা। মানুষ মরলে চোখে তুলসীপাতা দেওয়া হয়। কারণ, তা বহু রোগের জীবাণু ছড়ানোটাকে প্রতিহত করতে সাহায্য করে। এজন্যে শ্মশানে বট, অশ্বত্থ, পাঁকুড়, যজ্ঞডুমুর, নিম, ইত্যাদি বড় বড় বৃক্ষ থাকে। তুলসীগাছও রাখা হয়। এইসব গাছ প্রচুর প্রচুর অক্সিজেন ছাড়ে। পরন্তু, পাশেই থাকে সাধারণতঃ কোনো নদী। তার জলের বিশুদ্ধ হাওয়া সেখানে বয়। আগে মুমূর্ষুকে তুলসীতলায় শোয়ানো হত, তুলসীর প্রচুর অক্সিজেনের কল্যাণে অনেক ক্ষেত্রে রোগী বেঁচে যেত সে যাত্রায়। শ্মশানেও যে রোগী ক্ষেত্রবিশেষে পুনর্জীবন পেতে পারে, তা অবিশ্বাস্য নয়। রবিঠাকুরের 'জীবিত ও মৃত' গল্পে কাদম্বিনী মরে প্রমাণ করেছিল, সে মরেনি। সেওতো তখনকার মত সেই শ্মশানের কল্যাণে। সুতরাং সে শ্মশানও কেমন হতে পারে, তা ভাববার। সে তাৎপর্য অনুধাবনীয়। শবের বিছানা-বালিশ-কাঁথা—

স৽াই শ্মশানে পুড়িয়ে দিতে হয় রোগ-জীবাণুর ভয়ে। শরৎচন্দ্রের 'লালু'গল্পে দেখেছি, শ্মশানে কলেরা রোগীর লেপের মধ্যে লালু ঢুকে থেকেছে। এই রোগ সংক্রামক, সহজেই ছড়ায়। ছেলেমেয়েরা কি শিখল? লালুর অন্য ব্যবস্থা কি করা যেত না? ঐ যে সংস্কার, শবদেহ ছুঁয়ে থাকতে হয়। সত্যিই কি এটা কুসংস্কার? তখনকার দিনে হিংস্র জন্তুর উৎপাত খুবই ছিল জানি। শবদেহ ছেড়ে গেলে শিয়াল-কুকুরে সহজেই কাছে এসে মুহূর্তের মধ্যেই তা টেনে নিয়ে জঙ্গলে ছিঁড়ে খাবে যে! উঁচু-নিচু-পণ্ডিত-মূর্খ-সকলেরই শেষ পরিণতি সেই শান্তিবনে। শ্মশানকেই বলা হচ্ছে জীবনের শেষ ও শ্রেষ্ঠতীর্থ। সবাই যাতে সুভাবে শ্মশানে যাতায়াত করতে পারে, সবকাজে শ্মশানবন্ধুরা যাতে সমান সহযোগিতা সাহায্য-সুবিধা পায় সে-সব দিকে নজর দিতেই মহাদেবপুর শ্মশান উন্নয়ন কমিটি শুভ উদ্যোগকে দু'হাত তুলে সাধুবাদ জানাতেই হয়।

নির্দেশিকা :

১. Nadia District Gazetter, 1978. ২. Nadia District Census Handbook, 1991 ৩. A Statistical Account of Bengal, W.W Hunter, 1973. ৪. যশোহর খুলনার ইতিহাস, সতীশচন্দ্র মিত্র, ৩-য় সং ১৯৬৩। ৫. বঙ্গীয় শব্দকোষ, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৮ সং। ৬. হরিণঘাটার ইতিকথা, শ্যামপদ মণ্ডল ১৯৯৭। ৭. প্রাচীন দলিল-পরচাদি। ৮. সাক্ষাৎকার : রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, হারান বিশ্বাস, নন্দলাল দাস (মহাদেবপুর), বাসুদেব মণ্ডল (বারাসাত)।

মহরম সৈদ আলে হুসেন খন্দকার, তোপখানাপাতা, শান্তিপুর, ছবি : সাধন দত্ত

◻ লেখক পরিচিতি—গবেষক, গ্রন্থ প্রণেতা, দীনবন্ধু-বিভূতি সাহিত্য সংসদের অন্যতম কর্তা, সম্পাদক আয়ত পত্রিকা।

পুরুলিয়ার শ্মশান চারণা

সুভাষ রায়

শ্মশান গোরস্থানকে নিয়ে কত গল্প গাথা, লোকশ্রুতি, ভূত-পেত্নীর কাহিনী যে ছড়িয়ে আছে সাহিত্যের পাতায় তার শেষ নেই। রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী, শরৎচন্দ্রের লালুর কাহিনী, বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কাহিনী। শ্মশান তীরেই চরিত্রহীন বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের মনে জেগেছে অনুশোচনা। কামান্ধ বিল্বমঙ্গল খুঁজে পেয়েছেন সত্যের সন্ধান। তাই তাকে বলতে শুনি — "সত্য, সকলই মায়া! কই কেউতো আমার আপনার দেখিনি। যার জন্য জলে ঝাঁপ দিলুম, সেত আমার নয়। আর কেউ কি আমার আছে?" এরপরই তাঁর চেতনা আরও গভীর হয়েছে। শ্মশান বক্ষে শবদেহকে দেখে তাঁর স্বগতোক্তি —

এই নবদেহ
জলে ভেসে যায়,
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর শৃগাল,
কিম্বা চিতাভস্ম পবন উড়ায়।
এই নারী এরও এই পরিণাম!
নশ্বর সংসারে,
তবে হায়, প্রাণ দিছি কারে?
কার তরে করি শবে আলিঙ্গন?

(বিল্বমঙ্গল ঠাকুর / গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

পুরলিয়ার কবি সাহিত্যিকরা কেউ কেউ এবিষয়ে লেখার চেষ্টা করেছেন। কবি সুশান্ত কেওড়া রচিত 'শ্মশানের বর্ণমালা' কবিতা এক অমূল্য সম্পদ। আবার কানাইলাল খানের 'শ্মশান ও জিরেন ডোম' কবিতায় উঠে এসেছে হৃদয় স্পর্শী করুণ অনুভূতি। বিশিষ্ট কবি নকুল চট্টোপাধ্যায়ের "শ্মশানের শোক' গল্পে উঠে এসেছে লক্ষ্মণ ডোম ও তার পরিবারের দারিদ্রময় জীবনের বাস্তব চিত্র। মৃত মানুষের ব্যবহৃত পোযাক, পরিচ্ছদ, খাট বিছানা ব্যবহার করে বেঁচে থাকার করুণ কাহিনী। পুরুলিয়ার ঝুমুর গানেও শ্মশানে চিরশান্তি প্রাপ্তির কথা:

রং।। সাজা সাজা সাজা সখি আমায় যতন করে।
হেথায় আমি রইবো না আর যাব আপন ঘরে।।
আমার বুকেতে লেখ কৃষ্ণনাম দে কপালে ফোঁটা।
দেহের বস্ত্র খুলে আমার মাখা হলুদ বাঁটা।।

আর মুখে দিয়ে গঙ্গাজল সবাই হরি হরি বল।
চার জনেতে নিয়ে আমার শ্মশানেতে চল।।

পুরুলিয়ার লোক কথাতেও শ্মশানের প্রসঙ্গ বার বার এসেছে। এরকম একটি লোক কাহিনীর নাম — 'দাঁত গিজিড়া মড়া'।

পুরুলিয়ার নানা জন জাতির বাস। এদের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহের নানা অনুষ্ঠান লোক সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। মৃত্যু সংস্কার গুলো বৈচিত্রময় ও আকর্ষনীয়। অল্প কথায় যা বলা সম্ভব নয়।

পুরুলিয়ার শ্মশান ও কবরস্থান

পুরলিয়ার শ্মশানক্ষেত্র বলতে বোঝায় মূলতঃ নদী তীরবর্তী স্থান, ছোট ছোট নদী বা জোড়, বাঁধ-পুকুর প্রভৃতি। পুরুলিয়া জেলার প্রধান নদনদী মূলতঃ ৭টি — (১) দামোদর, (২) কংসাবতী, (৩) কুমারী, (৪) দ্বারকেশ্বর, (৫) শিলাবতী, (৬) সুবর্ণরেখা, (৭) অড়কষা।

এখন এই নদী তীরবর্তী স্থানগুলিতে কোন কোন গ্রামের শবদাহ করা হয় তার একটি তালিকা দেওয়া হল। তবে তালিকাগুলি যে সম্পূর্ণ তা জোর করে বলা যাবে না।

কংসাবতী

(১) মানবাজার (২) বাঁকডি (৩) চাঁদড়া (৪) ধাধকা (৫) বুধপুর (৬) সিন্দুরপুর (৭) গোপালনগর (৮) বারমাসিয়া (৯) নডিহা (১০) খৈরী (১১) মহেশপুর (১২) দেলাং (১৩) জানি বাইদ (১৪) ধরমপুর (১৫) নিশ্চিন্তিপুর (১৬) করণডি (১৭) বালকডি (১৮) কেশরগড় (১৯) কারুদুবা (২০) চাটুমাদার (২১) কোলডি (২২) পাতাতিরি (২৩) লুকিডি (২৪) পিঁদড়া (২৫) ডুড়কু (২৬) কোটলার (২৭) রামপুর (২৮) সাঁতরা (২৯) তেলিডি (৩০) বেলডি (৩১) হেস্যা (৩২) বীরচালি (৩৩) কাঞ্চনপুর (৩৪) সিরকা বাইদ (৩৫) হারাডি (৩৬) চাকদা (৩৭) রামনগর (৩৮) কুকুরগড়্যা (৩৯) ঝালদা (৪০) টিলো (৪১) গাড়াকুসডা (৪২) রাঙ্গামাটি (৪৩) চিড়কা (৪৪) হেতকাহন (৪৫) তুম্বা (৪৬) জয়পুর (৪৭) বোড়াম (৪৮) ভাটডি (৪৯) মুকুন্দপুর (৫০) উলুগোড়িয়া (৫১) হাড়বা (৫২) পোড়াডি (৫৩) বামনিয়া (৫৪) বেগুনকোদর (৫৫) বাগদা (৫৬) কোটশিলা (৫৭) পানড়া।

দামোদর

(১) বহড়া (২) পারবহাল (৩) সান্তালডি (৪) ওয়াসারি (৫) পোড়াডি (৬) আল্লাডি (৭) ইদর (৮) কামারগোড়া (৯) উপরুডি (১০) চেলিয়ামা (১১) করগালি (১২) তেলকূপি (১৩) কালিপুর (১৪) বেলকুঁড়ি (১৫) শালগোড়া (১৬) তুলসীবাড়ি (১৭) শ্বেতপলাশ (১৮) পাথরবাড়ি (১৯) তারাপুর (২০) বড়রা (২১) জামুয়াডি (২২) গুরুডি (২৩) বামড়রা (২৪) লালপুর (২৫) বকবাড়ি (২৬) রায়বাঁধ (২৭) ভুরকুণ্ডা বাড়ি (২৮) শিমুলিয়া (২৯) কালিপাথর (৩০) ঘাটকুল (৩১) নডিহা (৩২) শালতোড় (৩৩) পারবেলিয়া (৩৪) পুয়াপুর (৩৫) পাঞ্চেৎ (৩৬) নিতুড়িয়া (৩৭) আসনবনি (৩৮) আলকুশা (৩৯) মধুকুণ্ডা (৪০) দামোদর (৪১) বাঘমারা (৪২) সড়বড়ি (৪৩) বড়তোড়্যা (৪৪) রাণীপুর (৪৫) ইনানপুর (৪৬) দীঘা (৪৭) তামুরিয়া (৪৮) হাড়মাগড়া (৪৯) রঘুডি(৫০) রামচন্দ্রপুর (৫১) মুরারডি।

কুমারী

(১) মানপুর (২) জামদা (৩) কুমারী (৪) ধোড়া (৫) উপর বাইদ (৬) পিটিতিরি (৭) বিশরি (৮) মধুপুর (৯) টেটলা (১০) দিঘি (১১) বুন্দিয়া (১২) উকমগড় (১৩) পেঁচাড়া (১৪) বামনি (১৫) ডাহা (১৬) ভালুবাসা (১৭) নলকুন্তি (১৮) সিন্দরি (১৯) কাড়মা (২০) কুদা (২১) মাঝিহিড়া (২২) পুনরু (২৩) ডুমুরডি (২৪) সারগো (২৫) লটপদা (২৬) সড়বেড়িয়া (২৭) রাগমা (২৮) গোউরডি (২৯) গোবিন্দপুর (৩০) গুঁসাইডি (৩১) বনবীর (৩২) মানপুর (৩৩) পুপাপাত্যা (৩৪) তুমড়াশোল (৩৫) তুলমা (৩৬) ভাগবাঁধ (৩৭) রাউতোড়া (৩৮) খড়িদুয়ারা (৩৯) সাগমা (৪০) আদাবনা (৪১) তাকরিয়া (৪২) উরমা (ছোট) (৪৩) উরমা (বড়) (৪৪) দুবরাজপুর (৪৫) সোদপুর (৪৬) কোরাং,(৪৭) বলরামপুর (৪৮) বরাবাজার (৪৯) অযোধ্যা।

শিলাবতী

(১) বড়গ্রাম (২) নপাড়া (৩) দামোদরপুর (৪) শ্যামপুর (৫) কুঁধুড়কা (৬) রামকুঁধি (৭) রাসুডি (৮) বাগদা (৯) কাঞ্চননগর ১(১০) নরেন্দ্রপুর (১১) কানড়া (১২) ভালাগড়া (১৩) গোপালপুর (১৪) বারঘুটু (১৫) জয়নগর (১৬) তকিয়া (১৭) হরিডি (১৮) জয়কাল্লা (১৯) বলগাড়া (২০) ভাগাবাঁধ (২১) লহরিয়া (২২) পোড়াডি (২৩) দেগাঁ (২৪) গুনিয়াদা (২৫) মৌলাডাঙ্গা (২৬) চলকা (২৭) চাটালী বাইদ (২৮) শালই পাহাড়ী (২৯) নাথার ডাইঙ্গ (৩০) বহ্মোত্তর (৩১) শালালপুর (৩২) ব্রাহ্মণ ডিহা (৩৩) চাঁদ বাঁধি (৩৪) পোদলাড়া (৩৫) গোসতড়া (৩৬) দুবরাজপুর (৩৭) ঘটগাঁ (৩৮) ফুলকুসমা (৩৯) কদম দেউলি (৪০) মলিয়ান (৪১) চাঁদড়া (৪২) কালাপাথর (৪৩) জিয়ড়দা (৪৪) কয়া বাইদ (৪৫) বহড়ামুড়ি (৪৬) কেচন্দা (৪৭) নিমডিহা (৪৮) কলামি (৪৯) নিশ্চিন্তিপুর (৫০) বনগোপালপুর (৫১) নেকড় কঁধা (৫২) দে বাইদা (৫৩) বন দেউলি (৫৪) দেউলি।

দ্বারকেশ্বর

(১) চাপড়ি (২) কজরী (৩) সুতাবই (৪) তালাজুড়ি (৫) গৌরাঙ্গডি (৬) ধবাড়ি (৭) গগনাবাইদ (৮) কাশীপুর (৯) পাতপুর (১০) সোনাথলি (১১) ধাতলা (১২) বোদাম (১৩) তিলাবলি (১৪) কালাপাথর (১৫) জীবনপুর (১৬) পাবডা (১৭) লাড়া (১৮) ধানড়া।

সুবর্ণরেখা

(১) আটলা (২) সিমালি (৩) সুইসা (৪) রাঙ্গামাটি (৫) হোপহিড় (৬) তোরাং (৭) খালারি (৮) কুশি (৯) ইলু (১০) ঘুটিয়া (১১) তুলিন (১২) গড়িয়া (১৩) গুরিডি (১৪) বেঙ্গা (১৫) মারু (১৬) জামিখার (১৭) ঝাড়খা (১৮) দুলা (১৯) তুরদাগ (২০) গুরিডি (২১) ডিগারডি।

অড়কষা

(১) রখ্যাড়া (২) ছিরুডি (৩) পাঁড়ুদা (৪) চাঁছি পাথর (৫) পায়রা চালি (৬) আহন্দা, (৭) ভুটার গড়া (৮) চইকা (৯) চন্দনপুর (১০) শিয়ালা (১১) ঢেঙ্গাকেন্দ (১২) আসনবনি (১৩) কাজল কুড়া (১৪) টাঙ্গি লয়দা (১৫) কাঁলা বাসা (১৬) দুবরাজপুর।

উপরোক্ত নদ-নদী বাদে ও পুরুলিয়ার আরো অনেকগুলি ছোট ছোট নদী বা জোড় রয়েছে। যেগুলি আকার আয়তনে ছোট এবং অধিকাংশ গুলিতেই গ্রীষ্মকালে জল থাকে না। এই সব নদীতেও বহু গ্রামের শবদাহ কবা হয়ে থাকে। যে সব থানা গুলি এই নদীগুলেকে শ্মশান হিসেবে ব্যবহার করে বা মৃত ব্যক্তির সৎকার করে সেগুলির নাম নিচে প্রদত্ত হল —

ছোট নদী বা জোড়	*থানা*
(১) লেঙ্গ সাই (২) হনুমতি	বরাবাজার
(৩) বেকো	কাশীপুর
(৪) উত্‌লা	নিতুড়িয়া।
(৫) পাঁড়গা	জয়পুর
(৬) শালদা (৭) রূপাই	ঝালদা থানা
(৮) বান্দু (৯) পাতলুই	আড়ষা
(১০) চাকা (১১) জাম	মানবাজার
(১২) কাররু (১৩) শোভা (১৪) কুদলুং (১৫) শাখা	বাঘ মুণ্ডি
(১৬) তসের কুয়া (১৭) কদমদহা (১৮) হাড়াই (১৯) গোয়াই	পাড়া
(২০) পাতলুই (২১) তারা	পুরুলিয়া মফঃ
(২২) সোনা নদী	বরাবাজার
(২৩) বান্দা, কাড়া পঁচা	রঘুনাথপুর ২নং
(২৪) ডাংরা	কাশীপুর থানা

পুরুলিয়ার কবরস্থান

পুরুলিয়ার প্রতিটি মুসলিম প্রধান গ্রামেই রয়েছে কবরস্থান। সেগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গ্রামের জনবসতি থেকে একটু দূরে অবস্থিত। জেলার যে সব গ্রামে কবরস্থান রয়েছে তার একটি মোটামুটি তালিকা নীচে দেওয়া হল —

(১) জামা (২) হদলা (৩) শ্বেতপলাশ (৪) তালটাঁড় (৫) উশিড় (৬) সগড়কা (৭) বামড়রা (৮) ডুমুরডি (৯) রানীপুর (১০) দুবড়া (১১) পাড়া (১২) কাঁকি বাজারা (১৩) কাকডিহা (১৪) গুড় গুড়িয়া (১৫) হরিহরপুর (১৬) থাকুইডি (১৭) রিগুডি (১৮) ভাঁওরিডি (১৯) চাপুড়ি (২০) গোপীনাথপুর (২১) নূতনডি (২২) রঘুনাথপুর (২৩) আদ্র (২৪) কাঁটা রাঙ্গুনি (২৫) মাড়রা (২৬) ডাবর (২৭) রাঘবপুর (২৮) কসাই মহল্লা (২৯) পালঞ্জা (৩০) তেলকল পাড়া (৩১) পাটপুর (৩২) বাথানবাড়ি (৩৩) চৈনপুর (৩৪)

চৌকুনিয়া (৩৫) নূতনডি (৩৬) কলাগাড়া (৩৭) জাড়বেড়া (৩৮) হুড়রা (৩৯) তেঁতুল দাগ (৪০) লিপানিয়া (৪১) দুবরাজপুর (৪২) ফতেপুর (৪৩) ইনান পুর (৪৪) হেটডি (৪৫) গোড়াবাড়ি (৪৬) মুরুনিয়া (৪৭) পাঁড়কা (৪৮) সুকলিযা (৪৯) নডিহা (৫০) চালকা (৫১) বহড়া (৫২) ভেলাটাঁড় (৫৩) তদগ্রাম (৫৪) বেলকুঁড়া (৫৫) কালিদহ (৫৬) বাবির ডি (৫৭) কুলডি (৫৮) মেট্যাল শহব (৫৯) দেউলি (৬০) কুকুর ডাঙ্গা (৬১) পারবহাল (৬২) মনিহারা (৬৩) কিনি সায়ের (৬৪) কাশিপুব (শিকারী মহল্লা) (৬৫) আল্লাবহাল (৬৬) দক্ষিণ বহাল (৬৭) দুমদুমি (৬৮) বাইকাটা (৬৯) কাল্লা (৭০) কানড়া (৭১) কুলগড়া (৭২) ধ গড়া (৭৩) মানবাজার (৭৪) ধ-বাজার (৭৫) রসুলপুর (৭৬) ববা বাজার (৭৭) সিদুরপুর (৭৮) বাগাল্যা (৭৯) খাদকি (৮০) সরবেরিয়া (৮১) পড়াশ্যা (৮২) গোপালপুর।

পুরুলিয়ার শ্মশান সাধক

বহু মহান ব্যক্তির জন্মভূমি এই পুরুলিয়া। স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী, ঋষি নিবারণ চন্দ্র ঘোষ, রামেশ্বর সিং, লাবণ্যপ্রভা দেবী, মনোহর দাস. দেবী দাস, রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলি, গদাধর চৌধুরী, জ্যোতি প্রসাদ সিংদেও, নীলমণি সিংদেও প্রমুখ মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবে পুরুলিয়ার মাটি ধন্য। আবাব বেশ কিছু মনীষী অন্য জেলা থেকে এখানে এসে স্থায়ী ভাবে সাধন ভজন করে গেছেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখানেই কাটিয়ে গেছেন। এমনই দুইজন মহান ব্যক্তি স্বামী তপানন্দ এবং শোভারাম ব্যানার্জী। এই সব মহান ব্যক্তিরা একাধারে যেমন দেশপ্রেমী অন্যদিকে তেমনি মহান সাধক। তবে সকলেই যে তন্ত্র সাধক তা নয়। মনোহর দাস, স্বামী তপানন্দ, শোভারাম ব্যানার্জী প্রমুখ ব্যক্তিরা শ্মশান সাধনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। এবং সেই সব সাধনক্ষেত্র পুরুলিয়ার বুকে আজও বর্তমান। নিচে এই তিন সাধক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

মনোহর দাস — জন্ম ১৩০৩ সালের ৬ই শ্রাবণ। পুরুলিয়ার শোনাথলি গ্রামে। পিতা- নিকুঞ্জদাস ঠাকুর. মাতা- নিশদা দেবী। মনোহর দাসরা ছিলেন জাতিতে বৈষ্ণব। আনুমানিক ৩০০ বৎসর পূর্বে তাঁর পূর্ব পুরুষ রামদাস ঠাকুর সস্ত্রীক বৃন্দাবন থেকে শোনাথলি গ্রামে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। ছোটবেলা থেকেই মনোহর দাসের মধ্যে ঐশ্বরিক ভাবনার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে মাটি দিয়ে তিনি প্রায়ই রাধা-কৃষ্ণ, কালী, শিব প্রভৃতি তৈরী করতেন এবং পুজো করতেন। ছোটবেলায় তাঁর ডাক-নাম ছিল নাড়ুগোপাল। গ্রামের পাঠশালার পাঠ সমাপন করে তিনি ভর্তি হন পুরুলিয়ার ভিক্টোরিয়া হাই স্কুলে। স্কুলে পাঠরত অবস্থাতেই তাঁর মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা দিত দিব্যোন্মাদ অবস্থা। প্রায় পড়ার খাতায় গান লিখে রাখতেন। একদিন বিদ্যালয়েই তাঁর দিব্যোন্মাদ অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে তাঁকে বিদ্যালয়ে আর রাখলেন না। এরপর তিনি আর পড়াশোনা করেননি। এরপর মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বাড়ির লোক তাঁর বিয়ের বন্দোবস্ত করেন। ১৩২২ সালে মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় রামপুর নিবাসী বিহারীদাস এবং চন্দ্রাবলী দেবীর প্রথম মেয়ে গৌরীর সঙ্গে। বিবাহের পরেও তিনি

পূর্বাবস্থায় থেকে যান। মাঝে মাঝেই দিব্যোন্মাদ অবস্থা দেখা দিতে থাকে। ঈশ্বর ভাবনায় দিন রাত কাটতে থাকে। এরপর হঠাৎই তিনি অর্শ রোগে আক্রান্ত হন। অনেক ডাক্তার কবিরাজের দ্বারস্থ হন। কিন্তু কোন ফল পেলেন না। অবশেষে কাশীপুর নিবাসী প্রখ্যাত সাধক যাদবানন্দ স্বামীর চিকিৎসায় তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন। তাঁর কাছেই সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখনও তাঁর মন স্থির হয় নি। নতুন গুরুর কথা ভাবতে থাকেন। সংসারের মায়া মমতা ছিন্ন করে একাকীত্ব জীবন যাপন করার কথা ভাবতে থাকেন। এমতাবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ঘটে স্বামী সদানন্দের সাথে। স্বামী সদানন্দ 'শ্রীশ্রী বুড়া বাবা' নামেই সর্ব সাধারণের কাছে পরিচিত ছিলেন। যাইহোক ১৩৩০ সালের ২৭শে চৈত্র ২৭ বৎসর বয়সে তিনি সংসারের সমস্ত মোহ ত্যাগ করে স্বামী সদানন্দের কাছে নিজেকে সমর্পন করেন। এবং সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হন। তখন তাঁর নাম হয় বিরজানন্দ ভারতী। সোনাথলির শিব মন্দিরে, শিয়াদার শিব মন্দিরে এবং নানাস্থানে তিনি তন্ত্র সাধনা করেন। অমাবস্যার রাতে দ্বারকেশ্বর নদী তীরে মহাশ্মশানে তিনি প্রায়ই সাধনা করতেন। এই সব সাধানার প্রেক্ষাপটে তিনি 'তন্ত্র সাধনা' ও 'রাজযোগ সাধনা' মানে ২টি গ্রন্থ রচনা করেন। যা সাধক সমাজে আও সমান জনপ্রিয়। এছাড়াও অজস্র ঝুমুর, বাউল, শ্যামাসঙ্গীত তিনি রচনা করেছেন। তিনি পুরুলিয়ার বুকে মনোহর ক্ষ্যাপা, দীন মনোহর, সদানন্দ, সদাই প্রভৃতি নামে পরিচিত। তবে মনোহর ক্ষ্যাপাই নামটিই সর্বজন বিদিত। সকলেই এক ডাকে চেনেন।

তাঁকে কেন্দ্র করে মানভূমে অজস্র কিংবদন্তী আজও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কথিত আছে একদিন ঘোর অমাবস্যার রাতে তিনি যখন শ্মশান সাধনার উদ্দেশ্যে বিছানা ছেড়ে পথে বাহির হন তখন তাঁর স্ত্রীর মনে সন্দেহ জাগে এবং তাঁর পিছু পিছু যেতে থাকেন। কিছুদূর যাবার পর ম নাহর দাসের কানে তাঁর পদশব্দ ধরা পড়ে। কোন ব্যক্তি তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর দিকে আসছে এই ভেবে তিনি পেছনের দিকে তাকান। তাকিয়েই দেখতে পান এক স্ত্রী মূর্তি তাঁর দিকেই হেঁটে আসছে। তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সেই স্ত্রীলোকটির গলা চেপে ধরেন এবং শ্বাসরোধ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। স্ত্রীলোকটি রাস্তায় পড়ে থাকে। তিনি নদীতীরে শ্মশানে সাধনায় মনোনিবেশ করেন। সূর্যোদয় হলে তাঁর সাধনা সম্পন্ন হয়। তিনি সেই রাত্রেই সিদ্ধিলাভ করেন। মহানন্দে গৃহাভিমুখে ফিরতে থাকেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ে এক মহিলা মৃত অবস্থায় পড়ে আছে রাস্তার পাশে। তিনি তাকিয়ে দেখেন। তৎক্ষণাৎ চিনতে পারে স্বয়ং তাঁর স্ত্রী। অতঃপর তাঁর মনে পড়ে যায় পূর্বরাত্রের ঘটনা।

আরেকটি কিংবদন্তী আজও লোকমুখে শোনা যায় প্রতি অমাবস্যায় তিনি নাকি একটি করে ক্ষুদ্রাকৃতির মাটির কালী মূর্তি নির্মাণ করতেন। রাতে পূজা পাঠ সমাপন করে পরদিন প্রাতে মাটির মূর্তিটি কামড়ে খেতে খেতে নদী তীরে হাজির হতেন। যখন তিনি নদী তীরে পৌঁছতেন তখন মূর্তিটি প্রায় শেষ হয়ে যেত। একটি অতি প্রচলিত শ্যামাসঙ্গীত 'এবার কালী তোমায় খাব' এ প্রসঙ্গে সহজেই মনে ভেসে ওঠে।

শোভারাম ব্যানার্জী — পুরুলিয়ার একটি ছোট গ্রাম মৌতড়। এই গ্রামের কালীপূজা সারা পঃবঙ্গে বিখ্যাত। কার্তিক মাসের কালীপূজায় কয়ে হাজার পাঁঠা, ভেড়া এবং মহিষ

আজও বলি হয়ে থাকে। তাছাড়া নিত্য পূজাতেও প্রতিদিন ৮-—১০টি পাঁঠা বলি হয়ে থাকে। কার্তিক মাসের পূজায় রক্তের ধারা বইতে থাকে। একটি নালা কেটে সেই রক্তকে ফেলা হয় একটি নিকটবর্তী পুকুরে। এই মৌতড়ের বড়কালীর প্রতিষ্ঠাতা হলেন শোভারাম ব্যানার্জী। তাঁর আদি নিবাস বর্ধমান জেলায়। মৌতড়ের যে বিখ্যাত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের পরিবার রয়েছে সেই পরিবারের জামাই ছিলেন শোভারাম ব্যানার্জী। তিনি ঘর জামাই হিসেবেই মৌতড়ে স্থায়ী ভাবে থেকে যান। শোভারাম সংসারী হলেও গৃহে তার মন টিকত না। তিনি অধিকাংশ সময় বনে, জঙ্গলে, শ্মশানে ঘুরে বেড়াতেন। নিকটবর্তী বাজার জোড়ের শ্মশান বা তুলসীবাড়ীর শ্মশানে ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। তিনি সব সময় ঘুরে বেড়তেন আর বিড় বিড় করে কি সব বকতেন। অন্ধকারে শব যাত্রীরা তাঁকে অনেকে ভূত ভেবে ভয়ও পেত। আবার বাড়িতে যখন থাকতেন তখন সম্পূর্ণ আলাদা এক মানুষ। একদম নিশ্চুপ ও গম্ভীর। তাঁর এই আচার আচরণ বাড়ির লোকের গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। সেই জন্য তাঁকে কেউ কোন কথা বলত না। শ্মশানে ঘুরে ফিরে তিনি পঞ্চমুণ্ডী আসনের মুণ্ডগুলি সংগ্রহ করেন এবং বর্তমানে যে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে স্থাপন করেন। এই পাঁচটি মুণ্ড হল — কুকুর, শিয়াল, সাপ, নর, বানর। এখনও নাকি এই ৫টি মুণ্ড মৌতড়ের কালীমন্দিরের মাটির নীচে আছে। মৌতড়ে এখনও একটি কিংবদন্তী শোনা যায়। একদিন শোভারাম শ্মশানে বিচরণ করতে করতে হঠাৎ দেখতে পেলেন দূরে একটি আলোর রেখা। রেখাটি অতি স্বচ্ছ। সেটি মাটি থেকে আকাশে খাড়া ভাবে অবস্থান করছে। শোভারাম সেই আলোর রেখা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। একটা অদ্ভুত আনন্দ তাঁর মনে জেগে উঠল। তাঁর মনে বার বার প্রশ্ন জাগতে লাগল এই আলো এলো কোথা থেকে? এর উৎপত্তিই বা কোথায়? তিনি উন্মাদের মতো সেই আলোকে লক্ষ্য করে ছুটতে আরম্ভ করলেন। ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলেন গ্রামের দক্ষিণে শেষ প্রান্তে। দেখা গেল একটা মাটির ঢিবির মতো জায়গা থেকে গাছ-পালার ভেতর থেকে সেই আলোর জ্যোতিটা বেরিয়ে আসছে। গাছ পালা গুলোকে সরিয়ে সেই জ্যোতিটার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর সমগ্র শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর হৃদয় সব কিছু পাওয়ার একটা আনন্দ বোধ যেন জেগে উঠল তাঁর মনে। তিনি সেখানেই ধ্যান মগ্ন হয়ে পড়লেন। বর্তমানে এই স্থানটিই মৌতড় বড় কালী মন্দির।

স্বামী তপানন্দ মহারাজ—শৈশবে নাম ছিল বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। জন্মস্থান বর্ধমান জেলার মানকর। পিতার নাম—নন্দকুমার, মাতা—হরমোহিনী দেবী। মা ও বাবা দুজনেই আধ্যাত্মিক মার্গের হওয়ায় ছোটবেলা থেকেই বিশ্বেশ্বরের মনে আধ্যাত্মিক ভাবনা জাগ্রত হয়। মানকরেই প্রাথমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করে কলেজে পড়াশোনা করতে থাকেন। পারজ নিবাসী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে প্রবাসিনী দেবীর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পরেও তাঁর মনে আধ্যাত্মিক চেতনা তীব্র ভাবে জাগ্রত থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই মা সারদা দেবীর সংস্পর্শে তিনি আসেন। এবং তাঁর কাছেই দীক্ষা নেন। মা সারদার মৃত্যু হল তিনি সংসার পরিত্যাগ

করে চলে আসেন পুরুলিয়ার বাগ্দা গ্রামে। মনকে স্থির করা ও শান্তি ভাবই ছিল এই খানে অবস্থানের উদ্দেশ্য। জপ, তপ, ধ্যান নিয়েই তিনি সময় কাটাতেন। মাঝে মধ্যে জয়রাম বাটিও যেতেন। বেশ কিছুদিনের ন্য বৃন্দাবনেও যান। এরপর বেলুড় মঠে বেশ কিছুদিন বসবাস করেন। বেলুড়ে থাকা কালীন তিনি প্রায়ই ছুটে আসতেন বাগ্দা গ্রামে। ১৯২০তে তিনি স্বামী বিভানন্দর কাছে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা নেন। দীক্ষা নেবার পর তাঁর নাম হয় স্বামী তপানন্দ। এরপর তিনি বেশ কিছুদিন কাটান হুটমুড়ায় এবং বাঁকুড়ার হাট গ্রামে। পরে পুরুলিয়া শহরের ললিত মোহন মিত্রেব বাগান বাড়ির পাশে একটি ঘরে থাকতেন সেখানে বেশ কিছুদিন থেকে চলে আসেন কেতিকায়। সেখানে একাকীত্ব জীবন যাপন করতেন তিনি। এখানে অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন কেতিকা গ্রামেই প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীরামকৃষ্ণ তারক মঠ আশ্রম। প্রতিষ্ঠাকাল ১৩৪২ বঙ্গাব্দ। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও মা সারদার ভাবাদর্শে আশ্রম পরিচালনা করতে থাকেন তিনি। মানুষের সেবা করাই ছিল আশ্রমের মূল উদ্দেশ্য। তিনি অনেক গান ও গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। 'মুক্তি' পত্রিকার তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখক। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি আশ্রমের দায়িত্বভার তুলে দিয়ে যান স্বামী ত্র্যক্ষরানন্দ মহারাজকে। তিনি স্বামী তপানন্দের সুযোগ্য শিষ্য।

স্বামী তপানন্দ তাঁর স্বরচিত "আত্মকথা" গ্রন্থে তাঁর ব্যক্তি জীবনের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। জীবনের বহু অভিজ্ঞতা, মা সারদার সঙ্গে সঙ্গলাভ, ছাত্র জীবন, গার্হস্থ্য জীবন, সংসার ত্যাগ, স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান, সাধন জীবন প্রভৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ১৯১০-১১ সালের মধ্যে স্বামী তপানন্দের মাতৃবিয়োগ হয়। এরপর মনেও শান্তি লাভের জন্য তিনি পুরুলিয়ায় এসে পৌঁছান। সেখানে তাঁর ছোট মামা রামলাল ব্যানার্জী থাকতেন। মাতুলালয়ে দুই তিন দিন থেকে তিনি পুরুলিয়া টাউনের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত পুরুলিয়া গ্রামের একটি ছোট্ট নদী তীরে যে মহাস্মশান আছে সেটি দেখতে যান এবং সেখানে বেশ কয়েকদিন শ্মশান সাধনা করেন। সেই মহাশ্মশানের বর্ণনা, সাধনা প্রসঙ্গ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন 'আত্মকথা' গ্রন্থটিতে এখানে তার কিছু অংশ তুলে ধরলাম —

"এই শ্মশানে নিবারণ নামে একজন তান্ত্রিক ব্রহ্মচারী থাকিতেন। তখনকার দিনে এই শ্মশানটি অতি নির্জন ছিল, চারিপাশে আধ মাইলের ভিতর কোনও গৃহস্থ ঘর ছিল না। মায়ের মন্দির টন্দির তেমন কিছুই ছিল না। একটি মাঝারি একতলা বাড়ীর একধারে উচ্চ বেদীর উপর মার মূর্তি। তার নীচে একটি গুহা, সামনের দিকে গোটা দুই সিঁড়ি, একটি ছোট দুয়ার। গুহার ভিতর গুটি পাঁচেক নরমুণ্ড। বসিলে মার মূর্তিটি ঠিক মাথার উপরে থাকে। পিছন দিকে বাহির হইতে গুহায় ঢুকিবার জন্য ছোট একটি দুয়ার, গুড়ি মারিয়া ঢুকিতে হয়। ঘরটির মধ্যভাগে মার বেদীর কাছে হাত দু-তিন ছোট একটি দেয়াল দিয়া ভাগ করা যার। বাম ভাগে সাধুসন্ত থাকিবার জন্য।

সিংভূম জেলার সরাইকেল্লা (Political State-এর) জনৈক জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত তান্ত্রিক কালীভক্ত ব্রাহ্মণ এই কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যথাবিধি মুণ্ডাসনাদি কিছু সংস্কার করিয়া

প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। কয়টি মুণ্ড লইয়া আসিয়া সিন্দুর মাখাইয়া রাখা হইযাছে মাত্র। যিনি আছেন এই নিবারণ ব্রহ্মচারী, তন্ত্রে পূজাদির বিধি কিছুই জানেন না বলিয়া মনে হইল। দিবা ভাগে গাঁজা, সিদ্ধি ও রাত্রে পান অর্থাৎ মদ্য খুবই চালান।

* * *

প্রতি রাত্রে শিবাবলি অর্থাৎ শিবাগণের সমিযান্ন খাইতে দেওয়া হইত বলিয়া শিবাদের বড় উপদ্রব ছিল এখানে। অন্যদিকে কিছু দূরেই মরা ছেলেদিগকে পোঁতা হইত, গর্ত থেকে বাহির করিয়া শিবারা সেই সব ছিঁড়িয়া খাইত আর মাঝে মাঝে কেউ কেউ খ্যাঁক খ্যাঁক খ্যাঁক চিৎকার করিয়া রাত্রের শ্মশানের ভীষণতাকে আরও ভীষণতর করিয়া তুলিত। আমি এই শ্মশানে আসিয়া কুয়ার জল তুলিয়া হাত পা ধুইলাম, তারপর সর্বাগ্রে মাকে প্রণাম করিয়া এই ব্রহ্মচারীর কাছে বসিলাম।

প্রথমেই ব্রহ্মচারী আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর বলিলেন — "এখানে রাত্রে একলা থাকতে পারিস?" আমি বলিলাম "আপনি তো থাকেন? তবে আমি পারব না কেন?" আমি কিন্তু ইতঃপূর্বে জীবনে কখনও এই রূপ ভীষণ শ্মশানে সমস্ত রাত্রি একলা কাটাই নাই। ব্রহ্মচারী বলিলেন "তবে থাক আজ এখানে রাত্রে।" আমি বলিলাম — "বেশ। থাকি।"

* * *

নির্জন শ্মশান, তাহাতে আবার কালীমূর্তির সম্মুখে একাকী বসিযা জীবনে এই রূপ থাকা এই সর্বপ্রথম। বড়ই ভয় হইল, গাটি শিহরিয়া উঠিল। তখনই আবার বিবেক জাগ্রত হইয়া এই ভয়ের জন্য মনকে ধিক্কার দিতে লাগিল — "ছিঃ! ধিক্ তোকে! তুই এই মন নিয়ে চাস মাকে দেখতে? কেন তবে ঘর থেকে বেরিয়ে এলি?" মন লজ্জিত হইল, আবার পূর্ববৎ রূদ্রচণ্ডী পড়ায় নিবিষ্ট হইল। আবার আসিল সেই শিবাটি, শুনিতে বসিল আমার রূদ্রচণ্ডী। আবার ভয় হইল, মন হইল চঞ্চল। শিবাটি উঠিয়া চলিয়া গেল। এই রূপ যতবার পড়ি, শিবাটি শুনিতে বসে, এবং যতবার ভয়ে চঞ্চল হই, শিবাটিও উঠিয়া চলিয়া যায়।

এই রূপে কোনও রকমে পড়া শেষ করিলাম। দিলাম সব দুয়ার গুলি বন্ধ করিয়া। শ্মশানের ঘর, দুয়ার দিলে কি হইবে? দুয়ার গুলিতে বড় বড় ফুটা। বসিলাম জপ করিতে। যেই জপ আরম্ভ করি অমনি সেই শিবা আসয়িা কোলে বসে। এতো বড় বিপদ হইল দেখি, বড়ই শিবার দৌরাত্ম্য। কি করি? মার ঘরটি ছাড়িয়া পাশের শোবার অংশটিতে যেখানে বিছানা ছিল সেখানে গেলাম। বসিলাম জপ করিতে। আবার সেই শিবাটি আসিল কোলে বসিতে। বড়ই ভয় করিতে লাগিল, পড়িলাম মুস্কিলে। এক একবার মনে হইতে লাগিল পালাই এখান হইতে। আবার মনে হইল, প্রতিশ্রুত হইয়াছি এখানে থাকিতে, ভার লইযাছি এখানকার রক্ষনাবেক্ষণের। এখন যদি পালাই, তাহা হইলে সত্যভ্রষ্ট ও ধর্ম ভ্রষ্ট হইব এবং তাহা হইলেই ভূতভৈরবরা করিবে অনিষ্ট। নতুবা যতক্ষণ পর্যন্ত না ধর্মভ্রষ্ট হইব, তাহারা কিছুই করিতে পারিবে না।

দুয়ার বন্ধ করায় প্রাণটা কেমন ছটফট করিতে লাগিল। দিলাম সব দুয়ার খুলিয়া, কিন্তু ভয় আর কিছুতে যায় না। শেষে মনে দৃঢ় সংকল্প করিয়া, এই ভয়ের কাবণ, সেই মহাশ্মশান, সেইখানেই গেলাম এই বলিয়া—"চল শালা মন। তোরই একদিন কি আমারই একদিন! যে শ্মশানের ভয়ে তুই এত চঞ্চল হয়েছিস, চল সেই শ্মশানেই যাব। দেখি তুই কি করিস!" এই বলিয়া শ্মশানে চিতা শ্রেণীর মধ্যস্থলে যাইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম।

চাঁদ উঠিয়াছিল। কৃষ্ণপক্ষের মাঝামাঝি সময়। চাঁদের আলোকে চারিধারে চিতাগুলি দেখিলাম—মানুষের দেহের শেষ পরিণতি, যে দেহে কত বিদ্যার অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, পদের অহঙ্কার, রূপের অহঙ্কার, যৌবনের, বলের, আভিজাত্যের অহঙ্কার—সব চূর্ণ এই খানে; সকলের সমান গতি। সবশেষ অবশিষ্ট কতকগুলি ভস্ম ও অস্থি। তাই বৈরাগ্য উদ্দীপিত হইয়া হৃদয়ের সমস্ত মলিনতাকে চিতার আগুনের মত ভস্মীভূত ও অহঙ্কার চূর্ণ করে বলিয়াই তন্ত্রে এই শ্মশানকে সাধনার শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে।"

পুরুলিয়ার এই তিন শ্মশান সাধক বাদে ও আরো কয়েকজন শ্মশান সাধকের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন কালী কিংকর চক্রবর্তী, বাণীবাবা, জগদীশ পাণ্ডে প্রমুখ। কালীকিংকর চক্রবর্ত্তী চেলিয়ামা গ্রামের নিকটস্থ বান্দার জোড়ে বা ছোট নদীর তীরে বিরাট আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নদীতীরস্থ শ্মশানে প্রায়ই শ্মশান সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। তিনি ছিলেন স্বাবলম্বী সাধক, নিজেই চাষাবাদ করতেন, তাছাড়া গুঁড়ো মশলা তৈরী করতেন এবং নামেমাত্র মূল্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। এর থেকে যা উপার্জন হত তাই দিয়ে জীবন নির্বাহ করতেন। এই নদীতীরস্থ স্থানে তিনি বেশিদিন থাকতে পারেন নি। চোর-ডাকাতের উপদ্রবে তাঁকে অন্যত্র চলে যেতে হয়। তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করেন চেলিয়ামা গ্রামেরই নিকটস্থ উপরডি গ্রামে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি মানব সেবায় নিজেকে নিযুক্ত বেখেছিলেন।

পুরুলিয়ার আরেকজন শ্মশান সাধক বাণী বাবা। তাঁর আসল মান নিবারণ চন্দ্র বিশ্বাস। আদি নিবাস মৌতড় গ্রামে। তবে রুবানী নামের একটি ছোট্ট গ্রামে রুকনী গড়্যার শ্মশানে তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ছিলেন কালী সাধাক। প্রতি অমাবস্যার রাতে জাঁক জমক সহকারে তিনি কালীপুজো করতেন। বহু স্থানীয় মানুষের সমাগম হত। অনেক দীক্ষিত শিষ্যও তাঁর ছিল এবং বর্তমানেও আছে। তিনিও জোড়ের ধারে চিতার ওপরে প্রায় অমাবস্যাতেই শ্মশান সাধনায় নিমগ্ন হতেন। তাঁকে ঘিরেও রয়েছে অনেক কিংবদন্তী। একবার অমাবস্যার রাতে তিনি শিষ্যদের নিয়ে গঞ্জিকা সেবনে মগ্ন ছিলেন হঠাৎ তাঁর শিষ্যরা দেখতে পান তাদের গুরু বাণীবাবা আড্ডায় নেই। কোথাও উধাও হয়ে গেছে। খুঁজতে খুঁজতে দেখে গেল তিনি শ্মশানের একটি নির্জন স্থানে ধ্যান মগ্ন হয়ে আছেন। যাই হোক বাণী বাবা বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। তিনি হঠাৎই একদিন দুবৃত্তদের হাতে খুন হন।

পুরুলিয়ার জেলার সাঁওতালডির নিকটস্থ পোড়াডি গ্রামের একজন শ্মশান সাধকের নাম পাওয়া যায় ভাগবত পরামানিক রচিত "শ্রীশ্রী মৎ স্বামী উত্তমানন্দ পরমহংসদেব (রামেশ্বর সিং) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী" গ্রন্থে। তিনি হলেন জগদীশ পাণ্ডে। সেখানে আছে 'ইনি একজন

তান্ত্রিক কালী সাধক। নিজ গ্রামের পশ্চিম সীমান্তে গোয়াই নদীর তীরে একটি শ্মশান কালীর মন্দির স্থাপন করেন।" জগদীশ পাণ্ডের মৃত্যুর পর কালীমন্দিরের রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব নেন সুবোধ গঁরাই। তিনি অদ্যাবধি মন্দিরে পূজা, পাঠ, নামকীর্তন প্রভৃতিতে নিযুক্ত আছেন। এই মন্দিরে স্বামী উত্তমানন্দ পরমহংসদেব প্রায়ই আসতেন। তাঁর আগমনে মন্দিরে প্রচুর ভক্ত সমাগম হত। গান বাজনার আয়োজন হত। গঙ্গাধর মাহাত, বুধু কুম্ভকার ছিলেন বিখ্যাত গায়ক। স্বামীজী নিজেও গান গাইতেন। কখনো বা বাঁশি বাজাতেন।

এই রকম আরো অনেক শ্মশান সাধকের নাম পুরুলিয়ার গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে আছে তাঁদের কথা কোথাও লেখা হয় নি। এব্যাপারে বৃহৎ ক্ষেত্র সমীক্ষার প্রয়োজন।

বীরস্তম্ভ এবং সতীস্তম্ভ

পুরুলিয়ার গুরুত্বপূর্ণ প্রত্ন নিদর্শন হল বীরস্তম্ভ বা Megalith। এগুলি আসলে সমাধি প্রস্তর। নব্যপ্রস্তর যুগে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল মৃতদেহের ওপরে বিরাট আকৃতির পাথর সাজিয়ে স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ। হয়তো মৃতব্যক্তির সমাধিকে চিহ্নিত করা জন্য এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। পরবর্তী কালে এই রীতি ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, ফ্রান্স, স্কেনডিনেভিয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে এবং নূতনত্ব পরিলক্ষিত হতে থাকে। এই ধবণের স্মৃতি স্তম্ভ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত যেমন —Giants tomb, Dolmen, Mennir ইত্যাদি ইস্টার দ্বীপে যে স্মতি স্তম্ভ চোখে পড়ে তার সঙ্গে পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার মিল রয়েছে। পুরুলিয়ার হো, মুণ্ডা, ভূমিজ, সর্দার প্রভৃতি জাতির বীর যোদ্ধারা যখন কোন যুদ্ধে নিহত হতেন তখন তাঁর স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানাতে এবং তাঁকে মনে রাখার জন্য তার সমাধিতে এই ধরণের স্তম্ভ নির্মাণ করা হত। বর্তমানেও এই সব জাতি গুলির মধ্যেও মৃতদেহ সৎকার হিসেবে দাহ ও সমাধি দুটি রীতিই প্রচলিত আছে। তবে অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়ে থাকে।

বীরস্তম্ভগুলি তৈরী হয় লম্বা পাথরের ফলকের ওপরে খোদাই করে। রিলিফ পদ্ধতিতে খোদাই করা হয় মানুষের মূর্তি। মূর্তিটির হাতে থাকে ঢাল, তলোয়ার, ধনুক, তীর। অতীতে পাথরের উপরে মানুষের মূর্তি খোদিত হত না। পরবর্তীকালে খোদিত হয়। মূর্তির ওপরে সিংহ বা বাঘের মূর্তিও খোদাই করা হয় থাকে। আমাদের ভারতে আর্যরা আসার আগেই এই ধরণের স্মৃতি ফলক বা সমাধি প্রস্তর তৈরী করা হত। তবে সবারই যে হত তা নয়। গোষ্ঠীপতি, সর্দার বা বীর যোদ্ধার মৃত্যুতেই তৈরী হত। এই সব স্মৃতি প্রস্তর প্রতিষ্ঠিত হত সাধারণতঃ পুকুরপাড়ে, কোন বৃহৎ গাছের নীচে, গাঁয়ের মাথায় যেখানে মৃতদেহকে পুঁতে রাখা হত।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই বীরস্তম্ভ দেখা যায় যেমন নীলগিরি পর্বতের কুড়ম্বা আদিবাসীদের মধ্যেও এর প্রচলন রয়েছে। তাঁরা এগুলিকে বলে থাকেন 'বীরকল্লু'। যার অর্থ বীরদের স্মৃতি ফলক। ছোনাগপুরেও হো ও মুণ্ডাদের মধ্যে দেখা যায় বাঁকুড়ার ছাতনার কামারকুলির বটতলায় তিনটি বীরস্তম্ভ রয়েছে। দুটি মূর্তির বাঁ হাতে ঢাল ও ডান হাতে বড় তরোয়াল।

মাঝের মূর্তিটির বাঁ হাতে ধনুক ডান হাতে তীর। ইদপুর থানার বাজোড়া গ্রামের দেখা যায় ঘোড়ার লাগাম হাতে ধাবমান অশ্বারোহীর খোদিত বিরাট মূর্তি। মাথায় সিংহ খোদিত ছিল। বর্তমানে ভগ্ন। গঙ্গাজল ঘাঁটির থুমকোড়া গ্রামের পুকুর ধারে গোল স্তম্ভ আকৃতির অনেকগুলি প্রস্তর খণ্ড ছড়িয়ে আছে। স্তম্ভ গুলির গায়ে খোদিত রয়েছে যোদ্ধাদের মূর্তি। মূর্তিগুলি নানা ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট। ইন্দপুরে যে 'বরকনে' পাথর চোখে পড়ে তা অনুমান বীরস্তম্ভ।

পুরুলিয়ার ও বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে আছে অজস্র বীরস্তম্ভ। এগুলি নিয়ে অদ্যাবধি তেমন কোন লেখালেখি হয়নি। জেলার নিতুড়িয়া থানার মদনডি গ্রামের দক্ষিণে পঞ্চকোট পাহাড়ের পূর্ব দিকে রাস্তার ধারে বট গাছের নীচে দেখা যায় একটি বীরস্তম্ভ বা বীরকাঁড়। বর্তমানে এটি মাটির উপরে একটু হেলানো অবস্থায পড়ে আছে। উপরাংশের উচ্চতা ৩.৫ ফুটের মত। চওড়ায় প্রায় দুই ফুট। আর পাথরটির বেধ প্রায় এক ফুটের মত হবে। মাটির নীচেও অনেকটা প্রোথিত অবস্থায় রয়েছে। পাথরটির গায়ে খোদিত রয়েছে এক বীরের মূর্তি। মূর্তিটির শীর্ষস্থানে রয়েছে সিংহ মূর্তি খোদিত। বীরযোদ্ধার মূর্তিটি অনেকাংশেই ক্ষয়ে গেছে। তবে যোদ্ধার শরীর বেশ সুগঠিত। পরিধানে কোমর থেকে কিছুটা নীচ পর্যন্ত কাপড় জাতীয়। অনেক চাষীরা যেমন গামছা বা খাটো ধুতি পরিধান করে থাকে ঠিক সেই রকম। মূর্তিটি যুদ্ধরত ভঙ্গিমাতে দণ্ডায়মান। ডান হাতে তরোয়াল বাম হাতে সম্ভবত ঢাল। স্থানীয় গ্রামবাসীরা গ্রাম দেবতা হিসেবে এটিকে পুজো পাঠ করে থাকেন। আদিতে অনার্য রীতিতে পুজোপাঠ হলেও বর্তমানে আর্য প্রভাব চোখে পড়ে। অনেকেই আবার এটিকে বলে থাকেন 'বঙ্গা ঠাকুর'। বীরস্তম্ভটিতে সিঁন্দুর ও ঘি মাখন হয় পুজোর সময়ে। প্রচণ্ড শক্ত গ্রানাইট পাথর দিয়ে এটি নির্মিত।

পুরুলিয়া জেলার একটি ছোট্ট গ্রাম ভবানীপুর। এই গ্রামের চন্দ্রেশ্বর শিব মন্দিরের দেওয়ালে প্রোথিত অবস্থায় একটি বৃহৎ বীরস্তম্ভ। উচ্চতায় অনুমানিক চার ফুট চওড়ায় ২১/২ ফুট। প্রস্তর স্তম্ভ খোদিত বীরের হাতে রয়েছে ঢাল ও তরোয়াল। এই স্তম্ভের বাম পাশে রয়েছে একটি লিপি। তবে তা পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। মূর্তিটির ওপরে খোদিত রয়েছে বাঘ বা সিংহ মূর্তি। অবশ্য বর্তমানে সেটি ক্ষয়প্রাপ্ত। এই বীরস্তম্ভটিতেও নিয়মিত তেল সিন্দুর মাখানো হয়। একটি বৃহৎ ত্রিশূল পাশেই মাটিতে পোঁতা রয়েছে। স্থানীয় মানুষের কাছে এটি শিব রূপে পূজিত।

কাশীপুর থানার অন্তর্গত ক্রোশজুড়ি গ্রাম পুরুলিয়া জেলার একটি বিরাট প্রত্নস্থল। সম্ভবত এটি আদিতে জৈন প্রত্নস্থল ছিল। পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মে রূপান্তরিত হয়। সেখানকার দেবী মূর্তি গুলি জৈন শাসন দেবী। এই প্রত্নস্থলটিতে ৫টি বীরস্তম্ভ রয়েছে। প্রত্নস্থলে ঢোকার মুখে রয়েছে গেট। যেটি বর্তমানকালের প্রতিষ্ঠিত। সেই গেটের পূর্বমুখে রয়েছে ২টি বীরস্তম্ভ দুটিরই মাথায় সিংহ মূর্তি হাতে ঢাল তরোয়াল। উত্তর মুখে রয়েছে ৩টি বীরস্তম্ভ। বীরস্তম্ভ গুলি তোরণের গায়ে সাঁটানো অবস্থায় আছে তাই অন্যান্য স্থানের চেয়ে অনেকটা ভাল অবস্থায় রয়েছে।

পুরুলিয়া থেকে বাঁকুড়া যাবার সড়কপথে পড়ে ভাঙ্গড়া গ্রাম। এই গ্রামে রয়েছে জৈন দেউল। আনুমানিক ৯ম—১০ম শতাব্দীর। এই দেউলের প্রান্তর ভূমিতে সম্পূর্ণ অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে একটি বীরস্তম্ভ। এটি আকারে ক্ষুদ্র। সেটির মাপ আনুমানিক ৬৭×১৬ সেমি। হয়তো অনার্য সম্প্রদায়ের সমাধিক্ষেত্রে আবও এমনি অনেক বীবকাঁড় প্রোথিত ছিল বর্তমানে যেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে।

ঐ একই রাস্তায় পড়ে লধুড়কা গ্রাম। সেই গ্রামের চণ্ডেশ্বর শিব মন্দিরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সম্পূর্ণ ক্ষয় প্রাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে স্থানীয় পাথর দিয়ে নির্মিত ৩টি বৃহৎ বীরস্তম্ভ। তিনটিরই হাতে ঢাল ও তরোয়াল। উপরে সিংহ মূর্তি খোদিত। অতীতে এটি যে অনার্য সম্প্রদায়ের বীর ব্যক্তিদের যে সমাধি দেওয়া হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত চেলিয়ামা একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামে এককালে হো বা হা জাতির বাস ছিল। তাদের প্রতিষ্ঠিত দেবী মহামায়া মন্দিরের শিব মণ্ডপে বাম ও ডান পাশে দুটি বৃহৎ আকৃতির বীরস্তম্ভ সম্পূর্ণ অবহেলিত অবস্থায় মাটিতে প্রোথিত রয়েছে। মূর্তিগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত! স্থানীয় গ্রামবাসীরা এই পাথবের গায়ে কুড়ুল, বঁটি, ছুরি প্রভৃতি শান দেবার ফলে এমনভাবে নষ্ট হয়ে গেছে যে অনেকাংশ বোঝাই যায় না। বিশেষত: ওপরের সিংহ মূর্তি দুটি সম্পূর্ণ ক্ষয়ে গেছে। এই বীর দুইয়ের হাতে রয়েছে তীর ও ধনুক অনেকটা তীর ছোঁড়ার ভঙ্গিতে।

পুঞ্চা থানার অন্তর্গত বুধপুর একটি পুরুলিয়া জেলার বিখ্যাত প্রত্নস্থল। অতীতে এখানেও ৭টি জৈনদের দেউল ছিল। তবে বর্তমানে সবই নষ্ট হয়ে গেছে। অতীতেব স্মৃতি বহন করে চলেছে দুটি বিশাল আকৃতির গণেশ মূর্তি ও একটি ভগ্ন দেবীর মূর্তি হয়তো কোন শাসন দেবী। এই প্রত্নস্থলে রয়েছে মোট চারটি বীরস্তম্ভ, সন্ধান করলে অবশ্যই পাওয়া যাবে। তবে যে চারটি বীরস্তম্ভ প্রত্নস্থলে চোখে পড়ে সেগুলিতে দেখা যায় একজন বীবপুরুষ ঘোড়ার পিঠে বসে আছে হাতে তাদের তীর ধনুক অথবা ঢাল তরোয়াল। ওপরে প্রতিটিতে খোদিত রয়েছে সিংহেব মূর্তি। সম্ভবত বীরত্বের প্রতীক। ঘোড়ার পিঠে আরূঢ় বীরের মূর্তি সম্বলিত বীরস্তম্ভ সম্ভবত এখানেই রয়েছে আর কোথাও চোখে পড়ে নি।

বীরস্তম্ভের মতো পুরুলিয়ার আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রত্ন নিদর্শন হল সতীস্তম্ভ। এই নিয়ে অদ্যাবধি কেউ আলোকপাত করেছেন বলে তো মনে হয় না। এগুলি দেখতে গোলাকার স্তম্ভের মত। ওপরের অংশ শিবলিঙ্গের অনুরূপ। স্তম্ভের গায়ে খোদিত থাকে শিবলিঙ্গ অথবা কোন দেবদেবীর মূর্তি। উচ্চতায় ৪ ফুট থেকে ১০ ফুট পর্যন্ত। পুরুলিয়ার টুশ্যামা, লাখড়া, পাড়া থানার দেউল ভিড়া, তদগ্রাম, বান্দা, গোপলপুর, ধাধকি প্রভৃতি গ্রামে এই ধরণের অসংখ্য স্তম্ভ চোখে পড়ে। জেলার সতীস্তম্ভ গুলিব মধ্যে আকারে এবং কারুকার্যে অসামান্য হল পুঞ্চা থানার অন্তর্গত টুশ্যামার সতীস্তম্ভ গুলি। এগুলির পরিধি অনেক বেশি। কাঁসাই নদীর তীরে যে প্রস্তর নির্মিত ভগ্ন দেউল রয়েছে সেখানেই এগুলি পড়ে আছে সম্পূর্ণ অবহেলিত অবস্থায়। বেশ কয়েকটি স্তম্ভ কাঁসাইয়ের গহ্বরেও চলে গেছে। কাঁসাই যেভাবে নদীর পাড়কে খেয়ে ফেলছে তাতে এগুলি সবই নদী গহ্বরে একদিন হারিয়ে যাবে। এগুলি

উচ্চতায় ৩১/২—৪ ফুট। ২০—২৫টি সতীস্তম্ভ এখানে এখনো রয়েছে। এখানকার স্তম্ভগুলির গায়ে খোদিত রয়েছে কোন দেবতা বা দেবীর মূর্তি। বেশ কিছু সতীস্তম্ভ পড়ে আছে পুঞ্জা থানার লাখড়া গ্রামে। এগুলিও উচ্চতায় তিন, সাতে তিন ফুটের মতো। প্রতিটির গায়ে খোদিত রযেছে শিবলিঙ্গ। যে স্থানটিতে এগুলি রয়েছে সেটি একটি জৈন প্রত্নস্থল। বেশকিছু জৈন তীর্থঙ্কর অক্ষত ও ভগ্ন অবস্থায় বটগাছ ও চারুলতা গাছের নীচে একেবারে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে। বর্তমানে এই স্থান ছিলাটি শ্মশান বলেই পরিচিত। জেলাব সর্ববৃহৎ সতীস্তম্ভটি পড়ে আছে দেউলভিড়া গ্রামে (পাড়া থানার) এটির গায়ে খোদিত রয়েছে শিবলিঙ্গ। এটি মাটিতে হেলান অবস্থায় রয়েছে। গ্রামবাসীদের ভাষায় এটি 'বিজুক পাথর' এবং এটির নীচে অনেক ধনরত্ন সঞ্চিত রয়েছে। গ্রামের অনেক লোকই এর নীচের অংশটি খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু এত গভীরে এর নিচের অংশ প্রোথিত আছে যে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। এই ধরনের সতীস্তম্ভ পড়ে আছে তদগ্রাম গাঁয়ের হাড়াই-গুয়াই নদীর সঙ্গম স্থলে পার্বতী স্থানে।। সেগুলি লম্বায় প্রায় ৬ফুট। গায়ে খোদিত রয়েছে শিবলিঙ্গ।

উপরে যে সমস্ত সতীস্তম্ভ উল্লেখ করা হল সেগুলি সবই নদী তীরবর্তী শ্মশানে অবস্থিত। পুরুলিয়ার নদী তীরবর্তী শ্মশান গুলিতে অনুসন্ধান করলে এই রকম অজস্র স্তম্ভ পাওয়া যাবে। জেলার বিভিন্ন গ্রামের মানুষ এগুলিকে সতীস্তম্ভ বলে থাকেন। অতীতে যে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল তা এতদঞ্চলেও বজায় ছিল। যে সব সতী সাধ্বী রমণীরা স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতেন হয়তো তাদের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে শ্মশান ভূমিতে প্রোথিত করা হত এই সব প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভ। এ বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান চালাতে পারলে আগামী দিনে যে অনেক তথ্য উঠে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে উঠে আসে আরেকটি কথা, পুরুলিয়ার অনেক নদী তীরবর্তী শ্মশান ঘাটের নাম 'সতীঘাট'। অতীতে হয়তো সেই সব শ্মশানে মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হতেন। মৃত্যুর পর স্বীকৃতি পেতেন সতী হিসেবে। তাই নদীর ঘাট গুলি তাদের স্মৃতিবাহী হয়ে আজও রয়ে গেছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. পুরুলিয়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য।
২. অহল্যাভূমি পুরুলিয়া (১ম)—সম্পা-দেবপ্রসাদ জানা, প্রবন্ধ : পুরুলিয়ার জনজাতি—সুধন্বা দরিপা।
৩. অরণ্য সন্তান শবরখেড়িয়া—সম্পাদনা—মা মহাশ্বেতা ও আরো অয়েকজন।
৪. আত্মকথা—স্বামী তপানন্দ।
৫. পশ্চিমবঙ্গ (বাঁকুড়া সংখ্যা)—বাঁকুড়ার পুরাকীর্তি ঃ নানা প্রসঙ্গ—কান্তি হাজরা।
৬. অভিক্ষেপ—১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা—সম্পাদনা—মৃন্ময় কুণ্ডর।
৭. রাঢ়ভূম—সম্পাদনা : শরৎচন্দ্র বাউরী। বাউড়ী জনগোষ্ঠীর প্রাচীন বৌদ্ধতন্ত্র ধম্ম—সুনীল কুমার দাস।
৮. প্রয়াণ—প্রবন্ধ— কালী—তপন ঘোষ।
৯. আমাদের পুরুলিয়া—অমিয় কুমার সেনগুপ্ত।

১০. জাগরণ—মুকুল চট্টোপাধ্যায়।
১১. মানভূমের লোককথা—সৃষ্টিধব বঁশরিয়ার।
১২. কবি পাঠক . গ্রাম—কানড়া, পোঃ—গোপালপুব, জেলা—পুরুলিয়া।
১৩. বিজয় পাণ্ডা—গ্রাম ও পোঃ—গুনীয়াদা, জেলা—বাঁকুড়া।
১৪. একালের ধৃতি—লোধা শবরীর পদাবলী—দুলাল দে।
১৫. অভিমূন্য কিস্কু—গ্রাম—রতনপুর, পোঃ—জোরাড়ি, জেলা—পুরুলিয়া।
১৬. প্রেমনাথ যোগী—গ্রাম ও পোঃ—চেলিযামা, জেলা—পুরুলিয়া।
১৭. মহাদেব চক্রবর্তী—গ্রাম ও পোঃ—চেলিয়ামা, জেলা—পুরুলিয়া।
১৮. অনৃজু পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।
১৯. পুরুলিয়ার খরা স্থায়ী সমাধান—সম্পাদনা—প্রণতি ভট্টাচার্য।
২০. শ্রীশ্রী স্বামী উত্তমানন্দ পরমহংসদেব (রামেশ্বর সিং) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী—ভাগবত পরামানিক।

বিঃদ্রঃ — প্রস্তুতির শেষপর্বে সুভাষ বাবুর ৩৮ পৃষ্ঠার মূল্যবান লেখাটি দপ্তরে এসেছে। স্থানাভাবে ২০ পৃষ্ঠার মত পাণ্ডুলিপি ছাপা হলো, তাও অন্য লেখা সরিয়ে। বাকী অংশে বিভিন্ন জনজাতির পারলৌকিক ক্রিয়ার বিবরণ ছিল। সেখানে যে সব তথ্যদাতার নাম ছিল, (১) অভিমন্যু কিস্কু, রতনপুর, (২) রমজান আনসারী, হদলা. চেলিয়ামা। পুরলিয়ার শ্মশানদেবী ও লোক কথাটি বাদ গেল। গল্প ও তাই। কবিতা, গান কেবল উল্লিখিত হল। শ্মশান সাধক ও বীরস্তম্ভ মূল্যবান। ছাপা হলো।—সম্পাদক

হাড়াইয়ের তীরে শ্মশানভূমিতে পড়ে থাকা শিবলিঙ্গ খোদিত একটি বৃহৎ সতীস্তম্ভ, ছবি : সুভাষ রায়

লেখক পরিচিতি — মানভূমি লোক-সংস্কৃতির একজন গবেষক। বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝুমুর লোক সঙ্গীত নিয়ে গবেষণা রত। দীর্ঘ ২০ বৎসর মানভূম লোক-সংস্কৃতির মুখপত্র ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'অনৃজু' সম্পাদনা করে আসছেন।

দুর্গাপুর কয়লাখনি শিল্পাঞ্চলের কয়েকটি শ্মশান

সুজিত বিশ্বাস

ভারতে কয়লা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে রেলপথ ও কলকারখানার বিস্তার ঘটে। আর এই কয়লা প্রথম আবিষ্কার হয় রানীগঞ্জে। রানীগঞ্জ বর্ধমান জেলার পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে রানীগঞ্জ শহরের গুরুত্ব বৃদ্ধিপায়। ১৭৭৪/৭৫ সালে প্রথম কয়লা উত্তোলনের নিমিত্ত 'ডামলিয়ার' পুকুর -খাদ কেটে কাজ শুরু হয়। কিন্তু কয়লা তুলে লাভ না হওয়ায় ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কাজ বন্ধ থাকে। অতঃপর ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময় থেকে 'নারানকুড়ী' অঞ্চলে পুকুর-খাদ খুড়ে কয়লা তোলার কাজ শুরু হয়। এই কয়লা তোলা লাভজনক হওয়ায় ১৮২৪ সালে পরিত্যক্ত খনি 'ডামলিয়া'র কাজ আবার আরম্ভ হয়। এছাড়া ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে এগরায় প্রথম 'চানক খাদ' চালু হয়। এই 'চানক' খাদের গভীরতা ছিল ৯০ ফুট। অর্থাৎ ৯০ ফুট গভীর থেকে কয়লা কেটে তুলে আনা হতে লাগল। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে নারানকুড়ীতে ও চানক খাদ খোলা হয়। তবে এসময় পরিবহনের তেমন কোন উন্নতি ছিল না। তাই গরুর গাড়িতে করে কয়লা দামোদর নদের ঘাটে নিয়ে যাওয়া হত। তারপর নৌকাযোগে সেখান থেকে কোলকাতায় কোম্পানীর হেফাজতে পাঠান হত। প্রথম দিকে কয়লার চাহিদা কম ছিল পরে অর্থাৎ ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ স্টীমার ও ছোট ছোট কারখানা চালু হওয়ায় চাহিদা অনেকটা বৃদ্ধি পায়। ১৮৫৫ সালে রেল চালু হওয়ার পর কয়লার চাহিদা অনেক বেড়ে যায়। ফলে, কয়লাখনি রানীগঞ্জ ছাড়িয়ে আসানসোল, ঝরিয়া, বাঁকুড়া ও বীরভূমেরও বিস্তৃতি লাভ করে এবং খনি থেকে কয়লা তোলার কাজও শুরু হয়। এই সময় রানীগঞ্জ, বর্ধমান জেলার একটি মহকুমা ছিল পরে আসানসোলে কয়লা উত্তোলন শুরু হলে, ব্যবসা বাণিজ্যে আসানসোলের অগ্রগতি ঘটে। এজন্য ইংরেজ সরকার রানীগঞ্জ থেকে মহকুমা দপ্তরটি আসানসোলে স্থানান্তরিত করেন। এর পূর্বে রানীগঞ্জ মহকুমার মধ্যে দুর্গাপুরের অংশবিশেষ ছিল। এই সকল স্থানে কয়লাখনিও ছিল। অর্থাৎ অন্ডাল, উখরা ও পাণ্ডবেশ্বর প্রভৃতি স্থানগুলি রানীগঞ্জ ও পরবর্তীকালে আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত খনি অঞ্চল হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিল। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলশ্রুতিতে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা ও বিবিধ শিল্প কারখানা স্থাপিত হয়। ১৯৬৮ সালে দুর্গাপুর মহকুমায় উন্নীত হয়। অন্ডাল এবং পরবর্তীকালে পান্ডবেশ্বর থানার মর্যাদালাভ করে দুর্গাপুর মহকুমার অন্তর্ভূক্ত হয়। পূর্বতন অন্ডাল থানার মধ্যে উখরা ও পান্ডবেশ্বর থাকায় এই থানাটি কয়লা সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসেবে গণ্য হত। পূর্বেই বলা হয়েছে বর্তমানে উখরা ও পাণ্ডবেশ্বর নিয়ে পাণ্ডবেশ্বর থানা গড়ে উঠেছে। এই থানার সর্বাংশে কয়লা মজুত আছে। অন্ডাল থানার ভূগর্ভেও প্রচুর কয়লা স্তরে স্তরে সজ্জিত রয়েছে। কয়লা উত্তোলন শুরুর কাল থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বিভিন্ন জাতির মানুষ এই অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। এরা ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষ ছিল। ফলে এদের মধ্যে কর্মগত ঐক্য থাকলেও আচার আচরণ ও ধর্ম তথা সংস্কৃতিগত কোন ঐক্য ছিল না। ফলে, এই বহিরাগত অধিকাংশ মানুষেরা আপন আপন দেশে গিয়ে সকলরূপ আচার-আচরণ পালন করত। এমনকি মৃতদেহও নিজদেশে নিয়ে গিয়ে সৎকার করত

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। মুষ্টিমেয় সংখ্যক দরিদ্র শ্রমিক স্থানীয় শ্মশান বা কবরখানায় মৃত দেহের সৎকার করত। স্থানীয় মানুষ পূর্ব থেকেই তাদের নির্দিষ্ট শ্মশান বা কবরখানায় দেহাবসানের কার্য শেষ করত। অত্র নিবন্ধে আমার আলোচ্য বিষয় দুর্গাপুর খনি ও শিল্পাঞ্চলের কয়েকটি শ্মশান -ভূমির কথা।

উখরার শ্মশান

উখরা বেশ প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রাম বর্ধমান রাজার জমিদারীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। এই গ্রামের জমিদারী অতি সহজেই লাভ করেন মেহেরচাঁদ লাল সিং মুণ্ডা। এর কারণ বর্ধমানের রাজা তিলকচন্দ্রের সঙ্গে মেহের চাঁদের কন্যা বিষণকুমারীর বিবাহ হয়েছিল। ফলে জমিদারী পাওয়া খুবই সহজ হয়েছিল। এরপূর্বে মেহেরচাঁদ লাল সিং মুণ্ডা আলীবর্দী খাঁনের রাজদরবারে কাজ করতেন। তখন তিনি বর্ধমানের বক্তানগরে বাস করতেন। তবে জমিদারী লাভ করার পর তিনি সপরিবারে উখরা গ্রামে বসতি স্থাপন করে বাস করতে শুরু করেন। তখন উখরা গ্রামে নিজেদের বংশের অর্থাৎ জমিদারের শবদাহের জন্য কদমগোড়ের পাড়ে একটি.শ্মশান প্রতিষ্ঠা করেন। এই শ্মশান প্রতিষ্ঠার কাল ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। নবাব আলিবর্দীখানের রাজত্বকাল ১৭৮০ থেকে ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে উখরা গ্রামে মেহেরচাঁদ লাল সিং মুন্ডা বসবাস শুরু করেছেন। ফলে এই পারিবারিক শ্মশানও উক্ত সময়ের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। তখন অবশ্য উখরা একটি নগন্য গ্রামই ছিল। পরে উখরার বিস্তৃতি ঘটেছে কয়লাখনি আবিষ্কারের পর এবং বর্তমানে খনি অঞ্চলের বেশ বড় গঞ্জ বা প্রাণকেন্দ্রও বলা চলে। এই শ্মশান জমিদারদের হলেও তেমন কোন জাঁকজমক নেই। এইস্থানে একটি ছোট পুকুর ছিল। আঞ্চলিক ভাষায় ছোট পুকুরকে গোড়ে বলা হয়। এবং পুকুরের পাড়ে ছিল অনেকগুলি কদমফুলের গাছ। অন্যান্য গাছগুলির তথাপি কদমগোড়ে এই পুকুরের নাম হয় লোকমুখে। গ্রামের বাইরে অর্থাৎ মৌজার মধ্যে থাকলেও তৎকালে লোকবসতি কম থাকায় এই অংশে কোন মানুষই বাস করত না; এজন্য শ্মশানভূমি নির্দিষ্ট করার পক্ষে সহজ হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, রাঢ় অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র শ্মশানেও বর্ণ বিভাজন ছিল। বর্তমানে তদ্রুপ না থাকলেও একেবারে এই বিভাজন বিলীন হয়নি। ফলে জমিদারদের শ্মশানে বর্ণ বিভাজন না থাকলেও 'রাজা-প্রজা' এরূপ একটি বিভেদ ছিলও আছে। তবে এই মেহেরচাঁদ লাল সিং মুন্ডা যখন পাঞ্জাব থেকে এদেশে ভ্যাগ্যান্বেষণে আসেন তখন, তাঁর সঙ্গে বেশকিছু আত্মীয়স্বজনও এসেছিলেন এরা হলেন সায়গল, মেহেরা প্রভৃতি উপাধিধারী পরিবার। এই সকল পরিবার পরবর্তীকালে 'লাল সিং মুন্ডা' পরিবারের সঙ্গে আত্মীয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। ফলে এই সকল পরিবারের অন্ত্যেষ্টিও এই শ্মশানে হয়ে থাকে। জমিদার পরিবারের প্রায় সকল নারীপুরুষ এখানে শেষ আশ্রয় লাভ করেছেন। পুকুর পাড়ে চিতা সাজিয়ে পারিবারিক পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে শবদাহ প্রক্রিয়া সমাধা হয়। শবদেহ আনয়নের সময়ও সন্তান ও ঘনিষ্ট আত্মীয়রা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। অর্থাৎ পুত্র, পৌত্র বা আপনজন কাঁধে করে শব বহন করে কদমগোড়ের শ্মশানে নিয়ে আসেন। এখানে কোন মন্দির বা গৃহ নেই। কখনো কখনো হয়ত কেউ শ্মশানকালীর পুজো করে থাকে। এখন কদমগড়ের নাম আছে; কিন্তু কদম গাছ আর অবশিষ্ট নেই। কিছু জংলা গাছ ও ঝোপ ঝাড়ে ভরে গেছে। এই জমিদার

পরিবারগুলি বর্তমানে বাঙালীদের মত সকল আচার আচরণ পালন করে থাকেন। বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে পুরোপুরি একাত্ম হয়ে গেছেন। বর্তমানে এই সকল পরিবারের নারীপুরুষদের কথায়,আচরণে, পোশাকে, পূজা-পার্বণে একেবারে ষোলআনা বাঙালীয়ানা ঢুকে পড়েছে। ফলে, শ্মশান ক্রিয়া বা সাংস্কৃতিতেও বাঙালীয়ানা সার্বিকভাবে গৃহীত হয়েছে বলা যায়।

উখরার 'অবিচাল' শ্মশান

উখরা গ্রামের উত্তর প্রান্তে শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারী সংলগ্ন 'অবিচাল' শ্মশান। উখরা মৌজার অন্তর্গত কিন্তু গ্রামের বসতি থেকে বেশ দূরে অবিচাল নামক একটি পুকুর আছে। এই পুকুরটি বহিরাগত তেওয়ারী উপাধির ব্রাহ্মণদের। কোলিয়ারী বা খনিকর্মী হিসেবেই এরা উখরায় এসেছিলেন। তেওয়ারীরা এই পুকুরটি কিনেছিল। এই পুকুরের পশ্চিমপাড়ে একটি শ্মশানও গড়ে তোলেন তেওয়ারী, পান্ডে প্রভৃতি উপাধির ব্রাহ্মণগণ। পরে এই শ্মশানে স্থানীয় ময়রা, মুচি, কলু প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর বা বর্ণের মানুষেরা শবদাহ করতে থাকেন। বর্তমানে এতদ্ অঞ্চলের অধিবাসীরা এখানে শবদাহ করে থাকে। এখানে একটি কালীমন্দিরও আছে। তবে পাকা ঘর নেই। কালীপূজার আয়োজনও হয়ে থাকে বৎসরের কোন এক মাসের অমাবস্যার রাতে। এই পূজায় খুব ধূমধাম হয়। একাধিক বলি ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এই সময়ে। বহু মানুষের সমাগম হয় এই পূজার রাত ও দিনে। কোন স্থায়ী মন্দির ও গৃহ না থাকায় গ্রাম থেকে এসে পূজার অনুষ্ঠান করতে হয়। বর্তমানে শ্মশানের অপর পাড়ে কয়েকটি দোকান ও বাস যাতায়াত-এর জন্য জনসমাগম হয়ে থাকে। এই সকল দোকানঘর ও আগত গ্রামের যুবকবৃন্দরাই পূজার আয়োজন করে। উখরা পঞ্চায়েতভূক্ত হলেও শ্মশানে কোনরূপ টাকা-পয়সা লাগে না। পুকুর পাড়ে শ্মশান হওয়ায় জলের প্রয়োজন সহজেই মিটলেও গাছপালা তেমন না থাকায় রৌদ্রে খুব কষ্ট হয় শ্মশান যাত্রীদের। এই পুকুরের নামটি অবিচাল কেন? তা এই গ্রামের কেউ বলতে পারেননি। গ্রামটির প্রাচীনতার কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কত সালে এই গ্রাম গড়ে ওঠে সে কথা জানা যায় না। উখরা গ্রাম আনুমানিক ৪০০ বৎসর-এর পূর্বেই গড়ে উঠেছিল এতে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী গ্রাম খান্দরার জমিদার সরকার বংশের প্রতিষ্ঠাকালের তারিখ জানা গেলে উখরা গ্রামের. পত্তনকাল সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে। এই বংশের অষ্টাদশতম উর্দ্ধতন পূর্বপুরুষ রামদাসগজদানী। (১৮ ×২৫ বৎসর) এই হিসাবে গজদানীর জীবিতকাল ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে। অর্থাৎ ৪৫০ বৎসর পূর্বে। এরপূর্বে খান্দরা গ্রাম যেমন ছিল আবার তেমনি, উখরাও ছিল। এদিক থেকে উখরা গ্রাম ৪৫০ বৎসর পূর্বে যে গড়ে উঠেছিল সে কথা বলতে দ্বিধা নেই। কিন্তু অবিচাল শ্মশান তখন ছিল না। শ্মশানের পত্তনকাল যদি তেওয়ারীদের হাতে হয়; তার ১৮১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি বা তার দু-এক বৎসর পরও হতে পারে। কারণ এই সময় কয়লা শিল্প লাভজনক হয়ে ওঠে। ফলে বহিরাগত শ্রমিকআরও বেশী বেশী করে তখন আসতে থাকে। এই সময় তেওয়ারী ও পাণ্ডেরা যে এসেছিল একথা বলা যেতে পারে। অর্থাৎ অবিচাল শ্মশান ১৮০০ থেকে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন একসময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

উখরা গ্রামের আদি শ্মশান : বেনেপুকুর শ্মশান

উখরা গ্রামের পত্তনের সময় থেকে এই শ্মশানটি গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের উদ্যোগে। এই গ্রামের লায়েকদেরই বাসাধিক্য লায়েকরা জাতিতে ব্রাহ্মণ। এছাড়া এখানে চ্যাটার্জী, মুখার্জী, ব্যানার্জী, রায় ও চট্টোরাজ পদবীর ব্রাহ্মণদের শ্মশান এটা। এখানে বাউরিরাও শবদাহ করে থাকে। একসময় বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর আসানসোল অঞ্চলে অস্ট্রিকভাষীদের বাস ছিল। তাদের মধ্যে বাউরি, হাড়ি, বাগ্দী, ডোম, চোয়াড় ও বাদ্যকর প্রভৃতি জাতি পরবর্তীকালে গ্রাম তৈরি করে বসবাস করতে থাকে এবং জমিদার তথা তৎকালীন শাসকদের সৈন্য বা লাঠিয়াল হিসেবে কাজ করত একথা আমরা জানি। ফলে এই সকল জাতি একসময় উখরায় বসতিস্থাপন করে বাস করতে থাকে। তখন থেকে ধীরে ধীরে এখানে সদ্‌গোপ, গোয়ালা, বণিক, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতি বসবাসের জন্য আসেন। এই সকল জাতি আসার ফলে শ্মশান ভূমিরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণরা এই পুকুরটি হয়তো কোন এক সুদীর্ঘ অতীতে ক্রয় করে গ্রামের বাইরে শ্মশান প্রতিষ্ঠা করে শবদাহের ব্যবস্থা করেন। এই শ্মশান থেকে ৫০০ গজ দূরে 'শেরগোড়ে' পাড়া। এই পাড়ায় বাস করে বাউরী সম্প্রদায়ের মানুষ। এরাও এখানে শবদাহ করে। এখানে কিন্তু জাতিগত কোন বিভাজন নেই। হয়তো কোন এক সময়ে ছিল। বর্তমানে কোন জাতিকেই বাধা দেওয়া হয় না। সকলেই এখানে অন্ত্যেষ্টিকার্য করতে পারে। বহিরাগত কোন শব এখানে আসে না। ফলে কেবলমাত্র গ্রামের মানুষেরা এই শ্মশান ব্যবহার করে থাকে। এই পুকুরের পাড়ে আছে বিশাল একটি বটবৃক্ষ। গ্রাম গড়ে ওঠার কাল থেকে নাকি এই বৃক্ষ এবং শ্মশান আছে। বেনেপুকুরের দক্ষিণ ও পশ্চিম পাড়ে দাহ করা হয়। তবে বাউরী সম্প্রদায়ের মানুষেরা একটি নির্দিষ্ট স্থানেই শব দাহ করে। এই শ্মশান ঘিরে আছে বিভিন্ন প্রকারের গাছ ও ঝোঁপঝাড়। এইসকল গাছের মধ্যে আছে বকুল, মহুয়া, শিরীষ, সোনাঝুরি প্রভৃতি। স্থানটি বেশ নির্জন ও শান্ত পরিবেশ। এখানে কোন ঘর বা আচ্ছাদন ছিল না। বেশ কয়েক বছর পূর্বে গ্রামের ডাক্তারবাবু গুরুপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী বিয়োগ ঘটলে তিনি একটি পাকা মন্দির করে দিয়েছেন। রোদ-বৃষ্টি-বর্ষার সময় শ্মশানযাত্রীরা এই স্থানে আশ্রয় নিতে পারে। এই শ্মশানের ৫০ গজের মধ্যে একটি 'চানক' আছে। 'চানক' হল কয়লাখনিতে (গভীরে) প্রবেশের সুড়ঙ্গ বা পথ। এই 'চানক' মাধ্যমে ট্রলির সাহায্যে খনিগর্ভে শ্রমিকেরা কর্মস্থলে যায় এবং ফিরে আসে। দূর থেকে কেবল একটা চাকা ঘুরতে দেখা যায়। এখানে এখন কয়লা তোলা হয় না। তাই কয়লা তোলা বা শ্রমিকদের যাতায়াত বন্ধ আছে। তবে কেউ কেউ এই পথটি এখনও ব্যবহার করে থাকে। সেইজন্য এই অঞ্চলটি বেশ নির্জন। এই শ্মশানে শ্মশানকালীর পুজো হয় বছরে একবার। এছাড়া মানসিক পূজা ব্যক্তিগতভাবে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে অনেকে করে থাকে বেশ ধুম-ধামের সঙ্গে। মোট কথা এই শ্মশানের কোন শবদাহের জন্য কোন বর্ণগত বাছ-বিচার নেই। পূর্বের আলোচিত অবিচাল শ্মশান থেকে সোজা দক্ষিণে আধ কিলোমিটার গেলে এই বেনেপুকুর শ্মশানটি পাওয়া যাবে। গ্রামের সন্নিকট হলেও বসতির বাইরে। এখন যদিও বসতি ক্রমেই শ্মশানের কাছাকাছি চলেগেছে।

উখরার সংগোপ ও গোপদের শ্মশান

উখরা গ্রামের সংগোপ, গোপ বা গোয়ালা, ময়রা প্রভৃতি জাতিরও একটি শ্মশান আছে। গ্রামের বাইরে বেশ কিছুটা দূরে আমলৌকা গ্রামের সন্নিকটে এবং মহন্তের বাগানের নীচে এই শ্মশান অবস্থিত। এই মহন্তের বাগানের নিম্নে একসময় খল্‌সে বাবাজী নামে এক সাধু থাকতেন। এই সাধুবাবার উদ্যোগে একটা মেলাও হত। সকলে এই মেলাকে খল্‌সে বাবাজীর মেলা বলত। সে মেলা এখন আর হয় না। খল্‌সে বাবাজীর আশ্রমও আর নেই। এই মেলাস্থলের পাশেই একটি পুকুর পাড়ে শ্মশানটি অবস্থিত। পুকুরের চারপাশেই বিভিন্ন গাছ-পালা রয়েছে। আর পুকুর পাড়ের শ্মশানে একটি ঘর আছে শ্মশান যাত্রীদের জন্য। কখনো কখনো কালীপূজা হলেও বাৎসরিক কোন পূজা হয় না। এখানে অন্যকোন জাতির শবদাহ হয়না। এককথায় বলা যায় 'নবশাখ' বর্ণের মানুষের সৎকারের নিমিত্ত এই শ্মশান প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই শ্মশানটি সুদীর্ঘকালের। ৪০০ বৎসরের মত এই শ্মশানের বয়স।

ভাদুর বাগাজোড়া শ্মশান

রানীগঞ্জের দিকে যেতে অন্ডাল মোড় পার হয়ে বাঁদিকে জি. টি. রোডের সংলগ্ন এই শ্মশানটি অবস্থিত। এই শ্মশানের বিপরীত দিকে অর্থাৎ জি.টি রোডের দক্ষিণ দিকে ভাদুর গ্রামটি একসময় ভাদুর গ্রামের অন্তর্ভূক্ত ছিল। প্রায় এক বিঘা জমি নিয়ে শ্মশান। এই জমি খণ্ড কাজোড়া গ্রামের জমিদার হাজরাদের সম্পত্তি ছিল। বর্তমানে শ্মশান হিসেবে দান করেদিয়েছেন মৌখিকভাবে। এখানে কালীমন্দির আছে। নিত্যপূজা হয়। পূজারী বিল্বমঙ্গল বাউরী। এই শ্মশানেই তিনি বাস করেন। শ্মশানযাত্রীদের জন্য পাকাঘর আছে। মন্দিরও পাকা। বেশ জাঁক-জমকপূর্ণ শ্মশান। এখানে সকলেই শবদাহ করতে পারেন। কোন পয়সা দিতে হয় না। ভাদুর গ্রাম থেকে যেমন শব আসে, আবার তেমনি কয়লাখনি অঞ্চল থেকেও আসে দাহ করতে। পূর্বে এখানে দু-একটা শবদাহ হলেও তেমন কোন প্রতিষ্ঠিত শ্মশান হিসেবে-এর কোন পরিচিতি ছিল না। কালীমন্দির ও শ্মশানের নবকলেবর রূপ প্রায় ৫৫ বৎসর পূর্বে হয়েছে।

কাজোড়া গ্রামের শ্মশান

কাজোড়া কয়লাখনির একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল। কাজোড়া মোড় থেকে উত্তর দিকে কিছুটা গেলেই কাজোড়া স্টেশন পড়ে। এই রেল স্টেশনের পূর্বে একটি শ্মশান আছে। এই শ্মশানে এতদ্ অঞ্চলের জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শবদাহ করা হয়। কোনরূপ অর্থ এখানে গ্রহণ করা হয় না। এই শ্মশানে কেউ থাকেনও না। অর্থাৎ কোন মন্দির ও শ্মশান যাত্রীদের ঘর এখানে নেই। এই শ্মশানও দীর্ঘকালের কাজোড়া গ্রাম গড়ে ওঠার কাল থেকে এই শ্মশান আছে বলে জানাগেল।

কাজোড়া গ্রামের ব্রাহ্মণদের শ্মশান

কাজোড়া রেল স্টেশনের পশ্চিমে একটি শ্মশান গ্রাম পত্তনের কাল থেকে আছে। এই শ্মশানে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ জাতির শবদাহ করা হয়ে থাকে। কখনো কখনো কালীপূজা হলেও নিয়মিত কোন পূজা হয় না। বেশ কয়েক বিঘা জমি নিয়ে শ্মশানটি গড়ে উঠেছে। নিকটে জলাশয় আছে। বেশ কিছু গাছ ও ঝোপ-ঝাড় শ্মশানের চারদিকে রয়েছে। কোন ঘর নেই এবং সাধু সন্ন্যাসীও

থাকে না। তবে মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু তুলসী মঞ্চের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির স্থাপিত আছে।

শোনপুরবাজারীর শ্মশানঘাট

এই শ্মশানঘাটকে মড়িঘাট বলা হয়। যেহেতু মড়াপোড়ান হয় তাই এর নাম মড়িঘাট। শোনপুর বাজারী পান্ডবেশ্বর থানার অন্তর্গত একটি কয়লাখনি। এই অঞ্চলের খনি থেকে কয়লা তোলা শুরু হলে যে সমস্ত জলাশয় ও নালা বা জোড় বা কাঁদোর ছিল তা ভরাট করে ফেলা হয়। ফলে মড়িঘাটের শ্মশান সংলগ্ন কাঁদোরটিও হারিয়ে যায়। তথাপি মড়িঘাটের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। এই শ্মশানে পার্শ্ববর্তী গ্রামঞ্চলের মানুষ আজও দাহ করতে আসে। বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর মানুষেরাই এই মড়িঘাটে দেহ সৎকার করে আজও। এখানে পূর্বে সকল বর্ণের মানুষই শবদেহ দাহ করতে নিয়ে আসত। কিন্তু বর্তমানে বেশীর ভাগ লোকই দামোদর নদের তীরে পান্ডবেশ্বর শ্মশানে দেহ নিয়ে যায়। এই মড়িঘাট পুষ্কর শান্তি করাতে আসে। বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা মৃত ব্যক্তির উপদ্রব নিবৃত্ত করার জন্য এবং ত্রিপাপ জ্বালা থেকে মুক্তি পেতে পুষ্কর শান্তি করে থাকে। আচার্য পুরোহিতরা এই শান্তির অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করে থাকেন। পায়রা বলি দেওয়া হয় প্রেতের উদ্দেশ্যে। সকল অনুষ্ঠান এই শ্মশানে হয়ে থাকে।

পান্ডবেশ্বর শ্মশান

পান্ডবেশ্বর দুর্গাপুর মহকুমার একটি থানা শহর। এই থানার সর্বত্রই কয়লাখনিতে ব্যাপ্ত। পান্ডবেশ্বর নামের মধ্যেই মহাভারতের গন্ধ বর্তমান। পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাতবাসের সময় নাকি এখানে কিছুদিন ছিলেন। এই কিংবদন্তী এখানে আজও প্রচলিত। পাণ্ডবেশ্বরের নিকটে বীরভূম জেলার ভীমগড় নামক স্থান সেই জনশ্রুতিকে আরও দৃঢ় করেছে। পান্ডবরা যে মন্দিরে পূজা দিতেন, সেই মন্দির নাকি এখনও আছে। যাহোক পান্ডবেশ্বর একটি উল্লেখযোগ্য স্থান এতে সন্দেহ নেই। অজয় নদের তীরে পান্ডবেশ্বর গ্রাম অবস্থিত। পান্ডবেশ্বর নামে কিন্তু কোন মৌজা নেই। বৈদ্যনাথপুর মৌজায় পান্ডবেশ্বর অবস্থিত। পান্ডবেশ্বর শহরের উত্তরে অজয় নদের তীরে পান্ডবেশ্বর শ্মশান অবস্থিত। এই শ্মশান নদীর পাড়ে; এখানে কালীমন্দির আছে এবং এই মন্দিরে সাধুরা থাকেন। প্রতিদিন এই শ্মশানে শবদাহ হয়ে থাকে। সমগ্র থানার খনি অঞ্চল থেকে স্থানীয় ও বহিরাগত খনিকর্মীদের অন্ত্যেষ্টি স্থান হল পান্ডবেশ্বর। পঞ্চায়েতের পরিচালনায় শ্মশান ঘাটের কার্য পরিচালিত হয়। শবদাহের জন্য ৪০ টাকা মত লাগে। পান্ডবেশ্বরে মকর সংক্রান্তিতে অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তিতে একটি মেলা বসে। এই মেলার পূর্ব দিকে শ্মশান অবস্থিত। মেলায় বাউল ও কীর্তন বিশেষ মাত্রা লাভ করে। শিবমন্দিরে পুজো, হোম ও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এই শ্মশানের পশ্চিমদিকে অজয় সেতু কয়েক বৎসর পূর্বে নির্মিত হয়েছে। এই শ্মশান প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব থেকেই আছে বলে অনেকে মনে করেন।

সূত্র : (১) দুর্গাপুরের ইতিহাস—প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, (২) দুর্গাপুরের ইতিহাস প্রসঙ্গে— মধু চট্টোপাধ্যায়, (৩) রানীগঞ্জের কথা— বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শিল্প-সাহিত্য-গবেষণা সাহিত্য পত্রিকা'। *ক্ষেত্রগবেষণায় লেখককে সাহায্য করেছেন— শ্রী কার্তিক চট্টোপাধ্যায় (উখরা), শ্রী বিবেক চক্রবর্তী (শোনপুর), শ্রী বিকাশ বিশ্বাস (নতুনপল্লী) দুর্গাপুর।*

☐ *লেখক পরিচিতি - গবেষক, প্রাবন্ধিক, গ্রন্থকার।*

শ্মশান, গোরস্থান—দুর্গাপুরের শ্মশান চুরি

নির্মলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কবির কথা দিয়ে শুরু কবি—"শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী"। জীবনের শেষে নশ্বর দেহ যেখানে দাহ হবে সেখান তরুছায়াময় পঞ্চবটের শোভা থাকবে তা খুবই স্বাভাবিক। গ্রামবাংলার অধিকাংশ শ্মশানে এই পঞ্চবটের শোভা দেখা যায়। কোনো ভুল নেই অধিকাংশ শ্মশান এই ধরনের গাছগাছালিতে ভরা প্রকৃতির শোভায় শোভাময়। প্রত্যেকটি মানুষেরই যেন আন্তরিক কামনা তার দেহ যেখানে দাহ করা হবে, সেখানে যেন স্বর্গের শোভা বিরাজ করে। পশ্চিমবঙ্গের যেখানে যত গ্রাম আছে গ্রামের মাথায় অবশ্যই থাকবে একটি শ্মশান। পাশে থাকবে কোনো জলাশয় পুকুর নদী বা কোনো খাল-বিল। শ্মশানের মধ্যে কালীমন্দির, যাকে বলা হয় শ্মশান কালীমন্দির, ভয়ংকর বীভৎস যার রূপ। যাকে দেখলে প্রাণে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। আবার মনে সাহসও বাড়ে এই ভাবনায়, শ্মশানের মতো এই ভয়ংকর স্থানে সাথে মা কালী রয়েছেন। তাকে স্মরণ করলে, অপদেবতাদের হাত থেকে রক্ষা করবেন। কোনো কোনো শ্মশানে থাকে একটি আশ্রয় বা ছোট ঘর। ঝড়বৃষ্টিতে দুর্যোগের রাতে, রাতের অন্ধকারে, সূর্যের খরতাপে শ্মশানবন্ধুরা যেখানে আশ্রয় নেয়। এই শ্মশানই তো কাপালিক, বা তান্ত্রিক সাধুদের পঞ্চমুণ্ডীর সাধনার স্থান। একসময় শ্মশানে বসে শবসাধনার কথাও শোনা গেছে। নরবলি দিয়ে শ্মশানকালীকে সন্তুষ্ট করার কথাও নানা গ্রন্থ কাহিনিতে বর্ণিত আছে। এখন এইসব খুব একটা দেখা যায় না। শ্মশান দেখতে গিয়ে সেখানে সাধারণ মানুষ, শ্মশানে এক সময় বসবাসকারী তান্ত্রিক সাধুদের কথা বড় মুখ করে বলেছেন। বলেছেন তাদের অলৌকিক ও অসাধারণ ভৌতিক কাহিনি। যা আজকের প্রজন্মের মানুষের কাছে আজগুবি বলে মনে হবে। তারা সে সব বিশ্বাস করতে চাইবে না। একসময় এই সমস্ত গল্পে বাংলার শ্মশান জমে ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এইসব গল্পকাহিনির জন্য শ্মশান ছিল ভয়ংকর ও ভয়ের স্থান। রাতের অন্ধকারে শ্মশানের পাশ দিয়ে গেলে দৈবাৎ পাখি ডেকে উঠলে, ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। মনে হয় অপদেবতার ডাক। সারা পশ্চিমবঙ্গের এই একই ধরনের শ্মশান চিত্র বা শ্মশান সংস্কৃতি থাকবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কালের পট পরিবর্তনে অনেক কিছুই তো বদলায়, শ্মশান বদলাবে, তা খুবই স্বাভাবিক।

দুর্গাপুরে শহর গড়ে ওঠার আগে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অরণ্যঘেরা কয়েকটি গ্রাম ছিল। প্রত্যেকটি গ্রামের মাথায় একটি বা দুটি শ্মশান ছিল, প্রত্যেকটি শ্মশানেই শ্মশানকালী ছিল, তাকে কোনো সন্দেহ নেই। এখানের শ্মশান সংস্কৃতিতে শ্মশানকালী থাকবে—একথা যেমন সত্য, পুরনো সেইসব দিনে দুবৃর্ত্তরা শ্মশানকালীকে ঘটা করে পুজো করে ডাকাতি করতে যেত। এই শোনা কথাও মিথ্যে নয়। দুর্গাপুরের চর্তুসীমায় অন্ডাল থেকে পানাগড়, দামোদর থেকে অজয় বিশাল লাল কংকরময় মৃত্তিকার বুকে যেমন ঘন অরণ্য ছিল, তেমনি প্রবল

প্রতাপান্বিত জমিদার না থাকলেও কয়েকজন বড় ভূস্বামী ছিলেন। সেই বিশাল অরণ্য আজ উৎপাটিত, তাকে ছেদন করে শহর বানানো হয়েছে। শহরের মধ্যে দেখা গেছে কয়েকটা শ্মশানকালী মন্দির, কিছু গুহা, পরিত্যক্ত কিছু গড়। শ্মশান কালীমন্দিরের সংলগ্ন যে শ্মশান ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গুহা-গড় একসময়ের ভূস্বামীদের বানানো হতে পারে। তবে সঠিক তথ্য অজানা। বিশ্বাসের অযোগ্য কিছু কাহিনি আছে। ভবানী পাঠকের গড় বললে এ-কোন ভবানী পাঠক? বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরানী উপন্যাসে এক ভবানী পাঠকের নাম শোনা যায়। ইনি কি সেই? অনেকে মনে করেন। কিন্তু প্রমাণ কিছু নেই। দুর্গাপুরে শহর গড়ে ওঠার সাথে সাথে দুর্গাপুরের প্রকৃতির প্রকৃত অবস্থা থেকে দূরে সরে গেছে। তথাপি কিছু চিহ্ন থেকে গেছে। সেই চিহ্ন ধরে স্থানটি চিহ্নিত করতে অসুবিধা নেই। এখানের কালীনগর গ্রামটির কথাই উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক না। দুর্গাপুর স্টেশন থেকে ছয় কিলোমিটার উত্তরে কালীনগর বলে অন্ততঃ তিন দশক আগেও কোনো গ্রাম ছিল না। সেখানে আড়াগ্রামের সামনে ঝোপঝাড় জঙ্গলময় অনাবাদি অব্যবহৃত জমি ছিল। কয়েকটা খড়ের ছাউনির ঘর ছিল। এই জঙ্গলময় অনাবাদি জমিতে ছিল একটি বড় আকারের শ্মশান। আশেপাশের গ্রামের মানুষেরা তাদের প্রিয়জনদের এখানে দাহ করত। তবে একমাত্র শ্মশান নয়। সেই শ্মশানে একদিন ঘটল নরহত্যা। স্থানীয় থানার কালীপদ দারোগা কেস ডায়েরি করতে এসে বিপাকে পড়ে যান। ঘটনার স্থানের নাম কী? কেউ সঠিক জানে না। তারা যা বলে দারোগাবাবু সন্তুষ্ট হতে পারেন না। তাকে ডায়েরিতে স্থানের নাম উল্লেখ করতে হবে। তিনি নিজেই নামটা ঠিক করে বললেন এই শ্মশানকালীর নামেই হোক কালীডাঙা। কালীডাঙা পরবর্তীকালে ডাঙা হয়ে থাকতে চাইল না। দুর্গাপুরের বাড়বাড়ন্ত হওয়ায় সভ্য ভদ্রলোকেরা এখানে বাড়ি বানায়। তারাই পরিবর্তন করে স্থানটার নামকরণ করে কালীনগর। কালীনগর এখন শহরের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। সে যাইহোক চারিদিকে ঘরবাড়ি গড়ে উঠলেও, মাঝখানে শ্মশানকালী মন্দির আলোকোজ্জ্বল হয়ে শোভা পাচ্ছে। এখানে একদিন পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকদের শ্মশান ছিল। এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে জনপদ। কী ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে এই অবস্থার। শ্মশানচুরি। অবশ্যই শ্মশানচুরি। এটি একটি উদাহরণমাত্র। দুর্গাপুরের সর্বত্র তো এই একই অবস্থা। দুর্গাপুরের শ্মশান অবস্থার কথা জানাতে দুর্গাপুরে ব্যাপকহারে শ্মশানচুরির চিত্র ধরা পড়ে যাচ্ছে।

কালীনগর গ্রামের নামটা পরে হয়েছে জানা গেল। দুর্গাপুর গ্রামটা কোথায় ছিল যেমন কেউ বলতে পারে না। তেমনি কেউ জানে না ফরিদপুর গ্রামের প্রকৃত অবস্থান। আর মাত্র একদশক পরে দুর্গাপুরের গ্রামগুলিও হারিয়ে যাবে। অবসরপ্রাপ্ত লোকদের বাড়ি বানানোর জোয়ারে হারিয়ে যাবে গ্রামগুলির প্রকৃত সীমানা। সব গ্রামগুলিই এখন আবাসন নির্মাণের জোয়ারে ডুবুডুবু। এই আবাসন নির্মাণের প্রবাহে গ্রামের ফাঁকা মাঠ, গ্রামের পাশে শ্মশান, সব লোপাট। নব্বই দশকে বাড়ি নির্মাণের প্রবাহ শুরু, দু-হাজারে তুঙ্গে। কারণ কারখানায়-কারখানায় ডি. আর প্রকল্প। সবশ্রেণির মানুষের হাতে টাকা। কোম্পানির কোয়ার্টার বিক্রিতে

টালবাহানায়, চাপ বাড়তে থাকে গ্রামের মাথায় ফাঁকা জমিতে, শ্মশানে। বাড়ি বানানোর হিড়িকে গ্রামের জমিতে টান পড়ায় উচ্চহারে বিক্রি হয়ে যায় শ্মশানের জমি। শ্মশান তখন কোনো ভয়ের স্থান নয়, ভরসার স্থান। প্রতিবেশীরা চেনাজানা। পরিবেশ-ভালো। শ্মশানে কী এসে যায়। শ্মশানের জমির মালিকরাও তৎপর। বাপ-ঠাকুরদারা বোকামি করে গেছেন অনাবাদি পতিত জমিতে শ্মশান করতে দিয়েছে। তাবা জানতো না জমি লক্ষ্মী। আগের পুরুষদের বোকামি পরবর্তী প্রজন্ম শুধরে নেয়, উচ্চহারে শ্মশানের জমি বিক্রি করে। এইভাবে শ্মশান বিক্রিতে স্থানীয় মানুষের প্রতিবাদ থাকতে পারে। সেখানেও ভিতরে ভিতরে বন্দোবস্ত হয়ে যায়। সরকারি জমি যদি পতিত জমি হয় তাহলে পতিতপাবন জমির দালালরা ও পার্টির দাদারা ত্রাতার ভূমিকায়। কম দামে জমি দখল দেওয়াতে তারা তৎপর। একবার বাড়ি হয়ে গেলে ওঠায় কে? বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও বাড়ি হতে বিলম্ব হয়নি। এখন সে স্থানে গেলে কে বলবে দু-দশক আগে সেখানে শ্মশান ছিল। সেখানে মড়া পোড়ানো হত। শ্মশানের কোনো চিহ্ন নেই। চারিদিকে সুরম্য সুদৃশ্য ঘরবাড়ি। অবশ্য শ্মশানের শ্মশানকালী অবিকৃত রয়ে গেছেন। শ্মশানকালীর জন্য প্রমাণ করা যেতে পারে এখানে শ্মশান ছিল। মানুষের প্রয়োজন, মানুষের লোভ, মানুষের ক্ষুধা শ্মশানকেও গ্রাস করেছে। এই অবস্থা সমগ্র দুর্গাপুরেব কোন এক স্থানের চিত্র নয়। সর্বত্র এই একই অবস্থা। দুর্গাপুরের দক্ষিণে দামোদর নদ, বিভিন্ন কলকারখানা। উত্তরের গ্রামগুলির কথা যদি উল্লেখ করা যায় প্রধান শহর বেনাচিতির প্রান্তিকা থেকে জেমুরা, ফুলঝোর, টেটিখোলা, শঙ্করপুর, কালীগঞ্জ, আড়া, বামুনয়াড়া থেকে পানগড়ের আগে গোপালপুর পর্যন্ত সর্বত্র এই একই অবস্থা। নতুন গড়ে উঠা আবাসনের জোয়ারে শ্মশান অরণ্যস্থান সব লোপাট। কয়েক দশক পরে কোনটা যে কোনো গ্রাম, খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে।

এমন যদি অবস্থা হয়, শ্মশান যদি লোপাট হয়ে যায়! তাহলে কী হবে? শ্মশান বিনা এই নরদেহ পুড়িবে কোথা? শ্মশান তো প্রয়োজন। মানুষ জানে সে কথা। কিন্তু সময়ের প্রেক্ষিতে গ্রামের শ্মশান অনেকটাই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। গ্রামের শ্মশানে পুড়েও, অনেকে সরকারি খাতাকলমে এখনও বেঁচে আছে। অপঘাতে মৃত ব্যক্তিকে পুড়িয়ে ঝামেলা জিইয়ে আছে। সুধী বিবেচক ব্যক্তিরা তাই বলছেন, শ্মশানে দেহ পুড়বে। তবে গ্রামের শ্মশানে নয়। যেখানে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে লোক নিয়োগ করা আছে, সেখানে। সেখানের সার্টিফিকেট ভ্যালিড হবে। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে বা পঞ্চায়েত থেকে পাওয়া যাবে কড়কড়ে কাগজ। দুর্গাপুরের মানুষের আর সেদিন নেই। প্রত্যেকের এখানে ওখানে কিছু জমান টাকা আছে। তা পেতে হলে একটি ডেথ সার্টিফিকেট দরকার। সেটির কথা ভেবে সকলেই যাচ্ছেন দুর্গাপুরের একমাত্র মহাশ্মশান বীরভানপুরে। সেখানে মৃতদেহ নিয়ে গেলে, সব মুশকিল আসান। দাহ করার সংস্কারের সব কাজ করার সব সুবিধা পাক্কা। দাহ করার জন্য কাঠ-কয়লা-কেরোসিন, অভিজ্ঞ শ্মশানবন্ধু-পুরোহিত, সাথে সাথে দাহের সার্টিফিকেট দেবার সব সুবিধা বর্তমান। মৃতদেহ

সেখানে পৌছলে দাহ করতে কোনো অসুবিধা হয় না। বীরভানপুর শ্মশান দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যালিটি অনুমোদিত মহাশ্মশান। শ্মশানটি প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ভরপুর। পঞ্চবটের শোভা এখানে বর্তমান। বহুবৃক্ষেব সমারোহে ছায়াময়। পাশে শ্মশানেব কোল ঘেঁষে দামোদর নদের অবস্থান দেখলে স্বর্গের সিঁড়ি বলে ভ্রম হয়। দামোদর এখানে রুখা-শুখা নয়, উতলা। সামনে ব্যারেজ থাকার জন্য জলে টইটম্বুর। অধিকাংশ মানুষের ত্রিবেণী গিয়ে অস্থি দেওয়ার যে সংস্কার আছে, যে সংস্কারপর্ব বহুজন এখানেই সেরে নেয়। সব দিক দিয়ে বীরভানপুরের শ্মশানের গ্রহণযোগ্যতা আছে। জনপ্রিয়তা বাড়ছে। বাড়ছে বলেই গ্রামের শ্মশান অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে। গ্রামের বয়োবৃদ্ধরা পর্যন্ত জানে বীরভানপুর শ্মশানের কথা। মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধরা তাদেব শেষ ইচ্ছার কথা তার সন্তানদের জানায়। তারা বলেন, তাদের দেহ যেন বীরভানপুর শ্মশানে দাহ করা হয়। কিন্তু তারা জানে না। তাদের একথা না বললেও হত। তাদের গ্রামের মাথায় যে শ্মশানের কথা তারা জানে, সে শ্মশান এখন নেই। ভিনদেশের ভদ্রলোকেরা সেখানে বাড়ি বানিয়ে বসবাস করছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে, দুর্গাপুরের মতো আধুনিক শহরে, প্রাচীন সংস্কৃতি নিয়ে চলতে পারে না। এগিয়ে যাবার, এগিয়ে নিয়ে যাবার দায় তাবও আছে। সেই ভাবনায় নির্মাণ হচ্ছে বৈদ্যুতিক চুল্লি। নির্মাণ প্রকল্প প্রায় শেষের দিকে। খুব দ্রুত চালু হয়ে যাবার কথা। বাধা হচ্ছে কিছু সংসার। অনেকে ভাবছেন ধর্মের সংস্কার বোধহয় পালন হবে না। তাছাড়া শ্মশানে যারা কাঠ-কয়লা-কেরোসিন বিক্রি করে খেত, তাদেব অসুবিধা হবে। বাধা তাদের কাছ থেকে আসতে পারে। যাই হোক সব বাধা দূর হয়ে বৈদ্যুতিক চুল্লি তাড়াতাড়ি চালু হয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মানুষ যখন বুঝবে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে সুবিধা বেশি খরচ কম, সময় লাগে কম, তখন সকলে বৈদ্যুতিক চুল্লির দিকে ঝুঁকবে। দুর্গাপুবে শ্মশানের পর শ্মশান বিলোপ হয়ে গেছে কোথাও তেমন প্রতিবাদ ওঠেনি একথা ঠিক নয়। অত্যন্ত একটা শ্মশানের কথা জানা আছে সেই শ্মশানের জমি দখল নিয়ে প্রতিবাদ উঠেছে। শ্মশানের জমিকে অবিকৃত রাখার জন্য স্থানীয় জনসাধারণ গণদরখাস্ত দিয়েছে। সেই শ্মশানটির নাম হচ্ছে শঙ্করপুর শ্মশান। শ্মশানটির পরিবেশ অবস্থান খুবই সুন্দর। দুর্গাপুর বেনাচিতির রাস্তার পাশে। এমন অবস্থানে শ্মশান টিকিয়ে রাখা মুশকিল। ইতিমধ্যে শ্মশানের গা ঘেঁসে দেওয়াল উঠছে। শ্মশানটি খুব প্রাচীন। এই শ্মশানের একজন তান্ত্রিক সাধুর কথা সকলের মুখে শোনা যায়। শ্মশানের ২৯ শতক জমি প্রায় দখলের পথে। দুর্গাপুরে যারা অবস্থাপন্ন মানুষ, তাদের পুড়বার শ্মশানের অভাব নেই। কিন্তু যারা চিরবঞ্চিত দরিদ্র শ্রেণির মানুষ, তারা কোথায় যাবে? তাদের দেহ দাহ করার জন্য এক টুকরো জমি দরকার। সেই আদিবাসী পাড়ার মানুষেরা যেখানে দাহ হতেন, সেখান থেকে তাদের শ্মশান দূরে সরে গেছে।

চারিদিকে সুরম্য সুদৃশ্য ঘরবাড়ি মাঝে শ্মশান, কেমন যেন বেমানান। দুর্গাপুরে দু-এক স্থানে এমন দৃশ্য দেখা যায়। দুর্গাপুরের করিধ্যায় এ ধরনের শ্মশান আছে। ঘরে বসে মড়া

পোড়াতে দেখা যায়। আপত্তি থাকতে পারে। আপত্তি টিকবে কেন? অসহ্য অসহনীয় হলেও নয়। শ্মশানে মড়া পোড়া নিয়ে আপত্তি উঠেছে মহাশ্মশান বীরভানপুরকে ঘিরে। সেখানে দিনে অন্তত ২৫/২৬টি মড়া পোড়ে। অনবরত মড়া পুড়ছে। মড়া পোড়ার গন্ধ বাতাসে উড়ছে, ছাই উড়ছে। এই নিয়ে প্রতিবাদ উঠেছিল স্থানীয় একটি পত্রিকায়। নিকটবর্তী গ্রাম শহরের লোকেরা দিনরাত মড়াপোড়ার গন্ধে অতিষ্ঠ। বৈদ্যুতিক চুল্লিই এর সহজ সমাধান করতে পারে। তা চালু না হওয়া পর্যন্ত পরিবেশ দূষণের ব্যাপারটা থেকে যাবে। দুর্গাপুর শহর গড়ে ওঠার সাথে সাথে ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ধর্মের মানুষেরা এখানে চাকরি করতে আসে। অবশ্যই সাথে নিয়ে আসে মৃতদেহ গতি করার জন্য নিজস্ব সংস্কার ও ভাবনা। দুর্গাপুরে দুটি অঞ্চলের কথা জানা আছে যেখানে মুসলিম ধর্মের কিছু মানুষ আছেন। যেখানে মৃতদেহ কবর দেবার জন্য কবরখানা আছে। যেমন খয়রাখোল, জেমুয়া ও মগড়ভাঙা। জেমুয়া কবরখানা বর্তমানে সুরক্ষিত। পঞ্চায়েত থেকে দু-লাখ টাকা খরচ করে কবরখানাটি ঘিরে দিয়েছে। খ্রিস্টধর্মের লোকদের জন্য একটিমাত্র কবরখানা আছে সেটি হচ্ছে গঙ্গনগর। এই শহরেব সব খ্রিস্টধর্মের মানুষদের সেখানে কবর দেওয়া হয়। এই গঙ্গনগরের খ্রিস্টধর্মের কবরখানার বা গোরস্থানের পাশে মুসলিম ধর্মেব লোকদের কবর দেবার আরও একটি কবরখানা আছে।

দুর্গাপুর-বেনাচিতি রাস্তার ধারে শঙ্করপুর শ্মশান। জনগণের আপত্তিতে এখন কোনক্রমে টিকে আছে। ছবি : নির্মলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

☐ লেখক পরিচিতি—গবেষক, প্রাবন্ধিক।

বোলপুর-শান্তিনিকেতনের শ্মশান

মলয় ঘোষ

বীরভূম জেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান হল বোলপুর-শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন অঞ্চলটি। বোলপুর, শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন, সুরুল ইত্যাদি স্থান এখন মিলিমিশি করে অনেকটাই বৃহত্তম বোলপুরকেই বাস্তবায়িত করতে শুরু করেছে। কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো আমরা বৃহত্তম বোলপুরকে সার্থকভাবে দেখতে পাব। বর্তমানে এই ছয় বর্গ কি.মি. আয়তনেব অঞ্চলটিতে চারটি শ্মশানের অবস্থান লক্ষ করা যায়, লোকসংখ্যা বা আয়তনের তুলনায় যা নিতান্তই বেশি। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য এই চারটি শ্মশানেই এখনও মৃতদেহ সৎকার কবার কাজ চলছে সমানে।

বোলপুরের বাসস্ট্যান্ডের কিছু পূর্বে বাঁধগোড়া-ভুবনডাঙার মধ্যবর্তী স্থানে এতদঞ্চলের প্রাচীন শ্মশানটি অবস্থিত। বর্তমানের অবস্থান যা তাতে এই শ্মশানটি ভুবনডাঙার মনে হলেও, আসলে এটি বাঁধগোড়ার শ্মশান। বিঘা চারেক জায়গার উপর অবস্থিত এই শ্মশানটি। শ্মশানে ঢোকার মুখেই পাকা কালীমন্দির। মন্দিবটি ১৩৭৩ সালে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিব গাত্রে সেবকের নাম খোদাই আছে ভবানীকুমার দত্ত। শ্মশানের উত্তবে কালী মন্দিব এবং আটচালা। কিছুটা দক্ষিণে একটি ছোট শিব মন্দির, ভিতরে শিবলিঙ্গ রয়েছে। শ্মশানের পশ্চিম পাশে ইটের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা মৃতদেহ সৎকারের স্থান, অস্থায়ী চিতা ইত্যাদি। বৃষ্টি বা বর্ষার সময় এখানে মৃতদেহ সৎকার করা বেশ অসুবিধাজনক। শ্মশানটির মধ্যে একটি বন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ আছে। কারণ এটিকে ঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। এই শ্মশানটির দক্ষিণে গাছপালায় ঘেরা বন্য স্থানে এক টুকরো পাকা উঠোন। এটি রতন গোঁসাইয়েব পাট। শ্মশানের শিব মন্দিরের পাশেই আছে স্বামী স্বরূপানন্দ সরস্বতীর সমাধি। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীব শিষ্য কিবণচাঁদ দরবেশজি মহারাজ, তাঁর শিষ্য ছিলেন স্বামী স্বরূপানন্দ সরস্বতী।

বোলপুর শহরের পূর্বে নীচু পটী অঞ্চলের একদম শেষে রয়েছে সতীঘাট মহাশ্মশান। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, গোড়া বাঁধানো বিরাট বট গাছ। শ্মশানেব উত্তব দিকে কালী মন্দির। মন্দিরটির পুনর্নির্মাণ হয়েছে ১৪০৭ সালে। অতুলকৃষ্ণ পাল, সনকা পালেব পুত্র রাজেশ পাল ও অমৃত পাল মন্দিরটির পুনর্নির্মাণ করেছেন। মন্দির সংলগ্ন আটচালাটি ১৪০৩-এ নির্মাণ করে দিয়েছেন দেবকুমার দত্ত, রামপ্রসাদ দত্ত, তরুণ দত্ত, কল্পনা দত্তরা। শ্মশানে প্রবেশের মুখেই মারোয়াড়ি সমাজ কর্তৃক নির্মিত বিশ্রামকক্ষটি প্রথমেই চোখে পড়ে। শ্মশানের দক্ষিণে স্থায়ী চিতা তৈরি হয়েছে। মাথায় ছাদ আছে চিতাটির, ঠিক পাশেই সরু ক্যানেল। কালীমন্দিরের পিছনেই বিরাট নিমগাছের তলায় শিবলিঙ্গ। শ্মশানের পূর্বদিকে ছোট্ট একটু ঘেরা জায়গায় একটি 'রবীন্দ্র ভাস্কর্য' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের প্রস্তর মূর্তি—শুধু মুখটুকু। পূর্বদিকে দু' একটি ছোট স্মৃতিসৌধও রয়েছে।

এই শ্মশানটি ১৯৩৩ সালে শ্রীশ্রীমদন গিরি মহারাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। শ্মশানের জায়গা অধরচন্দ্র দিগর মহাশয়ের দান করা। শ্মশানটির নবীকরণ করে এটিকে সাজিয়ে তোলা হয় ১৯৭৭ সালে। কথিত আছে শ্মশান স্থাপনের প্রথম দিকে বোলপুরের এক দম্পতি এক সাথে মারা যান (আত্মহত্যা নয়) স্বাভাবিক ভাবে। তাঁদের মৃতদেহ দাহ করা হয় এই শ্মশানে। তারপর

থেকেই এই শ্মশানের নাম হয় সতীঘাট শ্মশান। বর্তমানে এই শ্মশানটিতেই সবচেয়ে বেশি মৃতদেহ দাহ করা হয়।

শান্তিনিকেতন সংলগ্ন রতন পল্লীর শেষে শ্যামবাটী ক্যানেলের উত্তর পাড়ে রয়েছে আর একটি পুরোনো শ্মশান—মানিকের শ্মশান। এটি প্রায় ১৫০ বছরের পুবোনো বলে মনে করা হয়। বর্তমানে এটিকে মানিকের শ্মশান বলা হয়। মানিক ছিলেন এ শ্মশানের দেখভালের দায়িত্বে। শ্মশানটি একটি ঘেরা বাগানের মতো দেখতে। বিঘে দুয়েক জায়গার ওপর গাছে গাছে ঘেরা এ শ্মশানটি অতীব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চারিদিক ইটের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। শ্মশানের ঠিক মাঝখানে কালীমন্দির। পশ্চিম পার্শ্বে স্থায়ী চিতা। পূর্ব পার্শ্বে শ্মশানের মালিক মানিকের ঘরবাড়ি, কুয়োতলা। এই শ্মশানটি ব্যক্তিগত মালিকানায় চলছে এখন।

শ্রীনিকেতনে আর একটি শ্মশান আছে। এটি সুরুলের সরকারদের জায়গায় গড়ে উঠেছে। পাক্কা তিন বিঘা জায়গা নিয়ে শ্মশানটি তৈরি। Eastern Zonal Cultural Centre-এর ঠিক বিপরীত দিকে এই শ্মশানটি। এই শ্মশানে কোনও কালীমন্দির নেই। রাস্তাব ঠিক পাশে অবস্থিত এই শ্মশানটি পাকা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। দুটি বড় বৃক্ষ ছাড়া তেমন কোনও গাছ এখানে নেই। একটি পাকা ইটের তৈরি চিতা এবং একটি বিশ্রাম নেবার জায়গা নির্মিত হয়েছে বেশ ক'বছর আগে। শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন ও সুরুলের মৃত মানুষদেরই এ শ্মশানে সৎকাব করা হয় মূলত। এই শ্মশানটি এ অঞ্চলের নবীনতম শ্মশান হিসেবে পরিচিত। শ্মশানের অদূরে কালীসায়র ও তার তীরে কালীমন্দির।

বোলপুর অঞ্চলেব এই চারটি শ্মশানে এখন প্রায় ১৬/১৭ কিমি. দূরের গ্রাম থেকেও মৃতদেহ নিয়ে এসে সৎকার করা হয়। সতীঘাট এবং শ্রীনিকেতনের শ্মশান সন্নিকটস্থ স্থানে বিকালে মানুষজন বেড়াতে আসেন। বোলপুবের শ্মশানগুলির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এগুলির পরিচ্ছন্নতা। একমাত্র বাঁধগোড়া শ্মশানটি খুব বেশি পবিচ্ছন্ন নয়। বোলপুর পুরসভা বা শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদ কোনও শ্মশানই অধিগ্রহণ করেনি বা প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনেনি। তবে ওই দুই প্রতিষ্ঠানই শ্মশানগুলির সংস্কারে সচেষ্ট হয়েছে। অনেক সহৃদয় মানুষজনও আর্থিক সহায়তা নিয়ে শ্মশানের উন্নয়নে এগিয়ে এসেছেন। মৃত্যুর পর মানব শরীর এক জড় পদার্থ ছাড়া কিছু নয়, তবু সেই জড় পদার্থটি একটি বিশেষ ব্যক্তিত্বেব সাথে জড়িয়ে থাকে, তাই তার সম্মানজনক, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র সৎকার প্রয়োজন। এ অঞ্চলের মানুষ এই প্রচ্ছন্ন সত্যটিকে উপলব্ধি [illegible] পেরেছেন বলেই বোলপুরের শ্মশান মৃত্যুর মতোই পবিত্র পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ।

□ লেখক পরিচিতি—গবেষক, প্রাবন্ধিক।

রাজকীয় মুসলিম সমাধি ও সমাধিলিপি

গোপাল লাহা

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পর জীবনের শেষ পরিণতি মৃত্যু। মৃত্যুর পর মৃতদেহের সৎকার দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম হিসেবে বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। কেউ মৃতদেহ শ্মশানে দাহ করে, কেউ সমাধিস্থলে সমাহিত করে বা কবর দেয়, কিছু সংখ্যক ব্যক্তি আবার অর্থাভাবে বা সংস্কার বশত মৃতদেহ জলে ভাসিয়ে দেয়।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শবাধারে শব মমি করে রাখতে বা মমির ওপর পিরামিড গড়ে তুলতেও দেখা যায় কোনো কোনো দেশে। মমির কথা আলোচিত হলে মিশরের ফ্যারাওদের পিরামিড-এর কথা মনে পড়ে। কথিত আছে, "মৃত্যুতেই যে মানুষের সব কিছু শেষ হয়ে যায়, প্রাচীন মিশরবাসীরা তা কোনোদিনই বিশ্বাস করত না। তারা ভাবত যে, পশ্চিম দিগন্তের যেখানে প্রতিদিন সূর্যদেব অস্ত যান, সেখানে আছে মৃতের রাজ্য বা কিংডম অব দি ডেড। দিনের শেষে ক্লান্ত রবি যেমন অস্তাচলে নেমে আসেন বিশ্রামের আশায় তেমনি মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা শান্তির নীড়, এই পরম ঈপ্সিত লোকে এসে পৌঁছোয়।"[১] আমাদের পূর্বপুরুষদের মতো মিশরীয়রাও বিশ্বাস করত আত্মা অবিনাশী এবং আত্মার একটি সঞ্জীবনী শক্তি আছে, যা তাকে সবরকম অবক্ষয় থেকে রক্ষা করে। মৃত্যুর পর মুক্ত আত্মা (মিশরীয় ভাষায় 'বা') দেহপিঞ্জর থেকে ছাড়া পাবার পর মহাশূন্যে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং তখনই সে চায় পুনরায় তার ত্যক্ত জীর্ণ দেহটির মধ্যে ঢুকে বিশ্রাম নিতে। মিশরীয়রা তাই আত্মার বিশ্রামের আধার দেহটিকে বিনষ্ট হতে না দিয়ে তাকে চিরন্তনভাবে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে 'মমি' তৈরি করেছিল এবং মমিকে রক্ষা করার জন্য গড়ে তুলেছিল বিরাটাকার পিরামিড। যে স্থানে মমিকে রাখা হত তার নিকটেই থাকত খাদ্য-পানীয়, তৈজসপত্র ও নানা প্রসাধনী সামগ্রী যা মৃত ব্যক্তির-দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য ছিল। ...মমির সঙ্গে সমাধিস্থ হত কুবেরের ঐশ্বর্য। বহুমূল্য রত্নময় অলঙ্কারাদি তাদের সঙ্গে শোভা পেত। মাথায় থাকত মণিমুক্তা খচিত রাজমুকুট, হাতে সোনার ঢাল-তরোয়াল এবং সর্বোপরি পরলোকে অমঙ্গলের হাত থেকে বাঁচার জন্য তাবিজও।

মুসলিমদের কাছে সমাধি

সমাধি মুসলিমদের কাছে কবর গোর বা আলমে বরজখ বা মৃত আত্মার কেয়ামত অবধি শেষ আশ্রয়স্থল বা বাসস্থান। মুহাম্মদ করম আলি বলেছেন, "কবর বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিশেষ পদ্ধতিতে খোদিত এমন একটি গর্তের দৃশ্য যে দৃশ্য আমাদেরকে মানব জীবনের শেষ পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জীবনের বেলা শেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার পর জগতের সাথে যখন সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন শুরু হয়ে যায় ঐ মাটির গর্ত খননের আয়োজন। পাড়া-পড়শী, আত্মীয়-স্বজন সবাই মিলে তখন ঐ মৃত ব্যক্তির লাশটাকে সেই মাটির গর্তের ভিতরে সযতনে মাটি চাপা দিয়ে রেখে আসে। তারপর তার কথা ক্রমে ক্রমে ভুলে যায়।

তাই 'কবর' যেন মরা মানুষের ঘর। মাটির নীচে কবররূপ সেই নির্জন ঘর সমূহে শুয়ে আছেন আমাদের কত-শত অগণিত প্রিয়-পরিজন—যারা আমাদের মতোই বসবাস করতেন এ

সুন্দর জগতে। আমাদের মতোই হাজারো আশা-আকাঙ্ক্ষার জাল বুনতেন মনের গোপন মণিকক্ষে। কিন্তু আজ তারা নেই। তারা চলে গেছেন এ সুন্দর দুনিয়া ছেড়ে কঠিন মাটির গর্তরূপ ঐ কবরের ভিতরে। এ জগতে আর কখনো তাদের আগমন ঘটবে না। তারা চির জনমের মতো কবরের মাঝে হারিয়ে গেছেন।

সেই হারিয়ে যাওয়া আপন জনদের প্রতি রয়েছে আমাদের বিরাট দায়িত্ব। আমরা তাদের রূহেব মাগফেরাতের জন্য দোয়া করব, যেন মহান আল্লাহ তাদের পাপসমূহ মাফ করে দেন এবং তাদের মরত (বা ইজ্জত) শতগুণ, হাজারগুণ বাড়িয়ে দেন। কবর জেয়ারত্তের সময় অনুরূপ দোয়া করাই হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য।''[২]

এমনও মৃত ব্যক্তি রয়েছেন যিনি কবরে শেষ শয্যায় শায়িত হলেও লোকে তাকে মনে বাখে। তার কল্যাণপূত কর্ম, পৌরুষদীপ্ত দৃপ্ত মুখচ্ছবি আপামর জনতার মনের মুকুরে উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রতিভাত হয়।

মালদায় মুসলিম সমাধি

মালদায় যে সমস্ত মুসলিম সমাধি ও সমাধিলিপি ছিল বা আছে সেসবের সবগুলো এযাবৎ অক্ষত এবং স্বস্থানে সন্নিবেশিত রয়েছে এমনটি বলা যায় না। মালদায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাধি অবশ্যই বাঁধিয়ে রাখা হত বা সমাধিক্ষেত্রটি প্রাচীর ঘিরে রাখা হত কিংবা সেনোটাফে ঢেকে সমাধি মাঝে রেখে তার ওপর ইট বা রঙিন ইট গেঁথে তোলা হত সমাধিগৃহ অর্থাৎ টম্ব বা মসোলেম। সমাধির পরিচয়জ্ঞাপক কারুকার্যখচিত সুদৃশ্য লিপি সংযুক্ত হত সমাধিফলকে, সেনোটাফে বা সমাধিগৃহে। সমাধিলিপিগুলোর অধিকাংশ কালো কষ্টিপাথরে খোদিত হত, কিছু কিছু খোদিত হত ব্ল্যাক ব্যাসাল্ট পাথরে, বেলে পাথরে বা শ্বেতপাথরে। মজবুত পাথরে লিপি খোদাই করে রাখার কারণে কিছু সমাধিলিপি এখনও টিকে আছে।

মধ্যযুগে মালদায় সব মুসলিম লিপিই ব্ল্যাক ব্যাসাল্ট , বেলে পাথরে কিংবা কষ্টিপাথরে খোদিত হত বা রিলিফে উৎকীর্ণ থাকত।

শ্বেতপাথরে খোদিত মধ্যযুগীয় লিপি মালদায় বিরলদৃষ্ট। যাওবা চোখে পড়ে তাও উৎকীর্ণ আধুনিককালে। ইটের ওপর খোদিত লিপিও এসেছে মালদায়। মালদায় মধ্যযুগীয় সমাধিলিপি কোনওটি আরবিতে, কোনওটি ফারসিতে রচিত। ইংরেজি ও বাংলায় রচিত মুসলিম সমাধিলিপি ফলকগুলি আধুনিক কালের। আধুনিক কালের মুসলিম সমাধি লিপিফলকে শ্বেত পাথরের ব্যবহারও পরিলক্ষিত হয়।

১২০৫ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়াব খিলজীর গৌড় বিজয়ের বা লক্ষ্মণাবতী বিজয়ের মধ্য দিয়ে মালদায় মধ্যযুগের সূচনা। আব্দুল করিম ও সুখময় মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থে এ বিষযে বিস্তৃত তথ্য রয়েছে। সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থে লিখেছেন,

''বখতিয়ার গৌড় অর্থাৎ লক্ষ্মণাবতী জয় করেছিলেন ৬০১ হিজবাব ১৯শে রমজান তথা ১০ মে ১২০৫ খ্রি. তারিখে একথা এখন প্রামাণিকভাবে জানা গিয়েছে বখতিয়ার খিলজির একটি নবাবিষ্কৃত টঙ্ক (স্বর্ণমুদ্রা) থেকে। এতে তারিখ এবং গৌড় বিজয়ের কথাটি দেবনাগরী অক্ষরে লেখা আছে।[৩] স্বর্ণমুদ্রাটি পরিচয় বহন করে প্রবর্তক হিসেবে সুলতান মুইজ-উদ-দীন

মোহাম্মদ বিন সাম ওরফে মোহম্মদ ঘোরীর নাম। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনিবের নামে বখতিয়ার খিলজিই ঐ স্বর্ণমুদ্রা প্রবর্তন করে থাকবেন এমন অভিমত প্রকাশ করেছেন।

খাজা নিজামউদ্দিন আহমদ-এর গ্রন্থ পাঠে জানা যায় সবুক্তগীন গজনীর প্রধান হয়েছিলেন ৩৬৭ আল হিজরায় বা ৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে। তিনি তাঁর শাসনকালের ১০ বছরের মাথায় হিন্দুস্থান আক্রমণ করেছিলেন ৯৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দে। ঐতিহাসিক আব্দুল করিমের মতে প্রথম দফায় ভারতবর্ষে মুসলিম রাজ্যবিস্তারের শুরু হয়েছিল ৭১১ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ-বিন-কাসেমের নেতৃত্বে সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের মধ্য দিয়ে।[8]

বখতিয়ারের বিহার আক্রমণ ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে, গৌড় আক্রমণ ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে এবং গৌড় বিজয় ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে। গৌড় বিজেতা আসার আগে গৌড়ে মুসলিম আগমন খুঁজতে গেলে তা মুসলিম পর্যটকদেব সুফি-সাধকদের এবং আবব বণিকদের বাণিজ্যবাস অনুসরণ করে এগোতে হবে।

মালদায় মুসলিম সমাধির শ্রেণিবিভাগ

মালদায় মুসলিম সমাধিগুলোকে বিষয়ভিত্তিক কমপক্ষে ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

১) মালদায় রাজকীয় মুসলিম সমাধি ও সমাধিলিপি।

২) মালদায় মুসলিম ঐতিহাসিকদের সমাধি ও সমাধিলিপি।

৩) মালদায় পীর-ফকিরদের সমাধি ও সমাধিলিপি।

৪) মালদায় বিশিষ্ট ও সাধারণ মুসলিম ব্যক্তি বিশেষের সমাধি, সমাধিলিপি ও স্মৃতিলিপি।

মালদায় রাজকীয় মুসলিম সমাধি ও সমাধিলিপি

গৌড়-পাণ্ডুয়ায় শাসন করেছেন দিল্লির বাদশা তাঁদের প্রতিনিধি মারফত এবং স্বাধীন সুলতানেরা। এভাবে তুর্কি, তুঘলক, ইলিয়াস শাহী, রাজা গণেশের বংশ, হাবসি মোগল, পাঠান প্রভৃতির শাসনাধীনে বা তাঁদের বংশধরদের মৃত্যু হলে কিছু কিছু রাজকীয় ব্যক্তিত্ব সমাহিত রয়েছেন মালদার মাটিতে।

সৈয়দ আশরফ আল-হোসেনির সুযোগ্য পুত্র সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ ছিলেন একজন প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রশাসক। পূর্ববর্তী সুলতান মুজফফর শাহের সৈনিক হোসেন শাহ নিজ যোগ্যতা দেখিয়ে তাঁর উজিরপদে উন্নীত হয়েছিলেন। উচ্চাভিলাষ চরিতার্থকল্পে উজির এমনসব প্রজাপীড়নমূলক পরামর্শ সুলতানকে দিতে থাকলেন এবং নিজে প্রজা ও রাজকর্মচারীদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে থাকলেন। সুলতান উজিরের পরামর্শে সৈন্যদের বেতন কমিয়ে দিয়ে রাজকোষের অর্থ বাড়ালেন ও অন্যান্য প্রজাপীড়নমূলক ব্যবস্থা নিলেন। ফলে সৈন্যদের কিছু অংশ এবং বড় বড় অমাত্য সুলতান মুজফফর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। হোসেন শাহ বিদ্রোহীদের পক্ষ অবলম্বন করেন। যুদ্ধে মুজফফর শাহ নিহত হলে সিংহাসনে বসেন হোসেনশাহ।

শিলালিপির সাক্ষ্যে জানা যায় ৮৯৯ হিজরীর ১০ই জিলকাদ বা ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে হোসেন শাহ সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই হোসেন শাহ দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। হাবসিদের দমন করেন। পাইক না রেখে দেহরক্ষী রাখেন। সৈয়দ, মোগল ও

পাঠানদের মধ্য থেকে যাঁরা তাঁর হিতৈষী তাঁদেরকে বেছে বেছে তিনি উচ্চপদে বহাল করেন। হিন্দুরাও হোসেন শাহর শাসনকালে উচ্চ রাজকর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হন। হোসেন শাহ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে গোরগাঁ-এর রূপ সনাতনকে দবির খাস ও শাকর মল্লিক পদে নিয়োজিত করেছিলেন। রঘুনন্দন, বল্লভ ওরফে অনুপ, শ্রীকান্ত, কেশব বসু, সুবুদ্ধি রায়, রামচন্দ্র খান, যশোরাজ খান, চিরঞ্জীব সেন, কবিরঞ্জন, দামোদর, গোপাল চক্রবর্তী, গোবর্ধন দাস, হিরণ্য দাস প্রমুখ হোসেন শাহর রাজত্বে বিভিন্ন পদে আসীন ছিলেন। রামকেলি এসে হোসেন শাহর রাজত্বকালে চৈতন্যদেব বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় প্রেমভক্তির বন্যা বইয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দিল্লির সুলতান সিকান্দর লোদীর সাথে সংঘর্ষে জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহ শর্কী ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে পবাজিত হয়ে বাংলায় পালিয়ে এলে গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। বেখেছিলেন খিলগাঁও-এ। ফলে সিকান্দাব লোদীর সাথে হোসেন শাহর বিরোধ বাধে। হোসেন শাহ প্রেরিত পুত্র দানিয়েলেব সাথে রাঢ়বঙ্গে সিকান্দার লোদী সম্মুখ সমরে মেতে ওঠেন। শেষমেষ সন্ধি হয়। পূর্বে পবাজিত জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহ শর্কীর বিহাবে হারানো অঞ্চলেব অংশে সুলতান আলা-উদ-দুনিয়া-ওয়াল-দীন-আবুল মুজফফর হোসেন শাহর দখলে যাবে। এ প্রমাণ দেখে মনে হয় সন্ধির শর্ত দানিয়েল তথা হোসেন শাহ হুবহু মানেননি। আশ্রয়দাতা হিসেবে হোসেন শাহ শর্কীব কাছ থেকেও তাঁর কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটেছিল। হোসেন শাহ তাঁব সাম্রাজ্য চারদিকে বিস্তৃত কবেছিলেন। কামরূপে জাজনগব, উড়িষ্যা, চট্টগ্রাম ত্রিপুরা ও বিহাবেব অংশবিশেষ বিভিন্ন সময়ে হোসেন শাহ্‌র সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল।

হোসেন শাহ ছিলেন ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ। সৈনিক হিসেবে তিনি ছিলেন দুর্ধর্ষ। প্রশাসক হিসেবে ছিলেন সুদক্ষ। তিনি ছিলেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। নিষ্ঠাবান ও উদার মনোভাবাপন্ন মুসলমান হিসেবে তাঁব খ্যাতি সুবিদিত। অনেক মসজিদ প্রতিষ্ঠা, নির্মাণ শিল্প ও জনহিতকর কাজের সাথে যুক্ত আছে হোসেন শাহর নাম।

বর্তমান গৌড-মালদাব বাইশগজী প্রাচীর ঘেরা ছিল হোসেন শাহর মধ্যযুগীয় রাজপ্রাসাদ। গড়ঘেরা দুর্গ-সুরক্ষিত রাজ্যপ্রাসাদে সপরিবারে বসবাস করে গেছেন হোসেন শাহ। সুদক্ষ হাতে করে গেছেন রাজকার্য পরিচালনা। গৌড়ের গোলঘর বা গুমতিগেট আজও রাজবাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার পথ ও আত্মগোপন করে থাকার রাজকীয় স্মৃতি বহন করে চলেছে।

গৌড়েব রাজবাড়ি ছিল বাইশগজী প্রাচীরে ঘেরা, তিনটি মহলে বিভক্ত ও প্রতিমহলে একটি করে সরোবর ও অট্টালিকার মনোরম শোভা। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-এর 'গৌড়কথা'-য় লেখা আছে :

"প্রাচীরের বর্ণ রক্তাভ; স্তরে স্তরে ইষ্টক রাশি সুসজ্জিত, শীর্ষস্থানে খোদিত ইষ্টকের পুষ্পহার। ফ্রাঙ্কলিন যখন বাইশগজী পরিদর্শন করেন, তখনও তাহার সৌন্দর্য বৃক্ষলতায় এখানকার মত আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে নাই। তিনি বিস্মিত নেত্রে এই বিচিত্র প্রাসাদ প্রাচীব পরিদর্শন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—'শীর্ষদেশে খোদিত ইষ্টকের বিচিত্র পুষ্পশোভার প্রাচুর্য। প্রাসাদ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্বে তাহা তিন মহলে বিভক্ত ছিল। প্রথম মহল প্রকাশ্য দরবার মহল। দ্বিতীয় মহল বাদশাহের খাসমহল। তৃতীয় মহল বেগম মহল।'"[৫]

এই মহল তিনটি উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রলম্বিত—সামনে ও পেছনে বাইশগজী প্রাচীরে ঘেরা। আবার প্রতিটি মহল পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রলম্বিত বাইশগজী প্রাচীরের পার্টিশন যুক্ত। ১৪৬৬ খ্রিস্টাব্দে বারবাক শাহ্ নির্মাণ করেছিলেন পাঠান প্যালেসটি। হোসেন শাহ্ তাঁর শাসনকালে এই প্যালেসটিতেই বসবাস করে গেছেন। তাঁর রাজধানী এলাকা হোসেনাবাদ নামে পরিচিত ছিল।

সুশাসক হোসেন শাহ পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ বছর রাজত্ব করার পব ১৫১৯ মতান্তরে ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে এন্তেকাল করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নশরৎ শাহ্ তাঁব কাফিন রাজকীয় মর্যাদায় গৌড় নগরীর বাংলাকোটে সমাহিত করেন। নশরৎ শাহ্ মরহুম পিতার কবরের ওপর রঙিন ইট পাথরে তৈরি করান সুদৃশ্য সমাধিসৌধ হোসেন শাহর সমাধিব বণনা দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,

"নাসির-উদ্দীন নসরৎ শাহ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গৌড়ে তাঁহাব পিতার সমাধি নির্মাণ করাইযাছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও এই সমাধি বিদ্যমান ছিল। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কলিন ইহা দর্শন করিয়াছিলেন, অখন ইহা বাদশাহকা-কবব নামে পবিচিত ছিল। ইহার তোবণ প্রস্তব নির্মিত এবং দ্বারের চারিদিক নীল ও শ্বেতবর্ণ চীনামাটির টালি দিয়া আচ্ছন্ন ছিল। চারিকোণে চারিটি মিনাব ছিল, প্রত্যেক মিনারে এক একটি প্রস্তরময় পদ্ম ছিল এবং বৃক্ষ, লতা ও পুষ্পাদির চিত্রে শোভিত ছিল। গৃহের অভ্যন্তবে আলা-উদ্দীন হোসেন শাহ ও তদ্বংশীয় অন্যান্য ব্যক্তিগণের সমাধি ছিল। ইহার অভ্যন্তরভাগ শ্বেত ও নীলবর্ণের চীনা টালি দিয়া আবৃত ছিল। বর্তমান সামনে ইহার ভিত্তিমাত্র অবশিষ্ট আছে।"[২]

মুন্সী আবিদআলী খান মালদহীর 'গৌড় ও পাণ্ডুয়াব স্মৃতিকথা'-য হোসেন শাহর সমাধির অবস্থান ও বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন,

"খাজাঞ্জীখানার প্রায় এক ফার্লং উত্তর-পূর্বে ও প্রাসাদ চত্বরের বাইরে বাংলাকোট নামে একটি স্থান রয়েছে। এটা ছিল গৌড়ের পরবর্তী রাজাদের সমাধিভূমি। এর দক্ষিণ-পূর্বে একটা বড় তেঁতুল গাছ রয়েছে এবং এর ১২ ফুট দূরে দক্ষিণ দিকে ছিল দুটো প্রস্তর নির্মিত কবর যেগুলো বিলুপ্ত হয়েছে। মহদীপুরের বয়োবৃদ্ধ লোকেরা ও কদমরসুলের খাদিম মুন্সী ইলাহী বকসকে জানিয়েছিলেন যে, এগুলো হচ্ছে হোসেন শাহ ও তাঁর স্ত্রীর কবর। কিন্তু ক্রেইটনের সময়ে দ্বিতীয় কবরটি তাঁর পুত্র নশরত শাহের বলে কথিত হত। কালো ব্যাসাল্ট পাথরের যে সর্ববৃহৎ শবাধারটি হোসেন শাহর কবর আবৃত করে রাখত তা মুন্সী ইলাহী বক্স খড়ি (খিড়কি) গ্রামের সন্নিকটে দেখতে পেয়েছিলেন। কথিত আছে যে, গুপ্ত ধনবত্নের অনুসন্ধান করতে গিয়ে দস্যুরা আগুন দিযে পাথরটির ক্ষতিসাধন করেছিল। সমাধিগুলোর অবস্থানের নিকটে ছিল একটি বর্গাকৃতি বেষ্টিত স্থান। এর দেওয়ালগুলো ছিল নানাভাবে রঞ্জিত ইষ্টকে তৈরি।"[৩] হোসেন শাহর সমাধিসৌধ সংলগ্ন প্রাঙ্গণটির আয়তন ২৪ বর্গফুট ছিল বলে ক্রেটনের লেখায় দেখা যায়। সমাধি ও প্রাঙ্গণ ধ্বংস হয় ১৮৪৬-এ।

'THE TOMB OF SHAH HUSSAIN' সম্পর্কে হেনরী ক্রেইটন লিখেছেন,

"A spacious area within the gateway, represented in the annexed plate,

was a royal burying place, where some years since were to be seen the tombs of two of the kings of Gaur, one of which was that of Hussain Shah, and the other of Nasrat Shah. The Gateway and the surrounding walls were caused with bricks, curiously carved, and beautifully glazed blue and white, in the manner of Dutch tiles in Europe. The greatest part of the materials which formed these lombs here now disappeared. Mr. Orme, the historian, who many years since visited these ruins, tells us, that they were removed by a Captain Adams, for the use of some public works in Fort William; and that there were then lying by the waterside ready for transportation, five pices of black stone, highly polished each measuring twelve feet in length, and two feet in breadth and thickness, which formed part of the steps. It appears from the Stewart's History of Bengal, that Hussain Shah died at Gaur, A.H. 927 or A.D. 1520; and that Nasarat Shah was assassinated A.H. 940, or A.D. 1533-4." [৮]

বাংলাকোটের সমাধিক্ষেত্রে গৌড়ের সুলতান হোসেনশাহ্ সমাহিত হননি—সমাহিত হয়েছিলেন জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহ শর্কী—এমন ভ্রান্ত ধারণা কারও কারও মনে বদ্ধমূল। এ ধারণা একদম ভুল। জৌনপুরের সুলতান আত্মগোপন করে হোসেন শাহের আশ্রয়েই কহলগাঁতে ছিলেন। বিহারের তথা ভাগলপুরের কহলগাঁতে হোসেনশাহ শর্কী এন্তেকাল করেন। কহলগাঁতেই তাঁকে সমাহিত করা স্বাভাবিক। এ বক্তব্যের সমর্থনে বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হল। তিনি বলেছেন,

"বারাণসীতে সিকন্দর লোদীর সহিত জৌনপুরের সুলতান হোসেনশাহ শর্কীর যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে পরাজিত হইয়া জৌনপুর-রাজ বিহারে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। সিকন্দর লোদী তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বিহারে উপস্থিত হইলে, হোসেন শাহ শর্কী ভাগলপুর জেলায় কহলগাঁওতে পলায়ন করিয়া বাঙ্গালার সুলতান আলা-উদ্দীন হোসেন শাহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। হোসেনশাহ জৌনপুর রাজের ভরণপোষণের বব্যস্থা করিয়া দিয়াছিলেন এবং হোসেন শাহ শর্কীর অবশিষ্ট জীবন গৌড়রাজের আশ্রয়ে কহলগাঁওতে অতিবাহিত হইয়াছিল।" [৯]

মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানার ১৩২নং জে.এল.যুক্ত মৌজার নাম পশ্চিম নাজিরখানি আরাজি। এ মৌজার এল.আর ২৫নং এবং ৩৬নং দাগ বাইশগজী প্রাচীর। বাইশগজী প্রাচীর ঘেরা পাঠান প্যালেসের উত্তরাংশের সীমানাঘেরা প্রাচীর এটি। ৩৩নং এল আর দাগটি খাজাঞ্জিখানা বা টাকশাল—এমন কিংবদন্তি প্রচলিত। এই খাজাঞ্জি এলাকার কাছ থেকে পশ্চিমদিকের বাইশগজী প্রাচীর সীমানা অবধি এ.এস.আই.-এর তত্ত্বাবধানে উৎখনন চলছে। প্রাচীন মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ইতিহাস উদ্ধারের আশায় পশ্চিম নাজিরখানি আরাজি মৌজার উত্তরাংশের বাইশগজী প্রাচীরের পূর্ব-উত্তর অংশ সংলগ্ন ১৩০ নং জে.এল. সংযুক্ত কনকপুর মৌজার কিছু অংশ এবং ১২৯ নং বাদুল্যাবাড়ি মৌজার দক্ষিণাংশ মিলে বাংলাকোট। এই বাংলাকোট বাইশগজী প্রাচীরের উত্তরাংশের বাইরে এবং রাজকীয় সমাধি এলাকা। কিছুটা ফাঁকা, ইট পাথর জঙ্গলাকীর্ণ কিছু অংশ আবাদী, উঁচু, নীচু, কিছু জায়গা আমবাগানে পরিপূর্ণ।

গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র সুলতান নসরৎ শাহ এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সমাধি এলাকা এই বাংলাকোট। ইংরেজবাজার থানা এলাকার ১২৯নং

বাদুল্যাবাড়ি মৌজার এল.আর. ১৫০নং এবং ৮৬নং দাগ জুড়ে বর্গাকৃতি এলাকায়। হোসেন শাহর মূল সমাধি বাদুল্যাবাড়ি মৌজার ১৫০ নং দাগে ৯৩ শতকে এবং ৮৬ নং দাগের ৯৪ শতকে সমাধি চত্বর। দু'টো দাগ মিলে সীমানা ঘেরা প্রাচীরে সাদা, নীল, হলুদ প্রভৃতি রংয়ের মীনাকরা ইটের সুদৃশ্য দেযালে মসৃণ কষ্টিপাথরের ও ব্যাসাল্ট পাথরের পিলারে এবং ফুল-লতা-পাতা সজ্জিত চারদিকে চারটি মিনার বসিয়ে তৈরি হয়েছিল সুলতান হোসেন শাহর সমাধি সৌধ। কালক্রমে হোসেন শাহর সমাধিক্ষেত্রে স্থান পেয়েছিল। মরহুম হোসেন শাহর পুত্র নসরৎ শাহর মরদেহ অথবা মরহুম হোসেন শাহর স্ত্রীর মরদেহ বা উভয়ের। হোসেন শাহ ছাড়াও আর কার কার মৃতদেহ ঐ সমাধিতে শায়িত আছে এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

১৮০১ খ্রিস্টাব্দে হেনরি ক্রেইটন ধ্বংসপ্রায় গৌড়ের ছবি এঁকে একটি গ্রন্থ প্রস্তুত করেছিলেন যা মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল হেনরি ক্রেইটনের মৃত্যুর পর ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থটির নাম 'The Ruins of Gaur'. হোসেন শাহর সমাধিক্ষেত্র সমাধি সৌধের রঙিন প্রতিলিপি হেনরি ক্রেইটন থেকে পুনর্মুদ্রিত দেখা যাবে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' এব ১৩২৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত সংস্করণের ২য় ভাগে। উক্ত গ্রন্থের ২৫৬ এবং ২৫৭নং পৃষ্ঠার মাঝখানে সন্নিবিষ্ট রয়েছে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ-র সমাধিচিত্র (গৌড়)।

বাদুল্যাবাড়ি মৌজার এল.আর. ৮৫নং দাগটি গৌড়েশ্বরী মন্দিরের ভগ্ন দেবস্থান। এ স্থানটিকে মাতৃগয়া রূপে মেনে রামকেলি মেলায় আগত বিহারী-রাজবংশী-কামতাপুরী ও অন্যান্য অনুরূপ সংস্কারে বিশ্বাসী মাতৃহারা মহিলারা দলে দলে সেস্থানে উপস্থিত হয়ে স্থানটিকে মাতৃগয়া ভেবে মাতৃপিণ্ড প্রদান করে থাকেন। এই গৌড়েশ্বরী থানের দক্ষিণে এবং পশ্চিম নাজিরখানি, আরাজি মৌজার ৩৩নং খাজাঞ্জিপুকুরের উত্তরে অনতিদূরে সুলতান হোসেন শাহর সমাধিসৌধভূমির অবস্থান বাদুল্যাবাড়ি মৌজায়—বাংলাকোটে তা পূর্বেই বলা হয়েছে। বর্তমানে দাগদুটোর শ্রেণি 'বাগান'। দাগ দুটোয় রয়েছে বড় বড় আমগাছ। দু'একটি বড় তেঁতুল গাছও চোখে পড়ে। সে বাগানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা সমাধি সৌধ ফটকের বড় বড় পিলার, পিলারের ভূমিক্ষেত্রের চৌকোণা পাথেরর স্ল্যাব, বিভিন্ন সাইজের ছোট বড় পাথরের টুকরো, পদ্ম-ফুল-লতা-পাতা উৎকীর্ণ মিনারের ভিন্ন অংশ মীনাকরা রঙিন ইটের টুকরো—অতীত রাজকীয় বৈভব ও ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। বাংলাকোটের পূর্ব দিকে, পশ্চিম দিকে আরও সমাধি ছিল। ধনরত্ন সন্ধানী অর্থপিপাসু দুর্বৃত্তদের এলোপাথাড়ি খননের ফলে বাংলাকোটের মিশ্র সমাধিক্ষেত্রটি আজ ধ্বংসের মুখে। হোসেন শাহর রাজকীয় সমাধির ঢাকনিটি অন্যত্র নীত ও অন্তর্হিত।

গৌড়ের কদম রসুল গৃহের অঙ্গনে প্রবেশের প্রাক্ মুহূর্তে বামদিকে তথা উত্তরদিকে তাকালে দেখা যাবে কদমরসুল গৃহের সংলগ্ন পশ্চিমে, পূর্ব-পশ্চিমে উঁচু প্লাটফর্মের ওপর প্রলম্বিত ভগ্ন দালানের সারি। ছাদবিহীন সে ভগ্ন দালান। তার ভেতরে রয়েছে কিছু কবর এবং বাতিদানের চিহ্ন। হোসেন শাহ ও নসরৎ শাহর পরিবারের রাজপুত্রদের এবং কিছু উচ্চ পদাধিকারী রাজকর্মচারীদের সমাধিক্ষেত্র এটি। কদমরসুলে পদচিহ্নের ঘরে নসরৎ শাহ সমাহিত আছেন। কেউ কেউ মনে করেন, কোনো কোনো ব্যক্তির মতে নসরৎ শাহ সমাহিত রয়েছেন বাংলাকোটে।

আবিদ আলির গ্রন্থে বলা হয়েছে,

"On the western side of the quadom Resul, there are the mains of a buildings, the roof and some of the walls of which here fallen down. Inside this there are tombs in a ruined state. It is probable that, there are the tombs of princes and high officials of Hussain Shah and Nasrat Shah. Even the raised platform in the Quadom Rasul building on which is placed the foot print of the prophet is believed by many to be the tomb of Nasrat Shah himself, who died in 1532 A.D., Though more probably, he was burried near his father at Bangla-Kot." [১০]

কদম রসুলের দক্ষিণ-পূর্বে ফতে খাঁ-র সমাধি ও সমাধিভবন। উক্ত সমাধি ভবনটি বাংলার বাঁশের চালাঘরের রীতিতে তৈরি। এক সময় এই ঘরের ভেতরের ছাদ থেকে হুকের সাহায্যে ঝুলন্ত লোহার চেনে ঘণ্টা ঝুলানো দেখা গেছে। এর থেকে উক্ত বাঁশের চালার রীতিতে তৈরি গৃহটির প্রাচীনত্ব সহজেই অনুমেয়। দিল্লিশ্বর আকবরের সেনাপতি ছিলেন দিলীর খাঁ। ফতে খাঁ তাঁর অন্যতম পুত্র। ফতে খাঁর মৃত্যু সম্পর্কে আবিদ আলি লিখেছেন,

"The Emperor Aurangzib, suspecting that the local Saint Shah Ni'matullah was advising Sultan Shuja to wage was against him, sent an officer called Dilir Khan to Gaur to cut his head it. The saint, however, had not given Shah advice, nor had he ever intended to do so. Which Dilir Khan arrived at Gaur with his two sons, one of them (Fathkhan) vomited blood and died on the spot. This so alarmed Dilir Khan that he only baid his respects to the Saint. On the matter bring reported to Aurangzib, the Emperor thereafter trusted the Saint."

ইংরেজবাজাব থানা এলাকায় গণিবাহাদুর খাঁ মৌজায় একটি সমাধিক্ষেত্র বয়েছে—হঠাৎ পাড়ায়। কিছুদিন আগেও বাইরে থেকে পরিদৃশ্যমান ছিল সেনোটাফের কিয়দংশ। ফারসি লিপিযুক্ত পাথরের পদ্মশোভিত বেলে পাথরের এই সুদৃশ্য সেনোটাফটি আয়তনে যেমন বিশাল, ওজনে তেমনি ভারী, সৌন্দর্যেও অপরূপ! লম্বা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি, চওড়া ২ ফুট ১ ইঞ্চি, উচ্চতা ২ ফুট দেড় ইঞ্চি। উত্তরদিকের চওড়া অংশ পাথরের পদ্মশোভিত। কবরে মরদেহ উত্তর শিয়র অবস্থায় শায়িত রাখা হয়। এই পদ্ম সেই উত্তর শিযরের সৌন্দর্যবর্ধক। কোরাণের বাণী সমাধির ঢাকনাটিতে উৎকীর্ণ। সুচিত্রিত, সুলিখিত, ভারবহুল, বেশ বড় হঠাৎ পাড়ায় এই সেনোটাফটি দেখে মনে হয় এটি খুব উঁচু দরের কোনো বাজকীয় সমাধি আবৃত করে ছিল। 'রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকরণ'-এর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ও কর্মীরা সেনোটাফটির আলোকচিত্র সংগ্রহ করে লিপির পাঠ উদ্ধারের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাতে কোরাণের আয়াত ছাড়া অন্যকিছু লেখা না থাকায় সেনোটাফটি কার কবর আবৃত করে ছিল তা জানা সম্ভব হয়নি।

গাজল থানা এলাকায় একলাখী সমাধি সৌধটি আদিন্দার ইন্দো-সারাসোজিক স্টাইলের একটি সুন্দর স্থাপত্যকীর্তি। নির্মিত ১৪১২-১৪১৫ খ্রিস্টাব্দ মধ্যে। তৈরি করতে একলাখ টাকা খরচ হয়েছিল সেজন্য ঐ সমাধি সৌধটির নাম একলাখী সমাধি। আযতন ৭৮ ফুট ৬ ইঞ্চি x ৭৪ফুট ৬ইঞ্চি। অনুরূপ একটি সৌধ রয়েছে গৌড়ে যা চিকা মসজিদ নামে পরিচিত হলেও তা মোটেই মসজিদ পদবাচ্য হতে পারেনা। একলাখী সমাধি সৌধটির উপরে রয়েছে একটিমাত্র বড় গম্বুজ। গম্বুজটির ভেতরটি সুঅলঙ্কৃত। বাইরের বিচিত্র ধরনের নকশা করা ইট ও টালিতে

সুসজ্জিত। সমাধি প্রকোষ্ঠের ভেতরে উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত পর পর তিনটি বাঁধানো কবর রয়েছে। পশ্চিমদিক থেকে পূর্বদিকে, মুন্সী এলাহী বখশ্-এর মতে, পরপর চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন সুলতান জালালুদ্দিন, তাঁর স্ত্রী আশমান তারা এবং পুত্র আহমদ শাহ। দুর্গাচরণ সান্যালের মতে, ভাতুড়িয়ার অধীশ্বর গণেশের সাথে তানোরের যুদ্ধে আজিমশাহ এবং নসেরিৎ নামক দু'ভাই মারা যান। আজিম শাহের একমাত্র কন্যা ছিল। সে ছিল নাবালিকা। নাম আশমানতারা। পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনের একচ্ছত্র অধিকার পেতে তার ইসলামী আইনে বাধা ছিল। এই সুযোগে গণেশ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন, আজিম শাহ ও নাসরিতের বেগমদের উপপত্নী করেন ও গৌড়ের হারেম রাখেন। পরে গোপনে তাদের নিকা করেছিলেন বলে মীর ফর্জন্দ হোসেন জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভালো, রাজা গণেশ পাণ্ডুয়ায় রেখে দিয়েছিলেন তাঁর পূর্বতন স্ত্রী রানি ত্রিপুরাসুন্দরী, যদুর পূর্বতন পত্নী নবকিশোরী এবং নবকিশোরীর গর্ভজাত যদুরা পুত্র অনুপনারায়ণকে। রূপ ও যৌবনমুগ্ধ যদু আশমানতারার প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। রাজা গণেশ তা জানতেন। গণেশের পুত্র যদুনারায়ণ খাঁ সিংহাসনে বসলে আশমানতারাকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। দৈহিক মেলামেশার ফলে আশমানতারা গর্ভবতী হয়ে পড়ে। গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর যাতে আইনসঙ্গতভাবে পিতৃ পরিচয় নিয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে থাকতে পারে সেজন্য আশমানতারা যদুকে প্রস্তাব দেন তাঁকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে।[১১] ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিয়েতে আইনগত বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আসে সামাজিক বাধাও। যদু তাই ধর্মান্তরিত হয়ে জালালুদ্দিন নাম ধারণ করেন এবং আশমানতারাকে সাদী করেন ইসলামী শরিয়তী বিধান মতে। কালক্রমে তাদের একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তার নাম রাখেন আহম্মদ শাহ। সমাধিক্ষেত্রে পশ্চিমদিকে বড় ও উঁচু সমাধিটি যদুর। মাঝের সমাধিটি আশমানতারার, পূর্বদিকের সমাধিটি আহম্মদ শাহর। আহম্মদ শাহর সমাধির উপরিভাগে যে স্তম্ভ দেখা যায় সে স্তম্ভ তাঁর কবরের চেয়ে বেশি উঁচুতে অবস্থিত। এরূপ অবস্থান প্রমাণিত করে আহম্মদ শাহ শহীদ হয়েছিলেন। ঐ বাড়তি উচ্চতা শহীদকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য।

আদিনা মসজিদ সেকেন্দার শাহর অপূর্বকীর্তি। দৈর্ঘ্য ৫০৭ফুট ৬ইঞ্চি, প্রস্থ ২৮৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। নির্মাণকাল ৭৬৬-৭৭৬ হিজরী বা ১৩৬৪-১৩৭৪ খ্রিস্টাব্দ। বিরাট কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠ, কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠের পেছনের কারুকার্যময় ও শিলালিপিযুক্ত দেয়ালের মাঝ বরাবর কেবলা, কেবলার উত্তরে কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্মিত মিম্বর। বাদশাহ বা তখ্‌ত কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠের উত্তরদিকে যার পশ্চিম দেওয়াল লিপিযুক্ত। সেকেন্দারের কবর বাদশাহকা তখ্‌ত-এর পশ্চিমে। চারদিকের মাপ সমান। পৃথিবীর তৃতীয় এবং এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম আদিনা মসজিদটির কাজ অসমাপ্ত রেখেই সেকেন্দার শাহকে করতে হয়েছিল আকস্মিক মৃত্যুবরণ। এন্তেকাল অন্তে সেকেন্দার শাহকে দাফন করা হয়েছিল যে কক্ষে সে কক্ষটির নাম সেকেন্দার কক্ষ। সেকেন্দার শাহর সমাধি সৌধটি এককালে ছিল দশ গম্বুজের ছাদযুক্ত। সে ছাদ এখন আর নেই, ভেঙে পড়েছে। ইলাহীবক্‌স্ বলেছেন, সেকেন্দার শাহ সুলতানের কবরের দৈর্ঘ্য ছিল ৯ হাত এবং প্রস্থ ছিল সাড়ে সাত হাত।

ড. প্রদ্যোত ঘোষ সেকান্দার শাহ-র সমাধি সম্পর্কে বলেছেন, "মহিলাদের নামাজের স্থানের বা তথাকথিত বাদশা-কা-তখতের পশ্চিমদিকে সেকান্দার শাহের সমাধি অবস্থিত। পুত্র গিয়াসুদ্দীন

আজম শাহের হাতে সিকান্দার শাহের শোচনীয় মৃত্যুর পর গিয়াসুদ্দীন এখানে পিতাকে সমাধিস্থ করেন।

এই সমাধিকক্ষের ছাদ এখন ভগ্ন। মধ্যেকার স্তম্ভগুলি এখনও ভূপতিত। ভিতরের বর্গাকার ক্ষেত্রটির বর্তমান আয়তন ৪২ ফুট x ৪২ ফুট। তার দেওয়াল ৬ ফুট ৮ ইঞ্চি চওড়া। চারটি স্তম্ভ দিয়ে ন'টি বর্গাকার ক্ষেত্রে এটি বিভক্ত। সমাধির চিহ্ন অবশ্য এখন আর কিছু নেই। বাইরে থেকে এটিকে একটি ঘনক্ষেত্র বলে মনে হয়। ভিতরে খিলানে টেরাকোটার কাজ আছে। এক সময়ে প্রতিটি বর্গক্ষেত্র আবার স্তম্ভোপরি খিলানোপরি ও ন'টি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। স্থাপত্যের পরিকল্পনার দিক দিয়ে বলা যায় যে বর্গাকার ক্ষেত্রের এই সমাধিক্ষেত্রটির নকশা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগেও দেখা যায়।"[১২]

আদিনার গড় ঘেরা ছিল রাজবাড়ি এলাকা। আদিনা ফরেস্টের কাছে এবং সাতাশঘরা দিঘি সংলগ্ন স্থানে ইলিয়াস শাহ-র শুরু করা এবং সেকেন্দার শাহ-র সমাপ্ত করা রাজবাড়ির স্মৃতিচিহ্ন পড়ে থাকতে দেখা যায়। বুকানন হ্যামিলটনের 'ভ্রমণ-বিবরণী' অনুসরণ করে ড. প্রদ্যোত ঘোষ বলেছেন,

''সাতাশঘর' বা 'ষাটগম্বুজ' বলে এই অংশটিতে রাজপ্রাসাদ ছিল বলে জনপ্রবাদ আছে। ১২০ গজ x ৬০ গজ অংশের ধ্বংসাবশেষকে কেন্দ্র করেই এই প্রাসাদ চত্বরের স্থান। মাটির পাড়ে ইটের দেওয়াল ঘেরা অংশ যা প্রথমে দেখা গিয়েছিল, তার উচ্চতাও ১৬ ফুট। দেওয়ালবেষ্টিত অংশে অনেক ভবনাদি ছিল বলে অনুমিত হয়। উত্তর-পশ্চিমে একটা অট্টালিকা ছিল এবং এর কেন্দ্রস্থলে খিলানযুক্ত একটি প্রকোষ্ঠও ছিল। দেওয়ালে জলবাহী নলেরও নিদর্শন দেখেছিলেন হ্যামিলটন সাহেব। ২৪ ফুট ব্যাসের অষ্টকোণী কক্ষের আটটি কোণে আটটি ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল। একটি থেকে ২৫ ফুট x ৭ ফুটের আয়তাকার একটি কক্ষ এবং উত্তর-পশ্চিমে একটি পৃথক ১১ ফুটের বর্গাকার কক্ষ ছিল। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি হামাম বা স্নানগার।"[১৫]

সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের মতো তাঁর পুত্র আবুল মুজাহিদ সুলতান সেকেন্দার শাহকেও হতে হয়েছিল দিল্লিব বাদশাহ ফিরোজশাহের আক্রমণের শিকার। দিল্লির অধীনতা স্বীকার না করে স্বাধীন সুলতান হিসাবে শাসনকার্য চালানোর জন্যই এই আক্রমণ। পিতার মতো শাহও নিয়েছিলেন একডালা দুর্গে আশ্রয়। পরে সন্ধি করেছিলেন ফিরোজশাহের সাথে অনেক মণিমাণিক্য ও ৪০টি হাতি উপঢৌকন দিয়ে। বিমাতার চক্রান্তে ভীত সেকেন্দারের পুত্র গিয়াসুদ্দিন ৭৭২ হিজরীতে বা ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দে সোনার গাঁ পালিয়ে গিয়ে সুলতান পিতার বর্তমানেই সেখানকার শাসনভার দখল করে নেন। এতে পিতা সেকেন্দার শাহর সাথে এই বিদ্রোহী পুত্রের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ পাণ্ডুয়ার কাছে সোনারকোটে সেনাছাউনি ফেলেন। আদিনা মসজিদ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ৪ মাইল দূরে গোয়ালপাড়ায় পিতা-পুত্রে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে গিয়াসুদ্দীনের নিষেধ অমান্য করে জনৈক সৈন্যের নিক্ষিপ্ত তীর বিদ্ধ করে সেকেন্দার শাহর দেহ। তীরবিদ্ধ স্থান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে থাকে। সুলতান সেকেন্দার শাহ হাতির পিঠ থেকে লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। তাঁর রাজকীয় পোশাক ও অতীব

সেবাযত্নে লালিত বরতনু ধুলোয় লুটোতে থাকে। পিতার এই শোচনীয় পরিণতি দেখে স্নেহবৎসল পুত্র গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসেন। মৃত্যু পথযাত্রী পিতার মাথা পরম স্নেহে দু'হাঁটুর ওপর তুলে নেন। বুলিয়ে দিতে থাকেন হাত। বিগলিত নেত্রে কৃতকর্মের জন্য মুমূর্ষু পিতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। দোয়া করতে বলেন। পুত্রের গুনাহ্ ক্ষমা করে সেকেন্দার শাহ তাঁকে দোয়া করেন। আল্লার কাছে মোনাজাত করেন পুত্রের কল্যাণ কামনা করে। প্রার্থনারত অবস্থায় ধীরে ধীরে তাঁর জীবনদীপ নিভে আসে। অসীম করুণার প্রতীক অক্ষয়কীর্তির মহীরুহ সেকেন্দার শাহ ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে। ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের ওপর আকস্মিকভাবে নেমে আসে কৃষ্ণ যবনিকা।

উপসংহার

অনেক সুলতানই রাজত্ব করে গেছেন গৌড়-লাখনৌতি-জিন্নতাবাদ-ফিরোজাবাদ-হোসেনাবাদ-মুহাম্মদাবাদ-টাণ্ডা নামাঙ্কিত মালদার ভূখণ্ডে। তাঁদের অনেকেই সমাধিস্থ আছেন মালদার মাটিতে। সকলের সমাধির অস্তিত্ব নির্ণয় করা দুরূহ ও দুঃসাধ্য। তবুও কিছু কিছু রাজকীয় সমাধি শনাক্ত করে সংশ্লিষ্ট সুলতান, তাঁদের বংশধর ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি বিশেষ ও তাদের জীবনের ও কর্মের নানা দিক স্বল্প পরিসরে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। কতটা সার্থক হতে পারা গেছে তা পাঠকদের বিচার্য।

মালদার কোনো সমাধিই আজ সঠিকভাবে সংরক্ষিত নেই। তাই অসংরক্ষিত ও ধ্বংস হতে বসেছে বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধ্বংস হয়েছে সমাধিলিপিগুলোও। জাগ্রত জাতীয় ও ঐতিহাসিক চেতনাই পারে মৃত ও মৃতপ্রায় কবরগুলোকে বাঁচিয়ে তুলতে।

সূত্রনির্দেশিকা ও কৃতজ্ঞতা :

১) প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের কাহিনী, সুবোধকুমার মজুমদার, জানুয়ারি ১৯৯৭, 'মিশর দেশের কবর চোরদের কথা' প্রবন্ধ, পৃ.৮৮।

২) কবরপূজা, মুহাম্মদ করম আলী, সিলেট, ২য় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৮৫, পৃ. ৭-৮।

৩) ক) বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব (১২০৪-১৩৩৮), সুখময় মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৮৮, পৃ.১২।

খ) Journal of Numismatic Society of India, Vol. XXXV, 1973, p.p.197-210.

গ) বখতিয়ার খলজির গৌড় বিজয় প্রমাণ করে এমন তিনটি মুদ্রার এ পর্যন্ত সন্ধান মিলেছে। ওয়াশিংটন ডিসির স্মিথসোনিয়ান মিউজিয়ামে, লন্ডনে এবং দিল্লিতে—এই তিন স্থানে মুদ্রা তিনটি সযত্নে রক্ষিত আছে। এখবর জানা যায় J.N.S.I's 1976, p.p.- 81-87 থেকে।

ঘ) গৌড় বিজয় পরিচায়ক মুদ্রাটির প্রচারক সুলতান মুইজ-উদ্ দীন মোহাম্মদ বিন সাম ওরফে মোহাম্মদ ঘোরী। তিনি কোনোদিন মালদায় আসেননি। বখতিয়ার খলজি গৌড় বিজয় করলে তাঁর

প্রভুর নামে বাংলাদেশে গৌড় বিজয়ের স্মারক মুদ্রাটির প্রবর্তন ও প্রচলন করে থাকবেন। ঐতিহাসিক ড. আব্দুল করিম তাঁর গ্রন্থে এমন অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। দ্রষ্টব্য : 'বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)', ড. আব্দুল করিম, ২য় সংস্করণ, ঢাকা, পৃ. ৬১।

৪) তবাকাত-ই-আকবরী, খাজা নিযামউদ্দীন আহমদ, জুন ১৯৭৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ ৩।

৫) গৌড়কথা, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সাহিত্যলোক, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃ. ১৩।

৬) বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় ভাগ, পৃ. ২৭২-২৭৩।

৭) গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতিকথা, মুন্সী আবিদ আলী খান, ইসলামিক ফাউন্ডেশান, ঢাকা, পৃ. ৬৩।

৮) The Ruins of Gaur, Compile from the manuscript and drawing of the Late H. Creighton, ESQ, London, 1817 Ch VIII, P. 33-34.

৯) বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় ভাগ, ১৩২৪, পৃ. ২৪৯।

১০) Memoirs of Gaur and Pandua, Khan Sahib M Abid Ali Khan of Maldah, P. 51.

১১) বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, দুর্গাচন্দ্র সান্যাল সংগৃহীত ও ফকিরচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত, পৃ. ৭৩-

১২) মালদহ জেলার কীর্তি, ড. প্রদ্যোত ঘোষ, প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার, পৃ ৮৪।

১৩) ঐ. পৃ ৮৫।

মালদা সদর ... তালের চৌহদ্দির ... সমাধিক্ষেত্র, ছান ...

□ লেখক পরিচিতি—গবেষক, প্রাবন্ধিক, জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের বরিষ্ঠ আধিকারিক, মালদা।

গৌড়বঙ্গের সুপ্রাচীন শ্মশানঘাট ঃ সোদুল্লাপুর

তপনকুমার দাস

শ্মশানের কথা মনে হ'লেই আমার চোখে ভেসে ওঠে একটা খুব দুঃখের ছবি। ছবিটা এই রকম —ঠাকুদ্দা খেজুরিয়া গঙ্গার ঘাটে দাউ দাউ আগুনে জ্বলছেন—ধু-ধু ধোঁয়ার কুণ্ডলী গঙ্গার পাগলা হাওয়ার তোড়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ছে—আর আমি সাশ্রু নয়নে কখনো প্রজ্বলিত চিতায় সমারূঢ় সেই আদি পুরুষের অপচীয়মান অগ্নিকল্প দেহের দিকে চেয়ে হা-হুতাশ করছি, কখনো আদিগন্ত বিস্তৃত গঙ্গার সুনীল বুকের দিকে চেয়ে রয়েছি।

তখন খেজুরিয়াতে গঙ্গার বুকে ফারাক্কা ব্যারেজ তৈরি হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই গঙ্গা ছিল অবারিত। ওপারে ফারাক্কার ঘর-বাড়িগুলোকে মনে হত পেনসিলে আঁকা ছবির মতো। খেয়া পারাপারের দানবিক স্টিমারগুলো ভূলোক-দ্যুলোক কাঁপানো বিকট আওয়াজ তুলে যখন ছাড়ত, তখন মনে হত এই ধরাধামে ঐ ধাতব কঠিন শব্দ ছাড়া বুঝি আর কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই—জীবনের সব স্পন্দনই যেন ঐ গগন বিদীর্ণ হাহাকারে মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে।

মালদা জেলার দক্ষিণ উপান্তে গঙ্গার তীরে বস্তুত কোনো স্থায়ী শ্মশানঘাট নেই। মূল ঘাট থেকে কিছু তফাতে সুবিধামত জায়গা খুঁজে দাহ কার্য সম্পাদন করা হয়। মালদার স্থায়ী শ্মশানঘাট হল—সোদুল্লাপুর। মহাশ্মশান বললেও আতিশয়োক্তি হয় না। দ্বিসহস্রাধিক বছরের প্রাচীন এই শ্মশানের নাম বাংলার অনেকেই জানেন।

মালদা শহর থেকে সোদুল্লাপুর শ্মশানের দূরত্ব সাত কিলোমিটার। শহর থেকে ফারাক্কার দিকে যেতে দক্ষিণে, এন.এইচ-৩৪ বরাবর চার কিলোমিটার দূরে বাঁধাপোখর মোড়। মোড়ের বাঁ দিকে ঐতিহাসিক কমলাবাড়ি গ্রাম আর ডানদিকে অর্থাৎ পশ্চিমে জাতীয় সড়ককে নব্বুই ডিগ্রি কোণে একটা রাস্তা সোজা এগিয়ে গেছে মোথাবাড়ির দিকে। সেই রাস্তা ধরে তিন কিলোমিটার এগোলেই ক্ষীণকায়া ভাগীরথী নদী—তার তীরেই সেই ঐতিহাসিক সোদুল্লাপুর শ্মশান।

সোদুল্লাপুর শ্মশানঘাটের প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিত। An account of the District of Purnia in 1809-10 গ্রন্থে ফ্রানসিস বুচানন (Francis Buchanan) কর্তৃক লিখিত বিবরণীতে সোদুল্লাপুর শ্মশানঘাটের ঐতিহাসিক উপস্থিতি সম্পর্কে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে তাঁর দেওয়া তথ্যটি নিঃসন্দেহে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপস্থাপনা—On the side of the old Bhagirathi, opposite to this suburb at a market-place called Sadullahpur, is the chief descent (Ghat) to the holly stream, and to which the deadbodies of Hindus are brought from a great distance to be burned. In the times of intolerence they probably were allowed to burn no where else, and the place in their eyes acquired a sancity which contains in a more happy period to have a powerful influence.

সোদুল্লাপুর যে স্মরণাতীত কাল থেকেই গৌড়ভূমির অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ শ্মশানঘাট ছিল তাও বুচাননের ঐ গ্রন্থের আনুষঙ্গিক তথ্য থেকে জানা যায়। মেজর রেনেলের বিবরণীতে পাওয়া

যাচ্ছে যে, খ্রিস্টের জন্মের ৭৩০ বৎসর পূর্বেও গৌড়ভূমি বাংলার রাজধানী ছিল। রেনেলের (Major Rennell) ঐ তথ্যের সত্যতা কিয়দংশে অনুমিত হয় চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে; সেখানে গৌড় দেশের পণ্যের উল্লেখ দেখা যায়। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত গৌড়ে হিন্দু রাজারা রাজত্ব করেছেন। ১২০৪এ তুর্কি যুদ্ধ ব্যবসায়ী মহম্মদ বখতিয়ার খিলজি হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটান। হিন্দু রাজন্যবর্গের আমল থেকেই যে সোদুল্লাপুরের পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীর শ্মশানঘাট হিসাবে খ্যাতি লাভ করে সে ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই। এই প্রসঙ্গে যে দুটি বিষয় এই অনুমানের যাথার্থ প্রতিপন্ন করে তা হল—১) প্রাচীন গৌড় দুর্গনগরী ও গৌড় বৃহত্তর নগরী (Extension)-র মধ্যে এবং তার বাইরে যে সব জনপদের উল্লেখ দেখা যায়, সোদুল্লাপুরের ভৌগোলিক অবস্থান অনেকটাই তার কেন্দ্রে অবস্থিত। তাছাড়া গৌড় দুর্গনগরী থেকে সোদুল্লাপুরের দূরত্বের মধ্যে সামীপ্য ও নৈকট্য দুই আছে—যা শ্মশানভূমি স্থাপনার পক্ষে উপযুক্ততম। দ্বিতীয় কারণটি সম্ভবত আরও গুরুত্বপূর্ণ এ কারণেই যে, গৌড় দুর্গনগরীর কাছাকাছি গঙ্গার পবিত্র জলধারার প্রাণবন্ত উৎস ঐ ভাগীরথীই।

তবে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব থেকেই যে ভাগীরথী মজে গিয়ে গতি পরিবর্তন করেছিল সেই তথ্যও পাওয়া যায় গৌড়েশ্বর বল্লাল সেনের প্রাসাদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বুচাননের গ্রন্থে—'From the house of Adisur I proceeded over some fine highland interspered with wood and old plantation of mangoes, to the place where Ballal Sen the successor of Adisurs is said to have resided. It consist, like the palace near Dhaka, of a squire of about 400 yeards sorrounded by a ditch .... A roused road seems to have led from this palace to north end of Gour. Crossing this road is a very extensive line of fortification, which extends in an irregular curve from old channel of Bhagirathi ....'.—না হলে ভাগীরথীর পুরানো খাতের প্রশ্নটি উঠত না।

ঐতিহাসিক আবেদ আলীর গ্রন্থেও গৌড় নগরীর উপান্ত দিয়ে ভাগীরথী নদীর প্রবাহমানতার উল্লেখ আছে। সম্ভবত একটি খাল দ্বারা গৌড় দুর্গনগরীর সঙ্গে ভাগীরথীর সংযোগ ছিল। এবং দুর্গ প্রাকারের যে স্থান দিয়ে খালটি প্রবেশ করেছিল সেখানে কৃত্রিমভাবে জলের প্রবেশ ও বহির্গমন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও ছিল।

রেনেলের মানচিত্র অনুযায়ী গৌড় নগরীর আয়তন ছিল ৩০ বর্গকিলোমিটার। বুচাননের সংশোধন অনুযায়ী তা দাঁড়ায় ২০ বর্গ কিলোমিটারে। ঐ ২০ বর্গকিলোমিটারে ৬/৭ লাখ লোকের বাস ছিল—সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে যা তৎকালীন প্যারিস বা লন্ডনের জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনীয় ছিল (বুচানন)। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে ঐ বিপুল সংখ্যক মানুষের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনের অন্যতম স্থান ছিল সোদুল্লাপুর মহা-শ্মশান।

বর্তমানে মালদহ শহর ও তৎসংলগ্ন বিশাল অঞ্চলের মানুষের পারলৌকিক ক্রিয়া (শবদাহ) সম্পাদনের অন্যতম স্থান সোদুল্লাপুর শ্মশানঘাট। দূরান্তের মানুষেরাও বৈদ্যুতিক চুল্লিতে প্রিয়জনদের শবদেহ দাহ করার জন্য সোদুল্লাপুরে আসেন। এখানে বৈদ্যুতিক চুল্লিটি বসানো হয়েছে এই চলতি বছরেই অর্থাৎ ২০০৪-এ। খোঁজ নিয়ে জানা গেল প্রতিদিন ১০/১২টি দাহকার্য এখানে সম্পাদিত করা হয়। শবদেহ প্রতি খরচ লাগে ৪৭৫ ০০ টাকা।

বর্তমানে সোদুল্লাপুর গ্রামে ১৫০টি পরিবার বাস করে। কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসের দোকানপাট সহ একটি বাজার মতো আছে এখানে। এখানকার 'হাতিপেয়ে' লুচি বিখ্যাত। পূর্ণিমার চাঁদের মতো বিশাল এক একটি লুচি—যার দু'তিনটে খেলেই খিদে দূর হয়ে যায়। শ্মশানবন্ধুরা শবদেহ দাহ করার পর, নদীতে স্নান সেরে পেট ভরে লুচি-মিষ্টি খান। খানেওয়ালারা ৮/১০টি পর্যন্ত লুচি উদরস্থ করেন। লুচিগুলো বেশ নরম ও উপাদেয়।

শতাব্দী প্রাচীন এই শ্মশানটি যে এপর্যন্ত কত কান্না আর হাহাকার প্রত্যক্ষ করেছে তার কোনো হিসাব নেই। কখনো খাঁ-খাঁ দুপুরে বা নিঝুম রাত্রে সম্মিলিত হরিধ্বনি বা ক্রন্দনের উচ্চকিত স্বরে চমকে ওঠে এই প্রাচীনা। দমকা হাওয়ায় নড়ে ওঠে ভয়ঙ্করী শ্মশানকালীর নাকের নথ—দূরে খ্যাঁ খ্যাঁ করে সম্মিলিতভাবে ডেকে ওঠে শিয়ালের পাল—খসে পড়ে গাছের শুকনো পাতা। গা হিম হয়। আবার মনুষ্য জীবনের অনিত্যতার কথা ভেবে উদাস হয়ে ওঠে মন। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থান থেকে ভেসে আসে সেই মহাসংগীত—'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হতে . . কী সংগীত ভেসে আসে

শ্মশান না আং . . . (রেজবাজার), ছবি . আভজ্ঞা

. তাঁঘাট শ্মশান (চাঁচল, মালদা), ছবি . পরিমল সূ.

□ লেখক পরিচিতি—গবেষক, প্রাবন্ধিক, সরকারি চাকুরে।

মালদহের শ্মশান, গোরস্থান, ও সমাধি

ব্যোমকেশ জানা

মৃত্যুর পর সকল মানুষের মরদেহ মিশে যায় মাটিতে কারো বা পঞ্চভূতে। কুহেলীতে ঢাকা এই মৃত্যু, রিলকের কাছে, 'otherside of life'—সেক্সপিয়র বলেছেন—'If it is not now, yet it will come.' জন মুভের ভাষায় —'The one poem that each poet seeks' জন ডানের ভাষায়—'Die an everlasting life and life an everlasting death.' কবি জীবনানন্দের ভাষায় 'বৈতরণী শান্তি দেয়—শান্তি—শান্তি—ঘুম—ঘুম —ঘুম।' রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক দৃষ্টিতে—'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান'। তাই তিনি শোনান—'সমুখে শান্তির পারাবাব,ভাষাও তরণী হে কর্মবীর ।' আবার বাঙালীর প্রাণপ্রিয় বাউল গানে—'পাখী যাবে উড়ে, শূন্য খাঁচা রবে পড়ে।' এই শূন্য খাঁচাই মৃতদেহ , দেশে দেশে এর সৎকারের নানান রীতি-নীতি।

এই মরদেহ দাহকরা হয় শ্মশানে, দফন করা হয় গোরস্থানে, তাই মানবদেহের অন্তিম অবস্থার আশ্রয় শ্মশানভুমি বা গোরস্থান। ইয়েটস তাঁর 'An acre of Grass'—কবিতায় দেহমাপের জমিন বা গোরস্থানের ইঙ্গিত দিয়েছেন । বুদ্ধ বলেছেন—শ্মশান ও গোরস্থান উভয়েব কথা। পিতৃ-পিতামহের পদধুলি মিশ্রিত পবিত্র এই স্থানের পাশে পুবাণ অনুসারে কোথাও কোথাও শ্মশানবাসী মহাদেব, কোথাও বা শ্মশানবাসিনী কালীব মন্দিব গড়ে উঠেছে। একই ভাবে পির-দরবেশের সমাধি, চিল্লাখানার (সাধনক্ষেত্রে) পাশে গড়ে তোলা হয়েছে গোবস্থান।

ভারতেব সাধক, মহাসাধক গণের সাধনার সিদ্ধিতে জনমানবহীন নির্জন এই শ্মশানভূমির গুরুত্বকে উপেক্ষা করা যায় না। যোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাব বিক্রমপুরে সামন্তরাজ কেদার রায় ও তার ভ্রাতা চাঁদরায়ের সহযোগিতায় সাধক ব্রহ্মানন্দগিরি নদী তীরবর্তী এক শ্মশানে সাধনা করে পেয়েছেন সিদ্ধি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আরো বলা যায়, মহাসাধক তৈলঙ্গস্বামীর (সপ্তদশ শতাব্দী) চিতাভস্মপূর্ণ শ্মশানের প্রান্তদেশে বসবাস, কাশ্মীরের এক মহাশ্মশানে গম্ভীর নাথের সঙ্গে (উনবিংশ শতাব্দী) এক বৃদ্ধ যোগীর সাক্ষাৎ, তাঁর জীবনে এনে দিয়েছিল পরিবর্তন- ফলে তিনি হয়েছিলেন মহাসাধক। তারাপীঠ মহাশ্মশানে মহাসাধক বামাক্ষেপা ও তাঁর শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মীয় স্বামী নিগমানন্দ তন্ত্রসাধনায় পেয়েছিলেন সিদ্ধি । স্বামী নিগমানন্দ জলপাইগুড়ি জেলায় ভোটাপট্টি থানার অন্তর্গত ধরলা নদীব তীরে বহুদিনের পুরানো ডাঙাপাড়া মহাশ্মশানের পাশে ডাঙাপাড়া আশ্রম (১৮৩০ খ্রি.) গড়ে তুলেছিলেন, কেবল তাঁর সাধনলব্ধ ধর্ম দর্শন প্রচারের জন্য নয়, শাস্ত্রীয় মতে বিদেহী অশরীরীদের মুক্তির জন্যও বটে। মনুসংহিতায় স্বীকার করা হয়েছে—

পঞ্চভ্য এব মাত্রাভ্য ঃ প্রেত: দুষ্কৃতিনাং নৃনাম।
শরীরং যাতনার্থীয় মনাদ্যুৎ পদাতে ধ্রবম।'

সেক্সপিয়র রচিত 'Tempest'—নাটকে ভালো ও মন্দ দুধরনের বিদেশী অশরীরীর কথা বলা হয়েছে। আবার সাধক, মহাসাধক, সন্ত পির-ফকির, দরবেশের জীবনে অলৌকিক কার্য-সাধনে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার কথাও অনস্বীকার্য। 'There are more things in Heaven and Earth than Philosophy or science dreams of' (Hamlet). Super-Being-এর অস্তিত্বের প্রভাবে—সৃষ্ট 'Mysticism'—তার উর্দ্ধে ধর্মের অস্তিত্ব নয়—'Without Mysticism Religion loses the reason of existance' (D.T.SUKUKI)। ভারতের মাটিতে তন্ত্রসাধনা, গুহ্যসাধনা এবং রহস্যময় অতীন্দ্রিয়বাদের—প্রসার ঘটেছে। এর ফলে তথাকথিত সমাজে পির-ফকির, সন্ত-সাধকদেব প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলশ্রুতিতে তাদেব দেহরক্ষায় গড়ে উঠেছে সাধক সাধক সন্তদের সমাধি আর পির-ফকির-দরবেশেব সমাধি ও মাজার।

এখন জেলা মালদহের গোরস্থান-শ্মশান-সমাধির আলোচনার পূর্বে জেলার বর্তমান গঠন ও জনসংখ্যার পরিসংখ্যান সম্পর্কে প্রথমে বলি। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ১৫টি জেলা নিয়ে গঠিত মালদহ। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দেব (১৭ই আগষ্ট) পর র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুসারে পূর্বেব দশটি থানা নিয়ে গঠিত হলেও অধুনা বৈষ্ণব নগর (পূর্বোক্ত ব্লক) নিয়ে মোট ১১ টি থানাব ২০০১ সালে সেন্সাস অনুসারে মোট জনসংখ্যা ৩২, ৯০১০৭, গ্রামেব সংখ্যা ৩৭০১, মৌজা-১৭৯৮, গ্রাম পঞ্চায়েত-১৫৫, পৌরসভা-২ ব্লক-১৫।

১৯৫১ সালের পরিসংখ্যানে প্রাপ্ত জনসংখ্যার (৯,৩৭, ৫৮০) পঞ্চাশ বছব পরে ৩½ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধির এই স্বাভাবিক কারণে পূর্বেব চেয়ে কিছু কিছু গোরস্থান ও শ্মশান সৃষ্টির নমুনা মেলে। এই জেলার গোরস্থান, শ্মশান, সমাধি ও মাজারের অবস্থান ও আকৃতি -প্রকৃতির যে চিত্র পাওয়া যায়, সেগুলি পর্যালোচনা কবলে কতগুলি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। গোরস্থানগুলি খাস ও ব্যক্তিগত উভয় প্রকার জায়গায় গড়ে উঠলেও শ্মশানগুলির প্রায় সমস্তই খাস জমিতে। পুকুর, দিঘি, ঝিল,খাড়ি, নদী, উপনদী ও শাখানদীর তীরে তীরে গড়ে উঠেছে। আবার চাঁচল-সামসী-হরিশচন্দ্রপুর প্রভৃতি এলাকায় গোরস্থানগুলি সন্ত-পির-ফকির-দরবেশের সমাধি, মাজার ও চিল্লাখানার পাশাপাশি গড়ে উঠেছে। গোরস্থান গুলির নির্ধারিত সীমারেখা, যথোপযুক্ত সংরক্ষণ ও মর্যাদা রক্ষার জন্য আর্থিক কারণে প্রায় অধিকাংশই প্রাচীর বা বেড়া নেই কোথাও। গঙ্গা, মহানন্দা, কালিন্দ্রী, ফুলহার, টাঙ্গন, বেহুলা, পুনর্ভবা প্রভৃতি নদনদী, উপনদী ও শাখানদীর তীরে তীরে মরদেহ দাহ করার কারণে গড়ে ওঠা অনেক শ্মশান, অতি বর্ষনে, নদীভাঙনে, প্লাবনে স্থান পরিবর্তন করে নতুন অবস্থান ও আকৃতি নিয়েছে। এইরূপ অবস্থান ও আকৃতিব আদল বদলানো শ্মশানের উপযুক্ত দৃষ্টান্ত : ফারাক্কা ব্যারেজ রাইট ব্যাঙ্ক শ্মশান (বৈষ্ণবনগর থানা) মহেদীপুর বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নদীর দুইতীরে দুই শ্মশান (থানা-ইংরেজ বাজার ও কালিয়চক)। বিশেষ ঐতিহ্যবাহী শ্মশানগুলির

পাশাপাশি গড়েওঠা কালী, শিব প্রভৃতি দেব-দেবীর মন্দিরে পূজার্চনা ছাড়াও পৌষ-সংক্রান্তি, মাঘী-পূর্ণিমা, কালীপূজা উপলক্ষ্যে মেলা বসে। আবার স্বপ্ন দৃষ্টে মন্দির সৃষ্টি কিংবা উৎসব-প্রাণ বাঙালীর উৎসবের মাধ্যমে পূজার্চনার জন্য শ্মশানের পাশাপাশি মন্দির তৈরির প্রবণতাও দেখা যায়। জেলার ঐতিহ্যবাহী শ্মশান থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় বিশ্বাসে সাক্ষাৎ গঙ্গাপ্রাপ্তির জন্য জেলার বাইরে ঝাড়খণ্ডের (সাহেবগঞ্জ জেলা, থানা-রাজমহল) প্রধান প্রবাহবাহী গঙ্গাতীরে রাজমহল ঘাটে মরদেহ দাহ করার জন্য নিয়ে যায়। জেলা মালদহের সবচেয়ে প্রাচীন মহাশ্মশান ভাগীরথীতীরে সাদুল্লাপুরে, আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন অধিবাসীগণ তাদের মরদেহ দাহ করে। কালিন্দ্রী তীরে গোবর্জনা মহাশ্মশানের কালী লোকবিশ্বাসে ও প্রচারে জাগ্রতা। কালী পূজাব দিন প্রায ৩৫০০ পশুবলি জেলার অন্যত্র কোথাও হয় না। বিপদে-আপদে দেবীর স্মরণে দেবীর প্রসন্নতা প্রাপ্তির কথাও শোনা লোকমুখে ও পূজায়।

আবার মুসলমান অভিযানের সময় থেকে আরম্ভ করে স্বাধীন সুলতানদের আমল পর্যন্ত প্রায় একশত অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পির-ফকির-দরবেশ বাংলায় আসেন। তাদের ভগ্ন, অর্ধভগ্ন মাজাব, চিল্লাখানা এ জেলার মাটিতে রয়েছে। তাঁদের জীবন-দর্শন ও লোকহিত কর্ম, তাদের অলৌকিক ক্ষমতার প্রভাবেব জন্য তাদের নামে দাঁড়িয়ে আছে গ্রাম, পথ, পল্লী, দিঘি— সবোবর।

আলোচনা প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন, সমকালিন জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে মুসলমানের সংখ্যা (৫৫:৪৫) বেশী হলেও একই স্থানে পাশাপাশি সমাধি, শ্মশান, গোরস্থানেব অবস্থানের জন্য পর্যায়ক্রমিক আলোচনার জন্য কোথাও সমাধি, কোথাও বা শ্মশান, কোথাও বা গোরস্থান পূর্বে বা পরে এসে পড়েছে। আরো একটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন—স্বজন প্রতিবেশী বাসিন্দাদের বসবাসকারী প্রতিটি পাড়ায় বা গ্রামে বা মৌজায় গোরস্থান তৈরি করা হয়েছে—এমনকি প্রয়োজনে নিজস্ব বসত-ভিটার পিছনেও দাহন করার নজির পাওয়া যায়। অপরক্ষেত্রে শ্মশানগুলি বেশ কযেকটি মৌজা বা এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে।

প্রথমে আসি জেলার সদর থানা ইংরেজ বাজারের কথায়। পূর্ব ও উত্তরে আংশিক অংশ মহানন্দা নদী বেষ্টিত, এই শহরের দক্ষিণ-পূর্বদিকে উত্তর বালুচব মৌজায় অরবিন্দ ভবনেব দক্ষিণ হঠাৎ-পাড়া-কলোনীতে নদী তীবে বোচাটক শ্মশানে দুঃস্থদের মরদেহ ছাড়া মালদহ মহকুমা হাসপাতালের দাবিদারহীন পোষ্টমর্টেম করা পরিত্যক্ত মবদেহ দাহ করা হয়। এর পশ্চিমে শক্তিপীঠের, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের নিকটস্থ বালুচরে দুঃস্থ ব্যাক্তিদের মরদেহ দাহ করা হয়।

শহরের সবচেয়ে বড় গোরস্থানটি রথবাড়ির উত্তরে এয়ারভিউ কমপ্লেক্স ও সানিপার্কেব নিকটবর্তী খ্রিস্টান ক্যাথলিক চার্চসংলগ্ন ২৩ নং ওয়ার্ডে মহেশমাটি মৌজায় ৩০ বিঘা জমির উপর। বর্তমান সংসদ গনিখান চৌধুরী তাঁর সাংসদ কোটার ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংস্কার কৃত কবরস্থানটি উদ্বোধন করার কথা ৪ নভেম্বর (২০০৩)। প্রাচীর ঘেরা এই কবরস্থানটি

সরকারী খাস জায়গায় এবং যে কোন স্থানের মুসলমানদের মরদেহ দাহ করা হয়।

এছাড়া শহরের রক্ষাটুলী সমাজের গোরস্থান রথবাড়ির ঘোড়ার গাড়ী স্ট্যান্ডের নিকটবর্তী স্থানে (৮বিঘা), হায়দারপুর মহল্লা সমাজের গোরস্থান চল্লিশাপাড়ায় (১.৩ বিঘা)। শহরের উওরাঞ্চলে বাগবাড়ি, গয়েশপুরের কলতাপাড়া, ঘোড়াপিরে বাবলাবনিতে, এবং পশ্চিমে জহড়াতলা যাওয়ার পথে ৩ কি.মি. দূরে যদুপুর ২ অঞ্চলে গোপালপুরে গোরস্থান আছে। মালদহ-টাউন স্টেশনের পাশ দিয়ে আরাপুর-কোতোয়ালির পথে মহানন্দার পশ্চিমতীরে নিমা-সরাই মৌজায় (জে.এল. নং -৫৩) বহু পুরানো দিনেব গোরস্থান আছে। এই পথেই আরাপুর ও কোতুয়ালিতে প্রাচীব ঘেরা গোরস্থান আছে।

মালদহ শহর থেকে ফারাক্কাগামী জাতীয় সড়কে (৩৪নং) দক্ষিণে প্রায় ৪ কি.মি. দূরে সাদুল্লাপুর মৌজায় (জে.এল. নং ৮৪) পুরাতন গঙ্গার শাখা ভাগীরথীতীরে অবস্থিত জেলার সর্বপ্রাচীন সাদুল্লাপুর মহাশ্মশানটিতে ধর্মীয় বিশ্বাসে মোক্ষপ্রাপ্তির আশায় জেলার সচ্ছল ব্যক্তিদের মরদেহ দাহ করা হয়। কারো মতে শ্রীহট্ট থেকে আগত শাহ আবদুল্লাহ নামে জনৈক ফকিরের নামানুসারে এই জনপদটির নাম সাদুল্লাপুর। ব্রিটিশ আমলে দিনাজপুরের জেলার বিশেষত: রায়গঞ্জ এলাকাব মরদেহ দাহ করা হত। ৩টি ধর্মশালার মধ্যে বর্তমানে টিকে থাকা ১টিতে শবদাহকারীগণ বিশ্রাম করে। বিদুর মহাবাজ নামক সাধু এবং মথুরাপুর ব্লকের যাত্রা শেখের অর্থানুকূল্যে তৈরি ৪টি চুল্লির ২টি চালু আছে। সাংসদ গনিখান চৌধুরী গত বছর (১১-১১-২০০৩২) বৈদ্যুতিক চুল্লির জন্য শিলান্যাস করেছিলেন। তাঁরই সাংসদ কোটার ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত চুল্লির উদ্বোধন করবেন সাংসদ গণিনাখ চৌধুরী ৩ নভেম্বর (২০০৩)। ঠিক হয়েছে শিলিগুড়িতে শবদাহ করতে যা লাগে সেটাই এখানে করা হবে।

শ্মশানের পাশে কালী, শিব, গঙ্গাদেবী ও হনুমানের মন্দির এবং সড়কেব পরপারে ব্যক্তিগত মালিকানায় রামকৃষ্ণ ও রামলালার মন্দির আছে। লালবাবা-নামে সন্তের সমাধি শ্মশানের পাশে মন্দির লাগোয়া। বর্তমানে ইংরেজ বাজার পৌরসভা থেকে মাসিক ৭৫০ টাকা দেখাভালের জন্য দেওয়া হয়। আঞ্চলিক একটি কমিটি আছে। ভকত্ পরিবারের রাখালের তিনছেলে পশুপতি, খগেন, লুটুলালের পর বর্তমানে নরেশ নামে জনৈক সাধুর তত্বাবধানে শবদাহের ব্যবস্থাপত্র হয়। প্রতিদিনই এখানে শবদাহ হয়-কি বর্ষা, কি শীত?

পৌষ-সংক্রান্তি, মাঘী-পূর্ণিমা, কার্তিক-সংক্রান্তি (সংকীর্তন)তে যানবাহনের বিশেষ ব্যবস্থায় হাজার হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে। এখানকার একটি উচ্চবাঁধের ধবংসাশেষ দ্বারবাসিনী পর্য্যন্ত পূর্বে গৌড় নগরীকে রক্ষা করতো। নিকটেই সাগর দিঘির উওর-পশ্চিম দিকে পরাণ-ই-পির নামে খ্যাত আঁখি সিরাজুদ্দিন উস্‌মানের সমাধিক্ষেত্র ঈদের দিন ও পরের দিন মেলা বসে। ইংরেজ বাজার মৌজায় (জে.এল. নং -১০২) জাহানপিরের মাজার এবং বাগবাড়িতে পোড়াপিরের মাজার আছে। মালদহ থেকে মহদীপুর গামী পথে ৭ কি.মি. দূরে পিয়াসবাড়ির বাম দিকে প্রায় ৩ কি.মি. এলাকার মধ্যে কদম রসুল সংলগ্ন এলাকায় ফতে খাঁর সমাধি,

বিপরীতে নেকবিবির সমাধি, পাশে পির শহিলা সাহেবের মাজার। তাঁতীপাড়া মসজিদের পূর্বদিকে উমর কাজী এবং তাঁর কন্যা জুল ফরণের কবর বিদ্যমান।

বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মহদীপুরে পাগলা ও ভাগীরথীর সঙ্গম স্থলে ভাগীরথীর উওর পারে শ্মশানটি প্রবল জলস্রোতে, অতি বর্ষণে, প্লাবনে স্থান পরিবর্তন করে আদল বদলায় (জে.এল.নং-১৩৫, ব্লক-ইঃ বাজার, গ্রাম পঞ্চায়েত ও মৌজা-মহদীপুর) কিছু ধবংসপ্রাপ্ত কবর ও সমাধির দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল। প্রায় ৫০০ বছর পূর্বে রামকৃষ্ণ পল্লির উত্তরে কালা পাথর নামক স্থান থেকে বর্তমানে ৩৪নং জাতীয় সড়ক পর্যন্ত স্থানে থাকা কিছু গোরস্থানগুলির উপর বসবাসের জন্য ঘর-বাড়ি হয়েছে। মালদহ শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের কাছে থাকা খ্রিস্টানদের কবরস্থানটিতেও সরকারি কাজে ঘরবাড়ি হয়েছে বলে অভিযোগ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজবাজার শহরে ইউরোপীয় সমাধি এবং ১/২ কি.মি. পশ্চিমে মকদুমপুরে ডাচ সমাধিটিও ধ্বংস হয়ে গেছে। আবার মালদহ মহকুমা হাসপাতালের চত্বরে ঊনবিংশ শতকের (১৮০০-১৮৪৩) ছয়জন বিদেশির কবর দেখা যায়। শহর থেকে রাজমহল রোডে ২ কি.মি. দূরে কুলী পট্টিতে খ্রিস্টানদের কবর লুনবই আছে। শহর থেকে কোতোয়ালির পথে ৪কি.মি. দূরে নিমা-সারাইতে খ্রিস্টান কবরখানা বিদ্যমান।

মালদহ থানা ঃ

নদীপারে মালদহ থেকে ২কি.মি. দূরে মঙ্গল বাড়িতে ৩৪নং জাতীয় সড়কের বাম পাশে গৌড় মহাবিদ্যালয়ের পূর্বদিকে মঙ্গলবাড়ি পাড়া সামন্ডইতে (জে.এল.নং -১৫০ মঙ্গল বাড়ি অঞ্চল) প্রাচীর ঘেরা কবরস্থানে শহরের মহাজনটুলীর জন্য ৩ বিঘা, যুলবাড়ীর জন্য ১.৫ বিঘা এবং উত্তবে সামগুই পাড়ার জন্য ৩ বিঘা গোরস্থান আছে (মৌজা-সামগুই)। নিকটবর্তী বাচামারীতে (মৌজা-সামন্ডই) পির শাহ লক্ষাপতির সমাধি আছে। জাতীয় সড়কের পাশে পির সৈয়দ শাহের মাজার আছে। পুরাতন মালদহ থানার দক্ষিণে ৪নং ওয়ার্ডে শর্বরী পাড়ার গোরস্থান পিরের মাজারের কাছাকাছি (জে.এল.নং ঃ৯৮)

পিরের মাজার সমূহ ঃ

মৌজা শর্বরীতে (৯৮) পির গাদার দরগাহ চত্বরে ৪টি কবর, পিছনে দুধ পির ও মালদহ পিরের মাজার। জামে মস্‌জিদের (জে.এল.নং-৯৮, দাগ নং-২৫০২) মোট ৫০টি কবর আছে। থানার ২ কি. মি. উত্তরে বাঁশহাট্টা মৌজায় শুঁড়ি পাড়ায় ফকির তাকিয়ার মাজারের কাছে মদান আলি শাহের সমাধি আছে। পুরাতন মালদহ থানা চত্বরে ২টি অজানা কবর ও নিকটে শাকমোহন মহল্লার পথপাশে পির দরবেশের সমাধি আছে। থানা থেকে চাঁপাই (বালিয়া) নবাবগঞ্জের পথে ২ কি.মি. উত্তরে বাঁশহাট্টা মৌজায় মহানন্দাতীরে লোলাবাগ শ্মশানটিতে বাংলাদেশ থেকে আগত 'পাগল বাবা' নামে সাধু বিগত কয়েক বছর ধরে কুঁড়ে ঘরে বাস করছেন। নলডুবির উত্তরে থানার পূর্বে পুরাতন মালদহ কোর্ট স্টেশনের নিকটবর্তী বেহুলা নদীর তটদেশে নিম্নবর্ণের মরদেহ দাহ করা হয়। শহব থেকে প্রায় ১০ কি.মি. দূরে

কালুয়া দিঘিতে (বর্তমানে কমলাদিঘি) কালু পিরের সমাধিতে যাতায়াতের পথে গাড়ি চালকরা সেলাম জানায়।

একই রাস্তায় শহর থেকে আটমাইল দূরের জায়গার নাম আট মাইল (৩৪ নং জতীয় সড়ক)। তার ডাইনে পূর্ব দিকে প্রায় ৫ কি.মি. দূরে ভাবুক অঞ্চলে সৈয়দপুর মৌজায় সৈয়দপুরে শিশু, ইউক্যালিপ্‌টাস, আকাশমণি বৃক্ষশোভিত দিঘি সংলগ্ন খাসজমিতে লালদিঘি শ্মশানটি স্থানীয় মতে ৭০০ বছরেরও বেশি পুরানো। (জে.এল.নং-৪১, খাতিয়ান নং-১, দাগ নং-৩২৭)। আজকাল স্থানীয় আদিবাসী সাঁওতালগণ মরদেহ দাহ করছে। নিকটস্থ জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নাদেশ পেয়ে কালীমন্দীর গৃহ নির্মাণ করছে। পৌষ সংক্রান্তির মেলায় এতদঞ্চলের বহুব্যক্তি দিঘির স্বচ্ছ সলিলে স্নান করে।

গাজল থানা ঃ

৩৪নং জাতীয় সড়কে আটমাইল থেকে ২কি.মি. উত্তরে পাণ্ডুয়া অঞ্চল ও মৌজার পাণ্ডুয়ায় (গাজল ১ নং ব্লক) রাজা লক্ষ্মণ সেনের দানকৃত সম্পত্তিতে (বর্তমানে বাইশ হাজারী এস্টেটের আয়ত্বাধীন) ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বড় দরগাহের (প্রায় ২৩৭একর) মধ্যে সন্ত পির তাবরেজীর নকল সমাধি, চাঁদ খাঁ ও তাঁর পুত্রের সমাধি, হাজি ইব্রাহিমের পিরের মাজার বিদ্যমান (অঞ্চল দেওতলী, জে.এল.নং-১৭২,দাগ নং -৪৭৫)। মন্তান্তরে বাংলাদেশের সিলেটে বা মালদ্বীপে ও একই পিরের মাজার আছে। কথিত, মৃত্যুকালীন হাজী ইব্রাহিম নামে জনৈক শিষ্যের প্রার্থনাস্থলের সবগুলিতে তিনি হাজির ছিলেন। এই দরগাহের উত্তরে ৫২ শতক জায়গার উপরে অবস্থিত গোরস্থানে স্থানীয় মুসলমানদের মরদেহ দাফন করা হয় (জে.এল.নং-৩৩ খতিয়ান-১, দাগ নং-৬৫.বাইশহাজারীর অন্তর্গত) উত্তরে ১/৪ কি.মি. দূরে কুতুবশহর মৌজায় ছয় হাজারী ওয়াকফ্ এস্টেটের নিয়ন্ত্রণাধিন সিদ্ধ পির নূর-উল-আলমের ছোট দরগাহে (পূর্বের ভালেশ্বরী মৌজা) প্রায় দেড় শতাধিক কবরের মধ্যে প্রধান হলো দরবেশ আলাউল হক পাণ্ডুয়ারী (মৃত্যু -১৩৯৮ খ্রি.) , তাঁর স্ত্রী বিবি মেহেরুন্নিসা, পুত্র নুর কুতবুল আলম ও কুতুবউলের পৌত্র পণ্ডিত শেখ জাহিদের সমাধি-সহ এক শিশু সন্তান ও জনৈক সৈনিক শেরখানের সমাধি আছে । (জে.এল. নং-৩২,খতিয়ান-১, দাগ নং-৭১৯) রাজা গণেশপুত্র যদু পির নূর-কুতুব-উলের কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আলাউল হকের সমাধির প্রধান বৈশিষ্ট্য পারস্য থেকে আনা চকমকি পাথর দিয়ে তৈরি সমাধির চারকোণে চারটি স্তম্ভ। অতীতে চাঁদনির রাতের জ্যোৎস্নায় অলোকিত হয়ে উঠত আরো। সামান্য উত্তরে তৎকালিন এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৪৮ ফুট ব্যাসার্দ্ধ সমন্বিত একটি মাত্র অর্ধগোলাকৃতি গম্বুজ বিশিষ্ট একলাখি সমাধি-সৌধে রাজা গণেশপুত্র জালাউদ্দিন (যদু), তাঁর পত্নী বেগম আসমানতারা ও পুত্রের সমাধি আছে । হিন্দু দেব-দেবীর সামান্য চিহ্ন থাকা এই সমাধি ইন্দো-সারাসেনী রীতিতে প্রস্তুত (১৪১২-১৫ খ্রি.) (মৌজা-কুতুব শহর, অঞ্চল-পাণ্ডুয়া, ব্লক-গাজল-১নং জে.এল.নং -৩২, দাগনং-১১১৪)।

ছোট দরগাহের পূর্বদিকে লাগোয়া গোরস্থানটি কুতুবশহর মৌজায় কুতুবশহর গ্রাম নিবাসি আফাজুদ্দিন আহমেদ (পিতা ˚ মফিজুদ্দিন আহমেদ) দানকৃত ১একর ৩৫ শতক জমির উপর (জে.এল. নং-৩২, খতিয়ান নং-৬১, দাগ নং -২০৩২) ১৯৬০ সালে দান করার পর মুসলমানদের মরদেহ দাফন করা হয় ।

এর পশ্চিমে ১/২ কি.মি. দূরে প্রায় ৬.৫ একর জায়গায় দিঘির পাশে কুতুবশহর মৌজায় শিবিরপাড়া গ্রামে প্রায় ২৫০ বছরের পুরানো শিবির পাড়া শ্মশানে পাশাপাশি ১০/১২ মৌজার মরদেহ দাহ করা হয় (জে. এল নং-৩২,খাতিয়ান-১ দাগ-৭১৯)। রাধেশ্যাম নামে এক সাধু কিছুদিন বসবাসের পর ৫ মাইল দক্ষিণে নারায়ণপুরে মারা যান। আরো ৪ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে দিঘির পাশে বোয়ালমারী (গ্রাম-বোয়ালমারি) ও তার দক্ষিণে ৩ কি.মি. দূরে গোয়াল পাড়া মৌজায় গোয়ালপাড়া ও আসানসই গ্রামের মধ্যবর্তীতে পুকুর (জে. এল. নং -১৩, অঞ্চল পাণ্ডুয়া, দাগ নং-৮৫১ ও মন্দির, দাগ নং-৮৫২) সংলগ্ন গোয়ালপাড়া- আসানসই শ্মশানটি প্রায় ২০০বছরের প্রাচীন। পশ্চিমে আদিনা স্টেশনের কাছেও শ্মশান আছে।

একলাখী সমাধির প্রায় ১ কি.মি. উত্তরে আদিনা মস্‌জিদ সংলগ্ন সিকান্দর শাহের সমাধির (দৈর্ঘ্য ২১.৯´´ x প্রস্থ ২১.৯´´) পশ্চিমে মেঠোপথে প্রায় ১/২ কি.মি. দূরে চন্দনদিঘি মৌজায় হঠাৎ-পাড়ায় চন্দনদিঘি-হঠাৎপাড়া শ্মশানটিতে মাঘী পূর্ণিমাতে ৭ দিনের মেলায় যাত্রাগান হয় ২-৩ রাত্রি। আদিনা মস্‌জিদের পূর্বে প্রায় ৪ কি.মি. দূরে কেবলমাত্র বৃষ্টিকালে জলথাকা খাড়ির পাশে কনাটি শ্মশান, সাহাজাদপুব অঞ্চলে খড়ির পাশে কেষ্টপুরে ও রানীগঞ্জের নিকটবর্তী পাইলে দিঘির পাশে চামড়াভিটা শ্মশানে দুঃস্থ ব্যক্তিদের মরদেহ দাহ করা হয়।

বৈরগাছী-১নং অঞ্চলে আলমপুর (অধুনা, শিবাজীনগর) হতে একলাখী স্টেশনগামী রাস্তার দক্ষিণের শ্মশানটিকে রম্য পরিবেশ দান করেছে সুবিশাল রাইখান দিঘি। (জে. এল. নং-২৩) মহানন্দাতীরে আলিনগর মৌজায় দিঘির হাটে একটি শ্মশান ও আলিনগর গ্রামে একটি গোরস্থান আছে (বৈরগাছী-১)। বৈরগাছী-২ অঞ্চলে নাওয়ালী মৌজায় নাওয়ালী শ্মশান (৫বিঘা), সাহারোলে-মৌলালী শ্মশান, খসলাবাড়ীতে-খসলাবাড়ী শ্মশান, আলাল অঞ্চলে মহানন্দাতীরে আলালঘাট শ্মশানে মরদেহ দাহ করা হয়। আর্থিক-সঙ্গতি সম্পন্ন ব্যক্তিদের বরাবরই সদুল্লাপুর মহাশ্মশানে মরদেহ দাহ করার ধর্মীয় বিশ্বাস আছে।

রাজাদিঘি একলাখি মিশন (গাজল-১) বাগসরাই (গাজল-১), ভরদিঘি (দেওতলা), আলমপুর মিশনে আদিবাসী খ্রিস্টানদের মরদেহ কবর দেওয়া হয়।

অন্যান্য গোরস্থান সমূহ : গাজল শহরের সরকারপাড়া, ভাদনাগরা, একুশ মাইলে দেওতলা, ভবানীপুর, সলাইডাঙা, রানীগঞ্জ (অঞ্চল-সাহাজাদপুর), আগমপুর, আহিল, দোহিল, দোহিলপুর, আলাল, নস্করপুর, শ্রীপুর, পাঁচপাড়া (মাতল) রসিকপুর, রাজাদিঘি, বাবুপুর ইত্যাদি।

বামনগোলা থানা : পাকুয়াহাট বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে পাকুয়াহাট মৌজায় প্রায় ৮।১০ বিঘা

জমির উপর বহু প্রাচীন গোবরাকুঁড়ি পঞ্চতীর্থ মহাশ্মশানে (দিঘিপার্শ্বে) বিগত আট-দশবছর পূর্ব থেকে পৌষ সংক্রান্তিতে ৭দিন ব্যাপী বাউলমেলায় বহু লোকের সমাগমে খ্যাতনামা বাউলদের গান হয়। বামনগোলা ১নং ব্লকে জাইতন মৌজায় মেদিনী শ্মশান, গোবর নন্দনবাটী মৌজায় চামারকুঁড়ি শ্মশান, নালাগোলায় পুণর্ভবার শাখানদী হাঁড়িয়ার তীরের শ্মশানটি বেশ পুরানো। পাকুয়াহাটের পূর্বদিকে ৫ কি.মি. দূরে আশ্রমপুর (জগতলা অঞ্চল) মৌজায় আশ্রমপুর খাড়ি সংলগ্ন দিঘিপার্শ্বস্থ জামতলা শ্মশানে নমঃশূদ্র ও আদিবাসী সাঁওতালদের দাহ করা হয়। এখানকার গাঙ্গুরিয়া শ্মশানটি প্রায় লুপ্ত।

এই অঞ্চলের গোরস্থানগুলি তিন থেকে দশ বিঘা জায়গার উপর করা হয়েছে। বামনগোলায় ওড়সি পাড়া মৌজায় শংকরপুর গোরস্থান (৭বিঘা), উত্তর জই মৌজায় ডাঙাপাড়া গোবস্থান ও মানাউল মৌজার গোরস্থানটি তিনবিঘা জায়গার উপর।

হবিবপুর থানা :

হবিবপুর থানায় পারুলিয়া মৌজায় (জে.এল.নং-৩৭) ন` পাড়া গোবস্থান, আকতুইল অঞ্চলে ৭ বিঘা জায়গার উপর গোরস্থান ছাড়াও প্রায়শ মুসলমান বসবাসকারী এলাকায় ছোট ছোট গোরস্থান দেখা যায়। হবিবপুর ব্লকে কেন্দপুকুরের নিকটবর্তী রাউতারা গ্রামে প্রোটেস্টান্ট পন্থী রাউতারা মিশনের কাছে সেন্ট টমাস হাই স্কুলের পিছনে ও পাশে বসবাসকারী আদিবাসীদের মরদেহ কবর দেওা হয়। একই ব্লকে নিত্যানন্দপুর ও কেন্দপুরের ডানদিকে খড়িবাড়িতেও খ্রিস্টান আদিবাসীদের জন্য কবরস্থান আছে। পারুলিয়া মৌজায় ফকির শাহ জামাল ও ফকির শাহ কামালের মাজার আছে। (জে.এল.নং-৩৭, খতিয়ান নং-৭৯)।

সিংহাবাদ রেলস্টেশনের নিকটবর্তী বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় ঋষিপুর গ্রামে টাঙ্গন নদীর তীরের শ্মশানটি পুরানো ও নদীপ্লাবনে স্থান পরিবর্তন করে। বুলবুলচণ্ডী অঞ্চলে কেন্দুয়া মৌজায় কেন্দুয়া গ্রামে টাঙ্গন নদীর তীরে ১২৫ বছরেরও পুরানো কেন্দুয়া শ্মশানটিতে ছিন্নমস্তা কালীমন্দিরটি বিখ্যাত। এখানে তিনটি সমাধিতে উৎকীর্ণ লিপিগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন। তাছাড়া ২টি কবর দেখা যায়। অস্থায়ীভাবে এক যাযাবর সাধু দেবী ছিন্নমস্তা কালী মন্দিরের পাশে থাকে।

কালিয়াচক ও বৈষ্ণবনগর থানা :

বসবাসকারী অধিবাসীদের মধ্যে কালিয়াচক ১নং ও ২নং ব্লকে মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যা বেশি হওয়ায় প্রায় প্রতিটি গ্রামেই গোরস্থান। অধুনা কালিয়াচক থানা অংশ নিয়ে বৈষ্ণবনগর থানা গঠিত। কালিয়াচক ও বৈষ্ণবনগর থানার কিছু কিছু গোরস্থানের অবস্থানগত গ্রামের নাম দেওয়া হল। সুজাপুর (অঞ্চল সুজাপুর), গয়েশবাড়ী বখরপুর (অঞ্চল গয়েশবাড়ী), জালালপুর (জে.এল.নং-১৪৪), মজরমপুর, হাস্চক, হলুয়াবাগান, শ্রীরামপুর, দুয়ারানি, জগদীশপুর, পূর্বচাঁদপুর, সুলতানগঞ্জ (বৈষ্ণবনগর) চড়ী অনন্তপুর, সবদলপুর (বৈষ্ণবনগর) প্রভৃতি।

কালিয়াডাঙা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকটে প্রাচীর ঘেরা প্রাচীন গোরস্থান (৯বিঘা), কালিয়াচক মৌজায় জুম্মা মস্‌জিদের লাগোয়া গোরস্থান, কড়ারী চাঁদপুর ও খাসচাঁদপুরের জন্য মধ্যবর্তী কড়ারী চাঁদপুরে ১২ বিঘা জমির উপর গোরস্থান, কালিয়াচক থানা সংলগ্ন মুচি পাড়ার কাছে খড়িয়ালী চক ধুনিয়া পাড়ায় ৪.৫ বিঘা জমির উপর পুরানো গোরস্থান আছে। লক্ষ্মীনগর কাহালায় চিকু ফকির ও পঞ্চানন্দপুরে পির মৌজানার মাজার আছে।

ভগবানপুর অঞ্চলে (কালিয়াচক-৩ ব্লক) নন্দলালপুর মৌজায় ১৫ বিঘা জমির উপর চামা শ্মশানটির শোভাবর্ধন করছে এক বড় দিঘি। আলীপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতে খাকচাঁদপুর মৌজায় নিমতলা শ্মশানটি পুরনো। কালিয়াচক-৩নং ব্লকের বীরনগর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সুলতানগঞ্জ মৌজায় নতুন ৩৪ নং জাতীয় সড়কের পাশে পাগলানদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত এই শ্মশানটি স্থান পরিবর্তনকারী শ্মশানের দৃষ্টান্ত। প্রায় ৫০ বছর পূর্বে এই শ্মশানটি পাগলা নদীর পূর্বতীরে দেওয়ান ঘাটে অবস্থিত ছিল। কালিয়াচক-৩ ব্লকের আকন্দবেড়িয়া অঞ্চলে সইলা মৌজায় পাগলা ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে পাগলানদীর দক্ষিণ তীরে এই শ্মশানটি অতিবর্ষণ, নদীতে জলবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে স্থান ও আদল বদলানো শ্মশানটি বহু দিনের পুরানো। সবদলপুর মৌজায় কবিরাজ পাড়ার গঙ্গাতটের শ্মশানটি ও পুরানো (কালিয়াচক-৩নং ব্লক)।

বৈষ্ণবনগর থানায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বহুদিনের প্রাচীন ফারাক্কা ব্যারেজ রাইট ব্যাঙ্ক শ্মশানটি বীরনগর ১নং অঞ্চলের জগন্নাথপুর মৌজায় (জে.এল.নং-৩৫) ভাগীরথী তীরে অবস্থিত। নদীর জলস্রোত বৃদ্ধি, প্লাবণ, অতিবর্ষণ ইত্যাদি কারণে স্থান পরিবর্তন করে শ্মশানটি খেজুরিয়া ঘাটের দিকে চলে এসেছে। শবদেহ দাহকারীদের ধর্মশালার পাশে এক যাযাবর সাধুর আগমন ঘটলেও কিছুদিনের পর তিনি কোথাও চলে যান। পৌষ-সংক্রান্তি, মাঘী-পূর্ণিমা, গঙ্গা-দশহরায় শ্মশানঘাটে গঙ্গা-স্নানে পুণ্যার্থীদের ভীড় দেখা যায়। মালদহ শহর থেকে ফারাক্কাগামী জাতীয় সড়কে (৩৪নং) ৩১ কি.মি. দূরে এই শ্মশান।

মানিকচক থানা :

মালদহ থেকে রতুয়াগামী রাজমহল রোডে ৭কি.মি. দূরে অমৃতি, ১৫ কি.মি. দূরে মিল্কী (জে.এল.নং-৭), ২৩ কি.মি. দূরে এনায়েৎপুরে (জে.এল.নং-৬৪) বড় গোরস্থান আছে। অমৃতির ৫ কি.মি. পশ্চিমে সাট্টারী, গোরস্থানের পর আটগামাতে গোরস্থান আছে। নূরপুর, নাজিরপুর, মথুরপুরের গোরস্থানগুলি বৃহৎ আকারের।

রতুয়াগামী রাজমহল রোডে শোভানগর ও উত্তরে কালিন্দ্রী বাসস্ট্যান্ডের মধ্যবর্তী একটি ভাঙা ব্রিজের নিকটে কালিন্দ্রী তীরে অস্থায়ী শ্মশান আছে। মানিকচকের গঙ্গাতীরে মানিকচক ঘাট, ডোমহাট, মথুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে শংকর টোলায় শ্মশান আছে। ফুলহারা, গঙ্গা, কোলী পরিবেষ্টিত দ্বীপসদৃশ ভূতনীর পশ্চিমে গঙ্গাতীবে হীরানন্দপুরে (জে.এল.নং-১২), উত্তর চণ্ডীপুরে (জে.এল.নং-১৯) শ্মশানগুলিতে হিন্দু বসবাসকারী অধিবাসীদের মরদেহ দাহ

করা হয়। ভূতনীতে বসবাসকারী মুসলমান অধিবাসীগণ নিজস্ব ভিটার সুবিধাজনক অংশে মরদেহ দাফন করতেন। ইদানিং ২০০২ সালে চাঁদার মাধ্যমে আর্থিক সাহায্যে ১.৭ একর জমি ক্রয় করে উত্তর চণ্ডীপুরে (জে.এল.নং-৩) খুসবুটোলায় সর্বসাধারণ জন্য একটিমাত্র গোরস্থান করা হয়েছে।

রতুয়া থানা :

রতুয়া থানার বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী গোবরজনা মহাশ্মশানটি আড়াইডাঙা অঞ্চলে গোবরজনা মৌজায় কালিন্দ্রী নদীতটে ৩০০/৩৫০ বছরেরও বেশি পুরানো বলে জনশ্রুতি। (রতুয়া ব্লক-২নং, জে.এল.নং-১৪৩, খতিয়ান নং-১, দাগ নং-৪৮০)। শ্মশান সংলগ্ন ৩৩ ডেসিমল জায়গায় জাগ্রত কালীমন্দিরে (জে.এল.নং-১৪৩, খতিয়ান নং-১, দাগ নং-৩৮০) প্রতিবছর কালীপূজার অমানিশায় পাঁঠা, মোষ, মেষ মিলিয়ে প্রায় ৩০০০ (তিন হাজার)/৩৫০০ হাজার পশুবলি হয়।

স্থানীয় ও অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায় পূর্বে প্রত্যন্ত এই অঞ্চলে এক দুর্ধর্ষ প্রকৃতির রাজপুত জাতির বাস ছিল। তাদের পেশা ছিল ডাকাতি। বর্তমানে মন্দিরের পিছনে কেবল বৃষ্টিকালে জলথাকা যে খালটি কালিন্দ্রী নদী থেকে মহানন্দায় মিলিত হয়েছে, সেই খাল দিয়ে উক্ত ডাকাতরা জলপথে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ডাকাতি করতো। ওই রাজপুত ডাকাতরা নিজেদের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষার জন্য এই কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করে এক মৈথিল ব্রাহ্মণকে দেবীর পূজারী নিযুক্ত করেন। তাঁদের বংশধরগণ বংশ পরম্পরায় মন্দিরের সেবাইত রূপে কাজ করছেন। বর্তমানে ঁ বরদাময়ীর চার পুত্রের তিন পুত্র তারাপদ চৌধুরী, বামাপদ চৌধুরী ও শান্তি চৌধুরী সেবাইত হিসাবে মন্দিরের পূজার্চনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছেন।

মন্দিরের পাশে ঘণ্টীবাবা নামে খ্যাত গোরক্ষপুর থেকে আগত গিরি সম্প্রদায়ের সন্ত শ্রীহরি মাধব গিরি ব্রহ্মচারী ১৯৮২ সালে ২৮ এপ্রিল মঠেশ্বর নাথ মহাদেব প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘ ৫০ বছর বসবাসের পর ঘণ্টিবাবা ২০০১ সালে দেহরক্ষা করেন। প্রতি বছর কালীপূজার পরের পূর্ণিমায় ৩দিনের যজ্ঞে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়।

এই থানার কালুটোলায় ফকির তাবিদ এবং তালবন্যা মৌজায় পির শাহ সিরাজদ্দীনের মাজার ছাড়া ও বহু জায়গায় গোরস্থান আছে।

চাঁচল থানা :

সামসী থেকে চাঁচল যাওয়ার পথে কেষ্টপুরের (কৃষ্ণপুর) কাছে মালতীপুরে (জে.এল.নং-১২৯, মৌজা মালতীপুর), কালিগ্রাম (অঞ্চল ও মৌজা-কলিগ্রাম, জে.এল.নং-১৫১) শ্মশানছাড়া সামসীতে কুমুদপুর মৌজায় গোবরডাঙার তীরে (শাখানদী) শ্মশান আছে। চাঁচল-২নং ব্লকে গোয়ালপাড়া মৌজায় মহানন্দার তীরে ১২ বিঘা খাসজমিতে শ্মশান আছে। পুরানো চাঁচল থানার কিছুদূরে জলাভূমির পাশে অবস্থিত শ্মশানটিতে বসবাস দুঃস্থ অনুরূপ মানুষদের। বোয়ালিয়া মৌজায় শ্মশান দেখা যায়।

চাঁচলে নোনাতোড় মৌজায় পির সৈয়দ নোনা সাহেবের কবর, খরবায় সিকান্দর পির সাহের মাজার, কলিগ্রামে জিন্দাপিরের সমাধি, দুর্গা-চণ্ডীপুর মৌজায় পির নীচকা শাহের মাজারের পাশাপাশি গোরস্থানগুলিতে মরদেহ্ দাফন করা যায়।

হরিশ্চন্দ্রপুর থানা :

এই থানার প্রধান প্রধান কয়েকটি গোরস্থান হল হরিশ্চন্দ্রপুর (হরিশ্চন্দ্রপুর অঞ্চল), তুলসীহাটা (অ: নাড়িয়াল), বিরুয়া, রামসিবুন (বিরুয়া অ:), সুলতান নগর (মহেন্দ্রপুর অঞ্চল), তালসুঙ (অ: তালসুঙ), গাঙনদিয়া (অ: গাঙনদিয়া), কোড়ীয়ালী (অ: কোড়ীয়ালী) —এছাড়া ছত্রক, সায়রা, মনোহরপুর, বাগুয়া, মালীপাঁকোর, কনুয়া ইত্যাদি।

ফুলহার নদীর তীরে খিদিরপুর, নয়াপাড়া, তুলসীহাট্টায় কুমারগঞ্জে খাড়ির তীরে মালীওর শ্মশান আছে। উত্তর ও দক্ষিণ খাকুরিয়ায় শ্মশান দেখা যায়। হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে কুর্শিদা যাওয়ার পথে মাদার ট্রেনিং স্কুলের নিকটে একটি শ্মশান আছে।

জামে মস্‌জিদের পিছনে চণ্ডীপুরে বড় পির সাহেব, নিকটে উক্ত পিরের পুত্র ছোট পির সাহেবের মাজার আছে। হরিশ্চন্দ্রপুর রেলস্টেশনের কাছে দক্ষিণ মহেন্দ্রপুর মৌজায় পিরের মাজার আছে।

দীর্ঘ এই প্রবন্ধে মোটামুটি ভাবে এই জেলার গোরস্থান, শ্মশান, সমাধির কথা সংক্ষেপে আলোচিত হলো।

তথ্যেব অপ্রতুলতা, তথ্য লিপিবদ্ধ না থাকায় কালে কালোত্তরে—এই জেলার গোরস্থান বা শ্মশান কতটা বৃদ্ধি হয়েছে, সে সংখ্যা জানা অসম্ভব। লোক মুখে মুখে কয়েক পুরুষের পর আর এগুলির সৃষ্টিকালের হিসাব থাকে না। এবং যে সমস্ত শ্মশান ও গোরস্থান, মাজার ইত্যাদি লুপ্ত হয়ে গেছে, তারও সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। এ তথ্য শুধু জেলা মালদহের নয়, সারা দেশের। পুরানো সমাধি, ঐতিহাসিক নিদর্শন, সৌধ ইতাদি উপযুক্ত সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের অভাবে ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

মৃত্যু অনিবার্য। মহাকালের ধাবাপাতে সম্পৃক্ত হয় অতীত—'Being is there and outside it nothing (sartre)'।

শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে সমাজে ধন বৈষম্যের দরুণ ধনী ও সর্বহারা মানুষের শ্মশানে মরদেহ্ দাহ্ করার জন্য ধনীর শবযাত্রা সহ্ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও অন্যদিকে তথাকথিত অন্ত্যজ সর্বহারার চিতার কাঠের অভাবে 'অভাগীর' মরদেহ্ অগ্নিতে ভস্মীভূত না হয়ে স্থান পেয়েছে ভূগর্ভে। একইভাবে দাফনকারীদের রীতি অনুসারে মরদেহকে আচ্ছাদন করার বস্ত্র কাফ্‌নের অভাব বর্ণিত হয়েছে এক প্রতিবাদী লেখক প্রেমচন্দ্রের গল্প—'কফ্‌নে'। শ্মশানের কথায় কবির এক অপরূপ নির্মিতি কবির—

> "তখন শকুনবধূ যেতেছিল শ্মশানেব পানে উড়ে উড়ে—
> মেঘের বরুজ ভেঙে ভেঙে অস্ত চাঁদ দিয়েছিল উঁকি" (জীবনানন্দ)

বলতেই হয়, শ্মশান, গোরস্থান অবশ্যই পবিত্র স্থান। অন্তিম পরিণামে চিতাভস্ম ধূলায় মিশে যায়। গোরস্থানে মরদেহ হয় মাটি। পিতৃ-পিতামহের চবণধূলিতে ধন্য এই ভূমি। তাই বুঝি—

'এ দ্যুলোক বড় মধুময়/বড় মধুময়—এই পৃথিবীর ধূলি।''

তথ্যসূত্র :

১. মালদহের ইতিবৃত্ত—ড: কৃষ্ণেন্দু গোস্বামী

২. গৌড়ের ইতিহাস—রজনীকান্ত চক্রবর্তী

৩. ভ্রমণে ও দর্শনে মালদহ—কমল বসাক

৪. সেখ শুভোদয়া—রজনীকান্ত চক্রবর্তী ও হরিদাস পালিত। (বাইশ হাজারী এস্টেটে সংরক্ষিত পুস্তক)।

৫ জেলা মালদহের পির-ফকিরের কথা—আবদুস সামাদ।

৬. ইতিহাসের ও সংস্কৃতির আলোকে পুরাতন মালদহ—ড: রাধাগোবিন্দ ঘোষ সম্পাদিত।

৭ মধুপর্ণী বিশেষ মালদহ সংখ্যা—১৯৮৫। সম্পাদনা · অধ্যাপক অজিতেশ ভট্টাচার্য।

৮. ভারতেব সাধক (১ম খণ্ড)—শংকর নাথ রায়।

৯. গৌড় ও পাণ্ডুয়া—কালিপদ লাহিড়ী।

১০. A Statistical Account of Bengal–W. W. Hunter

১১. মালদহ সমাচার—(৮৭ বর্ষ ৬ সংখ্যা, ২২ অক্টোবর, ২০০৩। সম্পাদক : সঞ্জীব কুমার চক্রবর্তী।)

১২. চর্যাগীতির ভূমিকা—জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী।

ব্যক্তিসূত্র :

তারাপদ সিংহ (শিক্ষক), শান্তি চৌধুরী (শিক্ষক, গোবরজনা), লালজী প্রসাদ সিং (সাদুল্লাপুর, শিক্ষক), আব্দুল জলিল (ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক), সূর্য দাস (শিক্ষক, লক্ষ্মীপুর), মোক্তার মিঞা (কালিন্দ্রী, শিক্ষক), গৌরাঙ্গ দত্ত (জহড়াতলা, শিক্ষক), রবি মুরমু (শিক্ষক, পাণ্ডুয়া), রতন মণ্ডল (আশ্রমপুর, পাকুয়াহাট), কমলকৃষ্ণ সিংহ রায় (ঝলঝলিয়া), সত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল (অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী, অরবিন্দ পার্ক), মহ: সানউল্লাহ (রসিলাদহ, পুরাতন মালদহ), পদ্মাসরকার (পুরাতন মালদহ), জে.এন.কুণ্ডু (গয়েশপুর), জোসেফ সানকাটা (প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ, রথবাড়ি), প্রবোধ এক্কা (ক্যাথেলিক চার্চ, সুকান্ত মোড়), অনির্বাণ ভট্টাচার্য্য (ছড়াকার), মুকুলেশ রহমান

(কালিয়াচক), দুলাল কুণ্ডু (শিক্ষক, আকন্দবেড়িয়া অঞ্চল), আফাজুদ্দিন আহমেদ (পাণ্ডুয়া), ফিরোজ সরকার মুন্না (পাকুয়াহাট), জীতেন সরকার (শিক্ষক, বৈরগাছী), মুজিবর রহমান (ভূতনী), রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডে (বুলবুলচণ্ডী) ও স্থানীয় বহু অধিবাসীবৃন্দ।

সিদ্ধিনাথের সমাধির উপর পঞ্চরত্ন মন্দির,
শ্যামসুন্দরপুর, পাটনা, পূর্ব মেদিনীপুর, ছবি : শ্যামল বেরা

☐ লেখক পরিচিতি—শিক্ষক, প্রাবন্ধিক, গবেষক।

খেজুরীর য়ুরোপীয় সমাধিক্ষেত্র

প্রবালকান্তি হাজরা

দেশের গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে থাকা লোকসংস্কৃতির অন্বেষণ ও চর্চার কথা রবীন্দ্রনাথ অনেককাল আগে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কথা মান্য করে বহু গুণী মানুষ লোকসংস্কৃতির অজস্র উপাদান আবিষ্কার ও সংগ্রহ করেছেন। গত তিন দশক জুড়ে বাংলার লোকসংস্কৃতির চর্চায় নিবেদিত প্রাণ ছিলেন শ্রদ্ধেয় তারাপদ সাঁতরা। বাংলার লোকসংস্কৃতির পরিধি বিস্তার আর ক্ষেত্র সমীক্ষায় অক্লান্ত এই পথিক কত দিকেই না আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে গেছেন,—লোকসংস্কৃতির উপাদান গ্রামীণ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে আছে।—তিনিই আমাকে খেজুরীর সাহেবদের গোরস্থানটি বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করায় অবাক হয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছিলাম এসব গোরস্থান-শ্মশানের আলোচনার গুরুত্ব। এগুলিও যে আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ—তা-ও তিনি বুঝিয়েছিলেন। পরে সংস্কৃতি শব্দের E.B. Tylor কৃত ব্যাখ্যায় পড়লাম—"culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, law, morals, custom and all other capabilities and habits acquired by man as a member of society." কাজেই সংস্কৃতির আলোচনায় গোরস্থানের ভূমিকা যথেষ্ট আছে—এটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। আমাদের খেজুরী থানায় প্রাচীন যে গোরস্থান বা সাহেবদের সমাধিক্ষেত্রটি আছে, সেটি পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অধীন খেজুরী থানা একসময় ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। বঙ্গোপসাগরের মধ্য থেকে উদ্ভূত, নতুন নতুন পলিবেষ্টিত চর থেকে এই স্থানের উদ্ভব সম্ভবত ষোড়শ শতকের গোড়ায়। তখন থেকে ভৌগোলিক কারণে এসব অঞ্চল, মালঝিটা অঞ্চল হিসেবে পরিচিত হতে শুরু করে। ডি. ব্যারোজ (১৫৫৩), ভ্যালেন্টীন (১৬৬০) প্রমুখের মানচিত্রে খেজুরী ও হিজলীকে দুটি দ্বীপের মতো দেখা যায়। মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কাউখালি নদী। পরবর্তীকালে দুটি একটিতে পরিণত হয়ে যায় আর মাঝের নদীটির বিলুপ্তি ঘটে। বর্তমানে এই দুটি মিলে খেজুরী থানা। যাই হোক, সেই দূর অতীতে নতুন গড়ে ওঠা দ্বীপের হিজলীতে ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে রাজত্ব করেন তাজ খাঁ মসনদ্-ই-আলা নামে এক মুসলমান রাজা। তাঁর ও উত্তরাধিকারীদের রাজত্বের শেষ দিকে, ১৬৬১ খিস্টাব্দ নাগাদ এই দ্বীপ অঞ্চলে পর্তুগিজ ও মগ দস্যুদের অত্যাচার প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে অঞ্চলটি জনশূন্য ও জঙ্গলময় হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতকের কোনো একসময়ে হুগলি নদীর মোহনা সংলগ্ন অঞ্চলে নদীর স্রোতপথ পরিবর্তিত হয় এবং খেজুরী একটি পোতাশ্রয় হয়ে ওঠে। হুগলি মোহনার পথ ধরে ভাগীরথী দিয়ে বড় বড় জাহাজ কলকাতা পর্যন্ত যেতে পারত না। এসব জাহাজ খেজুরী পোতাশ্রয় ও বন্দরে থাকত। এখান থেকে ছোট ছোট জাহাজে মালপত্র ও আরোহী কলকাতা যাওয়া-আসা করত। ফলে অল্প সময়ে খেজুরীতে পোর্ট অফিস, জাহাজের যাত্রীদের বিশ্রামকক্ষ, এজেন্টদের ঘর, ভারতবর্ষের প্রথম ডাকঘর প্রভৃতি তৈরি হয়। গড়ে ওঠে হোটেল, রেস্তোরাঁ প্রভৃতি। ফলত জায়গাটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

এছাড়া এখানকার পরিবেশও ছিল অত্যন্ত মনোরম। এই বন্দরের পূর্ব দিক দিয়ে বয়ে চলেছে হুগলি নদী, দক্ষিণে হিজলী নগরীর অস্তমিত গৌরবের কিছুটা পরিচয়, নানারকম গাছ-গাছালির বনানী, বিস্তৃত তটভূমিতে ঘুরে বেড়ানোর পরিবেশ। তাই অল্প সময়েই ইংরেজদের কাছে জায়গাটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মর্যাদা পায়।

এই রকম একটি জায়গায় বহু ইংরেজ—প্রধানত ব্যবসার কাজে যারা এসেছিল, তাদের মধ্যে অনেকেরই নানা কারণে মৃত্যু হত। তাই এইসব সাহেবদের গোর বা কবর দেবার জন্য এখানে গড়ে ওঠে একটি নির্দিষ্ট জায়গা, যা সাহেবদের গোরস্থান নামে পরিচিত। প্রাচীন এই য়ুরোপীয় সমাধিক্ষেত্রটি বিষয়ে প্রায় সব ঐতিহাসিক অবহিত। তবে খেজুরীর ইতিহাসকার মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয় তাঁর 'হিজলীর মসনদ-ই-আলা' গ্রন্থে লিখে গেছেন (১৯২৬)—প্রাচীর বেষ্টিত খেজুরীর য়ুরোপীয় সমাধি ক্ষেত্রটি এখনও গবর্নমেন্ট সুসংস্কৃত অবস্থায় রক্ষা করিতেছেন। সমাধিক্ষেত্রে মোট তেত্রিশটি সমাধি আছে, তন্মধ্যে একুশটি ক্ষোদিত লিপিযুক্ত। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন লিপিটির সময় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ। এই সমাধিটি একটি নাবিকের। লিপিফলকটি এক্ষণে পাওয়া যায় না।—সমাধিগুলির অধিকাংশই নৌ ও সৈন্য বিভাগীয় কর্মচারীদের। লিপিযুক্ত সমাধিগুলির বিবরণ নিম্নরূপ :

১. নীল ম্যাক্‌ইনেস—ডুনিরা জাহাজের মিড্‌শিপ্‌ম্যান, মৃত্যু : ১০ই সেপ্টেম্বর ১৮১৮।

২. কুমারী সারল্‌টি অ্যানি—মিড্‌লসেক্সবাসী রেভারেন্ড টমাস ব্র্যাকেনের কন্যা, মৃত্যু : ১২ই নভেম্বর ১৮২০।.

৩. হোরাশিও নেলসন ড্যালাস—লেডি মেলভিল জাহাজের পঞ্চম অফিসার, মৃত্যু : ২৮শে জুলাই ১৮২০।

৪. এমোলিয়া—দিনাজপুরের তদানীন্তন জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট এড্‌ওয়ার্ড ম্যাকস্‌ওয়েলের পত্নী, মৃত্যু : ২৬শে জুলাই ১৮২২। বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন,—এমোলিয়া অসুস্থ হয়ে স্বামীর সঙ্গে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য এখানে এসে ২৮ বছর ২ মাস বয়সে মারা যায়। দুঃখ করে তার স্বামী স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে লিখেছিলেন—

"The sanguine hope of a husband who adored her
That the dred calamity
Would be averted by the effect of the sea-air
Proved vain immediately on the return of the ship
Owing to the loss of her rudder after an escape from danger
When sorrow weeps over Virtue's Sacred Dust
Our tears become us and our grief is just.
Such are the tears he shed who grateful pays
This last sad tribute of his love and Praise."

৫. চার্লস্ রাসেল ক্রোম্‌লীন—ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী, মৃত্যু : ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৮২২।

৬. রবার্ট আলেকজান্ডার বেন্টলী, কলকাতাবাসী, মৃত্যু : ২২ নভেম্বর ১৮২৫।

৭. সারা—হেন্‌রী অস্‌বর্নের পত্নী, মৃত্যু : ৩রা জানুয়ারি ১৮২৫।

৮. ডব্‌লিউ এ, চামার—ভাগলপুরের জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট, মৃত্যু : ১৬ই জানুয়ারি ১৮২৬।

৯. ক্যাপটেন জেমস্‌ রীড—বেঙ্গল নেটিভ ইন্‌ফ্যান্ট্রী—১ম রেজিমেন্ট, মৃত্যু : ২৩শে নভেম্বর ১৮২৬।

১০. ডব্‌লিউ এইচ্‌, ব্রেট—কোম্পানির বঙ্গদেশীয় নৌবিভাগের মেট—মৃত্যু : ১৩ই আগস্ট ১৮২৬।

১১. জোস্‌ কাটিস্‌ স্টেপলটন—নৌ বিভাগের ব্রাঞ্চ পাইলট, মৃত্যু : ১৪ই আগস্ট ১৯২৬।

১২. জর্জ, ফবস্‌, এমডি—অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন, মৃত্যু : ২৩ অক্টোবর ১৮৩৭।

১৩. ক্যাপটেন উইলিয়াম্‌পীট—'ফর্বস' স্টিমারের অধ্যক্ষ, মৃত্যু : ১৭ই জুন ১৮৩৭।

১৪. রবার্ট পীচার—'ভ্যান্সিটার্ট' জাহাজের প্রথম অফিসার, মৃত্যু : ১৯শে আগস্ট ১৮৩৭।

১৫. জে.এচ্‌, বার্লো—সিভিল সার্ভিস, মৃত্যু : ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৪১।

১৬ ক্যাপটেন্‌ জেমস্‌ ম্যাসন্‌—আমেবিকান জাহাজ 'কোরিঙ্গা', মৃত্যু : ১৯শে মে ১৮৫৩।

১৭. চার্লস্‌ উইলিয়াম্‌সন্‌—ম্যাঞ্চেসটারের জজ উইলিয়াম্‌সনের পুত্র, মৃত্যু : ১লা ডিসেম্বর ১৮৫৪।

১৮. মাইকেল হোগ্যান্‌—এ.বি. টমসন নামক আমেরিকান জাহাজের মাস্টার, মৃত্যু : ৫ই জুলাই ১৮৫৫।

১৯. চার্লস লিটন, পাইলট—'স্যালাউইন' জাহাজ, মৃত্যু : ২৫ নভেম্বর ১৮৫৮।

২০. জে. বোটেল্‌হো, পত্নী মেরী ও পুত্র ইউজিন, মৃত্যু : ৫ই অক্টোবর ১৮৬৪।

২১. এমোস্‌ ওয়েস্ট, সুপারভাইজার পূর্ত বিভাগ, মৃত্যু : ১০ই অক্টোবর ১৮৬৫।

এই লিপিগুলি উল্লেখ করে মহেন্দ্রনাথ করণ লিখেছেন, "কতকগুলি সমাধিলিপি এতই মর্মস্পর্শী যে, পাঠ করিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। নির্জন প্রকৃতির মুক্তাকাশের চন্দ্রাতপ-নিম্নে সুষুপ্ত আত্মাগুলি অনাবিল শান্তির ক্রোড়ে শায়িত। ভাগীরথী মধুর কলসংগীতে এই মহানিদ্রায় সুধা বর্ষণ করে! সাগর-স্নাত চঞ্চল-সমীরণ বনা-কুসুমের সুবাস লইয়া সমাধিগুলি সুস্নিগ্ধ করিয়া তোলে।"

মেদিনীপুরের ইতিহাসকার যোগেশচন্দ্র বসু এই সমাধির কথায় লিখেছেন, "প্রকৃতি দেবীর স্নেহময় কোলে খেজুরীর নীরব সমাধিক্ষেত্রটি হৃদয়ে শান্তিরভাব আনয়ন করে। গম্ভীর নির্জনতা এখানে দেদীপ্যমান। জনকোলাহল এখানে নীরব। পাছে মৃত ব্যক্তিদিগের শান্তির নিদ্রা ভঙ্গ হয়, সেজন্য জড় প্রকৃতিও যেন ভীত ও চকিত।"

খেজুরীতে ইংরাজদের এই বাণিজ্য বিষয়ক কাজ কর্মের কারণে এখানে স্থাপিত হয় ভারতবর্ষে প্রথম ডাকঘর। এখান থেকেই প্রথম টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। রামমোহন রায় ২০শে

নভেম্বর ১৮৩০ আলবিয়ান নামক জাহাজে এই খেজুরী বন্দর থেকে বিলাতযাত্রা করেন। ১৮৪০ সালে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরও খেজুরী বন্দর হতে পালতোলা জাহাজে বিলাত যাত্রা করেছিলেন। বোঝা যায়, খেজুরী বন্দর তখন ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু সমুদ্রের মুখে বন্দরটি গড়ে ওঠায় প্রায়ই ঝড়-ঝাপটায় বন্দরের ক্ষতি হচ্ছিল। এখানকার সামুদ্রিক লোনা হাওয়া ও অসহ্য গরম ইংরেজদের সহ্য হচ্ছিল না। এর উপর ছিল বেশ কয়েকবার সামুদ্রিক বন্যা। ১৮০৭-এর মার্চে ভীষণ ঝটিকা, ১৮২৩-এর মে মাসে প্রবল ঝড়, আর শেষে ১৮৬৪ সালের ভয়ংকর ঝটিকায় খেজুরী বন্দর সম্পূর্ণ ধ্বংস হলে এখান থেকে ইংরাজ ব্যবসায়ীদের ব্যবসার আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। খেজুরীও জনশূন্য নির্জন স্থানে পরিণত হয়। ধীরে ধীরে আবার কীভাবে জনবসতি গড়ে ওঠে, কীভাবে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে খেজুরী ইংরাজ অধিকার মুক্ত হয়ে তিন দিন ছিল—সে অন্য ইতিহাস।

বর্তমানে খেজুরীর য়ুরোপীয় কবরস্থানটি যথারীতি অতীতের স্মৃতি নিয়ে ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। এর বর্তমান জে.এল.নং ৪৯, মৌজা-খেজুরী, দাগ নং ৩০৪৭, পরিমাণ ৩৯ ডেঃ। বর্তমানে এখানে দুটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে। একটি সুদৃশ্য, অন্যটি প্রায় ভঙ্গুর—গির্জাকৃতি, গায়ে অশ্বত্থের তীব্র কামড়। কোনো ফলক নেই। এখানকার প্রায় বেশিরভাগ ফলক বিভিন্ন লোকে খুলে নিয়ে ঘাটের শান করেছে। এখনো একটি আছে কবরটির পূর্ব দিকে ইরিগেশন বাংলোর নীচে। এটি মাটিতে পড়ে আছে। তাতে ইংরাজিতে লেখা ROBERT PITCHER, OFFICER OF THE VANSITTART, Died on AUG. 19th 1837. আরও বেশ কয়েকটি কবরের উপর ভঙ্গুর ইট ও চুন-সুরকির গাঁথুনির অবশেষ বিদ্যমান। কবরস্থানের চারদিক বহু দিন আগেকার দেওয়াল ঘেরা। ভেতরটা জংলা গাছ-আগাছায় ভরা। এর ভেতর ৩টি বড় খেজুর গাছ ও যুবা বয়সি তিনটি দেবদারু গাছ বিরাজ করছে। বর্তমানে এই প্রাচীর ঘেরা কবরস্থানের চারপাশে, অনেকটা জায়গা জুড়ে উঁচু দেওয়াল করে ইট গেঁথে ঘিরে দেওয়া হয়েছে।—এই কবরস্থানটি প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মারক হিসাবে সংস্কৃতি অনুরাগী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্তমানে খেজুরীর শেষ বাসস্টপ ও গ্যারাজ থেকে প্রায় পাঁচ মিনিট পূর্ব দিকে হেঁটে গেলে কলকাতা বন্দর সংস্থার বেড়া ঘেরা বিশাল জায়গা। তারপরই এই কবর স্থান। এর লাগোয়া ইরিগেশন বাংলোর ঘরবাড়ি। এর দক্ষিণদিকে বনদপ্তরের অফিস ও গাছগাছালি ঘেরা বিশাল অরণ্যভূমি। এই দপ্তরের ভিতরেই আছে ভারতের প্রথম ডাকঘরের ভগ্ন কক্ষ ও পাশে সাহেবদের হাওয়াখানা। আর আছে পর্তুগিজদের আনা একটি তিনশো বছরের পুরাতন বাওয়াব গাছ। আফ্রিকার মাটিতে জন্মানো এ গাছটি বর্তমানে রোগজীর্ণ হয়েও তার কাণ্ডের কারণে দর্শকদের বিস্ময় জাগিয়ে চলেছে। সমান বিস্ময় জাগায় পাশের একটি প্রাচীন মোটা কাণ্ডের লিচু গাছ। ভ্রমণকেন্দ্র হিসাবে খেজুরীকে নিয়ে যে উৎসাহ জাগছে, তাতে এই ঐতিহাসিক স্মারকগুলি বিশেষ মর্যাদা নিয়ে দর্শকদের অবশ্যই আকৃষ্ট করবে।

□ লেখক পরিচিতি—প্রাবন্ধিক, আলোচক, প্রধান শিক্ষক।

শ্মশান পরিচিতি : গ্রাম বড়হাট

প্রদ্যোতকুমার মাইতি

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা মহকুমার (অতীতের কাঁথি মহকুমা) অন্তর্গত পটাশপুর থানার বড়হাটি একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এ গ্রামে যাতায়াতের জন্য মেচেদা রেলস্টেশন থেকে মেচেদা - মঙ্গলামাড়ো। হাওড়া-পানিপারুল (ভায়া মেচেদা) অথবা খড়্গাপুর রেলস্টেশন থেকে বাসযোগে এগরা হয়ে মঙ্গলামাড়ো স্টপেজে নেমে ভ্যানে তিন কিলোমিটার মোরাম রাস্তা ধরে গ্রামে পৌঁছান যায়। গ্রামে একটি প্রাথমিক ও একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এই গ্রামেই আমার জন্ম এবং গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (১৯৪২-৪৫ খ্রি.) আমি পড়াশোনা করি। গ্রামটি মাহিষ্য প্রধান হলেও ব্রাহ্মণ, তন্তুবায়, নাপিত, ছুতার মিস্ত্রি, হরিজন ও ১টি আদিবাসী পরিবার-এর লোকজন বাস করেন। গত ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে গ্রামের লোকসংখ্যা ছিল ৩০৭১ জন। বর্তমানে এই সংখ্যা সামান্য বেড়েছে। চাষ-আবাদ ও ব্যবসা অধিকাংশ মানুষ জীবিকা হিসেবে পালন করে চলেছেন। চাকুরিজীবি খুব কম। পটাশপুর থানার ১নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ৯নং বড়হাট গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতিব অন্তর্ভুক্ত হল আমাদের গ্রাম। গ্রামের পূর্ব ও পশ্চিমদিকে প্রশস্ত মাঠ এবং দক্ষিণদিকে খাল। উত্তরদিকের গ্রাম হল এক্তারপুর। পাশাপাশি গ্রামগুলির তুলনায় আমাদের গ্রামটি আয়তনে ও জনসংখ্যার দিক থেকে বেশি।

বড়হাট গ্রামে নির্দিষ্ট চারটি শ্মশানক্ষেত্র রয়েছে। এছাড়াও কোনো কোনো পরিবার তাঁদের নিজস্ব জায়গায় পরিবারের লোকজনকে দাহ করে থাকেন।

১. পুকুরপাড়ের শ্মশান :

গ্রামের দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিত শ্মশানটি 'পুকুরপাড়ের শ্মশান' (লোকমুখে 'পুকুরপুরের শ্মশান' নামে উচ্চারিত হয়ে চলে আসছে) নামে পরিচিত। পটাশপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ৯নং বড়হাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত এই শ্মশান। এটি সরকারি নথিভুক্ত শ্মশান। মৌজা বড়হাট, জে.এল নং ২০১, খতিয়ান-১, দাগ নং ১৪১৭/২১৯৫; জায়গার পরিমাণ ৫৫ ডেসিম্যাল। এই শ্মশানভুক্ত এলাকার কিছু অংশে বর্তমান বনসৃজন প্রকল্প রয়েছে। এখানে একটি বড় পুকুর রয়েছে। তার পাড়েই শ্মশান থাকায় এটি 'পুকুরপাড়ের' বা 'পুকুরপুরের' শ্মশান নামে পরিচিত।

২. তিরিপুকুরের শ্মশান :

গ্রামের উত্তরপার্শ্বে তিরিপুকুরের পাড়ে এই শ্মশানের অবস্থিতি হওয়ায় এটি তিরিপুকুরের শ্মশান নামে পরিচিত। পটাশপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ৯নং বড়হাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত এই শ্মশান। এটিও সরকারি নথিভুক্ত শ্মশান মৌজা বড়হাটি, জে.এল নং-২০১, খতিয়ান-১, দাগ নং ৪২৮, জায়গার পরিমাণ ১ একর .০৯ ডেসিম্যাল।

উপরোক্ত দুটি শ্মশানের মালিক পশ্চিমবঙ্গ সরকার অর্থাৎ এই শ্মশান রূপে চিহ্নিত জমি খাস।

৩. বিদ্যালয় সংলগ্ন শ্মশান :

গ্রামের উত্তর-পশ্চিম কোণে মোরাম রাস্তার পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ২০০ গজ দূরে পুকুরের উত্তরপাড়ে একটি শ্মশান রয়েছে। আমাদের ছেলেবেলা থেকে অর্থাৎ ১৯৩৭ সাল থেকে এখানে নিয়মিত দাহ হতে দেখেছি এবং এখনও হয়ে থাকে। তবে এটি রেকর্ডভুক্ত শ্মশান নয়। যেহেতু ওই স্থানের কাছাকাছি গ্রামবাসীরা ওখানে দাহ করে আসছে তাই এটি শ্মশানে পরিণত হয়েছে। সরকারি রেকর্ডে এটি পুকুরপাড় রূপে চিহ্নিত।

গ্রামের উপরোক্ত তিনটি শ্মশানে এলাকা ভিত্তিক গ্রামবাসীরা প্রথাগতভাবে মরদেহ দাহ করে আসছেন। গ্রামের ব্রাহ্মণরা এইসব শ্মশান ব্যবহার করেন না। এইসব শ্মশানে গ্রামের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ দাহ করেন। সম্প্রদায় ভিত্তিক কোনো এলাকা চিহ্নিত নেই। যে-কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ শ্মশানভুক্ত যে-কোনো জায়গায় দাহ করার অধিকারী।

৪. ব্রাহ্মণদের নির্দিষ্ট শ্মশান :

কেবল গ্রামের ব্রাহ্মণদের মরদেহ দাহ করার জন্য একটি রেকর্ডভুক্ত রায়ত শ্মশান বামুনপাড়ায় ('দোবে' পদবিধারী বামুনপাড়ায়, এটি গ্রামের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত) রয়েছি। মৌজা—বড়হাট, জে.এল নং ২০১, দাগ নং ১০৬৮, পরিমান ১৭ ডেসিম্যাল। রায়ত মোহন দোবে। পটাশপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ৯নং বড়হাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত এই শ্মশান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই গ্রামের 'উষ্ণালিনী' পদবিধারী ব্রাহ্মণ দেবনারায়ণবাবু (পেশায় শিক্ষক, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) তাঁর বাবা-মার মরদেহ রাস্তার পাশে নিজেদের জায়গাতে দাহ করেছেন। এই ব্রাহ্মণ পরিবারের বসবাস 'দোবে' পদবিধারী ব্রাহ্মণপাড়া থেকে কিছুটা দূরে।

অনুসন্ধানে জানা যায় এইসব শ্মশানগুলি স্মরণাতীতকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ১৯১২-১৩ সালে সেটেলমেন্টের সময় তিনটি শ্মশান সরকার কর্তৃক রেকর্ডভুক্ত হয়। যাহোক্ গ্রামের এইসব নির্দিষ্ট শ্মশান থাকলেও আজকাল বেশ কিছু পরিবারের লোকেরা নিজেদের ব্যক্তিগত জায়গায় পরিবারের লোকজনের মরদেহ দাহ করার ব্যবস্থা করে থাকেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

আমার ভাই প্রদীপকুমার মাইতি, বি.এ. অনার্স আমায় তথ্য সংগ্রহ করে সাহায্য করায় আমাদের গ্রামের শ্মশান সম্পর্কে এই প্রবন্ধ রচনা সম্ভব হল।

□ লেখক পরিচিতি—তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ইতিহাসের অধ্যাপক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও পিএইচডি গবেষণা পর্যবেক্ষক।

মেদিনীপুরের কয়েকটি সমাধিক্ষেত্র প্রসঙ্গে

রাজর্ষি মহাপাত্র

ইতিহাস প্রসিদ্ধ বন্দর-নগরী তাম্রলিপ্তের অনেক কিছুই আমাদের কাছে রহস্যাবৃত। সেই তাম্রলিপ্তের লোকাচার অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তার মধ্যে একটি হল মৃতাশৌচ প্রথা। মানুষ মারা গেলে, দাহ হয়ে গেলে, মারা যাওয়ার চতুর্থ দিনে শ্মশানে গিয়ে পরিবারের লোকজনরা সেই চিতার ছাই দিয়ে কাদা তৈরি করে একটি মানুষের অবয়ব তৈরি করে এবং সেই মূর্তি বা অবয়বকে শুইয়ে দিয়ে তার পাশে মৃতের ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র রেখে দেওয়া হয় যাতে করে মৃত আত্মা সেই জিনিসগুলি ব্যবহার করতে পারে। তার পাশে চারধারে বাঁশ বা খুঁটি পুঁতে দেওয়া হয় বড়ো সাদা চাঁদোয়া বা কাপড়। পরে রান্না করে ওই অবয়বের পাশে রান্না করা খাবারগুলি রাখা হয়। শ্রাদ্ধের দিন বাঁশ বা শোলার বড় 'ফুলঘর' তৈরি করে ওই অবয়বে বা মূর্তির উপর রাখা হয়। একসময় তাম্রলিপ্তে মাহিষ্য সম্প্রদায়সহ অন্যান্য জাতের মধ্যেও এই প্রথা দেখা যেত।

শ্মশানে মৃতের ছাই দিয়ে মূর্তি বা অবয়ব তৈরি বা চাঁদোয়া টাঙানোর এই যে বিচিত্র প্রথার পিছনে যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। খ্রিস্টের জন্মের অনেক আগে তাম্রলিপ্ত বন্দর-নগরের সঙ্গে মিশরের গভীর সম্পর্ক ছিল। নিঃসন্দেহে সে দেশের কিছু লোক চলে এলে পর মমি ও পিরামিডের ধারণা তাদের সঙ্গে এসেছিল। অবশ্য মিশরের ভৌগোলিক আবহাওয়ায় মমি তৈরি সহজ ছিল কিন্তু এখানে ভিজে মাটি ও স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় তা সম্ভব নয়। শ্রাদ্ধের দিন কলার মান্দাসে যে ফুলঘর তৈরি করে ভাসিয়ে দেওয়া হয় তা মিশরের ফারাওদের প্রচলিত funeral boat বা শবের নৌ-যাত্রাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

মৃত্যুদিন থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত এই লোকাচার খুব ভালোভাবে লক্ষ করলে মিশরীয় একটি ক্ষীণ স্মৃতি মনে আসে। এছাড়া তাম্রলিপ্ত অঞ্চলে মৃতের আত্মা একটি নতুন দাঁড়কাকে রূপান্তরিত হয় এই ধারণা বিদ্যমান। মনে হয় প্রাচীন মিশরীয় রক্ত খুব কম হলেও আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে তাম্রলিপ্তের জনগোষ্ঠীর মধ্যে মিশ্রিত হয়ে গেছে।

বর্তমান তমলুকে দখিলা পাড়ার রোডের উত্তরে পায়রাটুংগী খালের ধারে মৃতদেহ সৎকারের সিদ্ধান্ত হয়। এই সিদ্ধান্ত তমলুক পৌরসভার মিটিং-এ ২৫.০৫.১৮৮৩তে গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তের কারণ এই স্থান পাশাপাশি গ্রামের মধ্যস্থানে অবস্থিত এবং আগেও এ স্থানে মৃতদেহ দাহ করা হত। নদীর ধারে শ্মশানের জন্য আরও উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভাইস্ চেয়ারম্যান বাবু উমাচরণ মিত্র ও বাবু হারাধন নাগকে নিয়ে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

আবার ২৫.০৬.১৯১৫তে জনৈকা মিস্ ব্লেয়ার পৌরসভার চেয়ারম্যানের কাছে খ্রিস্টানদের কবরস্থানের জন্যও তৎসংলগ্ন বাগান করার জন্য ৫ কাঠা জমি লিজ নেওয়ার জন্য আবেদন করেন। পুরকমিশনারগণ ৫ কাঠা জমি লিজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেই সঙ্গে আরও সিদ্ধান্ত

নেন যে এই কবরস্থান সমস্ত খ্রিস্টানরাই ব্যবহার করবেন এবং পৌরসভাকে নিয়মিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বাবদ ফি দিতে হবে।

মেদিনীপুর জেলাতে ইংরেজদের প্রভুত্ব বেশ কিছুদিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বেশিরভাগেরই জানা। সে সময়কালে উড়িষ্যা যেতে হলে তমলুক দিয়েই যেতে হোত। প্রথমে কোম্পানি যখন সাঁওতাল যুদ্ধ ও উড়িষ্যা জয়ের জন্য অভিযান চালান, তখন লালদিঘির বিস্তৃত পাড়ে (তমলুক) ছাউনি ফেলে বিশ্রাম করত ২/১ দিন। তারপর স্থলপথে মেদিনীপুর হয়ে গমন করত উড়িষ্যার দিকে। ১৭৯৩ সালে এমনি একটি সৈন্যদল এসে হাজির হল তমলুকে। এই প্রথম ভলান্টিয়ার সৈন্যদলের লেফ্‌টেনান্ট ছিলেন আলেকজান্ডার ও হারা (Lieutenant Alexander O'Hara of the 5th Battalion)। তমলুকে তিনি সৈন্যদলসহ বিশ্রাম কবছিলেন দু'একদিন। সহসা সামান্য রোগাক্রান্ত হয়ে ৬ অক্টোবব তিনি তমলুকেই মারা যান। এই লেফ্‌টেনান্ট সাহেবকে তমলুক রাজাদের 'ঘাটপুকুরে'ব পূর্বপাড়ে সমাহিত করা হয়। এই সমাধিস্মৃতি এখনও দেখা যায।

ক্ষীরপাই শহরের নিকটবর্তী কাশীগঞ্জ নামে গ্রামেও কোম্পানিব একটি সুবৃহৎ কুঠি ছিল। এব অনতিদূরে বেড়াবেড়া নামে পল্লিতে সাহেবদের ৬টি সমাধি-স্তম্ভ আছে। সমাধিস্তম্ভগুলির এখন ধ্বংসাবস্থা এবং এদের গাত্র-সংলগ্ন খোদিত লিপিগুলিও সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে। সেজন্য ওইগুলি যে কাদের সমাধি বা কতদিনেব পুবাতন তা সঠিক জানবার উপায় নেই। তবে বৃদ্ধ গ্রামবাসীরা কেউ কেউ তাদের পাবিবারিক কোনো শুভকার্য উপলক্ষে বা কোন বিশেষ পর্বদিনে তাঁদের পিতৃ-পিতামহের সুখ-দুঃখের সাথী পরলোকগত সেইসব বিদেশীয় বন্ধুগণের পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করতেন এক একটি ছোট প্রদীপে তেল ভর্তি করে সেই জবাজীর্ণ সমাধিগুলির সামনে জ্বালিয়ে দিয়ে আসতেন।

মেদিনীপুর শহরের কোরানিটোলা পল্লিতে রোমান ক্যাথলিকদের ও চার্চ অব্ ইংলন্ড মিশন সম্প্রদায়েব খ্রিস্টানদের একটি গীর্জা আছে। এ ছাড়া শহরের উত্তরাংশে আবাসগড়ের কাছে আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন সম্প্রদায়েরও একটি গীর্জা আছে। এই তিনটি গীর্জার কাছেই তিনটি সমাধিক্ষেত্র আছে। এছাড়া কর্ণেলগোলা পল্লির পুরাতন জেল নামে প্রাচীন দুর্গটির দক্ষিণদিকে এর গায়েই প্রাচীরের মধ্যে আরও একটি সমাধিক্ষেত্র আছে। সেখানে আরও অনেকগুলি সমাধি দেখা যায়। এর মধ্যে কয়েকটি শতাধিক বছরের প্রাচীন। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ইংরেজ রাজত্বের সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কোম্পানির কাজে যাঁরা দূরদেশে স্বজন বিরহ অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন, এরূপ কয়েকজন ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ ও সিভিল কর্মচারীর সমাধিও এর মধ্যে আছে।

মেদিনীপুর জজ-আদালতের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব কালেক্টর জন পিয়ার্স সাহেবের সমাধি আছে। সমাধি-স্তম্ভের খোদিত লিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি তেইশ বছর কোম্পানির কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে শেষ বারো বছর মেদিনীপুরের কালেক্টরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। মেদিনীপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়টি তাঁর সময়েই স্থাপিত

হয়েছিল। তাঁরই স্মৃতিরক্ষাকল্পে উহা 'পিয়ার্স হস্পিট্যাল' নামে পরিচিত। পিয়ার্স সাহেবের সমাধি-স্তম্ভে ইংরেজি ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতে লিখিত দুখানি প্রস্তর-ফলক আছে। বাংলা ভাষায় যা লেখা আছে তা অবিকল নীচে দেওয়া হল :

"শ্রীরাম
মেস্ত্র জন পিয়ার্স সাহেব
জিলা মেদনিপুর বারো
বৎসর কেলট্রাব কাজ করিয়া
সন ১৭৮৮ ইংরেজি ২০ই মে
সন ১১৯৫ বাঙ্গালা ১১ জৈষ্ঠী
কাল হইয়াছে - তাহাব কববে
এই কির্ত্তি করিয়া দেয়া গেল।"

'সমাধি-স্তম্ভের এই লিপি থেকে শতাধিক বছর পূর্বের বাংলাভাষার যে ধরনের নমুনা পাওয়া যায়, সেই বাংলাভাষা ও বাঙালিদের প্রতি তৎকালীন রাজকর্মচারীদেব যে বিশেষ অনুরাগ ছিল, তাব পরিচয়ও পাওয়া যায়। ইংরেজেব সমাধি-স্তম্ভে বাংলাভাষায় লিখিত প্রস্তরফলক খুব একটা দেখা যায় না।

মেদিনীপুব শহরের 'পদ্মাবতী ঘাট' নামে শ্মশানটি বঙ্গ-গৌরব ড. স্যার রাসবিহারী ঘোষের কীর্তি। জননী পদ্মাবতীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে তিনি এই শ্মশানটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। পদ্মাবতী এই শহরে তাঁর বাবার বাড়িতে মারা গিয়েছিলেন।

খাজুরী বা খেজুরীর সমাধি-ক্ষেত্রটি পোর্ট অফিসটির পেছনে এবং ডাকবাংলোটির সামনে প্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত। এর মধ্যে সাহেবদের তেত্রিশটি সমাধি আছে। তার মধ্যে বাইশটিতে খোদিত লিপি আছে, এগারোটিতে কিছু লেখা নেই। শেষোক্ত সমাধিগুলির অবস্থা দেখলে ওই গুলিকেই প্রাচীনতর বলে মনে হয়। খাজুরীর সেই রমরমা দিনগুলোতে যেসব ইংরেজ কোম্পানির কাজে বা ব্যবসার জন্য অথবা স্বাস্থ্যের কারণে এই দূরদেশে স্বজন বিরহ অবস্থায় বাস করতেন, তাঁদের কয়েকজন এই স্থানে দেহত্যাগ করে যান। সেইসময় দু-একজন বন্ধু ছাড়া আর কেউ তাঁদের পাশে থাকেননি। স্বদেশে আত্মীয়গণ বহুদিন পরে তাঁদেব মৃত্যুসংবাদ পেতেন।

খাজুরীর সমাধি-ক্ষেত্রে লিপি ফলকযুক্ত যে সমাধিগুলি আছে তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে প্রাচীন তার তারিখ ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ এবং শেষ সমাধিটির তারিখ ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ। এরপর আর কোনো দেহ সেখানে সমাহিত করা হয়নি। এই সমাধিক্ষেত্রে ভাগলপুরের জজ-ম্যাজিস্ট্রেট চামার সাহেবের, সিভিলিয়ান বালো সাহেবের এবং ডাক্তার জর্জ ফরবেস্ সাহেবের সমাধি আছে। একটি সমাধিতে খাজুরীর তৎকালীন পোর্ট ও পোস্টমাস্টার এবং অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট জে. বটেল্হো সাহেব তাঁর পত্নী মেরী এবং একমাত্র পুত্র ইউজিন একসাথে সমাহিত হয়েছিলেন। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের জলপ্লাবনে তাঁরা তিনজনেই একসঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হন। শেষ সমাধিটি

পূর্তবিভাগের সুপারভাইজার এমোস ওয়েস্ট সাহেবের।

ওইখানে সারলটী অ্যানি নামে একটি বালিকার সমাধি আছে। বালিকাটি মিড্‌লসেক্সের রেভারেন্ড টমাস এ্যাকেনের একমাত্র কন্যা। তাঁর দুই ভাই ভারতবর্ষে কর্মোপলক্ষে বাস করতেন। দুইভাই তাঁদের প্রিয় ভগিনীর স্মৃতিস্তম্ভে করুণ ভাষায় তাঁদের দুর্ভাগ্যের কথা লিখে নিয়েছেন। আর একটি স্বামীহারা নারী তাঁর একমাত্র পুত্রকে নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করবার জন্য খেজুরীতে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু সে সাধে বাধা দিয়েছিলেন ওইখানে একটি সমাধি-স্তম্ভের স্মৃতিলিপি পাঠ করলে মনে হয়, জননী বুকের রক্ত দিয়ে সেই কাহিনি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। দিনাজপুরের ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট এড্‌ওয়ার্ড ম্যাক্সওয়েল সাহেব তাঁর পত্নীর সমাধিগাত্রে যে কবিতাটি লিখেছেন তার ভাষাও মর্মস্পর্শী।

তমলুকের রাজবংশে একটা সময় দেখা দেয় নানা অশান্তি (১৭৫৭-১৭৬৭)। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে নবাব মস্‌নদী মহম্মদ খাঁর প্রিয় বন্ধু খোজা মির্জা দিদার আলি বেগ তমুলক জমিদারি গ্রহণ করেন। মোট দশ বছর তিনি রাজত্ব করেন। ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পর তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় তমলুক রাজবাড়ির দেউড়ির পশ্চিমদিকে। কোনো কোনো মুসলমান পর্বোপলক্ষে মুসলমানগণ আজও এই আলি সাহেবের সমাধিতে এসে তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ জ্ঞাপন করেন। শোনা যায় আলি সাহেবের বংশধরগণ খড়্গপুরে অবস্থান করছেন।

সবশেষে কাজ শেষ করে অতি আপনজনেরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সমাধির গায়ে যে দু-চারটি কথা লিখে রেখে যান, তা পাঠ করলে চোখ জলে ভরে আসে, মনের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। স্মারকলিপিতে মৃতব্যক্তির আত্মীয়গণের কত গভীর প্রীতি ও স্নেহ প্রকাশ পেতে থাকে।

তথ্যসূত্র :

১. আর্যরহস্য, সুহৃদকুমার ভৌমিক, মেচেদা, ১৯৯০।
২. যোগেশচন্দ্র বসু, মেদিনীপুরের ইতিহাস, কলকাতা, ১৩৪৬।
৩. প্রণব বাহুবলীন্দ্র ও আশুতোষ দাস সম্পাদিত, তমলুক পৌরসভা তথ্যপঞ্জি ২০০০, তমুলক ২০০০।
৪. যুধিষ্ঠির জানা (মালীবুড়ো), বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস, কলকাতা, ১৩৭১।
৫. রাজর্ষি মহাপাত্র, তাম্রলিপ্তের লোকাচার (প্রবন্ধ), কালিপদ পাল ও কৃতিসুন্দর পাল সম্পাদিত 'গ্রামের ডাক' পত্রিকা (সংবাদ সাপ্তাহিক), ৯ ও ১৬ এপ্রিল ২০০২, তমলুক।

☐ লেখক পরিচিতি—গবেষক, প্রাবন্ধিক, শিক্ষক।

মুর্শিদাবাদ ও জিয়াগঞ্জের শ্মশানঘাট কিছু তথ্য ও ফিরে দেখা

প্রভাস সামন্ত

যে কোনো জীবের ক্ষেত্রে মৃত্যু এক স্বাভাবিক অথচ অমোঘ ঘটনা। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই মানুষের বাস্তব জীবনের সমাপ্তি সূচিত হয়। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিগ্রাহ্য এক চৈতন্যের অধীন বলে কায়িক জীবনের সমাপ্তিরেখার পরও সে নিজেকে চিরতরে লুপ্ত হতে দেয় না। সমগ্র জীবনব্যাপী আপন কর্মজাত ফসলের বীজ সে যেমন সমাজসংসারে ছড়িয়ে দিতে চায়, তেমনি আপন আত্মার অবিনশ্বরতার লক্ষ্যে এক সাংস্কৃতিক পীঠভূমিতে নিজেকে প্রোথিত করতে চায়। আর সেই লক্ষ্যমুখ থেকেই মৃত্যুকে ঘিরে গড়ে উঠেছে নানান সংস্কার, পারলৌকিক কৃত্য এবং শ্মশান সম্পর্কিত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম।

'শ্মশান' শব্দের অর্থ হল শব শয়নস্থান। শ্ম (= শব) + শান (= শয়নস্থান) মিলে শ্মশান শব্দের উৎপত্তি। আবার ইংরেজি Burning Ghat ধরে বলা যায় শবদাহ স্থান। সাধারণভাবে মৃত্যুর পর শবদেহকে দাহ অথবা সমাধিস্থ করা হয়। তাই প্রায় সর্বত্রই অঞ্চলভিত্তিক শ্মশান বা গোবস্থানের অস্তিত্ব মেলে। মুর্শিদাবাদ ইতিহাসের শহর। নবাবী আমলের রাজধানী হিসাবে ইতিহাসের নানান উজ্জ্বল স্মৃতিতে এই শহর মোড়া। এখানে তাই একাধিক শ্মশান বা গোরস্থান ঐতিহাসিক সম্পদরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কাটরা মসজিদের সুরম্য সিঁড়ির নীচে সমাহিত নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কবর, খোসবাগে নবাব সিরাজোদ্দৌলার কবর, মহিমাপুর পুলিশ ফাঁড়ির বিপরীতে জিন্নাতুন্নেসার কবর কিংবা জাফরগঞ্জে মীরজাফর বংশের কবরখানা আজ মুর্শিদাবাদে আগত পর্যটকদের নিকট ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান হিসাবে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। আমাদের আলোচ্য দুটি শ্মশানঘাটও এই ইতিহাসের শহরের উজ্জ্বল সাক্ষী।

মুর্শিদাবাদ শ্মশানঘাটটি সাধারণ জনমানসে লালবাগ শ্মশানঘাট নামে পরিচিত। কেননা মুর্শিদাবাদ শহর স্থানীয় মানুষের কাছে লালবাগ নামে চিহ্নিত। এই শ্মশানটির প্রথম নাম ছিল লালবাগ সাহানগর শ্মশানঘাট। কেননা আগে সাহানগরে মূল শ্মশানটি ছিল। তার পাশের অন্য শ্মশানটি ছিল কৌলীন্য থেকে দূরে। পরে শহরের উন্নয়নে ও জনবসতির কারণে সাহানগরের শ্মশানটি লুপ্ত হয়ে যায় এবং বর্তমান শ্মশানটি জন্ম নেয়। তাই শ্মশানটির ইতিহাস প্রায় আড়াইশো বছরের পুরানো। এগারো বিঘা জমির উপর এটি অবস্থিত। যতদূর জানা যায় স্থানীয় জমিদারের কাছ থেকেই এই জমি পাওয়া গিয়েছিল। এখন এটি মুর্শিদাবাদ পুরসভার পরিচালনাধীন।

এই শ্মশানঘাটটি পুরসভার দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত। বর্তমান ২নং ওয়ার্ডে আমানীগঞ্জ মৌজায়। গঙ্গার পূর্বতীরে, লালবাগ থেকে ফরাসগঞ্জ হয়ে বহরমপুর যাবার পথের পাশেই এই শ্মশানটির অবস্থান। এটির সঙ্গে সংলগ্ন বনমালীপুর মৌজা, দক্ষিণে নূতনগ্রাম অঞ্চল, উত্তরদিকে লালবাগ শহর। পুরসভার অধীনে শ্মশানঘাটটি থাকলেও প্রতিবছর টেন্ডার ডেকে এর দায়িত্বভার নির্দিষ্ট

ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়। এখন যাঁর নামে ঘাটটি আছে তিনি হলেন অঞ্জলি গঙ্গাপুত্র, জাতিতে ডোম। তবে তাঁর পুত্র সুরেশ গঙ্গাপুত্রই শ্মশানঘাটটির মূল তদারকি করেন। ডোম হিসাবে যাবতীয় শ্মশানকৃত্যাদিও তিনিই করে থাকেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই শ্মশানঘাটটি পুরুষানুক্রমে অনেকদিন এই গঙ্গাপুত্র পরিবারের তদারকিতে চলেছে। এটি বর্তমানে সুরেশের মায়ের নামে থাকলেও আগে তাঁর বাবা ঁকেশব গঙ্গাপুত্র, তাঁর বাবা ঁকৈলাস গঙ্গাপুত্র, তাঁর বাবা ঁতারণ গঙ্গাপুত্রও এই শ্মশানে কাজ করেছেন। প্রায় নবাবী আমল থেকেই এই ডোম পরিবারটি এখানে আছে। মৃতদেহ পিছু ২০ টাকা পুরসভাকে দিতে হয়। এছাড়া মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গ থেকে যা বক্‌শিশ পায় তাতেই কোনোরকমে গ্রাসাচ্ছাদন চলে এই ডোম পরিবারটির।

এই শ্মশানটিতে শবদাহ করতে আসে প্রসাদপুর, তেঁতুলিয়া, ধরমপুর, ডাঙ্গাপাড়া, ইসলামপুর, পাহাড়পুর, চাতরা, সন্ন্যাসীডাঙা, আয়েসবাগ, টিকটিকিপাড়া, হুমায়ুন মঞ্জিল, চক, ইচ্ছাগঞ্জ, হরিশপুর, রামপুর, নশীপুর এবং লালবাগ শহর থেকে। আগে দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর মৃতদেহ দাহ কার্যের জন্য এলেও বর্তমানে তা হ্রাস পেয়েছে। বহরমপুরে গঙ্গার ধারে শ্মশানঘাটের আধুনিকীকরণের ফলে এবং গঙ্গার ধার বরাবর নতুন বাইপাস নির্মাণে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে অনেকে মৃতদেহ সেখানে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তাই এই বিশ্বায়নের যুগে অন্যান্য ব্যবস্থার মতো শ্মশানঘাটেরও আধুনিকীকরণ অত্যন্ত জরুরি।

শ্মশানের সঙ্গে কালীমন্দির বা তন্ত্রসাধনার অনুষঙ্গ জড়িয়ে থাকার ঐতিহ্য সুপ্রাচীনকালের। মুর্শিদাবাদের শ্মশানঘাটটি আজো সেই ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। স্থানীয় মানুষের সাক্ষ্যে জানা যায় যে বর্তমানের কালীমন্দিরটি আগে পাটকাঠি দিয়ে তৈরি ছিল। পরে ননীপাগলা নামে এক সাধুর উদ্যো গ মন্দিরটি পাকা হয়। শ্মশানের বহু কুল, বাবলা ইত্যাদি গাছ কেটে মন্দিরটিকে নবরূপে তিনি প্রতিষ্ঠা দেন ১৩৬৪ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ। এখন মন্দিরটি মোজাইক করা এক ঝাঁ চকচকে দর্শনীয় স্থান। নাম—তারাতীর্থ মাতৃমিলন আশ্রম।

এই ননীপাগলার আগে দুজন সাধু এখানে এসেছিলেন। প্রথমজন হলেন রামানন্দ সাধু এবং দ্বিতীয় জন হলেন তারাপীঠ আগত নরেন সাধু। রামানন্দ সাধুর সময়ে শ্মশানভূমি ছিল নিবিড় জঙ্গলে পবিকীর্ণ। শোনা যায় বাঘ শেয়ালও হামেশাই দেখা যেত। তিনি নিজে এই নিবিড় জঙ্গলে এক কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ বা ইচ্ছা গ্রহণ করলে নানান দিক থেকে বেশ কিছু অর্থ সাহায্য আসে। সেই অর্থ নিয়ে মূর্তি আনতে গিয়ে তিনি আর ফিরে আসেননি। অনেকেই তাঁর ফিরে না আসার পেছনে তঞ্চকতা বা প্রতারণার গন্ধ পেয়েছেন। আবার একান্ত অনুরাগী নৈষ্ঠিক ভক্তকূল তা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু ঘটনা যাই হোক, তিনি মূর্তি না আনলেও পববর্তীকালে কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তারাপীঠের নরেন সাধু এখানে এসে পঞ্চমুণ্ডির আসন তৈবি করেন।

এরপরেই আসেন ননীপাগলা, মাত্র ১২ বছর বয়সে। তিনি দীর্ঘদিন এখানে বসবাস করেছিলেন। কালীমন্দির সহ আশপাশের ঘরগুলি সবই তাঁর তৈরি। তিনি শেওড়া গাছের তলায় বসে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল ঈর্ষণীয় এবং প্রচুর শিষ্য-শিষ্যা হয়েছিল। বর্তমান সাধু কার্তিক চক্রবর্তীও ননীপাগলার শিষ্য। ইনি নৈহাটি থেকে এখানে ননীপাগলার

মৃত্যুর পর এসেছেন। তিনিই এখন কালীর মন্দিরের পুজো করেন। আয়ের তেমন কোনো সংস্থান নেই। তবে নানান উৎস থেকে প্রাপ্ত পূর্ব সঞ্চয় Fixed Deposit হিসাবে রক্ষিত। তা থেকেই তিনি কালীমাতাকে ভোগ দেন এবং বলাই বাহুল্য এই ভোগই তাঁর আহার্য। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, তিনি মন্দিরে ভোগ দিলেও দিনে উৎসর্গ করেন কালীমায়ের উদ্দেশে, রাতে গুরুজি ননীপাগলার উদ্দেশে। দিনে পূজার সময় ১১-৩০ থেকে ১২টা, আর রাতে ৬টা থেকে ৬-৩০।

এই শ্মশানে ২২শে জ্যৈষ্ঠ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এক বিরাট মেলা হয়। টানা ১০দিন ধরে মেলাটি চলে। অন্যান্য পাঁচটা মেলার মতোই নাগরদোলা, মনোহারী জিনিস, তেলেভাজা, মিষ্টি বা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পশরায় মেলাটি সুসজ্জিত হয়। মেলায় বাউলগান, লোকপালা কিংবা যাত্রাগানের আসরও জমে। বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু সাধু সন্তদেরও আগমন এই মেলাকে এক স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা দান করেছে। পুরসভা থেকে টেন্ডার ডেকে মেলার অনুষ্ঠানের দায়িত্ব অর্পিত হয়ে থাকে।

এই মেলা ছাড়া প্রতি বৎসর ৭ই মাঘ ননীপাগলার তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে এই শ্মশানে এক চতুর্মুখী যজ্ঞ হয় এবং নরনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা দেখা যায়। প্রধানত বিভিন্ন মানুষের দানে এই নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। সরকারি উদ্যোগে স্নানের ঘাট এবং মেয়েদের বস্ত্র পরিবর্তনের জন্য গৃহ নির্মিত হয়েছে। শ্মশানে যাবার রাস্তাটিও (প্রায় ৪০০ মিটার লম্বা, ১২ ফুট চওড়া) পুরসভার উদ্যোগে কয়েক বছর আগেই পাকা হয়ে গেছে। গঙ্গার তীরে বট-অশ্বত্থ, শেওড়া, কলাগাছ, কুল, বাবলা, আম, কাঁঠাল, বেল, বকুল, জাম, নারিকেল ইত্যাদি নানান ফল ফুলের গাছগাছালিতে পরিপূর্ণ এক ছায়াময় স্নিগ্ধ পরিবেশে এই শ্মশানটি অবস্থিত।

শ্মশানটির পরিচালন ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের মনে বড় রকমের ক্ষোভ না থাকলেও বেশ কিছু অসুবিধার সম্মুখীন মানুষকে হতে হচ্ছে। সে ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন আছে। যেমন শনাক্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না থাকায় এবং পুরসভার তরফ থেকে Death Register maintain করার জন্য কোনো অফিস না থাকায় সন্দেহভাজন মৃতদেহ এলে জটিলতা সৃষ্টি হয় বা শনাক্তকরণ না করে দাহ করে ফেলা হয়। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে মৃতদেহ রাখার সুব্যবস্থা নেই। এজন্য একটি ঘর অবশ্য আছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে তা ব্যবহারের অনুপযুক্ত। তৃতীয়ত, বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। চতুর্থত, ভাগীরথী নদী পূর্বদিকে ভাঙছে, তাই শ্মশানঘাটটির ভবিষ্যতে বিপন্ন হবার সমূহ সম্ভাবনা। পঞ্চমত, দাহকার্যের জন্য ব্যবহৃত পাকা চুল্লিগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, তাই অব্যবহার্য অবস্থায় পড়ে আছে। ষষ্ঠত, পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং মৃতদেহকে স্নান করানোর জন্য জল তোলার ঘাটটির অবস্থা ভাল নয়। সপ্তমত, আগে শ্মশানের বাইরে এক কাঠের গোলা ছিল। সেটি ভেঙে গেছে। তাই আর কাঠ রাখা হয় না। তবে দূরে শহরের আশপাশে কাঠের গোলা আছে। মৃতের পরিজন বা আত্মীয়বর্গকে সেখান থেকে কাঠ সংগ্রহ করতে হয়। অষ্টমত, শ্মশানের একটা অংশ বিহারী ঘোষরা জবর দখল করে বসে আছে।

এই সব অসুবিধা দূর করার জন্য স্থানীয় মানুষ, প্রশাসনের সদিচ্ছা উদ্যোগ একসঙ্গে যুক্ত

হলে শ্মশানঘাটটির পরিবেশ আরো উন্নত হবে এবং সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই ঐতিহাসিক শ্মশানঘাটটি কার্যকরী ভূমিকা পালনে সমর্থ হবে।

এই শ্মশান সম্পর্কে একটা গল্প আছে যে, পানিয়াটি বাগানের ভেতর দিয়ে শ্মশানে যাবার যে রাস্তা গেছে, সেই রাস্তার ডানদিকে এক আমগাছ আছে। শোনা যায় একসময় রাস্তা দিয়ে হাঁটলে মানুষকে কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তি গঙ্গার দিকে টেনে নিয়ে যেত। সতীদাহের কথাও এখানে লোকমুখে শোনা যায়। এছাড়া একটি বিশেষ ঘটনার কথা জানা যায়। জনৈকা বিমলা মুখার্জি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের জন্য সমাজচ্যুত হয়েছিল, কিন্তু ১৭ বছর বয়সে অবিবাহিতা অবস্থায় তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে এই শ্মশানের একেবারে বাইরের এক প্রান্তে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। বাস্তবিক সমাজচ্যুত হবার কারণেই তাঁর স্থান হয়েছিল শ্মশানের বাইরের এক প্রান্তে। মৃত্যুর পরেও মানুষ জাতপাতের হিসাব থেকে মুক্ত হতে পারলো না—এ তারই এক নিদর্শন।

প্রসঙ্গত জানাই যে, এই প্রতিবেদকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় নির্দিষ্ট বংশ বা জ্ঞাতিগোষ্ঠীর পৃথক শ্মশানের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। সবচেয়ে চমকপ্রদ ইতিহাস হল একই জ্ঞাতিগোষ্ঠীর একাধিক শ্মশান রাখা। বিবাহিতা মেয়েবা পিত্রালয়ে থাকাকালীন যদি কোনো কারণে মারা যায়, তাদের স্বতন্ত্র শ্মশানে রাখা হত। কেননা বিবাহের পর তাদের গোত্রান্তর ঘটেছে বলে পিতৃ পিতামহের শ্মশানে নিজের অবস্থান মৃত্যুর পরেও রাখার অধিকার হারিয়েছে। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে আছে উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, আভিজাত্যেব অহমিকা এবং সংস্কাববোধ। লালবাগ শহরেও সাহানগরের শ্মশানে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের দাহ করা হত, আর পার্শ্ববর্তী শ্মশানটিতে অব্রাহ্মণদের দাহকার্য সম্পন্ন হত। কিন্তু সাহানগরের শ্মশানটি লুপ্ত হবার ফলে এখন বর্তমান শ্মশানটিতে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সব মিলেমিশে গেছে। বাস্তবিক শ্মশান এভাবেই ধনী, দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য সবাইকে একসূত্রে মিলিয়ে দেয়। এদিক থেকে শ্মশান ভেদাভেদহীন সাম্যের মন্ত্রে এক মহামিলন ক্ষেত্র।

মুর্শিদাবাদ শ্মশানঘাটটির মতো জিয়াগঞ্জ শ্মশানও মহামিলনের ঐতিহ্যকে সুদীর্ঘকাল ধরে বহন করে চলেছে। মুর্শিদাবাদ মহকুমার অধীন এই শ্মশানটি জিয়াগঞ্জ শহরের এক প্রান্তে ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত। লালবাগ থেকে নশীপুর হয়ে জিয়াগঞ্জে প্রবেশের মুখেই এই শ্মশানটির অবস্থান। এই শ্মশানের ইতিহাসও দুশো বছরের বেশি পুরানো। মূল শ্মশান এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলটি ৮ বিঘা জমি ঘিরে গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে মূল শ্মশান চত্বরটির জমির পরিমাণ ৬৩ শতক। জমিটি নশীপুরের আখড়ার মোহান্তদের। তাঁরা শ্মশানের জন্য জমিটি দান করেন।

মূল শ্মশানের জায়গাটি গাছগাছালি দিয়ে ঘেরা। এক বিশাল বটবৃক্ষের তলায় কালী-শিব-দুর্গার মন্দির সহ দাহকার্যের স্থান রয়েছে। এক নবনির্মিত মনসার বেদিও এখানে রয়েছে। শ্মশানের নীচে বহমান ভাগীরথীর পশ্চিমপারে রয়েছে আজিমগঞ্জ। বর্তমানে শ্মশানের দুর্গামন্দিরটির গায়ে প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ঁরমণীমোহন ঠাকুরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তদীয় সহধর্মিণী প্রফুল্লনলিনী দেবীর নাম আছে। সাল ১৩৯১, ১০ই বৈশাখ। শিব মন্দিরটি গঙ্গাধর স্মৃতি মন্দির

নামে চিহ্নিত।

অন্যান্য শ্মশানঘাটের মতো এর সঙ্গেও একাধিক তন্ত্রসাধকের নাম জড়িয়ে আছে। শোনা যায় ভোলানন্দ গিরি নামে এক সিদ্ধপুরুষ জঙ্গীপুর মহকুমার নিমতিতা থেকে এখানে এসেছিলেন। তিনি তন্ত্রসাধক ছিলেন। আর এই তন্ত্রসাধনার লক্ষ্যে ১০৮টি মড়ার খুলি দিয়ে তিনি এক মন্ত্রপূত বেদি নির্মাণ করেছিলেন। সেই বেদিতে বসেই তিনি প্রত্যেক অমাবস্যায় তন্ত্রসাধনা করতেন। ভোলানন্দ গিরির সময় শ্মশানক্ষেত্রটি গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। বিভিন্ন শ্বাপদ জন্তুর দেখাও মিলত। তাই সচরাচর কেউ এই ঘোর জঙ্গলে আসতে আগ্রহ দেখাত না। ভোলানন্দ গিরি সেই দুর্গম স্থানে তাঁর সাধনক্ষেত্র স্থাপন করে প্রাথমিকভাবে ভীতির আবহটিকে হালকা করেন। কিন্তু শ্মশানটিকে সাধারণের কাছে জনপ্রিয় করে তোলেন সদানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক তন্ত্রসাধক।

ভোলানন্দ গিরি তথা গিরিবাবার তিরোধানের পর সদানন্দ ব্রহ্মচাবী এই শ্মশানে আসেন এবং শ্মশানটির দায়িত্ব নেন। তন্ত্র সাধনার দ্বারা তিনি অঘটন-ঘটন-পটু এক অতিপ্রাকৃত শক্তি অর্জন করেছিলেন এবং সেই শক্তিকে মানুষের কল্যাণমূলক কাজে প্রয়োগ করেছিলেন। তাই নানান দুরারোগ্য ব্যাধি, মানসিক সংকট ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আশায় নানাবিধ পরামর্শ, তাবিজ-মাদুলি, জড়িবুটি বা ওষুধের জন্য প্রতিদিন বহুলোকের সমাগম শ্মশানে ঘটত। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বহুলোকের যাতায়াতের ফলে ক্রমে শ্মশানটিব ভয়ঙ্করত্ব জনিত ভীতি জনমানসে হ্রাস পেতে থাকে। এদিক থেকে সদানন্দ ব্রহ্মচারীর একান্ত ব্যক্তিগত চেষ্টাতেই জিয়াগঞ্জ শ্মশানটি জেগে ওঠে। শ্মশানে এখনো সেই সিদ্ধ পুরুষটির সমাধি আছে।

সদানন্দ ব্রহ্মচারীর পরে শিবানন্দ সরস্বতী, মাতাজি ব্রহ্মচারী এবং শেষে সত্য ঘোষ নামে একাধিক সাধু শ্মশানে আস্তানা গেড়েছিলেন। কিন্তু শ্মশানটিকে কেন্দ্র করে এক অসামাজিক চক্র গড়ে ওঠায় স্থানীয় মানুষের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। কলকাতার শ্মশান-স্বপনদের মতো দাদাগিরিও শ্মশানটিকে কেন্দ্র করে দেখা যায়। কিন্তু পরে প্রশাসনিক উদ্যোগে এবং জিয়াগঞ্জের সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে যাবতীয় অসামাজিক চক্র ভেঙে দেওয়া হয়। এখন শ্মশানটি সাধুবাবা ও দাদাদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে শবদাহ স্থান হিসাবেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই কাজে জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পুরসভারও এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। তবে এই আলোচনায় যাবার আগে একবার পিছন ফিরে তাকানো যেতে পারে।

এই শ্মশানটিতে আগে স্নান করা এবং জল তোলার একটি সুদৃশ্য ঘাট ছিল। জিয়াগঞ্জের হাতিবাগান এলাকার বটকৃষ্ণ দত্ত, রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, হুলাশচাঁদ বোথরা, মন্মথনাথ সাহা, বসন্ত পোদ্দার প্রমুখের সাহায্যে ও পরামর্শে এই ঘাটটি নির্মাণ করেছিলেন। তাই শ্মশানের ঘাটটি আজো বটকৃষ্ণঘাট নামে পরিচিত। মূল শ্মশানক্ষেত্রটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। চারদিকে ছিল চারটি মড়া পোড়াবার জায়গা। প্রাচীরগাত্রে লেখা ছিল 'স্বর্গদ্বার'। স্বর্গদ্বারের পেছনেই ছিল শিবের মন্দির। গোবিন্দচন্দ্র দত্ত নামে জনৈক স্থানীয় ব্যক্তি ওই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। ওই মন্দিরের পাশাপাশি আরো কয়েকটি মন্দির ছিল। 'স্বর্গদ্বারে'র চতুর্দিকে মৃত্যু সম্পর্কিত বিভিন্ন

বাণীসহ সুদৃশ্য প্লেট ছিল।

এছাড়া পাকা চেয়ার টেবিল সহ এক সুরম্য উদ্যান একদা শ্মশানটিতে ছিল। সেখানে নানান বাহারী ফুলের শোভা বাগানকে আলোকিত করে রাখত। অনেক মানুষ সেখানে বিকেলবেলায় পার্কে যাবার মতো বেড়াতে যেতেন। জিয়াগঞ্জ শহরের বর্ষীয়ান এক বিশিষ্ট নাগরিক বিমলচাঁদ বোথরা মহাশয় এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন যে ছোটবেলায় বড়দের হাত ধরে তাঁরা বহুদিন ওখানে বেড়াতে গিয়েছেন। কিন্তু কালের নিয়মে এবং নদীর খেয়ালী প্রকৃতির ভ্রূকুটিতে সেইসব অমূল্য নিদর্শন আজ হারিয়ে গেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শ্মশানে প্রথম টিউবওয়েল তৈরি করে দিয়েছিলেন হরিনারায়ণ সিংহ। এছাড়া খদুলাল পাণ্ডে তাঁর পিতৃস্মৃতিতে এক শিবমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। একদা বেশ ধুমধামের সঙ্গে রায়বাহাদুর এবং হুলাশচাঁদ বোথরা মহাশয়দের উদ্যোগে কালীপুজোয় নরনারায়ণ ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। এখন সেই বিরাট আয়োজন না থাকলেও নরনারায়ণ ভোজন কিন্তু উঠে যায়নি। গত পুজোতেও পুরসভার তৈরি পাকা রাস্তার দু'পাশে বহু কাঙালি ও দুঃখীজনকে বর্তমান প্রতিবেদক পঙ্‌ক্তি ভোজন করতে দেখেছে।

একদা বহু দূর-দূরান্ত থেকে জিয়াগঞ্জের শ্মশানঘাটে দাহকার্যের জন্য মৃতদেহ আসত। ভগবানগোলা, লালগোলা ছাড়াও বীরভূমের সাঁইথিয়া থেকে এখানে শবদেহ হাজির হত। সাধারণভাবে জনমানসে একটা বিশ্বাস আছে যে গঙ্গাতীরস্থ শ্মশানে শবদাহ করলে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। আব সেই বিশ্বাস ও সংস্কারের বশেই গঙ্গাপ্রাপ্তির আশায় অনেক দূর দূরান্ত থেকে মৃতদেহ এখানে আসত। পরে আজিমগঞ্জেও এক সুন্দর পরিবেশে শ্মশানঘাট তৈরি হয়। প্রচলিত প্রবাদ আছে —"গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণসী সমতুল।" তাই পশ্চিমতীরে দাহ করলে স্বর্গলাভ সুনিশ্চিত — এরকম এক বিশ্বাস থেকেও আজিমগঞ্জ শ্মশানঘাট গুরুত্ব পেল। কেননা জিয়াগঞ্জ শ্মশানঘাটটি ভাগীরথীর পূর্বপারে অবস্থিত, আর আজিমগঞ্জ নদীর পশ্চিমতীরে। এছাড়া বহরমপুর শহরে ইলেকট্রিক চুল্লি হবার ফলে, যাতায়াত ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতির ফলে দূর দুরান্তের শবদেহ সেখানে যেতে লাগল। আর এসব কারণেই জিয়াগঞ্জ শ্মশানঘাটের কৌলীন্য অনেকটা কমে গেল। তবু একের অধিক শবদাহ হয় না, এমন দিন শ্মশানের ইতিহাসে নেই বললেই চলে।

বর্তমানে মূল রাস্তা থেকে শ্মশানে যাবার জন্য পৌরসভা বেশ চওড়া পাকা ঢালাই রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে। শবযাত্রী বা আত্মীয়দের বসার জন্য একটা পুরাতন শেড ছিল। সম্প্রতি বন্যার পর পাড় বাঁধাইয়ের টাকায় এক নতুন শেড নির্মিত হয়েছে। নদীতে নামার জন্য দুটি ঘাট থাকলেও একটা প্রায় ভেঙে গেছে। বর্ষায় বৃষ্টির হাত থেকে মুক্ত হয়ে যাতে দাহকার্য সুসম্পন্ন করা যায়, সেজন্য একটি শেড দেওয়া চুল্লি আছে। কিন্তু বর্তমানে শেডটির উপরের টিনের চালাটি ভেঙে গেছে। আগামী বর্ষার আগেই এই শেডটির মেরামত করা অত্যন্ত জরুরি। এই চুল্লি ছাড়া আরো দুটি দাহ কবার স্থান আছে। শ্মশানের দক্ষিণ পাশে প্রায় লাগোয়াভাবে রয়েছে পীরবাবার এক সমাধি এবং কারবালা প্রান্তর। মহরমের দিন কয়েক ঘণ্টার এক ছোট্ট মেলাও অনুষ্ঠিত হয়।

জনবসতির দিক থেকে জিয়াগঞ্জ হিন্দু-মুসলমান-জৈন-শিখ-নানান ধর্ম ও বর্ণের মানুষের

মিলন ক্ষেত্র হিসাবে বৈচিত্র্যময়। তাই বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের শবযাত্রা, সংস্কার, লোকাচার অনুষ্ঠান শ্মশানের বুকে এক বৈচিত্র্য ও সম্প্রীতির আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বর্তমান শ্মশানটিতে যিনি ডোমের কাজ করছেন, তাঁর নাম শিবু দাস। তিনি কিন্তু জাতিগত বৃত্তিতে ডোম নন। সাধারণত ডোমরা ছিল যোদ্ধা জাতি, তাই অসীম সাহসী এবং বীর। সেই বীরত্ব ও সাহসের কারণেই শ্মশানের ভয়ভীতিকে তুচ্ছ করে তাদের কর্মপ্রবাহ। কিন্তু সময়েব বহমান স্রোতে জাতিগত বৃত্তি ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। তাই শ্মশানের সঙ্গে ডোমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়টি আর আগের মতো জায়গায় নেই। জীবিকার প্রয়োজনে যে কোনো মানুষ যে কোনো বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে। জিয়াগঞ্জ শ্মশানঘাটে শিবু দাসের ডোমের কাজ সেই বিবর্তনেরই এক নিদর্শন।

জিয়াগঞ্জ শ্মশানে কাঠসহ একটি মৃতদেহের দাহখরচ মোট ১৪০ টাকা (একশত চল্লিশ টাকা)। তাছাড়া কেউ দয়া করে যা দিয়ে যান তা সানন্দে গ্রহণ করা হয়। অনেক সময় খুব দুস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে পৌরসভা দু'মণ কাঠ দাহকার্যের জন্য অনুদান হিসাবে দিয়ে থাকে। শ্মশানকর্মীদেব সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, সেক্ষেত্রে পুরসভা থেকে একটা স্লিপ দেওয়া হয়। সেই স্লিপ অনুসারে শ্মশানের কাঠগোলা থেকে কাঠ দান করা হয়।

এই শ্মশান নিয়ে অনেক গল্প আছে। তন্ত্রসাধক সদানন্দ গিরি সম্বন্ধে শোনা যায়, তিনি বাঘ শেয়াল কুকুর বিড়াল সব একসাথে নিয়ে খেতে বসতেন। সকালে পূজার্চনা সেরেই তিনি ঝোলা কাঁধে পথে বেরিয়ে পড়তেন। তিনি ভিক্ষা চাইতেন না। কিন্তু অযাচিতভাবে অনেক কিছু পেতেন। দুপুরে ফেরার পথে অনেক সময় দুস্থ লোকেদের সবকিছু বিলিয়ে নিঃস্ব হয়ে ফিরতেন।

জিয়াগঞ্জ শ্মশানটির অভ্যন্তরে একটি কুয়ো আছে। তার পাশাপাশি আরো দুটি কুয়োর সন্ধান মেলে। সুড়ঙ্গপথের মাধ্যমে কুয়োগুলির মধ্যে যোগাযোগের কথা অনেকেই জানিয়েছেন। কুয়োর মধ্যে লোহার খাঁচা কিছুদিন আগেও অনেকে দেখেছেন। বর্তমানে কুয়োটি মাটিতে বুজে গেছে। এই কুয়োর সুড়ঙ্গ পথকে স্থানীয় কেউ কেউ দেবী চৌধুরানি বা ভবানী পাঠকের বলে মনে করেন। কিন্তু এরূপ ভাবনার যুক্তি সংগত কোনো কারণ নেই। দেবী চৌধুরানি বা ভবানী পাঠকের কাহিনীর প্রেক্ষাপট উত্তরবঙ্গ। তাই মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে তা না হবারই সম্ভাবনা। মনে হয় রানি ভবানীর নামসাম্য থেকে জনমানসে বিভ্রান্তি ঘটেছে।

এই শ্মশানটিতে যে সব মন্দির বা দেবস্থান আছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা নবতম সংযোজন হল এক মনসার থান। এটি নির্মাণের পেছনে কিছু অর্বাচীনের কৃতকর্মের চমকপ্রদ ইতিহাস আছে। কিছু নবীন প্রবীণ শ্মশানে নেশাভাঙ করার জন্য হাজির হত। একদিন একটি সাপের বাচ্চাকে এক তরুণ কিছুটা নেশাব ঝোঁকে মজা করার লক্ষ্যে মদের বোতলে ঢোকায় এবং সাপটি মারা যায়। শ্মশানে মন্দিরচত্বরে জীবহত্যা করার জন্য ওই দলের এক প্রবীণ সদস্য তরুণটিকে ভীতি প্রদর্শন করে এবং পাপমুক্তির জন্য শ্রাদ্ধ-শান্তি-স্বস্ত্যয়ন এবং সর্পদেবী মনসার এক বেদি স্থাপনের পরামর্শ দেয়। ধর্মভীরু তরুণটি নেশার ঝোঁকে করা কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ প্রায় হাজার তিনেক টাকা খরচ করে শ্রাদ্ধ-শান্তি এবং মা মনসার বেদি নির্মাণ করে।

জিয়াগঞ্জের এই শ্মশানটিতে বিভিন্ন সময়ে অনেক ব্যক্তিগত স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছিল।

এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীপৎ সিং, রানি ধন্যাকুমারী, রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহনলাল জৈন, লালগোলার মুরারিমোহন সাহা। এইসব স্মৃতিসৌধের অনেকগুলিই গঙ্গাবক্ষে হারিয়ে গেছে। এখন গঙ্গার ভাঙন তেমন না হলেও পাড়টির বাঁধানোর ক্ষেত্রে সচেতন পদক্ষেপ দরকার। এছাড়া মূল শ্মশানঘাটটির সংস্কারও একান্ত জরুরি। মূল রাস্তা থেকে শ্মশানে যাবার পথে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এক্ষেত্রে পুরসভা যদি ভ্যাপার ল্যাম্পের ব্যবস্থা করে তাহলে শ্মশানের জমাট অন্ধকারের ভীতি অনেকটা দূরীভূত হয়। এছাড়া সন্দেহভাজন মৃতদেহের শনাক্তকরণ বা Death Register maintain করার জন্য পৌরসভার অফিস থাকা প্রয়োজন। সর্বোপরি ইলেকট্রিক চুল্লি স্থাপনের ব্যাপারে কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া দরকাব।

পরিশেষে বলি, জিয়াগঞ্জ শ্মশানঘাটটির সার্বিক উন্নতিসাধনে সরকারি ও ব্যক্তিগত উভয় উদ্যোগকেই যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। ইতিহাসের সাক্ষ্যে জানা যায় যে আগেকার দিনে যে কোনো জনকল্যাণমূলক কাজে জমিদার বা অভিজাত ধনাঢ্য ব্যক্তির দান যুক্ত হত। মুর্শিদাবাদ ও জিয়াগঞ্জ শ্মশানঘাট দুটিও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু জিয়াগঞ্জ শ্মশানঘাটের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অগ্রসর হয়েও অনেকে পিছিয়ে গেছেন। এর মূলে এক সংস্কারবোধ কাজ করেছে।

অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে যে যাঁরা শ্মশানঘাটটির উন্নতিকল্পে কিছু কাজ করেছেন তাঁরা বেশিদিন বাঁচেননি। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বিশ্বাস শেকড় মেলে ডালপালা বিস্তার করতে থাকে যে শ্মশানে কিছু করলেই সে আর বেঁচে থাকবে না। ফলে এক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বর্তমানের বিজ্ঞাননির্ভর যুক্তিবাদী যুগে এই বিশ্বাস বা সংস্কারের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে শ্মশানঘাটটির পুরাতন গৌরব ও সমৃদ্ধি ফেরানোর জন্য সচেতনতা জরুরি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

সম্মাননীয় বিমলচাঁদ বোথরা, জিতুদা, রামপ্রসাদ দাস, শ্মশানকর্মী স্বপন সাহা (জিয়াগঞ্জ) এবং সুবল প্রামাণিক, শান্তিকুমার হালদার, দারোগা মাহাতো, অমিত পাল, মধু মিত্র (মুর্শিদাবাদ)

জিয়াগঞ্জের শ্মশান,
ছবি : প্রভাস সামন্ত

☐ লেখক পরিচিতি—প্রাবন্ধিক, গবেষক, কলেজের অধ্যক্ষ।

কয়েকটি ঐতিহাসিক গোরস্থান ও মুসলিম সামাজিক আচার

রাজকুমার শেখ

জীবনের সব থেকে বড় সত্য হল মৃত্যু। মৃত্যু আসবেই। কবি শাহীর লুধিয়ানভী এক জায়গায় তাঁর কবিতায় লিখেছেন—

"মৌৎ কিৎনিহি সংদিল্ হ্যায়মগর
জিন্দগী সে তো মেহেরবাঁ হোগী"।

এই অনিবার্য সত্যের নিদারুণ যন্ত্রণা মানুষ সেই অতীতকাল থেকে বহন করে আসছে। মানুষ কী মরণের মধ্যেই বিলীন হয়ে যেতে চায়? মরণের পরও তো কেউ কেউ হেঁটে যাবার বাসনা করেন। মানুষ জানে যে তার শেষ আশ্রয়স্থল কবর। অবশ্য মুসলিম শরিয়তের মত অনুযায়ী মুসলমাদের 'গোরস্থান' হিন্দুদের 'শ্মশানভূমি' খ্রিস্টানদের 'সিমেট্রি' ইত্যাদি।

তবে মুসলমানদের শেষ ঠিকানা তার চিরশান্তির জায়গা কবর। মৃত্যুর পরই তাঁর অনন্ত জীবনের শুরু হয়। যার শুরু আছে শেষ নেই। অনন্তকাল থেকে শুরু হয়ে আসছে এই কবরের প্রথা। মানুষের মৃত্যুর পর তার ঠিকানা কোনটি হবে তার বিচার করবেন মহান আল্লাহ্‌পাক। যেদিন সেই কিয়ামত দিবস হবে (মহাপ্রলয় দিবস)। যাঁরা ভালো কাজ করেছেন। নামাজ পড়েছেন। সৎপথে চলেছেন। মানুষকে ভালোবেসেছেন। দান করেছেন। আল্লাহর হুকুম মেনেছেন। নবী হজরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর তরিকাকে মেনে চলেছেন সেই ব্যক্তির জন্যেই বেহেশত। যদিও সেই মহান আল্লাহ পাকই জানাবেন কোন্ ব্যক্তি বেহেশেতের অধিকারী হবেন।

বেহেশত :

পাপ-পুণ্যের বিচারের পর যে স্থানে চিরস্থায়ী ভাবে আরামের সঙ্গে বসবাস করবেন, তাকে জান্নাত বা বেহেশত বলে।

বেহেশত মোট আটটি ভাগে বিভক্ত :

১) জান্নাতুল ফিরদাউস।

২) দারুস্ সালাম।

৩) দারুল খুলদ্।

৪) জান্নাতুল নায়ীম।

৫) জান্নাতুল আদ্‌ন।

৬) জান্নাতুল মাওয়া।

৭) দারুল মাকাম।

৮) দারুল কায়ার।

দোযখ :

বিচারের পর পাপী বান্দারা যে সীমাহীন, শাস্তিময় জায়গায় যাবে, তার নাম—দোযখ। এই

দোযখ মোট সাতটি ভাগে বিভক্ত :

১) হারিয়া।

২) হুতামা।

৩) জাহীম।

৪) সায়ীর।

৫) লাজা।

৬) সাক্কার।

৭) জাহান্নাম।

মুসলিম শরীয়ত অনুযায়ী দাফনের নিয়মাবলী :

মৃত্যুকালে তওবা করাতে হবে। তবে তার পাশে বসে ইস্তেগফার ও কালেমা উচ্চস্বরে পড়তে হবে। রুহ্‌বের হয়ে গেলে চোখ ও চোয়াল বন্ধ ও হাত পা টেনে সোজা করে দিতে হবে। পরিধেয় কাপড় খুলে নিয়ে পাক চাদবে দেহ ঢেকে দিতে হয়।

গোসল :

পুরুষ বা নারীদের সতব হিসাবে ঢেকে রেখে প্রথমে ওজু করাতে হয়। আঙ্গুলে ন্যাকড়া জড়িয়ে দাঁত ও মাড়ি ঘসে নিতে হবে। নাকের ভেতর মুছতে হয়। কুলের পাতা দ্বারা সামান্য গরম জল বা বিশুদ্ধ জল দিয়ে প্রথম মাথা, দাড়ি সুগন্ধি সাবান মাখিয়ে ধোয়াব পর তক্তাব উপর বাম কাত করে শুইয়ে ডান দিক তিন বার ধুয়ে ফেলতে হবে। তৎপর বসিয়ে ঠেস দিয়ে আস্তে আস্তে পেটে মালিশ করবার সময় যদি কিছু বের হয়ে আসে তাহলে ধুয়ে ফেলতে হবে। শুকনো পরিস্কার কাপড়দিয়ে সর্বাঙ্গ মুছে দিতে হয়। মাথা ও দাড়িতে আতর লাগিয়ে দিতে হবে। কপাল, নাক, দুহাত, দু'হাঁটু, ও দু'পায়ে কর্পূর লাগাতে হয়।

চিরুনী ব্যবহার ও চুল-নখ কাটা নিষিদ্ধ। গোসল নারীদের ক্ষেত্রে—স্বামী স্ত্রীকে গোসল দিতে পারবে না। কিন্তু স্ত্রী স্বামীকে গোসল দিতে পারবে। স্ত্রীলোকের অভাব যদি থাকে তাহলে কোন মুহরম ব্যক্তি কেবল কোন স্ত্রীলোককে তায়াম্মুম করাতে পারবে।

কাফন :

ইজার, লেফাফা এবং পিরহান, এই তিন প্রকার কাপড় পুরুষদের সুন্নত। আর স্ত্রীলোকের সুন্নাত পাঁচটি। গোসলের পর মৃত্যু ব্যক্তিকে কাফন পরিয়ে দিতে হয়।

জানাজার নামাজ :

জানাজা নামাজ ফরজে কিফাযা। দু'একজন পড়ে দিলে সবাই দায়মুক্ত হবে, নতুবা সবাই দায়ী হবে। এই নামাজের শর্ত হল পাঁচটি :

১) মৃতা ব্যক্তি মুসলমান হওয়া।

২) পাক-সাফ হওয়া।

৩) কাফন পাক।

৪) সতর ঢাকা।

৫) নামাজীর সামনে লাশ রাখা।

মকরুহ্ ওয়াক্ত বাদ দিয়ে লোক বেশি হলে ৩-৭ কাতারে লোক দাঁড়াবে। লাশের মাথা উত্তরে পা দক্ষিণে যাতে থাকে এমনভাবে খাটিযা রাখতে হবে। ওলীর ইজাজতে ইমাম নামাজ পড়ান।

দাফন :

জানাজার নামাজ শেষ হওয়া মাত্র মুর্দাকে দাফন করতে হয়। কবরের পশ্চিম দিক হতে লাশ নামাতে হয়। লাশ নামাবার সময় দুআ পড়তে হবে।

মৃত্যু ব্যক্তির মুখ কিব্‌লার দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আর স্ত্রীলোকের লাশ চাদর ঢাকা দিয়ে কবরে নামাতে হয়। দাফনকালে উপস্থিত ব্যক্তিগণ 'দুআ' পড়বে আর তিন মুষ্টি করে মাটি কবরে চাপাবে।

মৃতের চারদিনের দিন জন্য 'দুআ' দরুদ পাঠ করতে হয়। ফকির মিসকিনদের দান করতে হয়। অবশ্য চল্লিশ দিনেও একই নিয়ম পালন করা যায়। তাঁর আত্মার প্রতি শান্তি কামনা করা হয়। কোরান শরীফ তাঁর নামে খতম করা হয়। একে কুল পড়ানো বলে। আত্মীয়-স্বজন পাড়া প্রতিবেশি অনেকেই আমন্ত্রিত হয়ে আসেন। স্থানীয় মৌলানা সাহেব বাড়িতে এসে মিলাদে শরীক হন। অনেকরাত পর্যন্ত দুআ-দরুদ পাঠ করেন। শরীয়তের নানান দিক নিয়ে আলোচনা করেন। মৃত্যুর পর যে অনন্ত জীবন, আর ইহ জগৎ যে সামান্য কটা দিনের, আর মৃত্যু হচ্ছে পরলোক জীবনের শুরু। সেই চির শান্তির জায়গা পেতে হলে ইসলামের প্রতিটি বিধিই মানতে হবে। কিছু কিছু মানুষের কাছে মৃত্যুও তো সুখের হয় . .

তাই তো বলি—

"আহা! মৃত্যু,
তুমি বড় সুন্দর হে"!

মুর্শিদাবাদের কয়েকটি ঐতিহাসিক গোরস্থান :

গোটা মুর্শিদাবাদে বেশ কিছু ঐতিহাসিক গোরস্থানের শেষ চিহ্ন এখনও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। যেমন— জাফরাগঞ্জের আর ভাগিরথীর ওপারে খোশবাগ-এর গোরস্থান। জাফরাগঞ্জ মির্জাফরের বংশধরদের গোরস্থান আর খোশবাগ-এ নবাব আলিবর্দির পরিবারের সমাধিক্ষেত্র। যার টানে প্রতি বছর বহু পর্যটক দুর-দূরান্ত থেকে আসেন। মুর্শিদাবাদ এক সময় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী ছিল।

মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজিদ বেশ কয়েক বিঘা জমির ওপর তৈরি। মুর্শিদাবাদের প্রথম নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কবর এই মসজিদের সিঁড়ির তলে। তাঁর কবরের গায়ে ফার্সি ভাষাতে লেখা একটি এপিটাফ চোখে পড়ে। অবশ্য বাংলাতে তর্জমা করলে তার মানে হচ্ছে—"আরবের হজরত মুহম্মদ (সঃ) দুনিয়া ও বেহেশতের গৌরব। যে ব্যক্তি তাঁর দুয়ারের ধূলিরও যোগ্য নয় তাঁর মাথায় পুণ্যবান বান্দার পদধূলি বর্ষিত হোক।"

এই কাটরা মসজিদের সিঁড়ি বেয়ে নামাজ পড়তে যায় পুণ্যবান মানুষেরা আর সেই সব মানুষের পদধূলি ঝরে পড়ে তাঁর কবরের ওপর। এটাই নাকি প্রথম নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর শেষ ইচ্ছে ছিল। গোটা মুর্শিদাবাদ জুড়ে বহু ছোট বড় কবরস্থান রয়েছে। তবু এর মধ্যেই কিছু কবরস্থান আছে যা মানুষ আজও মনে রেখেছে। মনে রাখবে। যার সাক্ষী ইতিহাস। যেমন—খোশবাগ কবরস্থান। নবাব আলিবর্দি খাঁ কয়েক বিঘা জায়গায় এই সমাধি ক্ষেত্রটি তৈরি করেন। এই সমাধি বাংলার ইতিহাসের বহু উত্থান-পতনের সাক্ষী। এই সমাধিভূমিব এক জায়গায় পরপর আটটি কবর আছে। এখানেই চির নিদ্রায় শায়িত আছেন বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা ও তাঁর পাশে লুৎফা বেগম। এবং নবাব আলিবর্দি খাঁ ও তাঁর পাশে মহিষী সরফুননেসা। কবরের গায়ে কোরআনের শ্লোক লেখা : "স্বর্গীয় প্রলেপে পার্থিব বেদনা মুছে দেবার প্রয়াস। কিন্তু ইতিহাসের পাতা থেকে রক্তের দাগ কে মুছবে?"

শুধুই কি কবর? কবর দেওয়ার পরও তো মানুষের কথা থেকে যায। থেকে যায় তার ক্রিয়াকর্ম। কোন দিনই মুছে যায় না তার কথা। ইতিহাস মনে করিয়ে দেয় বারবার। কবর মানেই শেষ নয়। আজও সিরাজের কবরের পাশে দাঁড়ালে মনে করিয়ে দেয় পলাশীপ্রান্তরের কথা। বাংলাকে বাঁচাবার অক্লান্ত যুদ্ধের কথা। আর সেই সঙ্গে উঠে আসে মীরমদন আর মোহনলালের কথা। আজ তারা কেউ বেঁচে নেই। তবু মৃত্যুর কয়েকশ বছর পরেও তাঁরা থেকে গেছেন মানুষের মনে। ইতিহাসের পাতায়।

১৮ আগষ্ট ১৮২১। ৪ ভাদ্র ১২২৮

মুরশেদাবাদ —- সুরে বাঙ্গালা ও সুরে বেহার ও সুবের উড়িস্যার সুবেদার মুরশেদাবাদের নবাব সুজাউলমুলুক মুবারকদ্দৌলা আলীজাহ্ জিনতদ্দীন্ আলীখাঁ বাহাদুর ফীরোজ জঙ্গ ৬ আগস্ত অর্থাৎ ২৩ শ্রাবণ সোমবারে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন তৎপর দিন ৭ তারিখে অতিপ্রাতঃকালে মোং বহরমপুর হইতে গোরা পলুটন ও সিফাহী পলটন দুই তোপ লইয়া নবাব বাটীর চকে উপস্থিত হইল পরে নবাব সাহেবের অমাতোরা ও আত্মীয় লোকেরা ঐ মৃত শরীর ধৌত করিয়া সবুজবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত অপূর্ব্ব পালঙ্গোপরি তাঁহাকে উঠাইয়া কবর স্থানে লইয়া চলিল। তাঁহার অগ্রে ২ ঐ সকল সৈন্য বন্দুক উল্টাইয়া চলিতে লাগিল এবং বাদ্য যন্ত্র সকল কৃষ্ণ বর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া শোকসূচক বাদ্য করিতে ২ চলিল। এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে সরকারী হাতী ও ঘোড়া ও সৈন্য চলিল এবং শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের উকীল ও তত্রস্থ সকল সাহেবেরা সঙ্গে চলিলেন মুরশেদাবাদ হইতে এক ক্রোশ নাজীমেরদের কবরস্থান জাফরগঞ্জ পর্য্যন্ত সকল সমেত গেলেন সেখানে পঁহুছিয়া সিফাহীরা তিনবার বন্দুক ছাড়িল ও তাঁহার বয়ঃক্রম বৎসরানুসারে ২৯ তোপ হইল পরে তাঁহারদের বংশমর্য্যাদানুসারে তাঁহাকে সেইখানে কবর দিয়া সকলে স্ব ২ স্থানে গমন করিলেন।

— সমাচার দর্পণ

☐ লেখক পরিচিতি—গল্পকার, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক।

খলিশানীর শ্মশান

তপনকুমার সেন

বহুদিন পূর্বেকার কথা। বর্তমান দক্ষিণপূর্ব রেলের বাউড়িয়া স্টেশন ছেড়ে একটু এগোলেই ঘন বনজঙ্গলে ঘেরা এক বিস্তীর্ণ শ্মশানের শুরু। একদিকে এক চিলতে সরু রাস্তা আর ঘন বনের পাশ দিয়ে প্রবল বেগে বয়ে যেত গৌরী নদী। এই রাস্তা উলুবেড়িয়া দু'নম্বর ব্লকের অধীন খলিশানী গ্রামের। সংযুক্ত গ্রাম রামনগর। গৌরী নদীর অন্যদিকের গ্রাম শুঁড়িখালি। শ্মশানেব মধ্যে ছিল এক প্রাচীন মন্দির। মাঝি মাল্লারা নেমে পুজো দিয়ে যেত। মন্দির সংলগ্ন শ্মশান জুড়ে ছিল বিশাল বিশাল বৃক্ষরাজি। শাল, নিম, বট, অশ্বত্থ, বকুল, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, ঝাউ, বাঁশ ও অন্যান্য গাছের ঘন বন।

আরও পরে তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে ব্যবসা ও রাজত্ব করছে। এ রাজার ঊর্ধ্বতন কর্মচারী মানিকবাম বসু ১৭৭৪ সালে খলিশানী-রামনগর গ্রামে বসবাস করতে আসেন। ওই স্থানকে বসবাসের উপযোগী করে বারমহল, অন্দরমহল, গোয়ালঘর, দেউড়িদের থাকার জায়গা, অতিথিশালা, ধানের গোলা ইত্যাদি বসান। খাবার জল ও মাছ চাযেব জন্য কাটান পুকুর। যানবাহন হিসাবে আনেন পালকি ও গরুর গাড়ি। তখনকার ইতিহাস থেকে জানা যায় গৌরী নদী মজে চওড়া খালের আকার ধাবণ করেছে। হুগলি ও আমতা থেকে যাতায়াত ও বাণিজ্য নৌকাপথে চেঙ্গাইল, বাউড়িয়া, উলুবেড়িয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঘন জঙ্গল পরিবেষ্টিত শ্মশানধারের মন্দির তখন নদীগর্ভে বিলীন। মন্দির সংলগ্ন চত্বরে শালবৃক্ষতলে স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা পূর্বের দেবীঘট পূজিত হয়ে আসছে। এই বিশাল প্রায় এক কিমি. লম্বা শ্মশানের পাশ দিয়ে একা কোনো মানুষ দিনেরবেলাতেও হেঁটে যেতে সাহস পেত না। দলবদ্ধভাবে যাতায়াত করত।

অনেক বছর পরে এই ভুতুড়ে শ্মশানে রামাজি নামে কোনো এক সাধু এসে বসবাস শুরু করেন। মন্দির চত্বরে ঘটের আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে নিত্য পূজার্চনা চালান। তাঁব তিরোধানের পরে চেঙ্গাইল এলাকার এক চক্রবর্তী পরিবাবের ব্রাহ্মণ আসেন পূজা কবতে। তাঁর মৃত্যুর পর বেশ কিছু বছর শ্মশান ছিল নিস্তব্ধ। মানুষের বসবাস বাড়লেও শ্মশানে দূব থেকে মায়ের উদ্দেশে প্রণাম জানাত পথের যাত্রী মানুষেরা। তবে স্থানীয় দাস পরিবারের মানুষরা মন্দির দেখভাল করতেন। গ্রামের মানুষরাও চাইছিলেন একজন স্থায়ী পূজাবী এসে মায়ের পূজার্চনা করুক।

এই সময় এখন থেকে প্রায় শতাধিক বছর পূর্বে পানপুর এলাকার হরিশদাদপুর গ্রাম থেকে কালীনাথ আচার্য নামে এক ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এখানে আসেন। দাস পবিবারের উপেন দাস তাঁর সাথে যোগাযোগ করেন। কালীনাথের বংশধররা আজও মায়ের মন্দিরের বংশানুক্রমিক পূজারী। বর্তমানে তড়িৎ, দিলীপ, দেবাশিস ও নিমাই ভট্টাচার্যরা পূজা করেন। স্থানীয় পাত্র পরিবার ব্রাহ্মণকে থাকার জন্য বারো কাঠা জায়গা দান করেন।

ইতিমধ্যে বহুবছর অতিক্রান্ত। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী কালে সম্ভবত ১৯৩১/৩২ সালে হাওড়ার

দায়িত্বে তখন ইংরেজ শাসক ডি. ব্যরোজ সাহেব। খলিশানী এলাকার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য উক্ত বসু পরিবারের শিবনাথ বসুর উদ্যোগে হাওড়া থেকে উলুবেড়িয়া বাস রাস্তা কবার চেষ্টা শুরু হয়। তৎকালীন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান পুণ্ডরীকাক্ষ রায় চেয়েছিলেন এই রাস্তা হাওড়া থেকে আমতা পর্যন্ত হোক, কিন্তু ব্যরোজ সাহেব উলুবেড়িয়া পর্যন্ত অনুমোদন করেন। শ্মশানের বুক চিরে খলিশানী গ্রামের উপর দিয়ে চলে গেছে এই রাস্তা। যা পরে বোম্বে রোডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ৬নং জাতীয় সড়ক নামে খ্যাত হয়েছে। এই শিবনাথবাবুই বোম্বে রোড থেকে খলিশানী-রামনগর গ্রামের রাস্তায় ঘেঁস ফেলে ও বাসুদেবপুরের বড় ব্রিজ তৈরি করে গ্রামের মানুষের যাতায়াতের সুবিধা করে দেন। হুগলি ও আমতার আনাজ ব্যবসায়ীরাও পায়ে হেঁটে এপথে আসতেন।

এবারে আমরা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে খলিশানী গ্রামের শ্মশানের আলোচনা করব। দঃপূঃ রেলপথের বাউড়িয়া স্টেশন ছেড়ে কিয়ৎদূর আসার পরে প্রায় এক কিমি বিস্তৃত পূর্বের শ্মশান এখন চারটি শ্মশানে বিভক্ত হয়ে গেছে। জাতীয় সড়কের বাউড়িয়া স্টেশনের দিকে একটি ও অন্য তিনটি খলিশানী-রামনগরের দিকে। রাস্তার ডানদিকে শ্মশানের মধ্যে আছে বিরাট মন্দির ও তার বৃহৎ চত্বর। শ্মশানেই গড়ে উঠেছে খেলার মাঠ, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। এখনো রয়েছে বনজঙ্গল এবং শ্মশানের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী যা এখন ক্যানেল বা খাল। রাস্তার বাঁদিকে গড়ে উঠেছে বাড়ি ও দোকানঘর।

শ্মশান-মন্দির .

মন্দিরটি উলুবেড়িয়া ২নং ব্লকের অধীন খলিশানী মৌজায় অবস্থিত। ডাকঘর পূর্বে পাঁচলা ছিল কিন্তু বর্তমানে বাসুদেবপুর। জে এল নং ৯৬, খতিয়ান নং ১০৯৬, দাগ নং ৫৯৭। আন্দুল-মহিয়াড়ীর জমিদার যদুগোপাল কুণ্ডুরায়চৌধুরী সেটেল্‌মেন্টের সময় নিষ্কর দেবোত্তর সম্পত্তি হিসাবে মন্দির সংলগ্ন শ্মশানটি দান করেন। পাশে শিব মন্দির নির্মিত হয়েছে। একটি গভীর পুকুর ও যাত্রীদের স্নানঘর হয়েছে। উৎসবের সময় দেড়/দুই হাজার যাত্রীদের রান্নার উপযুক্ত ভোগঘর নির্মিত হয়েছে। সংলগ্ন এলাকাটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ভিতরে আছে প্রায় তিন শতাধিক বছরের প্রাচীন নিমগাছ। মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীকে ঘিরে গভীর পুষ্করিণী গড়ে উঠেছে। স্থানীয় দাস পরিবার আজও মন্দির পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন।

মন্দিরে মায়ের মৃন্ময় দক্ষিণাকালী মূর্তি। এই মূর্তিটি পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে মূল মন্দির গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তবে পূর্বের রক্ষিত দেবীঘটটি আজও পূজিত হয়ে আসছে। নদীগর্ভের পুকুর থেকে পাওয়া গেছে একটি পাথরের দণ্ডায়মান বিষ্ণুমূর্তি। দু'পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। প্রাপ্তমূর্তি থেকে অনুমান করা যায় এখানে এককালে মন্দির ছিল। প্রত্যহ প্রথমে বিষ্ণুর পূজার পর কালীমায়ের পূজা শুরু হয়। দেবী মায়ের মূর্তিটি উচ্চতায় প্রায় ছয়ফুট, চারি হাত বিশিষ্ট বামহস্তে খড়্গ ও দক্ষিণহস্তে বরাভয়, নীচের বামহস্তে নরমুণ্ড ও দক্ষিণহস্ত গ্রহণের ভঙ্গিতে। প্রথম মূর্তি নির্মাণ থেকে শুরু করে আজও আমতা এলাকার এক পটুয়া বংশের শিল্পীরা এই মূর্তি নির্মাণ করে আসছেন।

প্রত্যেক শনি ও মঙ্গলবার পাঁঠাবলি হয় মায়ের কাছে। প্রতি অমাবস্যায় নিশিরাতে পূজা ও ভোগ-আরতি হয়। বহু দূর দেশ থেকে ভক্ত ও যাত্রীগণ আসেন। দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পেতে স্বপ্নাদেশে ওষুধ পাবার আশায় হত্যে দেয় অনেকে। মকর সংক্রান্তি ও কার্তিক মাসের কালীপূজাতে জনসমুদ্রের ঢল নামে। কার্তিক মাসের কালীপূজাতে অন্যান্য স্থানের মতো এই গ্রামেতেও বিরাট প্যান্ডেল ও আলোকসজ্জা সহকারে আট/দশটি কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই শ্মশানকালী মায়ের পূজার পর ফুল নিয়ে গেলে তবে অন্য মূর্তিগুলির পূজা শুরু হয়। প্রায় আশি/নব্বই হাজার দর্শনার্থী আসেন। বারো বছব অন্তর এই মৃন্ময়মূর্তি বিসর্জন দিয়ে নতুন মূর্তি বসানো হয়। এই উপলক্ষ্যে যে উৎসব চলে সেখানেও প্রায় আঠারো/কুড়ি হাজাব দর্শনার্থী আসেন। ১৯৩৬ সালে সেটেল্‌মেন্টের সময়েও কড়ি-বরগা ও টালির ছাদ যুক্ত মন্দির ছিল। পরে জনসাধারণেব অর্থ সাহায্যে পাথরের কারুকার্য শোভিত ছাদসহ ইষ্টক দ্বারা মন্দির নির্মিত হয়েছে। মন্দিব চত্বরে বকুলগাছতলায় ঘড়া পোঁতা আছে বিশ্বাসে খোঁড়াখুড়ি শুরু হয়েছিল, কিন্তু একটি বিষধব সাপ বেব হওয়ায় দেবী ক্রুদ্ধ হতে পারেন ভেবে সে কাজ বন্ধ করে দেওযা হয়েছিল। এলাকাব নব বিবাহিত দম্পতিরা প্রথমে মন্দিরে প্রণাম করে তবে স্বগৃহে প্রবেশ করেন।

জাগ্রত শ্মশানদেবীর মাহাত্ম্য :

বসু পরিবারেব দ্বারিকানাথ বসু শক্তিশালী ব্রহ্মজ্ঞ গুরুলাভের আশায় মন্দিরে মায়েব নিকট চোখের জলে প্রার্থনা করেন। বলেন, যদি তোমাব কৃপা হয় এবং আমি গুরুলাভে সমর্থ হই তাহলে এখানে এক গণ্ডী কেটে দিলাম যেন এর ভেতব তোমার পায়ের ফুল পড়ে থাকে। ভোর রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন মা তাঁকে বলছেন, 'তাড়াতাড়ি ওঠ আমার ফুল নিবি না, বাসঘবি গিয়ে এখনই মন্দির পরিষ্কার কবে ফেলবে যে।' ঘুম ভেঙে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছোটেন মন্দিরেব উদ্দেশ্যে। মন্দিরের ভেতর থেকে ফুল সংগ্রহ করে বাইবে এসে দেখেন বাসঘরি তখন প্রবেশ করছেন। পরে তিনি সত্যই পাঞ্জাব থেকে আগত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এক জ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষকে গুরুরূপে লাভ কবেন। তিনিও কিছুদিন এই গ্রামে এসেছিলেন।

পুরাতন নিমগাছ :

মন্দির প্রাঙ্গণে ৩০০ বছবের অধিক একটি প্রাচীন নিমগাছের গোড়াটিকে পরবর্তী সময়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয় যাত্রীদের বসার সুবিধার জন্য। ২০০০ সালে ঝড় বৃষ্টির এক দিনে প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হয় এই নিমগাছে। তখন গ্রামের অনেক কিশোর বল খেলছিল। মুষলধারে বৃষ্টি নামতেই নিমগাছের অদূরে আটচালায় আশ্রয় নেয়। বজ্রাঘাত নিমগাছে না হয়ে নীচে পড়লে অনেকে মারা যেতে পারত। বজ্রাঘাত নিমগাছটি দু'ফাঁক করে দিয়ে নীচের বেদি ভেঙে বেরিয়ে যায়। তা সত্ত্বেও গাছটি মরেনি আজও জীবন্ত।

শিবমন্দির :

কালীমন্দিরের পাশে শিবমন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন পূজারী বংশের আর এক সন্তান তন্ত্রসাধক যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। আচার্য বংশ পরে ভট্টাচার্য হয়েছিলেন। কেউ কেউ আবার সান্যাল উপাধিও

গ্রহণ করেন। উনি চব্বিশ পরগনার বিড়লাপুর আশ্রমে থাকতেন, আবার এখানে আসতেন।

ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্যের গল্প :

পূর্বে বহু সময় ঘন বন জঙ্গল ঘেরা শ্মশানের পাশ দিয়ে যাতায়াত করার সময় লোকে হাঁড়ি-কলসীর ঠোকাঠুকি দেখেছে। দেখেছে হাঁড়ি-কলসী আপনা আপনি নড়াচড়া করতে। তন্ত্রসাধক যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলতেন নিমগাছে ব্রহ্মদৈত্য আছে। তিনি দেখেছেন গভীর রাত্রে একটা জ্যোতি নিমগাছ থেকে নেমে মন্দিরে ঢুকতে। তারপরে আশ্চর্যজনকভাবে মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি সহ আরতির আওয়াজ উঠত। একবার চোর ডাকাতের উপদ্রবের জন্য আর.জি.পার্টির লোকেরা রাত-পাহারা দিতে গিয়ে নিমগাছের কাছে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুম ভেঙে তারা দেখে পুরো দলটাই অনতিদূরে মন্দির চত্বরে শুয়ে আছে। শোনা যায় ভূতেদের কাছারিও বসতো।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গোপন ঘাঁটিতে এসেছিলেন নিবেদিতা :

এখানকার বসুবাড়ির এক উজ্জ্বল নক্ষত্র সতীশচন্দ্র বসু যিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ঐতিহাসিক 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৮ সালে যখন ইংরেজ সরকার অনুশীলন সমিতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তখন তিনি এখানের গ্রামে বসুবাটিতে লুকিয়ে থাকতেন। আরও উল্লেখযোগ্য যে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী যোগাযোগ ব্যবস্থাহীন এই জঙ্গলাকীর্ণ-স্থানে লুকোতে আসতেন। এটি স্বাধীনতা সংগ্রামীদেব গোপন ঘাঁটি ছিল। দু'তিন দিনের জন্য সতীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে এসেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। এ থেকে তাঁর সঙ্গে স্বাধীনতাসংগ্রামীদের যে নিবিড় যোগ ছিল তা প্রমাণিত হয়।

খলিশানী-রামনগর শ্মশান :

এটি লম্বায় বিস্তৃত শ্মশানের একটি। বর্তমানে গ্রামের মানুষের দানে সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়েছে। হয়েছে লোহার ফ্রেমের চুল্লি, তাকে গোলাকার মনোরম এক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এখানেই মৃতদেহ সৎকার করা হয়। আছে মৃতদেহে ঘি মাখানো, স্নান করানো বা নববস্ত্র পরানো ইত্যাদি আনুসঙ্গিক ক্রিয়াব জন্য থাম দিয়ে গঠিত ছাদ নির্মিত ঘর। নীচে সিমেন্টের বেদি—আগত শ্মশানযাত্রী ও হরিনামের দলের বসার জন্য। মনোরম কেয়ারী করা ফুলের ও রঙ-বেরঙের গাছের বাগান। যা নিয়মিত পরিচর্যা করা হয় স্থানীয় কয়েকজন যুবকের দায়িত্বে। ২০০৩ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর এই শ্মশান একেবারে নতুনভাবে সজ্জিত।

বৃষকাঠ :

খলিশানী-রামনগরেব এই শ্মশানে মাস কয়েক পূর্বেও ছিল দুটি বৃষকাঠ। স্থানীয় সরকার পরিবারের প্রায় ৬৭ বছর পূর্বে মৃত গোপালচন্দ্র সরকারের এবং প্রায় ৫০ বছর পূর্বে মৃত তাঁরই স্ত্রী ক্ষীরোদাবালা সরকারের স্মরণে তৈরি দুটি বৃষকাঠ ছিল। বর্তমান বৃষকাঠ দুটি শ্মশান সংলগ্ন রাস্তার ধারে হওয়ায় বালির লরির ধাক্কায় তা ডোবায় পড়ে যায়। তবে তাকে তুলে যাতে আবার পূর্বের স্থানে রাখা যায় সরকার পরিবারের লোকেরা তা চেষ্টা করবেন।

খলিশানী শ্মশান :

মন্দিরেব প্রবেশ পথের ডানদিকে একটি শ্মশান আছে। সেখানেও লোহার ফ্রেমের চুল্লি বসানো

হয়েছে। একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে সিমেন্টের বেদি বানানো হয়েছে। ফুলের বাগান দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানোর জন্য স্থানীয় যুবকেরা পরিশ্রম করছেন।

গৌরী নদী :

বহু প্রধান নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে শাখা নদীগুলিব কখনও সক্রিয় আবার কখনও পরিত্যক্ত হওয়ার ঘটনা ইতিহাসে দেখা গেছে। ভাগীরথী-হুগলি নদীর প্রবাহ পথের এরকম পাববর্তনের কথা জানা যায় নদী গবেষক হান্টার, উইলসন, রিক্স ও আরও অনেকের সমীক্ষামূলক লেখা থেকে। যেমন পশ্চিমে সরস্বতী নদী সাঁকরাইল ভাটিতে হুগলি নদীর বর্তমান প্রবাহ পথে এসে মিশত। আদিগঙ্গার পথ ও ভাগীরথী-হুগলি নদীর প্রবাহ পথ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায় এঁদের বা পরবর্তী গবেষকদের কাছ থেকে। কিন্তু চেঙ্গাইলের কাছে ভাগীরথী-হুগলির ভাটিতে যে এককালে গৌরী নদী মিশত তার কথা কেউ বলেন নি। অথচ খলিশানীর উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বর্তমানের এই খালটি আমতা ছুঁয়ে হুগলি জেলার দিকে ধাবিত। আমতায় দামোদর নদের কাছে বেতাই বন্দর নামে একটি স্থান আছে। তবে এটি যে নদী ছিল তার অনেক প্রমাণ আছে। তিনশো বছরের অধিক সময় পূর্বেই এ নদী মজে যাওয়ায় গবেষকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। নদী গবেষকরা মনে করেন নদীর প্রবাহ পথের দুদিকে প্রচুর শ্মশান দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কৃত্রিমভাবে কাটা খালেব পাশে তা দেখতে পাওয়া যায় না। খলিশানীব গৌরীনদীর দু'পাশে ঘন বনজঙ্গল ও প্রচুর শ্মশান এবং এ সমস্ত শ্মশানের অস্তিত্ব তিনশো বছরের অধিক। শ্মশানের ওপর মন্দিরের পিছনের পুকুর কাটানো নয়। নদীগর্ভ ঘিরেই পুকুর গড়ে উঠেছে এবং এব গভীরতাও বেশি। অনেক বছর পূর্বে এখানে জাহাজের ভাঙা অংশ উঠেছিল। এপথে হুগলি ও আমতা থেকে বাণিজ্যতরী বাউড়িয়া, চেঙ্গাইল, উলুবেড়িয়া পর্যন্ত যাতায়াত করত। বর্তমান রাস্তা তৈরি হওয়ার পূর্বে গ্রামগুলির নামও নদীকে ঘিরে ছিল যেমন চড়াগ্রাম, চড়া পাঁচলা, চড়া রামনগর, চড়া শুঁড়িখালি ইত্যাদি। নদীতে চর পড়ে যাওয়ার পর নিশ্চয় গ্রামগুলির নামে 'চড়া' কথাটি লোকমুখে যুক্ত হয়ে গেছে। এই নদী নতুন করে গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

বিদ্যালয় :

এই গ্রামের দীর্ঘ লম্বা শ্মশানের উপর গড়ে উঠেছে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। নাম সত্যময়ী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্থানীয় বেচু কর-এর স্ত্রী শ্রীমতী সত্যময়ী কর নিজের আর্থিক সহায়তায় স্বাধীনতার পূর্বে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবার এর অনতিদূরে শ্মশানের উপরে ১৯৫৪ সালে গড়ে ওঠে খলিশানী জাতীয় বিদ্যাপীঠ। এই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন নরেন্দ্রনাথ পাত্র।

ফুটবল মাঠ :

এই শ্মশানের বুকে গড়ে উঠেছে দুটি ফুটবল ক্লাব। ছোটদের ছাত্র সংঘ ক্লাব এবং বড়দের মহাকালী ফুটবল ক্লাব। যেখানে নিয়মিত ফুটবল খেলা হয় এবং বৎসরান্তে প্রতিযোগিতা চলে। এখানে শৈলেন মান্না, সুব্রত ভট্টাচার্য প্রমুখ বিখ্যাত ফুটবল ব্যক্তিত্বরা আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন।

পরিশেষে নিঃসন্দেহে একথা বলা যায়, গৌরী নদীর দু'পাশে বহুদূর পর্যন্ত আরও অনেক ছোট ছোট শ্মশান আছে। তবে খলিশানীর শ্মশান ঘিরে অনেক ইতিহাস একে মর্যাদাসম্পন্ন করেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গোপন ঘাঁটি, গৌরী নদীর বয়ে যাওয়া, ঘনজঙ্গলের মাঝে প্রাচীন মন্দির একে ইতিহাসের পাতায় উল্লেখের দাবি রাখে।

খলিশানী-রামনগরের শ্মশান চুল্লী, ছবি তপন কুমার সেন

পরশুরামের শেষ ইচ্ছাপত্র

রাজশেখর বসু বা পরশুরামের মহাপ্রয়াণের পর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'দেশ' পত্রিকায় এক স্মৃতিচারণ মূলক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—রাজশেখর ছিলেন সত্যের পূজারী এবং নিয়ম রাজত্বের অনুবর্তী।

তিনি তাঁর দৌহিত্রের উদ্দেশ্যে রচিত শেষ ইচ্ছাপত্রে লিখেছিলেন—'আমার মৃত্যুর পর সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছেন লিখবে না। কারণ মৃত্যুর আগে অজ্ঞান হবই। আর 'গঙ্গালাভের'ই বা অর্থ কী? তার চেয়ে লিখো 'প্রয়াত হইয়াছেন।' আবার 'ভাগ্যহীন' শব্দটির ব্যবহারও অযৌক্তিক। বৃদ্ধ বয়সে কারও মৃত্যু হলে যারা রয়ে গেল তাদের 'ভাগ্যহীন' আখ্যা দেওয়া যায় কি? তার চেয়ে বরং লিখো 'বিনীত'।

সূত্র ঃ নামাবলীর খাতা / শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়।

□ লেখক পরিচিতি : লেখক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের মনোনীত সদস্য। লোক সংস্কৃতি চর্চা নেশা এবং একজন লোকসংগীত শিল্পী। ব্যক্তিগত জীবনে গ্রন্থাগারিক এবং 'গ্রামীণ পুঁথি' নামে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদক।

আরামবাগ মহকুমার শ্মশান, গোরস্থান ও ভাগাড় পরিচয়

অসীমকুমার রায়

আরামবাগ মহকুমা প্রাচীনত্বে ঐতিহাসিক। এই মহকুমায় জন্মেছিলেন ভারতেব নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়। কিংবদন্তিতে জানা যায় এই মহকুমাব পূর্বে নাম ছিল জাহানাবাদ। নির্দিষ্ট প্রমাণাভাব হলেও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ফকির জাহানশাহের দেহরক্ষা করবার পব তাঁর অনুগত ভক্ত শিষ্যগণ উক্ত স্থানের নাম তাঁর নামানুসারে জাহানাবাদ বেখেছিলেন বলে জানা যায়। আবার সম্রাট সাজাহানের নামানুসারে জাহানাবাদ রেখেছিলেন বলে শোনা যায়। 'আকবরনামায়' বহু পাণ্ডুলিপিতে জাহানআবাদ উল্লেখ আছে। এই মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে শ্মশান কবর ও ভাগাড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই মহকুমা আবামবাগ, গোঘাট, খানাকুল ও পুড়শুঁড়া থানা নিয়ে গড়ে উঠেছে। এই মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চল এবং সেইসব অঞ্চলের শ্মশান, কবর ও ভাগাড় নিয়ে বর্তমান সমাজের প্রেক্ষিতে কিছু আলোচনাব অবতাবণা কবা হল।

আরামবাগ পৌরসভা : আরামবাগ মহকুমায় আরামবাগ পৌরসভা একটি প্রাচীন স্থান। বর্ধমান থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত প্রাচীন বাদশাহী সড়কের পার্শ্বে অবস্থানেব দরুন একসময় এর গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল। নদীর ধ্বংসলীলা পুরাতন স্মৃতি অবলুপ্তির জন্য মূলত দায়ী। নদীব পশ্চিমে কালীপুরে ও দক্ষিণ-পূর্বে পারুলে এখন নীলের কারখানার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই পৌরসভায় পাঁড়েরঘাট শ্মশান ও হাসপাতাল মোড়ের সন্নিকটে বিরাট কবরস্থান অতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া গার্লস কলেজের সামনে ঈদ্‌গাহ কবরস্থান রয়েছে।

পাঁড়েরঘাট শ্মশান : আরামবাগের প্রায় ৯০শতাংশ শব এখানে দাহ কবা হয়। এটি পৌরসভার একটি দীর্ঘদিনেব শ্মশান আর হাসপাতাল মোড়ের সন্নিকটে কবরটি স্থানীয় পৌর মুসলিম নাগরিকদের একমাত্র গোরস্থান।

গৌরহাটির মীরপাড়া, তাতারচক, বেউড়গ্রাম শ্মশান ও কাপশীট ভাগাড় : আরামবাগ থানার অধীনে এই পঞ্চায়েত রতনপুর, গোপীনাথপুর, হেলাব চক, তাতারচক, কাপশীট, গৌড়া, খালেড়, পৈসাড়া, ডিহিবাগনান, মীরপাড়া, পাড়াবাগনান, বেউড়গ্রাম, সুভরপুর, সাপড়াজোল ও ভবানীপুর গ্রাম নিয়ে গঠিত। এই গ্রামের বেশিরভাগ শ্মশানই সাধারণত এলাকার বিভিন্ন পুকুরপাড়ে গড়ে উঠেছে। বেউড়গ্রাম, মীরপাড়া, তাতারচক ও পাড়াবাগনান এখানকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কবর। এই অঞ্চলে কাপশীট গ্রামে ঢুকবার মুখে একটি ভাগাড় আছে।

গৌরহাটির রাধারপাড় মহাশ্মশান, চাঁদুপাতার বন ও ফতের চক কবর : গৌরহাটি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত রতনপুর আমতলা থেকে কয়েদতলা পর্যন্ত গ্রামটি উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত এবং ফতের চক থেকে শাপথের মাঠ পর্যন্ত পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যাওয়ার জন্য লালমাটি নির্মিত রাস্তার শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে কিছু শ্মশান যেমন নির্দিষ্ট তেমনি অনেক পরিবারের বাড়ির লাগোয়া জমিতেও শবদাহ করা হয়। এ অঞ্চলে নির্দিষ্ট কতকগুলি গোরস্থান ছাড়াও বাড়ির সংলগ্ন জমিতে কবর দেওয়া হয়। গৌরহাটি মৌজায় গৌরহাটি, বাসুদেবপুর, ফতের চক, যাদববাটি, বেহালা বাজার ও বারোয়ারি বৃন্দাবন বাজারের মধ্যে

কতকগুলি শ্মশান তাৎপর্যবহ।

রাধারপাড় শ্মশানে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। এই শ্মশান লাগোয়া কৃষ্ণচন্দ্র সাধুবাবার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে বর্তমানে গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের পুত্রগণ পূজারি। এই শ্মশানে নাকি এখনও অধিক রাত্রে একা কেউ যেতে পারে না। প্রায় শতাধিক বৎসরের পুরানো এই শ্মশানে নাকি সতীদাহ চলত রমরমিয়ে। এই শ্মশানে এক পক্ষে নাকি তিনজন মানুষ দাহ হয়। এই বিষয়টি স্থানীয় মানুষের প্রত্যক্ষগোচর। তাই এই শ্মশানকে মহাশ্মশানও বলা হয়।

এই অঞ্চলের গৌরহাটি হরদাস ইনস্টিটিউশনের সংলগ্ন বনকে চাঁদুপাতার বন বলে। শোনা যায় এই বনে যদি কোনো ব্যক্তি জীবন্ত গরুকে হত্যা করে রান্না করে গভীর রাতে বড় হাঁড়ি করে রেখে আসে তবে ঐ রাতেই নাকি তার বাড়িতে ৩৬ ঘড়া সোনার কলস পৌঁছে যেত। এই স্কুলের মাঠে একটি পীরের থানও আছে। স্থানীয় মানুষের কাছে এটি জাগ্রত পীর। এছাড়া ষষ্ঠের পাড়, সিনেমাতলার মহাশ্মশান, পাঁচপাল্লার পাড় শ্মশান, হাটপুকুর পাড় শ্মশান ও বোদপুকুর পাড়ের শ্মশানটি উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলে মুসলিম সমাজের অতি উল্লেখযোগ্য দুটি গোরস্থান ফতের চক ও দক্ষিণ পাড়ায় অবস্থিত।

সালেপুরের দাদুর ঘাট, যুগীদহ, ঘোসিমঘাট, মানিকপাট ও রাইপুর শ্মশান : সালেপুর ১নং ও ২নং পঞ্চায়েত মিলে গ্রামটি বেশ সমৃদ্ধ। রাজা শালিবাহনের রাজত্বকালীন গড় এখনও পরিদৃশ্যমান। শোনা যায় রামনগরের নিকট শ্যামবাটি গ্রামে নাকি আয়ুবল ও বাহুবল রাজার বাস্তুভূমি ছিল। এছাড়া মোবারকপুরের ইষ্টক নির্মিত জরিপ স্তম্ভটি উল্লেখযোগ্য। পার্বতীচক, মোবারকপুর, রামনগর লালুর চক, সালেপুর, রাইপুর, মানিকপাট, শেখপুর, ডহরকুণ্ডু, বেড়াবেড়ে, বসন্তবাটি, রাংতাখালি, মহিষগোট, গুজরাট চুয়াডাঙা এই অঞ্চলের বিশেষ গ্রাম।

এই অ'ঞ্চলের অধিকাংশ শ্মশানই দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে অবস্থিত। এখানকার রামনগর গ্রামে ছটি শ্মশান। সালেপুর রামনগর গ্রামের সীমান্তে প্রাচীন বটবৃক্ষতলে বিখ্যাত দাদুরঘাট বা কদমতলার শ্মশান বিখ্যাত। সালেপুর গ্রামের যুগীদহ বাঁধের ধারে যুগীদহ শ্মশান আছে। এর পাশেই রাইপুরের শ্মশান আবার দক্ষিণদিকে মানিকপাটের শ্মশান অবস্থিত। মানিকপাটের দক্ষিণ অংশে যেখানে দ্বারকেশ্বর নদী দুটি শাখায় ভাগ হয়ে গেছে তার কাছাকাছি অঞ্চলে ঘোসিমঘাটের শ্মশান অতি উল্লেখযোগ্য। তবে মোবারকপুর গ্রামে শ্মশান ও কবরস্থান পাশাপাশি অবস্থিত। সালেপুর গ্রামের দক্ষিণপূর্বদিকে একটি পুকুরের পাশে দাস পাড়ার শ্মশান আছে। সালেপুর গ্রামের পূর্বদিকে আরামবাগ বন্দর বাসরুটের কাছাকাছি একটি বড় কবরস্থান রয়েছে।

বাতানলের তিলুয়া-ভালিয়ার (তেলোভেলোর) শ্মশান ও কবর : আরামবাগ থানার চক্‌জালান, চকমদন, রুহিৎচক, নারায়ণপুর, বেহালা, ষষ্ঠীপুর, চক্‌ফাজিল, রসুলপুর, সেখপুর, চক্ আহমদ, চক্‌ [illegible]জী, কাঁচগোড়, ভালিয়া, তিলুয়া, যশাপুর, বদরপুর, বাতানল, সোমসপুর গ্রামগুলি বাতানল পঞ্চায়েতের অধীন। এই অঞ্চলে কৃষিকাজ ছাড়া তাঁতশিল্প, চর্মশিল্প বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। 'চললো গৌর বাতানল' কথাটি জনশ্রুতিতে আছে। শোনা যায় মহাপ্রভু চৈতন্য নাকি নীলাচলে যাওয়ার পথে বাতানলের গ্রামে একরাত্রি কাটিয়েছিলেন।

তিলুয়া-ভালিয়ার জলার মাঠের মধ্যে শ্মশান অতি উল্লেখযোগ্য। এখানে নাকি যুগাবতার

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পত্নী সারদা-মা একবার বিপদাপন্ন হয়েছিলেন। জনশ্রুতিতে আছে বিখ্যাত ডাকাত ভীম সরদারের বাড়ি ছিল ভালিয়া গ্রামে। তাঁর বংশধরগণ এখনও নিয়মিতরূপে প্রতিবৎসর কার্তিকমাসে কালীপূজা করেন। তিলুয়া-ভালিয়ার (তেলো-ভেলোর) জলার বিখ্যাত ডাকাতে কালীমন্দির আনুমানিক ১৭০০ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এটা ডাকাতদের প্রতিষ্ঠিত নয়। ভালিয়া গ্রামের রমাকান্ত সরকার মহাশয়ের জামাতা (ইনি অপুত্রক ছিলেন এবং ভালিয়া গ্রামে শ্বশুরালয়ে বাস করতেন) একজন তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। শোনা যায় তিনি নাকি তিলুয়া-ভালিয়ার জলার মাঠের মধ্যে শ্মশানে কূর্মপৃষ্ঠস্থানে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্থানটি সেই সময় বাবলা গাছের বন ও প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছের দ্বারা পরিবৃত ছিল। সন্ধ্যার পর নাকি কোনো ব্যক্তি এই জায়গায় আসতেন না। গভীর রাত্রে ডাকাতেরা ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে শ্মশানকালীর পূজা করতেন বলে স্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে তেলো-ভেলোর ডাকাতে কালী বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে এটা তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠিত শ্মশানকালী।

তবে এই অঞ্চলে চক আহমদ, চক বাজী, বদরপুর, চকজালান ও চক্‌মদনে ছোটখাটো কিছু কবরও আছে।

মলয়পুরের নেওটার শ্মশান, ভাগাড় ও চকবেশিয়া, চৌধুরিপাড়ার কবর : আরামবাগ থানার মলযপুর গ্রাম পঞ্চায়েত মলয়পুব, বালিয়া, বাছানরী, হরিপুর, ফতেপুর, চক্‌বেশিয়া, বাসনারপাড়, চক্‌বেহালা, তালা, গোয়াল, বনমালীপুর, কেশবপুর ও চকানল গ্রামগুলি নিয়ে গড়ে উঠেছে। নেওটাব শ্মশান এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় শ্মশান। এখানে বেশিরভাগ শবদাহ হয়। মলয়পুরের নতুন বাজারের শ্মশানটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চক্‌বেশিয়া, চৌধুরিপাড়াতে নির্দিষ্ট কবব আছে। এ অঞ্চলে নেওটার ভাগাড়ে জীবজন্তুর মরা দেহ ফেলা হয়।

মাধবপুরের কানপুর, নিমতলা শ্মশান এবং চাঁদ চক, মহিষগোড়, বাসুলিচক, এলমা ও আদমপুরের কবর : আরামবাগ থানার মাধবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত মাধবপুর, সেলালপুর, পাণ্ডুগ্রাম, রানহাট, জযসীন্‌চক, কানপুর, ষাটপুর, সোনাগাছি, পয়রা, কৃষ্ণবাটি, চাঁদচক, অজয়পুর, মহিষগোড়, বাসুলিচক, চাঁদসীট, কৃষ্ণবল্লভপুর, হামিরবাটি, জ্যোৎরাম, এলমা, জয়সিংহচক, ধ্যানাগাছি ও ধরমপোতা গ্রামগুলি নিয়ে গড়ে উঠেছে।

এই অঞ্চলের শ্মশান বলতে কানপুর স্কুলের পাশে এবং নিমতলার শ্মশান এবং বিক্ষিপ্তভাবে ২৪টি শ্মশান ছড়িয়ে আছে। এই অঞ্চলে চাঁদচক, মহিষগোড়, বাসুলিচক, এলমা, আদমপুর ও কৃষ্ণবল্লভপুরের কবর বিখ্যাত। এই অঞ্চলেই বিখ্যাত রণজিৎ রায়ের দিঘি এখনও বিদ্যমান। এই অঞ্চলে বেশ কিছু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। এখানকার কনকেশ্বর শিব বিশেষ প্রসিদ্ধ।

হরিণখোলার শ্মশান ও কবর : আরামবাগ থানার হরিণখোলা ১নং ও ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামগুলি হল অসুয়াকুণ্ড, আসানপুর, মজফফরপুর, ছাতরা, কৃষ্ণপুর, শিবপুর, আদকপুর, মধুরপুর, সরাইঘাটা, সারাবাটি, চকসরাই, পানপীট, সাহাপুর, সাহাবাগ, রসুলপুর, তাড়াল, হরাদিত্য, শ্যামগ্রাম, অরুণবেড়ে, গোলানিচক, সুলতানপুর, আমগ্রাম, তাজপুর, বিরাটি, কাঁটাবনী ও পিরিজপুর।

এই অঞ্চলে তেমন কোনো বিখ্যাত শ্মশান ও কবর মেলেনা। বেশিরভাগই শ্মশান, কবর যেখানে সেখানে রয়েছে। তবে সরাইঘাটা, সাহাপুর, কাঁটাবনী ও হরাদিত্যর কাছে শ্মশানগুলি বিশেষ পরিচিত। এখানকার আমগ্রাম, তাজপুর, মজফফরপুর ও সুলতানপুরে কিছু কিছু কবর আছে। তবে ভাগাড় বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না।

আরাণ্ডীর শীতলপুর, নারায়ণপুর, খেদাইল, প্রতাপনগরের শ্মশান এবং সাতমামা, হিয়াৎপুর, পুঁড়ার কবর : আরামবাগ থানার আরাণ্ডী ১ ও ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উল্লেখযোগ্য গ্রামগুলি হল ধামসা, সাতমামা, গৌড়ন, চুনাইট, শীতলপুর, হায়াৎপুর, নারায়ণপুর, প্রতাপনগর, খেদাইল, রাগপুর, পুঁড়া, তিলকচক। এই অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে চর্মশিল্প, বংশ শিল্প, লৌহ শিল্প, মৃৎশিল্প ও কাষ্ঠশিল্পের জন্য বিখ্যাত। প্রতাপনগরের বদর সাহেবের মেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এখানকার শীতলপুর, হিয়াৎপুর, তিলকচক, নারায়ণপুর, খেদাইল, প্রতাপনগরে বিশেষ শ্মশান দেখা যায়। এই অঞ্চলের সাতমামা, গৌড়ন, হিয়াৎপুর, নারায়ণপুর ও পুঁড়াতে কবর দেখা যায়।

মায়াপুরের বড়বাগান, ঘোষেরবেড় শ্মশান ও বলুণ্ডীর কবর : আরামবাগ থানার মায়াপুর ১ ও ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উল্লেখযোগ্য গ্রামগুলি হল মুথাডাঙা, মায়াপুর, কালাদিঘি, জয়রামপুর, কোড়লা, খামারবেড়, কুলবায়ড়া, তেঘরী, রঘুনাথপুর, কাষ্ঠদহি, বামসা-আমরেল, বলরামপুর, ডিহিবায়ড়া, বেড়বাড়ি, রাধখাস, গোপীনাথপুর, কেলেদানা, পাহাড়পুর, আদমবাঁধ, কোড়োলা ও বলুণ্ডীগ্রাম। জনশ্রুতিতে শোনা যায় মায়াপুরে মায়াচণ্ডী নামে কোনো এক দেবীর মূর্তি বহু বৎসর পূর্বে হিন্দুরা পূজা করত। তখন দেবীর মূর্তি নাকি কালোপাথর দিয়ে তৈরি ছিল। দেবীর নামানুসারে এর নাম মায়াপুর হয়। পরে গোঁড়া মুসলমানেরা মায়াচণ্ডীর প্রতিমা ও মন্দির ধ্বংস করে।

ঐতিহ্যপূর্ণ দ্বারকেশ্বর নদী এই অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। আর এই নদীর সাথে কানা দ্বারকেশ্বরের মজে যাওয়া খাল বিভিন্ন গ্রামকে যুক্ত করেছে। এই অঞ্চলে নদীর পাড়েই শ্মশান গড়ে উঠেছে। প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামেই শ্মশান আছে। তবে মায়াপুর ২নং পঞ্চায়েতের জয়রামপুর মৌজায় বড়বাগান ও ঘোষের বেড়ের শ্মশান সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।

বড় বাগানের শ্মশানটি সম্ভবত ১৫/১৬ শতক নাগাদ গড়ে উঠেছে। পূর্বে এখানে বড় জমিদার বাড়ি ছিল বলে জানা যায়। এখানে তখন মজে যাওয়া নদী অনেক বড় ছিল। জলপথও ব্যবহারের যোগ্য ছিল। কিন্তু কোনো এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাড়ির অস্তিত্ব ধূলিসাৎ হয়ে যায়। বর্তমানে এখানেই দাহকার্য সম্পন্ন হয়। এখানেই শ্মশান লাগোয়া একটি ছোট ভাগাড় গড়ে উঠেছে। এই ভাগাড়েই বর্তমানে মৃত গবাদিপশু ও জীবজন্তু ফেলা হয়।

জয়রামপুরের ঘোষেরবেড়ের শ্মশানটি বর্তমানে অতি উল্লেখযোগ্য। জনশ্রুতি আছে এখানে মানুষের জীবিকা ছিল ডাকাতি করা। শোনা যায় ১৮শ শতকে নাকি কোনো এক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে মেরে ডাকাতেরা সর্বস্ব লুঠ করে নেয়। মৃত্যুকালে ঐ ব্যক্তি সবংশে নিধন হওয়ার অভিশাপ দেন। মহামারীতে এই ডাকাত বংশের সব মারা যায়। আর তখন থেকে এটি মহাশ্মশানের রূপ নেয়। এখনও চাঁদনি রাতে অশরীরী আত্মার অস্তিত্ব অনুভূত হয়। এখানে মানুষের হাত, পা কেটে গেলে নাকি সেই ঘা সহজে সারে না। বরং পচনক্রিয়া শুরু হয়। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য

কবরের মধ্যে বলুণ্ডী গ্রামের কবরটি বিখ্যাত। এই অঞ্চল মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ায় কবরের সংখ্যা বেশি। এখানকার গ্রাম রঘুনাথপুর, কুলবাযড়া, কাষ্ঠদাহ, মনসাডাঙা, কালাদানা, পাহাড়পুর, ভগবানপুর, রায়খাস, ইছাপুর, বামসা-আমরেল শ্মশান ও কবর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই অঞ্চলের জয়রামপুর মৌজায় জলা নামক জায়গাটিতে ভাগাড় আছে। তবে জনবসতির আধিক্যের কারণে ভাগাড়গুলি এখন বিলুপ্ত প্রায়।

তিরোলের শ্মশান ও কবর : আরামবাগ থানার তিরোল গ্রাম পঞ্চায়েতের গোলতা, বড়ুই, চণ্ডীবাটি, পুঁইন, তিরোল, মইগ্রাম, মমিনপুর, ভাবাপুর, পারআদক, কীর্তিচন্দ্রপুর, মন্দিবা, দাদনপুর, ইয়াদপুর, ডোঙাবাতান, বোড়া ও গোলতা গ্রাম নিয়ে গঠিত। বিখ্যাত ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'জাল প্রতাপচাঁদ' কাহিনীর নায়ক মনসারাম এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। পাগলা রোগের জন্য তিরোল গ্রামের কালীমাতার বালা প্রসিদ্ধ। শোনা যায় প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে এই গ্রামের ত্রিলোচন বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তাব এক সন্ন্যাসী ভাইপোব কাছ থেকে কালীমাতাকে পান। তার মৃত্যুর পব তার পুত্র মুক্তাবাম চক্রবর্তী কালীমাতার সেবক নিযুক্ত হন। মুক্তারাম স্বপ্নে পাগল রোগ আরোগ্য করার জন্য বালা পরানোর আদেশ পান। সকল ধর্মেব লোক এখানে বালা পবতে আসেন।

পুঁইন, মইগ্রাম, দাদনপুরে, ইয়াদপুর কবব দেখা যায়। এছাড়া চণ্ডীবাটি, কীর্তিচন্দ্রপুর, মন্দিরা, ডোঙাবাতানে শ্মশান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পুঁইন গ্রামে পীরতলায় প্রতি মাঘ মাসে একটি ছোট মেলা হয়।

গোঘাট শিবেনাদার পাড় শ্মশান, যুগীপোতা ও শুড়িপুকুর শ্মশান : গোঘাটের ১নং পঞ্চায়েতের গ্রামগুলি হল কাঁঠালি, বুঁইত্যা, গোপালবাটি, নবাসন, কোমলবাটি, আকদপুব, খানাটি, গোঘাট, শুনিয়া, আমোদপুর, বামনিয়া, কামচে, সানবাদী ও দহিয়াকান্দা। গোঘাট হাটতলার নিকট হাটপুকুর শ্মশান উল্লেখযোগ্য। এখানে দক্ষিণপাড়ার কাযস্থদের মৃতদেহ দাহ করা হয়।

এ অঞ্চলের শিবেনাদার পাড় শ্মশান সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে। শোনা যায় কোনো এক বিয়ের রাত্রে ঢাকুরিযারা নাকি ঢাক বাজানোব পর বাড়ি ফিরছিল। ঐ ঢাকুরিয়াদের সারা রাত ভূতেরা নাকি ঢাক বাজাতে বাধ্য করেছিল। যখন সকাল হয় তখন ঢাকুরিয়ারা বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এছাড়া যুগীপোতা, কালীপোড়ে, শুড়িপুকুর শ্মশান দীর্ঘদিন ধরে আছে। এখানে শুড়িপুকুর কালীমন্দিরটি প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন। এই মন্দিরের পূজারি বাদল পালধি বর্তমান। এইসব শ্মশানে নির্জন দুপুব ও নিশীথে যাওয়া রীতিমত ভয়ের ব্যাপার ছিল।

গোঘাট অঞ্চলের সানবাদী, আমোদপুর, ঘটক, আনজু কবর প্রায় ছ'শো বছরের প্রাচীন। সানবাদী কবরে হাতি ঢোকার মতো তোরণ আছে। ঐ তোরণে ঢোকার আগে যে লিপি উৎকীর্ণ আছে তা সাধাবণত অপরিচিত। এই অঞ্চলে নবাব আলিবর্দী খাঁ নাকি গম্বুজ নির্মাণ করেছিলেন বর্গী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য। এছাড়া ছোটখাটো কবর স্থানও আছে। গোঘাট দক্ষিণপাড়ার ভাগাড় ও মালিপুকুরেব (গোরপুকুর) শ্মশান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া গোঘাট গোস্বামী পাড়ায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মামার বাড়ি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কামারপুকুরের ভুতির খাল শ্মশান ও কবর : গোঘাট ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রাম হল কামারপুকুর, শ্রীপুর, মধুবাটি, দশঘড়া, আনুড়, সাতবেড়ে, তাড়ুই, মুকুন্দপুর ও হরিশোভা। কামারপুকুর এখন

বিশ্বমানবের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। কামারপুকুরে এখনও রামকৃষ্ণের জন্মস্থানের স্মারক ঢেকিচুল্লি, শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, রঘুবীরের মন্দির, রামকৃষ্ণের ভিক্ষেমার বাড়ি, যুগীদের শিবমন্দির, লাহাবাবুদের বাড়ি, পঞ্চচূড়, পাঠশালা, শিবমন্দির উল্লেখযোগ্য।

জনশ্রুতিতে আছে স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব ভূতির খাল শ্মশানে ধ্যানমগ্ন হতেন। এ অঞ্চলে তেঁতুলতলায় কোনো মানুষ সন্ধ্যার সময় যেতে পারত না। আনুড়ের বিশালাক্ষী মাতা এখানকার জাগ্রতা দেবী। ল্যাদনার বটতলাতে ল্যাদনার শ্মশান ছিল। কিন্তু জলের ট্যাংক হওয়ায় সেটি বর্তমানে লুপ্ত। শোনা যায় হরিশোভায় বিখ্যাত মানিক রাজার বসতবাটি ছিল। এখানকার আমবাগান রামকৃষ্ণের শৈশবের লীলাভূমি ছিল। বুধুই মোড়লের শ্মশানটিও উল্লেখযোগ্য। এ অঞ্চলে কবরের সংখ্যা খুবই সীমিত।

এ অঞ্চলের ল্যাদনাতে আগে ভাগাড় ছিল। কামারপুকুর কলেজমোড়ের পাশে কোলেপুকুরের কোলে ভাগাডটি বিখ্যাত।

গড়মান্দারনের শ্মশান ও কবর : গোঘাট থানার এই অঞ্চলটি মহেশপুর, নলডুবি, পশ্চিমপাড়া, বেদমনি, হাজিপুর, দেবখণ্ড, কাজলা, লালুকা, রাঙামাটি, মিঠাইচক, কৃত্তিবাসপুর, ভগবানপুর, সিংড়াপুর, উজলচক, ঘোড়াডুবি, সাঁইত্যা গ্রামগুলি নিয়ে গড়ে উঠেছে। এই পঞ্চায়েতে কবর ও গড় আছে। এখানে দুর্গের চূড়ায় মন্দিব ও কবর ছিল। এখানকাব কাজলা দিঘিতে ছাদারি ও মাদারি নামে দুটি পোষা কুমির ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে এসে কাঁঠালিতে শৈলেশ্বর মন্দির দর্শন করেন। এখানে একটি ডিয়ারপার্কও আছে। এখান থেকে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী লিখেছিলেন। এই অঞ্চলে কববের প্রাধান্য বেশি।

ভাদুর ঘোড়ুই পুকুর পাড়, বল্লভ পুকুরের পাড় ও বড় ডাঙার কবর : গোঘাট থানার ভাদুর পঞ্চায়েত ভাদুর, পোড়াবাগান, ভোলার পাড়, মেথুল, কুলকী গোবিন্দপুর, মীর্গা, চাতরা, মাধবপুর, বোল, ভঞ্জপাড়া নিয়ে গড়ে উঠেছে।

ঘোড়ুই পুকুরপাড়ের শ্মশানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ছোট আহারের শ্মশান, বল্লভপুকুরের পাড় শ্মশান, ভনুয়ের পাড় শ্মশান, ঘোষপুকুরের পাড় শ্মশানে এ অঞ্চলের মৃতদেহ দাহ করা হয়। এই অঞ্চলের শ্মশানগুলি পুকুরের পাড়কেন্দ্রিক গড়ে উঠেছে। গোবিন্দপুরের দক্ষিণ দিকে বড়ডাঙাব কবর বিশেষ পরিচিত। এখানে ছোট আহার নামে একটি ভাগাড় আছে।

শ্যামবাজারের মুখার্জী পাড়া, গোস্বামী পাড়া, শ্যামসায়ের পুকুরের শ্মশান : শ্যামবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতেব পাণ্ডুগ্রাম, মাহমুদপুর, শ্যামবাজার, মুল্লুক, মেমানপুর, ধর্মপুর বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রাম। এই অঞ্চলের মুখার্জী পাড়া শ্মশান, গোস্বামী পাড়া, ভাগের পুকুর শ্মশান, শ্যামসায়ের পুকুরের শ্মশান ও তারাজুউলি খালের পাশের শ্মশান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলের মহাপ্রভু মন্দিরটি প্রায় ৩০০ বছরের প্রাচীন। তবে ভটকানি পুকুরের পাড়ের ভাগাড়টি বেশ বড।

বালীর শ্মশান ও দেওয়ানগঞ্জ মকদমপীরের কবর : বালী গ্রামপঞ্চায়েত দীঘড়া, লক্ষ্মীপুর কানাইপুর, গোয়ালসাড়া, নতুন বাজার, বালী, জগৎপুর, খিলগ্রাম, বল্লভচক, ছোট ডোঙ্গল, কলাগাছিয়া, দেওয়ানগঞ্জ, কৃষ্ণবল্লভপুর, শ্যামবল্লভপুর, দামোদবপুর, উদয়রাজপুর, পেচাড়া, মলিমহল, বালিডাঙা ও জগৎপুর নিয়ে গড়ে উঠেছে। শোনা যায়, বালীতে কালাচাঁদ গোস্বামী

নামে একজন সিদ্ধ পুরুষ বালীগ্রামে বাস করতেন। দেহান্তরের কিছু কাল পরে ইনি বৃন্দাবন ধামে তাহার কোনো এক প্রতিবেশীকে স্বশরীরে দর্শন দেন এবং দন্ত, পাদুকা ও কৌপীন দান করেন। প্রতি বছর তাঁহার সমাধিস্থলে মহোৎসব হয়ে থাকে। এই উৎসবের উচ্ছিষ্ট অংশ ভোজন করে অনেকে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ করেছে। কালাচাঁদ গোস্বামীর মতো আযমখাঁ পীরও বিখ্যাত। জনশ্রুতিতে আছে কালাচাঁদ গোস্বামী ও আযমখাঁ পীর উভয়ই দ্বারকেশ্বর নদীতে ভীষণ বন্যার সময় তুফানে হেঁটে নদী পার হয়ে যেতেন। এখনও এই পীরেব নামে ভক্তবা সিন্নি মানত করে।

বালী শ্মশান সম্বন্ধে আরও শোনা যায় মবণের পরে প্রেতাত্মাদের নাকি দেখা যেত। এছাড়া কৃষ্ণবল্লভপুরের শ্মশানেও অপঘাতে মৃতদের আত্মার অস্তিত্ব অনুভূত হত। প্রতি বছর দ্বারকেশ্বরের পশ্চিমতীরের বাঁধ বন্যায় ভেঙে যেত বলে এক অঙ্গহীন ঠুঁটা ব্যক্তিকে দেবীব নির্দেশে বলি দেওয়া হয়। এ অঞ্চলে দেওয়ানগঞ্জ ও বালীতে মকদমপীরের কবর আছে। কানাইপুকুর গোয়ালসাড়ার সংযোগে একটি ভাগাড় আছে। এছাড়া নতুনবাজার ও গোয়ালসাড়ায় ভাগাড় আছে।

পুড়শুঁড়ার শ্মশান ও কবর : পুড়শুঁড়া থানায ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেকটিতে শ্মশান, কবর ও ভাগাড় ছড়িযে ছিটিয়ে আছে। ভাঙামোড়া পঞ্চায়েতের সোঙালুক, বৈকুণ্ঠপুর, সাহাপুর, বাখরপুর, কৃষ্ণবল্লভপুবের শ্মশান সাধারণভাবে রাস্তার আশেপাশে গড়ে উঠেছে। এখানকার সোঙালুক ও মারকুণ্ডাতে নির্দিষ্ট কবর আছে। কেলেপাড়া পঞ্চায়েতে কুলবাতপুর কৃষ্ণবাটি, বৈঠা, হরিণাখালি ও রণবাগপুরে কিছু কিছু ছোট শ্মশান আছে। তবে কেলেপাড়াব কবরটি বিশেষ পরিচিত। ডিহিবাতপুর পঞ্চায়েতটি ডিহিবাতপুর, দেউলপাড়া, আলাটি, মির্জাপুর, রসুলপুর, পশ্চিমপাড়া, নিমডাঙিগ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে। এখানে শ্মশান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তবে কুলবাতপুরের কবরটি উল্লেখযোগ্য।

পুড়শুঁড়া ১নং ও ২নং পঞ্চায়েতের উল্লেখযোগ্য গ্রামগুলি হল জঙ্গলপাড়া, পুড়শুঁড়া, সোদপুর, মশিনান, বাউতাডা। এই অঞ্চলে পুড়শুঁড়া, সোদপুর, মশিনানের শ্মশানগুলি বিশেষ পরিচিত। ছোট ছোট কবর বিভিন্ন গ্রামে থাকলেও রাউতাড়া মিদ্দেপাড়ার কবরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলে দেউলপাড়ার বুদ্ধমন্দিরটি আট বছর আগে স্বয়ং দালাই-লামা উদ্বোধন করেন। শ্রীরামপুর পঞ্চায়েত সাঁওতা, বাজীপুর, হরিহর, শ্রীরামপুর, ধাপধাড়া, বলরামপুর, পারুল, হাটি, ভুয়েরা, সমজপুর, ভেউটিয়া গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলের শ্রীরামপুর, ভেউটিয়ার শ্মশান গুরুত্বপূর্ণ। এখানকার সাঁওতার কবরটি বিশেষ পরিচিত।

চিলাডাঙি ও শ্যামপুরের শ্মশান ও কবর : পুড়শুঁড়া থানার চিলাডাঙি পঞ্চায়েত যশার, ধনপোতা, চিলাডাঙি, হাড়োয়া, সুন্দরুশ, গোপীমোহনপুর, ফতেপুব, আকড়ি গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে।

এই অঞ্চলেই পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে বৈদ্যুতিক চুল্লির শ্মশান তৈরি হয়েছে। সুন্দরুশ ও যশারে এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য কবর আছে। শ্যামপুর পঞ্চায়েতটি বড় দীঘরুই, ঘোলদীঘরুই, নেওটা, শ্যামপুর, কৌটালপাড়া, পাড়ভুড়শীট গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলে বড় দীঘরুই, ঘোল দীঘরুই, শ্যামপুর শ্মশান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার শ্যামপুরের কবরটি বিশেষ

গুরুত্বপূর্ণ।

রামমোহনের পালদিঘি, হেলান, জগন্নাথপুরের শ্মশান ও মৈখণ্ডের কবর : খানাকুল থানার রামমোহন ১ ও ২নং পঞ্চায়েত হেলান, পালদিঘি, আটঘড়া, গোবিন্দপুর, মৈখণ্ড, রাধানগর, ধামলা, জগন্নাথপুর, সেনপুর, গৌরাঙ্গপুর গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলের রাধানগরে সমাজ সংস্কারক ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও নবীন ভারতের মহামন্ত্রদাতা রামমোহন রায়ের জন্ম। রাধানগর গ্রামে রামমোহন রায়ের একটি স্মৃতিসৌধও আছে।

এই অঞ্চলের পালদিঘি, হেলান, জগন্নাথপুরের শ্মশান বিশেষ পরিচিত। হেলান, মৈখণ্ড এখানের বিশেষ কবর।

তাঁতিশালের কনকপুর, কুড়কুড়ি শ্মশান ও তাঁতিশাল ও উদনার কবর : তাঁতিশাল পঞ্চায়েত তাঁতিশাল, মাঝপুর, দুর্গাপুর, কুড়কুড়ি, কনকপুর ও উদনা গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে। এ অঞ্চলের তাঁতিশাল, কুঁড়কুড়ি, কনকপুর শ্মশানটি উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলের উপর দিয়ে মুণ্ডেশ্বরী নদী প্রবাহিত হয়। এই নদীর মধ্যে গ্রামেব অনেক শ্মশান আছে। তাঁতিশাল ও উদনাতেও কবর আছে।

বালীপুর, ছত্রশাল, চব্বিশপুর, অরুণ্ডা, কাবিলপুর শ্মশান ও অরুণ্ডা, বনদাইপুর, দাসপুরের কবর : খানাকুল থানার বালীপুর ও অরুণ্ডা পঞ্চায়েত বালীপুর, পূর্ব রাধানগর, দাসপুর, ছত্রশাল, অরুণ্ডা, বনদাইপুর, ধাড়াশিমুল, কাবিলপুর, চব্বিশপুর, গড়বেড়িয়া প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে।

এই অঞ্চলের বালীপুর, ছত্রশাল, দাসপুর, চব্বিশপুর, অরুণ্ডা, কাবিলপুর শ্মশান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বালীপুর, পূর্বরাধানগব, অরুণ্ডা ও বনদাইপুরে কিছু কিছু কবর দেখা যায়।

খানাকুলের ঘন্টেশ্বরের শ্মশান : খানাকুল ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত খানাকুল, লাউসর, জয়রামচক, চক্রপুর নিয়ে গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলেব ঘন্টেশ্বরেব শ্মশান বিশেষ খ্যাত। ঘন্টেশ্বর কালীমন্দির দীর্ঘদিন ধরে খানাকুলের গর্ব। এ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য কবর তেমন নেই।

পশ্চিমপাড়া, ঘোষপুর ও ঠাকুরানিচকের শ্মশান ও কবর : খানাকুল থানাব পশ্চিমপাড়া পঞ্চায়েতে তাঁতশিল্প, রাসমেলা, শান্তিপুর গ্রামে মাঘী পূর্ণিমায় দামোদর শ্রীধর জিউর পুষ্যাভিষেক যাত্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শোনা যায় ধর্মমঙ্গল প্রণেতা খেলারাম চক্রবর্তীর জন্মভূমি পশ্চিমপাড়াতে ছিল। এখানকার অনুপনগর, শান্তিপুর ও কুলতলাতেও শ্মশান আছে।

ঘোষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে শ্মশানের থেকে কবর বেশি। বেশিরভাগ কবর শ্মশানই রাস্তার ধারে ধারে। আনন্দবাজার, গাংপুর, পিলখাঁ, রাধাকান্তবাটি, মাধবকুণ্ডু এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ গ্রাম। ঠাকুরানিচক পঞ্চায়েতটি ঠাকুরানিচক, মাইনান, শঙ্করপুর, কাছড়া, কাবনান, দুয়াদণ্ড নিয়ে গড়ে উঠেছে। প্রতি বছর এখানে পৌষ সংক্রান্তি মেলা হয়। এখানে শ্মশান ও কবরের সংখ্যা খুব কম।

পোলের শেওড়া গেড়ের পুকুর পাড়, হেঁদোর পাড় শ্মশান ও আমবাগান, তালপুকুরের পাড়ের কবর : রায়াবাড়, সাপথ, হরিণগেড়ে, পোল, পাতুল, গণেশবাজার এ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য গ্রাম। এখানে শেওড়াগেড়ের পুকুর পাড়ের শ্মশান, কোনার পাড়, পুণ্যিপুকুর শ্মশান, হেঁদোরপাড় শ্মশান ও রায়বাড়ের শ্মশান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাপথ মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ায় আমবাগানের

কবর, তালপুকুরের পাড় কবর, বড়পুকুরের পাড় কবর ও পীব পুকুয়ের পাড় কবরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে বামনার পাড়ে একটি ভাগাড় আছে। শোনা যায় আমবাগান পাড়ে নাকি ঠাঙাড়ে বাহিনী থাকত। তারা মানুষের কাছ থেকে লুঠ করে মাটিতে পুঁতে রাখত।

রাজহাটির মধ্যাড়ঙ্গ, বেলপুকুর, বেহুলার মাঠ, মমকপুরের মধ্যস্থল ও কাটিপুকুরের শ্মশান : বাজহাটি পঞ্চায়েতটি রাজহাটি, মমকপুর, সেনহাট অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলের মধ্যাড়ঙ্গ, বেহুলার মাঠ শ্মশান বিশেষ পরিচিত। এই অঞ্চলটি তাঁতশিল্পের জন্য বিশেষ পরিচিত।

তবে সমস্ত আরামবাগ মহাকুমায় যে সমস্ত শ্মশান, কবর ও ভাগাড়ের সন্ধান মিলেছে তা কোনও সময় যেমন বিশেষ ঐতিহ্য বহন করেছে, আবার কখনও কখনও লোকজীবনের বিশেষ একটি দিকের সন্ধান দিয়েছে। জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে বর্তমানে ভাগাড় আর নেই বললেই চলে। সমগ্র মহকুমায় মুসলিম জনবসতি স্বল্প হওয়ায় কবরের সংখ্যাও সীমিত। আর শ্মশান মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে নদীর ধার, রাস্তার পাশে এবং বাড়ির জমিতে বেশি দেখা যায়।

ঋণ স্বীকার :

১) আরামবাগের ইতিকথা (১৯৫৭), চুনীলাল বসু

২) হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ (১ম ও ২য় খণ্ড), সুধীরকুমার মিত্র

৩) পশ্চিমবঙ্গ হুগলি জেলা সংখ্যা ১৪০৩ বঙ্গাব্দ ১৯৯৬

গোপীকান্ত দত্ত (গৌরহাটি), নিমাই বোলে, মৃণাল চক্রবর্তী (সালেপুর), নবারুণ সমাদ্দার (জয়রামপুর), প্রণব ঘোড়ুই (রাজহাটি), শ্যামল ভট্টাচার্য (কাপশীট), স্বপন কুণ্ডু (পাঁইটা), অজয়কুমার সামুই (আরামবাগ), তপনকুমার মণ্ডল (সাপখ) উত্তম গণ (কামারপুকুর), বিশু নন্দী (হরিশোভা), শ্রীমতী শান্তা দাস (রাজবলহাট), শ্রীমতী পদ্মা ঘোষ (বলুণ্ডী), স্বপন ঘোষ, স্বপনকুমার সরকার (গোঘাট), নুটুবিহারী ভট্টাচার্য (বালী), রামদুলাল মুখার্জী (পাণ্ডুগ্রাম), অনন্ত ভট্টাচার্য (গৌরহাটি), শিবরাম লাহা (সোদপুর), মৃন্ময় ঘোষ (কানপুর), প্রসাদ চ্যাটার্জী, সুব্রত রায় (ঠাকুরানিচক), অনির্বাণ ঘোষ (আরামবাগ), রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী (জয়েন্ট বিডিও, পুড়শুঁড়া), হীরা মিস্ত্রি, ওমর আলি, তপন রায় (গ্রন্থাগারিক), শ্রীমতী পুণ্যশ্রী চক্রবর্তী (গোঘাট), মাধব মালিক (বালী), কৃষ্ণপদ সামুই।

□ লেখক পরিচিতি—শিক্ষক, গৌরহাটি হরদাস ইনস্টিটিউশন।

কোম্পানী আমলে ঢাকা : মৃত্যু, শেষকৃত্য, বিবিধ প্রসঙ্গ

জেমস্ টেলর

সমাধি ঃ মুসলমান অধিবাসীদের মতো অধিকাংশই শহরের অভ্যন্তরে তাদের বাসগৃহের সন্নিকটে বা সংলগ্ন স্থানে মৃতদেহ কবরস্থ করে থাকে। কবরগুলো কদাচিৎ সাড়ে চারফুট অপেক্ষা অধিক গভীর হয়। ফরায়েজীগণ সমাধির স্থান স্মরণীয় বা চিহ্নিত করে রাখার জন্য, কখনও মাটির উঁচু মঞ্চ তৈরী করে না এবং মৃতকে কবরস্থ করার কিছুকালের মধ্যেই তারা সাধারণত এসব কবরের উপর বাড়ি-ঘরও তুলে থাকে। এখানকার কিছু সংখ্যক মুসলমান-গোরস্থান শহরের পশ্চিম দিকে জঙ্গলে অবস্থিত। এস্থানের কবরগুলো প্রায় ৬ ফুট গভীর করে খনন করা হয় থাকে; দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে যারা কফিন বা শবাধারের খরচপাতি বহন করতে অক্ষম, তারা বাঁশের তৈরী কাঠামো শবের উপর আড়াআড়ি ভাবে রেখে দেয়; কিন্তু এই সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও, শৃগাল ইত্যাদি মাঝে মাঝে শবদেহ কবর খুঁড়ে বের করে ফেলে।

চিতা ঃ হিন্দুগণ শহরের সন্নিকটে শবদেহ পুড়িয়ে ফেলে। কিন্তু অধিকতর দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে কোনরূপ চিতা তৈরী করা হয় না; তারা শবদেহ নদীতে ফেলে দেয়।

ফরায়েজীগণের সৎকার কার্য্যাবলী ঃ তাদের সমাধি সংক্রান্ত কার্যাদি সরলতাব সঙ্গে পরিচালিত হয়ে থাকে। কবরে ফলমূল ও পুষ্পাদি অর্পণ এবং নানাবিধ ফাতেহাখানি অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ। তাদের কবর মাটির উপরিভাগে উচ্চ করে তোলা হয় না। কিম্বা কোন রকম ইট বা প্রস্তর নির্মিত সৌধ দ্বারা চিহ্নিত হয় না।

ডোম সম্প্রদায় ঃ ডোম বা শবদাহকারীরা সাধারণত শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তারা শূকর পালন করে, ঝুড়ি ইত্যাদি তৈরী করে, এবং এদেরকে কুকুর মারা কাজেও নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

যোগী সম্প্রদায় ঃ এ জেলার ময়মনসিংহে যোগীরা একটি সংখ্যা বহুল সম্প্রদায়। অন্যান্য সব নিম্নশ্রেণীর ন্যায় তাহাদেরও বিবাহ অনুষ্ঠান এবং পূজাপার্বণ ইত্যাদি নিমিত্ত নিজেদের ব্রাহ্মণ রয়েছে; কিন্তু সকল ব্রাহ্ম-উপাসকদের প্রচলিত রীতি বিরুদ্ধ একটা কাজ তারা করে এবং তা হচ্ছে মড়া পোড়ানোর পরিবর্তে তারা মৃতদেহ কবর দেয়। গোলাকার করে কবর খোঁড়া হয় এবং এর মধ্যে বসার ভঙ্গীতে মৃতদেহ স্থাপন করে। অত:পর এর সঙ্গে একত্রে

একটি ক্ষুদ্র পাণির কলস একটি হুঁকা ও চাটাই রেখে দেয়। ...... ভিক্ষাজীবি যোগীগণও তাদের মৃতদেহ কবর দেয় কিন্তু তারা একই অনুষ্ঠান পালন করে কিনা সে সম্পর্কে আমি অবহিত নই। অবশিষ্ট সম্প্রদায়ের লোকজন প্রথমে পাল রাজাদের পুরোহিত ছিলেন বলে ডা. হ্যামিল্টন ধারণা করেন।

অগ্রদানী ব্রাহ্মণ ঃ শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে প্রদত্ত প্রথম দান গ্রহণকারীদেরকে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ রূপে অবহিত করা হয়। এদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক অবিশুদ্ধ ও অধঃপতিত বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। এই জেলায় বসবাসকারী কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ শবদাহ কার্যে বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান পূর্বক তাদের জীবিকা অর্জন করে। সাধারণত এদেরকে দান করা জিনিসপত্রের মধ্যে থাকে খাদ্যশস্য, তৈলবীজ, কাপড়-চোপড়, ছোট্ট এক টুকরা স্বর্ণ বা রৌপ্য ইত্যাদি। কিন্তু এ সকল দান গ্রহণের পূর্বে, এদেরকে মৃতের প্রতি উৎসর্গীকৃত সিদ্ধ 'চালপাতরাণের' কিছুটা অংশ গ্রহণ করতে হয়।

১৮৩০ থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত আকস্মিক মৃতুসংখ্যা ঃ ১৮৩০ থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত সময়ে পুলিশ কর্মচারী কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট রিপোর্টকৃত এ জেলার আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনাগুলোর একটি বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো —

	পুরুষ	*নারী*
আত্মহত্যা	৫	০
গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা	৪	৮
পানিতে ডুবে মৃতু	২১	২০
সর্পঘাতে মৃত্যু	৩০	২৬
বজ্রাঘাতে মৃত্যু	৩	৩
বিষক্রিয়ায় মৃত্যু	৩	৩
গাছ থেকে পড়ে মৃত্যু	৩	০
প্রহারজনিত মৃত্যু	৯	০
বাঘের আক্রণে মৃত্যু	৮	৩
শূকরের আক্রমণে মৃত্যু	২	১
মহিষের আক্রমণে মৃত্যু	২	০
কুমীরের আক্রমণে মৃত্যু	৮	৬
বন্দুকের গুলিতে আহত হয়ে মৃত্যু	৩	০
গর্ভপাতজনিত মৃত্যু	০	৭
হত্যাজনিত ও অনুল্লিখিত বিবিধ কারণে মৃত্যু	৪৫	৩০
মোট	১৪৬	১০৫

সতীদাহমূলক অপরাধের সংখ্যা ঃ সবকার কর্তৃক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করার পর থেকে একজন সতীকেও জোর পূর্বক দাহ কবার চেষ্টা করা হয়নি। ১৮১৫ থেকে ১৮২৮ সনের মধ্যে এ জেলাতে একশত পঁচানব্বই জন বিধবা স্বেচ্ছায় তাদের স্বামীদের চিতায় আরোহণ করে। এই সখ্যার মধ্যে —

২০ বছরেব কম বযস্ক ছিল ১০ জন
২১ থেকে ৩০ বছব বয়স্ক ছিল ৪৩ জন
৩১ ” ৪০ ” ” ” ৪৯ জন
৪১ ” ৫০ ” ” ” ৪৬ জন
৫১ ” ৬০ ” ” ” ৩৪ জন
৬১ ” ৭০ ” ” ” ১২ জন
৭০ বছরের উর্দ্ধে ছিল ১ জন

এদের আবার ২৮ জনের কোন সন্তানাদি ছিল না, এবং ২৪ জনের ছিল না কোন শিশু সন্তান।

শেষকৃত্যমূলক অনুষ্ঠান ঃ কলকাতা অপেক্ষা এখানকার মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠানে অধিক অর্থ ব্যয়ে পরিচালিত হয় বলে কথিত হয়ে থাকে। কিন্তু এখানকার শেষকৃত্যমূলক অনু,টানে যে কোন পরিমাণ বিপুল অর্থ মুক্ত হস্তে ব্যয় করার ঘটনা কদাচিৎ ঘটে এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীর অধিবাসীদেব মধ্যে এতদ্ সংক্রান্ত খরচ পত্র তুলনামূলকভাবে পরিমিত। এই উপলক্ষে নিম্নশ্রেণীব অন্তর্ভুক্ত হিন্দু বা মুসলমানেব খবচের নিম্নতম হার নিম্নে প্রদত্ত হলো।

হিন্দু

	টাকা	আনা
শেষকৃত্য সংক্রান্ত বস্ত্রাদি	০	৮
চিতাগ্নি তৈরীর জন্য একজন ডোমকে দেয়	০	৮
অগ্নি কাষ্ঠ	০	১২
সন্দাল, ঘি বাঁশ ইত্যাদি	০	৪
শ্রাদ্ধপর্ব		
ব্রাহ্মণ	১	০
বস্ত্রদান	১	০
চাল ও ডাল	২	০
ব্রাহ্মণগণের জন্য ভোজানুষ্ঠান	১	০
পিতলের পাত্র ইত্যাদি	১	০
নাপিত	০	৪
ধোপা	০	৪
বিবিধ	০	৮
মোট	৯	০

মুসলমান

	টাকা	আনা
কবর খননকারী	০	১২
শবাধার, কাপড়, মাদুর, বাঁশ ইত্যাদি	১	০
মোল্লা	০	৪

চতুর্থ ফাতেহা পাঠকারী

	টাকা	আনা
মোল্লা	১	০
খাদ্য ইত্যাদি	০	৪
তাম্রথালা ও অন্যান্য	১	০
গরীবদের মধ্যে কড়ি বিতরণ	০	৪
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফাতেহা উপলক্ষে খরচ	২	৮
মোট	৭	০

নিতান্তগরীব পরিবারের শ্রাদ্ধ ঃ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি পালনের পক্ষে পরিবার যদি খুব গরীব হয়, তাহলে তারা অগ্রদানী ব্রাহ্মণদের মধ্যে কয়েক সের চাল, কিছু তৈলবীজ ও কড়ি বিতরণ করে থাকে। গ্রামাঞ্চলে ডোমদেরকে কদাচিৎ নিয়োগ করা হয় এবং গ্রাম ও শহর উভয় স্থানে যে সকল ব্যক্তি চিতার খরচ যোগাতে অক্ষম তারা মৃতদেহ নদীতে ফেলে দেয়। মুসলমানদের কয়েকটি শ্রেণী যেমন, রিফুগর ও অন্যান্য কিছু সমাজের অন্তর্ভুক্ত মৃত ব্যক্তির জন্য উক্ত সমাজের সদস্যরাই কবর খনন করে এবং মৃতদেহ বহন করে। এটা তাদের এমন একটি কর্তব্য যা পালাক্রমে তাদের সকলেই পালন করে থাকে। অত্যন্ত গরীব লোকেরা কদাচিৎ ফতেহা পালন করে এবং যারা কোন পরিবার বা বন্ধুবান্ধব না রেখে মারা যায়, তাদের জন্য ফাতেহা পড়ানো হয় না। ফারায়েজীগণ বিবাহ ও শেষকৃত্য সম্পর্কিত অনুষ্ঠানাদি বর্জন করে। সুতরাং এ সকল পর্ব উপলক্ষে তাদের ব্যয়ের পরিমান সামান্য। কোন দান স্বরূপ কিছু অর্থ বিতরণ করা হয়।

* জেমস টেলর রচিত 'টপোগ্রাফি অব ঢাকা' গ্রন্থ থেকে গৃহীত। গ্রন্থটি ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা, মিলিটারী অরফান প্রেস থেকে প্রথম মুদ্রিত হয়। মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বাংলায় অনুবাদ ক'রে 'কোম্পানী আমলে ঢাকা' এই নামকরণ করেন। বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের ১৬ বছর আগে লেখক কোম্পানী আমলের শেষ পর্বে ঢাকায় আসেন সিভিল সার্জন হিসেবে। ৮ বছর অবস্থান কালে ব্যক্তিগত ও সরকারী উদ্যোগে নানান দলিল দস্তাবেজ, ও নানা জনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কোম্পানীর আদেশে. তৎকালে ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গে অবস্থানকারী মেডিকেল বোর্ডের সচিব জেমস হাচিনসনের কাছে ঢাকার ভূপ্রকৃতি ও জনগণের একটি পরিসংখ্যান পেশ করেন।। সংক্ষিপ্তভাবে যার নাম ছিল — 'এ স্কেচ অব দ্য টপোগ্রাফী এ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্স্ অব ঢাকা'।

— সম্পাদক

ঢাকার প্রথম কবরস্থান

মুনতাসীর মামুন

ঢাকায় কবর দেয়া ছিল একটি সমস্যা। অনেকে বাড়ির আঙিনায় বা রাস্তার আশপাশে কবর দিতেন। উনিশ শতকে ঢাকায় অনেক জলা ছিল। শীতের মৌসুমে সেগুলো শুকিয়ে গেলে সেখানেও কবর দেয়া হত। বর্ষাতে আবার পচা মৃতদেহের অংশবিশেষ ভেসে উঠত। যেমন, আর্মেনীটোলা ঝিল এ কারণে বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। সামগ্রিকভাবে অবস্থাটা কেমন ছিল তা বোঝা যাবে ১৮৬৪ সালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে —

ঢাকার মহামারীর বিভিন্ন কারণের মধ্যে পত্রিকা উল্লেখ করেছিল, একটি কারণ হচ্ছে— "ঢাকাস্থ ইতর মুলমানগণের কবর দেয়ার দূষ্যতা।"

"ঢাকায় যে সকল ইতর মুসলমান বাস করে, তাহাদিগের শব সমাহিত করিবার কোন বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট নাই। লোক গমনাগমনের পথের পার্শ্বে যে সকল স্থান ছাড়া পড়িয়া থাকে অনেকে সেই সকল স্থানে, অনেকে নিজ নিজ বাটিতে মৃত শরীর নিখাত করিয়া রাখে। জনাকীর্ণ তাঁতীবাজার ও বংশালে সন্নিহিত নূতন সড়কের পূর্ব পার্শ্বে এত শব নিধান হইয়াছে যে, ঢাকায় তিলার্ধ শূন্য রয় নাই। তথাপি আমরা দুবেলাই প্রায় তথায় কবর দিতে দেখিতেছি। এই সকল শব কেবল নামে সমাহিত হইয়া থাকে। কৃষকেরা শস্য বীজ যেমন মৃত্তিকার নিম্নস্থ করিয়া রাখে, শব সমাহিতারাও সেইরূপ মৃত্তিকা দ্বারা শরীরটা আচ্ছাদিত করিয়া আইসে বলিলেই হয়। শব নিহিত করিবার জন্য যেরূপ গভীর কূপ খনন ও মৃদাচ্ছাদন আবশ্যক, তাহারা তাহার কিছুই করে না। এক বা অর্ধ হস্ত প্রমাণ একটা গর্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে শবটা নিক্ষেপ করিয়া কতকটা মাটি দিয়া ঢাকিয়া আসে। ...... যাহা হউক, এইরূপ শব নিখাত হওয়াতে ...... কুকুর প্রভৃতি মাংসাদ পশু সকল নখাকর্ষণে অনায়াসেই তাহা বাহির করিয়া ফেলে। তাহা হইতে দুর্গন্ধময় বায়ু উত্থিত হইয়া বায়ু দূষিত করে।

অপিচ, ঢাকার অনেক স্থানেই জলা আছে। ঐ সকল জলাশয়াদি কয়েক ঋতুতে পরিশুষ্ক হইয়া যায়। সেই সময় তাহার মধ্যেও অনেক লোক কবর দিয়া থাকে। প্রাবৃটকালে যখন এই সকল জলপূর্ণ হয়, তখন প্রোথিত শব গর্তে জল প্রবিষ্ট হইয়া তাহার সহিত সম্যকরূপে মিশ্রিত হইয়া যায়। সুতরাং বায়ুর ন্যায় জলও এতদদ্বারা বিদূষিত হইয়া থাকে। ......"

এ ধরনের যত্রতত্র কবর দেয়া বন্ধ করে, মিউনিসিপ্যালটির অধীন সুনির্দিষ্ট জায়গায় কবর দেয়া বা কবরস্থান তৈরির চিন্তাভাবনা হতে থাকে। ১৮৬৮ সালে মিউনিসিপ্যালিটির চৌহদ্দির মধ্যে যে সব জায়গায় কবর দেয়া হত (পারিবারিকভাবেও) তার একটি তালিকা তৈরি করা হয়। তালিকায় ১২টি কবর দেয়ার জায়গায় খোঁজ পাওয়া যায়। সেগুলো হল — চম্পাতলি, বেগম বাজার, পূরব দবওয়াজা, বেচারাম দেউড়ি, আগামসিহ দেউড়ি প্রভৃতি। মিউনিসিপ্যালিটি সরকারের কাছে এর অনেকগুলো বন্ধ করে দেয়ার সুপারিশ করে। লেঃ

গবর্নর এ সুপারিশ মেনে নিয়ে বেশ কটি কবরস্থান বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দেন। সরকারি নির্দেশ ঠিকমতো মান্য করা হচ্ছে কিনা তা তদারক করার জন্য ঢাকার কমিশনার ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ডাঃ গ্রাহাম, ডাঃ ওয়াইড ও খাজা আহসানউল্লাহকে নিয় একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিকল্প প্রস্তাব রাখার। তাঁরা আগাসাদেক বাজার ও পুরানা ক্যান্টনমেন্ট (পুরানা পল্টন)—এ দুটি কবরস্থান খোলার চিন্তাভাবনা করছিলেন।

পরবর্তী দশ বছরেও এর সমাধান করা যায় নি। ১৮৮১ সালে সিভিল সার্জন আগাসাদেক বাজারের কবরস্থানটি বন্ধ করে দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এখানে পুরনো একটি কবরস্থানের মতো ছিল এবং তা বন্ধ করেও দেয়া হয়েছিল। ১৮৮৯ সালে দেখি, আগাসাদেক বাজারের প্রতাপ চন্দ্র দে এবং আরো অনেকে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন জানিযে বলেন যে, এখানে মাঝে মাঝে গর্ত করে লাশ ফেলে রাখা হয়। তারপর শৃগাল, কুকুর এসে উৎপাত করে। সুতরাং তা বন্ধ করে দেয়া হোক। কিছু মুসলমান বাসিন্দা আবার এতে আপত্তি জানায়। ২০মে ১৮৮৯ সালে পৌরসভার কমিশনারদের এক সভায় এই গোরস্থান উন্মুক্ত করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরে লেঃ গবর্নরের হস্তক্ষেপের ফলে এই সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যায়।

অবশেষে পুরানা নাখাসে ১৮৮২ সালে মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃত্বাধীন প্রথম কবরস্থান খোলা হয়। ১৮৮৯ সালে গেণ্ডারিয়ায় খোলা হয় দ্বিতীয় কবরস্থানটি। এটির ব্যয়ভার বহন করেছিলেন দীননাথ সেন। আজিমপুর ও জুরাইনে কবরস্থান খোলা হয় পঞ্চাশ দশকে। কবর খোঁড়ার পুরনো একটি হিসাব পাওয়া গেছে। ১৯১৮ সালের এ হিসাবে জানা যায়, প্রাপ্তবয়স্কের কবর খোঁড়ার জন্য দিতে হত ১০ আনা, মাঝারি আকারের লাশের জন্য ৭ আনা এবং শিশুর লাশের জন্য ৫ আনা।

৩ আগষ্ট ১৮২২। ২০ শ্রাবণ ১২২৯

মরণ — ১৮২২ সালের ৫ জুলাই তারিখে মোকাম ঢাকার বড় নবাব নসরৎজঙ্গ বাহাদুরের উদারময় সঞ্চার হইয়াছিল এবং ২২ জুলাই প্রাতঃকালে সাত ঘন্টার সময়ে তিনি ঐ রোগে লোকান্তর গত হইয়াছেন। ঐ তারিখে বৈকাল বেলা তাঁহার কবর হইয়াছে তাঁহার কবর দেওনের কালে ন্যূনাতিরেক লক্ষ লোক সঙ্গে গিয়াছিল এবং কোম্পানি সম্পর্কীয় ইংগ্লণ্ডীয় সাহেব লোকেরা আপনারদের সৈন্য লইয়া গিয়াছিলেন ও আর ২ সাহেব লোকেরাও ঐ সঙ্গে গিয়াছিলেন এবং ঐ নবাব সাহেবের সম্ভ্রমার্থে কোম্পানির সিফাহীরা তাঁহার কবরের নিকট তিনবার ফএর করিল। তাহার বয়ঃক্রম পূর্ণ উনষাটি বৎসর হইয়াছিল . . .।

— সমাচার দর্পণ

* 'ঢাকার প্রথম গ্রন্থ' থেকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত।

পীর খান-জাহানের সমাধি

খুলনা-বাগেরহাট পীর খান জাহানের কীর্তি আজও লোক মুখে প্রচিলত। তিনি আপন কর্ম-বলে দেবত্বে উন্নীত হয়েছেন। তিনি বাংলাদেশের এই অঞ্চলে, মূলত: সুন্দরবনে পথঘাট, জলাশয় নির্মাণ করেই ক্ষান্ত হননি, কৃষিকার্যের উন্নতিতেও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন।এটা আজ মিথ যে তিনি ৩৬০টি দিঘি এবং ৩৬০টি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর ৩৬০ জন অনুচর বা সহকর্মী ছিলেন। সবাই ছিলেন খানজেলি পীর। অর্থাৎ প্রত্যেকের হাতে একটি করে কোদাল তুলে দিয়েছিলেন। জলকষ্ট নিবাবণে দিঘি বানাও, পথিকের জন্য পথ বানাও আর ভালো করে মাটি কোপাও যাতে চাষের উপযুক্ত ভূমি প্রস্তুত হয়। গোটা অঞ্চলে একথা প্রচার হয়েছিল, পীর সাহেব ৩৬০ বিঘা জমিতে মাটির নীচে প্রচুর সম্পদ লুকিয়ে রেখেছেন। সেই লোভে লোকে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে চাযের উপযুক্ত করেছিল গোটা এলাকা। তাঁর দুই স্ত্রী। সোণা বিবি ও রূপা বিবি। একদা দুই সতীনে ঝগড়া হয়। একজন নাকি বিষ খেয়ে পুকুরে ঝাঁপ দেন। সে পুকুরের নাম আজও 'বিষ পুকুর' বলে প্রচারিত। আরও একজন মারা গেলে ঘোড়া দিঘির পশ্চিম কোণে সমাধি দেওয়া হয়। তা আজ 'বিবি জানের মসজিদ' বলে প্রচলিত। তাঁব কোনো সন্তান ছিল না। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র লিখছেন—"প্রবাদ আছে, মৃত্যুর কয়েক বৎসব পূর্ব্বে খাঁ জাহান ভগবানের নিকট কোথায় তিনি দেহত্যাগ করিবেন, সে স্থান নির্দেশ কবিযা দিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থনা অনুসারে ভগবান স্থান নির্দেশ কবিয়াছিলেন।"

যাটগম্বুজ মসজিদের মাইল খানেক পুবে এবং বাগের হাট থেকে সাড়ে তিনমাইল পশ্চিমে ঠাকুর দিঘি। এই দিঘির মধ্যে একটি বুদ্ধ ঠাকুর পাওয়া যায় তাই এর নাম ঠাকুর দিঘি। পরে বুদ্ধ মূর্তিটি শিববাড়ীতে নিয়ে গিয়ে পূজা করা হয়। এই দিঘিব দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সমান। এক এক দিকের পবিমাপ ১৬০০ ফুট। এর উওর দিকে বাঁধা ঘাটের উপর খান জাহানের সমাধি মন্দিব। *যশোহর-খুলনাব ইতিহাস*-এ এক গম্বুজ মাজাবেব বিবরণ এরকম ঃ

"সমাধি-মন্দির সমচতুষ্কোণ; উহার বাহিবের মাপ ৪৬×৪৬ ফুট। উহার চারিকোণে চারিটি স্তম্ভ দেওয়ালের সঙ্গে গ্রথিত রহিয়াছে। উহারা মিনাবের মত উচ্চ হইয়া উঠে নাই। খাঁ জাহান নিশ্চিতই জানিতেন, লবণাক্ত দেশে কোন অট্টালিকায় মৃত্তিকা হইতে ৩/৪ ফুট পর্য্যন্ত লোণা ধরে: ঐ অংশে ভাল ইট দিলেও তাহা অল্পবিস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই জন্য খাঁ জাহান তাঁহার সমাধি-মন্দিরকে চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত, উহাতে মৃত্তিকা হইতে তিন ফুট উপর পর্য্যন্ত সমস্ত অংশ প্রস্তরদ্বারা গাঁথাইয়াছিলেন। এই সকল পাথর তিনি চট্টগ্রাম হইতে আনাইতেন। প্রস্তরগুলি সাধারণতঃ প্রায় ২ ফুট দীর্ঘ, ১ ফুট প্রস্থ, এবং ৯ ইঞ্চি পুরু দেখা যায়। গৃহটির দেওয়ালের ভিত্তি ৮'-৩" ইঞ্চি। ইহাব বাহিরের দেওয়াল চতুষ্কোণ বটে, কিন্তু ভিতরের দেওয়াল অষ্টকোণ। এই অষ্টকোণ দেওয়াল ২৪ ফুট উচ্চ হইয়া সেখান হইতে একটি গোলাকার গুম্বজ নির্ম্মিত হইয়াছিল। গুম্বজের উপরিভাগে নানাবিধ কারুকার্য্য করা ছিল। এখন কারুকার্য্য নাই। তবে গুম্বজের উপর জমাট এত শক্ত ও সুন্দর যে,

এ পর্য্যন্ত এক প্রকার বিনা মেরামতে এই সমাধি-গৃহ এখনও সুন্দর অবস্থায় আছে। গৃহটির মেজে পূর্ব্বে 'মীনা' করা ইটে মণ্ডিত ছিল, এখন তাহার চিহ্ন আছে, ইটগুলি অপহৃত হইয়াছে।

সমাধি-মন্দিরের দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে তিনটি দরজা। উত্তরদিকে কোন দরজা নাই। দরজাগুলি ৬'-১০'' বিস্তৃত। উহাদের উপর পাথর ছিল, পাথরের গায়ে সম্ভবতঃ এক একখানি করিয়া লোহাও ছিল। তাহা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় গবর্ণমেন্ট হইতে এক একটি ৪''×২'' লোহার কড়ি বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গৃহের মধ্যস্থলে খাঁ জাহানের সমাধিমঞ্চ। প্রথমে মেজের উপর একটি ইষ্টকবেদী। এ বেদীটিও মীনা করা টালি (tile) দ্বারা আবৃত ছিল, এখন টালিগুলি নাই। এই ইষ্টকবেদীর উপর প্রথমতঃ একটি তাক ৬ খানি বড় বড় কৃষ্ণপ্রস্তর দ্বারা গঠিত; তাহার উপর আর একটি পাথরের তাক, তাহাও ঐরূপ ৪ খানি কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত। সর্ব্বোপরি একখানি অর্দ্ধগোলাকৃতি ৬ ফুট দীর্ঘ সুন্দর কৃষ্ণপ্রস্তর। এই শীর্ষ প্রস্তরখানি ও তাহার নিম্নবর্ত্তী দুই স্তরের প্রস্তরগুলি সকলই আরবী ও পারসীক লিপিতে পরিপূর্ণ সমাবৃত ছিল। লিপিগুলি খোদিত নহে, সকলগুলি সুন্দরভাবে সযত্নে উৎকীর্ণ। এই লিপি ভাস্কর্য্যে যে যথেষ্ট সময় ও শ্রমকৌশল লাগিয়াছিল, তাহাতে দ্বিমত নাই। আমরা ভাষান্তরিত করিয়া ক্রমে ক্রমে ঐ লিপিগুলির মর্ম্ম প্রদান করিতেছি।[১]

সমাধিবেদীর শীর্ষপ্রস্তরের উত্তরগাত্রে মুসলমান-ধর্ম্মের সেই চিরপ্রসিদ্ধ সার মত উৎকীর্ণ আছে: 'ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়; মহম্মদ তাঁহার রসুল (ধর্ম্মোপদেশক) বা প্রতিনিধি।' ঐ অর্দ্ধগোলাকৃতি প্রস্তরের উপরিভাগে প্রথম দুই লাইনে আছে *'হে ভগবান! আমাকে সয়তানের প্রলোভন হইতে রক্ষা কর; আমি তোমার দয়ার্দ্র, করুণাময় নামে আশ্রয় করিতেছি।'* ইহারই নিম্নে উপরিভাগের অধিকাংশ স্থান ১০৪টি চতুষ্কোণক্ষেত্র দ্বারা পূর্ণ। উহার প্রথম ৫টি চতুষ্কোণের মধ্যে আছে : 'ঈশ্বর, একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর, তিনি' —উহাদের উপর অবশিষ্ট ৯৯টি চতুষ্কোণের মধ্যে ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যে ৯৯ একটি বিশেষণ শব্দ লিখিত রহিয়াছে। উহার সবগুলি এখানে অনূদিত করিবার প্রয়োজন নাই, কতগুলি দৃষ্টান্ত দিতেছি : 'রাজা, রাজরাজেশ্বর, সত্য, নিত্য, অনন্ত, অমূল্য, চতুর, আদি, অন্ত, প্রকাশিত, জাগ্রত, গুপ্ত, লুপ্ত, রক্ষক, শাসক, পালক, স্রষ্টা, নির্ম্মাতা, শ্রোতা, দর্শক, সর্ব্বব্যাপক, জ্ঞানী, ন্যায়বান, বিচারক, বিবেচক, দয়ালু, ক্ষমাশীল, পথের আলো, পথিকের সঙ্গী প্রভৃতি। এই ৯৯টি বিশেষণের নিম্নে লেখা আছে : *'ঈশ্বরের তুলনা নাই, তিনি দ্রষ্টা ও শ্রোতা; তিনি (সকলের) তুষ্টিসম্পাদনা করেন; তিনি সর্ব্বপ্রধান প্রভু, শ্রেষ্ঠ সহায়ক।'* অর্দ্ধগোলাকৃতি পাথরের দক্ষিণের দিকে আরবীয় ভাষায় আছে : *'প্রধান পুরুষ খাঁ জাহান আলির এই সমাধি স্বর্গীয় কাননের অংশবিশেষ। ভগবান্ তাঁহার প্রতি কৃপালু হউন। ৮৬৩ হিজরীর ২৬শে জেলহজ্জ তারিখ।'*

[১] মহামতি ওয়েষ্টল্যাণ্ড স্বকৃত রিপোর্টে কতকগুলি লিপির মূল ও ইংরাজী অনুবাদ দিয়াছেন। Westland, Report, 1871, p 28; Basak, G D Antiquities of Bagerhat, J. A. S. B. Vol. 36, 1867-8; Sunder, D H E. Antiquities of Bagerhat

শীর্ষপ্রস্তরের নিম্নবর্ত্তী প্রস্তরের তাকের উপরিভাগে চারিধার ঘুরাইয়া লেখা আছে :

'লুব্ধ লিপ্সা মমতায় ভুলি ভগবান্,
সংসারচিন্তায় তুমি রয়েছ মগন;
সময় আসিবে যবে একথা ভাবিবে
মৃত্যু সন্নিহিত হলে এ চিন্তা জাগিবে;
আছয়ে নরক, তাহা ত্বরায় জানিবে,
নরক দর্শনে শেষে কষ্ট উপজিবে;
তোমার কাজেতে হবে তোমার বিচার
তাহাতে সন্দেহ নাই কিছু মাত্র আর।'

এই প্রস্তরপীঠের পূর্ব্বপার্শ্বে নিম্নলিখিত উপাসনা লিপিগত আছে : *'হে জাগ্রত ভগবান্! তুমি অনন্ত, তুমি পাপীর আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিয়া থাক; তুমি গৌরবময়, পবিত্র; তুমি রাজরাজেশ্বর, তুমি ক্ষমাশীল, তুমি চৈতন্যস্বরূপ; তুমি শ্রষ্টা, তুমি স্বর্গমর্ত্ত্যের গঠনকর্ত্তা; আমাকে নরক হইতে নিস্তার কর।'*

এই প্রস্তরপীঠের পশ্চিমপার্শ্বে আছে : *'হে অবিশ্বাসিগণ! তোমরা যাঁহাকে পূজা করিবে, আমি তাঁহাকে পূজা করিব না; আমি যাঁহাকে পূজা করিব, তোমরা তাঁহাকে পূজা করিবে না; তোমরা যাঁহাকে পূজা কর, আমি তাঁহার পূজা করি না; আমি যাঁহার পূজা করি, তোমরা তাঁহার পূজা কর না; তোমাদের ধর্ম্ম তোমাদের আছে এবং আমার ধর্ম্ম আমার আছে।*

এই প্রস্তরপীঠের দক্ষিণপার্শ্বের মধ্যস্থলে একটি চতুষ্কোণ এবং তন্মধ্যে একটি বৃত্ত অঙ্কিত আছে। চতুষ্কোণের চারিকোণে আরবীয় ভাষায় আছে :

কে মরিল—জনৈক প্রবাসী;
তিনি মরিলেন—(ধর্ম্মের জন্য) আত্মোৎসর্গ করিয়া।

বৃত্তটির মধ্যেও আরবীয় ভাষায় লিখিত আছে : *'যিনি ঈশ্বরের দাসানুদাস, যিনি বৃদ্ধ, দুর্ব্বল ও কৃপাভিখারী, যিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধির (মহম্মদের) বংশধরগণের আত্মীয়, যিনি সুধীবর্গের প্রকৃত বন্ধু এবং অবিশ্বাসীর শত্রু, যিনি মুসলমানের সহায় এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক, তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার নাম আলঘ খাঁ জাহান। (ভগবান তাঁহার প্রতি কৃপাযুক্ত হউন)। তিনি উর্দ্ধতন (স্বর্গ) লোকের আশায় ৮৬৩ হিজরীর ২৬শে জেলহজ্জ বুধবারে এ জগৎ ত্যাগ করিয়াছেন এবং ২৭শে জেলহজ্জ তংহাকে সমাহিত করা হয়।*

ইংরাজী গণনানুসারে খাঁ জাহানের মৃত্যুতারিখ ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর হইবে। খাঁ জাহান যে অত্যন্ত অধিক বয়সে জরাজীর্ণ দুর্ব্বল দেহে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার এই প্রাণস্পর্শী স্বরচিত মর্ম্মগাথা হইতে বেশ বুঝিতে পাবা যায়। তিনি নিজের লিপি নিজেই লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তারিখটি মাত্র অন্যলোকে পরে বসাইয়া দিয়াছিল। সমস্ত প্রস্তুত না থাকিলে একদিনের মধ্যে প্রস্তরনির্ম্মিত সমাধিমঞ্চ নির্ম্মাণ করা যায় না।

দুইটি পাথরের স্তরের উপর একখানি শীর্ষপ্রস্তর দিয়া খাঁ জাহানের সমাধি নির্ম্মিত হয়। উহার উপরিস্থ পাথরের স্তরের উপরিভাগে বা পার্শ্বদেশে যে সমস্ত লিপি আছে, আমরা তাহার কথা বলিয়াছি। নিম্নবর্ত্তী প্রস্তরপীঠেও এরূপ অনেক লিপি আছে। উহার অনেকগুলি একরূপ অস্পষ্ট বলিয়া এখনও পাঠোদ্ধার হয় নাই। সাণ্ডার্স সাহেব সেগুলিকে কোরাণ হইতে

উদ্ধৃত পবিত্র ধর্ম্মগাথা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু এই নিম্নস্থ পাদপীঠেই দক্ষিণদিকে কয়েকটি সুন্দর তত্ত্ববাণী আছে। উহার কতক আরবীয়, কতক পারসীক ভাষায় লিখিত। আমরা কবিতায় উহার যথাযথ অনুবাদ প্রদান করিলাম :

"জগতে ক্রন্দন লয়ে খুলি এ জীবন,
কত বা যাতনা কষ্ট করে আক্রমণ!
পরীক্ষার নাহি পার জীবন ভরিয়া,
(কিন্তু) সব শেষ করে শেষে মরণ আসিয়া।
মৃত্যুই নিশ্চিত, ভাই, মৃত্যুই নিশ্চয়,—
জীবন-উদ্যানে তীক্ষ্ম কন্টকের ন্যায়,
মরণ নিশ্চয়, ভাই, মরণ নিশ্চয়।
জীবনের হেন অরি নাহি কেহ আর,
অন্য শত্রু হতে এর প্রভেদ বিস্তর,
দুষ্ট সয়তান আছে অরাতি তোমার,
টলাতে বিশ্বাস তব চেষ্টা সদা তার;
সকল সমাজে দেখি এই রীতি আছে —
দুর্ব্বল লভয়ে ক্ষমা সবলের কাছে;
ক্ষমা নাই—দয়া নাই—মৃত্যু দুর্নিবার
মরণ নিশ্চিত ভাই আছয়ে সবার।"
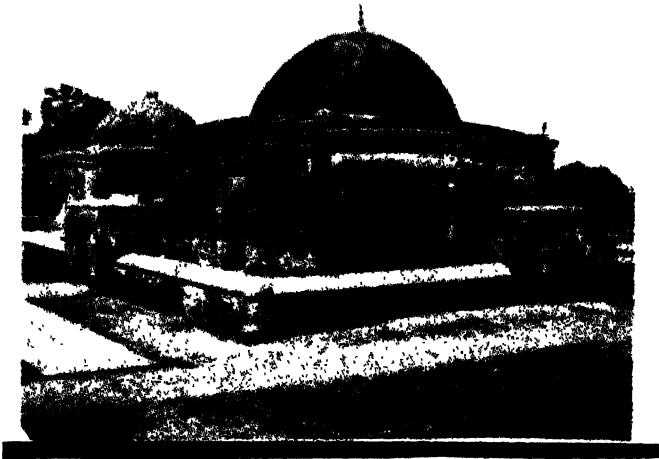
পীর খান-জাহানের মাজার

Jessore, Bagerhat Pir Ali's tomb

"This tomb is that of Muhammad Tahir, dewan of Khanja Ali. He is known in Bengal by the name of Pir Ali and was a brahman who had adopted the Mussulman religion. His zeal for religion is celebrated to the present day and he gives his name to a certain sect of Hindus." p. 206. "The sath Gumboz or Sixty domes is the largest of Khanja Ali buildings situated about three miles in westerly direction from Bagerhat." p. 203.

"The inside is kept clean by an old man who gets a pice from the pilgrims who travel to the place. During the mela or fair held every year in honour of Khanja Ali, it is used as a dwelling place by many hundreds of the visitors who can find abundant accomodation within."

"Khanja Ali's tomb occupies the centre of the building and it is marked by a tombstone five or six feet long, covered with Arabic inscriptions in relief." p. 205. "The tomb is also a favourite place pilgrimage for devout of Muhammadans and people come from a long distance to make their vows at Khanja Ali's shrine." p. 206. "There is a cookhouse west of the tombs of Khanja Ali and Pir Ali. It is said to have been used by Khanja Ali when he dwelt here as his cookhouse." p. 206.

"The tradition is that Khanja Ali or to use by full name Khan Jahan Ali came to the district to reclaim and cultivate the lands in the Sunderban which were at the time waste and covered with forests. He obtained from the emperor or from the king of Gour as jaighir of these lands, and in accordance with it established himself in them." p. 126.

---

* From Government of Bengal. Revised list of Ancient Monuments in Bengal 1886

কবর, মাজার, দরগা

বাংলাদেশে মুসলিম অধিকার বিস্তারের স্মারক

সত্যচরণ সাহা

মধ্যযুগে বঙ্গদেশে মুসলিম অধিকার বিস্তারের ইতিহাস ঠিকভাবে লিখতে হলে--কবর, মাজার, দরগা, মসজিদ গুলোকে নিয়ে সম্যক গবেষণা প্রয়োজন। কেননা—"শক্তি সম্পন্ন মুসলমানদিগের মধ্যে একটি সাধারণ নিয়ম আছে, তাঁহারা মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বীয় স্বীয় সমাধিস্থান প্রস্তুত করিয়া যান। এই সকল সমাধিস্থান তাঁহাদের জীবদ্দশায় মসজিদ রূপে ব্যবহৃত হয় এবং মৃত্যুর পর উহার মধ্যে অন্য কেহ সমাহিত করিয়া তাহার উপর সমাধিবেদী নির্ম্মিত হয়। এমন কি, সমাধির উপর কোন্ পাথরখানি কিভাবে বসাইয়া বেদী গঠিত হইবে, কোন্ পাথরে কি কি লিপি উৎকীর্ণ থাকিবে তাহাও সমস্ত ঠিক হইয়া থাকে। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া কর্ম্মী পুরুষ কোরাণ হইতে নিজের পছন্দ মত লিপিকথা রচনা করিয়া যান। মৃত ব্যক্তির অনুচরবর্গ সমাধি গঠন করিয়া নির্দিষ্ট স্থলে মৃত্যুর তারিখটি মাত্র লিখিয়া রাখে।" (যশোর খুলনার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, সতীশচন্দ্র মিত্র) । এছাড়া মুসলিম যোদ্ধাগণ যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে আল্লার কাছে জয়ের জন্য প্রার্থনা করতেন। যুদ্ধে জিতে মসজিদ বা প্রার্থনা গৃহ নির্মাণ করে পুনরায় প্রার্থনা করে কৃতজ্ঞতা জানাতেন। তাঁরা মনে করতেন এই জয় আসলে আল্লার জয়। সেজন্যই বোধ হয় ধর্মযোদ্ধা (জিহাদী) শত্রুকে পরাস্ত করে 'গাজী' উপাধি পেতেন, আর মারা গেলে হতেন শহীদ। কোনো কোনো শাসক উৎসাহিত হতেন বিধর্মীকে ইসলামে দীক্ষা দেবার জন্য। তাঁদের এই উৎসাহের পেছনে ছিল আলামা ওয়াদী রচিত 'সিয়াসৎ নামা' গ্রন্থটি। এর ৩১-৩২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে খলিফার আটটি কর্তব্যের অন্যতম হল বিধর্মীকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করণ। এই কর্ম যে করে তার স্বর্গের পথ প্রশস্ত হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন বঙ্গদেশে মুসলমানগণ এসেছিলেন—একহাতে অসি অন্য হাতে কোরাণ নিয়ে। গাজী, পীর, ফকির, কাজী ও পিরাণিরা কোরাণের পবিত্র বাণীকে সামনে রেখে পুণ্য সঞ্চারে ব্রতী হয়েছিলেন। কোরাণ বলে—"হে বিশ্বাসী, তুমি আল্লার যে বাণী লাভ করিয়াছ, তাহা তুমি সমস্ত বিশ্বে প্রচার কর--ইহা তোমার পুণ্য কর্ম।"

কিন্তু এত সরলীকরণের পথে হাঁটা ইতিহাসের পক্ষে ঠিক নয়। বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার, ও মুসলিমের অধিকার বিস্তারে যে সব জনহিতকর কাজগুলি পীর, ফকিরেরা করেছিলেন, তাতেও আকৃষ্ট হয়ে অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। পরে সে প্রসঙ্গে আসছি। এখন বঙ্গদেশে মুসলিম শক্তি সূচনার পটভূমি আলোচনা করা যাক।

বঙ্গদেশের ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের আগে নজর দেব দিল্লীর দিকে। খ্রিস্ট্রীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে ভারতে তখন তুর্ক-আফগান রাজত্ব। সে সময় মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ মোঙ্গল জাতি বাগদাদ আক্রমণ ও ধ্বংস করে। ধ্বংস হয় আশপাশের অনেক মুসলমান রাজত্ব। মোঙ্গলদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে—ইলতুৎমিস, বলবন, মহম্মদ তুঘলক, ফিরোজ তুঘলক, প্রমুখ দিল্লীর দরবারে আশ্রয় নেন। তাঁদের সঙ্গে অনেক জ্ঞানী গুণী, সুধীমণ্ডলী

এক সঙ্গে বা পৃথক ভাবে দিল্লীর দরবারে আশ্রয় নেন ও সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তাঁরা দিল্লীর জলবায়ু , মনোরম পরিবেশ ও ঐশ্বর্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। বাংলার উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু তাদের পছন্দ ছিল না। অবশ্য দিল্লীর অভিজাত মানুষের চোখে বাংলা তখন *দোজক-ই—পুর-নিয়ামত* বা আশীষপূত নরক। কিন্তু সুলতান গিয়াসুদ্দিনের আমলে এবং পরে সুলতান আজম শাহের সময়ে দিল্লী ও অন্যান্য প্রদেশের জ্ঞানী-গুণী সুধীমণ্ডলীকে বাংলার দরবারে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু বেশীরভাগই সে আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেন। ফলে বাংলাদেশে মুসলিম কৃষ্টি, ফার্সী ভাষা ও আরবী লিপি তখন চালু হল না। এ কারণে বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় অসুবিধা দেখা গেল।

তবুও কিছু মানুষ বাংলাদেশে শাসক হয়ে এলেন। তাদের অবস্থা এরকম—"বঙ্গদেশে যে সমস্ত তুর্ক-আফগান সুলতান রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন অসিজীবী ও নিরক্ষর। লুণ্ঠন ও ইসলাম ধর্ম প্রচারে তাঁহাদের যতটা উৎসাহ ছিল কৃষ্টি প্রচারে ততটা উৎসাহ ছিল না। সেই জন্যই বঙ্গদেশে মুসলিম অধিকারের প্রাথমিক যুগে মুসলিম অধিকার বিস্তারের সঙ্গে —মুসলিম সংস্কৃতি ও ভাষা বাঙ্গালী জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বঙ্গদেশেই মুসলিম সুলতানগণ আনুষ্ঠানিক ভাবে স্থানীয় বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। ফলে বাংলাভাষা বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ভাষা রূপে গৃহীত হইয়াছিল।" (বঙ্গদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, প্রথম পর্ব / ড. সুশীলা মণ্ডল)।

আর একদল সাধক, সুফী, আউলিয়া, দরবেশ বাংলায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। অনেকে কেচ্ছা কাহিনী, অলৌকিক গল্প লেখেন। এরা অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে এলেও ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের ঘটনাকে রচনায় তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে হয়তো কিছু অতিরঞ্জিত ব্যাপার আছে তবে ইদানীং ইতিহাস রচনায় এগুলোর বিশেষ ভূমিকা আছে। আজ আর কোনো কিছুই বাদ যাবে না। মৌখিক গল্প বা 'Oral History' ও বঙ্গদেশে মুসলিম অধিকার বিস্তারের দুটি পর্ব। প্রথম পর্বে, তুর্ক-আফগানরা বাংলাদেশে শাসন কায়েম করেন। তাঁরা ছিলেন উদার ও পরধর্ম সহিষ্ণু। এরা আসলে ধর্মান্তরিত মুসলমান। এদের ধর্ম ছিল ইসলাম আর সংস্কৃতি ছিল ইরানের। তাছাড়া আরবে ৬১০ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হলেও ভারতে এর স্থায়ী রূপ পায় ছশো বছর পরে প্রায় ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে। তখন এর বহুধা বিবর্তন হয়েছিল, উদ্দামতাও হ্রাস পেয়েছিল। তাছাড়া তুর্ক-আফগানরা মধ্য এশিয়ার জীবনচর্যার বশেই বাংলায় সহমর্মিতার বাতাবরণে সামঞ্জস্যপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন। তাই বখতিয়ারের দ্বারা প্রথম নবদ্বীপ বিজয় হলেও নবদ্বীপের মন্দির টোল পাঠশালা, পুঁথি ও পণ্ডিতদের তেমন বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি। বরং শাসকরা সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দুদের সেনা হিসেবে গ্রহণ করেন। হিন্দুর সংস্কার, পূজার্চনা, জাতিপ্রথা, ধর্মানুষ্ঠান কোনো কিছুর উপর অহেতুক হস্তক্ষেপ করেন নি। কিন্তু আরবরা ধর্ম ও সমাজকে অভিন্ন করে দেখতেন, ফলে ইসলাম ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে কোরাণের সামাজিক আদর্শ, আরবী ভাষা ও লিপি প্রচলনে প্রয়াসী হয়েছেন। তবে দুই পর্বেই একদল গোঁড়া মোল্লা, কাজী সুযোগ পেলেই বিধর্মীকে নিপীড়ন করেছেন, ধর্মান্তরণ করেছেন, হিন্দু নারীকে বিয়ে করেছেন।

কিন্তু একথা স্মরণ রাখা দরকার ইসলাম ধর্ম প্রচার করলেও তাঁরা হিন্দু ধর্ম খারাপ এ প্রচার করেন নি কিংবা হিন্দুর শাস্ত্রীয় বিধান নিয়ে কোনো কথা বলেন নি।

অবশ্য এটাও সত্য যে অসংখ্য পীর-ফকিরদের সাদামাটা জীবন যাপন, উদার কার্যাবলী ও অলৌকিক ক্রিয়া কাণ্ড (বুজরুগি) ইসলাম ধর্মের প্রতি সাধারণ হিন্দুর আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। তাদের মসজিদ, মাদ্রাসা স্থাপন, এতিমখানা (অনাথালয়) ও মেহমান খানা নিপীড়িত অসহায় মানুষকে সাহায্য করেছে। বিনা খরচে পড়া-শুনা, বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে মানুষ খুশি হয়। তার উপরে পথঘাট নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন করে জলকষ্ট নিবারণ প্রচেষ্টা মানুষকে ইসলাম ধর্মের দিকে নিয়ে যায়। সে সময় জাতপাতের অত্যাচারে নিম্নবর্ণের মানুষেরা ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের প্রতিষ্ঠা করা জলাশয়ের জল ছুঁতে পেতনা, ফলে জলকষ্টে পীড়িত মানুষ এতে আনন্দিত হয়। কেননা মুসলিম খনিত পুকুরে সকলের সমান অধিকার। সর্বোপরি গোঁড়া হিন্দুদের অত্যাচার ও জাত প্রথার ফলে এমনিতেই নিম্ন বর্গীয়েরা জাতি হারা, মান হারা, অচ্ছুৎ পরিত্যক্ত মনুষ্যতর জীব হিসেবে গণিত হত। তাই তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে খনিকটা বল পেয়েছিল, উঁচু জাত হয়তো পায়নি, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবানদের দলভুক্ত হতে পেরেছিল। তাই ধর্মান্তরণের পর নাপিত হল হজ্জাম, ধোপা হল গাস্‌সাল, তন্তুবায় হল তাঁতী বা জোলা. আর চণ্ডাল হল কসাই। কিন্তু সুবিধাবাদী হিন্দু ধনীর দল সম্পদ ও সম্পত্তি বাঁচাতে খাঁ, খান ইত্যাদি পদবী গ্রহণ করে রাতারাতি মুসলমান শাসকের কুনজর এড়িয়ে ছিলেন। অনেকে তুর্ক-আফগান শাসকদের সঙ্গে নিজ কন্যার বিয়ে দিয়েছেন কিংবা নিজপুত্রের বিয়ে দিয়েছেন নবাবজাদীর সঙ্গে। এই সব শাসকরা ধর্মান্তরনিকরণে উচ্চবর্ণের হিন্দু ও ব্রাহ্মণকেই বেছে নিয়েছিলেন। দৃষ্টান্ত ছিল দিল্লীর। কেননা ফিরোজ তুঘলক, আলাউদ্দিন খলজী, খিজির খান, আকবর থেকে আওরঙ্গজেব সবাই উচ্চবর্ণের হিন্দুরমণীকেই বিয়ে করেছিলেন। নিম্নবর্ণের কেউ সেখানে ছিলনা। আর বঙ্গদেশে! উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়— ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে ইলিয়াস সাহের বিয়ে, ব্রাহ্মণ কালা পাহাড়ের সঙ্গে কররানী সুলতানজাদীর বিয়ে, হুসেন শাহের এগারো কন্যার সঙ্গে বারেন্দ্র ভাদুড়ী বংশীয় ব্রাহ্মণ সন্তানদের বিয়ে।

তবে ছোঁয়াছুয়ি বা স্পর্শদোষের কারণে এবং রক্ষণশীল হিন্দু ধর্মের নানান ফতোয়ায় বহু মানুষ ধর্মচ্যুত হয়েছিলেন। দৃষ্টি দোষ, স্পর্শ দোষ, খাদ্য দোষ, ঘ্রাণ দোষ হিন্দু সাধারণের কাছে সাংঘাতিক ছিল। এমনকি কাক পক্ষীতেও যদি কোনো প্রকার গোমাংস বাস্তু ভিটেয় ফেলত তবে জাতিচ্যুত হতে হত। কোনো মুসলমান (যবন) হিন্দু নারীর প্রতি দৃষ্টি দিলে, ছুঁলে, জাত যেত। অজ্ঞাতে গোমাংস ভক্ষণ করলেও তাই। বাগেরহাট খুলনার বিখ্যাত পীর খান জাহানের অন্যতম শিষ্য মহম্মদ তাহের পূর্বে ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। তিনি মুসলমান হয়েই ব্রাহ্মণ কায়স্থকে মুসলমান করতে উদ্যোগী হন। কারণ উচ্চবর্ণীয়দের ধর্মান্তরিত করতে পারলে নিম্নবর্ণীদের বেলায় অতটা বাধা পেতে হবে না। প্রতাপাদিত্যের পতনের পরে একলপ্তে ১৪০০ ব্রাহ্মণ ধর্মান্তরিত হন। মহম্মদ তাহেরের সংস্পর্শে যে সব বংশ পীরালি হয়েছিল— রায় চৌধুরী, মুস্তাফী, মুখোপাধ্যায় (মুখোটী) প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, বৃহৎমাপের দুজন মাত্র স্বেচ্ছায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। প্রথম জন হলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় রাজা

মেচ। নাম বদল করে হন আলী মেচ। অপব জন হলেন রাজা গনেশের পুত্র যদুমল্ল। ইনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালুদ্দিন নাম গ্রহণ করেন।

বঙ্গে সুমলিম অধিকার বিস্তারের উৎকৃষ্ট প্রমাণ নগরেই বেশী দেখা যায। কেননা নগর আর দুর্গকে কেন্দ্র করে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। কোনো স্থান অধিকার করে দুর্গ নির্মাণ ছিল প্রথম কাজ। তাই বড় শহর গুলোতে—মসজিদ, মাদ্রাসা, সমাধি, হামামেব এত ঘটা। তুলনায় গ্রাম ছিল পরিত্যাজ্য। নদী, খাল-বিলে ঘেরা বাংলাদেশে মশা, মাছি, বোগ-শোক, কাদাপথ, ঝড় ঝঞ্ঝা, বৃষ্টিপাত সেনা অভিযানের প্রতিবন্ধক ছিল। তাই গ্রামাঞ্চলে ইসলাম ধর্ম বিস্তারে পীর, ফকির, পীরানি, আউলিয়া, দববেশরা বেশি ভূমিকা নিয়েছিলেন। নির্জনে সাধনা ও জনগণেব সেবা কবার মানসিকতাও ছিল।

বাঙালী, বিদেশীর ভাবধারা, ধর্ম চিন্তা, ও সংস্কৃতির সঙ্গে কিভাবে মানিযে নিয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন জাগে। ইতিহাসকার লিখছেন—"বাঙ্গালী জাতির মন, চিন্তাধারা ও কর্ম প্রচেষ্ঠা ছিল ন্যূনাধিক পরিমানে প্রাচীন উত্তর-ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি বিদ্রোহাত্মক না হইলেও সহানুভূতি বিহীন। বহিরাগতদের ধর্ম, চিন্তা ও ভাবধারা বাঙালী সম্পূর্ণ গ্রহণও করে নাই, আনুষ্ঠানিক ভাবে বর্জনও করে নাই। বঙ্গের ভূ প্রকৃতি, জলবায়ু এবং পুনঃ পুনঃ নদীর গতি পবিবর্ত্তনে বাঙ্গালী হিন্দু পরিবর্তন এবং বিদেশী বিধর্মী মুসলমানের সহিত ও তাহারা সেই কারণেই সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারিয়াছিল।"

বঙ্গদেশে মুসলিমা বিজয়ের প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল লুণ্ঠন আর পরোক্ষ ছিল ধর্ম, সভ্যতা সংস্কৃতি প্রচারের বিলাস। তাই দেখি বিজয়েব পরে আল্লাহর প্রার্থনার জন্য মসজিদ নির্মাণ, মসজিদের জন্য জমিদান, তদারকের জন্য ইমাম নিয়োগ। ইসলামি কায়দায় বিচারের জন্য আরবী জানা কাজী, উলেমা ও মোল্লা নিয়োগ। তাবা সবকিছুতেই সাক্ষর বা চিহ্ন রাখতে ভালবাসতেন। তাই মৃত সুলতানের সমাধি সৌধই শুধু নির্মাণ করা হতনা, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ সৌধ নির্মাণ করা হত। মৃত, পীর, ফকির, আউলিয়া, সুফী সাধকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও পূণ্যার্জনের জন্যও তা করা হত। এগুলি আজও দুই বাংলায় ছড়িয়ে আছে। এইসব সৌধের গায়ে, দেওয়ালে, ভিতে, শিলালিপিতে নাম, পিতৃপরিচয়, হিজরি সন তারিখ লেখা আছে। অনেক জায়গায় নেই, কিংবা কালের করালগ্রাসে হাবিয়ে গেছে। যদি এইসব কবর, মাজার, দরগার, স্থান-কাল-পাত্র আলোচনা করা যায়, কিংবা নির্মাতার নাম, সন, তারিখ, সমকালীন সুলতানের নাম কিংবা কবরে শায়িত সুলতান বা পীর-ফকির গাজীর নাম, মাজারটির স্থাপত্য শৈলী বিচার করা যায় তবে ইতিহাস রচনায় তা মূল্যবান উপাদান হিসেবে বিবেচিত হবে। কিংবা কিংবদন্তী, কেচ্ছা, কাহিনী গীত ইত্যাদি জানা যায় তাহলেও ইতিহাসের পক্ষে মঙ্গল। কেননা যুগ প্রভাবে এসব 'গল্প বুড়ো' বা 'গল্প বুড়ী' ঠাই নিয়েছে যাদুঘরে।

এক্ষণে মনে রাখা দরকার যাঁরা বিখ্যাত, যাদের নিয়ে ইতিহাস লেখার প্রভূত উপাদান আছে, যাঁদের নিয়ে নানাবিধ গ্রন্থ লেখা হয়েছে সেই সুলতান বাদশাহের কথা নয়, যাদের কথা আজও লেখা হল না বা ঠিকভাবে লেখা গেলনা তাদের কথাই বিবেচ্য। অজানা সমাজ

ইতিহাসের দ্বার উন্মোচনে এগুলো পর্যালোচনা ভীষণ জরুরী। অল্পকথায় বাংলাদেশের কিছু কবর, দরগা ও মাজারের পরিচয় দেওয়া যাক।

রাজশাহী

(ক) *নাম না জানা কবর* : শিবগঞ্জ থানার কানশাটেব অদূরে হোসেন শাহের রাজত্বকালে নির্মিত ছোট সোনা মসজিদের ভেতরে ইটের পাকা গাঁথনিব বেদীর উপব দুটি পাশাপাশি কবর আছে। বেদীর আয়তন ১৫×১০ ফুট। কবর দুটি কাব? সাধারণের বিশ্বাস, মসজিদ নির্মাতা ওয়ালী মহম্মদ ও তাঁর স্ত্রীর। গবেষণা প্রয়োজন।

(খ) *পীরমখদুম শাহের দরগা* : রাজশাহী কলেজের দক্ষিণ কোণে পীর মখদুম শাহের দরগা। জানা যায় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে বঙ্গদেশে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

(গ) *নিমাই শাহের দরগা* : জানা যায় নিমাই শাহ ধর্মান্তরিত হিন্দু সন্ন্যাসী। ধর্ম বদল হলেও পূর্বের নাম বদল হয়নি। বারেন্দ্র গবেষণা সমিতি জানিয়েছিলেন প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপেব উপর দরগাটি নির্মিত।

(ঘ) *শাহ নিয়ামত উল্লার মাজার* : শিবগঞ্জের ছোট সোনা মসজিদের অদূরে উত্তরে আছে শাহ নিয়ামত উল্লার মসজিদ। মসজিদের উত্তরে প্রায় দু একর জায়গা জুড়ে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা মাজারের এলাকা। ফুলের গাছ। কাঁচা পাকা কবর। দক্ষিণে অনেকগুলি পাকা কবর। জনশ্রুতি শাহ নিয়ামত উল্লা সম্রাট শাহজাহানের দাক্ষিণ্য পেয়েছিলেন।

(ঙ) *মখদুম শাহর মাজার* : রাজশাহী শহরের দক্ষিণে পদ্মা নদীর তীবে এটি অবস্থিত। দক্ষিণ দিক দিয়ে মাজারে ঢোকার একটিই দরজা। কবরটি জরির কাপড়ে ঢাকা। বর্গাকৃতি মাজারের একটি গম্বুজ। দক্ষিণ দেওয়ালের শিলালিপি থেকে জানা যায় ১৬৩৫ ক্রিস্টাব্দে শাহজাহানের রাজত্ব কালে আলিকুলি নামক একজন শিয়া মুসলমান গম্বুজটি নির্মাণ করেন।

খুলনা

(ক) *জিন্দাপীরের মাজার* : খুলনা-বাগেরহাটের হোসেন শাহী মসজিদের প্রায় মাইল দুয়েক পশ্চিমে ঠাকুর দীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে জিন্দা পীরের মাজার ও মসজিদ। মাজারটি দেখতে বর্গাকৃতি। দেওয়াল ৫ ফুট পুরু। মাজারের মাঝখানে কবরটি অবস্থিত। এই মাজারের উত্তরদিকে ৫টি কবর ও পশ্চিমে ৪টি পাকা কবর আছে। এছাড়া কিছু নূতন কবরও দেখা যায়। জিন্দাপীর খানজাহানের প্রিয় অনুচর ও অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। খান জাহানের সঙ্গে সম্পর্ক কী ছিল? প্রকৃত ইতিহাস জানা দরকার। তাঁকে হুসেন শাহের আমলের লোক বলে কেউ দাবি করেন, তা কতটা সত্য?

(খ) *খাঁ-জাহানেব মাজার* : খাঁ জাহান বা খান-ই-জাহান। খুলনা বাগেরহাটের সীমা ছাড়িয়ে যাঁর জানপ্রিয়তা গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ঠাকুর দিঘি উত্তব পাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে এটি অবস্থিত। এই মাজারটি সম চতুষ্কোণ। বাইরের মাপ ৪৬×৪৬ ফুট। মাটি থেকে ৩ ফুট উচু করে পাথর দিয়ে নির্মিত। এই পাথর চট্টগ্রাম থেকে এসেছিল। পাথরগুলির ২ ফুট দৈর্ঘ্য, ৩ ফুট প্রস্থ এবং ৮ ইঞ্চি পুরু। মাজারের মেঝে মীনা করা ইঁট দিয়ে নির্মিত ছিল। এখন সেগুলো নেই। সমাধি মঞ্চটি ঘরের মাঝখানে মীনা করা টালি দিয়ে নির্মিত ছিল, এখন নেই। সমাধিবেদীর শীর্ষ পাথরের উত্তর গায়ে লেখা আছে—"ঈশ্বর এক এবং

অদ্বিতীয়; মহম্মদ তাঁহার রসুল (ধর্মোপদেশক) বা প্রতিনিধি মাত্র।'' নানা প্রকার আরবী ও ফার্সী লিপিতে খোদাই করা নানা পাথর ছিল। এখন অনেকগুলি নেই। তিনি মারা যান ৮৬৩ হিজরী সনের ২৬শে জিলহজ্জ বুধবার। তিনি নাকি বাংলাদেশে ৩৬০ দিঘির নির্মাতা? বহু পথঘাটও তিনি নির্মাণ করেন। অসংখ্য দীন দুঃখীকে সাহায্য করেন। তাঁর সোনা বিবি ও রূপা বিবি নামে দুই স্ত্রী ছিল। পশুপতি চট্টোপাধ্যায় রচিত তাঁর জীবন চরিতের মুখবন্ধে আছে ৩৬০ জন খানজালী বা কোদাল বাহী কর্মচারী সর্বদা কোদাল কাঁধে করে ঘুরতেন। খাট গম্বুজ মসজিদ তাঁর অন্যতম কীর্তি। যদিচ মসজিদের গম্বুজ সংখ্যা ৭৭। কেন? ষাট গম্বুজ মসজিদ থেকে জাহাজঘাটা পর্যন্ত রাস্তার দুধারে একদা প্রচুর বৌদ্ধ কীর্তি ছিল। পুরাতন বৌদ্ধ নগরীর ধ্বংসাবশেষের উপরে কি তাঁর নিজস্ব নগর পত্তন?

(গ) *পীর আলি মহম্মদ তাহেরের কবর* : খান-ই-জাহানের মাজারের অদূরে কালো পাথরে তৈরি একটি কবর। খান-ই-জাহানের কবরের মতই দেখতে। সমাধি লিপি হচ্ছে "এই স্থান স্বর্গীয় কাননের অংশ বিশেষ এবং ইহা এক বিশেষ বন্ধুর সমাধি, তাঁহার নাম মহম্মদ তাহের, তারিখ ৮৬৩ জেলহজ্জ।" সতীশচন্দ্র মিত্র জানিয়েছেন পীর আলি ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন পরে মুসলমান হন এবং বহু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করেন। 'পীরালি ব্রাহ্মণ' শব্দটি তাঁর কারণেই সৃষ্ট। পীর আলি মহম্মদ তাহের অন্যত্র মারা যান। বন্ধুর স্মৃতি রক্ষার্থে খান-ই-জাহান এই শূন্যগর্ভ সমাধি বেদীটি নির্মাণ করেন।

ঢাকা

(ক) *পরী বিবির মাজার* : ঢাকার লালবাগ এলাকায় বুড়ি গঙ্গার তীরে এটি অবস্থিত। বর্গাকৃতি ৪টি কামরার মাঝে আরও ৪টি কামরা আছে। প্রত্যেকটি সমমাপের। একটি কামরার মাঝখানে পরী বিবির কবর। কারুকার্য খচিত তিন তাকের কবরটি মার্বেল পাথরে নির্মিত। ছাদের উপরে ১টি গম্বুজ, তামা বসানো। রোদ পড়লে মনে হত সোনার তৈরী। কিন্তু কে এই পরীর মত সুন্দরী মহিলা? কারও মতে শায়েস্তা খাঁনের কন্যা। উরঙ্গজেবের পুত্র শাহ আজমের সঙ্গে বিয়ের পূর্বেই মারা যান। কেউ বলেন মীর জুমলা কর্তৃক অপহৃত আসামের রাজকন্যা। সত্য ইতিহাস কী কে জানে?

(খ) *চম্পা বিবির মাজাব* : ঢাকার চকবাজার এলাকায় চারিদিকে ঘর বাড়ির ঘেরা টোপে অবস্থিত বর্গাকৃতি এই মাজার। একটি মাত্র গম্বুজ। চারপাশে ৪টি দরজা আছে। নবাব শায়েস্তা খাঁর বাঙালী স্ত্রী ছিলেন চম্পা।

(ঘ) *অজ্ঞাত মাজার* : ধানমণ্ডী এলাকায় মোহাম্মদ পুরের অদূরে একটি মাজার ইমারতের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। অনুমান এটি শায়েস্তা খাঁনের কন্যার কবর।

(ঘ) *হাজী খাজা শাহবাজের মাজার* : ঢাকার রমনা এলাকায় অবস্থিত এটি। বর্গাকৃতি এই ইমারতের প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য ২৪ ফুট। মোঘল আমলের বিত্তবান ব্যবসায়ী ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে নিজেই তৈরী করেন।

(ঙ) *হাইকোর্টের মাজার* : রমনা এলাকার বর্তমান সুপ্রিম কোর্টের লাগোয়া। মাজারের গায়ে সাইন বোর্ডে লেখা আছে—"শেখ শরফ-উদ-দীন-চিশতী ওরফে 'চিশতী বেহশ্‌তীর মাজার। উত্তর দিক ছাড়া অন্য তিন দিকে ১টি করে দরজা আছে। এখানে ঢাকার প্রথম

মোগল সুবাদার অথবা সুবেদার ইসলাম খানকে কবর দেওয়া হয়েছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে। তবে যাঁরই হোক, দেহটি এখান থেকে তুলে অন্যত্র দাফন করা হয়। ফলে শূন্যগর্ভ মাজার এটি। এক সময় পতিত অবস্থায় পড়ে থাকলেও বর্তমানে জমাটি ভাব দেখা যায়।

(চ) *মীরপুর মাজার* : মীরপুর একনম্বর ব্লকে অবস্থিত। মাজারের দেওয়াল প্রায় ৮ ফুট পুরু। বাগদাদের অধিবাসী শাহ বাগদাদী ফরিদপুর জেলাব গেরদা হয়ে এখানে আসেন।। আগে এটি মসজিদ ছিল। সুলতান শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহর রাজত্বকালে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে এটি তৈরী হয়। ৪ জন শিষ্য সাগরেদদের নিয়ে শাহ আলী এখানে এসে চল্লিশ দিন ধরে উপবাসী অবস্থায় এই ভগ্নপ্রায় মসজিদের দরজা জানাল্য বন্ধ করে সাধনা করতে থাকেন। ৪০ দিন পরে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলে সেই স্থানেই একটি উষ্ণ রক্তপূর্ণ পাত্রে কবর দেওয়া হয়। ফলে অতীতের মসজিদ, মাজারে পরিণত হয়। তিনি ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।

(ছ) *দমদমার নিকটবর্তী প্রাচীন কবর স্থান* : সোনারগাঁর অদূরবর্তী মোগরা পাড়ার কাছেই আছে দমদমা বা সুরক্ষিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। তার ভেতরেও আছে ধ্বংস প্রাপ্ত মাজার। তার উত্তরে দেখা যায় একটি এক গম্বুজের মসজিদ। এই মসজিদের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের পূর্ব দিকে আছে প্রাচীর ঘেরা পুরানো কবর স্থান। জনশ্রুতি, এগুলো কয়েকজন সুলতানের কবর। মৃত্যুর পূর্বে তারা বেশ আর্থিক অস্বচ্ছলতায় পড়েছিলেন বোধ হয়। মোগরাপাড়া বাজারের কাছেই নহবত খানা। এর সামান্য উত্তরে খানকা শরীফ। তার পশ্চিমে ৪টি পাকা মাজার আছে। এগুলোর মাপ ৮×৮ ফুট। ধারণা এগুলো ইব্রাহিম দানেশ মন্দ ও অপব তিন জন আউলিয়ার। গঠন প্রণালী দেখে মনে হয় মাজারগুলি মোগল যুগের।

(জ) *গিয়াস-উদদীন আজম শাহের মাজার* : দমদমা থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে এই মাজারটি অবস্থিত। এখানে একটি খালের পাড়ে দুটো কবর আছে। একটি পুব পাশে অপরটি পশ্চিম পাশে। পশ্চিম পাশের কবরটি ১০ ফুট লম্বা ও ৫১/২ ফুট চওড়া। মাটি থেকে ফুট চারেক উঁচু। বহু অর্থ ব্যয় করে রাজমহল থেকে কালো পাথর এনে এটি তৈরী করা হয়েছিল। মনে করা হয় এটি সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের মাজার। তিনি ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের সুলতান হন। ১৪১০ খ্রিস্টাব্দে গুপ্ত ঘাতকের হাতে প্রাণ দেন। ধারণা করা হয় এখানে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল। জনশ্রুতি এটি জনৈক পীরের কবর। তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর ভক্ত সুলতান আজম শাহ রাজমহল থেকে পাথর এনে এটি নির্মাণ করেন।

তুলনায় পুব দিকের জরাজীর্ণ প্রাচীন কবরটি অতি সাধারণ। তিন ধাপের ইটের তৈরী কবর সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই। মাত্র ৪০ ফুট দূরত্বের এই কবরটির সাথে পশ্চিমের মূল্যবান কবরটির কোনো যোগ ছিল কিনা গবেষকরাই তা বলবেন?

(ঝ) *পাঁচ পীরের দরগা* : গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের কবরের কাছেই ভাগলপুর গ্রামে পাঁচপীরের মসজিদ ও দরগা আছে। মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। মসজিদের পিছনেই আছে ৬০ ফুট লম্বা দেওয়াল ঘেরা স্থান। মাটি থেকে ফুট চারেক উঁচুতে পর পর ৫টি কবর

আছে। মনে করা হয় এগুলো ইসলাম ধর্ম প্রচারক পাঁচজন পীরের। এরা মগদস্যু বা হিন্দুদের সঙ্গে যুদ্ধে শহীদ হন বা স্বাভাবিক ভাবে মারা যান একই সঙ্গে।

এছাড়া সোনারগাঁর মোয়াজ্জেমাবাদে (মজমপুর) শাহ লঙ্গর এর মাজার আছে।

নারায়ণ গঞ্জ

(ক) *বিবি মরিয়মের মাজার* : হাজী গঞ্জে বিবি মরিয়মের মসজিদ ও মাজার অবস্থিত। আগে দেওয়াল ঘেরা জায়গায় বর্গাকৃতি কামরার মধ্যে বিবি মরিয়মের কবর। কামরার উপরে ছিল গম্বুজ। এখন সে সব নেই। কামরার চারপাশে বারান্দা ছিল। বারান্দায় কিছু অজানা কবর আছে। বিবি মরিয়ম কে ছিলেন? কেউ বলে শায়েস্তা খাঁর কন্যা। কেউ বলে ঈশা খাঁর স্ত্রী, কেউ বলে সোনার গাঁয়ের ইব্রাহিম দানিশমন্দের কন্যা বা পৌত্রী।

(খ) *হাজী বাবা সালেহর মাজার* : নবীগঞ্জে কদম রসুলের মাইলখানেক দক্ষিণে লক্ষ্যা নদীর পূর্বতীরে বন্দর এলাকায় আছে বাবা সালেহর মসজিদ। এর আধ মাইল দক্ষিণে হাজী বাবা সালেহর মসজিদ ও মাজার। শোনা যায় সুলতান হোসেন শাহের আমলে হাজী বাবা সালেহ নামের একজন আমীর এটি নির্মাণ করেন। সম্ভবত: ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে।

(গ) *বাবা আদমের মাজার* : মুন্সী গঞ্জের ৪ মাইল পশ্চিমে বাবা আদমের মসজিদ ও মাজার অবস্থিত। মসজিদের সামনে খোলা উঠোন। এর উত্তর পাশে পাকা বেদীর উপর কবরটি অবস্থিত। লোকে বলে বাবা আদমের কবর। কেউ বলে নির্মাতা মালিক কাফুরের কবর।

দিনাজপুর জেলা

(ক) *চেহেল গাজীর মাজার* (১) : দিনাজপুর শহরের উত্তর দিকে সরকারী কলেজের পাশে ৫৬ ফুট লম্বা কবরটি বিদ্যমান। জনশ্রুতি চল্লিশ জন মুসলিম ধর্ম প্রচারক বীর যোদ্ধার কবর এটি। ধর্ম যুদ্ধে মৃত ৪০ জন ধর্মপ্রচারককে গণ-কবর দেওয়া হয়।

(খ) *দরিয়া বোখারীর মাজার* : ঘোড়াঘাট দুর্গের উত্তরে প্রায় মাইল খানেক দূরে করতোয়া নদীর ডান তীরে সামান্য উঁচু দেওয়াল ঘেরা স্থানের মধ্যবর্তী অংশে গ্রানাইট পাথর দিয়ে তৈরী একটি কবর আছে। একে লোকে দরিয়া বোখারীর কবর বলে। শোনা যায় তিনি মোগল যুগের একজন দরবেশ। ভগ্ন মন্দিরেই ছিল তাঁর শেষ আশ্রয়। মৃত্যুর পরে এখানে তাঁকে কবর দেওয়া হয়।

(গ) *কাজী বদর উদ্দীনের মাজার* : পূর্বোক্ত মাজারের মাইল দুয়েক উত্তর পাশ্চিমে একটি ধ্বংস প্রাপ্ত মসজিদ ও তার অদূরে এই মাজারটি অবস্থিত। শোনা যায় মোগল যুগে তিনি ঘোড়াঘাটের কাজী ছিলেন। কেউ বলেন, তিনি একজন বিখ্যাত দরবেশ ছিলেন।

(ঘ) *চেহেল গাজীর মাজার* (২) : কান্তনগর ঈক্ষু ফার্মের শেষ মাথায় অবস্থিত একটি ৯২ ফুট লম্বা কবর দেখা যায়। এই কবরটি হিন্দু বৌদ্ধ যুগের বিভিন্ন মাপের ইঁট দিয়ে তৈরী। একে *গঞ্জে শহীদান* বলা হয়। জনগণ এটিকেই আসল চেহেল গাজীর মাজার বলে। ধর্ম যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাদের ছিন্ন ভিন্ন মৃত দেহের গণ-কবর এটি।

রংপুর

(ক) *শাহ ইসমাইলের মাজার :* রংপুর শহর থেকে ১৮ মাইল দূরে রংপুর-বগুড়া সড়কের পাশে বড় দরগা নামক স্থানে এই দরগা বা মাজারটি অবস্থিত। তিনি সুলতান বারবাক শাহের সেনাপতি ছিলেন। সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করায় তাকে হত্যা করে সুলতান মুণ্ডু হীন দেহ এখানে কবরস্থ করা হয়। আর মস্তকটি পীরগঞ্জ থানার ৭ মাইল পশ্চিমে কাঁটাদুয়ার গ্রামে সমাহিত আছে। কেউ বলেন পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার গড় মান্দারণে কবরস্থ করা হয়। যা হোক, সাধারণ এই মাজারে মোট ৩টি কামরা আছে। মাঝখানের কামরায় শাহ ইসমাইল গাজীর কবর। পীরগঞ্জ থানা থেকে মাইল দুয়েক দক্ষিণ পশ্চিমে একটি ভাঙা মাজার দেখা যায়। শোনা যায় এখানেই ইসমাইল গাজীর কাটা মুণ্ডুকে কবর দেওয়া হয়।

বগুড়া

(ক) *বন্দেগী শাহর মাজার :* শের পুরের খেরুয়া মসজিদ থেকে অল্প দূরে উত্তর পশ্চিমে ছোট একটি মাজার আছে। লোকে বলে বন্দেগী শাহর মাজার। সঠিক পরিচয় জানা যায়নি।

(খ) *খলজী মসজিদ ও শাহ সুলতানের কবর :* বগুড়া শহরের ৪ ক্রোশ দূরে বঙ্গদেশের প্রথম মুসলিম উপনিবেশ দেবকোট। মুসলমান শাসকগণ এই হিন্দু নামটি অপরিবর্তিত রাখেন। বখতিয়ার খলজী এখানে প্রথম একটি মসজিদ নির্মাণ করেন যার নাম খলজী মসজিদ। এখানেই প্রথম বারোজন বিখ্যাত ইসলাম ধর্ম প্রচাবক আউলিয়াগণের মধ্যে শাহ সুলতানের কবর আছে। এর দেওয়ালে একটি বড় পাথরের টুকরো আছে। একে বলা হয় 'খোদার পাথর'।

(গ) *শেরপুর খানকা ও পীর তুরকান সাহবের কবর :* শেরপুরে একটি পুরানো খানকা বা মসজিদ আছে। আবুলফজলের 'আকবর নামায়-এর উল্লেখ দেখা যায়। বাদশাজাদা মুরাদ এটি ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন। বগুড়া শহরের দুটি আলাদা কবরের মধ্যে পীর তুরকান সাহেবের দেহ ও মাথা আলাদা ভাবে কবরস্থ করা আছে। জনশ্রুতি বল্লালসেনের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। পরে তার মস্তকহীন দেহকে ও মস্তককে আলাদা আলাদা কবরে সমাধিস্থ করা হয়। শহরের দরগাটির নাম *শিরে মোকাম* ও শহরের বাইরেটির নাম *ধড়ে মোকাম*।

(ঘ) *গাজী মিঁয়ার কবর :* শের পুরে গাজী মিঁয়ার কবর আছে। প্রতি বছর জৈষ্ঠ্য মাসের দ্বিতীয় রবিবার এখানে গাজী মিঁয়ার বিয়ের উৎসব অতি জাঁকজমক সহকারে পালিত হয়। শোনা যায় গাজী মিঁয়া জনৈকা হিন্দু নারীকে অপহরণ করে বিয়ে করেছিলেন। গাজীর গানে গাজী মিঁয়ার বিয়ে সম্পর্কে অনেক ছড়া আছে।

পাবনা

(ক) *বুড়া পীরের মাজার :* হান্ডিয়াল বাজারের পশ্চিম সীমান্তে একটি পুরানো মসজিদ আছে, যাঁর নাম পাইক পাড়া মসজিদ। এর অদূরে একটি মাজার আছে যার নাম বুড়া খাঁর মাজার।

(খ) *বারো আউলিয়ার মসজিদ ও মাজার* : পাবনা জেলার শাহাজাদ পুরে বারো আউলিয়ার মসজিদটি অবস্থিত। শোনা যায় পীর মগদ্দিল শাদুল্লার সঙ্গে বারোজন আউলিয়া ইয়ামন থেকে বাংলাদেশে এসে পাবনার কাছে 'হুর সাগরে' নামেন। এই সাগর অঞ্চলে পীরের মসজিদের জন্য ৭১২ বিঘা নিষ্কর জমি দান করা হয়েছিল। পীর মগদ্দিলের কবরের পার্শ্বে এক সারিতে ১৫টি কবর আছে। এর মধ্যে তিনটি কবরে পীরের তিনজন ভাইপো আছেন। বাকী ১২টি আউলিয়ার কবর। এরা ধর্ম যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন মনে করা হয়।

কুষ্টিয়া

ঝাউদিয়া মসজিদ ও দরবেশের মাজার : কুষ্ঠিয়া শহর থেকে মাইল দশেক দক্ষিণ পশ্চিমে ঝাউদিয়া গ্রামে মোগল আলমের একটি মসজিদ আছে। মসজিদের উত্তর-পশ্চিমে আদারী চৌধুরী নামক দরবেশের একটি মাজার আছে। তিনি একজন প্রজাবৎসল ধর্মপ্রাণ জমিদার শ্রেণীর মানুষ ছিলেন।

যশোর

গরীব শাহ ও বাহারাম শাহের কবর : যশোরের অদূরে মুরলী কসবা গ্রামে পীর খান জাহান আলীর এই দুই শিষ্যের কবর আছে। কবর দুটি সম্ভবত: ১৫দশ শতাব্দীর প্রথম দশকে নির্মাণ করা হয়।

ফরিদপুর

মজলিস্ আউলিয়ার মাজার : ভাঙ্গা থানার আজিম নগর ইউনিয়নের পাতরাইল গ্রামে একটি বিরাট দিঘির পশ্চিম তীরে প্রাচীর ঘেরা এই কবরটি দেখা যায়। জনশ্রুতি এটি মজলিস আউলিয়ার মাজার। মাজারের পাথবে হিন্দু মুসলমান সবাই ভক্তি সহকারে দুধ নিবেদন করে।

টাঙ্গাইল

শাহবাবা কাশ্মিরীর মাজার · টাঙ্গাইল শহর থেকে মাইল আষ্টেক দূরে একটি প্রাচীন কবর আছে। এখানকার শিলালিপি থেকে জানা যায়—শাহ বাবা কাশ্মিরী ৯১৩ হিজরী বা ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দে হোসেন শাহের রাজত্বকালে মারা যান। কেউ বলেন, এটি হোসেন শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দিন মামুদ শাহের কবর।

ময়মনসিংহ

বোকাইনগর মাজার : বোকাইনগর দুর্গের পশ্চিম প্রান্তে ১০ কাঠা জায়গা জুড়ে অনুচ্চ প্রাচীর ঘেরা একটি প্রাচীন মাজার আছে। এর ইটগুলো মোগল পূর্ব যুগের। প্রাচীরের মধ্যভাগে তিন ধাপের একটি কবর আছে। অনেকে এটি নিজমুদ্দিন আউলিয়াব কবর বলে থাকেন।

সিলেট

হজরত শা জালালের দরগা : সিলেট শহরের দরগা মহল্লার পাহাড়ী টিলার উগর শাহ জালালের কাঁচা কবরটি অবস্থিত। তার উপরে একটি মাত্র কাপড়ের আবরণ। কাঁচা কবরকে চুনকাম করে সাদা করা হয়। এই কবরের দক্ষিণে শাহ জালালে সঙ্গীদের কয়েকটি পাকা কবর আছে। এগুলির মধ্যে তাঁর ভাইপো পীর আলির কবর অন্যতম। তিনি আরবের একজন

শেখের পুত্র ছিলেন। নীচ থেকে উপরে ওঠার জন্য অনেকগুলি সিঁড়ি। সিঁড়ি পার হলেই একটি গম্বুজের ইমারত আছে। এটি ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে আমিল ফরহাদ খান নির্মাণ করেন। আজ থেকে প্রায় ৬৫০ বছর আগে (১৩৩৯-৫০ খ্রি.) ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ সিলেট অভিযান করেন। শাহজালাল ইসলাম ধর্ম প্রচারে তাঁর সঙ্গে আসেন। জনশ্রুতি তিনি প্রত্যহ প্রভাতী নমাজ পড়বার জন্য মক্কায় যেতেন দ্বিপ্রাহরিক নমাজের জন্য সিলেটেব খানকায় পুনরায় ফিরে আসতেন। একাদিক্রমে ৪০ দিন উপবাসী থেকে রোজা পালন করতেন। ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। ইবন বতুতা তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে লিখেছেন-—শাহ জালালের দরগায় তিনি নমাজ পড়েছিলেন। সিলেটের চারপাশে ৩৬০টি প্রাচীন কবব আছে, জনশ্রুতি এরা শাহ জালালের শিষ্য সহযোগী।

শাহ পরাণের মাজার : শ্রীহট্ট শহর থেকে মাইল চারেক পূর্বে শ্রীহট্ট জযন্তিয়া পাকা রাস্তার দক্ষিণ পাশে শাহ পরাণের মসজিদ ও মাজার আছে। এই কবরটিও খোলা স্থানে অনুচ্চ টিলার উপর। লাল কাপড় দিয়ে সবসময় ঢাকা থাকে। শাহ পরাণ কে? কেন এই হিন্দু নাম?

চট্টগ্রাম

বায়াজিদ বাস্তামীর কবর ও মাজার : চট্টগ্রাম শহরের অদূরে পাহাড়তলি নামক পর্বতেব সানুদেশে এটি অবস্থিত ও চতুর্দশ শতকে নির্মিত। এই চট্টগ্রামই ছিল নিকটবর্তী দ্বীপময় অঞ্চলগুলির ইসলাম ধর্ম প্রচারের ঘাঁটী।

পরিশেষে বলা যায়, হয়তো কিছুই হলনা। কিছু মাজার, কবরের হাল্কা বিবরণ মাত্র হল। অনেকগুলি বাদ রয়ে গেল। যেমন যশোর-মেহের পুরের পীর মেহের উদ্দিনের মাজার, খুলনার আমাদি গ্রামের বুড়া খাঁ ও ফতে খাঁর সমাধি, মাগুরার পীর জয়ন্তীর সমাধির কথা, চট্টগ্রামের পীর বদর উদ্দীনের কথা। আসলে গবেষকরা যাতে কাজে এগোতে পারেন এই লেখাটি তার মুখপাত বলা যায়। কিছু সূত্র ধরিয়ে দেওয়া আর কি।

আর কতকগুলো কথা মনে রাখা দরকার। সাধারণত: মসজিদের পাশেই মুসলমানগণের কবর দেওয়া হয়। পারিবারিক কবরখানাও দেখতে পাওয়া যায়। নজরুল তাই লিখেছিলেন— ''মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই। /যেন কাছে থেকে মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।'' সেকালে পীর ফকিরের মৃত্যুর দিনে কবরে কোরাণ পাঠ হত, মিলাদ শরীফ এর অনুষ্ঠান পালন করা হত। পীর ফকিরের কবরে ধুপ ধুনো দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করা হত। দান খয়রাত, কাঙালী ভোজন ও উৎসব অনুষ্ঠান পালন করা হত। উৎসব প্রিয় বাঙালী জাতি ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে যোগ দিত। সেই ধারা আজও চলেছে।

তথ্যসূত্র :

১. যশোহর খুলনার ইতিহাস / সতীশচন্দ্র মিত্র (১ম খন্ড)।
২. বঙ্গদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, প্রথম পর্ব / ড সুশীল মণ্ডল।
৩. বাংলাদেশের প্রাচীন কীর্তি / আ. কা. মো, জাকারিয়া।
৪. বাংলায় ভ্রমণ, (১ম ও ২য় খণ্ড)। ৫ বিবিধ।

আশু বা অকাণ্ডে মৃতজনের পরীক্ষা

কৌটিল্য

আশু বা অকাণ্ডে মৃত ব্যক্তির শরীর তেল দিয়ে সিঞ্চন করে পরীক্ষা করতে হবে।

- যে মৃত ব্যক্তির মল মূত্র বেরিয়েছে। যার পেট ও ত্বক বায়ু দিয়ে পূর্ণ হয়েছে, যার হাত পা ফুলে গেছে, যার চোখ দুটো খোলা এবং গলায় চিহ্ন বা দাগ আছে তাকে গলা টিপে শ্বাসরূদ্ধ করে মারা হয়েছে বলে ধরতে হবে।

উপরিউক্ত লক্ষণযুক্ত মৃতের বাহু ও উরুদেশ সংকুচিত দেখা গেলে, সেই ব্যক্তি ফাঁসীতে মারা গেছে বলে জানতে হবে।

যে মৃতের গোপনদ্বার ও চোখ শক্ত হয়ে গেছে বা দাঁত দিয়ে জিভ কামড়ে আছে পেট ফুলে গেছে তাকে জলে ডুবিয়ে মারা হয়েছে ধরতে হবে।

- যে মৃত ব্যক্তি রক্তে ভিজে আছে, যার গা থেঁতলে গেছে বা ছড়ে গেছে তাকে কাঠ দিয়ে আঘাত করে মারা হয়েছে ধরতে হবে।
- যে মৃতের শরীর ভেঙ্গে ফেটে গেছে সে প্রসাদ বা অনুরূপ উচ্চস্থান থেকে পড়ে মারা গেছে জানবে।
- যে মৃতদেহের হাত, পা, দাঁত, নখ কপিশ (মেটে রঙ) বর্ণ দেখা যায়, যার শরীরে মাংস রে.ম ও চর্ম শিথিল হয়ে গেছে এবং মুখে ফেনা উঠেছে তাকে বিষপান করিয়ে মারা হয়েছে।

উক্ত লক্ষণাক্রান্ত মৃতের দষ্ট স্থান থেকে যদি রক্ত বেরোয় তবে তাকে সাপ বা অন্য কোনো বিষাক্ত কীট দংশনে মৃত বলে ধরতে হবে।

- যে মৃতের বস্ত্র ও গা ওদিক-ওদিক বিস্ফারিত এবং অত্যাধিক বমি ও পায়খানা হয়েছিল বোঝা যায় তবে তাকে মদকর রস যোগে হত বলে জানতে হবে।

কিংবা উপরের কারণগুলির মধ্যে অন্যতম কারণে হত ব্যক্তিকে এসবও মনে করা যেতে পারে কেউ তাকে মেরে ফেলে রাজদণ্ডের ভয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মেরেছে এটা প্রতিভাত করার জন্য গলায় ফাঁসের চিহ্ন করে দিতে পারে।

বিষ খেয়ে মৃত ব্যক্তির ভুক্তাবশিষ্ট দুধ দিয়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে। কিংবা পাখিকে খাইয়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে। মৃতের শরীরের টুকরো অংশ আগুনে ধরলে যদি চিট চিট শব্দ করে এবং বর্ষাকালের রামধনুর মত নানান বর্ণ ধারণ করে তবে বিষাক্ত বলে জানতে হবে। অথবা মৃত ব্যক্তিকে পোড়ানো হলে যদি হৃৎপিন্ড অদগ্ধ দেখা যায়—তাহলে বুঝতে হবে বিষের কারণে মৃত।

অথবা মৃত ব্যক্তির চাকব-বাকর যাদের মৃতব্যক্তি কটু কথা বলেছিল ও শাস্তি দিয়েছিল

তাদের খোঁজ করতে হবে, যদি তারা বিষ খাইয়ে মেরে থাকে। কিংবা মৃতের সম্পর্কিত কোন স্ত্রীলোক যদি সে মৃতের দ্বারা দুঃখ পেয়ে থাকে কিংবা অন্য কোনো পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়ে থাকে, তারও খোঁজ করতে হবে, কিংবা (মৃত ব্যক্তির) মৃত্যুর পর যদি কেউ তার সম্পত্তির অধিকারী হবে এরূপ মনে করে, কিংবা কোনো স্ত্রীলোক তার ভোগ্য হবে এরূপ মনে করে তবে তারও খোঁজ করতে হবে। এই ভাবে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মৃতব্যক্তি সম্মন্ধেও খোঁজ খবর করতে হবে। এছাড়া তার (ফাঁস লাগিয়ে মৃত ব্যক্তির) কী রকম দুঃখ কষ্ট হয়েছিল তা জানতে হবে।

যে যে কারণে এই হত্যা ঘটতে পারে—নারী সংক্রান্ত, দায় ভাগ জনিত, (রাজ পরিবারে) নিয়োগ জনিত, প্রতি পক্ষের প্রতি রাগ, পণ্যসংস্থা বা ব্যবসার কারণে, কিংবা সংঘ নির্মিত্ত দোষ, (সংঘের প্রাধান্য চলে যাওয়া) বা এই সব কারণে জনসাধাবণ একে অপরের শত্রু হয়ে অন্যাকে হত্যা করতে পারে।

যে ব্যক্তি নিজে মারা গেছে, কিংবা ঘাতকের হাতে মরেছে বা অর্থের জন্য চোর-ডাকাতের হাতে মরেছে কিংবা ভুল করে অন্য অপরাধীর শত্রুর হাতে মারা যায় তবে তার হত্যা সম্পর্কে নিকটবর্তী লোকের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তাব কাছে জানতে হবে— খুন হওয়া ব্যক্তিকে জীবিত কালে কে ডেকেছিল, কে তার সঙ্গে ছিল, কার সঙ্গে সে গিয়েছিল, কে তাকে খুনের স্থানে এনেছিল।

আর যারা অকুস্থলে ঘোরাফেরা করেছে তাদের প্রত্যেককে এক এক করে জিঞ্জেস করতে হবে। কে হত ব্যক্তিকে এখানে এনেছিল, কে তাকে হত্যা করেছে, তোমরা কার কাছে অস্ত্র-শস্ত্র দেখেছো, কাকেই বা উদ্বিগ্ন দেখেছো? তাদের কথামতো অনুসন্ধান আরো চালাতে হবে।

মৃতের শরীরে উপভোগ দ্রব্য সকল যথা, মালা, ছাতা, পোযাক, পরিচ্ছদ, বেশভূষা, অলঙ্কার সকল ভাল করে দেখে সেই সেই দ্রব্যের ব্যবসাদারদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। মৃতের সঙ্গে কার কার বন্ধুত্ব ছিল, সে কোথায় থাকত, সেখানে তার থাকার কোনো কারণ ছিল কিনা, সে কি কাজ করত, তার ব্যবহার কেমন ছিল? তাবপরে খুনী বা ঘাতকদের অনুসন্ধান করতে হবে।

❑ অর্থশাস্ত্র সপ্তম অধ্যায় ৮২ম প্রকরণ। ড. রাধাগোবিন্দ বসাক অনুদিত সাধুভাষায় রচিত অংশ বিশেষের চলিতরূপ।
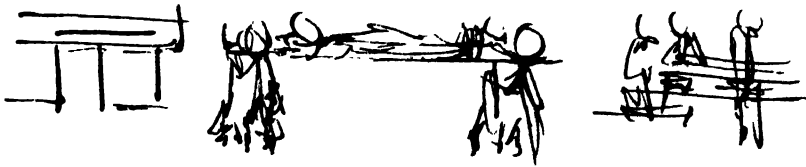
একেশ্বরবাদ সম্মত অন্ত্যেষ্টি কর্ম্ম

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মৃত শরীরের আপাদ মস্তক বস্ত্রে আচ্ছাদন করত অভ্রমিশ্রিত ফল্গু ও পুষ্পে সুসজ্জিত করিয়া প্রান্তরে লইয়া যাইবেক। তথায় মৃত শরীরের সমান দীর্ঘ চুল্লীতে চিতা সজ্জিত করিবেক এবং তদুপরি শবের কোন অঙ্গ কুণ্ঠিত বা বিকৃত না করিয়া যথাবস্থিত শবকে সেই চিতায় উত্তান ভাবে শয়ন করাইবেক। তৎপরে পুত্রাদি অগ্নি লইয়া *ওঁ ব্রহ্মন্ নয় সুপথা রায়ে অস্মাদ্বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্ যুযোধ্যস্মাজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম।* হে ব্রহ্মন্! কর্ম্মফল প্রাপ্তির নিমিত্ত ইঁহাকে এ লোক হইতে সুপথ দ্বারা লইয়া যাও; হে দেব! তুমি সমুদায় কর্ম্ম জানিতেছ, তুমি ইঁহা হইতে কুটিল পাপকে বিয়োজিত কর; তোমাকে ভূয়োভূয় নমস্কার করি। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া সেই অগ্নি মৃতদেহের মুখে স্থাপন করিবেক। পরে চিতাকে প্রজ্বলিত করিবেক। যতক্ষণ মৃত দেহ দগ্ধ না হইবে, ততক্ষণ সকলে তথায় অবস্থান পূর্ব্বক চিতাগ্নিকে রক্ষা করিবেক। মৃতদেহ দগ্ধ হইলে পর সেই চিতাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া পুত্রাদি প্রার্থনা করিবেক। হে পরমাত্মন! তুমি আমার অমুকের (অমুক শব্দ পিতামাতা আদি সম্বন্ধপর) আত্মাকে সংসারের পাপ তাপ হইতে মুক্ত করিয়া তোমার শীতল ক্রোড়ে রক্ষা কর এবং ইহাঁকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যাও। ওঁ *বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরং ওঁ ক্রতোস্মর কৃতং স্মর ক্রতোস্মর কৃতং স্মর।* নিঃশ্বাস-বায়ু বাহিরের অমৃত অনিল হইয়া গেল, এই শরীর এইক্ষণে ভস্মের সহিত ভস্মান্ত হইল; এখন হে মন! আপনার কৃত কর্ম্ম স্মরণ কর, হে মন, কৃত কর্ম্ম স্মরণ কর। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ। অনন্তর মৃত দেহের দগ্ধাবশিষ্ট অংশ তৎসন্নিহিত জলে নিক্ষেপ করিবেক অথবা তাহা ধাতুকুম্ভে রক্ষা করিয়া কোন বিশুদ্ধ স্থানে প্রোথিত করিবে। তৎপরে পুত্রাদিগণ কুলাচার বা শিষ্টাচার পরিপ্রাপ্ত শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া সকলের সহিত গৃহে আগমন করিবেক। ইতি অন্ত্যেষ্টি কর্ম্ম সমাপ্ত।

শোকচিহ্ন ধারণের নিয়ম—কন্যাগণ তিন রাত্রি ও পুত্রাদি দশ রাত্রি শোকচিহ্ন ধারণ করিবেক এবং হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেক। যদি কেহ দূরতর দেশে গিয়া মৃত হয় আর তাহার পুত্রেরা দশ রাত্রি অশৌচকালের মধ্যে মৃত্যুসংবাদ পায় তাহা হইলে তাহারা সংবাদ প্রাপ্তির দিন হইতে অশৌচকালের অবশিষ্ট দিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে। আর যদি অশৌচকাল অতিক্রম করিলে মৃত্যু সংবাদ পায় তাহা হইলে তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে।

শ্রাদ্ধ—কন্যাগণ চতুর্থ দিবসে ও পুত্রগণ একাদশ দিবসে আদ্য শ্রাদ্ধ করিবেক। আদ্য শ্রাদ্ধ দিনে পূর্ব্বাহ্নে শ্রাদ্ধকর্ত্তা ভূমি আসন জল বস্ত্র প্রদীপ অন্ন (আতপ তণ্ডুল ও উপকরণ) তাম্বুল ছত্র গন্ধ মাল্য ফল শয্যা পাদুকা গো (তদভাবে গোমূল্য) স্বর্ণ ও রৌপ্য এই ষোড়শ

দ্রব্য যথারীতি শ্রাদ্ধস্থলে দাদার্থ স্থাপন করিবেন এবং যথাশক্তি ভোজ্য উৎসর্গ করিবেন, যথা, ওঁ তৎসৎ, ওঁ *তদ্বিষ্ণোঃ পবমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং।* ধীরেরা আকাশে প্রসারিত চক্ষুর ন্যায় যে বিশ্বব্যাপী পরমাত্মাকে সর্ব্বদা দর্শন করেন, তাঁহার পবিত্র সন্নিকর্ষ উপলব্ধি করি। ওঁ তৎসৎ *অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা অমুক গোত্রস্য পিতুঃ অমুক দেবশর্ম্মণঃ অক্ষয়স্বর্গ কামনয়া এতানি সঘৃত সোপকরণ আমান্ন ভোজ্যানি যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে সম্পাদানায় অহং দদানি।* ওঁ তৎসৎ *অদ্য অমুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা। কৃতৈতৎ দানকর্ম্মণঃ সাঙ্গদার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে সম্পাদানায় অহং দদানি। কৃতৈতৎ দানকর্ম্মাছিদ্রমস্তু। ওঁ অস্তু (ইতি প্রতিবচনং)।* তৎপরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা দেবীর সম্মুখে উপবেশন করিলে আচার্য্য সাধারণ ব্রহ্মোপাসনা করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম আরম্ভ করিবেন। যথা, ওঁ *মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং। মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ।* গৃহী ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা জানিয়া সর্ব্ব প্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা করিবেন। *ওঁ শ্রাবযেন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ। পিত্রোবাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ।* কুলপাবন সৎপুত্র পিতামাতাকে মৃদু বাক্য কহিবেক, তাঁহাদের প্রিয়কার্য্য করিবেক এবং আজ্ঞাবহ থাকিবেক। ওঁ *গুরুণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং মাতা পরমকোগুরুঃ। মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা।* সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু হয়েন; মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরু, আর পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর। ওঁ *যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাং। ন তস্য নিষ্কৃতিঃ* ক্লেশ সহ্য করেন, শত বৎসরেও তাহার পরিশোধ করিতে কেহ শক্ত হয় না। ওং *পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তঃ পুণ্যস্থানং স্ম গচ্ছতি। পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে।।* মনুষ্য পুণ্য কর্ম্ম করিলে পবিত্র কীর্ত্তি লাভ করেন এবং পুণ্যলোকে গমন করেন, পুণ্য জীবের প্রাণ ধারণ করেন, পুণ্য প্রাণদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ওঁ *ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াৎ বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ। পরলোকসহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্যপীড়যন্।।* কোন প্রাণীকে পীড়া না দিয়া, পরলোকে সাহায্য লাভার্থে, পুত্তিকেরা যেরূপ বল্মীক প্রস্তুত করে, তদ্রূপ অল্পে অল্পে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবেক। ওঁ *নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ। ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতির্দ্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ।।* পরলোকে সহায়ের নিমিত্ত পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, জ্ঞাতি বন্ধু, কেহই থাকে না; কেবল ধর্ম্মই থাকেন। ওঁ *একঃ প্রজায়তে জন্তুরেকএব প্রলীযতে। একোহনুভূঙক্তে সুকৃতমেকএব তু দুষ্কৃতং।।* মনুষ্যএকাকী জন্ম গ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়; একাকী স্বীয় পুণ্যফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃতি ফল ভোগ করে। ওঁ *মৃতং শরীর-মুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্টসমং ক্ষিতৌ। বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি।।* বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃত শরীরকে কাষ্ঠ-লোষ্টবৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করেন; ধর্ম্ম তাহার অনুগামী হয়েন। ওঁ *শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।* ইতি শ্রাদ্ধ-সাধারণ কর্ম্ম সমাপ্ত। পিতৃশ্রাদ্ধ।

ব্যাখ্যান্ — ওঁ মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং। মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্ব-প্রযত্নতঃ। গৃহী ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা-স্বরূপ জানিয়া সর্ব্ব প্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা করিবেন। পরমেশ্বরেরই এই সংসার, তিনি ইহার পরম পিতা। তাঁহার

সন্তানগণের মধ্যে তিনি এক এক পরিবারে এক এক পিতাকে আপনার প্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত করিয়া সুনিপুণ প্রণালী স্থাপন করিলেন; এবং নিজের মঙ্গল-ভাবের প্রতিরূপ যে স্নেহ মমতা, তাহা জনক-জননীর বিকশিত হৃদয়ে অর্পণ করিলেন। এইরূপে তিনি প্রতি পরিবারে আপন প্রতিনিধির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার এই বিশাল বিশ্ব-সংসার পালন করিতেছেন। যেমন নভোমণ্ডলে এক এক সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া গ্রহ-উপগ্রহ সকল প্রজ্বলিত রহিয়াছে, সেইরূপ এই সংসারক্ষেত্রে এক এক পিতার অধীনে থাকিয়া পুত্র-কন্যারা জীবন ও সম্পদ্ লাভ করিতেছে। সকল গুরুর মধ্যে মাতা পবম গুরু, মাতার স্নেহ ও দুগ্ধে প্রথমেই বালক পরিপোষিত হয়। ঈশ্বরেবই মঙ্গলভাব মাতার হৃদয়ে স্নেহ-রূপে, স্তনে দুগ্ধ-রূপে পরিণত হইতেছে। সকলের জননী—সকলের ধরিত্রী যে এই পৃথিবী, মাতা এই পৃথিবী অপেক্ষাও গরীয়সী; আবার পিতা তাঁহা হইতেও গুরুতর। অতএব গৃহী ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা-স্বরূপ জানিয়া,—ঈশ্বরের প্রতিনিধি-স্বরূপ জানিয়া সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহাদের সেবা করিবেক। কূল-পাবন সৎপুত্র তাঁহাদিগের প্রতি মৃদু বাক্য কহিবেক, তাঁহাদের প্রিয় কার্য্য করিবেক ও সর্ব্বদা আজ্ঞাবহ থাকিবেক। সংসারের স্নেহ নিম্নগামী; স্নেহভাজনকে স্নেহ সকলে সহজেই করে। ভক্তি কিন্তু দেব-ভাব, তাহা ম্নিনগামী নহে। পশুর মধ্যে দেখ স্নেহবৃত্তি কেমন প্রবলা, শাবকদিগকে তাহারা কেমন স্নেহে কেমন যত্নে পালন করে; কিন্তু পিতামাতার প্রতি সেই পশুশাবকদিগের শ্রদ্ধা ভক্তি কোথায়? ভক্তির ভাব কেবল মনুয্যে। ভক্তির ভাব পশুতে নাই, ইহা অতি উৎকৃষ্ট ভাব, সুতরাং অতি বিরল। পিতামাতা সহজেই পুত্রদিগকে স্নেহ করেন; যাহাবা সৎপুত্র-কুলপাবন সৎপুত্র, তাহারাই কেবল পিতামাতাকে কর্ত্তব্যানুযায়ী ভক্তি করে। যে পরিমাণে স্নেহ, সে পরিমাণে এখানে ভক্তি নাই। একটি যে নির্ভরের ভাব, সেই নির্ভরের ভাবটি ভক্তিভাবকে উত্তেজিত করে; সেই জন্য বালকেরা যত দিন পিতার উপরে নির্ভর থাকে, তত দিন তার সঙ্গে ভক্তি থাকে। কিন্তু যে বালক যুবা হইয়া, কর্ম্মক্ষম ও স্বাধীন হইয়া, তাহার বৃদ্ধ পিতামাতাকে ভক্তি সহকারে সেবা করে সেই তার নিষ্কাম ভক্তি। ইতিহাস পুরাবৃত্তে এবং বর্ত্তমান সাধুদিগের জীবন-চরিত্রে এমন কত শত দৃষ্টান্ত আছে যে পিতার জন্য পুত্রেরা অগণ্য কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, পিতার মঙ্গলই তাহাদের মনে অভিসন্ধি। কঠোপনিষদে ইহার একটি সুন্দর উদাহরণ আছে। যখন পিতা নচিকেতার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন *যে তোমাকে যমেরে দিলাম* তখন শ্রদ্ধাবিষ্ট নচিকেতা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে পিতা যদি অঙ্গীকার করিয়াও স্নেহানুরোধে আমাকে যমভবনে পাঠাইয়া না দেন, তবে তাঁহার কথা মিথ্যা হইয়া তাঁহার সাংঘাতিক অনিষ্ট হইবেক। অতএব তাঁহাকে তিনি এই বেদবাক্য স্মরণ করিয়া দিলেন। *অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথা পরে। শস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ।* পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষেবা যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখ, আর এখনকার সাধু সজ্জনেরা যে প্রকার আচরণ করিতেছেন তাহাও দেখ। শস্যের ন্যায় মনুয্য জীর্ণ হইয়া মরে, আবার শস্যের ন্যায় পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে। এমন অনিত্য সংসারে মিথ্যা কহিবার প্রয়োজন কি? অতএব হে পিতঃ! তুমি আপনার প্রতিজ্ঞা পালন কর, আমাকে যম-সদনে প্রেরণ কর। দেখ তাঁর কেমন পিতৃভক্তি। আপনাকে যমেরে দিয়াও পিতার ইষ্ট-সাধনে তিনি

তৎপর হইয়াছেন। আবার যম যখন তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে অভিলাষ করিলেন, তখন সর্ব্ব প্রথমে তিনি বর চাহিলেন যে শান্তসংকল্পঃ সুমনা যথা স্যাৎ আমাকে তোমার নিকটে পাঠাইয়া পিতা অতিশয় শোকাকুল হইয়াছেন; অতএব যাহাতে তিনি শান্তচিত্র সুমনা হন, তাহাই বিধান কর। কঠোপনিষদের আখ্যায়িকাতে সৎপুত্র নচিকেতার পিতার প্রতি মনের ভক্তিভাব কেমন প্রকাশ পাইতেছে। ব্রহ্ম-নিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ পিতামাতাকে ভক্তি করাই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রথম উপদেশ। আমাদিগের বল-বীর্য্য যাহা কিছু পিতামাতা হইতে পাইয়াছি; পিতামাতারই প্রতি ভক্তিবৃত্তি সর্ব্ব প্রথমে উত্থিত হউক। কুল-পাবন সৎপুত্র সর্ব্ব-প্রযত্নে যেন পিতামাতাকে সেবা করেন, সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রিয় কার্য্য করেন ও আজ্ঞাবহ থাকেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে যাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই, যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের শাসন ও উপদেশ অবহেলা করেন, তাঁহারা হয়তো বিদ্যার গৌরবে পিতামাতাকে লঘু জ্ঞান করেন, অথবা ধন-মদে মত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে অবহেলা করেন। হে প্রিয় ব্রাহ্ম সকল! তোমরা কদাপি এমন গর্হিত কর্ম্ম করিও না—তোমরা বিদ্যা-মদে বা ধন-মদে উন্মত্ত হইয়া পিতৃ-হেলন করিও না। আমরা পিতামাতার আশ্রয়ে থাকিয়াই বল বীর্য্য, বিদ্যা বুদ্ধি, উপার্জ্জন করিয়াছি এবং তাঁহাদের প্রসাদেই ধন মান প্রতিপত্তি যাহা কিছু লাভ করিয়াছি; তাঁহাদিগকে অবহেলা বা পরিত্যাগ করিও না। তোমরা বৃদ্ধ পিতামাতার যষ্টি স্বরূপ হইয়া আমৃত্যু তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবে, এই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ। যদিও তোমাদের প্রতি তাঁহারা বিরক্ত হন ও তাঁহাদের স্নেহ অল্প হয়, তথাপি তোমরা তাঁহাদের প্রিয় আচরণ করিবে, তাঁহাদিগকে সমধিক ভক্তি করিবে। *যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাং। ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি।* সন্তান হইলে পিতামাতা যে ক্লেশ সহ্য করেন, শত বৎসরেও তাহার পরিশোধ করিতে কেহ শক্ত হয় না। হে পরমাত্মন্! তুমি পিতা-পুত্রের যে প্রকার সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছ, তাহা উভয়েই যেন সাবধান হইয়া রক্ষা করেন; উভয়েই যেন সমভাবে তোমারই প্রতি দৃষ্টি করেন; সংসার-তরঙ্গের মধ্যে সকল পরিবারই যেন তোমার উপাসনা করিয়া প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করে। সকল পরিবারে পিতা-পুত্রের অন্তরে তোমার মঙ্গল ভাব প্রেরণ কর, তোমার উৎসাহ-ধ্বনিতে বিশ্বসংসারকে পূর্ণ কর। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

* এর পরেও ছিল। 'পিতা মাতার আদ্যশ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধকর্ত্তার প্রার্থনা ও তার ব্যাখ্যান' এবং বার্ষিক শ্রাদ্ধে পুত্রের প্রার্থনার বিস্তৃত বিবরণ।

'একেশ্বরবাদ সম্মত অনুষ্ঠান পদ্ধতি' গ্রন্থটি 'বাউলমন' প্রকাশনের।। আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে টুকরো অংশটুকু সঙ্গে গ্রহণ করেছি মাত্র। উক্ত গ্রন্থের 'মুখবন্ধে' শ্রী অমৃতময় মুখোপাধ্যায় লিখছেন, 'দেবেন্দ্রনাথের একেশ্বরবাদী আদর্শ পালনের সংকল্পের বিরুদ্ধে প্রথম পরীক্ষা এসেছিল ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বৎসর বিলাতে তাঁর পিতা দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়, সে খবর কলিকাতায় পৌঁছালে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা নিয়ে মত বিরোধ হয়। দেবেন্দ্রনাথ অ-পৌত্তলিকভাবে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করবেন বলে স্থির করেন কিন্তু আত্মীয় বন্ধুরা বাধা দিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে

লিখছেন —'আমার ছোটকাকা রমানাথ ঠাকুর আমায় সতর্ক করিয়া দিলেন, দেখো, ব্রহ্ম ব্রহ্ম করবে এ সময়ে কোন গোলমাল তুলিও না। দাদার বড় নাম।' আমি তখন রাধাকান্ত দেবের কাছে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম, তিনি পরামর্শ দিলেন, 'শাস্ত্রে যেমন যেমন বিধান আছে, সেই অনুসারে এই শ্রাদ্ধটি বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন করিও।' তাঁহাকে আমি বিনয়ের সঙ্গে বলিলাম, 'আমি ব্রাহ্মধর্ম ব্রত লইয়াছি, সে ব্রতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে পারিব না। তাহা করিলে ধর্মে পতিত হইব। আমি কিন্তু যে শ্রাদ্ধ করিব, তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ উপনিযদের মতে করিব।' তিনি বলিলেন, 'সে হবে না। সে হবে না। তাহা হইলে শ্রাদ্ধ বিধি পূর্বক হবে না। শিষ্টাচারের বিরুদ্ধে কার্য হইবে।' কাহারো নিকট হইতে আর আমি এ বিষয়ে উৎসাহ পাই না। এমনি বিরুদ্ধভাব দাঁড়াইল, যেন আমি সকলকে রসাতলে ডুবাইতে যাইতেছি। সকলের মনে হইল, যেন আমার একটি কাজে সকল থাকে না সকল যায়।'' তিনি শ্রাদ্ধের দিন পৌত্তলিকতার সংস্রব বর্জিত দানোৎসর্গের একটি মন্ত্র স্থির করিয়া সেই মত দানোৎসর্গ করেন।

২. দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়নের* মধ্যে চিঠিপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিষয়ে আলোচনা চলে। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ানুষ্ঠানের বিষয়ে তিনি দেখি বিশদভাবে লিখছেন—'পারিবারিক রীতি বর্জনের দরকার নেই। শবদাহান্তে আত্মীয়বর্গ আপন পরিবারের প্রথামত শোক চিহ্ন ধারণ করবে, তবে সংকারের ব্যবস্থাটি অনাড়ম্বর ভাবব্যঞ্জক হওয়া দরকার। হিন্দু সংকারের নববস্ত্র পরিধান ও পিণ্ডদানাদি নানা কার্যের নির্দেশ আছে, 'ক্রবাদাগ্নয়ে স্বাহা' বলে 'সপ্তকাঠি' নিক্ষেপ করতে হয়; এবং 'সপ্তবার পরিক্রমা' করে 'উত্তরাস্য' হয়ে মুখাগ্নি করতে হয়। ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানে বলা হল যে, ''আপাদ মস্তক বস্ত্রের আচ্ছাদন করত: অভ্রনির্মিত ফল্গু ও পুষ্পে সজ্জিত করলেই চলবে। প্রথমে ব্যবস্থা ছিল পাদদেশে অগ্নি স্পর্শ করাতে হবে। পরে বোধহয় মুখাগ্নি কথাটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছাপা হয়েছে 'অগ্নি মৃতদেহের মুখে স্থাপন করিবেক। সেই সময় অগ্নি প্রদাতা বাজসনেয় সংহিতা থেকে একটি নির্বাচিত মন্ত্র পাঠ করিবেন।'

লাখড়ার শ্মশানে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকা সতীস্তম্ভ, ছবি সুভাষ রায়

* রাজনারায়ণ বসু

THE SHRADDHA

Extract from Jhon Bull, Date 17th May 1830

It is an undoubted precept of the shasters "on the anniversary of one's death let a multitude be fed", hence it becomes necessary to feed a great many Brahmins at a shraddha, and this practice is universally followed. In the lapse of time it has become the fashion in the first instance to provide large sums to be distributed among mendicants and then to care for the other parts of the ceremony and it is those mendicants who decide upon the honor on the disgrace of a Shraddha. These mendicants turn even a rich man into a beggar, for though one were possessed of three lakhs of rupees, yet if at the shraddha of his father three or four lakhs of beggars should crowed upon him, he is reduced to poverty by distributing his wealth among them. If he refuse to do so, people say, "he is worth nothing, if he were rich, he would certainly distribute his money among the beggars." We therefore judge that this practice of giving to beggars is not among the best for it is equally disadvantageous to the receiver as to the giver. If you say, how can it be disadvantageous to the beggars for them to receive something? We reply, this may be true but it exposses them to the loss of life, for they come to Calcutta from a distance of ten or twelve days journey, and when there, are not dismissed until they have been locked up for two days and nights without food in a house resembling a prison. With the hope of gaining a little, they bring their infant children with them. How many perish through want of food an the labours of the journey, and the heat which arises from so many being locked up together? If their hopes are disappointed they are subject even to greater distress. How then can the reception of one or two rupees compensate for the perpetual distress of the loss of relatives? If they lose a child by death, they are subject to perpetual anguish; such is the distress which the practice inflicts on the beggars.

The river is plunged into even greater distress. If only one in a hundred of the beggars receives nothing, he is disgraced; and though the man may be wealthy it is difficult to distribute the money, for all those who arrive on the day of the shraddha, he is obliged during that day and night to crowed into houses and the next day to begin giving them money. If he should not do so, the beggars would perish through hunger, thirst and heat; the person in whose house they are crowded moreover, becomes annoyed, and he is necessarily obliged to begin dismissing them. As soon as he begins, an innumerable crowd presses forward from every direction and those who have received gifts mingle with those who are yet to receive them, and scream out that they have received nothing. Upon hearing these sounds, all will conclude that nothing has been given to anyone, and yet it is impossible to give them money twice. Hence he is covered with disgrace, an example of which has just been afforded. On Tuesday, the 16th Vysack, at the shraddha of Baboo Ram Gopal's mother an immense crowd of beggars was assembled, whom he was not able adequately to dismiss with gifts, the reason of which may be gathered from our preceding remarks. It was an astonishing occurrence, that Mullick Baboo has no money, we can not acknowledge, and who will say that he is not liberal? Who does not remember the renown acquired by this family through their gifts to beggars. At his father's shraddha he gave away seven lakhs, of which he received only two lakhs from the family wealth, the remainder he supplied himself. At his mother's shraddha, he received a lakh of Rupees from the joint property; all that he spent over and above this sum, was from his own property. Almost every man in this city is acquainted with his liberality; for he gave away four Dan Saugurs, of which the articles in eight were of gold, he also gave sixteen brisus and to the Gosaees and Brahmins shawls, and embroidery,

and gold rings, and who that witnessed the splendour of that festival did not bless him? Yet the Mullick Baboo having done all these great deeds, was unable to acquire credit from the poor. what then can be expected from others? We have before this heard that many have fallen into discredit through their gifts to the beggars; it appears therefore probable that the practice will cease. The beggars were subject to very great distress; through want of food they begged from door to door, and though their plundering in town and in the country were exposed to death from the blows they received. Seeing their distress, many rich men in the town gave them food; more particularly Baboo Ashootosh Dey in his alms-house at Belgachee, For eight days together bestowed food on all the poor who passed and repassed.

We shall hereafter mention the names of the other Baboos who supplied the wants of the poor at this sharddha-chandrika.

শ্রাদ্ধে গোদান, ছবি : অভিজিৎ রায়

সংবাদ শিরোনামে

কবর ও শ্মশান

প্রায় ২৫০ বছরের মধ্যে কলকাতায় নতুন করে কববস্থান গড়ে ওঠেনি। বিভিন্ন নেতা-নেত্রী বার বার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও না। অথচ সমস্যা গুরুতর। স্থানাভাবে একজনের কবরের উপর আর একজনকে কবর দেওয়া হচ্ছে। কলকাতার পাঁচটি বড় কবরস্থানের কোনোটিরই অবস্থা ভালো নয়। কোথাও কোথাও পাঁচিল ভেঙে গেছে। সেগুলো দ্রুত পুনর্নির্মাণ করা দরকার। চলতি আর্থিক বছরে কলকাতা পুরসভা তাদের বাজেটে কবর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। কিন্তু মুসলিম বেরিয়াল বোর্ডের দাবি এক কোটি টাকা। যা হোক অবিলম্বে কমপক্ষে পঞ্চাশ বিঘা জমিতে নতুন কবরস্থান গড়ে তোলা দরকার।

সম্পাদব

সাড়ে চার বছর ধরে চেষ্টা, কবরখানার জমি মেলেনি

সাড়ে চার বছর ধরে চেষ্টা চালিয়েও মুসলিমদের কবরখানার জন্য জমি উদ্ধার করতে পারেননি মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়। একবার উদ্যোগ নিলেও আইনি জটিলতার কারণে পিছিয়ে যেতে হয়েছিল মেয়রকে। এবার ফের ওই প্রকল্পটি সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সাহায্য চাইতে চলেছেন মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়। এই সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মুসলিমদের কবরের জন্য ৫০ বিঘা খালি জমি পাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাবেন মেয়র। পুরসভা সূত্রের খবর, কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (কেআইটি), কেএমডিএ, সেচ দফতর, বন্দরসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রচুর জমি রয়েছে। কলকাতা পুরসভারও অনেক জমি রয়েছে শহরে। 'মুসলিম বেরিয়াল বোর্ড'-এর সদস্যদের যুক্তি, সেই জমি থেকেও ৫০ বিঘা জমি অনায়াসেই কবরেব জন্য দেওয়া যেতে পারে। গত মঙ্গলবার বেরিয়াল বোর্ড-এর সদস্যরা এই বিষয়ে মেয়রের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। মেয়র বোর্ড সদস্যদের আশ্বস্ত করে বলেন, গোটা বিষয়টি তিনি যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করছেন। এবং যাতে আর কোনও জটিলতা না তৈরি হয় সেই জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসবেন তিনি। এবং প্রয়োজনে রাজ্য সরকারকে পুরসভার তরফে চিঠিও দেওয়া হবে হবে জানান মেয়র।

রাজারহাটে প্রাচীন কবরস্থান সংস্কার

গত ২৮ নভেম্বর রাজারহাটের দক্ষিণ নারায়ণপুরে প্রাচীন কবরস্থানের নতুনভাবে উদ্বোধন করলেন পরিবহন মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। এর ফলে স্থানীয় মুসলমানদের দীর্ঘদিনের একটি দাবি পূরণ হল। কবরস্থানটি ২০০ বছরের পুরনো হওয়ায় নতুনভাবে সংস্কার করে গড়ে

তোলার দাবি জানিয়ে আসছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজন। তাঁদের এই দাবি পুরণে এগিয়ে আসেন রাজারহাট গোপালপুর পুরসভার পুরপ্রধান তাপস চট্টোপাধ্যায়। পুরসভা ও এলাকার বাসিন্দাদের সহযোগিতায় ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুনর্নির্মিত এই কবরস্থানটি উদ্বোধনের আগে ফটকের তালা খোলেন হাজি মৌলানা আজহার হোসেন। এরপর ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। স্থানীয় স্কুলমাঠে উদ্বোধনী মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা গুপ্ত, প্রাক্তন বিধায়ক রবীন মণ্ডল, পুরসভার বিরোধী দলনেতা সুখেন চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ হজ কমিটির সম্পাদক তথা পুরপিতা সোলেমান বিশ্বাস প্রমুখ। রবীনবাবু জানান, বিধায়ক থাকাকালীন বিধায়ক কোটা থেকে মোট সাত লক্ষ টাকা করে পেয়েছিলেন। তারমধ্যে এই কবরস্থান ও স্থানীয় একটি শ্মশান সংস্কারের জন্য এক লক্ষ টাকা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার কবরস্থান সংস্কার হলেও শ্মশান সংস্কারের ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। এ ব্যাপারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি উষ্মা প্রকাশ করেন।

চাঁচলে শীতলপুরে মুসলিমরা কবরের জমি দান করল শ্মশানের কাজে

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উল্লেখযোগ্য নজীর তৈরী করল চাঁচল থানার শীতলপুর গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। তারা নিজেদের কবরদানের জমির কিছু অংশ (সাড়ে ১৬ কাঠা) জমি তুলে দিল হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের। এই ঘটনাটি ঘটেছে ১৫ নভেম্বর। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংগ্রেস বিধায়ক মহববুল হক, স্থানীয় সিপিএম-এর জোনাল কমিটির এক নেতা আলি হাসান, চাঁচল থানার ওসি স্নেহাশিষ মুখার্জী, চাঁচল ২নং ব্লকের জয়েন্ট বিডিও এবং হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের একদল মানুষ জেলার এস পি পঙ্কজ দত্ত বলেন, ঈদের আগে মহান কাজ করল স্থানীয় মুসলিম সমাজ। তিনি বলেন, শীতলপুর গ্রামে একই জায়গায় পাশাপাশি ছিল হিন্দুদের সৎকারের জায়গা এবং মুসলিমদের কবরখানা। দুটো জমিই দান করে গেছেন চাঁচলের রাজা শরৎচন্দ্র মুখার্জী ১৯২৭ সালে। একই প্লটে হিন্দুদের জমি ছিল ২০ শতক এবং মুসলিমদের ছিল ২.৮৬ একর। ফলে সৎকার নিয়ে মাঝে মধ্যে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হত। এবং পুলিসকেও টেনশনে থাকতে হত। বিষয়টি নিয়ে অনেক মামলাও হয়েছে। জেলা প্রশাসন দু'পক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসে। গত ১৫ নভেম্বর দুই সম্প্রদায়ের মানুষ ঐক্যমত হয়ে জমি দান করেছেন হিন্দুদের। স্বভাবতই খুশি জেলার কর্তাব্যক্তিরা। স্থানীয় মানুষের দাবি জেলা প্রশাসন এগিয়ে আসুক তাদের এই মহৎ উদ্যোগকে আরো সার্থক করে তুলতে। গ্রামবাসীদের বক্তব্য কবরখানা ও শ্মশানের উন্নতিকল্পে জেলা প্রশাসন সাহায্য করুক। হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের এই অনন্য নজীর শুধু রাজ্য নয়, গোটা দেশের এমনকি গোধরাকাণ্ডের যারা জনক তারাও দেখুক ইচ্ছা অথবা উদ্যোগ থাকলে অনেক বড় মহৎ কাজ করা তার জ্বলন্ত উদাহরণ চাঁচলের শীতলপুর গ্রাম।

কবরস্থান থেকে কঙ্কাল চুরি

বর্ধমান জেলায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে চলেছে মানুষের কঙ্কালচুরির ঘটনা। কবরস্থানের মাটি খুঁড়ে কঙ্কাল গায়েব করে দিচ্ছে পাচারকারিরা। কিন্তু এখনও ধরা যায়নি কাউকে। উদ্বিগ্ন জেলার পুলিশ প্রশাসন। জেলার বিভিন্ন কবরস্থান থেকে মাটি খুঁড়ে কঙ্কাল উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনায় আতঙ্কিত মুসলিমরা। কবরস্থানগুলিও সুরক্ষিত না থাকায় তাঁবা চিন্তিত।....

কালেনা, গলসি, আউসগ্রাম, ভাতারসহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের নানা কবরস্থান থেকে গত আট মাসে ৮০টির মত কঙ্কাল মাটি খুঁড়ে গায়েব করে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। সম্প্রতি কালনা থানার বিজয়নগর গ্রামের কবরস্থান থেকে একরাতে ১১টি কঙ্কাল উধাও হযে গেছে। দু'মাস আগে এই থানারই সিমলন গ্রাম থেকে উধাও হয়েছে চারটি কঙ্কাল। এছাড়া কালনা থানার আকাল পৌষ গ্রামেব কবরস্থান থেকে তিন মাস আগে দুটি ও বৈদ্যপুর গ্রাম থেকে তিনটি কঙ্কাল পাচার হওযার ঘটনা ঘটেছে। এ বছর জুন মাসের শেষের দিকে গলসি থানার সাহা পীর তলা ও কুলডাঙ্গার কবরস্থান থেকে দুটি মরদেহের কঙ্কাল, আউসগ্রাম থানার ইটেচান্দা গ্রামের কবরস্থান থেকে ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এক সপ্তাহে দফায় দফায় আটটি কঙ্কাল চুবি করে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতিরা। ভাতার থানার কবরস্থান থেকেও পাচার হয়েছে কঙ্কাল। ...

বর্ধমান শহরের বেশ কিছু কবরস্থান দেওয়াল দিয়ে ঘেরা হলেও তেমন কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। রাতের অন্ধকারে কাজ হাসিল করে পালিয়ে যেতে কোন অসুবিধাই হবে না পাচারকারীদের। পুলিশ জানিয়েছে, চোরাকারবারীরা সাধারণত ছয় সাত মাস আগে কবর দেওয়া মরদেহ গুলি টার্গেট করে।

অবশেষে তারা ডোম পোড়াল স্বামীর দেহ

পঁচাশি টাকায় কেনা লুঙিটা দেখে শরীরটা কেঁপে উঠল তারাদেবীর। এটা কার 'বডি'। সাত বছরে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে আটশোরও বেশি 'বডি' কাঁধে বয়েছেন তারাদেবী। এ বার তাঁর স্বামীই 'বডি'।

বুধবার রাতভর ইছামতীর তীরে বনগাঁ শ্মশানে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন প্রায় শ'দুয়েক মানুষ। তাঁরা দেখলেন, স্বামীর ছিন্নভিন্ন দেহ কোলে তুলে আড়াই মণ কাঠের উপর শুইয়ে দিলেন তারাদেবী। তারপর আলুথালু চুলে, উন্মাদের মতো নিজের হাতে আগুন জ্বালিয়ে দাহ করলেন স্বামীকে। শ্মশানের পুরোহিত ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী কোনওদিন শবদাহ করার সময় থাকেন না। তিনিও চাব ঘন্টা দাঁড়িয়ে দেখলেন ওই মহিলার স্বামীকে দাহ করার দৃশ্য।

বনগাঁ থেকে বারাসত কিংবা রানাঘাট শাখায় স্টেশনে ট্রেনে কাটা পড়লেই শব আনতে ছুটতে হয় তারা দাসের। সোমবার দত্তপুকুর স্টেশনে 'বডি' আনতে ছুটে গিয়েছিলেন বছব

পঁয়ত্রিশের ওই মহিলা। রেল পুলিশের কর্মীরা তারাদেবীর স্বামী অশোকের মৃতদেহ দেখেই চিনতে পেরেছিলেন। তাঁরা লুকোনোর চেষ্টা করলেও নিজের হাতে কিনে দেওয়া লুঙিটা দেখে আঁতকে ওঠেন তারাদেবী। স্বামী আত্মহত্যা করেছেন জানতে পেরে তিনি নিজেও ছুটে যান ট্রেনের সামনে ঝাঁপ মারতে। রেল পুলিশ তাঁকে বোঝান, ''তুই মরে গেলে মরাগুলির কী হবে রে তারা।'' তাই মরতে পারেননি তারাদেবী। ৮০০ লোকের দেহ যে ভাবে বয়ে এনেছেন, সেভাবেই ভেন্ডার কামরায় দত্তপুকুর থেকে স্বামীকে বনগাঁয় নিয়ে আসেন। নিয়মমাফিক ১৯নম্বর কেস ডায়েরিতে আস্বাভাবিক মৃত্যুর নথিও করে বনগাঁ পুলিশ। 'শব বহনেব গাড়ি' লেখা ভ্যান রিকশায় স্বামীর দেহ বনগাঁ হাসপাতালের লাশ কাটা ঘরে নিয়ে যান। দেহ যাতে পচে না যায় তার জন্য বরফও ছড়িয়ে আসেন। দু'দিন পরেও রেল পুলিশ মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা না করায় বুধবার বিকালে তীব্র অভিমানে নিজেই আবার ভ্যান বিকশা করে দেহ বয়ে আনেন তারাদেবী। এত দিন অন্যের দেহ বইলেও স্বামীর দেহ বহনের জনা কোনও লোককে তিনি পাশে পাননি। তাই নিজেই কাঠ জোগাড় করে চিতায় সাজিয়ে স্বামীকে দাহ করলেন তারাদেবী।

জরুরী দূরভাষ

শববাহী শকট	হিন্দু সৎকাব সমিতি	২২৪১—৩৮৪৯
	সন্তুগুরু	২৪৭৫—৭৬৪০
	পার্কসার্কাস. পূজা	২২৪০—১৭৯৩
	সরকার বাগান	২৫৫৪—১৮৮১
	মীরা	২৪১১—৮৩১৬
	লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশন	২৪৭৯—৩৩০১
	রাজীব মেমোরিয়াল	২৪৮৫—৫০৫০
	লেকটাউন কমিটি	২৫২১—৯৫৭৮
	কুমারটুলি ইনস	২৫৩০—০০০২
	শ্রীভূমি স্পোটিং	২৫৩৪—০০০২
	সিঁথি ইউথ	২৮৭২—০৯২৪
শ্মশান	কেওড়াতলা	৪৬৬—৬৬০২
	সিরিটি	৪০৩—২০১৩
	কাশীপুর	'৫৫৭—৫৭১২
	কাশী মিত্র	৫৫৪—২৯৬৭

খ্রিস্টানদের সমাধি, সমাধিলিপি

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে জোব চার্ণক কলকাতায় আসেন ২৪শে আগষ্ট ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে। সে সময়ে কোম্পানির কর্মচারী ও বণিক যারা মারা গেলেন তাদের সমাধির জন্য হুগলী নদীর তীরে গোবিন্দপুরে একটি সমাধিক্ষেত্র তৈরি করা হয়। সেন্টজন গীর্জা প্রাঙ্গণ। বর্তমান কিরণশঙ্কর রায় রোড, কাউন্সিল স্ট্রীট ও চার্চ লেনের মধ্যবর্তী স্থান সেটি। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে এর কাছেই গড়ে ওঠে কোম্পানীব প্রথম হাসপাতাল। এ হাসপাতালের এত দুর্নাম ছিল যে একবার ভর্তি হলে মরণ সুনিশ্চিত। কলকাতায় তখন ওলাউঠা ও বিষ জ্বরের প্রাবল্য। লোক মরছে কিন্তু সমাধি দেবার ভালো ব্যবস্থা নেই। জোর বৃষ্টি হলে মাটির সমাধি ধুয়ে মুছে বেরিয়ে পড়ছে পচাগলা দেহ। শহরবাসী দুর্গন্ধে নাকাল। তাই কলকাতার প্রথম সমাধিক্ষেত্রটিকে ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে বন্ধ করে পরের বছর ২৫শে আগষ্ট পার্কস্ট্রীটে তৈরি হলো দ্বিতীয় সমাধিক্ষেত্র। সাউথ পার্কস্ট্রীট সেমিট্রি। প্রথম সমাধিক্ষেত্রে জোব চার্ণক ও তাঁর স্ত্রীকে সমাধি দেওয়া হয়। পরে এর উপরে কোম্পানী বারুদঘর গড়ে তোলে।

পার্কস্ট্রীটের কবরখানায় চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন—স্যার উইলিয়াম জোন্স, কর্নেল কিড্ আলেকজাণ্ডার, জর্জ হাইড, হিন্দু স্টুয়ার্ট, অগাস্টাস ক্লীভল্যাণ্ড, ইলিয়ট, আর ওয়াল্টার স্যাভেজ ল্যাণ্ডরের প্রেয়সী রোজ এলমার।

নর্থ পার্ক বেরিয়েল গ্রাউন্ডে বিখ্যাত ব্যক্তির সমাধির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিখ্যাত আমেরিকান ঔপন্যাসিক উইলিয়াম মেকশিপ থ্যাকারের সমাধি।

এবাব মেজর জেনারেল চার্লস স্টুয়ার্ট বা হিন্দু স্টুয়ার্ট সম্পর্কে দুচারটি কথা বলা যাক। তিনি কৃষ্ণ এবং যীশুকে সমানভাবে ভজনা করতেন। তাঁর উড স্ট্রীটের বাড়ি থেকে প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে যেতেন। হিন্দু পণ্ডিতদের ন্যায় সাত্ত্বিক জীবনযাপন করতেন। দঃ ২৪ পরগনার সাগরে একটি সুন্দর মন্দির তৈরী করেছিলেন। তিনি ইংল্যাণ্ডে গেলেও হিন্দুদের দেবীর মূর্তি গুলোকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তাঁর সমাধিস্তম্ভে—ভগীরথ, পৃথ্বী দেবীর সঙ্গে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি খোদিত আছে। কটন সাহেব লিখছেন, *'দি ক্রাউডেড কর্নেল হাউজ ইন দি হার্ট অব দি সিটি গেভওয়ে অ্যাজ আরলি অ্যাজ ১৬৭৭ টু এ নিউ সেমেট্রি অ্যাট দি ইস্টার্ণ অব পার্কস্ট্রীট হুইচ এ্যাপিয়ার্স ইন আপজন'স ম্যাপ অব ১৭৯৩ আন্ডার দি মেলাঙ্কোলি নেম অব করিং গ্রাউন্ড রোড।*

ডাউন ইট উড ফাইল মেনি এ স্যাড কোম্পানী অব মোরনার্স ফ্রম এপ্রিল টু অক্টোবর। 'দি ডিপার্টেড ওয়ান অব হোয়াট এভার ব্যাঙ্ক উই রেড ইন 'হার্টলি হাউস' এ লাইভলি কালেকশান অব কনটেমাপারারি লেটার্স, ইজ ক্যারেড অন মেন'জ শোল্ড্যারস (লাইক ইয়োর ওয়াকিং ফিউনেরালস ইন ইংল্যান্ড) এ্যাণ্ড এ প্রোশেসান অব জেন্টেল ম্যান ইকোয়ালি নিউমেরাস এ্যান্ড রেসপেকটেবল ফ্রম দি জেন্টিল কালেকশানস্, ফলোইং, 'সী ফীকোয়েন্ট ওয়াজ দি

স্টেকট্যাকল দ্যাট স্পেশাল প্রিকসানস ওয়ের টেকন নট টু হ্যারো দি ফীলিংজ অব দি ফেয়ার সেক্স।"

১৯ এপ্রিল ১৮২৮ 'সমাচার দর্পণ' স্টুয়ার্ট সাহেবের মৃত্যু সম্পর্কে লিখেছেন, "জেনরল স্টুয়ার্ট এই বাঙ্গালার পল্টনভুক্ত ছিলেন তিনি প্রাচীন হইয়া কর্ম্মচ্যুত হইযাছিলেন সংপ্রতি তিনি কোন পীড়ার উপলক্ষে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন এই স্টুয়ার্ট সাহেব এই বঙ্গদেশীয় ভাষাব ধারার রীতি এমত অভ্যাস করিয়াছিলেন এবং এমত বাঙ্গালিপ্রিয় ছিলেন যে সকলে ইহাঁকে হিন্দু স্টুয়ার্ট কহিত সুতরাং ইনি বাঙ্গালিদিগের সহিত সতত আলাপন করাতে ও শাস্ত্র শ্রবণ করাতে বাঙ্গালিদিগেব তাবৎ বিষয জ্ঞাত হইয়াছিলেন। ইহাঁর এমন সচ্চরিত্র এবং দয়া ছিল যে ইনি সদা সর্ব্বদা লোকেব উপকার করিতেন এবং শত২ অনাথ ইহাতে এই বাঙ্গলার নানা প্রকার পুরাতন চমৎকার দ্রব্য সকল উত্তম প্রতিমা ও আভরণ ও অস্ত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং যে কেহ ইহা দেখিতে ইচ্ছুক হইতেন তাঁহাকে স্বয়ং আপনি কিম্বা লোক দ্বারা ঐ সব চমৎকৃত দ্রব্য দেখাইতেন। .."

উইলিয়াম জোন্সের নিজের লেখা সমাধি লিপিটিও খুব আকর্ষনীয়। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে এখানে তাঁকে যখন সমাধিস্থ করা হয় তখন ফোর্টউইলিয়াম দুর্গ থেকে ৪৯ বার কামান গর্জন করে নবাবী কায়দায় সম্মান জানানো হয়। এখানেই আছে কবি ও শিক্ষাবিদ ডিরোজিওর সমাধি। আছে জজসাহেব ববার্ট পলকের স্ত্রী লুসিয়ার সমাধি।

পার্কস্ট্রীটের আর একটি সমাধিক্ষেত্রেব নাম 'দি ফ্রেঞ্চ অথবা টিরেটাজ বেরিয়েল গ্রাউন্ড'।

কলকাতা ছাড়াও ২৪ পরগনা, হুগলী, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর গোটা রাজ্যেই সাহেবদের সমাধিক্ষেত্র দেখা যায়। সর্বত্রই সেনাবাহিনীর লোক ছাড়া বিশেষ ব্যক্তিদের সমাধি আছে। যেমন শ্রীরামপুরে, ওয়ার্ড, মার্শম্যান ও কেরীর সমাধি আছে। সেগুলোর বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারলে ভালো হত। ইংরাজ ছাড়া, গ্রীক, চিনা, আর্মেনিয়ান নানা বিদেশীজাতির সমাধিস্থান গোটা দেশে ছড়িয়ে আছে। সঙ্গের সমাধিলিপিগুলি এই মুহূর্তে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কিন্তু সুযোগ না থাকায় বিস্তৃত লেখা গেলনা।

সাহেবদের কবরখানার পরিচয়

সাহেব সুবোদের লেখা বইপত্রে সংকলনে কলকাতাস্থ তাদের সমাধিস্থান, সমাধিলিপির নানা পরিচয় পাওয়া যায়। সরকারী, বেসরকারী এসব উদ্যোগের পরিচয়টুকুর উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে রচিত বেশ কিছু বাংলা পুস্তকে খ্রিস্টানদের কবর সম্পর্কে লেখা হয়েছে। ইংরেজী গ্রন্থেও পাওয়া যায়। H. E. A. Cottton-এর Calcutta Old and New এবং Kathleen Blechynden-এর Calcutta Past and Present. বেসরকারি উদ্যোগে প্রকাশিত Bengal Obituary (1448) কেও সাহেবদের কবরখানার একটি আকরগ্রন্থ বলা যায়। আর Office of the Superitendent of Government Printing, India-এর প্রকাশনায় এবং C. R. Willson, M.A. সম্পাদিত List of Inscription on Tombs or Mnuments in Bengal, Possessing Historical or Archeological Interest (1896) একটি বাস্তবিক আকরগ্রন্থ। এর Vol. I

হচ্ছে Bengal। এই বিশাল তথ্যভাণ্ডার থেকে বিশদ কিছু উপস্থাপনের পক্ষে বড় সমস্যা স্থান সংকুলান। মোটামুটি ভাবে এখানে যে সব সমাধিক্ষেত্র বা কবরখানার কথা আছে, তাদের সূচনা বা প্রতিষ্ঠার কথা বলা যেতে পারে।

১. সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল। ১৮২৬ থেকে এখানে কবর দেওয়া হচ্ছে। যদিও ১৮২৭ সালে এটি উৎসর্গ করা হয়।

২. সেন্ট জন্স চার্চ ইয়ার্ড। ১৬৯০ থেকেই ব্যবহৃত হয়। ১০ই জানুয়ারী ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে জোব চার্নককে এখানে সমাহিত করা হয়।

৩. সেন্ট জন্স চার্চ, পুরানো গির্জা। ৬ই এপ্রিল ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলেও ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে জুন এটি উৎসর্গ করা হয়।

৪. ওল্ড মিশন চার্চ। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে এটি চালু হয়।

৫. সেন্ট পিটার্স চার্চ, ফোর্ট উইলিয়াম। ১৮২৪ সালে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলেও ১৮২৬ সালে চালু হয়।

৬. অন্যান্য এ্যাংলিকান এবং প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ সমূহ :

i) সেন্ট জেমস চার্চ, উৎসর্গ করা হয় ২৫শে জুলাই ১৮৬৪।

ii) সেন্ট থমাস চার্চ, উৎসর্গ করা হয় ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৩।

iii) সেন্ট, স্টিফেনস্ চার্চ। শুভারম্ভ ১৮৪৬। উৎসর্গীকৃত ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৭০।

iv) অক্সফোর্ড মিশন হাউস। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট।

v) চ্যাপেল অর্ফাদি ইউরোপীয়ান ফিমেল, অরফান এসাইলাম।

vi) সেন্ট অ্যান্ড্রুজ'স চার্চ।

vii) সা-ুলার রোড ব্যাপটিস্ট চ্যাপেল।

viii) লাল বাজার ব্যাপটিস্ট চ্যাপেল।

৭. রোমান ক্যাথলিক চার্চইয়ার্ড এবং ক্যাথিড্রাল :

i) রোমান ক্যাথলিক চার্চইয়ার্ড। ১৬৯০ থেকে ব্যবহৃত।

ii) রোমান ক্যাথলিক ক্যাথিড্রাল।

৮. অন্যান্য রোমান ক্যাথলিক চার্চসমূহ :

i) চার্চ অফ দ্য সেক্রেট হার্ট।

ii) সেন্ট থমাসের রোমান ক্যাথলিক চার্চ।

iii) চার্চ অফ আওয়ার ব্লেসড লেডি অফ ডলয়ার্স।

৯. আর্মেনিয়ান চার্চইয়ার্ড এবং চার্চ :

i) আর্মেনিয়ান চার্চইয়ার্ড। K. Phnos-এর প্রতিষ্ঠাতা।

ii) আর্মেনিয়ান চার্চ অফ সেন্ট নাজারেথ। পার্শিয়ার আর্মেনিয়ান স্থপতি Cavond এটি তৈরি করেন।

১০. গ্রীক চার্চ এবং চার্চইয়ার্ড, কলকাতা।

১১. সাউথ পার্কস্ট্রীট সেমিট্রি। দি গ্রেট বেরিয়াল গ্রাউন্ড। ১৭৬৭ সালে শুভারম্ভ।

১২. নর্থ পার্কস্ট্রীট সেমিট্রি। দি নিউ বেরিয়াল গ্রাউন্ড। ১৭৯৬-৯৭ সালে কবর দেওয়া শুরু হয়।

১৩. লোয়ার সার্কুলার রোড সেমিট্রি। ১৮৪০ সালের ২৯শে এপ্রিল শুভারম্ভ।

১৪. অন্যান্য সেমিট্রি সমূহ :

i) মিশন সেমিট্রি, কলকাতা। 'কিয়েরনানদার'স বেবিয়াল গ্রাউন্ড।

ii) মিলিটারি সেমিট্রি। ১৮৭২-৮৩ সালে কবর দেওয়া শুরু হয়।

iii) সি.এম.এস. সেমিট্রি, মানিকতলা।

iv) স্কচ অথবা স্কটিশ সেমিট্রি : দি ডিসেনটারস বেরিয়াল গ্রাউন্ড।

v) ফ্রেঞ্চ সেমিট্রি : টিরেটাস বেরিয়াল গ্রাউন্ড। ১৭৯৬ সাল থেকে কবর শুরু হয়।

vi) সেন্ট জন্‌স রোমান ক্যাথলিক সেমিট্রি।

vii) আর্মেনিয়ান সেমিট্রি, কলুটোলা।

এছাড়া কিছু পবিত্র, গৃহ, গৃহাঙ্গন ও মুক্ত স্থান আছে। যেখানে বিশিষ্ট খ্রিস্টান ব্যক্তিদের কবর আছে।

কলকাতার বাইরে যেসব স্মৃতিস্তম্ভ, সমাধি আছে সংক্ষেপে তার একটি তালিকা দেওয়া হল :

১. বর্ধমান বিভাগ

i) ব্যান্ডেল চার্চ এ্যান্ড কনভেন্ট, হুগলী। ১৬৪০ সালে পুরানো কবরখানার অবলুপ্তি।

ii) ১৬৬১ সালে জন গোমস ডি সোটো পুনরায় তা তৈরি করেন।

iii) ইংলিশ চার্চ, চুঁচুড়া। পুরানো ডাচ গীর্জা। ১৭৬৭ সালে স্যার জে. ভারনেট গড়ে তোলেন।

iv) রোমান ক্যাথলিক চার্চ, চুঁচড়া।

v) আর্মেনিয়ান চার্চইয়ার্ড, চুঁচুড়া। ১৬৯৫ সালে মার্গার সোহানেস-এর সূচনা করেন এবং ১৬৯৭ সালে জোশেপ সোহানেস এর সমাপ্তি করেন।

vi) ডাচ সেমিট্রি, চুঁচুড়া।

vii) ফ্রেঞ্চ চার্চ, চন্দননগর।

viii) ফ্রেঞ্চ, সেমিট্রি, চন্দননগর।

ix) গৌরহাটি।

x) ইংলিশ চার্চ, শ্রীরামপুর। পুরানো ডেনিস চার্চ।

xi) ব্যাপটিস্ট চ্যাপেল, শ্রীরামপুর।

xii) রোমান ক্যাথলিক চার্চ, শ্রীরামপুর।

xiii) ড্যানিশ সেমিট্রি, শ্রীরামপুর।

xiv) মিশন সেমিট্রি, শ্রীরামপুর।

xv) সেন্ট থমাস চার্চ, হাওড়া।

xvi) ওল্ড সেমিট্রি, হাওড়া।

xvii) নিউ সেমিট্রি, বাঁটরা।

xviii) ব্যাপটিস্ট সেমিট্রি, সালকিয়া।

xix) শিবপুর কলেজ চ্যাপেল, (পুরানো বিশপ কলেজ)

xx) মেদিনীপুর সেমিট্রি, মেদিনীপুর।

xxi) মেদিনীপুর টাউন সেমিট্রি, মেদিনীপুর।

xxii) তমলুক টাউন সেমিট্রি, মেদিনীপুর।

প্রেসিডেন্সী বিভাগ

i) পলতা।

ii) সেন্ট বার্থোলোমেজ্স চার্চ, ব্যারাকপুর।

iii) ওল্ড সেমিট্রি, ব্যারাকপুর।

iv) নিউ সেমিট্রি, ব্যাবাকপুর।

v) ব্যারাকপুর পার্ক।

vi) রিভারসাইড, ব্যারাকপুর।

vii) সেন্ট স্টিফেনস্ চার্চ, দমদম।

viii) সেন্ট স্টিফেনস্ চার্চ ইয়ার্ড, দমদম।

ix) ক্যান্টনমেন্ট, দমদম।

x) ওল্ড সেমিট্রি, দমদম।

xi) নিউ সেমিট্রি, দমদম।

স্টুয়ার্টের সমাধি

xii) কাশীপুর ফাউন্ড্রী এ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরী।

xiii) খেজুরী, মেদিনীপুর।

xiv) পলাশী, নদীয়া।

xv) ওল্ড ডাচ সেমিট্রি, কালকাপুর, মুর্শিদাবাদ।

xvi) ওল্ড ইংলিশ সেমিট্রি, কালকাপুর।

xvii) ওল্ড রেসিডেন্সি বেরিয়াল গ্রাউন্ড।

xviii) বহরমপুর সেমিট্রি।

xix) আর্মেনিয়ান চার্চ ইয়ার্ড, সৈয়দাবাদ। ১৬৬৫ সালে আওরঙ্গজেবের দানে গড়ে ওঠে।

রাজশাহী বিভাগ

i) পাতলা খোয়া সেমিট্রি. জলপাইগুড়ি।

ii) সেন্ট অ্যান্ড্রুজস্ চার্চ, দার্জিলিং।

iii) দার্জিলিং সেমিট্রি। এখানে আলেকজান্ডার সোমারোকোরোস নামক তিব্বতী ভাষার বিখ্যাত গবেষকের কবর আছে।

iv) ওল্ড সেমিট্রি, জলাপাহাড়। ৪ মে ১৮৯২ মৃত্যু। এডওয়ার্ড উইলিয়ামস্।

v) রংপুর সেমিট্রি। উইলিয়াম কার্ভিল আর্মহাস্ট। মৃত্যু ২০ এপ্রিল, ১৭৯২।

ঢাকা বিভাগ

i) ইংলিশ সেমিট্রি, ঢাকা। উল্লেখিত প্রথম কবর যোশেফ পাগেট, Minister of Calcutta. মৃত্যু ১৭২৪, ২৬ শে মার্চ।

ii) ডিসেন্টার্স সেমিট্রি। উইলিয়াম রবিনসনের কবর। মৃত্যু ২ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩।

iii) আর্মেনিয়ান চার্চইয়ার্ড, ঢাকা।

iv) আর্মেনিয়ান চার্চইয়ার্ড, তেজগাঁ। মিস রোজমানি। মৃত্যু ২৫ জুন,. ১৭০৬, ঢাকা, ৩০ বছর বয়সে।

v) রোমান ক্যাথলিক চার্চ, তেজগাঁ। Dr. C. F. D. Angos মৃত্যু ১৩ আগস্ট,১৮৪১।

vi) বরিশাল সেমিট্রি, জন ম্যাক্স। মৃত্যু ৩ নভেম্বর ১৭৬০।

চট্টগ্রাম বিভাগ

i) চিটাগাং সেমিট্রি। লেফট. উইলিয়াম ডিকসন। মৃত্যু ৩১শে আগস্ট ১৮২৭। Executive Engineer. স্যার আলেকজাণ্ডার ডিকসনের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

ভবানীপুর সেমিট্রি, ছবি : অভিজিৎ রায়

ওয়ার্ড মার্শম্যান ও কেরীর সমাধি (শ্রীরামপুর)

সেকালের সতীদাহ প্রক্রিয়া

গুজরাত প্রদেশে ও আগ্রা-দিল্লী অঞ্চলে সতীর আত্মীয়-স্বজনেরা বাঁশ কাঠ-খড় দিয়ে একটি কুড়ে ঘর তৈরী করে তার ভেতর কয়েক কলসী জল ও দাহ্য দ্রব্য রাখে। সতী ঘরের ভিতর এক খণ্ড কাঠের উপর মাথাটি রেখে একটি খুঁটিতে পিঠটি ঠেসান দিয়ে বসেন। তারপর পুরোহিতেরা তার কোমড়ে দড়ি দিয়ে তাঁকে খুঁটির সঙ্গে বাঁধে। এই অবস্থায় সতী তার কোলে মৃত স্বামীর দেহটি নিয়ে প্রায় আধঘন্টা বসে থাকে, আর সারাক্ষণ পান চিবুতে থাকে। এই সময় পুরোহিতেরা কুঁড়ে ঘরের বাইরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরেই ঘরের ভেতর থেকে সতী পুরোহিতদের কুঁড়ে ঘরের আগুন দিতে বলে। একাজে তাদের সতীর আত্মীয় স্বজনেরাও সাহায্য করে। তারপর জ্বলন্ত কুঁড়ে ঘরের উপর কলসী কলসী তেল ঢালা হয়। এই ভাবে ঘরটি পুড়ে ছাই হয়ে গেলে পুরোহিতেরা সেই ছাই থেকে হাতের বালা, পায়ের মল, আংটি, কানের দুল ইত্যাদির গলা সোনা-রূপা তুলে নেয়। এগুলি তাদের প্রাপ্য।

— জাঁ বাতিস্ত তাভার্নিয়ে

কবি জসীমউদ্দীনের বিখ্যাত কবর. ছবি বিকাশ সূত্রধর, সৌজন্যে · আমিনুল হক

শম্ভুমিত্রের শেষ ইচ্ছাপত্র

হয়তো অনেকেরই জানা মৃত্যুর আগে শম্ভু মিত্রের ইচ্ছাপত্রে তিনজন স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আমি ছিলাম একজন।

এখানে লিখিত তাঁর ইচ্ছাগুলিকে অনেক আগেই তিনি ব্যক্ত করেছিলেন আমাদের কাছে। একটা খসড়াও করে আমাকে একবার দিয়ে বলেছিলেন, এটা রেখে দেবেন। সেই সময় প্রয়োজন হবে। এরও অনেক আগে উনিশ 'শ' বাহাত্তর সালে 'বহুরূপীর' সম্পাদকের উদ্দেশ্যে তিনি একটি চিঠিতে ব্যক্ত করেছিলেন প্রায় একই ধরনের অভিপ্রায়। শেষ বারেরটির বেলায় তফাৎ হল, আরও বিশেষভাবে প্রতিটি কথা লিখে রাখা এবং সেটি কোর্টের স্ট্যাম্প পেপারের ওপর লিখে নিজে সই করে তারপর সাক্ষী হিসেবে আমাদর তিনজনকে সই করতে বলেছিলেন। ডা. শিবাজী বসু, অধ্যাপক শিবনাথ চট্টোপাধ্যায় ও আমি। এটি করার উদ্দেশ্য আর কিছু নয় ভবিষ্যতে শাঁওলীকে কোন জবাবদিহির মধ্যে যেন না পড়তে হয়।

"আমি জানি ভালো করে কী অসুখ করেছে। সুতরাং অনুগ্রহ করে যেন চিকিৎসার নামে আমার বাঁচার কষ্টটা দীর্ঘায়িত করা না হয়।..... মৃত্যুর পর শাঁওলীর বিবেচনা মত যত দ্রুত সম্ভব যেন আমাকে সোজা পোড়ানোর জায়গায় নিয়ে যাওয়াব বন্দোবস্ত করা হয়। দেহটা যেন রবীন্দ্রসদন ইত্যাদির মতন কোনও সাধারণ স্থানে প্রদর্শিত না হয়, পথে ঘোরানোও যেন না হয়।.... আমার যেন মুখাগ্নি করা না হয়। 'শ্রাদ্ধ' বলে যা করা হয়ে থাকে তা যেন কিছুতেই না করা হয়। ওসব তো আমি বিশ্বাস করিনা। নতুন কোনও কাপড় চোপড় পরানো হবে না। দরকার হলে কেচে রাখা কাপড় পরানো যাবে। মোটকথা আমি সামান্য মানুষ, জীবনে অনেক জিনিস এড়িয়ে চলেছি। তাই মরবার পরেও আমার দেহটা যেন তেমনি নীরবে, একটু ভদ্রতার সঙ্গে সামান্য বেশে বেশ একটু নির্লিপ্তির সঙ্গে গিয়ে পুড়ে যেতে পারে। .... অজস্র সাধারণ লোক আমায় আদর করেছেন বলেই আমি নানা প্রতিকূলতাব মধ্যেও যেটুকু কাজ করেছি তা করতে পেরেছি। সেই সমস্ত অগণিত সাধারণ মানুষদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এই লেখাতে তাঁদের সকলকে আমার ঐকান্তিক নমস্কার জানাই।"

এই লেখার তারিখ সাতাশ ফেব্রুয়ারি, সাতানব্বই।

বারীন রায়/সহজ মানুষ শম্ভুমিত্র/দৈনিক স্টেটসম্যান, রবিবার ২২ আগষ্ট ২০০৪।

মধুসূদন গুপ্ত ও শবব্যবচ্ছেদ

হেয়ার সাহেবেরই মন্ত্রশিষ্য বৈদ্যবাটীর মধুসূদন গুপ্ত 'মড়া কেটে' সৃষ্টি করেছিলেন এক ইতিহাস। ১০ই জানুয়ারী ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে স্ক্যালপেল হাতে নিয়ে ডাঃ হেনরি হ্যারি গুডিড সাহেবের সাথে কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজের একটি গুদাম ঘরে ঢুকলেন মড়া কাটতে। ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্রে সূচিত হল নবদিগন্ত। হিন্দু সমাজ রে রে করে উঠল। এই কারণে সে সময়ের প্রখ্যাত আয়ুর্বেদাচার্য গঙ্গাধর সেনরায় ক্ষোভে কোলকাতা ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদে চলে এলেন। মুধুসূদনকে জাতিচ্যুত করে একঘরে করা হল। তিনি নির্ভয়ে গোঁড়ামি ত্যাগ করে আমাদের দেশে 'অ্যানাটমি' শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করলেন। ইয়ংবেঙ্গলের অনুগামীরা এব্যাপারে তাদের জোরালো বক্তৃতায় প্রগতির হাওয়া তুললেন। মধুসূদনের মৃত্যুতে 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখলঃ

'....মধুসূদনবাবু এতদ্দেশীয় শবব্যবচ্ছেদবিদ্যা ব্যবসায়ীগণের আদিপুরুষ ছিলেন, এতদ্দেশীয়রা বিশেষতঃ হিন্দু জাতিরা মৃতদেহ স্পর্শ করিবেন দূরে থাকুক পিতা-মাতা আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু হলে যে স্থানে শব রাখে গোময়জলে সেস্থান পর্যন্ত ধৌত করেন, শব লইয়া গেলে বহির্দ্বার পর্যন্ত গোময়জলের ছিটা দেন। মৃতদেহের বিষয়ে অদ্যাপিত যে জাতির ঘৃণা ও পাপ রহিয়াছে মধুসূদনবাবু সেই জাতির মধ্যে এক উত্তম কুলে জন্মিয়াছিলেন তথাচ মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া হিন্দু জাতির মধ্যে সর্ব্বাগ্রে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হন, তাঁহার দৃষ্টান্ত অন্যান্য হিন্দুরা মৃতদেহ কাটাকুটি কার্য্যে সুপটু হইয়াছেন ঐ বাবুই তাঁহাদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছেন, মধুসূদন গুপ্ত স্বজাতীয় বৈদ্যক বিদ্যায় এবং ইংরাজী চিকিৎসা বিদ্যায় সুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন তাহাতে দেশের বিস্তর উপকার করিয়াছেন তাঁহার মৃত্যু সমাচারে ইংরাজ বাঙালী সাধারণ বহুলোক আক্ষেপ করিবেন।'

তাঁর সম্পর্কে ১৮৫৬-৫৭ খ্রিস্টাব্দে ডি.পি.আই.এব প্রতিবেদন ঃ

'Baboo Maddosoodum Gupta, Lecturer on Anatomy to the Bengali and Hindustani students. after twenty two years service in the college; died on the 15th November, 1856. To him a debt of gratitude is due by his countrymen. He was the pionner who cleared a space in the jungle of prejudice, into which others have successfully pressed and it is hoped that his countrymen appreciating his example will erect some monument to prerpetuate the memory of the victory gained by Madhusudan Gupta over public prejudice, and from which so many of his countrymen now reap the advantage.

মধুসূদন যখন শবব্যবচ্ছেদ করেন তখন ফোর্ট উইলিয়াম থেকে তোপধ্বনি করে তাকে সম্মান জানানো হয়।